শংকর

কিশোর রচনা সমগ্র



শংকর

কিশোর রচনা

সমগ্র

শংকর

সাহিত্যম ॥ ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

SANKAR
KISHOR RACHANA SAMAGRA
by SANKAR
Sahityam
18B Shyamacharan Dey Street,
Kolkata 700073

প্রকাশক ❑
শ্রীনির্মলকুমার সাহা
সাহিত্যম্
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান ❑
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা ৭০০ ০০৭

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক ❑
লোকনাথ বাইন্ডিং অ্যান্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৪বি কলেজ রো
কলকাতা-৭০০ ০০৯

বর্ণ-সংস্থাপনা :
দিলীপ দে
লেজার অ্যান্ড গ্রাফিকস্
১৫৭বি মসজিদবাড়ি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৬

প্রচ্ছদ · বুধেন্দ্র ব্যানার্জি

উৎসর্গ

আমার ছোটবেলার
পঞ্চস্তম্ভ
বাদলকাকু শ্রীবাদলচন্দ্র বসু
মুহুরিমশাই শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মান্না
গোমস্তামশাই শ্রীবরদাপ্রসন্ন মণ্ডল
হাঁদ্দা শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টচার্য
গুঁইরামদা শ্রীহিমাংশুশেখর ভট্টাচার্যকে

এঁদের কেউ আজ সশরীরে আমার চোখের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু তাই বলে এবং এখন বেঁচে নেই এটা সত্য নয়, এঁরা সবাই সারাক্ষণ চলাফেরা করছেন আমার মনের মধ্যে, আমার বুকের ভিতরে।

শংকর-এর বই

ছোটদের বই
এক ব্যাগ শংকর ৩০্
চিরকালের উপকথা ৩০্
শংকর কিশোর রচনা সমগ্র ১০০্

বিশেষ রচনা
রসবতী ৬৫্
বঙ্গ বসুন্ধরা ৭০্
চরণ ছুঁয়ে যাই (১ম) ৭৫্ (২য়) ৭৫্
কত অজানারে ৯০্
এই তো সেদিন ৫০্
যোগবিয়োগ গুণ ভাগ ৩৫্
পাত্রপাত্রী ৪০্

ভ্রমণ সাহিত্য
এপার বাংলা ওপার বাংলা ৫৫্
যেখানে যেমন ৫০্
জানা দেশ অজানা কথা ৫০্
মানবসাগর তীরে ৮০্

সংকলন
ভ্রমণ সমগ্র
সপ্তসাগর পারে ১২৫্
চলচ্চিত্রায়িত কাহিনীসংগ্রহ
ছায়াছবি ১৫০্

ত্রয়ী উপন্যাস
স্বর্গ মর্ত পাতাল ৬০্
(জন-অরণ্য, সীমাবদ্ধ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা)
জন্মভূমি ৫০্
(স্থানীয় সংবাদ, সুবর্ণ সুযোগ ও বোধোদয়)

যুগল উপন্যাস
তনয়া ৬০্
(সীমন্তসংবাদ ও নগর নন্দিনী)
তীরন্দাজ ৫০্
(তীরন্দাজ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট)
মনজঙ্গল ৫০্
(মনোভূমি ও মনজঙ্গল)

কথাসাহিত্য
যাবার বেলায় ৫০্
চেনা মুখ জানা মুখ ৪০্
সপ্তরথী ৪০্
এখানে ওখানে ৫০্
মানচিত্র ৪০্
সার্থক জনম ৪০্
এক দুই তিন ৪০্
যা বলো তাই বলো ১৫্
এক যে ছিল ৩২্

উপন্যাস
অবসরিকা ৫০্
লক্ষ্মীর সন্ধানে ৫০্
সহসা ৪০্
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত ৫০্
কামনা বাসনা ৪০্
পটভূমি ৪০্
বাংলার মেয়ে ৪০্
সুখসাগর ৫০্
দিবস ও যামিনী ৩০্
যেতে যেতে যেতে ৪০্
অনেকদূর ৩০্
চৌরঙ্গী ৭০্
ঘরের মধ্যে ঘর ১৫০্
এবিসিডি ৩৫্
কাজ ৩৫্
মুক্তির স্বাদ ৪০্
মাথার ওপর ছাদ ৩৫
একদিন হঠাৎ ৩৫্
নবীনা ৩০্
মানসম্মান ৪০্
রূপতাপস ২৫্
সোনার সংসার ৩৫্
জন-অরণ্য ৪০্
মরুভূমি ৪০্
আশা-আকাঙ্ক্ষা ৪০্
সুবর্ণ সুযোগ ৪০্
সম্রাট ও সুন্দরী ৪০্
বিত্তবাসনা ২৫্
বোধোদয় ১৬্
নগর নন্দিনী ৪০্
সীমন্তসংবাদ ৪০্
স্থানীয় সংবাদ ২৫্
সীমাবদ্ধ ৩৫্
নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরেটরি ৪০্
পদ্মপাতায় জল ৫০্

লেখকের কৈফিয়ৎ

ছোটদের জন্যে লেখা যে কী ভীষণ শক্ত কাজ তা সব লেখকেরই হাড়ে-হাড়ে জানা আছে।

কেন এই লেখা শক্ত? এ-বিষয়ে অনেক কর্তাব্যক্তি নানা সময়ে নানা ভাবে মাথা ঘামিয়েছেন। মোদ্দা কথাটা হলো, ময়রার দোকানের স্পঞ্জ রসগোল্লায় কোনোরকম ভেজাল চলে না, এই ছানায় অন্য কিছু মেশালেই তা ফেটে যায়।

আরও একটা মুশকিল আছে, যারা নিজেরা কখনও ছোট ছিল না তারা ছোটদের জন্যে লিখতে গেলেই খুব কষ্ট পায়। মা আমার ওপর খুব রেগে গেলে বলতেন ইঁচড়ে-পাকা, অর্থাৎ কচি বয়সেই কেউ কেউ ভীষণ পেকে যায়। এখন আমার মা নেই। থাকলে তিনি দেখতেন, তাঁর অকালপক্ক ছেলে পক্ককেশ অবস্থায় কচি হবার জন্যে বেজায় চেষ্টা চালাচ্ছে।

এখন প্রশ্ন, যখন যেমন তখন তেমন, অর্থাৎ সময়ের ফল না হয়ে কেন অসময়ে কচি হবার ইচ্ছা? তার কারণ, পৃথিবীতে বেশ কিছু অবুঝ মানুষ থাকে যারা ছোটবয়সে বড় হতে চায় এবং পরে বুড়োবয়সে ছোট হবার জন্যে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে। তাই সমস্ত ছোটদের কানে কানে বলতে চাই, খবরদার বড় হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না ; বড় হয়ে কোনো লাভ নেই, বড়রা এই পৃথিবীকে যেভাবে গুবলেট করেছে ছোটরা মাঠে নামলে তা কিছুতেই করতে পারতো না।

এবার কিছু নিজের কথা। মাঝে মাঝে নিজের খেয়ালে ছোটদের জন্যে কিছু লিখেছি—কিন্তু সেসব বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এখন হিসেব করে দেখা যাচ্ছে, সত্যিই রাই কুড়িয়ে বেল হয়—অর্থাৎ আমিও সাহস করে কিশোর রচনা সমগ্র ছাপাবার দুঃসাহস দেখাতে পারি। দুশ্চিন্তার কারণ একটাই। সমগ্র

মানে, লেখার পাট চুকে গিয়েছে, আর কিছু সংযোজিত হবার চান্স নেই। এরকম গ্যারান্টি দিতে গিয়েও দিতে মন চাইছে না। অর্থাৎ, কিশোর রচনা সমগ্র প্রকাশের পরে যদি আবার কিছু লিখে বসি ছোটদের জন্যে তাহলে খুব বেশি নিন্দে করা চলবে না। সেক্ষেত্রে কোন্ পথে শাস্তি এড়ানো যাবে তার ইঙ্গিত আমার মা অনেকদিন আগেই দিয়ে গিয়েছেন। ছোট ও বড়দের তফাৎ বোঝাতে গিয়ে মা বলতেন, কচিতে না নোয় বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁশ ট্যাশ। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, গ্রামেগঞ্জে ছোটবড় সবাই জানে, ছোটরা যা করবে ঠিক করে তাই করে, সিদ্ধান্ত থেকে তারা সরে যায় না, আর বড়োরা মনস্থির করে আবার দ্বিধার দোলনায় দোল খায়—একবার ভাবে রচনা সমগ্রটাই শেষ রচনা, আর একবার ভাবে এই পৃথিবীতে যখন কিছুরই শেষ নেই, তখন শেষের পরে আবার শুরু করতে বাধা কোথায়?

এবার আমার কথাটি ফুরোলো। শংকর কিশোর রচনা সমগ্র খুব ভয়ে ভয়ে সবার হাতে তুলে দেওয়া গেল, দেখা যাক কম বয়সের পাঠক ও পাঠিকারা এগজামিনার হয়ে বসে আমাকে পাশ নম্বর দেয় কি না দেয়।

শংকর

খারাপ লোকের খপ্পরে

উৎসর্গ : মৌসুমী, কাকলি, কৌশিক, মিঠাই, রাণা ও গোপা-কে

লেখকের নিবেদন :

অনেকদিন ধরে কেবল বড়দের জন্যেই কলম পিষে এসেছি—ছোট-বড় সবার জন্যে একই সঙ্গে লেখার চেষ্টা করিনি। যাঁর খপ্পরে পড়ে আমার এই দুঃসাহস হলো তাঁর নাম শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাংলা সাহিত্যের এই জাঁদরেল কবি এবং প্রখ্যাত পত্রিকা 'আনন্দমেলা' সম্পাদকের কাছে গোড়াতেই ঋণ স্বীকার করে রাখছি।

দাদু ভবনাথ সেনের সঙ্গে এই সাত-সকালে পিকলুর ঠাকুমার ঝগড়া লেগেছে। কারণটা অবশ্যই পিকলু।

একটু আগেও ঠাকুমা একবার পিকলুর দাদুর কাছে গিয়েছিলেন। চেয়ারে বসে ভবনাথ তখন একমনে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পিকলুর ঠাকুমাকে দেখে সংসারের দরকারি কথা আলোচনা না-করে তিনি বলে উঠলেন, "চাঞ্চল্যকর চুরি! রয়টার খবর দিচ্ছে ইনটারন্যাশনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে সর্দি ভাইরাস চুরি হয়েছে।"

ভীষণ রেগে গেলেন পিকলুর ঠাকুমা। এমনভাবে ভবনাথ চুরির খবরটা তুলেছিলেন যে তিনি ভেবেছিলেন বিদেশের কোনো রাজপ্রাসাদ থেকে মহামূল্যবান হীরে-জহরত কিছু উধাও হয়েছে।

ঠোঁট বেঁকিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে পিকলুর ঠাকুমা উত্তর দিলেন, "ছাপবার মতো আর খবর পেলো না কাগজওয়ালারা?"

ভবনাথ তখন গভীর আগ্রহের সঙ্গে পুরো খবরটা পড়ে চলেছেন, "শোনো, শোনো—ভীষণ ব্যাপার। আন্তর্জাতিক সর্দি ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর আজ স্বীকার করেন যে এক পাত্র সর্দি ভাইরাসের হিসেব তাঁরা মেলাতে পারছেন না। তিনি দুঃখ করে বলেন, গবেষণা কেন্দ্রের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম সর্দি ভাইরাস চুরি হলো।"

ঘেন্নায় পিকলুর ঠাকুমার বমি হবার উপক্রম। তিনি এই সব নোংরা বিষয়ে আলোচনা একদম পছন্দ করেন না। তবু ভবনাথকে ওই খবরের মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে তিনি রেগেমেগে রান্নাঘরে চলে এলেন।

উনুনে আগুন তখন গনগন করছে। পিকলুর জলখাবার তৈরির জন্যে ঠাকুমা উনুনে কড়া চাপিয়ে দিলেন।

চিঁড়ে-ভাজা আর চা হাতে পিকলুর ঘরে ঢুকেই ঠাকুমা দেখতে পেলেন তাঁর আদরের নাতি মাদ্রাজ থেকে পাঠানো পিচার পোস্টকার্ডখানার দিকে একমনে তাকিয়ে আছে।

ছবিটা পাঠিয়েছে শতরূপা। একদিকে বঙ্গোপসাগরের রঙিন ফটো অন্যদিকে শতরূপার নিজের হাতের লেখা, "দাদু, আমরা আজ ভেলোরে যাচ্ছি। ওখান

থেকে তোকে আবার চিঠি লিখবো।"

ঠাকুমা জানেন, পিকলু এই চিঠিটা গতকালও সাত-আটবার পড়েছে। আজও সেই দৃশ্য দেখে পিকলুর মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে তিনি বললেন, "লক্ষ্মী সোনা আমার, কিচ্ছু ভেবো না—ঠাকুরেব ইচ্ছায় সব ঠিক হয়ে যাবে।"

শতরূপার শক্ত কী এক অসুখ হয়েছে—তাই পিকলুর বাবা-মা বোনকে নিয়ে ভেলোরে গিয়েছেন। ঠাকুমা ভরসা দিলেন, "ওখানে মস্ত হাসপাতাল, বড়-বড় সব ডাক্তার—শতরূপা খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে বাড়ি ফিরে আসবে।"

ঠাকুমা এর পরেই দাদুর ওপর রেগে উঠলেন। হাঁটার স্পিড ডবল করে দিয়ে রীতিমতো বিরক্তভাবে তিনি বৈঠকখানায় হাজির হলেন। দাদু ভবনাথ সেন তখন গড়গড়ার লাল রবারের পাইপটা বাঁ-হাতে ধরে ডান হাতে একখানা চিঠির খাম খুলবার চেষ্টা করছেন। চিঠিখানা লিখেছে সাহিত্যিক ভবনাথের কোনো ভক্তপাঠক : "আপনার লেখার তুলনা হয় না। আপনি আমাদের দেশের গৌরব।"

"তুমি কি অপদার্থই থেকে যাবে? সংসারের কোনো কাজে লাগবে না?" হুঙ্কার ছাড়লেন ঠাকুমা। সহজে রাগেন না তিনি, কিন্তু একবার মেজাজ গরম হলে মাথার ঠিক থাকে না।

দাদু ততক্ষণ গড়গড়ায় আর-একবার টান দিয়ে চিঠির গোছা থেকে একখানা পোস্টকার্ড টেনে নিলেন। বেনারস থেকে একজন পাঠিকা লিখেছেন : "আপনার লেখা পড়তে-পড়তে বিশ্বসংসারের কথা ভুলে কোথায় যেন চলে যাই!"

চিঠিখানা ঠাকুমার দিকে এগিয়ে দিয়ে ভবনাথ বললেন, "দেখো, পাঠকরা কী সব লিখছে।"

"আমার তো বিশ্বসংসার ভুললে চলবে না", মুখ ঝামটা দিলেন ঠাকুমা। "আমার ঘর-সংসার রয়েছে—পিকলুর চিন্তা আছে।"

"পিকলু তো খুবই ভাল ছেলে—ওর সম্বন্ধে আমার তো কোনো চিন্তাই হয় না।" অত্যন্ত শান্তভাবে ভবনাথ আবার গড়গড়ার পাইপে মুখ লাগিয়ে গুড়ুক-গুড়ুক শব্দ করতে লাগলেন।

ঠাকুমা কয়েক মুহূর্ত ভবনাথের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ওদিক থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে গলার স্বর টপ ভল্যুমে তুলে তিনি প্রশ্ন করলেন, "বলি, তুমি কি এই কলকাতা শহরে আছো? না বলিভিয়া-বাহামায় চলে গিয়েছো?"

ঠাকুমার এইসব কথা নিজের ঘর থেকে শুনতে পেয়ে পিকলু ফিক করে

হেসে ফেললো। দাদুর সদ্যপ্রকাশিত কিশোর উপন্যাসের পটভূমি বলিভিয়া। দুর্দান্ত হয়েছে নবেলখানা।

ওটা পড়া ছিল বলেই তো কুইজ কনটেসটে পিকলু ক্লাসের সবাইকে হারিয়ে দিলো। মাস্টারমশায় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "বলিভিয়া কোথায়?" ক্লাসের ছেলেরা কিছুই বলতে পারলো না। একজন আন্দাজে ঢিল ছুঁড়লো, "বাইলাডিলার কাছে—মধ্যপ্রদেশে।" "নো নো—একেবারেই ভুল।" মাস্টারমশায় গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, "আর কেউ? এনি ওয়ান এলস?" পিকলু সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠে বলে দিলো, "দক্ষিণ আমেরিকায়।"

"বলিভিয়ার রাজধানী?" মাস্টারমশায় ভাবলেন এবার পিকলু হেরে যাবে।

কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সে উত্তর দিলো : ' লা-পাজ।" এসব খবর দাদুর বই থেকে পিকলু জেনে ফেলেছে।

পিকলু ভেবেছিল, দাদু দক্ষিণ আমেরিকার ওইসব জায়াগায় নিজে গিয়েছেন—অনেকদিন থেকেছেন। না-হলে লা-পাজ শহরের অমন বর্ণনা করলেন কী করে?

কিন্তু কলকাতায় এসে ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করতে ব্যাপারটা তিনি ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেন। "বলিভিয়া! মাগো? সে আবার কোথায়? গতবার তো বই লেখার আগে হরিময় ঠাকুরপোর সঙ্গে বালিতে গিয়ে ক'দিন থাকলো।"

"বালি! বালিদ্বীপ। সেও তো অনেক দূর। ভারি সুন্দর জায়গা।" ওখানকার ক'খানা রঙিন ছবি পিকলু দেখেছে। ওখানকার মেয়েদের মাথায় কী চমৎকার ফুল গোঁজা থাকে।

ঠাকুমা বললেন, "দূর! বালিতে তো কোনো মেয়ে মাথায় ফুল গোঁজে না। আমার বাপের বাড়ি তো বালিতে—বালি-উত্তরপাড়ায়। এখান থেকে মাইল কয়েক দূরে—তোকে একদিন নিয়ে যাবো'খন।"

বলিভিয়ার কথায় দাদু মুখ তুলে চাইলেন। পিকলুর ঠাকুমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু বলছো?"

"বলছি বই কি। বলবার জন্যেই তো এসেছিলাম। কিন্তু কোনো কথাই তোমার কানে ঢুকলো না," ঠাকুমা বেশ জোরের সঙ্গেই ঝগড়া করতে গেলেন।

কিন্তু পিকলুর সাহিত্যিক দাদু ইতিমধ্যে অন্য কী এক গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছেন। তিনি চোখ বন্ধ করেছেন, মাঝে-মাঝে শুধু গড়গড়ার চাপা আওয়াজ হচ্ছে গুড়ুক-গুড়ুক।

এবার ঠাকুমার রাগ বাড়লো। বললেন, "ঠিক আছে। তুমি যখন কিছুই

করবে না, তখন আমি লালবাজারেই খবর পাঠাচ্ছি।"

নাটকীয় এই মুহূর্তে এক ভদ্রলোক বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

বাইরের দরজাটা বন্ধ ছিল না। ভদ্রলোক বলতে যাচ্ছিলেন, "বাড়ির দরজা কখনও খুলে রাখবেন না। কখন কী বিপদ হয়—কে জানে। খারাপ লোকে দেশটা বোঝাই হয়ে যাচ্ছে।"

ঠিক এই সময় ঠাকুমার মুখে লালবাজার কথাটা শুনে ভদ্রলোক আঁতকে উঠলেন।

"অ্যাঁ! সাত-সকালে লালবাজার কেন? যা ভয় পাচ্ছিলাম তাই... অ্যাঁ...বউদি..."

ভদ্রলোক যে এ-বাড়ির শুভানুধ্যায়ী এবং সকলকেই খুব ভালবাসেন তা তাঁর কথায় বোঝা যাচ্ছে!

পিকলু দেখলো, জাম রংয়ের খাদি হাফ-হাতা পাঞ্জাবি পরেছেন ভদ্রলোক। রোগা পাকানো চেহারা। বোধহয় দাদুর বয়সী হবেন ভদ্রলোক। মাথা জুড়ে মস্ত টাক—শুধু এক থেকে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ জায়গায় ঘন কালো চুল রয়েছে। ঠিক যেন টেকো মাথার তলায় একখানা মোটা কালো রিবন জড়ানো আছে।

দাদু হেসে ভদ্রলোককে ভরসা দিলেন, "চুরি-ডাকাতির ব্যাপার নয়। উনি একবার বেয়াইমশায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছেন?"

এ-কথা শুনে ভদ্রলোক আরও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। "কী সর্বনাশ! কী করেছিলেন ভদ্রলোক? লালবাজার পুলিস লক্-আপ, সে অতি খারাপ জায়গা! ব্রিটিশ আমলে একবার ঐ হাজতে রাত কাটিয়ে এসেছিলাম।"

ভদ্রলোকের কথায় দাদু বেশ মজা পাচ্ছেন। গড়গড়ায় টান দেওয়া বন্ধ করে তিনি বললেন, "লক্-আপ নয়। খোকার শ্বশুরমশায় তো এখন ওখানেই ট্রান্সফার হয়েছেন। লালবাজারের মধ্যে বড়-বড় কোয়ার্টারও আছে। পিকলুর ঠাকুমা তো বেশ কয়েকদিন ওখান থেকে ঘুরে এসেছেন।"

দাদুর টেকো বন্ধুটি এবার টাকে হাত দিলেন। বললেন, "বউদি! আপনিই তাহলে হচ্ছেন সেই রাইট পার্সন যাকে আমি খুঁজছি।"

"কী করতে হবে বলুন?" ঠাকুমা ঝগড়া বন্ধ রেখে জিজ্ঞেস করলেন।

গলাটা একটু নামিয়ে টেকো ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, "একটা কোশ্চেনের অ্যানসার জানবার আমার খুব ইচ্ছে। আপনার বেয়াইকে যদি একটু জিজ্ঞেস করেন। বিনা লাইসেন্সে কোন সাইজ পর্যন্ত রামপুরিয়া সঙ্গে রাখা যায়?"

"কী পুরিয়া?" ঠাকুমা ঠিক বুঝতে পারছেন না। "খোকার শ্বশুর তো ডি-

সি, উনি ডাক্তার নন—পুরিয়া-টুরিয়া কোথায় পাবেন?”

টেকো ভদ্রলোক এবার ছোট ছেলের মতো হেসে ফেললেন। “এতো বড় রাইটারের বউ আপনি। শ্রদ্ধেয় দাদা থার্টি এইট ইয়ার্স বাংলা বইয়ের লাইনে আছেন—আর আপনি সামান্য ব্যাপারটা জানেন না। গতবারের সাপ্তাহিক শিহরন পত্রিকায় দাদার যে-লেখাটা বেরিয়েছে সেখানেই রামপুরিয়ার রেফারেন্স রয়েছে। অপূর্ব লাইনখানা : ‘রামপুরিয়া রামও নয়, পুরিয়াও নয়—স্রেফ একধরনের ছুরি ; স্প্রিং টিপলেই কেউটে সাপের মতো বেরিয়ে এসে ছোবল মারে। অথচ অন্য সময় দেখলে ছুরি বলে মনেই হয় না!”

গল্পটা পিকলুর পড়া হয়নি। কিন্তু মা পড়েছিল এবং পিকলু শুনেছে, এই রামপুরিয়ার কল্যাণেই দুঃসাহসী নায়ক শশধরবাবু দুর্দান্ত দস্যু ভোজরাজের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন।

সেই থেকেই বোধহয় এই ভদ্রলোক ভাবছেন, পথেঘাটে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে একখানা রামপুরিয়া রাখবেন।

“সঙ্গে রাখবার আর জিনিস পছন্দ করতে পারলে না!” দাদু বকুনি লাগালেন। ছোরাছুরি রিভলবার কিছু সঙ্গে রাখাই দাদু যে পছন্দ করেন না তা পিকলু জানে।

ভদ্রলোক এবার দাদুকে বললেন, “আপনি তো বলে খারাস। কিন্তু শ্রীভৃগু প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে খবরের কাগজে আমার সম্বন্ধে লিখছেন, সাবধান, শত্রু কাছেই আছে। যে-কোনো ক্ষতি হতে পারে।”

দাদু বলতে গেলেন, “রাশিচক্রের ওই সব রাবিশগুলো তুমি বিশ্বাস করো!” কিন্তু ঠাকুমা ওঁকে থামিয়ে দিলেন, “আপনি চিন্তা করবেন না, রামপুরিয়ার মাপটা আমি আপনাকে জানিয়ে দেবো।”

ঠাকুমা এবার বাইরের লোকের সামনে দাদুর হাঁড়ি ভাঙলেন। “যা অবস্থা দেখছি তাতে আমাকে এবং পিকলুকে এ-বাড়ি ছেড়ে লালবাজারেই উঠতে হবে। ওঁর তো কোনোদিকে নজর নেই—দিন রাত শুধু প্লট প্লট আর প্লট। গল্পের প্লট খোঁজা ছাড়া আপনার দাদার আর কিছুই ভাল লাগে না।”

টেকো-ভদ্রলোক এবার বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন। কোন পক্ষে সাপোর্ট দেবেন বুঝতে পারছেন না।

বাইরের লোকের সামনে অপমানিত দাদু এবার একটু রেগে উঠলেন। “লেখকের বউ যখন হয়েছো তখন প্লট, চরিত্র, সংলাপ এসব তো সহ্য করতেই হবে।”

"লেখক জানলে বিয়েই করতাম না," ঠাকুমা সোজাসুজি উত্তর দিলেন। "বিয়ের আগে তুমি তো শুধু পদ্য লিখতে। ছোট-ছোট জিনিস, বেশি হুজ্জুত নেই। তারপর এই ছেলেদের লাইনে এসে তোমার কী যে দুর্মতি হলো। কখনও কিছু বলবার উপায় নেই—সব সময় প্লটের মধ্যে ডুবে আছো।"

টেকো-ভদ্রলোক এবার দাদুর পক্ষে যাবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "দাদার যে আবার সব স্পেশাল প্লট! একটু বেশি খাটাখাটনি করতে হবেই—কলেজ স্ট্রিট থেকে সাধে কি আব ওঁকে শিশু সাহিত্যসম্রাট টাইটেল দেওয়া হয়েছে।"

"রাখুন-রাখুন!" এই বলে বিরক্ত ঠাকুমা এবার পিকলুর ঘরে চলে এলেন।

"বউদির মেজাজ আজ এতো চড়া কেন," এখনও ভদ্রলোক বুঝতে পাবেননি।

ভবনাথ সেন গড়গড়ায় সামান্য টান দিয়ে বললে, "তোমার বউদির দোষ নেই। প্রায় এক সপ্তাহ হলো পিকলু এসেছে, অথচ এখনও পর্যন্ত কলকাতা শহরের কিছুই ওকে দেখানো হলো না।"

"ভুলুর ছেলে! বম্বে থেকে এখানে এসেছে?" টেকো-ভদ্রলোক বেজায় খুশি হলেন। দাদুর সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রেখে তিড়িং করে ভদ্রলোক এবার ভিতরের ঘরে চলে এলেন!

ঠাকুমা আলাপ করিয়ে দিলেন পিকলুর সঙ্গে, "তোমার দাদুর বন্ধু—হরিময় চৌধুরী।"

হরিময়বাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, "তোমাদের সঙ্গে আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়তা আছে। কিন্তু সেটা আমি বলে বেড়াই না এই জন্যে যে দুর্জনেরা বলবে সাহিত্যিক ভবনাথ সেন শুধু আত্মীয়তোষণ করছেন। পর পর তিনখানা সম্পূর্ণ উপন্যাস আমার কাগজেই ছাপা হয়েছে।"

ঠাকুমা বললেন, "ভুলুর ছেলের নাম পিকলু।"

"খুউব বুঝতে পারছি—খুউব ছোটবেলায় যখন তুমি এসেছিলে তখন রিকশ চড়ে দু'জনে খুউব ঘুরেছি।"

"তখন যে পিকলু খুব রিকশ চড়তো তা মনে নেই।" ঠাকুমা বললেন, "রিকশ চড়লে তোর আর কিছু ভালো লাগতো না। তোর কান্নাকাটি এই দাদুই সামলাতো।"

ঠাকুমা এবার অতিথির জন্যে চায়ের জল চাপাতে গেলেন। হরিময়বাবু বেজায় খোশমেজাজে একখানা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে পিকলুর পাশে বসে পডলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার ভাল নামখানা যেন কী?"

'পুণ্যশ্লোক সেন।''

পিকলুর উত্তর শুনেই হরিময়বাবু টাকে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন ''হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে বটে—তোমার দাদু খুব ভেবেচিন্তে নাম দিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে কনসাল্টও করেছিলেন এবং সত্যি বলতে কী, আমি তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার দাদুব মাথায় যা ঢোকে তা তিনি করবেনই।''

এমন সুন্দর নাম, বম্বেতে কত মাবাঠি ভদ্রলোক এই নামের প্রশংসা করেন। অথচ হরিময়বাবুর আপত্তি কেন? পিকলু বুঝতে পারে না।

হবিময়বাবু বললেন, ''আমার আপত্তি টেকনিক্যাল কারণে। নাতিনাম্ ঠাকুর্দাক্রমঃ! যাব দাদু এতবড় লেখক, সেও নিশ্চয় লেখক হবে!''

পিকলু চুপ কবে আছে। হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে বললেন, ''হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। চার্লস ডিকেন্স এতো বড় নভেলিস্ট— তাঁর নাতনী মনিকা ডিকেন্স নাম কবা লেখিকা হয়েছে। উপেন্দ্রকিশোর বায়চৌধুরী, তাঁর নাতি সত্যজিৎ বায—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ! এখন ভবনাথ সেনের নাতির এইটটি পার্সেন্ট চান্স লেখক হবার। কিন্তু ওই 'পুণ্যশ্লোক' নামটা উচ্চারণ কবতে কচি-কচি ছেলে-মেয়েদের দাঁত নড়ে যাবে।''

হবিময়বাবুর কথা শুনে পিকলু হেসে ফেললো। লেখক হবার কোনো ইচ্ছে নেই পিকলুর। সে হতে চায বৈজ্ঞানিক : মহাকাশে যাবার বৈজ্ঞানিক। বোন শতরূপাকে সে বলে রেখেছে, ফ্রি পাসে সে একবার বোনকে সমস্ত মহাকাশ ঘুরিয়ে আনবে।

হরিময়বাবু বললেন, ''আমাকে তুমি ঠিক চিনতে পারছো না, বোধহয়। আমি চমচম পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর।''

চমচম পত্রিকার নিয়মিত পাঠক পিকলু। প্রথম পাতায় হেডিং থেকে শেষ লাইনে মুদ্রাকবের নাম পর্যন্ত সে পড়ে ফেলে, কিন্তু কোথাও হরিময়বাবুর নামটা সে একবারও দেখেছে বলে মনে করতে পারছে না।

''বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'' এবার নিজের টাক-মাথায় হাত দিলেন হরিময়বাবু। জিজ্ঞেস করলেন. ''এই জিনিসটার নাম কী?''

ফিক করে হেসে ফেললো পিকলু। ''এই জিনিসটার নাম কে না জানে? টাক।''

হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে জানালেন, 'টাকের একটা সিরিয়াস সংস্কৃত নাম আছে!''

পিকলুর এবার মনে পড়েছে, চমচম পত্রিকায় সম্পাদকের নাম থাকে :

ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী। ইন্দ্রলুপ্ত মানে তাহলে টাক!

চাপা গলায় হরিময়বাবু জানতে চাইলেন, "ছদ্মনামখানা কী রকম হয়েছে? তোমার দাদু তো প্রথমে শুনেই আমাকে কংগ্রাচুলেট করেছিলেন। সন্তুষ্ট হয়নি শুধু আমার ভাইপো। ইলু চৌধুরী অথবা ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরীর নামে কোনো চিঠি দেখলেই সে চটে উঠতো।"

হরিময় এবার মনের খুশিতে পিকলুর সঙ্গে চমচম পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করতে শুরু করলেন। হরিময়বাবুর ওই স্বভাব—ছোট ছেলেমেয়ে দেখলেই তাদের সঙ্গে একদম মিশে যান, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় চমচম পত্রিকা সম্বন্ধে মতামত সংগ্রহ করেন।

হরিময়বাবু বললেন, "চমচম নামখানা তোমার মিষ্টি লাগে না?"

"মিষ্টি বলে মিষ্টি।" পিকলু উত্তর দিলো।

"অথচ আমার চাকর এবং সহ-সম্পাদক বিজয়ের ধারণা নামটা মোটেই ভাল নয়।" দুঃখ করলেন হরিময়বাবু, "কাগজের নাম দিতে গিয়ে খু-উ-ব কষ্ট পেয়েছি। যে নাম পছন্দ হয়, দেখি সে নামেই একখানা পত্রিকা রয়েছে। না-হলে আমার ফার্স্ট প্রেফারেন্স ছিল সন্দেশ। খেতে এবং পড়তে দুই মজা। কিন্তু ও-নামে কাগজ রয়ে গিয়েছে। মিষ্টির দোকানে ছোটাছুটি করে দেখলাম, নেকসট টু সন্দেশ ইজ চমচম। কোনো সাহিত্য পত্রিকার নাম বোঁদে বা মিহিদানা রাখা যায় না। আমার বন্ধুর ইচ্ছে ছিল জিলিপি নাম হোক। আমার জন্ম বেনারসে। রাবড়ি এবং জিলিপির ওপর আমার একটু টান থাকবেই। কিন্তু জিলিপির প্যাঁচের মধ্যে আমি ছেলেদের ঢোকাবো না। তাছাড়া জিলিপি গরম না-থাকলে খাওয়া যায়, না। চমচম গরম খেতেও ভাল, বাসী খেতেও গ্রেট! চমচমের পুরনো সংখ্যাগুলে যে-কেউ পড়ে দেখুক মনে হবে আধঘণ্টা আগে প্রকাশিত হয়েছে।

হরিময়বাবু যে খাওয়া-দাওয়া ভালবাসেন তা তাঁর কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছে। পিকলুকে তিনি বললেন, "তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে খু-উ-ব ভাল হলো। আমার দু-একটা পরিকল্পনা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করে নিই।"

চায়ের কাপ হাতে ঠাকুমা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে পড়েছেন। তিনি হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "ওইটুকু ছেলের সঙ্গে আপনার আবার কী গোপন পরামর্শ।"

হরিময়বাবু চোখ গোলগোল করে উত্তর দিলেন, "আমাদের চমচম

পত্রিকার নীতিই হলো ছোটদের পরামর্শ অনুযায়ী চলা। দেখেন না, প্রতি সংখ্যায় প্রথম পাতায় মোটা অক্ষরে লেখা থাকে—বড় যদি হতে চাও ছোট হও তবে।"

ঠাকুমা আবার মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, "আপনার আর বয়স বাড়ালো না—ছোটদের কাগজ সম্পাদনা করতে গিয়ে আপনি নিজেও ছোট হয়ে রইলেন।"

হরিময়বাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে পিকলুকে সাবধান করে দিলেন, "যা-কিছু তোমার সঙ্গে আলাপ হবে সমস্ত কিন্তু টপ সিক্রেট।"

পিকলুর উত্তরের অপেক্ষায় না-থেকে হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন,—'টপ-সিক্রেট কথাটার মানে জানো তো? যাকে বলে কিনা, ভী-ষ-ণ গোপনীয়; কাউকে বলা চলবে না। মিলিটারিতে. পুলিসে, গভরমেন্টে কালো-কালো বক্সে এইসব টপ-সিক্রেট কাগজপত্তর থাকে—এমন সব খবর যা কেবল চোখের জন্যে, মুখের জন্যে নয়। সেইসব খবর দেখলে চোখ চমচম হয়ে যাবার অবস্থা।"

পিকলু সামনের বছর এন-সি-সিতে ঢুকবে। মিলিটারিতে ওর ভয় নেই। সে বললো, "বলুন আপনি, কেউ জানতে পারবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমার সহ-সম্পাদক বিজয় পর্যন্ত ব্যাপারটা জানে না। ওকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না—মাঝে-মাঝে সন্দেহ হয়, আমাদের সমস্ত গোপন খবর মাসি শিশুবন্ধু পত্রিকায় পাচার হয়ে যাচ্ছে।"

এরপর পিকলু এবং হরিময়বাবুর গোপন আলোচনা আরম্ভ হলো। পাঠকদের মন জয় করবার জন্যে চমচম সম্পাদকের মাথায় নতুন এক পরিকল্পনা এসেছে। খাবার জিনিসই মানুষকে সবচেয়ে টানে—এ বিষয়ে হরিময়বাবুর মনে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বের করবেন কাটলেট্ সংখ্যা।

"তোমার কী মনে হয়? ঘোষণা করা মাত্রই হৈ-চৈ পড়ে যাবে না?"

পিকলু ঠিক বুঝতে পারছে না। "চমচম পত্রিকার কাটলেট সংখ্যা।" সে একটু সন্দেহ প্রকাশ করলো।

কিন্তু হরিময়বাবু গম্ভীরভাবে জানতে চাইলেন, "আপত্তিটা কী? মিষ্টির সঙ্গে কেউ নোনতা খায় না?"

ঠাকুমা এই সময় আবার ঘরে ঢুকলেন। হরিময়বাবু আবার টাকে হাত দিলেন। ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, "নাতিটিকে কেমন দেখলেন?"

'টপ ক্লাস বলতে যা বোঝায়," সঙ্গে-সঙ্গে মতামত দিলেন হরিময়বাবু।

"ঠিক যেন একখানা গরম কবিরাজী চিকেন কাটলেনট। মচমচে অথচ মিষ্টি।"

ঠাকুমাও আদরের নাতির প্রশংসা করলেন। "খাসা ছেলেই বটে। বম্বেতে আবার কুইজ মাস্টার হয়েছে। সাধারণ জ্ঞানে কেউ ওর সঙ্গে পেরে ওঠে না।"

এই খবর পেয়ে হরিময়বাবু আরও উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। "অ্যাঁ! বলবেন তো। এতো বড়ো খবরটা আমার কাছে চেপে গিয়েছেন। আমার ভীষণ উপকার হলো। দুখানা কোশ্চেন আমার পকেটে রয়েছে, পাঠকরা পাঠিয়েছে। এ সংখ্যাতেই উত্তর দেবো ভেবেছিলাম। কিন্তু নকুলবাবুকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

"নকুল কে?" ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন।

"চলমান বিশ্বকোষ—উনিই তো আমাদের প্রশ্নোত্তর বিভাগের শক্ত-শক্ত কোশ্চেনের উত্তরগুলো দেন। কিন্তু ওঁকে ক'দিন থেকে পাচ্ছি না—কোথায় যে উধাও হলেন।"

কোশ্চেন দুটো শোনবার জন্যে পিকলুর আগ্রহ হচ্ছে। হরিময়বাবু এবার পকেট থেকে কাগজখানা এবং সেই সঙ্গে পড়বার চশমা বের করে ফেললেন। চশমাটা নাকে লাগাতে-লাগাতে বললেন, "আজকালকার ছেলেমেয়েদের যা জেনারেল নলেজ। এমন সব কোশ্চেন পাঠায় যে সম্পাদকের মাথা ভোঁ-ভোঁ করে। উত্তর ভাবতে-ভাবতে ঘেমে উঠি—এ-মাথায় চুল গজাবে কী করে? ইঞ্জিন সব সময় গরম হয়ে আছে।"

এবার কোশ্চেনখানা ছাড়লেন হরিময়বাবু। "কোন দেশের রাজা দাড়ির ওপর ট্যাক্সো বসিয়েছিলেন? বাব্বা! কী প্রশ্ন! মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ইনকাম-ট্যাক্স, সেল-ট্যাক্সের বড় বড় অফিসারদের জিজ্ঞেস করলাম, গোঁফের ওপর ওঁরা কখনও ট্যাক্সো বসিয়েছেন কি না। কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলেন না।"

পিকলু বলে উঠলো, "সোজা প্রশ্ন। রাশিয়ার রাজা পিটার দ্য গ্রেট।"

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন হরিময়বাবু। এবার তিনি সেকেন্ড প্রশ্নখানা ছাড়লেন। "কোন দেশের রানী নকল দাড়ি পরতেন?"

এবারেও মেরে বেরিয়ে গেলো পিকলু। বললে, "আমাদের ক্লাসের সব ছেলে জানে, মিশরের রানীরা নকল দাড়ি পরতে ভালবাসতেন!"

হাতের গোড়ায় একটা হাতপাখা ছিল—সেটা তুলে নিয়ে নিজেকে ঘন ঘন হাওয়া করতে লাগলেন হরিময়বাবু। চিৎকার করে বললেন, "বউদি, আমার মাথা ঘুরে গিয়েছে। আপনার এই নাতি হরিনাথদাকেও হারিয়ে দেবে!"

নাতির প্রশংসা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে ঠাকুমা বললেন, "ওইটুকু ছেলে যে কত খবর রাখে! আমি নিজেও অবাক হয়ে যাই।"

ঠাকুমা এবর খবর দিলেন, "এই দেখুন না, এতোদিন পরে কলকাতায় এলো, এখনও পর্যন্ত কলকাতার কিছু দেখানোর ব্যবস্থা করতে পারলাম না। কিন্তু পিকলু আমাকে গড়-গড় করে শুনিয়ে দিলো মনুমেন্টের উচ্চতা কত। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বাড়িটা নাকি কয়েক ইঞ্চি করে মাটিতে বসে যাচ্ছে।"

"ভারি মজার খবর তো!" হরিময়বাবু খুশিতে ঝলমল। "মাটিতে বসতে-বসতে শেষ পর্যন্ত কোনদিন তাহলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল উধাও হয়ে যাবে! শ্বেত পাথরের টেকো চূড়োয় তখন ঘাস গজাবে!"

ঠাকুমার বোধহয় দাদুর সঙ্গে ঝগড়া করার কথাটা আবার মনে পড়ে গেলো।

সদর ঘরে দাদু এক মনে গড়গড়ায় টান দিচ্ছেন—আর মাঝে-মাঝে ধোঁয়া ওড়ানো বন্ধ রেখে চুপচাপ বসে থাকছেন।

দাদুর কানের কাছে মুখ নিয়ে ঠাকুমা চড়া গলায় বললেন, "বলি শুনছো?"

গল্পের খোঁজে দাদু বোধহয় অন্য কোনো রাজত্বে চলে গিয়েছিলেন। আস্তে-আস্তে উত্তর দিলেন, "কিছু বলছো?"

ঠাকুমা : "বলি কী করছো?"

করুণভাবে দাদু উত্তর দিলেন, "ভাবছি। কিন্তু ভেবে-ভেবে কোনো কূলকিনারা পাচ্ছি না।"

এ-ঘরে বসে হরিময়বাবু ফিসফিস করে পিকলুকে বললেন, "তোমার দাদু গল্পের প্লট ভাবছেন—চমচমের কাটলেট সংখ্যার জন্যে স্পেশাল উপন্যাস।"

হরিময়বাবু এবার ঠাকুমাকে প্রায় পাকড়াও করে পিকলুর ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। হাতজোড় করে আবেদন করলেন, "বউদি, এই সময় দাদাকে একদম ডিসটার্ব করবেন না। ভবনাথ সেনের মুড নষ্ট হলে দেশের ক্ষতি হবে।"

ঠাকুমা রেগেমেগে উত্তর দিলেন, "একশোবার ডিসটার্ব করবো। পাঁচটা নয়, দশটা নয়—একটা নাতি, এতোদিন পরে আমাদের কাছে এলো; মনমরা হয়ে সে বাড়িতে বসে আছে। ও'কে নিয়ে একবারও বেড়ানো হলো না—কীরকম দাদু!"

হরিময়বাবু কিন্তু ভবনাথের অবস্থা আন্দাজ করতে পারছেন। ওঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ভবনাথ বললেন, "হরিময়, তুমি এসেছো। তোমাকে দেখলেই ভয় করে—মনে হয় তোমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে কোথাও পালিয়ে যাই!"

"ভয়ের কী আছে? আমি তো তাগাদা দিতে আসিনি।" ভবনাথকে সান্ত্বনা দেন হরিময়বাবু।

ভবনাথ নিজের মনেই বললেন, "কী যে হলো—গল্পটা শুধু আটকে যাচ্ছে।"

"আটকাতে-আটকাতেই হঠাৎ খুলে যাবে। গতবারেও তো গোড়ার দিকে গপ্পোটা আটকাচ্ছিল। তারপর যখন সম্পূর্ণ আকারে উপন্যাসখানা বেরুলো তখন পাঠকমহলে হৈ-চৈ পড়ে গেলো।"

ভবনাথ বললেন, "সব ভাল যার শেষ ভাল। আমি তো গল্পের শেষ না-ভেবে প্রথম লাইন লিখি না। খোদ শরৎ চাটুজ্যে মশাই আমাকে গোপনে পরামর্শটা দিয়েছিলেন—লাস্ট লাইনটা মনে না আসা পর্যন্ত কখনও ফার্স্ট লাইন লিখবে না।"

হরিময়বাবু অনুরোধ করলেন, "আপনি সাধনা চালিয়ে যান। কোনোরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন না।"

এরপর হরিময়বাবু পিকলুর ঘরে ফিরে এসেছেন। তেমন দরকার হলে তিনি নিজেই পিকলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরোবেন। অবশ্য পিকলুর যদি আপত্তি না থাকে।

পিকলুর ঠাকুমার কাছে প্রস্তাবটা দেবার কথা হরিময়বাবু ভাবছেন, ঠিক সেই সময় তিরিক্ষি মেজাজে দরজার ইলেকট্রিক বেল বেজে উঠলো।

উঃ! কান ফুটো হয়ে যাবে! লোকটা হয় পালোয়ান না-হয় জীবনে কখনও বেল বাজায়নি। বাড়িতে একটা লেখক গভীর চিন্তা করছেন, সেই সময় কি এইভাবে কেউ বেল বাজায়? ভবনাথের উচিত এই সময়টা অন্তত সাহিত্যিক নগেন পালের মতো বাইরে লিখে দেওয়া "দয়া করে জ্বালাতন করবেন না। প্লিজ্ ডোন্ট ডিসর্টাব।"

নিজেই দরজা খুলতে গিয়ে হরিময়বাবু একটু ঘাবড়ে গেলেন। সাড়ে ছ' ফুট লম্বা একখানা চলমান পাহাড় হুড়মুড় করে ভিতরে ঢুকে পড়লো। লোকটার মাথার চুলগুলো ছোট-ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু প্রমাণ সাইজের একখানা ইমপিরিয়াল গোঁফ। এই গোঁফটাই যে ইমপিরিয়াল তা অন্য সময় হলে হরিময়বাবু বলতে পারতেন না। কিন্তু পিকলুর দাদু গতবারের উপন্যাসখানায় নানারকম গোঁফের বিস্তারিত খবরাখবর দিয়েছেন। দু-দুবার প্রুফ সংশোধন করে হরিময়বাবুর ওসব মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এই ইমপিরিয়াল গোঁফ ও দাড়ি প্রথম রেখেছিলেন ফরাসি সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন।

ইমপিরিয়াল গোঁফের মালিককে পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক নিমেষে দেখে নিলেন হরিময়বাবু। পাঞ্জাবি এবং ধুতির সঙ্গে লোকটা কালো রংয়ের ভারী বুট জুতো পরেছে।

ঘরে ঢুকেই সে দাদুকে সেলাম ঠুকলো এবং জানালো, তার নাম হুকুম

সিং—লালবাজার থেকে এসেছে।

লালবাজার শুনেই হরিময়বাবু কিছুক্ষণের জন্যে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ঠাকুমা বললেন, "কিছু চিন্তা করবার নেই—হুকুম সিং অতি অমায়িক লোক ; পিকলুর পুলিশ-দাদুর কাছেই ওর ডিউটি।"

হরিময়বাবুর অবস্থা দেখে হুকুম সিংও একটু মজা পেলো। বললো, "হামি তো পিলেন-ডিরিসে আছি, এখোন কোনো চিন্তা নেই।"

অ্যালসেশিয়ান কুকুর এবং পুলিশ যে-ড্রেসেই থাকুক হরিময়বাবু বেশ অস্বস্তি বোধ করেন। অত বড় সাহিত্যিক নগেন পাল, তাঁর কাছে লেখা নেওয়াই বন্ধ করে দিলেন হরিময়বাবু, স্রেফ ওই কুকুরের ভয়ে। বাড়িতে বাছুর সাইজের কুকুর থাকলে কে সেখানে লেখা আনতে যাবে? এক-একটা কুকুর যা অসভ্য হয়। মালিক ছাড়া কাউকেই মানুষ মনে করে না।

হুকুম সিংয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ঠাকুমা একগাল হেসে ফেললেন। পিকলুর পুলিশ-দাদু ওকে পাঠিয়েছেন, পিকলুকে বেড়িয়ে আনবার জন্যে।

"খোদ পুলিশেব সঙ্গে হাওয়া খাওয়া!" হরিময়বাবু প্রস্তাবটায় বেশ উৎসাহিত বোধ করছেন।

ভবনাথ অনুরোধ করলেন, "হরিময়, তুমিও ওদের সঙ্গে একটু ঘুরে এসো না। যেখানে খুশি যতক্ষণ বেড়াতে পারবে। পুলিশ সঙ্গে থাকলে আমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না!"

হরিময়বাবু ঠিক মনস্থির করতে পারছেন না। ভবনাথবাবু বললেন, "আমার নাতিটি খুব ইনটেলিজেন্ট। রাস্তায় বেরুলেই নানা প্রশ্ন করে। তুমি থাকলে উত্তর দিতে পারবে।"

ভ্রমণের ব্যাপারে হরিময়বাবু কখনও পিছপা হন না—সে দূরদেশ ভ্রমণেই হোক আর কলকাতা ভ্রমণই হোক। এবার আবার স্পেশাল সুবিধে--সঙ্গে পুলিশ রয়েছে।

হুকুম সিংয়ের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে বেজায় খুশি হরিময়বাবু। তাঁর আনন্দ যেন পিকলুর থেকেও বেশি।

পকেট থেকে চিকলেট বের করে হরিময়বাবু একটা পিকলুকে দিলেন, আর একটা নিজের মুখে পুরলেন। তারপর ফিসফিস করে পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "হুকুম সিংকে একখানা চিকলেট দেবো নাকি? পুলিশ চিকলেট খায় তো?"

হুকুম সিংকে জিজ্ঞেস করতেই সে গোঁফ নাড়িয়ে হুঙ্কার ছাড়লো। "রাম! রাম! আমি কোভি চিকেন খাই না।"

হরিময়বাবু এবং পিকলু দুজনেই হাসিতে গড়িয়ে পড়লো। হরিময়বাবু নিজস্ব স্টাইলে ব্যাখ্যা করলেন, "ওরে বাবা, চিকেন নয়—চিকলেট। বহুত আচ্ছা চুইং গাম—মুখকে অন্দর রাখকে পানকো মাফিক চিবোনেসে বহুত মজা আতা।"

কিন্তু হুকুম সিং কোনো অজানা অখাদ্য মুখে পুরে জাত নষ্ট করবে না।

হরিময়বাবু বললেন, "এ-জানলে আমি খদ্দরের টুপিখানা সঙ্গে আনতাম।"

পিকলু ভাবলো, হরিময়বাবু টাক ঢাকবার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু হরিময়বাবু বললেন, "মোটেই না। টাক থাকলে লোকে খাতির করে। মুদির দোকানে ধার দেয়—ভাবে নিশ্চয় অনেক টাকা আছে।"

"তাহলে?" পিকলু জিজ্ঞেস করে।

আসলে ভি-আই-পি ভি-আই-পি মনে হচ্ছে হরিময়বাবুর।

"ভি-আই-পি বোঝো তো?"

"খুব বড়-বড় লোক," পিকলু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

হুকুম সিং যাতে শুনতে না পায় এমনভাবে চাপা গলায় হরিময়বাবু বললেন, "দু'রকম লোকের সঙ্গে পুলিশ থাকে। হয় চোর ডাকাত, না-হয় ভি-আই-পি!"

পিকলু এবার হুকুম সিংকে জিজ্ঞেস করলো, "পণ্ডিতজী, কলকাতার সব রাস্তাঘাট চেনেন আপনি?"

ইমপিরিয়াল গোঁফ নাচিয়ে হুকুম সিং উত্তর দিলো, "জরুর! কী চিনি না আমি! কলকাতার সব চোর-জোচ্চোর পকেটমারকে আমি চিনি ; তারাও আমাকে চেনে।"

মস্ত বড় ভরসার কথা এটা হরিময়বাবুর পক্ষে। গতকালই নেবুতলার মোড়ে ওঁর মানিব্যাগ পকেটমার হয়েছে। আঃ! হুকুম সিং সঙ্গে থাকলে কী উপকারই হতো—মানিব্যাগ পকেটেই থাকতো, মাঝখান থেকে পকেটমার ধরা পড়তো।

হরিময়বাবুর পকেট মারা খবরে পিকলুর দুঃখ হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু কে যেন ওকে কাতুকুতু লাগিয়ে হাসিয়ে দিলো। পিকলু ভেবেছিল, হরিময়বাবু এই হাসি দেখে খুব দুঃখ পাবেন। কিন্তু তিনি হাসতে লাগলেন। বললেন, "পকেটমারের জন্যে আমার দুঃখও হয়। মানিব্যাগ গিয়েছে, কিন্তু মানি যায়নি! টাকাকড়ি আমি রাখি চমচম পত্রিকার একখানা পুরনো খামের মধ্যে।

মানিব্যাগটা' ফলস্। বাসেট্রামে যাচ্ছি অথচ সঙ্গে মানিব্যাগ না থাকলে লোকের কাছে প্রেস্টিজ থাকে না। প্রেস্টিজ বোঝো তো?" হরিময়বাবু কোশ্চেন করলেন।

"প্রেসার কুকার—খুব তাড়াতাড়ি রান্না হয়ে যায়," ঝটপট উত্তর দিলো পিকলু। সেই শুনে হরিময়বাবু আবার ইন্দ্রলুপ্তে হাত দিলেন।

"মিস্টার পিকলু, প্রেস্টিজ দু'প্রকারের। মেয়েদের যে প্রেস্টিজ তার নাম প্রেসার কুকার, আর ছেলেদের প্রেস্টিজের নাম ইজ্জত।"

পিকলু ও হরিময়বাবু দুজন একসঙ্গে খুব হেসে নিলো। আর হুকুম সিং ভাবলো নিশ্চয় কোনো সিরিয়াস গোলমাল হয়েছে তাই ডি-সি সাহেবের বোম্বাই-নাতি কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে হাসছে।

একজন ঝাঁকামুটে ফুটপাতের এক কোণে পা-ছড়িয়ে আরাম করছিল। হুকুম সিং তাকে গিয়ে ক্যাঁক করে ধরলো। সে-বেচারা তো অবাক। নিজের খুশিমতো সে একটু ঘুমোচ্ছে, দোষটা কী হলো? হুকুম সিং ভারী গলায় তাকে যা বললো তার অর্থ : "রাস্তাটা হাঁটবার জায়গা, ঘুমোবার নয়। বেশি তর্ক করলেই থানা, সেখান থেকে আদালত এবং আদালত থেকে জেল।"

হরিময়বাবু চমকে উঠলেন। "কখনও খেয়াল হয়নি আমার। ফুটপাত কেবল ফুটের জন্য। শোবার সুযোগ থাকলে তো নাম হতো ফুট অ্যান্ড হেড পাথ!"

পিকলু এবার পুলিশকে জিজ্ঞেস কবলো, "কলকাতার সব কিছু চেনেন?"

হুকুম সঙ্গে সঙ্গে বললে "জ-রু-ব!" তারপর গড়গড় করে মুখস্থ বলতে লাগলো . আলিপুর, আমহার্স্ট স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, বেলিয়াঘাটা, বেনিয়াপুকুর, ভবানীপুর, বিরজুতলা থেকে শুরু করে ট্যাংরা, টালিগঞ্জ, তিলজলা, উল্টোডাঙ্গা এবং ওয়াটগঞ্জ পর্যন্ত।

নামগুলো পিকলুর বেশ ভাল লাগছে। হুকুমচাচা তাহলে সত্যিই অনেক কিছু জানেন! এর মধ্যে কোথায় গেলে মজা বেশি হয়? পিকলু জানতে চাইছে হরিময়বাবুর কাছ থেকে।

আর-একখানা চিকলেট মুখে পুরে দিয়ে হরিময়বাবু পিকলুর কথায় আঁতকে উঠলেন। "ওসব জায়গায় তো কেউ ইচ্ছে করে যায় না! ধরে নিয়ে গেলে যায়। হুকুম সিং তো কলকাতার সাতচল্লিশটা থানা আর ফাঁড়ির নাম মুখস্থ বলে গেলো!"

হুকুম সিং একগাল হেসে বললে, "যে-থানায় ইচ্ছে চলিয়ে।" সর্বত্র চা-পানি পিলাবার প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছে হুকুম সিং।

কিন্তু হরিময়বাবু বেশ ঘাবড়ে গেলেন। পিকলুকে বললেন, "ওসব জায়গায় আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। কে বেল দেবে?"

পিকলুও থানায় যাবার পক্ষপাতী নয়। কিন্তু এই বেলের কথায় একটু আগ্রহ হলো ওর। ওখানে গেলে বোধ হয় শিবমন্দিরের মতো বেল পুজো দিতে হয়। "এমনি বেল? না কদবেল?" জিজ্ঞেস করে পিকলু।

আরও নার্ভাস হয়ে পড়লেন হরিময়বাবু। "অর্ডিনারি বেল ফল না। স্পেশাল বেল।"

পিকলু বললো, "ও, বুঝেছি। বেল মানে ঘণ্টা। আমরা বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধা সম্পর্কে পড়েছি ; হু উইল বেল দ্য ক্যাট্? বেড়াল কি থানায় গিয়েছিল?"

হরিময়বাবু বললেন, "আরও খারাপ কেস! একবার ঢুকলে বেরিয়ে আসা মুশকিল!"

পিকলু ভাবলো, থানায় গেলে পুলিশ খুব খাতির করে, ছাড়তে চায় না। যেমন বন্ধুরা বাড়িতে এলে বাবা বলেন, আরে বোসো, বোসো। এখন যাওয়া হবে না।

হরিময়বাবু শুনিয়ে দিলেন, "যতক্ষণ না কোনো লোক এসে বেল দিচ্ছে ততক্ষণ থানা থেকে ছাড় নেই। অথচ আমার মুশকিল হলো, যাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা তাদের কারুর নিজস্ব বাটী নেই। থালা গেলাস কিছুই চলবে না—নিজস্ব বাটী চাই।"

"বাটীর সঙ্গে বেলের কী সম্পর্ক?" পিকলু এবার একটু বিরক্ত হয়। তার সন্দেহ হচ্ছে হরিময়বাবু তাকে ছোট পেয়ে ঠকাচ্ছেন।

কিন্তু হরিময়বাবু বললেন, "বিশ্বাস করো, যাঁর বাটী নেই, তিনি বেল দিতে পারেন না। বিষয়-সম্পতি বাড়িওয়ালা লোক ছাড়া কাউকে ওখানে বিশ্বাস করা হয় না! বেল মানে জামিন এবং সেই জামিন নিয়ে আসতে হয় আদালত থেকে।"

থানায় বেড়াবার প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে সর্বসম্মতিক্রমে বাতিল হয়ে গেলো। বললো, যা বোম্বাইতে নেই এমন কোনো জিনিস সে এখানে দেখতে চায়।

পিকলুর কথায় হুকুম সিং এবং হরিময়বাবু দুজনেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। যা কলকাতায় পাওয়া যায় না সেই সব দেখতেই তো ছেলেরা লুকিয়ে বম্বে পালায়। যা-কিছু বড়, ভাল এবং মিষ্টি তার নামই তো বোম্বাই—যেমন বোম্বাই-আম, বোম্বাই-চাদর, বোম্বাই-মিঠাই। কলকাতা-জাম, কলকাতা-কাঁঠাল বলে তো বাজারে কিছুই নেই।

হুকুম সিংয়ের মাথায় কিছু মতলব আসছে না—সে গোঁফ বেঁকিয়ে হরিময়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

হরিময়বাবু গভীরভাবে চিন্তা করছেন। কিন্তু যা-কিছু স্পেশাল সবই তো বোম্বাই। একখানা পাহাড় বা সমুদ্রও নেই কলকাতা শহরে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্যে হরিময়বাবু চোখ বুঝলেন। পিকলুর ভয় হলো, এই ভিড়ের রাস্তায় হরিময়বাবু না গাড়ি চাপা পড়ে যান।

হরিময়বাবুর কিন্তু বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা নেই। বললেন, "কায়দাটা তোমার দাদুর কাছে শিখেছি। যখনই আইডিয়া শর্ট পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে ব্রেনটাকে ডার্করুম করে নিই। তারপর ফটাফট মতলব ভেসে ওঠে।"

হরিময়বাবু হঠাৎ চোখ খুললেন। বললেন, "হয়েছে! তাই বলি, এতো বড় কলকতা শহর—বম্বেতে নেই এমন কোনো এস্পেশাল জিনিস না থেকে যায়!"

খুশি হয়ে হুকুম সিং বললো, "বাতাইয়ে—এখোনই ছোটাসাবকে দেখায়ে দিচ্ছি।"

হরিময়বাবু সগর্বে ঘোষণা করলেন, "ট্রাম! বম্বেতে এ-জিনিস নেই।"

একটা চলন্ত ট্রামে হাত দেখিয়ে ওরা উঠে পড়লো। উত্তেজনার মাথায় তিনজনেই পিছনের কামরাতে চড়েছে। পিকলুর খুব মজা লাগছে। কী রকম ঢক ঢক করতে করতে গাড়িখানি একটু একটু এগোচ্ছে, আবার থামছে।

ট্রামগাড়িতে হরিময়বাবু বেশি চড়েন না। ওঁর ধারণা পাকেটমারেরা ট্রামকেই একটু বেশি নেকনজরে দেখে। হরিময়বাবুর পছন্দ রিকশ।

এই পছন্দর কথা শুনে পিকলু হেসে ফেললো। হরিময়বাবু বললেন, "হাসছো কি? বেস্ট গাড়ি হলো এই রিকশ। তোমার দাদু পর্যন্ত একটা বইতে লিখেছেন—এমন দিন আসছে যখন পৃথিবীতে রিকশ ছাড়া আর কোনো গাড়িই থাকবে না।"

পাছে ট্রামের অন্য লোকেরা শুনতে পায় সেজন্য পিকলুর কানের খুব কাছে মুখ এনে হরিময়বাবু বললেন, "রিকশতে পেট্রোল লাগে না, ইলেকট্রিক লাগে না, গোরু লাগে না। রিকশ বিষাক্ত ধোঁয়া ছাড়ে না, মুখোমুখি কলিশনের ভয় নেই—বৃষ্টির জলে গাড়ি আটকায় না—ট্রাফিক জ্যাম পর্যন্ত রিকশকে জব্দ করতে পারে না।"

ট্রামে প্রচণ্ড ঠাসাঠাসি। অজস্র লোক উঠেছে। ভিড়ের চোটে দরজা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। কন্ডাক্টরকে আসতে দেখে হরিময়বাবু টিকিট কাটবার জন্যে পকেটে হাত দিতে যাচ্ছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হুকুম সিংয়ের সঙ্গে কন্ডাক্টরের দৃষ্টি

বিনিময় হলো। ইঙ্গিতে হুকুম সিং প্রথমে পাঞ্জাবির বুকপকেটটা এবং পরে হরিময়বাবু ও পিকলুকে দেখিয়ে দিলো। কন্ডাক্টর এরপর কাছেই এলো না।

হরিময়বাবু বললেন, "আঃ এরপর থেকে সম্ভব হলে রোজ আমি হুকুম সিংয়ের সঙ্গে বের হবো। কোথাও ওদের টিকিট লাগে না।"

একজন গ্রাম্য বুড়ি লেডিজ সিটে বসে ছিলেন। এবার বোধহয় তিনি গাড়ি থেকে নামবেন। কিন্তু সিট ছেড়ে একটু ঠেল্লাঠেলি করে বুড়ি হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলেন এবং চিৎকার করতে লাগলেন। "ও দোকানী। দোকানী কেথায় গেলো?"

কাতর আর্তনাদ শুনে অনেকে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। হরিময়বাবু এগিয়ে গিয়ে বললেন, "কোথাকার দোকানী খুঁজছেন? এখানে তো কোনো দোকানী নেই।"

সেই শুনে বুড়ি তো হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলেন। "ওমা। কী কথা বলে গো। দোকানী নাকি নেই। আমার সব্বোনাশ হলো গো!"

পিকলু এবার বুড়িকে সাহস দেবার জন্যে বললো, "কী হয়েছে আপনার? ভয় কী!"

পিকলুর হাত ধরে বুড়ি বললেন, "এই লোকটা কী বলে! এতো বড় দোকানে নাকি দোকানী নেই গো!"

পিকলু এবার গলা বাড়িয়ে কন্ডাক্টরকে ডাকল। ভিড় ঠেলে খাকি ইউনিফর্ম পরা কন্ডাক্টর এসে বুড়িকে জিজ্ঞেস করলো, "কী হয়েছে?"

বুড়ি যেন হাতে চাঁদ পেলেন। "ও দোকানী, তুমি ঝাঁপ ফেলে দিয়েছো কেন? আমি যে বেরুবার দরজা খুঁজে পাচ্ছি না। আবার ওই নোকটা বলে দোকানীও নেই!"

ভিড়ের মধ্যে দরজা খুঁজে না-পেয়েই যে গাঁয়ের বুড়ি নার্ভাস হয়ে পড়েছেন তা বোঝা গেলো। গাড়ির মধ্যে অনেকেই হেসে ফেললো। কে যেন বলে উঠলো "দোকানী নয়—কন্ডাক্টর।"

গাড়ি থেকে নামতে-নামতে বুড়ি ফোঁস করে উঠলেন। "আ মলো যা। অ্যাদ্দিন কালীঘাটে আসছি, আমাকে দোকানী শেখাচ্ছে!"

ট্রামযাত্রাটা বেশ রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে পিকলুর। দেড় হাজার লোক যেন একসঙ্গে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার চেষ্টা করছে—কিন্তু সে একলা লড়ে যাচ্ছে।

বুড়ির ভয়ে ভিড়ের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে হরিময়বাবু অনেকখানি দূরে সরে গিয়েছিলেন। এবার তিনি কায়দা করে পিকলুর কাছে চলে এলেন।

বললেন, "বম্বেতে নেই, কলকাতায় আছে—এমন আর একটা আইটেম মনে পড়েছে। কালীঘাট—মা কালীর মন্দির। কালীঘাট থেকেই তো কলকাতা।

কালীঘাটে নামবার আগেই আশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটলো। কন্ডাক্টর কয়েকবার টিকিট চাইতেই কদমছাঁট ও মর্কটমার্কা একটা লোক চোঙাটে প্যান্টের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলো। পকেট থেকে পয়সা বের করবার কোনো ইচ্ছেই যেন ছিল না লোকটার।

মানিব্যাগটার দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন হরিময়বাবু। ওঁর চোখ দুটো চমচমের মতো হয়ে উঠলো। তারপর বললেন, "ইউরেকা।"

"হুকুম সিং হুঁশিয়ার!" এই বলে হরিময়বাবু মুহূর্তের মধ্যে মানিব্যাগ ও লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হৈ-হৈ কাণ্ড। লোকটার শার্টের কলার ধরে হুকুম সিং হিড়হিড় করে ট্রামের বাইরে নিয়ে এলো। পাবলিক বাধা দিলো না। কলকাতায় সাদা-পোশাকের পুলিশের মার্কামারা চেহারা। সবাই হুকুম সিংকে চিনে ফেলেছে।

"আমার মানিব্যাগ—লস্ট আটলান্টা, লস্ট আটলান্টা," হরিময়বাবু আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন।

মানিব্যাগখানা লোকটার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হরিময়বাবু বললেন, "এই তো আমার ব্যাগ। বোতাম-দেওয়া পকেটে মায়ের জবাফুল রয়েছে দেখুন। দেখি-দেখি"—একটা গর্ত থেকে চমচম কাগজের ভিজিটিং কার্ডও বেরিয়ে এলো।

লোকটা বিপদ বুঝে বললো, "বিশ্বাস করুন সায়েব, ব্যাগে কিছুই ছিল না। সবশুদ্ধ সাতাশি পয়সা পেয়েছিলাম।"

কালীঘাটের কালী দেখা মাথায় উঠলো। বমাল চোর নিয়ে হুকুম সিং এখন থানায় যেতে চায়।

পিকলু অবাক। কী কলে হরিময়বাবু নিজের হারানিধি ব্যাগ চিনতে পারলেন?

সগর্বে হরিময়বাবু নিবেদন করলেন : "খুব সহজ। আমার ব্যাগ যে চমচমের জন্যে স্পেশালি তৈরি। এই দ্যাখো—ব্যাগের দুধারে বড়-বড় করে লেখা রয়েছে চমচম! এই ব্যাগ যখন স্পেশালি তৈরি করেছিলাম তখন উদ্দেশ্য ছিল প্রচারের। দিনের মধ্যে কতবার কত জায়গায় মানিব্যাগ বার করে লেনদেন হচ্ছে। পরের মানিব্যাগের দিকে সবারই নজর থাকে। সুতরাং চমচম নামটা দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়বে।

চোরকে ছেড়ে দেবার জন্য হরিময়বাবু হুকুম সিংকে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। মনে-মনে হিসেব করে হরিময়বাবু বললেন, "সাতাশি পয়সার জন্যে জেলে যাওয়া পোষায় না।"

লোকটাও বেশ চালাক। সুযোগ বুঝে হরিময়বাবুকে সে বললো, "আমাকে হাজতে দিলে ওই ব্যাগ ফেরত পেতে ছ'মাস লেগে যাবে হুজুর। কোর্ট-কাছারিতে যাবে ওই ব্যাগ।"

এবার বহু কষ্টে হুকুম সিংয়ের হাত থেকে লোকটাকে ছাড়ানো হলো। উত্তেজনায় হরিময়বাবুর টাকে ঘাম জমে গিয়েছে। বললেন, "পকেটমার ধরতে যা কষ্ট হয়েছিল তার থেকে ছাড়াতে বেশি মেহনত হলো।"

কালীঘাট দেখে পিকলুর মন ভরলো না। সে কলকাতার আরও অনেক কিছু দেখতে চায়।

খোকাবাবুকে এবার বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলো হুকুম সিং। কিন্তু খোকাবাবুর ইচ্ছে আজ সমস্ত দিন হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়াবে।

এবার হরিময়বাবু ও হুকুম সিং দুজনেই ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। হুকুম সিংয়ের বোধহয় আপিসে ডিউটি আছে। সায়েবের নাতিকে দেখবার জন্যে সে একবার ঝট করে চলে এসেছিল।

একটা দোকানে গিয়ে সে আপিসে ফোন করে দিলো। তেমন দেরি হলে সে আজ আপিসেই যাবে না।

একখানা মিনিবাস প্রায় পিকলুর নাকের ডগা স্পর্শ করে চলে গেলো। তার গায়ে লেখা ; বিবাদী বাগ—টালিগঞ্জ। পিকলু যা দেখবে তার সম্বন্ধেই প্রশ্ন তুলবে। হুকুম সিংকে সে জিজ্ঞেস করে বসলো, "বিবাদী বাগ কেন নাম?"

পাজি চোর ডাকাত ধরতে হুকুম সিংয়ের জুড়ি নেই। কিন্তু সাধারণ জ্ঞানের কোশ্চেন করলেই সে বেশ মুশকিলে পড়ে যায়। মাথা চুলকে সে বললো, " কোর্টে দো কিসিমের আদমি যায়—এক পার্টির নাম বাদী, যে মামলা করে ; অন্য পার্টির নাম বিবাদী। সুতরাং বিবাদী বাগ নাম তার থেকেই হয়েছে।"

হরিময়বাবু একটা টেলিফোন করতে যাবেন ভাবছিলেন। হুকুম সিং সঙ্গে থাকলে টেলিফোনের মালিক ন্যায্য দামের বেশি নেবে না। হুকুম সিংয়ের ব্যাখ্যা শুনে তিনি বললেন, "হলেও হতে পারে। রহস্যময় কোনো শব্দ পেলেই আমি তার মূলে চলে যাই। বিবাদীর মধ্যে বিবাদ শব্দ রয়েছে—তার অর্থ ঝগড়া। মামলাও এক ধরনের ঝগড়া। সুতরাং যে বিবাদ করে সেই বিবাদী। যে-স্থানে বিবাদীকে বাগে পাওয়া যায়—যেমন কোর্ট, কাছারি, সরকারি

আপিস—তাই বিবাদী বাগ।"

স্ট্যান্ডের কাছে বাস ধর্বার জন্যে কোটপ্যান্ট পরে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি আর সহ্য করতে পারলেন না। মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বললেন, "ছোট ছেলেকে কী সব বুঝোচ্ছেন? বিবাদী বাগ মানে বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগান। মস্ত তিন বিপ্লবী ছিলেন—ইংরেজ আমলে রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করেছিলেন। বাগ মানে বাগান।"

একগাল হেসে ফেললো হুকুম সিং। "হ্যাঁ, হ্যাঁ—মনে পড়ছে বটে। বিবাদী বাগ মানে ডালহৌসি স্কোয়ার।"

ব্যাপারটা নোট বইতে টুকে নিলো পিকলু। পকেটে সে ছোট্ট একটা নোট বই রাখে—কখন কী লেখবার দরকার হয় ঠিক নেই।

এবার টালিগঞ্জের মানে জিজ্ঞেস করে বসলো পিকলু। ওকে অন্যমনস্ক করে দেবার জন্যে হরিময়বাবু বললেন, "মানে জেনে কী হবে? তার থেকে চীনে বাদান খাও।" পিকলু চীনেবাদামও নিলো এবং সেই সঙ্গে মানেও জিজ্ঞেস করলো।

হরিময়বাবু বললেন, "এসব কোশ্চেন আগাম জানলে আমি এবং হুকুম সিং দুজনেই পড়াশোনা করে বেরোতাম। টকাটক সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতাম—লালদিঘি কেন লাল নয়, গোলদিঘি কেন চৌকো, বউবাজারে কেন বউ পাওয়া যায় না। তবে টালিগঞ্জের কোশ্চেনটা খু-উ-ব সোজা। কমনসেন্স থেকে উত্তর দেওয়া যায়।"

সাহস পেয়ে হুকুম সিং বলে ফেললো, "এটা আমিও জানি। ওখানে অনেক টালি তৈরি হতো।"

হা-হা করে উঠলেন হরিময়বাবু। "মোটেই নয়। মাটি পোড়ানো টালির সঙ্গে টালিগঞ্জের কোনো সম্পর্ক নেই। ওখানে কর্নেল টলি নামে এক দুর্দান্ত সায়েব ছিলেন। তোমার দাদুর গতবছরের আগের বছর লেখা উপন্যাসে এঁর কথা লেখা আছে।"

হুকুম সিং ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছে। খোকাবাবুর সঙ্গে সে একলা ঘুরতে খুব উৎসাহী নয়। তার ইচ্ছে হরিময়বাবুও সঙ্গে থেকে যান।

হরিময়বাবু বললেন, "ঝটপট তাহলে একবার চমচম অফিসটা ঘুরে আসা যাক। আমাকে এতোক্ষণ না-দেখে সহ-সম্পাদক বিজয় নিশ্চয় চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তাছাড়া আর্জেন্ট কোনো খবরাখবর থাকলেও জানা যাবে। তোমরাও ততক্ষণ বাড়ি ফিরে হোল-ডে প্রোগ্রামের জন্য রেডি হয়ে নাও।"

শেষে ঠিক হলো, বাড়িতে খবর দিয়েই পিকলু ও হুকুম সিং সোজা চমচম অফিসে চলে আসবে।

পিকলুর দাদু অনেকক্ষণ ধরে ইজিচেয়ারে পাথরের মতো বসে আছেন। এই চেয়ারটা মন্ত্রপূত সিংহাসনের মতো। এখানে না-বসলে তাঁর মাথায় গল্পের প্লট আসে না। গত কুড়ি বছরে তিনি যত নামকরা গপ্পো-উপন্যাস লিখেছেন তাব শুরু এবং শেষ এই ইজিচেয়ারেই।

গত সাতদিন ধরে এই চেয়ারে বসে তিনি একটা উপন্যাসের প্লট বুনবার চেষ্টা করছেন। কত বিচিত্র বর্ণিন চরিত্র পরীর মতো পাখা মেলে তাঁর মানসলোকে নেমে আসছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই সুবিধে করতে পারছেন না তিনি। শুধু তো নানা রঙেব মানুষ হলেই হলো না—একটা গল্পের দানা বেঁধে ওঠা প্রয়োজন। গল্পের একটা মনের মতো পরিণতি চাই।

গত কয়েক বছর ধরে ভবনাথ সেন, যা লিখেছেন সেগুলোর শেষে একটু দুঃখের ইঙ্গিত আছে।

এবারেও একটা দুঃখের গপ্পো ভাবছিলেন তিনি। সেই সময় পিকলু চলে এলো কলকাতায়। নাতনী শতরূপার শক্ত অসুখ। তাকে নিয়ে ওর বাবা-মা ভেলোরে চলে গিয়েছে, পিকলুকে এক বন্ধুব সঙ্গে বম্বে থেকে পাঠিয়ে দিযেছে ভবনাথের কাছে।

ভবনাথ নিজের ছেলেকে সেই ভাবেই লিখে দিয়েছিলেন : "আমরা যখন রয়েছি তখন পিকলু যতদিন খুশি আমাদের কাছে থাক। তাছাড়া এখন যখন ইস্কুলের ছুটি রয়েছে ওর পড়াশোনার কোনো চিন্তা নেই।"

পিকলু এসেই দাদুর সঙ্গে অনেক গপ্পো করছে। হাজার-হাজার লোক যে দাদুর গপ্পো পড়বার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকে, তা পিকলু কিছুটা শুনেছে। কিন্তু পিকলু তার ঠাকুমাকে বলেই দিয়েছে, "দাদুর গপ্পো তার ভাল লাগে না। দাদুর থেকে অনেক ভাল জানে অধরদা। অধরদা ওদের বাড়ির চাকর।"

নাতির মন্তব্য শুনে সেদিন বাড়িতে বেশ চাঞ্চল্য। লেখকের নাতি বলে দিয়েছে—পদ্মশ্রী ভবনাথ সেনের থেকে চাকর অধরের গপ্পো ভাল। সবাই মিটি-মিটি হেসেছে।

এক সময় ঠাকুমা জিজ্ঞেস করেছেন, "হ্যাঁরে, তুই এমন কথা বললি কেন?"

পিকলুর উত্তর খুব সোজা। দাদুর গপ্পে বড় দুঃখ থাকে। প্রথমে বেশ ঝলমলে

লোকজন থাকে, বেশ আনন্দ হয়—তারপর কয়েকপাতা এগোলেই কী যে হয়, সবাই গম্ভীর হয়ে পড়ে। তারপর শেষের দিকে কী কষ্ট, কী কষ্ট! চোখে জল এসে যায়।

অথচ পিকলুর একদম কাঁদতে ইচ্ছে করে না। ভীষণ কষ্ট হয়। অধরদা যখন গপ্পো বলেন, তখন ঠিক উল্টো। প্রথমে একটু-একটু দুঃখু থাকে। কিন্তু পিকলু সেজন্য চিন্তা করে না—সে জানে অধরদা যখন আছেন তখন একটু পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যিই তাই হয়। শেষ পর্যন্ত কী হাসাহাসি, কী মজা। বন্দিনী রাজকন্যার সঙ্গে অচিন দেশের রাজপুত্রর বিয়ে হয়ে যায়, হিংসুটে রানীর দুষ্টুমি ধরা পড়ে ; দুয়োরানীর দুঃখ শেষ হয়. লোভী রাক্ষস শাস্তি পায়, গুপ্তধনের সন্ধানে বেরিয়ে ছেলেরা নিরাশ হযে ফিরে আসে না, মুঠো-মুঠো মারবেল-সাইজের হীরায় তাদের হাফ-প্যান্টের পকেট ফুলে ওঠে।

পিকলুর কথাবার্তা ভবনাথকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে। হিসেব করে দেখলেন, অজান্তেই তিনি একের পর এক দুঃখের গপ্পো লিখে গিয়েছেন। কিন্তু পাঠকও আছে যারা নিমপাতা এবং উচ্ছে খেতে এবং দুঃখের গপ্পো পড়তে ভালবাসে। তারাই মোহিত হয়ে ভবনাথকে লম্বা লম্বা চিঠি লিখেছে. এবং ভবনাথকে বিপথে চালিত করেছে। কিন্তু এবারে ভবনাথ ভাবছেন, পিকলুর মুখে যে-করেই হোক হাসি ফোটাবেন তিনি।

কিন্তু ওই পর্যন্ত এসেই তিনি আটকে গিয়েছেন। গত এক সপ্তাহ ধরে কল্পনার সরস্বতীকে তিনি কত ভাবে আহ্বান করলেন—কিন্তু তারপর হঠাই কী যে হয়, দুঃখের ঘন কালো মেঘে তাঁর মনের আকাশ ছেয়ে যায়। ভবনাথ এখন বুঝতে পারেন, দুঃখের কথা লেখা সব চেয়ে সহজ। কিন্তু এবার তিনি আনন্দ ছাড়া আর কিছুই লিখবেন না। ভোরের আলোর মতো প্রসন্ন ঝলমলে আনন্দ চাই তাঁর।

তার ফলেই সাতদিন নিষ্ফলা কেটে গিয়েছে। ভবনাথ কিছুই করতে পারছেন না। চমচম পত্রিকার সম্পাদক হরিময়বাবু সেবার এসে জোর করে আগামী উপন্যাসের বিষয়টি জানাতে চাইলেন। ভবনাথ সেনের মতো লেখকের মাথায় যে গল্প শুকিয়ে গিয়েছে, এ-কথা হরিময়বাবু বিশ্বাস করেন না। হরিময়বাবুর ধারণা ভবনাথ একটা আপেল গাছ—তার ডালে-ডালে অসংখ্য গল্পের রঙিন আপেল ঝুলে রয়েছে, একটা ছিঁড়ে সম্পাদককে দিয়ে দিলেই হলো।

বাধ্য হয়ে হরিময়ের হাতে এক টুকরো কাগজে ভবনাথ একটা নাম লিখে দিয়েছেন। হরিময়বাবু নতুন উপন্যাসের নামটা আগাম প্রচার করতে চান।

কাগজের টুকরোর দিকে তাকিয়ে হরিময়বাবু তো আনন্দে ও বিস্ময়ে

হতবাক। বললেন, "দুর্দান্ত! ভাবা যায় না! বুঝতে পারছি এবার একটা কেলেংকেরিয়াস কিছু ঘটবে।"

"কী ঘটবে আমি নিজেই কিন্তু এখনও জানি না, হরিময়।" ভবনাথ সেন করুণভাবে বলেছিলেন।

কিন্তু চমচম-সম্পাদক তা বিশ্বাস করলেন না। বললেন, "খারাপ লোকের খপ্পরে' নামেতেই ছেলে এবং বুড়ো সবাইকে বেঁধে ফেলেছেন। প্রকাশের পূর্বেই চমচম নিঃশেষিত হবে বুঝতে পারছি।"

এসব কথা শুনতে কোন লেখকের না ভাল লাগে? কিন্তু ভবনাথ সেন মোটেই শান্তি পাচ্ছেন না—গল্পটা আবছাভাবেও মনের মধ্যে ফুটে উঠছে না।

সাধারণত গল্পগুলো অদ্ভুতভাবে ভবনাথের মাথায় এসে যায়। এই চেয়ারে বসে ভবনাথ মিনিট কয়েক একমনে গড়গড়ায় টান দিয়ে যান। তাঁকে ঘিরে একটা পাতলা ধোঁয়ার মশারি তৈরি হয়ে যায়। সবকিছু অস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এমন অবস্থায় ভবনাথ সেন চোখ বন্ধ করেন—চোখ বন্ধ অবস্থায় কয়েকবার গড়গড়ায় টান দেন। ঠিক সেই সময় চোখের সামনে ভবনাথ বিরাট একটা রূপালী পর্দা দেখতে পান। ঠিক যেন সিনেমা হল্-এ বসে আছেন ভবনাথ। তিনি ছাড়া হল্-এ কিন্তু একজনও দর্শক নেই। যেন ওঁর জন্যেই কেউ স্পেশাল শোয়ের ব্যবস্থা করেছে। এই অবস্থায় আস্তে আস্তে পর্দার ওপর কয়েকটা মুখ ফুটে ওঠে। অস্পষ্ট অন্ধকারে ছবি শুধু হয়ে যায়। চরিত্রগুলো আপনা-আপনিই কাজকর্ম শুরু করে, ভবনাথকে কোনো নির্দেশ দিতে হয় না। তিনি হাত-পা গুটিয়ে স্রেফ দর্শকের আসনে বসে থাকেন। অবশেষে শেষটাও দেখতে পান ভবনাথ। গল্পটা পুরো জানা হয়ে যায় ভবনাথের। তখন তিনি আবার গোড়া থেকে ছবিটা দেখতে শুরু করেন—গল্পের যা-কিছু ফুটো এবার তিনি মেরামত করে নেন।

এরপর কোনো অসুবিধা হয় না ভবনাথের। গড়গড়ায় নল সরিয়ে রেখে, পার্কার কলম খুলে কাগজের ওপর তিনি যখন প্রথম লাইনটা লেখেন তখন গল্পের শেষ লাইনটাও তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু আজ ভবনাথ অস্থির হয়ে উঠেছেন। কল্পনার ছোট্ট টুনটুনি পাখিটা কিছুতেই তাঁর কাছে আসছে না। মনের এই অবস্থায় ভবনাথের অন্য কোনো কাজ করতে ইচ্ছে হয় না। কাজ তো দূরের কথা, খাবারেরও রুচি থাকে না। শুধু ওই গড়গড়াটুকু টেনে যাওয়া, কিন্তু তাও আজ সকাল থেকে বিস্বাদ লাগছে।

পিকলুর কথাটা গিন্নি এমনভাবে শুনিয়ে গেলেন যেন বাড়িতে নাতির

উপস্থিতি সম্বন্ধে ভবনাথের হুঁশ নেই। কথাটা মোটেই ঠিক নয়। পিকলুর জন্যে ভবনাথ মনে মনে অনেক পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন—কোথায়-কোথায় ওকে নিয়ে যাবেন, চিড়িয়াখানার কোন-কোন পশুর সঙ্গে ওর পরিচয় করিয়ে দেবেন। বোটানিক্যাল গার্ডেন, মিউজিয়ম, প্ল্যানেটোরিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি ইত্যাদির লিস্টিও তৈরি করেছিলেন। ভবনাথ ভেবেছিলেন এবার তাঁর নাতির সঙ্গে বাঘা-বাঘা লেখকের আলাপ করিয়ে দেবেন। দিনকয়েক নাতির সঙ্গে বেড়ানো ছাড়া আর কোনো কাজই রাখবেন না। দরকার হলে সবাই মিলে লাক্সারি বাসে একবার দীঘাও ঘুরে আসবেন।

কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। গল্পের সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে উঠেছে। মেজাজটা যে রকম তেতো হয়ে আছে তাতে মাথা দিয়ে কীভাবে মজার গপ্পো বেরুবে তা ভবনাথ বুঝতে পারছেন না। কিন্তু ভবনাথের পণ এবার কিছুতেই দুঃখের গপ্পো নয়।

আজ সকালে পিকলুর ঠাকুমার সঙ্গে কিছুটা রাগারাগি হলো। রাগটা আরও কোথায় গড়াতো ঠিক নেই। পিকলুর ঠাকুমা সত্যি-সত্যিই হয়তো বউমার বাবা অর্থাৎ রঞ্জন সেনকে লালবাজারে খবর দিতেন। পুলিশের হাই-অফিসারের সামনে তিনি স্বামীর সমালোচনা করতেন।

শহরের চোর জোচ্চোর গুণ্ডা জালিয়াত ঠগ ইত্যাদি ধরবার কাজে পিকলুর পুলিশ-দাদু সারাক্ষণ ব্যস্ত। রাত্রে শোবার সময়েও ওঁকে বিছানার পাশে টেলিফোন রাখতে হয়। রাস্তায় যখন বেরোন তখনও গাড়িতে একটা বেতার টেলিফোন থাকে।

সেবার এখানে রঞ্জনবাবু খেতে এলেন। দশ মিনিট কথাবার্তার পরে ভদ্রলোক সবে রাতের খাবারে হাত দিয়েছেন, অমনি হুকুম সিং এসে খবর দিলে চার্লি পিটার ওয়ারলেসে ডাকছে। চার্লি পিটার নিশ্চয় কলকাতা পুলিশের কোনো কোর্ড-ওয়ার্ড। ওয়ালেসে নিশ্চয় খুব জরুরী কোনো খবর এলো—কারণ খাওয়া শেষ না-করেই রঞ্জন সেন অফিসে ফিরে গেলেন।

পিকলুর ঠাকুমা জিজ্ঞেস করলেন, "রাত আটটা বেজে গিয়েছে—এখন আবার আপিস কী?"

রেঞ্জন সেন দুঃখ করে বললেন, "আমরা হলাম চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। আমাদের দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, দুপুর নেই। দুষ্টু লোকেরা তো আর অফিসের ঘড়ি ধরে দুষ্টুমি করে না।"

তবু রঞ্জন সেন আর একদিন পিকলুকে দেখতে এসেছিলেন এবং

বলেছিলেন, তেমন হলে পিকলুর জন্যে তিনি দু-একদিন ছুটি নেবেন।

"আপনি কেন শুধু শুধু ছুটি নেবেন? চিরছুটির লোক তো আপনার সামনেই বসে রয়েছেন। উনি আপিস যান না, রেডিও টেলিফোনে কথা বলেন না। অথচ বড়-বড় বিমান-বম্বেটেদের কলমের এক খোঁচায় উনি পাকড়াও করেন, কেউ ওঁর হুকুমে রাজা হয়, কেউ ফকির।" একটু রেগেই কথাগুলো বলেছিলেন পিকলুর ঠাকুমা।

রঞ্জন সেন হেসে ফেলেছিলেন এবং আচমকা বিদায় নেবার আগে বলেছিলেন, "সাহিত্যিকের সঙ্গে কলকাতা ঘুরে বেড়ানো আর পুলিশের সঙ্গে কলকাতা দেখা তো এক জিনিস নয়। আমরা মানুষের খারাপ দিকটাই জানি—কোথায় খুন হয়, কোথায় ছিনতাই হয়, কোন জায়গাটা কোন সময় বিপজ্জনক বলতে পারি। কিন্তু ভবনাথবাবুর চোখে এ-সব জায়গাই অন্যরকম হয়ে উঠবে।"

এরপরেই পিকলুর ছোট দাদু হুড়মুড় করে বিদায় নিয়েছিলেন। ভবনাথের লেখার মস্ত ভক্ত তিনি। আজকাল তিনি ভুলেও বড়দের উপন্যাস পড়েন না। সময় পেলেই ছোটদের গপ্পোর বই খুলে বসেন।

ভবনাথ ভেবেছিলেন, দু-একদিনের মধ্যেই চমচমের উপন্যাসটার একটা ছক মনে এসে যাবে এবং তখন পিকলুর ঠাকুমাকে দেখিয়ে দেবেন, কত হৈ-চৈ তিনি নাতির সঙ্গে করতে পারেন।

কিন্তু আজও ভবনাথের মনের মধ্যে রোদ উঠলো না। পিকলুর ঠাকুমা হয়তো আজ আরও রেগে যেতেন, হয়তো তিনি রঞ্জনবাবুকেই ছুটি নেবার জন্যে খবর পাঠাতেন। ভাগ্যে হুকুম সিং এবং চমচম-সম্পাদক হরিময়বাবু প্রায় একই সঙ্গে বাড়িতে হাজির হয়েছিল।

হরিময় লোকটি বেশ—ছেলেদের সত্যিই ভালবাসেন। ভবনাথের সঙ্গে গ্রাম-সম্পর্কে একটা আত্মীয়তাও আছে। যেটা ভবনাথের খুব ভাল লাগে, ছোটখাট সব ব্যাপারেই হরিময়ের বেজায় উৎসাহ। কোন জনপ্রিয় কাগজের সম্পাদক এইভাবে স্রেফ মজার সন্ধানে একটা এগারো বছরের ছেলের সঙ্গে রাস্তায় বেরোতে পারেন?

হরিময়বাবু এক কাজে বেরিয়ে একেবারে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়তে আপত্তি করেন না। ভদ্রলোক এসেছিলেন ভবনাথের আগামী উপন্যাসের কিছুটা অংশ নেবার জন্যে, কিন্তু পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে একটা কথা না-তুলেই চলে গেলেন পিকলুর সঙ্গে।

সেবার আদালতে সাক্ষী দেবার জন্যে বেরিয়ে হরিময়বাবু ভুলে মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখার লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সাড়ে-চার ঘণ্টা লাইন দেবার পর মাঠের মধ্যে ঢুকে ওঁর খেয়াল হলো, পকেটে সাক্ষীর সমন রয়েছে। ইতিমধ্যে জজ রেগে গিয়ে ওঁকে ধরে আনবার জন্যে ওয়ারেন্ট বের করে দিয়েছিলেন। ভবনাথবাবু ছাড়া কেউ বিশ্বাসই করতে চায় না যে, হরিময় স্রেফ ভুল করে খেলার মাঠে লাইন দিয়ে বসেছিলেন।

আজকে পিকলুর সঙ্গে বেরিয়ে হরিময়বাবু ভুলোমনে বিপজ্জনক কিছু করতে পারবেন না—কারণ সঙ্গে হুকুম সিং আছে। পুলিশের লোকেরা ঠিক হরিময়বাবুর উল্টো। কোথায় যেতে হবে, কতক্ষণ থাকতে হবে, কী করতে হবে, সব ওদের নোটবুকে টপাটপ লিখে নেয়—পান থেকে চুন খসবার কোনো সুযোগই থাকে না। হরিময়বাবু ও হুকুম সিং, এদের দুজনকে নিয়ে এবারের গপ্পোটা লিখতে পারলে কেমন হয়? ভবনাথ হঠাৎ ভাবলেন।

পিকলুকে নিয়ে হুকুম সিং ও হরিময় বেরিয়ে যাবার পরেও ভবনাথ সেন নিজের চেয়ারে অনেকক্ষণ হেলান দিয়ে বসে ছিলেন। তারপর ভাবলেন, কিছুক্ষণের জন্যে বাইরের হাওয়া গায়ে লাগানো যাক। মনটা নতুন সৃষ্টির জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

পিকলুর ঠাকুমা দূর থেকে ব্যাপারটা দেখলেন। তিনি যে কী ভাবলেন, তা ভবনাথ আন্দাজ করতে পারছেন। ওঁর বক্তব্য, "যদি বেরোবেই, তাহলে নাতিকে সঙ্গে নিয়েই গেলে না কেন?"

কিন্তু ভবনাথের এই বেরুনোটা বেরুনো নয়—স্রেফ অশান্ত মনকে একটু শান্ত করবার চেষ্টা। দু'পা গিয়েই হয়তো তিনি ফিরে আসবেন।

হলোও তাই। রাস্তায় চলমান জনস্রোতের সঙ্গে মিশে গিয়েও শান্তি পেলেন না ভবনাথ। মাথায় গল্পটা কিছুতেই পেকে উঠছে না।

ঠিক সেই সময় ভবনাথ দেখলেন একটা লোক মই এবং বালতি হাতে উঁচু জায়গায় পোস্টার লাগাচ্ছে। চমচমে পত্রিকার পোস্টার না? হ্যাঁ, তাঁর দেওয়া নামটাই তো বড় বড় করে ঘোষণা করা হয়েছে। যে উপন্যাসের একটা লাইনও তিনি এখনও লেখেননি। ভবনাথ সেনের মাথাটা বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। কাছাকাছি যে একটা বিরাট গর্ত ছিল ভবনাথ লক্ষ্য করেননি। পা-টা আচমকা সেখানেই পড়লো। আর-একটু হলেই ভবনাথ সেন দড়াম করে পড়তেন। বড় রকমের বিপদ হয়নি, কিন্তু গোড়ালিটা মনে হচ্ছে মুচকেছে। যন্ত্রণা সহ্য করে ভবনাথ কোনোরকমে বাড়ির দিকে এগোলেন।

ঠিক সেই সময় একজন চেনা লোক একগাল হেসে ভবনাথকে বললো, "চমচমের বিজ্ঞাপন দেখলুম। এবারে খু-উ-ব হাসির গপ্পো হবে মনে হচ্ছে!"

হাসতে পারলেন না ভবনাথ—মন এবং পা একই সঙ্গে দপ দপ করছে!

ভবনাথ বাড়ি ফিরেই পিকলু ও হুকুম সিংকে দেখতে পেলেন। ওরা দুজনে দ্রুতবেগে দুপুরের খাওয়া সেরে নিচ্ছে।

ইমপিরিয়াল গোঁফখানা বাঁচিয়ে খেতে হচ্ছে হুকুম সিংকে—ফলে সে পিকলুর সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। অন্যদিনে পিকলুর খেতে অনেক সময় লাগে। ওর একটা বদ-অভ্যাস আছে—মাকে এই বয়সেও খাইয়ে দিতে হয়। এখানেও ঠাকুমা প্রতিদিন কাজটা করছিলেন। কিন্তু আজ পিকলু ও হুকুম সিং দুজনেই বোম্বাই মেলের স্পিডে খাচ্ছে। দুজনের মধ্যে বেশ কমপিটিশন লেগে গিয়েছে। ডালের বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে হুকুম সিংয়ের ইমপিরিয়াল গোঁফের দশ পার্সেন্ট হলুদ হয়ে গেলো।

ঠাকুমা সানন্দে জানিয়ে দিলেন, "ওদের একটুও সময় নেই। এখনই বেরুতে হবে"

হরিময়বাবুর খোঁজ করলেন ভবনাথ। পিকলু জানালো, "খাওয়া শেষ করেই রিকশ নিয়ে হরিময়বাবুর বাড়ি চলে যাবো আমরা।"

ঠাকুমা বললেন, "ওঁকেও নিয়ে এলে পারতিস, যা-হয় দুমুঠো এখানে খেয়ে নিতেন।"

হুকুম সিং গম্ভীরভাবে উত্তর দিলো, "বুড়া সায়েবের সময় নেই। সাহা সম্পাদকের সঙ্গে জরুরী মুলাকাত করবেন এবং পিকলুবাবুর জন্যে বসে থাকবেন।"

পিকলু হেসে বললো, "সাহা সম্পাদক নয়! যিনি সম্পাদককে কাগজ বের করতে সাহায্য করেন তাঁর নাম সহ-সম্পাদক।"

দাদুর দিকে মুখ ঘুরিয়ে একগাল হেসে পিকলু বললো, "দাদু, রাস্তায় আজ অনেক মজা হয়েছে। পকেটমার পর্যন্ত। এর আগে আমি কখনোই জ্যান্ত পকেটমার দেখিনি।"

"অ্যাঁ! বেচারা হরিময়বাবুর পকেট নিশ্চয়।" বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন ভবনাথ।

পিকলু হেসে আশ্বাস দিলো, "কিছু ভেবো না দাদু! পকেটমারের প্রত্যাবর্তন, ভীষণ মজার ব্যাপার।"

পিকলু এখন বেশ খুশি মেজাজে রয়েছে। হুকুমচাচাকে সে জিজ্ঞেস করলো,

"এখন কী খাওয়া শেষ হলো?"

একগাল হেসে হুকুম উত্তর দিলো, "খানা! তবে সায়েব বোলেন লাঞ্চ।"

পিকলু বললো, "এর নাম ব্রাঞ্চ—সকালের ব্রেকফাস্ট এবং দুপুরের লাঞ্চের মধ্যে বলে বম্বেতে নাম দিয়েছে, ব্রাঞ্চ!"

পিকলু দ্রুত বেরিয়ে যেতে-যেতে বললো, "আমরা কোথায় যাবো, কী করবো এসব কিছুই ঠিক নেই। আমরা চলি—হরিময়দাদু নিশ্চয় এতোক্ষণ ছটফট করছেন।"

"তোমরা আমাদের জন্যে ভেবো না।" বক্স ক্যামেরাটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে পিকলু হৈ-হৈ করে উঠলো। ওর আনন্দ দেখে ঠাকুমার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

পিকলুর সঙ্গে হরিময়বাবু ও হুকুম সিং রয়েছে, ভবনাথবাবুর আর কোনো ভাবনাই হচ্ছে না।

ঠাকুমা শুধু বললেন, "তুমি একটা রেনকোট নাও। ঘনঘন তোমার সর্দি হয়। বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লাগলেই মুশকিল।"

পিকলু ওসব শুনলো না। ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে হুড়মুড় করে সে বেরিয়ে পড়লো।

তাঁর নাতিটি বেশ ব্রাইট, ভবনাথ মনে-মনে ভাবলেন। রেনকোট না নিয়ে ঠাকুমাকে কেমন বলে গেলো "সর্দির সঙ্গে ঠাণ্ডার, বৃষ্টিতে ভেজার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ঠাকুমা অবাক হয়ে বললেন, "এক রত্তি ছেলে, বলে কী। জলে ভিজলে নাকি সর্দি হয় না।"

পিকলু চিৎকার করে বললো, "সর্দি হয় ভাইরাস থেকে।"

ভবনাথ আবার নিজের ভাবনাব মধ্যে ডুব দিলেন। হুকুম সিং ও হরিময়বাবু ক্যারাকটার দুটো বেশ। গপ্পোটা যদি মাথায় এসে যায় তাহলে হরিময়বাবুর নামটা পাল্টে রাখবেন রসময়বাবু।

চোখ বন্ধ করলেন ভবনাথ। কিন্তু মাথায় কিছু আসছে না। শুধু খবরের কাগজে ওই সর্দি ভাইরাস চুরি যাবার খবরটাই বড়-বড় অক্ষরে চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

হুকুম সিংয়ের যা স্বাস্থ্য! রিকশয় উঠলে পুরো সিটখানাই প্রায় বোঝাই হয়ে যায়। পিকলু যদি রোগা না-হতো তাহলে বেশ মুশকিল হতো, একখানা রিকশয়

ধরতো না।

রিকশওয়ালা সব রকম আইন বাঁচিয়ে রীতিমতো জোরে গাড়ি চালাচ্ছে! হুকুম সিংকে দেখেই সে সেলাম করেছে—প্লেন ড্রেস হলেও পুলিশদের চিনতে রিকশওয়ালাদের এক মিনিটও সময় লাগে না।

চমচম অফিস ও হরিময়বাবুর বাসস্থান একই ঘরে। ঘরের বাইরে বাংলায় বড় করে লেখা আছে : ইন্দ্রলুপ্ত চৌধুরী।

কিন্তু হরিময়বাবু বেশ বিপদে ফেলে দিলেন। যাঁর জন্যে এইভাবে ছুটে আসা তিনি আপিসে নেই। পিকলুর ডাক শুনে ভিতর থেকে একজন চড়া গলায় জানালো তিনি গড়িয়া গিয়েছেন। হুকুম সিং অত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। সে ভারী গলায় ডাকাডাকি শুরু করলো। এবার হরিময়বাবুর রাঁধুনি, তথা চাকর, তথা চমচম পত্রিকার সহ-সম্পাদক বিজয় বেরিয়ে এলো। বেশ স্টাইলের সঙ্গেই বিজয় দরজা খুলেছিল. কিন্তু হুকুম সিং-এর ইমপিরিয়াল গোঁফ দেখে সে বেজায় ঘাবড়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে কথা পাল্টে বিজয় বললো, "হরিময়বাবু হঠাৎ দমদম চলে গিয়েছেন।"

"সে কী! আমাদের যে এখানে আসবার কথা!" হরিময়বাবু যে বেশ ভুলো মানুষ তা পিকলু এবার আন্দাজ করতে পারছে।

বিজয় নিজেও খুব রেগে গেলো হরিময়বাবুর ওপর। বললো, "আপনাদের আসতে বলেছেন এখানে? এই রকম ভুলো লোক কীভাবে যে চমচমের মতো কাগজ চালান!"

কী করবে পিকলু গালে হাত দিয়ে ভাবছে।

বিজয় বললো, "দুঃখু করবেন না। এ তো কমের ওপর দিয়ে গেলো। সেবার ওঁর ভাগ্নীকে শ্রীরামপুর নিয়ে যাবেন বলে হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির তলায় দাঁড় করিয়ে রাখলেন। এমনি ভুলো লোক যে, টিকিট-ঘর থেকে বেরিয়ে ভাগ্নীকে না-নিয়ে সোজা ট্রেনে গিয়ে উঠলেন। রিষড়া স্টেশন পেরিয়ে শ্রীরামপুরে নামার আগে ওঁর খেয়াল হলো ভাগ্নীকে হাওড়া স্টেশনে বড় ঘড়ির তলায় দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছেন!"

পিকলু এতোটা বিশ্বাস করতে চায় না। হরিময়বাবুকে যতটা দেখেছে সে, তাতে খুবই নির্ভর করা যায় ওঁর ওপর।

পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে গোঁফ নাড়িয়ে হুকুম সিং এবার বিজয়কে জেরা শুরু করলো, "কেয়া হুয়া থা?"

পুলিসী জিজ্ঞাসাবাদে কে না ভয় পায়? বিজয় ভয়ে-ভয়ে বললো, "বাবু

এসেই বললেন, "বেজা, তাড়াতাড়ি ভাত বাড়। আমি এখনই বেরুবো।" গোটাকয়েক চিঠি এবং টেলিগ্রাম এসেছিলো। সেগুলো দেখতে-দেখতে কী যে হলো, বাবু বললেন, "বেজা, ভাত থাক। আমি একবার এয়ারপোর্ট যাচ্ছি। শিশুবন্ধু পত্রিকা থেকে যদি কেউ খোজ করে, তাহলে বলবি আমি গড়িয়া গিয়েছি।"

বিজয় স্বীকার করলো, তার উপর হরিময়বাবুর পাকাপাকি নির্দেশ আছে, বিপক্ষকে সব সময় ভুলপথে চালিত করতে হবে। হরিময়বাবু উত্তরে গেলে বলতে হবে তিনি দক্ষিণে গিয়েছেন। ঘুমোলে বলতে হবে জেগে আছেন, জেগে থাকলে বলতে হবে ঘুমোচ্ছেন।

অপরিচিত কণ্ঠস্বর বুঝতে না-পেরে বিজয় তাই পিকলুকে বলেছিল হরিময়বাবু গড়িয়া গিয়েছেন।

পিকলুর মাথায় এবার একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। সে শুনেছে, কলকাতার নতুন বিমানবন্দরখানা দারুণ হয়েছে। কিন্তু এখনও দেখা হয়নি। পিকলু এবার বললো, "হুকুম-চাচা, চলো আমরা ট্রামে চড়ে এরোপ্লেন দেখে আসি।"

হুকুম-চাচা খুব উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। ওখানকার থানা আবার কলকাতা পুলিশের এক্তিয়ারে নয়। তাছাড়া ট্রামে চড়ে দমদমে যাওয়া যায় না।

কিন্তু পিকলু নাছোড়বান্দা। দমদমে বিরাট-বিরাট প্লেনগুলো সে দেখতে চায়, তারপর বোম্বাইয়ের সান্টাক্রুজেব সঙ্গে দমদমের তুলনা করবে।

দমদমের একখানা মিনিবাস থামালো হুকুম সিং এবং পিকলুকে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লো। হাত তোলার ভঙ্গি দেখেই মিনিবাসের সদাসতর্ক ক্লিনার ও কন্ডাক্টর ইতিমধ্যেই হুকুম সিংকে চিনে ফেলেছে। কন্ডাক্টর গলা খাঁকারি দিয়ে বললো, "সরষের মধ্যে ভূত।" সে ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে সাবধানে বাস চালাতে বললো।

ভি-আই-পি রোড ধরে মিনিবাস-ড্রাইভারের বোধহয় খুব জোরে গাড়ি চালাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু গাড়িতেই পুলিশ আছে জানতে পেরে বেচারা মনমরা হয়ে গেলো। কন্ডাক্টরকে ডেকে গেঞ্জিপরা মিনিবাস ড্রাইভার বললো, "যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধে হয়।"

কন্ডাক্টর সবিনয়ে এসে খোঁজ করলো, "হুকুম সিংজী কতদূর যাবেন।" ভেবেছিল দু-এক স্টপ পরেই তিনি নেমে পড়বেন। একেবারে দমদম এয়ারপোর্ট শুনে সে দুঃখ করে ড্রাইভারকে খবর দিলে। "পুরো সন্ধে।"

পিকলু উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো, "এখানে বাঘের ভয় আছে বুঝি?"

কন্ডাক্টর ফিক করে হেসে বললো, "না, আমরা অন্য বাঘের কথা বলছি!"

এয়ারপোর্টে নেমে বিরাট ইন্দ্রপুরী দেখে পিকলু অবাক হয়ে গেলো। বোম্বাইয়ের সান্টাক্রুজ এই বাড়িটার কাছে শিশু।

হুকুম সিংও একজন প্লেন-ড্রেস পুলিশ বন্ধুকে দেখে খুব খুশি হলো। পিকলুর পরিচয় দিয়ে হুকুম সিং বললো, "ডি-সি সায়েবের নাতি। হাওয়াই আড্ডা দেখতে এসেছে বোম্বাই থেকে।"

"কেন? বোম্বাইতে এয়ারপোর্ট নেই?" ললিতবাবু জিজ্ঞেস করলেন। ললিতবাবু কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। কিন্তু এই যে হুকুম-চাচা বললো দমদম কলকাতার এক্তিয়ারের বাইরে?

হুকুম সিং ফিসফিস করে পিকলুকে বুঝালো, "ওরা 'সিক্রেটারি" কনট্রোলের লোক! যেখানে তোমার দাদু আগে ছিলেন।"

পিকলু হেসে ফেললো। "সিকিউরিটি কনট্রোল। যারা বিদেশীদের ওপর নজর রাখে।"

ললিতবাবুর আদি দেশ নিশ্চয় বাংলাদেশ। উনি বললেন, "আমি এখন হাই-যাঃ ডিউটিতে আছি!"

হাই-যাঃ! সে আবার কি কাজ? পিকলু বুঝতে পারছে না। ললিতবাবু তখন ব্যাখ্যা করলেন, "উচ্চারণটা খট খট—কেউ-কেউ বলে হাইজ্যাক! বিমান ছিনতাই।"

হাইজ্যাক ব্যাপারটা পিকলু অবশ্য জানে। কিন্তু হুকুম-চাচা ব্যাখ্যা করতে শুরু করলোন। "ভি-আই-পি রোডেও ছিনতাই হয়—পিলেন ছিনতাই। আর এয়ারপোর্টে ইস্পেশাল ছিনতাই।"

"ডেনজারাস জিনিস। বিমানদস্যুরা প্লেনকে প্লেনই ছিনতাই করবার তালে থাকে!" ললিতকাকা চোখ বড়-বড় করে বোঝালেন পিকলুকে।

তারপর ললিতকাকা বললেন, "আমি যখন রয়েছি, তখন এয়ারপোর্টের সবই দেখিয়ে দেবো। কেমন করে প্লেন নামে, কী করে ওঠে, কী ভাবে যাত্রীদের সার্চ করা হয়।"

এয়ারপোর্ট ঘুরে দেখতে-দেখতেই, একসময় তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ ভেসে এলো। স্বরটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে, অথচ মানুষটাকে দূর থেকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। "পিকলু—মিস্টার পিকলু না?"

আরে, এ যে হরিময়বাবু! টাকমাথায় একটা ফরেন টুপি পরায় তাঁকে চেনাই

যাচ্ছিল না। টুপিটা খুলে ললিতবাবুর দিকে ইংলিশ স্টাইলে টাক মাথা নত করলেন হরিময়বাবু, তাই পিকলু সঙ্গে-সঙ্গে বুঝতে পারলো।

হরিময়বাবুর পাশে আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোককে দেখা গেলো। ওঁরা দুজনে এয়ারপোর্ট রেস্তোরাঁয় বসে ক্যাম্পাকোলা খাচ্ছেন।

হরিময়বাবু ঝটপট পিকলু ও হুকুম সিং-এর পরিচয় দিলেন। ললিতকাকুর পরিচয়টা পিকলু নিজেই দিয়ে দিলো।

হরিময়বাবুর সঙ্গী ভদ্রলোক রসিকতা করলেন, "ভাগ্যে আমাদের প্লেনটা হাই-যাঃ হয়নি—হলে আপনার কাজ বেড়ে যেতো।"

ললিতবাবু হাসলেন বটে, কিন্তু এ ধরনের অলুক্ষণে কথা যে তাঁর মোটেই ভাল লাগে না তা ওঁর স্পেশাল মুখভঙ্গিতেই বুঝিয়ে দিলেন।

হরিময়বাবু এবার হাসিমুখে এবং সগর্বে বললেন, "মিট মাই ভাইপো—রামানুজ চৌধুরী! একসময় চমচম পত্রিকার সহ-সম্পাদক ছিলেন। এখন বহুকাল ধরে ফবেনে আছেন!"

রামানুজ নামখানা বেশ নতুন ধরনের মনে হচ্ছে। হরিময়বাবু ব্যাখ্যা করলেন, "রামের অনুজ অর্থাৎ ছোটভাই অর্থাৎ লক্ষ্মণ। সুতরাং ভুলে গেলে ইজিলি লক্ষ্মণ বলে ডাকতে পারো, কোনো প্রবলেম হবে না।"

রামানুজবাবু ইতিমধ্যে কখন রেস্তোরাঁর বেয়ারাকে চোখের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আরও তিনখানা বরফ-ঠাণ্ডা বোতল নিয়ে এসে সে ভটাভট খুলে দিলো।

হুকুম সিংয়ের আবার পাইপ ঢুকিয়ে ক্যাম্পাকোলা খাওয়ার অভ্যাস নেই। তাই বোতল থেকেই খাওয়া আরম্ভ করলো সে—ফলে ইমপিরিয়াল গোঁফটার তলার অংশ ভিজে লালচে হয়ে উঠলো।

জেনুইন মাল মনে হচ্ছে, কারণ হুকুম সিং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তিনখানা প্রমাণ সাইজের ঢেকুর তুলে হ্যাটট্রিক করলো!

এয়ারপোর্ট রেস্তোরাঁয় ছোট্ট টেবিল ঘিরে ওঁরা কয়েকজন বসে-বসে কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছেন। পিকলু এখন চারিদিকে তাকাচ্ছে।

রেস্তোরাঁর টেবিলগুলো বেশ গায়ে-গায়ে লাগানো। পাশের টেবিলেও দুজন লোক বসে আছেন, তাঁদের মধ্যে একজন ইন্ডিয়ান হলেও হতে পারেন ; আর-একজন কোন দেশের তা পিকলু ঠিক বুঝতে পারলো না। বিরাট দশাসই চেহারা। গোঁফটাও লেটেস্ট স্টাইলের। মাথা ভরতি কোঁকড়া চুল। কিন্তু ঠিক যেন জঙ্গল—কোনদিন ওর মধ্যে বোধহয় চিরুনি ঢোকেনি।

হরিময়বাবু এবার লজ্জায় জিভ বের করে ফেললেন। পিকলুকে বললেন,

"আমি খুবই দুঃখিত। বাড়ি ফিরেই দেখি ভাইপো রামুর এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম। টেলিগ্রাম দেখে তো আমার বিশ্বাসই হয় না। আমি ভেবেছিলুম রামুর সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখাই হবে না! কিন্তু চমচমের টেলিগ্রাফিক নম্বরে সেই ভাইপো রাম তার করেছে সে কলকাতার ওপর দিয়ে চলে যাবে। যদি ইচ্ছে থাকে, তাহলে যেন একবার দমদমে দেখা করতে আসি।"

রামানুজ চৌধুরীর দাঁতগুলো ঠিক ঝকঝকে মুক্তোর মতো। আর চেহারাটা কালো হলেও ঝকমকে। শরীরটায় বেশ জেল্লা আছে। হরিময়বাবুর শরীরের সঙ্গে ভাইপোর কিন্তু কোনো মিল নেই। হরিময়বাবু বেঁটে, ভাইপো লম্বা। হরিময়ের নাকখানা রিভলভারের নলের মতো, ভাইপোর নাকটা চাপা।

ঠাণ্ডা বোতল শেষ করে পুরানো বন্ধু ললিতবাবুর সঙ্গে গল্প করবার জন্যে হুকুম সিং উঠে পড়লো।

রামানুজ এতোক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, "এঁরা কারা?"

হরিময়বাবু ভাইপোর কাছে কিছুই চাপলেন না। প্লেন ড্রেসে এরা যে পুলিশের লোক এবং পিকলুকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন সব বলে দিলেন।

পিকলুর মনে হলো পাশের টেবিলের লোকরাও ওদের কথাবার্তা খুব মন দিয়ে শুনছেন। এবার হাসি-হাসি মুখ করে ওঁরাও টেবিলের কাছে সরে এলেন।

রামানুজবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন, "মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার—আমার ফ্রেন্ড এবং একই হাওয়াই জাহাজে হংকং থেকে কলকাতায় এসেছেন। আর ইনিই মিস্টার পিক্‌ল।"

"পিক্‌ল নয়—পিক্‌ল মানে তো আচার! ইনি হচ্ছেন পিকলু," সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন হরিময়বাবু। নামের বিকৃতি উনি একদম সহ্য করতে পারেন না।

এঁরা দুজনেই যে সবে ফরেন থেকে নেমেছেন তা এঁদের জামা-কাপড় এবং মালপত্তর দেখলেই বোঝা যায়।

ভাইপো-গর্বে গর্বিত হরিময়বাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, "ফরেনের ব্যাপারই আলাদা। রামু, তোর গা দিয়ে যে সেন্টের গন্ধখানা বেরুচ্ছে না!"

পিকলু লজ্জা পাচ্ছে। দুজন অতিথি বাংলা কথা বুঝতে পারছেন না। ইংরিজিতে কথা বলাটাই এই অবস্থায় ভদ্রতা।

কিন্তু হরিময়বাবু বাংলায় বললেন, "মাইডিয়ার ভাইপোকে আমি কতদিন পরে ফেরত পেয়েছি। এখন দুটো প্রাণের কথা বলে বুক হাল্কা করতে চাই—ইংরিজির প্রশ্নই ওঠে না। মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর জেঠু যদি এখানে

আসতেন তাহলে নিশ্চয় ওঁরা ম্যাড্রাসি ভাষায় কথা বলতেন।"

ইস্! বেশ লজ্জা করছে পিকলুর। হরিময়বাবুর জানা উচিত ম্যাড্রাসি বলে কোনো ভাষা নেই। ভদ্রলোকের মাতৃভাষা নিশ্চয় তামিল।

"মাত্র ফরটি-এইট আওয়ারস"—অর্থাৎ আটচল্লিশ ঘণ্টার জন্যে হরিময়বাবুর ভাইপো কলকাতায় এসেছেন। স্রেফ ব্রেক জার্নি। হংকং থেকে জেনিভার পথে কলকাতায়।

পিকলু অবাক হয়ে রামানুজবাবুর জিনিসপত্তর লক্ষ্য করছে। ওঁর গলা থেকে, কাঁধ থেকে, কোমরের বেল্ট থেকে কতরকম অজানা জিনিস যে ঝুলছে। অনেকদিন আগে ইলেকট্রিক ট্রেনে পিকলু এরকম এক ফেরিওয়ালা দেখেছিল। তারও চোখে রঙিন চশমা। সেই লোকটার সমস্ত দেহ থেকে মেডেলের মতো নানা রংয়ের প্লাস্টিকের চিরুনি, জুতোর বুরুশ, ছুরি, পেন, চামচে, চশমা ঝুলছিল।

রামানুজ ফস করে চোখের চশমাটা খুলে পিকলুর দিকে এগিয়ে দিলেন। "পরে দেখো। স্পেশাল পোলারয়েড-লেন্স—নিউইয়র্কে সবে বেরিয়েছে।"

চশমাটা পরবার লোভ সামলাতে পারলো না পিকলু। আঃ, চোখ দুটো কেমন ঠাণ্ডা হয়ে গেলো—ঠিক যেন চোখ দিয়ে আইসক্রিম খাচ্ছে।

মিস্টার আয়ারের সর্বাঙ্গেও নানারকম অজানা যন্ত্রপতি ঝুলছে। একটা যন্ত্র খুলে হঠাৎ তিনি নিজের গালের ওপর বুলোতে লাগলেন। হরিময়বাবু ফিসফিস করে বললেন, "ব্যাটারি-চালিত অটোমেটিক দাড়িকামানোর কল! উঃ! সাবান নয়, জল নয়, ব্লেড নয়—স্রেফ ম্যাজিকের মতো কামানো হয়ে গেলো। সম্রাট শাজাহানও এই সুখ ভোগ করতে পারেননি। পিকলু, তোমার দাড়ি গজালে ওইরকম একটা মেশিন যোগাড় করে ফেলো। আমার মতো খোঁচা-দাড়ির খোঁচা তোমাকে খেতে হবে না।"

জেঠুর কথা শুনে রামানুজ বললো, "মোস্ট অর্ডিনারি ফিলিশেভ। মিস্টার আয়ারকে ত্রিভুবন ঘুরে বেড়াতে হয়, আমিরী কায়দায় দাড়ি কামাবার সময় কোথায়?"

অন্যসব যন্ত্রও আড়চোখে দেখছেন হরিময়বাবু। টেপরেকর্ডার, টেলিফটো লেন্স, ট্রানজিস্টর রেডিও, কত রকমের ক্যামেরা এবং ফ্ল্যাশ যে রয়েছে। এসব তিনি জীবনে দেখেননি।

হরিময়বাবুর মনে পড়েছে অতীতের কথা। এই রামুর একজোড়া চটির বেশি ছিল না। স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার সময় একখানা ফাউনটেন পেনের জন্যে কী

কান্নাকাটি করেছিল রামু। তারপর পাস-টাস করে রামু অনেক দিন বেকার বসেছিল। একটা স্টেশনারি দোকানে শেষ পর্যন্ত কী একটা চাকরি জুটেয়েছিল। কিন্তু থাকা খাওয়ার খরচ উঠতো না।

শেষ পর্যন্ত, হঠাৎ একদিন রামু উধাও হলো। কোথায় গেলো, কী হলো, প্রথমে জানাই যায়নি। তারপর রামু বিদেশ থেকে একখানা রঙিন ছবির পোস্টকার্ড পাঠালো। হরিময়বাবু ছবিখানা আজও যত্নের সঙ্গে রেখে দিয়েছেন। আন্দাজ করেছেন তাঁর ভাইপো এখন বিদেশে কেষ্ট-বিষ্টু হয়েছে।

পুরানো দিনের কথা ভেবে হরিময়বাবুর চোখে জল এসে যাচ্ছে। কিন্তু এখন কাঁদবার সময় নয়। ভাইপোটিকে নিয়ে তিনি বাড়ি যেতে চান।

মালপত্তর নিয়ে ওঁরা এয়ারপোর্টের গেটের কাছে এসে ট্যাক্সির জন্যে লাইন দিলেন। বন্ধুর সঙ্গে গল্পগুজব শেষ করে হুকুম সিংও ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে।

কোঁকড়া-চুলওলা এক মেমসায়েব তাঁর মালপত্র নিয়ে একটা ট্যাক্সি চড়ে ভোঁ করে বেরিয়ে গেলেন। পরের ট্যাক্সিতে মিস্টার আয়ার তার মালপত্তর তুলে ফেললেন। লম্বা-চওড়া চুল না-আঁচড়ানো সায়েবটি দূরে চুপচাপ গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

ড্রাইভার গাড়ির দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছে, তখন মিস্টার আয়ার চিৎকার করে উঠলেন, "মিস্টার চৌধুরী, আসুন। আপনিও তো কর্নওয়ালিস হোটেলে উঠেছেন।"

হা-হা করে উঠলেন হরিময়বাবু। "আমার ভাইপো দুদিনের জন্যে কলকাতায় এসে কেন হোটেলে উঠবে? চমচম আপিসে দুজনের বেশ জায়গা হয়ে যাবে।"

মিস্টার আয়ার ততক্ষণে ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়েছেন। কিন্তু কোথায় রামানুজ চৌধুরী? তিনি তখন একটু দূরে পিকলুকে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞেস করছেন, "এখানে ছবি তোলা যায় তো?"

আজকাল সব জায়গায় ছবি তোলার পারমিশন থাকে না। ক্যামেরা বের করলেই পুলিশের খপ্পরে পড়তে হবে। পিকলুবাবুর ছবি তোলা হচ্ছে দেখে হুকুম সিং বাধা দিলো না। বরং বললো, "জলদি খোকাবাবুর ছবি তুলে নিন।"

রামানুজ চৌধুরী যখন ছবির ফোকাস ঠিক করছেন তখন মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার ও হরিময়বাবু কাছে এসে দাঁড়ালেন।

মিস্টার আয়ার জিজ্ঞেস করলেন, "কী ঠিক করলেন? হোটেলেই তো ভাল

ছিল। ঠিক আছে—সারাদিন জেঠুর কাছে থাকুন—রাত্রে হোটেলে চলে আসুন।"

হরিময়বাবুকে বুঝিয়ে রামানুজ বললেন, "আমরা লে-ওভার পাবো এরোপ্লেন কোম্পানি থেকে। কর্নওয়ালিস হোটেলে আমার ও মিস্টার আয়ারের জন্যে ঘর ঠিক আছে।"

লে-অফ কথাটা হরিময়বাবু শুনেছেন। লে-অফের ধাক্কায় কারখানার লোক বাড়িতে বেকার বসে থাকে, খুব কষ্ট পায়। তিনি ভাবলেন, এরোপ্লেন কোম্পানিতে হয়তো কোনো গোলমাল হয়েছে।

ভাইপো এবার হেসে বললো, "জেঠু, লে-অফ নয়—লে-ওভার। মানে, জামাই আদর—প্লেন কোম্পানির খরচে আমরা হোটেলে থাকবো। পকেট থেকে একটি আধলা খরচ হবে না। এমন কী, এই এয়ারপোর্ট থেকে যাবার ট্যাক্সি ভাড়াও ওদের!"

শেষ পর্যন্ত রামানুজ বললো, "মিস্টার আয়ার, আপনি এগোন। আমি জেঠুর সঙ্গে বাড়িতে একবার দেখা দিয়েই কর্নওয়ালিস হোটেলে যাচ্ছি।"

আয়ারের ট্যাক্সি এবার তীরের বেগে এয়ারপোর্ট ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। শুধু মিস্টার রামানুজ চৌধুরীর জিনিসপত্র রাস্তায় পড়ে রইলো।

হরিময়বাবু হন্তদন্ত হয়ে ভাইপোকে বকুনি লাগালেন, "দামী জিনিসপত্তর এভাবে ছড়িয়ে রাখিস না, রামু। এর নাম কলকাতা শহর।"

আড়চোখে একবার সব ক'টা জিনিসের হিসেব মিলিয়ে নিলো রামানুজ। তারপর একটা ক্যামেরা তুলে নিয়ে পিকলুর কাছে চলে এলো।

পিকলু তখনও গেটের কাছে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছবি তোলার কথা শুনলেই ও কী রকম শক্ত হয়ে যায়। অথচ ছবি তোলাতে ওর খুব ভাল লাগে।

নিজের বক্স ক্যামেরায় সে ইতিমধ্যে এয়ারপোর্টের একটি ছবি তুলে নিয়েছে। হরিময়বাবুকে যে-রকম দেখাবে ওই ছবিতে ভেবে সে বেশ মজা পাচ্ছে।

হরিময়বাবু দেখতেই পাননি যে, পিকলু ছবি তুলে নিয়েছে—তবে মিস্টার আয়ার এবং ওই বিরাট লোকটা আড়চোখে ফটোগ্রাফার পিকলুকে ছবি তুলতে দেখে বেশ গম্ভীর হয়ে গেলো। পিকলুর মনে হলো, বিরাট লম্বা চওড়া ওই সায়েব পিকলুকে দিয়ে ছবি তোলানো পছন্দ করলেন না। পিকলু শুনেছে, বিনা অনুমতিতে ছবি তুললে অনেকে বেশ বিরক্ত হন।

রামানুজ এবার পটাপট পিকলুর ছবি তুলে ফেললো, এবং দশাসই ওই

সায়েব হঠাৎ এগিয়ে এসে মুখ টিপে হাসতে-হাসতে ওদের সকলের গায়ে সুগন্ধ সেন্ট স্প্রে করে দিলো। সেন্টের গন্ধে মাতোয়ারা হরিময়বাবু খুব খুশি হয়ে বললেন, "আমাদের জন্যে ভদ্রলোক কতখানি সেন্ট নষ্ট করলেন দ্যাখো। হয়তো ওঁদের দেশে এইরকম সেন্ট ছড়িয়ে বন্ধুত্ব পাতাতে হয়!"

ইতিমধ্যে আর-একখানা খালি ট্যাক্সি এসে থামলো। এবং হরিময়বাবুর নির্দেশে পোর্টার সেই গাড়িতে রামানুজের জিনিসপত্তর তুলতে লাগলেন।

ভবনাথ সেন আরাম কেদারায় বসে গড়গড়া টানছেন। ঘড়িতে পৌনে আটটা বাজলো। পিকলুর ঠাকুমা এর মধ্যে দু'বার ঘড়ি দেখে গেলেন—কারুর জন্যে চিন্তা থাকলে তিনি ঘন-ঘন দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকান।

ভবনাথ বললেন, "পিকলুর জন্যে কোনো চিন্তা নেই—সঙ্গে হুকুম সিং এবং হরিময়বাবু রয়েছেন।"

এমন সময় হৈ-হৈ করে ওরা তিনজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। খুশিতে টগবগ করতে করতে হরিময়বাবু ছোটছেলের মতো বললেন, "দুর্দান্ত! ভাবা যায় না।"

পিকলু তড়াং করে একটা সোফার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর বললো, "উঃ, আজ সমস্ত দিন কলকাতায় ঘুরে-ঘুরে যা হৈ-চৈ হয়েছে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "আপনার নাতি ইচ্ছে করলেই একখানা বই লিখে ফেলতে পারে—'পিকলুর কলকাতা ভ্রমণ'—প্রথম পর্ব।"

প্রথম পর্ব এই কারণে, কাল নাকি আবার দ্বিতীয় পর্ব ভ্রমণ হবে। হরিময়বাবু এবার পিকলুর ঠাকুমাকে অনুরোধ করলেন, "আপনার বেয়াইকে একটু বলে দিন, আগামীকালও হুকুম সিংকে আমাদের দলে চাই। হুকুম সিং সশরীরে উপস্থিত থাকলে আমাদের কোনো চিন্তাই থাকে না।"

ঠাকুমা বললেন, "বসুন, কিছু খান।"

হরিময়বাবু বললেন, "বসবার উপায় নেই—সর্দিতে নাকটা বুজে আছে।"

ভবনাথ একটু অবাক হলেন। কারণ হরিময়বাবু গর্ব করতেন, তিনি সর্দিকাশিতে ভোগেন না!

রুমালে কয়েকবার নাক পরিষ্কারের ব্যর্থ চেষ্টা করলেন হরিময়। তারপর বললেন, "হঠাৎ কী যে হলো—এখনই ওষুধের দোকানে যেতে হবে।"

ঠাকুমা বললেন, "আমাদের বাড়িতেই নাকের ড্রপ এবং ইনহেলার রয়েছে।"

ইনহেলার ব্যাপারটা হরিময়বাবুর কাছে পরিষ্কার নয়। বললেন, "ওই

নাকের মধ্যে ফাউনটেন পেন গুঁজে দেবার মতো জিনিসটা? আমি কখনো ব্যবহার করিনি—জিনিসটা দেখলেই কেমন আমার হাসি লাগে। দিন, এখন যখন অসুবিধায় পড়েছি—যে-রোগের যে চিকিৎসা।"

হরিময়বাবু যখন নাকে ওষুধ নিচ্ছেন, তখন ভবনাথ লক্ষ্য করলেন হুকুম সিংও সর্দিতে হাঁসফাঁস করছে।

হুকুম সিংয়ের নাকেও কয়েক ফোঁটা ওষুধ ঢেলে দিলেন ঠাকুমা। সঙ্গে-সঙ্গে এমন জোরে হাঁচলো হুকুম সিং, বাড়িটা কেঁপে উঠলো।

ভবনাথ লক্ষ্য করলেন, যার প্রায় সব সময় সর্দি লেগে থাকে, সেই পিকলুর কিন্তু কিছু হয়নি। ব্যাপারটা তাঁর একটু আশ্চর্যই লাগলো।

নাক টানতে-টানতে হরিময়বাবু বললেন, "আজ যা মজা হয়েছে না। শ্যামবাজারের মোড়ে একটা বিরাট পোস্টার দেখে আমার ভাইপো তো তাজ্জব। লেখা আছে : 'খারাপ লোকের খপ্পরে পড়ুন।' সে বেচারা তো রীতিমতো নার্ভাস হয়ে গেলো। বললে, "ওয়ার্লডের কোন শহরে ওই ভাবে জনসাধারণকে খারাপ লোকের খপ্পরে পড়বার জন্যে অনুরোধ করা হয় না।"

"তারপর?" মৃদু হেসে ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"তখন বাধ্য হয়ে ভাইপোর কাছে টপ সিংক্রেট ফাঁস করলুম। চমচমের বিশেষ সংখ্যায় স্পেশাল উপন্যাসের নাম 'খারাপ লোকের খপ্পরে'—সেইটা জনসাধারণকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।"

ভবনাথ সেন এবার হা-হা করে হেসে ফেললেন। হরিময়বাবু বললেন, "দাঁড়ান— এখনও হাসির বাকি আছে। আমার ভাইপোর ফ্রেন্ড মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার— কোনো একসময় বোধহয় ঢাকাতে ছিলেন। রীতিমতো বাঙলা জানেন। আমাদের সেকেন্ড পোস্টারখানা দেখে ভদ্রলোক বেশ ঘাবড়ে গেলেন। ধর্মতলা স্ট্রিটে পরের পর, ল্যাম্পপোস্ট পাবলিসিটি হয়েছে। 'খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছেন? এখনই খোঁজ করুন।' পিকলুটা আবার বোকার মতো বলে ফেলেছে, পুলিশ থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছে বোধহয়। জানতে চাইছে, সত্যিই কেউ খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছে কি না।"

পিকলু হাসতে-হাসতে বললো, "জানো দাদু, মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর মুখ শুকনো হয়ে গেলো। জিজ্ঞেস করলেন, এখানকার পুলিশ খুব সজাগ বুঝি?"

হরিময়বাবু বললেন, "বিদেশীর কাছে স্বদেশী পুলিশের বদনাম আমার সহ্য হয় না। সঙ্গে-সঙ্গে শুনিয়ে দিলাম, 'পুলিশ জানে শত্রু নিকটেই আছে।' ভাগ্যে চাইনিজ যুদ্ধের সময় যে পোস্টারখানা চমচমে ছাপিয়েছিলাম, অর

ওয়ার্ডিংগুলো মনে ছিল।”

হরিময়বাবু নাকে আর একবার সর্দির ওষুধ গুঁজলেন। কিন্তু জানালেন, “নাকটা ক্রমশই বুজে আসছে। কোনোরকমে নিঃশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি।”

আর গল্পগুজব নয়। হরিময়বাবু ও হুকুম সিং এবার উঠে পড়লেন।

রাতে খাবার খেতে বসে পিকলু বললো, “দাদু অবাক কাণ্ড।”

অবাক হবার কাণ্ডই বটে। পকেট থেকে একখানা রঙিন ফটো বের করলো পিকলু। এ যে পিকলুরই ফটো—এয়ারপোর্টেরর সামনে বুক ফুলিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে পিকলু। ছবি দেখে ঠাকুমা খুব খুশি হলেন।

পিকলু বললো, “হরিময়দাদুর ভাইপো ম্যাজিক দেখিয়ে দিলেন। আমাকে বললেন, হাসো! আমি হাসলাম, উনি ক্যামেরার বোতাম টিপলেন। তারপর ওয়ান-টু-থ্রি এইভাবে কুড়ি পর্যন্ত গুনলেন।” এবার ক্যামেরার ভিতর থেকে পিকলুর এই রঙিন ছবিটা বেরিয়ে এলো। তাজ্জব ব্যাপার।

পিকলু নিজেও ছবি তোলে বক্স ক্যামেরায়। ছবি তোলা হলে ফিল্মটা স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেয়, সেখানে নেগেটিভ ওয়াশ হয়। ডেভেলপ করা নেগেটিভ থেকে এক-একখানা পজিটিভ ছবি অন্য একটা কাগজে ডার্করুমে ছাপা হয়। কত সময় লাগে। কিন্তু রামানুজ কাকুর আশ্চর্য যন্তর—বোতাম টেপামাত্রই হাতে-হাতে ছবি।

রুটি চিবোতে-চিবোতে ভবনাথ বললেন, “পড়েছি বটে। এর নাম পোলারয়েড ইন্‌সট্যান্ট ক্যামেরা। কখনও দেখেনি। গোড়ার দিকে শুধু সাদাকালো ছবি উঠতো, এখন তাহলে রঙিন ছবি তোলবার ক্যামেরাও হয়েছে।” ভবনাথ মনে-মনে ইংরেজি ইন্‌সট্যান্টামেটিকের একটা বাংলা নাম ঠিক করে নিলেন : তাৎক্ষণিক ক্যামেরা।

ক্যামেরা থেকে সোজাসুজি রঙিন ছবি বেরিয়ে আসতে দেখেই কেবল পিকলু অবাক হয়নি। আরও একটা ভুতুড়ে ব্যাপার হয়েছে। ছবিখানা যেমনি রামানুজবাবু পিকলুর হাতে দিলেন অমনি হঠাৎ তার মনে পড়ে গেলো, আজ সকালে স্নান করা হয়নি। পিকলু বললো, “জানো, দাদু, ছবিটায় যেন কেমন ঘেমো-ঘেমো গন্ধ পেলাম।”

হা-হা করে হেসে উঠলেন ভবনাথ। “ছবিতে তোর গায়ের ঘেমো গন্ধ ধরা পড়লো বলছিস?”

পিকলু জানালো হরিময়দাদু এবং হুকুম সিংকেও ছবিটা সে চুপি-চুপি

দেখিয়েছিল। কিন্তু দারুণ সর্দিতে ওঁদের নাক বুজে গিয়েছে— কোনো গন্ধই ওঁরা পেলেন না। কিন্তু হরিময়বাবু কিছুতেই স্বীকার করবেন না যে, তাঁর নাক দিয়ে গন্ধ ঢুকছে না।

ছবিটা বের করে পিকলু এবার ভবনাথের হাতে দিলেন। সত্যি ভৌতিক ব্যাপার! তিনিও যেন ঘেমো গন্ধ পাচ্ছেন। ঠাকুমা বললেন "যত তোদের সব পাগলামি। সারাদিন তোর পকেটে-পকেটে ছবিটা ঘুরছে তাই তোর ওইরকম মনে হচ্ছে।"

ঠাকুমা ভিতরে চলে গেলেন, কিন্তু পিকলুর সন্দেহ কমলো না। ছবিটা সে আবার শুঁকে দেখলো। তারপর দাদুকে বললো, "তুমি আমার হাফ্-প্যান্টের ডান পকেটের দিকটা শুঁকে দ্যাখো—পেয়ারার গন্ধ পাচ্ছ না?"

ছবিতে যেখানে পকেট দেখা যাচ্ছে সেখানে নাক নিয়ে গিয়ে পাকা পেয়ারার কড়া গন্ধ পেলেন ভবনাথ। পিকলু বললো, "আমার ডান পকেটে একটা পেয়ারা ছিল। অথচ বাঁ পকেট শুকলাম, কোনো গন্ধ নেই।"

ব্যাপারটা সত্যিই একটু ভুতুড়ে মনে হচ্ছে ভবনাথের। কিন্তু ভূত-পেত্নীতে পিকলুর অত বিশ্বাস নেই। সে বললে, "ভুতুড়ে নয়...রহস্যাবৃত!" শেষ কথাটা ভবনাথ তাঁর গল্পে প্রায়ই ব্যবহার করে থাকেন।

ভবনাথ এরপর পিকলুকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায়-কোথায় গিয়েছিলি তোরা?"

পিকলু হুড়হুড় করে সব বলে গেলো। এয়ারপোর্টে হরিময়বাবুর ভাইপো রামানুজকাকু ছাড়াও ওর বন্ধু মিঃ আয়ারের সঙ্গে আলাপ হলো। সঙ্গে আরও একজন লম্বা-চওড়া বিদেশী ছিলেন—কোন দেশের লোক পিকলু ঠিক বুঝতে পারেনি। হয়তো মিশ্র জাতেরও হতে পারেন। দেখলে মনে হয় কুস্তিগীর। হুকুম সিংয়ের সঙ্গে আলাপ করেও ওঁরা খুশি। হুকুম সিং না থাকলে সাহস করে এয়ারপোর্টে কেউ পিকলুর ছবি তুলতেই পারতো না। তারপর চমচম অফিস ঘুরে রামানুজবাবুরা নিউ মার্কেটের পিছনে কর্নওয়ালিস হোটেলে উঠলেন।

হরিময়বাবু ভাইপোকে খুব রিকোয়েস্ট করেছিলেন চমচম আপিসে ওঠবার জন্যে। রামানুজ রাজিও ছিলেন, কিন্তু ওই মিঃ সিঙ্গারাভেলুর চাপে পড়ে রামুকাকু হোটেলেই হাজির হলেন।

"খুব পুরনো বন্ধু হয়তো হবেন," পিকলুর বর্ণনা শুনতে-শুনতে ভবনাথ মন্তব্য করলেন।

পিকলু বললো, "মোটেই না। হংকং এয়ারপোর্টে আলাপ। দুজনেই খুব গল্প

করতে ভালবাসেন।"

ওখানে চা-টা খেয়ে কলকাতা ঘুরে বেড়াবার প্ল্যান হলো।

পিকলু বললো "জানো দাদু, ওঁদের কাছে কত রকমের অদ্ভুত জিনিসপত্তর! ওই লম্বা সায়েবের আছে একখানা সেন্ট যা আছে না! এয়ারপোর্টে সরু লম্বা একটা শিশি বের করে আঙুলের একটু চাপ দিতেই স্প্রে হয়ে গেলো হরিময়বাবু এবং হুকুম সিংয়ের ওপর। বিলিতী সেন্টের সেই গন্ধে হরিময়দাদুর খুব আনন্দ—স্বদেশী আন্দোলনের পর এই প্রথম সেন্ট মাখলেন হরিময়দাদু।"

"সেই সায়েবটা তোদের সঙ্গে কথা বলেছিল?" ভবনাথ জানতে চান।

"মোটেই না। সায়েব হয়তো ইংরিজি বোঝেন না। তবে আমাদের দেখলেই হেসেছেন—আমরাও হাসিমুখ দেখিয়েছি। ওঁর সঙ্গে রামানুজকাকু বা মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর কোনো সম্পর্ক নেই। একই প্লেনে হংকং থেকে এসেছেন এই পর্যন্ত। এবং একই হোটেলে উঠেছেন অ্যাক্সিডেনটালি।"

পিকলু বলে চললো, হরিময়দাদু ভাইপোর গপ্পো শুনলে তুমি খুব হাসবে, দাদু। রামানুজকাকু নাকি পড়াশোনায় খুব খারাপ ছিলেন। ছবি তোলার খুব লোভ ছিল। আর.." এবার পিকলু আর হাসি চাপতে পারলো না।

দাদু ওর মুখের দিকে তাকালেন। পিকলু বললো, "খু-উব পেটুক ছিলেন। চপ কাটলেট চানাচুর থেকে আরম্ভ করে দই সন্দেশ রসগোল্লা পর্যন্ত সব কিছু খাবার খেতে প্রচণ্ড ভালবাসতেন। দু-একবার হরিময়দাদুর পকেট থেকে পয়সা চুরিও হয়েছে— প্রতিবারেই হরিময়দাদু মিষ্টি-দোকানের খালি বাক্স ওয়েস্ট পেপার বাক্সে পড়ে থাকতে দেখেছেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে হরিময়দাদু কখনও কিছু বলতে পারেননি।"

পিকলু বললো, "তারপর কিন্তু রামুকাকুকে বাড়ি ছেড়ে পালাতে হলো। রাবড়িচূর্ণ চুরি করে ধরা পড়বার ভয়ে।"

হরিময়বাবুর যে রাবড়িচূর্ণের নেশা আছে তা ভবনাথ জানেন। অন্য লোকেরা বিড়ি, সিগারেট, নস্যি, খৈনির নেশা করে। কিন্তু হরিময়বাবুর স্পেশাল নেশা, বোধহয় ওয়ার্লডে কারও নেই। ট্রামে-বাসে, রাস্তায় যেতে-যেতে মাঝে মাঝে খৈনির মতো মুখে একটু রাবড়িচূর্ণ না ফেললে হরিময়বাবুর মাথা ঘুরতে আরম্ভ করে। নেশাটা বেশ চেপে বসেছে। রাবড়িচূর্ণ মানে হরলিক্সের গুঁড়ো।

রামুকাকু একদিন দুপুরে হরিময়বাবুর ঘরে ঢুকে পুরো এক শিশি রাবড়িচূর্ণ সাবাড় করে ফেলেছিলেন। তারপর ভয় পেয়ে সেই যে গৃহত্যাগ করেছিলেন—আর কেউ খোঁজ পায়নি। কীভাবে ফরেনে পালিয়েছিলেন

রামানুজকাকু সেটাই নাকি একটা গপ্পো। তবে ওখানে খুব নাম করেছেন রামানুজকাকু, রেডিওতে মস্ত কী এক চাকরি করেন। সেই কাজেই তেহ্‌রান এবং জেনিভা যাবার পথে কিছুক্ষণের জন্যে কলকাতায় নেমে পড়েছেন।

হংকং-এ মিস্টার সিঙ্গারাভেলুর সঙ্গে খুব আলাপ হলো। উনি বললেন, "তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে কলকাতা ঘুরে আসি।"

"হরিময়দাদু ভাইপোকে কী উপহার দিলেন জানো? এক শিশি রাবড়িচূর্ণ। বললেন, সামান্য এক শিশি চূর্ণর জন্য তুই সংসার ত্যাগ করলি। খুব হাসলেন রামুকাকু—তিনি এখন ওসব জিনিস খান না।"

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর তোরা কোথায় গেলি?"

পিকলু মুখে একটা জাপানি লজেন্স পুরে বললো, "কর্নওয়ালিস হোটেলে চা টোস্ট খেয়ে আমরা পাঁচজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।"

পাঁচজন লোককে আজকাল একখানা ট্যাক্সিতে নিতে চায় না। কিন্তু হুকুম সিং থাকায় কোনো অসুবিধে হলো না। একজন ট্যাক্সিওয়ালা বেশি ভাড়া চাইতে গিয়ে হুকুম সিংকে দেখে লজ্জায় জিভ কাটলো। ক্ষমা চেয়ে বললে, স্লিপ অফ টাং, আর কখনও সে বেশি ভাড়া চাইবে না।

এরপর ভবনাথ ভেবেছিলেন এরা আবার কলকাতার বিখ্যাত জায়গাগুলো যেমন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, মিউজিয়ম, এই সব দেখবেন।

কিন্তু অবাক কাণ্ড। ওঁরা প্রথমে গেলেন হ্যারিসন রোডের ওপর বিখ্যাত এক চপ-কাটলেটের দোকানে। দিলখুশা রেস্তোরাঁর গন্ধ নাকি রামুকাকুর নাকে এতো বছর পরেও লেগে আছে। ওখানকার চিকেন কবিরাজি কাটলেট নাকি ওয়ার্লড'স বেস্ট। দুশো গজ দূর থেকে ভুরভুর করে গন্ধ ছাড়ে। গন্ধ শুঁকে দোকান খুঁজে পাওয়া গেলো। ওর সামনে দাঁড়িয়ে রামুকাকু একটি ছবি তোলালেন। বোতাম টিপলেন মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার।

এরপর বিখ্যাত এক কচুরি-সিঙাড়ার দোকান। সেখানে খাঁটি ঘিয়ের গন্ধ প্রাণ মাতিয়ে দিচ্ছে। চোখ বন্ধ করে অনেকক্ষণ ধরে সেই পবিত্র গন্ধ নিঃশ্বাস নিলেন হরিময়বাবুর ভাইপো। ওখানেও ছবি উঠলো।

ট্যাক্সি এবার ছুটে চললো এসপ্লানেডের কাছে সেই বিখ্যাত মোগলাই পরোটার দোকানের দিকে। অনাদির দোকানেও গন্ধ ভুরভুর করছে। রামুকাকু বললেন, "এমন গন্ধ কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—সকল দেশের সেরা সে যে আমার জন্মভূমি।" মোগলাই পরোটা ও কষা মাংস খেতে-খেতে ছবি

তোলার প্রস্তাব উঠলো। এ-অবস্থায় ছবি তুলতে আপত্তি উঠেছিল—অনেক ভদ্রলোক মহিলাদের নিয়ে মোগলাই পরোটা ও কষা মাংস খাচ্ছেন। এ-অবস্থায় ছবি ওঠাতে অবশ্যই আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু হুকুম সিং সঙ্গে থাকায় কেউ আর প্রতিবাদ করলো না! রামুকাকু মনের সুখে ছবি তুললেন।

ট্যাক্সিতে চড়ে বড়বাজার সত্যনারায়ণ পার্কের দিকে যেতে-যেতে রামুকাকু বললেন, "এইসব দোকান হলো কলকাতার অমূল্য-সম্পদ। এক-আধখানা ঐতিহাসিক মনুমেন্ট থাকলো আর না থাকলো, কিন্তু ভীমনাগ, গাঙ্গুরাম, পুঁটিরাম, তেওয়ারি, গুপ্ত, শর্মা ছাড়া শহর কল্পনাই করা যায় না।"

হরিময়বাবু উৎসাহ পেয়ে বললেন, "নোনতার দিকটাই বা বাদ দিচ্ছ কেন—নানকিং, নিজাম, চাংওয়া, চাচা, রয়াল। আস্বাদের দিকেই বলো আর গন্ধের দিকেই বলো প্রত্যেকটি দোকানের এক একটি বৈশিষ্ট্য। চোখ বেঁধে দিলেও স্রেফ গন্ধ শুঁকে হাজার-হাজার লোক বলে দেবে কোন দোকানে নিয়ে এসেছো।"

মিস্টার আয়ার এই সময় বলে ফেলেছিলেন, "দুর্গন্ধের শহর বলেই লোকে কলকাতাকে জানে—কিন্তু এমন সুগন্ধ পৃথিবীর আর কোথায় আছে?"

বড়বাজারে তেওয়ারির দোকানে তখন শোনপাপড়ি বিক্রি হচ্ছে। ভিড়, ঠেলে সেখানে ট্যাক্সি নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু হুকুম সিংয়ের ভয়ে ট্যাক্সিওয়ালা অসাধ্য সাধন করলো। শোনপাপড়ি খেতে-খেতে ওখানেও ছবি তোলা হলো। তারপর চিৎপুরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি এবং নেপাল হালুইকরের দোকানের মধ্যে ওঁরা নেপালের দোকানই নির্বাচন করলেন।

হরিময়বাবু পিকলুকে বললেন, "ভাবছি, ভাইপোকে একটা অনুরোধ করবো। চমচমের স্পেশাল সংখ্যার জন্যে কলকাতার একটা স্পেশাল খাদ্যম্যাপ করে দিতে—কোথায় কোন রাস্তায় কী বিখ্যাত খাবারের দোকান আছে। শুধু তাই দেখানো থাকবে।" উৎসাহের সঙ্গে হরিময়বাবু বলেছিলেন, "ভাবা যায় না, কী হবে! প্রকাশের পনেরো মিনিটের মধ্যে সমস্ত চমচম যদি নিঃশেষিত না হয় তা হলে পত্রিকা সম্পাদনা ছেড়ে দেবো।"

সারাদিন ঘুরে-ঘুরে পিকলুর ঘুম পাচ্ছে। বাকি গল্প পরের দিন শোনা যাবে। পিকলু নিজের ঘরে যাবার আগে গম্ভীর হয়ে গেলো। বললো, "দাদু, সমস্ত ছবিই তো এই তাৎক্ষণিক ক্যামেরার তোলা। কী সুন্দর রঙিন সব ছবি। কিন্তু...."

"কিন্তু কেন? বলেই ফেলো", ভবনাথ নাতিকে সাহস দিলেন।

পিকলু বললো, "চাংওয়ার ছবিটি আমার একবার হাতে নিয়েছিলাম আমার

মনে হলো, ছবিটার গা থেকে ভুরভুর করে চিকেন ফ্রায়েড রাইসের গন্ধ ছাড়ছে।"

"হুকুম সিং বা হরিময়বাবু লক্ষ্য করেননি?"

"ওঁরা করবেন কোথা থেকে? ওরা তো সর্দিতে হাঁসফাঁস করছেন।"

পিকলু ঘরে চলে যাচ্ছিলো। এমন সময় ভবনাথ ডাকলেন, "পিকলু।"

পিকলু দাদুর কাছে ফিরে এলো। দাদু জিজ্ঞেস করলেন, "তোদের দলে কার-কার সর্দি হয়েছে?"

পিকলু হিসেব করে বললো, "আমি এবং মিস্টার আয়ার ছাড়া সবার। এমন কী রামুকাকুরও।"

দাদু বললেন, "এই সিঙ্গারাভেলুর কোনো বিশেষত্ব তোর নজরে পড়েছে?"

পিকলু হেসে ফেললো। বললো, "নাকে এবং কানে অজস্র চুল। ঠিক যেন বন হয়ে আছে।"

ঠাকুমা বললেন, "ছিঃ, পিকলু, লোকের শরীর নিয়ে ও-ধরনের কথাবার্তা বলতে নেই। ভগবান যাকে যা দিয়েছেন।"

পিকলুকে নিয়ে ওর ঠাকুমা ঘুমোতে চলে গেলেন। কিন্তু ভবনাথের চোখে ঘুম নেই। গল্পের প্লট এখনও দানা বাঁধেনি। ইতিমধ্যে নতুন উপসর্গ জুটেছে। পিকলুর প্রথম কলকাতা ভ্রমণের ছবিগুলো ওঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে।

আলো নিভিতে চোখ বন্ধ করলেন ভবনাথ—কিন্তু গন্ধ আর সর্দি, সর্দি আর গন্ধ—কথা দুটো ওঁর মাথার মধ্যে বরাবর দপদপ করে যেন নিয়ন আলোতে জ্বলে উঠছে আর নিভে যাচ্ছে।

অন্য দিনের থেকে অনেক আগেই পিকলু ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। আজ যে সকাল থেকে ঘুরে বেড়াবার প্রোগ্রাম। হুকুম সিংও আসছে। লালবাজারের দাদু প্রথমে ওকে দ্বিতীয় দিনের জন্যে ছাড়তে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু পিকলু টেলিফোনে এমনভাবে আব্দার করলো যে, তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

পিকলু দেখলো এ-বাড়ির দাদু-অনেক আগেই উঠে পড়েছেন! কলম ও নোটবই নিয়ে তিনি কী সব হিজিবিজি দাগ কাটছেন। অঙ্ক মেলাতে না-পারলে পিকলু অনেক সময় ঐভাবে খাতায় দাগ কাটে।

দাদু জিজ্ঞেস করলেন, "পিকলু, তুমি নিজের ক্যামরায় গতকাল ক'খানা ছবি তুলেছো?"

পিকলু বললো, "ফিল্ম শেষ। এয়ারপোর্টে ওই বিরাট কুস্তিগীর সায়েব থেকে আরম্ভ করে, মিঃ আয়ার, রামুকাকু, হরিময়দাদু সবার ছবি তুলেছি।"

দাদু বললেন, ‘‘তা হলে এখনই গুইন স্টুডিওতে ওয়াশিং এবং প্রিন্টিংয়ের জন্যে পাঠিয়ে দেওয়া যাক।’’

বাড়ির চাকর ভজুকে ডাকলেন ভবনাথ। ভজু এর আগেরবার ছবি নিয়ে বিপদ বাধিয়েছিল। ওয়াশিং শুনে ফিল্মটা সোজা গণেশ ডাইংক্লিনিং-এ দিয়ে এসেছিল। পিকলু বললো, ‘‘গুইন স্টুডিও। আজ বিকেলই প্রিন্ট চাই।’’

কিন্তু ক্যামেরা খুলে ফিল্ম বের করতে গিয়ে পিকলু আর্তনাদ করে উঠলো। ক্যামেরার মধ্যে কোনো ফিল্ম নেই।

‘‘ফিল্ম পুরেছিলিস তো?’’ ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

দুদিন আগে পিকলু নিজের হাতে ক্যামেরা লোড করেছে। ঠাকুমা এসে সান্ত্বনা দিলেন, ‘‘মন খারাপ কোরো না, এখনই দুটো ফিল্ম আনিয়ে দিচ্ছি।’’

বেবি ব্রাউনি ক্যামেরারয় সুন্দর-সুন্দর কত ছবি তুলেছিল পিকলু—সব নষ্ট হয়ে গেলো।

ভবনাথ গম্ভীর হয়ে জানতে চাইলেন, ‘‘ক্যামেরাটা কোথায় রেখেছিলে?’’

সকাল থেকেই পিকলু ক্যামেরাটা একেবারেই হাতছাড়া করেনি।

‘‘ভাল করে ভেবে দ্যাখো,’’ ভবনাথ বললেন।

‘‘সত্যি একবারও হাতছাড়া করিনি’’—শুধু সন্ধেবেলায় ফেরবার পথে কর্নওয়ালিস হোটেলে একবার টয়লেটে যেতে হয়েছিল পিকলুকে। তখন ক্যামেরাটা কয়েক মিনিটের জন্যে বাইরে রেখেছিল।

ভবনাথ ওঁর নোটবইতে দু-একটা হিজিবিজি টানলেন। বললেন, ‘‘পিকলু, তুমি একবার তিনতলার ফ্ল্যাট থেকে প্রফেসর মিহির সেনকে ডাকবে?’’ অন্য সময় হলে ভবনাথ নিজেই যেতেন, কিন্তু গতকালের পদস্খলনের ফলে পা-টা বেশ ফুলে উঠেছে, হাঁটা-চলার উপায় নেই।

মিহির সেনকে নিয়ে পিকলু পাঁচ মিনিটেই ফিরে এলো। সাহিত্যিক ভবনাথ নিজেই ডেকেছেন শুনে মিহিরবাবু খুব খুশি। এই মিহিরবাবুই একবার রাস্তায় ভবনাথকে বলেছিলেন, সর্দি সম্বন্ধে একখানা উপন্যাস লিখুন। ব্যাপারটা হাস্যকর, কিন্তু যে-হেতু মিহিরবাবু সর্দি-সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণায় লেগে রয়েছেন, সে-হেতু তাঁর হাসি আসে না। বেথেসডা সর্দি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সাড়ে তিন বছর কাজ করেছেন প্রফেসর সেন।

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘আচ্ছা মিহিরবাবু, জলে ভিজলে কতক্ষণ পরে সর্দি হয়?’’

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে প্রফেসর মিহির সেন বললেন, "একদম বাজে কথা—ঠাণ্ডা এবং জলে ভেজার সঙ্গে সর্দির কোনো সম্পর্কে নেই।"

"অ্যাঁ! ঠাকুমা বিশ্বাস করলেন না মিহির সেনকে। বললেন, চিরকাল শুনে আসছি, ভিজে জামাকাপড় পরে থাকলে সর্দি হয়।"

মিহির সেন জোরের সঙ্গে বললেন, "মোটেই ঠিক নয়। পৃথিবীর বড়-বড় সর্দি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে ঠাণ্ডা লাগিয়ে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা লোককে ভিজে মোজা পরিয়ে দেখা হয়েছে—একটুও সর্দি হয়নি। সর্দি হয় ভাইরাস থেকে। ভাইরাস সংক্রান্ত যে বিজ্ঞান তার নাম ভাইরোলজি।"

ভাইরাস কথাটা পিকলু শুনেছে বটে।

মিহিরবাবু বললেন, "অতি ক্ষুদে জিনিস এই ভাইরাস—অর্ডিনারি অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখাই যায় না। ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপে দেখাও অনেক সাধ্যসাধনের ব্যাপার। এক ইঞ্চি লম্বা জায়গায় কতগুলো সর্দির ভাইরাস লাইন দিতে পারে জানেন?"

পিকলু আন্দাজ করে নিয়ে বললো, "একশো-দেড়শো হবে।"

মিহির সেন চোখ বড়-বড় করে বললেন, "পঞ্চাশ হাজার। আমরা বলি জিরো পয়েন্ট ফাইভ মাইক্রন।"

মিহির সেন ভবনাথকে রিকোয়েস্ট করলেন, "করাইজা সম্বন্ধে একখানা উপন্যাস লিখুন। বছরে একশো কোটি টাকার বেশি জাতীয় লোকসান হয় এর থেকে, আমরা হিসেব করে দেখেছি। আমেরিকার বছরে ক্ষতি হয় ২৪০০০ কোটি টাকা।

"করাইজা আবার কী?'

মিহিল সেন বললেন, "ওহো! সাধারণ সর্দির ওইটাই বৈজ্ঞানিক নাম—আগে বলতো নেজাল ক্যাটার।" মিহির সেন আরও ব্যাখ্যা করলেন, "বছরে শতকরা পঁচাত্তর জন লোকের অন্তত একবার সর্দি হয়, আর শতকরা পাঁচজন জন লোকের অন্তত চার-পাঁচবার ·

এই সময় হরিময়দাদু গরম সোয়েটার পরে মাফলার জড়িয়ে ঘরে ঢুকলেন। গরম কালেও এরকম অদ্ভুত ড্রেস দেখে হাসি আসছে পিকলুর। কিন্তু হরিময়বাবুর মুখটা খুব করুণ হয়ে আছে।

মিহির সেনের কথা শুনে হরিময়বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, "তা হলে চমচম পত্রিকার একখানা করাইজা সংখ্যা বের করা যাক। সেই সঙ্গে ভবনাথ সেনের বিশেষ উপন্যাস 'সর্দি থেকে সাবধান'।"

কথা বলতে-বলতে হেঁচে উঠলেন হরিময়বাবু। হাঁচির ধাক্কা সামলে তিনি করুণভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "সর্দি কী করে হয়?"

মিহির সেন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বললেন, "সর্দি প্রচারের সবচেয়ে সহজ উপায় হাঁচি। ছোট ছেলেরা আবার বড়দের থেকে অনেক বেশি সর্দি প্রচার করে। সর্দিওলা লোকের খুব কাছে গেলেও সর্দি হতে পারে।" এই বলে তিনি হরিময়বাবুর কাছ থেকে একটু দূরে সরে গেলেন।

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "সর্দির ভাইরাস কি দেহের বাইরে বাঁচে না?"

মিহির সেন বললেন,"বাঁচে না। তবে মাইনাস ৭৬° সেন্টিগ্রেডে ড্রাই-বরফের মধ্যে এক বছরের জন্যে সর্দি ভাইরাস রাখা যায়। অনেক দেশে মিলিটারিরা সর্দি নিয়ে গবেষণা করছে। যুদ্ধের সময় শত্রুসৈন্যের মধ্যে সর্দি ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে।"

হরিময়বাবু আঁতকে উঠলেন। "ঠিকই তো। রণক্ষেত্রে সৈন্যরা হাঁচি সামলাবে না কামান বন্দুক ছুঁড়বে! আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝছি—কাল থেকে। অথচ এতোদিন আমার কখনও সর্দি হয়নি।"

মিহির সেন বললেন, "মানুষ এবং শিম্পাঞ্জি ছাড়া অন্য কোনো জীবের সর্দি হয় না।"

"এতোক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পেলাম।" রুমালে নাক মুছতে-মুছতে হরিময়বাবু বললেন, "ইস্কুলে কালীমাস্টার আমাকে যে গাধা বলতেন সেটা তা হলে কিছুতেই সত্যি নয়।"

ভবনাথ ততক্ষণ জানতে চাইছেন, "সর্দির ভাইরাস শরীরে ঢুকবার পরে সর্দি প্রকাশ হতে কত সময় লাগে?"

'ইনকিউবেশন পিরিয়ড বলছেন?" মিহির সেন হেসে উত্তর দিলেন, "প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা। তবে শুনেছি, দু-চার জায়গায় এদের আরও তাড়াতাড়ি 'মানুষ' করবার চেষ্টা চলছে।"

"তাতে লাভ?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"লাভ বলে লাভ," অধ্যাপক মিহির সেন উত্তর দিলেন। "বিশেষ করে সর্দিকে যেখানে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে সেখানে হাতে-হাতে ফল পেলে খুব লাভ।"

হরিময়বাবু করুণ ভাবে আবেদন করলেন, "সর্দির নাড়ি-নক্ষত্র তো আপনি জেনে বসে আছেন। সর্দি সারে কী করে একটু যদি বলে দেন। আমি খুবই 'সাফার' করছি।"

মিহিরবাবু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "এখনও পর্যন্ত সর্দির কোনো চিকিৎসা বেরোয়নি। ওই যে চুপচাপ বিছানায় শুনে থাকতে বলে তার কারণ যাতে অন্য লোকের মধ্যে রোগটা না-ছড়ায়। বড়িই বলুন, মালিশই বলুন, নাকের ড্রপই বলুন—এসবে সাময়িক কষ্ট লাঘব হয়, কিন্তু সর্দি সারে না। কড়া ডোজের ওষুধে অনেক সময় ক্ষতি হয়—সর্দি আরও বেড়ে যায়।"

"কেন?" নাকে ওষুধ ঢালতে গিয়ে হরিময়বাবু থমকে দাঁড়ালেন।

মিহিরবাবু বললেন, "সিলিয়াব সর্বনাশ হয় ওষুধে। নাকের মধ্যে যে ছোট-ছোট চুল থাকে তার নাম সিলিয়া। নাকের সর্দি আটকায়।"

চোখ দুটো বড়-বড় করলেন হরিময়বাবু। "নাকের চুল থাকলে আজ আমাকে এই কষ্ট পেতে হতো না।"

মিহিরবাবু চলে গেলেন। ভবনাথ এবার হরিময়কে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের ওই সিঙ্গাবাভেলুব নাকেব চুলগুলো কি খুব বড়?"

একমুহূর্তে ভেবে নিয়ে হরিময়বাবু বললে, "ঠিকই! আপনি জানলেন কী করে? চোখে র‍্যাডার যন্ত্র লাগিয়ে নিয়েছেন নাকি? বাড়িতে বসে-বসেই সব দেখতে পাচ্ছেন!"

হরিময়বাবুকে পিকলুর ক্যামেরাব ফিল্ম উধাও হবার ঘটনা বললেন ভবনাথ। হরিময়বাবু রীতিমতো আশ্চর্য হলেন। বললেন, "ভৌতিক ব্যাপার মনে হচ্ছে! কালকে আমার ভাইপো একখানা ছবি উপহার দিয়েছিল। ওই আশ্চর্য ক্যামেরায় ছবিটা তুললো নিজামের কাঠি কাবাবের দোকানের সামনে। ছবিখানা আমি ডায়েরির মধ্যে রেখেছিলাম। কিন্তু বাড়িতে এসে সহ-সম্পাদককে ছবি দেখাতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ছবি উধাও।"

ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন, "আর কিছু স্পেশাল ঘটেছে গতকাল?"

হরিময়বাবু টাক আর মাথা চুলকোতে লাগলেন। তারপর উত্তর দিলেন, "বুড়ো মানুষ তো। রামুর স্পেশাল ক্যামেরাখানা আমার হাতে ছিল। গপ্পো করতে-করতে ক্যামেরাখানা নিয়েই আমি হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েছি। ব্যাপারটা খেয়াল হলো মিনিবাস থেকে নামবার সময়। তা ভাবলাম, আজ সকালেই তো দেখা হচ্ছে। তখন দিয়ে দেবো'খন।"

"দেখি একবার ক্যামেরাখানা," ভবনাথ বললেন।

হরিময় দুঃখের সঙ্গে বললেন, "সে-গুড়ে বালি। বাড়িতে পৌঁছবার ঘণ্টা তিনেক পরে একটা ট্যাক্সি নিয়ে মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার হাজির। ক্যামেরাটা তখনই নিয়ে গেলেন।"

"একলা এসেছিলেন?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

'ট্যাক্সিতে বসেছিলেন সেই বিরাট কুস্তিগীর সাহেব। তিনি ভিতরেও ঢুকলেন না। হাজার হোক, ভাইপোর বন্ধু। আমি কতবার রিকোয়েস্ট করলাম, ঘরে বসে একটু ঘোল খেয়ে যান। কিন্তু ওঁদের নাকি কর্নওয়ালিস হোটেলেই ডিনার পার্টি আছে—দু-একজন অতিথি আসছেন।"

"আপনার ঘড়িতে তখন ক'টা?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

হরিময়বাবু বললেন, "আপনার মতো আমি সবসময় ঘড়ি ধরে কাজ করি না। তবে অন্তত রাত পৌনে এগারোটা।"

ভবনাথ বললেন, "ওঁরা কর্নওয়ালিস হোটেলে আছেন তো? মিসেস এসকুইথ যে হোটেলটা চালান?"

হরিময়বাবু অত খবর রাখেন না। ভবনাথ এবার ওঁর খাতায় কী সব হিজিবিজি টানলেন।

পিকলু ইতিমধ্যে কলকাতা-ভ্রমণের জন্যে রেডি হয়েছে। মাথায় একটা চমৎকার রুশী টুপি পরেছে পিকলু। যা সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে!

পিকলুর ঠাকুমা এই সময় ঘরে ঢুকে স্বামীকে বকুনি লাগালেন। "তোমার সব বাজে-বাজে কোশ্চেন রাখো। হরিময়বাবু, আপনি তো একলা মানুষ। আদ্দিন পরে ভাইপো ফিরলো, তাকে নিশ্চয় খাওয়াতে ইচ্ছে করছে?"

হরিময়বাবু বুঝতে পারছেন, পিকলুর ঠাকুরমা কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন। তিনি একটু হাসলেন।

ঠাকুমা বললেন, "আজ রাত্রে আপনারা সবাই এখানে খাবেন।"

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, "রামুকাকুর বন্ধু, মিস্টার আয়ার?"

দিদিমা বললেন "ওঁকেও বলবেন!"

হরিময়বাবু অনুবোধ করলেন, "যদি সম্ভব হয়, একটু পোস্ত-চচ্চড়ি করবেন। আমার ভাইপোটি খুব খেতে ভালবাসতো, কিন্তু ক্যালকাটার কোনো হোটেলে পোস্ত-চচ্চড়ি পাওয়া গেলো না।"

ভবনাথ সেন এখন আবার গড়গড়ার নল ধরে টানতে শুরু করেছেন। হুকুম সিংও হাজির হয়েছে।

হরিময়বাবু বললেন, "মিস্টার আয়ারের ইচ্ছে আজ প্রথমেই ধাপা এবং ট্যাংরা ঘুরে আসবেন। এগুলো কি দেখবার জায়গা! দুর্গন্ধ!"

ভবনাথ বললেন, "যেখানেই যাও, যদি পারো, দুপুরে খাবার সময় একবার ফিরে এসো।"

পিকলু বললো, "লাঞ্চের সময় আমরা কোথায় থাকবো. কিছুই ঠিক নেই।"

"যদি না আসো, তাহলে একটা ফোন করে দিও," ভবনাথ সেন নাতিকে অনুরোধ করলেন।

পিকলুর ঠাকুমা অবাক হয়ে গেলেন। কর্তার আজ হলো কী, নাতির সঙ্গে এত সময় খরচ করছেন।

পিকলুরা বেরোবার সময় হঠাৎ ভবনাথ সেন জিজ্ঞেস করলেন, "পিকলু, ফটোগ্রাফি কে আবিষ্কার করেছিলেন?"

কুইজ মাস্টার জেনারেল পিকলুর এসব উত্তর মুখস্থ। হরিময়বাবুকে অবাক করে দিয়ে পিকলু বললো, "দুজন ফরাসি গত শতাব্দীতে। একজনের নাম ডি-নিপ্‌সে। আর একজনের নাম ডাগুরে।"

"আঃ। কী সব নামের ছিরি। অমন সব গুণী লোকের বাপ-মা ছেলের একটা ভদ্র নাম খুঁজে পেলো না!" বিরক্তি প্রকাশ করলেন হরিময়বাবু।

ভবনাথ বললেন, "কাছাকাছি ঐ সময়ে একজন ইংরেজও খুব দামী কাজ করেছিল।"

পিকলু চটপট বললো, "ফক্স ট্যালবট। তাঁর মাথায় হরিময়দাদুর মতো টাক ছিল—বুক অব নলেজে টাকের ছবি দেখেছি।"

নাতির সাধারণ জ্ঞানের বহর দেখে খুব খুশি হলেন ভবনাথ। হরিময়বাবুও খুশি, তবে অন্য কারণে। তিনি বললেন, "তাহলেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, টাক জিনিসটা হাসাহাসির ব্যাপার নয়—বড়-বড় লোকের মাথাতেই টাক পড়ে। কী বলো হুকুম সিং?"

হুকুম সিং বেচারা কী করে! খোদ ডি-সি সায়েবের মাথাতেও টাক আছে। সুতরাং সে সঙ্গে-সঙ্গে হরিময়বাবুর কথায় সায় দিলো।

"হ্যালো, লালবাজার পুলিশ স্টেশন?" ভবনাথ টেলিফোনে কথা বলছেন।

বেয়াই মশায়ের গলার স্বর শুনে ওদিক থেকে পুলিশের মস্ত অফিসার এবং পিকলুর মায়ের বাবা মিস্টার রঞ্জন সেন খুব খুশি হলেন।

পিকলু ইতিমধ্যেই বেড়াতে বেরিয়ে গিয়েছে শুনে মিস্টার সেন আরও খুশি হলেন। বললেন, "গতকালই রাত্রে একবার ওখানে যাবো ভাবছিলাম।"

'এলেন না কেন?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"আসবো কী করে! বেরুতে যাচ্ছি, সেই সময় বিদেশ থেকে খবর এলো কয়েকটা খারাপ লোকের কলকাতায় আসার সম্ভাবনা রয়েছে।" সেই নিয়ে

খুবই ব্যস্ত রয়েছেন পিকলুর ছোট দাদু। বিদেশী খারাপ লোকেরা দেশের কী ক্ষতি করে যাবে কিছুই ঠিক নেই।

পিকলুর ছোট দাদু চমচমের বিজ্ঞাপনও দেখেছেন। সন্দেহ করছেন লেখাটা ভবনাথের। জিজ্ঞেস করলেন, "আপনিই কি এবার আমাদের 'খারাপ লোকের খপ্পরে' পড়াচ্ছেন?"

হা-হা করে হেসে উঠলেন, ভবনাথ। তারপর বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন, বললেন, "পোস্টার পড়ে গেলো—কিন্তু এখনও একটা লাইন লেখা হলো না।"

রঞ্জন সেন বললেন, "আপনার কোনো চিন্তা নেই। খারাপ চরিত্রের অভাব হবে না। আমাদের পুলিশ লাইনে বলে, লোক তিন রকম। কম খারাপ, বেশি খারাপ এবং একেবারে খারাপ! এর বাইরে আর লোক হয় না।"

কথাটা দ্রুত নোটবইতে লিখে নিলেন ভবনাথ। তারপর রঞ্জন সেনকে একবার দেখা করতে অনুরোধ করলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "যদি পারি, দুপুরে কোনো সময়ে টুক করে ঘুরে আসবো। বিদেশের গোপন মেসেজ না-পেলে আজ বেশ একটু হাল্কা মেজাজে গপ্পো করা যেতো।"

ভবনাথ বললেন, "দুপুরে আসুন, না-আসুন, রাত্রে খেতে আসতেই হবে। গিন্নীর হুকুম। পিকলুর দিদিমাকেও সঙ্গে আনবেন।"

মেয়ের শাশুড়ীকে রাগাবার মতো সাহস নেই মিস্টার সেনের। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন।

ভবনাথ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন. "ফটোগ্রাফির ব্যাপারে পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে এসব খোঁজখবর রাখে এমন কোনো লোককে আপনি জানেন?"

মিস্টার সেন বললেন, "আমার ভাইপো সুখেন্দু রয়েছে। জার্মান ক্যামেরা কোম্পানিতে কাজ করে। দু'সপ্তাহের ছুটি কাটাতে এখানে এসেছে। ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবো'খন।"

এরপর কর্নওয়ালিস হোটেলে ফোন করলেন ভবনাথ। বললেন, "আপনাদের হোটেলে রাত এগারোটার সময় একটা পার্টি দিতে চাই।"

ওরা বললো, "অন্য হোটেলে চেষ্টা করুন। এ-হোটেলে রাত দশটার মধ্যে ডাইনিং হল্ বন্ধ হয়ে যায়।"

কর্নওয়ালিস হোটেলে রামানুজকাকু ও মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার পিকলুদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

হুকুম সিংয়ের সেলাম পেয়ে মিস্টার আয়ার যে খুব খুশি হলেন, তা পিকলু লক্ষ্য

করলো। খুশি হবারই কথা—পৃথিবীতে ক'টা লোকই বা পুলিশের সেলাম পাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে? পিকলু নিজেও তো বোম্বাইতে পুলিশ দেখলে ভয় পেতো। এবারেই লালবাজারে দাদুর কাছে কয়েকদিন থেকে তার ভয় ভেঙেছে।

পিকলু দেখলো সেই দশাসই সায়েব হোটেলে লাউঞ্জে বসে আছেন। ভদ্রলোক লক্ষ্য করছেন, এদের দলে সবাই বারবার রুমাল বের করে নাক মুছছে। রামানুজকাকুও সর্দিতে ছটফট করছেন। সায়েব হঠাৎ পিকলুকে বললেন, "ভেরি ব্যাড প্লেস! এখানে আসা মাত্রই সবার সর্দি হয়।"

বম্বের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও কলকাতার বদনাম পিকলুর ভাল লাগলো না। সে প্রতিবাদ করলো, "কই? আমার তো হয়নি?"

সায়েব হেসে বললেন, "আই অ্যাম স্যরি। তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

এরপর ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে সেই স্প্রের শিশিটি বের করলেন। এবং মজা করে পিকলুর গাছে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে স্প্রে করলেন। কী সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। আঃ! পিকলু মুহূর্তের জন্য আনন্দে চোখ বন্ধ করলো।

ট্যাক্সির খোঁজে ওরা একসঙ্গে চৌরঙ্গীর দিকে বেরিয়ে পড়লো। পিকলু একবার হোটেলের টয়লেটে গিয়েছিল। টয়লেট থেকে বেরিয়ে দেখলো, মিস্টার আয়ার একটা ছবির প্যাকেট টেবিলে ফেলে গিয়েছেন। গতকালের তোলা ছবিগুলো মনে হচ্ছে। আলাদা-আলাদা স্বচ্ছ পলিথিন খামে রঙিন ছবিগুলো রয়েছে। ছবিগুলো সে দেখছে, দেখতে দেখতে কেবলই সে অবাক হয়ে যাচ্ছে। মিস্টার আয়ার হঠাৎ ফিরে এসে ছোঁ মেরে প্যাকেটটা পিকলুর হাত থেকে নিয়ে নিলেন। বললেন, "মিস্টার পিকলু, চলুন—সবাই আপনার জন্যে ট্যাক্সিতে অপেক্ষা করছে।"

টিফিন টাইমে পিকলুরা বাড়ি ফিরতে পারলো না। ট্যাংবা পুলিশ-ফাঁড়ি থেকে হুকুম সিং ফোনে পিকলুর সঙ্গে ভবনাথের যোগাযোগ করিয়ে দিলো। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পরে ভবনাথ চিন্তিত মুখে ফোন নামিয়ে দিলেন।

পিকলুর ঠাকুমা বললেন, "ওরা তো বেশ হৈ-চৈ করছে। তুমি হঠাৎ বাংলা পাঁচের মতো মুখ করলে কেন?"

ভবনাথ আসল কারণটা বললেন না। মেয়েরা অল্পেতেই ভয় পেয়ে যায়। তাছাড়া পিকলু টেলিফোনেই কয়েকবার প্রচণ্ড জোরে হেঁচেছে।

ভবনাথ নিজের নোটবইটা নিয়ে আবার কী সব লিখতে লাগলেন। 'পিকলু বলেছে, আজ সকালে সায়েব তাঁর গায়ে সেন্ট স্প্রে করেছেন। দু নম্বর, পিকলু

বলেছে, দাদু তুমি বিশ্বাস করবে না, আমার মনে মনে হলো দিলখুশ কেবিনের ছবিটা থেকে কবিরাজী চিকেন কাটলেটের গন্ধ বেরুচ্ছে।

ভবনাথ নিশ্চয়ই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতেন না। কিন্তু পিকলুর একটা গুণ—কখনও বানিয়ে কিছু বলে না। তা ছাড়া, বাগবাজার স্ট্রিটের একটা ছবি থেকে খাঁটি সরষের তেলের গন্ধ পেয়েছে পিকলু। ছবিটা তোলা হয়েছিল একটা বেগুনি ফুলুরির দোকানের সামনে।

দুপুরে ভাত খাবার একটু পরেই পিকলুর ছোট দাদু রঞ্জন সেন রেডিও-টেলিফোনওয়ালা জিপ নিয়ে ভবনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সঙ্গে ক্যামেরাবিশারদ ভাইপো সুখেন্দু।

রঞ্জন সেন যে দু'মিনিট গপ্পো করবেন তার উপায় নেই। রেডিও-টেলিফোনে দু-দুবার চার্লি পিটারের ডাক এলো। মিঃ সেন বললেন, "আর পারা যায় না। দেশের যা অবস্থা। আমাদের দেশ এগিয়ে যাক এটা অনেক দেশ চায় না। তারা সব সময় ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছে, কী করে আমাদের ক্ষতি করা যায়। আমাদের কাজও তাই বেড়ে যাচ্ছে। গতকাল থেকে গোপন মেসেজ পেয়ে সমস্ত জায়গা তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করছি।"

"বাইরের লোকরা আর কী করতে পারে?" ভবনাথ জিজ্ঞেস করলেন।

"পারে না এমন কাজ নেই। এরা আগুন লাগাতে পারে, পয়সা খরচ করে রায়ট বাধাতে পারে, হাওড়া ব্রীজের ক্ষতি করতে পারে, ট্রেন উল্টোতে পারে, ইলেকট্রিক পাওয়ার স্টেশন খারাপ করে দিতে পারে।"

আরও কথা হতো। কিন্তু রেডিও-টেলিফোনে আবার পিকলুর দাদুর ডাক পড়লো। তিনি বললেন, "সুখেন্দু, তুমি গপ্পো করো—আমি মিনিট পনেরোর মধ্যেই একবার ঘুরে আসছি।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুবাবুকে বললেন, "ফটোগ্রাফির ব্যাপারটা আমি একটু জানতে চাই।"

সুখেন্দু বললো, "মাত্র দেড়শো বছরের মধ্যে এই বিদ্যেটির যা উন্নতি হয়েছে, ভাবা যায় না। ১৮২২ সালে নিপ্‌সে প্রথমে ফটো তুললেন। তারপর ডাগুরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আবিষ্কার হলো ডাগুরে পদ্ধতি। বাজারে প্রথমে ক্যামেরা ছাড়লেন জিরো সায়েব ১৮৩৯ সালে। ১৮৪১ সালে ট্যালবট সায়েব তো ক্যালোটাইপ বের করলেন। তারপর থেকে হুড়-হুড় করে উন্নতি। ১৮৭১ সালে ম্যাডকস সায়েব বের করলেন ড্রাইপ্লেট প্রসেস। তারপর ১৮৮৮ সালে জর্জ ইস্টম্যান বের করলেন রোল ফিল্ম এবং কোডাক ক্যামেরা। এই কোডাক

ক্যামেরা থেকেই অবিশ্বাস্য প্রগতি।"

ভবনাথ তাড়াতাড়ি লিখতে লাগলেন : "ফিল্মের পিছনে কালো কাগজ লাগানোর ব্যবস্থা হলো ১৮৯৪ সালে যাতে দিনের আলোতে ক্যামেরায় ফিল্ম ঢোকানো যায়। বিখ্যাত বেবি ব্রাউনি ক্যামেরা বেরুলো ১৯০০ সালে।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুর মুখের দিকে তাকালেন। সুখেন্দু বললো, "প্রথম রঙিন ছবি তুললেন লিপম্যান ১৮৯১ সালে। তারপর এই ১৯৪৭ সালে বেরুলো বিখ্যাত পোলারয়েড ক্যামেরা—বোতাম টেপার এক মিনিটের মধ্যে ছবি ছেপে ক্যামেরার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে। প্রথমে ছিল কেবল সাদা-কালো ছবি, তারপর, বেরুলো রঙিন ছবি। এক মিনিট সময় কমে এখন হয়েছে দশ সেকেন্ড।"

ভবনাথ বুঝলেন, এই রকম ক্যামেরাতেই গতকাল পিকলুর ছবি তোলা হয়েছে।

"এরপর কী?" প্রশ্ন করলেন ভবনাথ।

সুখেন্দু বললেন, "এখন সবই সম্ভব। ত্রিস্তর ছবির ওপরে কাজ হচ্ছে। আরও কী হতে পারে ভগবান জানেন।"

ভবনাথ এবার সুখেন্দুর কানে-কানে কী এক প্রশ্ন করলেন। প্রশ্ন শোনামাত্রই সুখেন্দু চমকে উঠলো। "আপনি জানলেন কী করে? হায়েস্ট মিলিটারি ডিপার্টমেন্টে এরকম একটা চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু যতদূর জানি এখনও সফল হয়নি।"

ভবনাথ কিছুই বললেন না। সুখেন্দু ভাবলো, সাহিত্যিক মানুষ—মাথায় কখনও-কখনও অদ্ভুত খেয়াল চাপে।

একটু পরেই রঞ্জন সেন তাঁর জিপগাড়িতে চড়ে ভবনাথের বাড়িতে ফিরে এলেন। ভবনাথ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁকে ঘরের এক কোণে ডেকে নিয়ে গেলেন।

ওঁদের গোপন কথাবার্তা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলছে। পিকলুর ঠাকুমা দূর থেকে ওই দৃশ্য দেখে হেসে ফেললেন। "দুই বেয়ারে কী এতো গোপন কথা হচ্ছে?"

পিকলুর ঠাকুমা চায়ের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রঞ্জন সেন বললেন, "আমাকে এখনই ছুটতে হবে—এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান।"

পিকলুর ঠাকুমা একটু বিরক্তই হলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "রাগ করবেন না, রাত্রে তো স-গিন্নী আসছিই!"

মাঝখান থেকে সুখেন্দুরও চা খাওয়া হলো না। সেও কাকাবাবুর গাড়িতে ফিরে গেলো।

সন্ধে সাড়ে-সাতটার সময় পিকলু ও হরিময়বাবু ফিরলো হুকুম সিংয়ের সঙ্গে।

হরিময়বাবুর মুখ চুন। তাঁর ভাইপোর তোলা সমস্ত ছবি চুরি হয়ে গিয়েছে। "বিদেশীদের কাছে কলকাতার কোনো মানসম্মান রইলো না," দুঃখ করলেন হরিময়বাবু।

ধাপা, ট্যাংরা থেকে শুরু করে বড়বাজারের ময়লা ডিপোর ছবিও তোলা হয়েছিল আজ। দু-একজন পাবলিক আপত্তি তুলতে গিয়েছিল। কিন্তু হুকুম সিং সঙ্গে থাকায় শেষ পর্যন্ত কোনো অসুবিধে হয়নি।

সঙ্গে পুলিশ থাকতেও কী করে ছবি চুরি হলো কেউ বুঝতে পারছে না। হুকুম সিং বললো, "পকেটমার নয়—ছিনতাই। একটা পাগল কোত্থেকে এসে মিস্টার আয়ারের হাত থেকে ছবি নিয়ে ছুট দিলো।"

রামানুজকাকুর মন খারাপ। কিন্তু সবচেয়ে মুষড়ে পড়েছেন মিস্টার আয়ার।

"সামান্য ক'খানা ছবি গিয়েছে তো কী হয়েছে? কাল সকালে আবার ছবি তোলা যাবে।" রামানুজ বলেছিলেন মিস্টার আয়ারকে। কিন্তু ভদ্রলোক এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ট্যাক্সি চড়ে হোটেলে ফিরে গিয়েছেন। বাধ্য হয়ে রামানুজকাকুও হোটেলে গিয়েছেন। একটু পরেই দুজনে একসঙ্গে নেমন্তন্ন খেতে আসবেন।

এতোক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যে হরিময়বাবুর পক্ষে কষ্টকর তা ভবনাথ জানেন। তিনি গিন্নীকে বললেন, "একটু টমাটো জুস দাও।"

টমাটো জুস খেতে-খেতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কেটে গেলো।

খিদেয় হরিময়বাবু ছটফট করছেন। কিন্তু বিশিষ্ট অতিথিদের এখনও দেখা নেই। কর্নওয়ালিস হোটেলে একবার ফোন করা হলো, কিন্তু কোনো খবর পাওয়া গেলো না। ওদের নাম করতেই কে যেন টেলিফোন কেটে দিলো।

পিকলুর দাদুরও দেখা নেই। যদিও লালবাজারের দিদিমা বিকেলবেলাতেই চলে এসেছেন। তিনি সেই থেকে রান্নাঘরে ঠাকুমার সঙ্গে গল্প করছেন। পুলিশ-দাদুর ওপর রেগেমেগে দিদিমা বললেন, "ওঁর স্বভাবই এই। ওঁর সঙ্গে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না এই জন্যে।"

ঠাকুমা এখন কিন্তু রাগ করলেন না। ভবনাথ সম্বন্ধে বললেন, "উনি তো আবার এক কাঠি ওপরে। নেমন্তন্ন করেছে ওঁর টালিগঞ্জের মাসতুতো বোন, উনি ভুল করে আমাকে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন শ্রীরামপুরের মেসোর বাড়িতে।

রাত অনেক হয়েছে। আর অপেক্ষা করা যায় না। পিকলুর ঘুম এসে গিয়েছে।

ভবনাথ কোনো কথা বলছেন না। চিন্তিত হয়ে তিনি ঘন-ঘন ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন।

আর দেরি করা সম্ভব নয়। ওঁরা খেতে বসতে যাচ্ছেন, এমন সময় বাইরে জিপের আওয়াজ হলো।

রঞ্জন সেন হাসিমুখে ঘরে ঢুকে বললেন, "বদমাসগুলোকে অ্যারেস্ট করে হাজতে পুরে আসতে গিয়ে একটু দেরি হয়ে গেলো। পুলিশ কমিশনার, হোম সেক্রেটারি এবং চিফ মিনিস্টারকেও ব্যাপারটা জানাতে হলো। সবাই খুব খুশি—ধন্য-ধন্য পড়ে গিয়েছে। যদিও খবরের কাগজে এখন কিছু বলা চলবে না—কয়েকটা দিন গোপন রাখতে হবে। আরও অ্যারেস্ট হতে পারে।"

হরিময়বাবু কিছুই বুঝতে পারছেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "কাদের অ্যারেস্ট করলেন?"

রঞ্জন সেন বললেন, "শত্রুভাবাপন্ন এক দেশ পাঠিয়েছিল ওই লয়েড এবং সিঙ্গারাভেলুকে উইথ টপ ডিফেন্স প্রোজেক্ট। ওরা নতুন এক টপ সিক্রেট ক্যামেরা বের করেছে স্মেলোমেটিক ০০১। এই ক্যামেরায় ছবি ছাড়াও গন্ধ ধরা পড়ে। বিজ্ঞানের আশ্চর্য এক আবিষ্কার—কিন্তু ব্যাটারা ওই দিয়ে আমাদের শহরের গন্ধ-ম্যাপ তৈরি করে নিচ্ছিল।"

"অ্যাঁ! বলেন কী।" হরিময়বাবুর ফেন্ট হয়ে যাবার অবস্থা। "আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি।"

"বুঝতে পারবে কী করে? তোমার নাক তো সর্দিতে বন্ধ!" আচমকা উত্তর দিলেন ভবনাথ।

রঞ্জন সেন ও ভবনাথ দুজন ফিসফিস করে কথাবার্তা বললেন। তারপর ভবনাথ গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন, "আমি যা ভয় পাচ্ছিলাম—ঠিক তাই। তোমার সর্দিটা সাধারণ সর্দি নয়—ওই দুষ্টু সায়েবটা সঙ্গে করে সর্দির ভাইরাস নিয়ে এসেছিল। স্পেশাল টাইপের ভাইরাস ছড়িয়ে দেবার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রচণ্ড সর্দিতে তোমার নাক বুজে গেলো। তুমি সন্দেহ করতে পারলে না যে, ওরা সিক্রেট ক্যামেরায় গন্ধের ছবি তুলছে। এই সব গন্ধ মারাত্মক কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।"

"অ্যাঁ! আমি যে ভাবলাম সায়েব আমার গায়ে সেন্ট স্প্রে করলো।" হরিময়বাবুর এবার অজ্ঞান হবার অবস্থা।

রঞ্জন সেন বললেন, "সিঙ্গারাভেলু আয়ার ইন্ডিয়ান-সিটিজেন, কিন্তু অনেক দিন দেশের বাইরে স্মাগলিং করছে। এবার এই ক্যামেরার গন্ধ-রঙিন ছবি

তোলবার জন্য বিদেশী শত্রু অনেক টাকা দিয়ে তাকে নিয়োগ করেছে। তবে পালের গোদা ওই লয়েড।''

''আমার ভাইপো! আমার ভাইপো!'' কাতরভাবে কেঁদে উঠলেন হরিময়বাবু। ''বংশের মুখ ডোবালো, সেও এর মধ্যে আছে নাকি?''

রঞ্জন সেন বললেন, ''ও বেচারা নিরপরাধ। কিন্তু একটুর জন্যে বেঁচে গেলো। রামানুজবাবু অর্ডিনারি একটা পোলারয়েড ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলেন—ইচ্ছা, পুরানো স্মৃতিজড়ানো কিছু জায়গার ছবি তোলা। লয়েডের টপ সিক্রেট ক্যামেরাও একেবারে একই রকম দেখতে। ছবিও একই রকম উঠবে—কিন্তু সঙ্গে ধরা পড়বে গন্ধটা। এয়ারপোর্টে পিকলু এবং হরিময়বাবুর কথাবার্তা শুনেই লয়েড ও সিঙ্গারাভেলু কু-মতলবটা আঁটে। ওরা বুঝতে পারে, সঙ্গে হুকুম সিং থাকলে ওদের ছবি তুলতে কোনোরকম অসুবিধে হবে না। যেখানে যা-খুশি ছবি তুলে নিয়ে ওরা আমাদের কলা দেখিয়ে চলে যেতে পারবে। একলা বিদেশীর পক্ষে কলকাতার পথে-ঘাটে ছবি তোলা একটু শক্ত।''

হরিময়বাবুর গলা দিয়ে ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরুচ্ছে। ''সত্যিই তাহলে খারাপ লোকের খপ্পরে পড়েছিলাম আমরা!''

রঞ্জন সেন বললেন, ''আপনার ভাইপোটিও খুব চালাক-চতুর নয়।''

''সে তো বটেই, সে তো বটেই। চালাক-চতুর হলে কখনও নিজের দেশ ছেড়ে চলে যায়!'' মন্তব্য করলেন হরিময়বাবু।

রঞ্জন সেন বললেন, ''ওরা যে কায়দা করে ক্যামেরটা পাল্টে নিয়েছে—তা বুঝতে পারেনি রামানুজ। তার ওপর রামানুজের নাকেও প্রচণ্ড সর্দি। ছবির গন্ধ-টন্ধ তেমন পাচ্ছে না—ফলে বেচারার কোনোরকম সন্দেহ হয়নি। সিঙ্গারাভেলু জানতো সর্দি কমাবার আগেই ছবিগুলো ওরা হাত সাফাই করবে।''

''সর্দি হয়নি মাত্র দুজনের,'' চিৎকার করে উঠলেন হরিময়বাবু।''ওই দুষ্টু সিঙ্গারাভেলু আয়ার এবং পিকলুর।''

''সিঙ্গারাভেলু আয়ার নয়—ওর আসল নাম এ বি সি ডি রাও। অনন্ত বাসুদেবন চন্দ্রিকাপুরম দেবরাম রাও। ভাইরাস ছাড়বার সময় যাতে ওর কিছু না হয়, সে জন্যেই তো নাকে বড়-বড় চুল রেখেছে। আর পিকলুর সর্দি না-হওয়াটা ছোটখাটো একটা অ্যাক্সিডেন্ট। ঘন-ঘন সর্দি হয় ওর—হয়তো ওর দেহের ভাইরাস শত্রুপক্ষের ছড়ানো নতুন ভাইরাসকে সুবিধে করতে দেয়নি। সামান্য ঘটনা। কিন্তু তার থেকেই ওদের বিপদের সূত্রপাত।''

ভবনাথ বললেন, ''পিকলু যদি গতকাল ওর ছবিতে ঘেমো গন্ধের কথা না-

বলতো তাহলে আমার সন্দেহই হতো না।"

হরিময়বাবু বললেন, "কী সর্বনাশ বলুন তো! দুর্দান্ত শত্রুপক্ষ আমাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এভাবে আমাদের দেশের ক্ষতি করছিল। ধন্য আপনাকে—এ যাত্রায় খারাপ লোকগুলো ধরা পড়লো।"

রঞ্জন সেন বললেন, "ধন্যবাদ আমার একটুও পাওনা নয়। পুরো ক্রেডিট ভবনাথবাবুর। উনিই গত রাত থেকে একের পর এক রহস্যের পয়েন্ট সাজিয়ে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক সর্দি ইনস্টিটিউট থেকে হঠাৎ সর্দি ভাইরাস চুরি হলো কেন? পিকলুর ছবিতে ঘেমো গন্ধ কেন? মিস্টার সিঙ্গারাভেলু আয়ার রাত এগারোটার সময় কেন হরিময়বাবুর বাড়ি থেকে ছবি ফিরিয়ে নিতে এলেন? ট্যাক্সিতে কেন ওই লয়েড সায়েব বসেছিলেন? কর্নওয়ালিস হোটেলে দশটার পরে ডাইনিং রুম বন্ধ হয়ে যায় — অথচ সিঙ্গারাভেলু কেন হরিময়বাবুকে মিথ্যে কথা বললো, হোটেলে রাত সাড়ে-এগারোটায় ডিনার পার্টি আছে। পিকলুর ব্রাউনি ক্যামেরা থেকে কেন ফিল্ম উধাও হলো? নিশ্চয় এমন কারও ছবি ওর ক্যামেরায় ধরা পড়েছে যে নিজের প্রচার চায় না। সিঙ্গারাভেলুর নাকে অত বড়-বড় চুল কেন? ওর কেন সর্দি হলো না? যে হরিময়বাবুর লাইফে কখনও সর্দি হয় না, হঠাৎ তাঁর কেন সর্দি হলো? তাছাড়া ভবনাথবাবু কিছুদিন আগে হঠাৎ স্বপ্ন দেখেছেন : নতুন ধরনের ক্যামেরা বেরিয়েছে যাতে রং ছাড়াও গন্ধ ধরা পড়ে। স্বপ্নেই নতুন এই ক্যামেরার নাম দিয়েছিলাম স্মেলোমেটিক। সরল মনে সাহিত্যিক ভবনাথ ভেবেছিলেন, নতুন এই ক্যামেরায় নতুন সম্ভাবনার দিক খুলে যাবে। কেবল সাজগোজ করেই তখন ছবি তোলা যাবে না—সঙ্গে স্নো এবং সেন্ট মাখতে হবে। সামনে সুগন্ধী ফুলের গুচ্ছ থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু যা মিস্টার সেন ভাবতে পারেননি—বিষাক্ত গ্যাসের ছবি তুলে পাঠালে—সেই ছবি দেখতে গিয়ে মানুষ খুন হতে পারে।"

বিস্মিত হরিময়বাবু উত্তেজনার বশে ঘন-ঘন টাকে হাত দিতে লাগলেন। তারপর ভবনাথকে বললেন, "এ-সম্মান তা হলে সত্যিই আপনার প্রাপ্য। সময় থাকতে আপনিই মিস্টার রঞ্জন সেনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, তাই খারাপ লোকগুলো ধরা পড়লো।"

রঞ্জন সেন বললেন, "দুষ্টুগুলো ধরা পড়লো—কিন্তু যন্তরটা পাওয়া গেলো না। আমার ডিটেকটিভরা ওকে ঘিরে ফেলেছি বুঝতে পারা মাত্রই ওই ব্যাটা লয়েড গোপন ক্যামেরাটা ধড়াম করে মাটিতে ফেলে ভেঙে দিলো।"

"ছবিগুলোও তো হাওড়া ব্রিজের সামনে ছিনতাই হয়ে গেলো," আপসোস

করলেন হরিময়বাবু।

"ছিনতাই নয়। আমার প্লেন-ড্রেস সাব-ইনসপেকটর পাগল সেজে ছবির প্যাকেটটা ছিনিয়ে নেয়। তারপরেই তো আমি নিজে কর্নওয়ালিস হোটেলে গিয়ে লয়েডকে অ্যারেস্ট করি। আদালতে ওইসব ছবি উঠবে—তবে সিক্রেট আদালত, অফিসিয়াল সিক্রেট অনুযায়ী বিচার হবে। বাইরে খুব বেশি জানানো হবে না।"

হরিময়বাবু চোখ বন্ধ করে মা কালীর উদ্দেশে তিনবার প্রণাম জানালেন। ভাইপোটা যে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছে তার জন্যে তিনি মায়ের কাছে দেড় সের চমচম মানত করলেন। রঞ্জন সেন বললেন, "ওঁর জন্যে চিন্তা করবেন না। ওঁর স্টেটমেন্ট এখন থানার অফিসাররা লিখে নিচ্ছে। জল অনেক দূর গড়াবে। কারণ লয়েড স্বীকার করছে, সর্দি ইনস্টিটিউটের ভাইরাস ওদের দলের লোকরাই চুরি করিয়েছে।"

পিকলু ও ভবনাথ দুজনেই আজ খুব খুশি। বাড়িতে এসেই পিকলু খবর পেয়েছে, বোন শতরূপার রোগটা তেমন কিছু নয়। ভেলোরের ডাক্তাররা বলছেন, কয়েকদিন ঠিকমতন ওষুধ খেলেই তাড়াতাড়ি সেরে যাবে।

হরিময়বাবুর চোখদুটো এখনও চমচমের মতো হয়ে আছে। তিনি এবার ভবনাথকে বললেন, "চমচম পত্রিকার পক্ষ থেকে আপনাকে এক শিশি রাবড়িচূর্ণ এবং মালা পাঠাবো। ঘরে বসে-বসে এতো বড় একটা রহস্য উদঘাটন করলেন আপনি।"

ইঙ্গিতে নাতিকে দেখিয়ে ভবনাথ বললেন, "ওসব পিকলুরই প্রাপ্য। ও যদি এতো সজাগ না হতো, তা হলে কিছুই ধরা পড়তো না। আজও সে সাহস করে ভোরবেলায় কর্নওয়ালিস হোটেলে অন্য ছবিগুলো শুঁকে ফেলেছিলো এবং আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছিল যে, দিলখুশা কেবিনের ছবি থেকে কবিরাজি কাটলেটের গন্ধ ছাড়ছে। ওর ফোন না পেলে সন্দেহটা আমার মনে দানা বাঁধতো না। আমি লালবাজারে খবর দেবার কথা ভাবতেই পারতাম না।"

বেজায় খুশি হয়ে বিদায় নেবার সময় হরিময়বাবু ঘোষণা করলেন "শুধু মালা নয়—পিকলু যাতে পদ্মশ্রী পায় তার জন্যে আমি চমচমের পরবর্তী সংখ্যায় কড়া সম্পাদকীয় লিখবো।"

"সম্পাদকীয় কেন? সোজাসুজি সরকারকে লিখলে হয়," বললেন রঞ্জন সেন।

গম্ভীরভাবে হরিময় বললেন, "যদ্দুর জানি, একুশ বছরের কমে কাউকে পদ্মশ্রী দেওয়া হয় না। সুতরাং চিঠির কম্মো নয়। সরকারি খেতাব পাবার বয়সটা কমিয়ে দশে আনতে হলে চমচমের জ্বালাময়ী এডিটোরিয়াল ছাড়া কাজ হবে না।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত

উৎসর্গ: রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী সমর্পণানন্দ রামকৃষ্ণ মহারাজকে
যাঁর সমালোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে এই লেখার পরিকল্পনা।

লেখকের কথা

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন লীলাকথাকে নির্ভর করে এদেশে গল্প, কবিতা, গান, উপন্যাস, নাটক, জীবনী ও স্মৃতিকথা রচিত হয়েছে। অভাব ছিল একটি রহস্যকথার। সেই অভাবমোচনের উদ্দেশ্যেই এই উপন্যাসের পরিকল্পনা। বলা বাহুল্য সীমাহীন রামকৃষ্ণ-সাহিত্যে ডুব দিয়ে বহু মূল্যবান রসদ মিলেছে এবং সেই সঙ্গে মিশেছে কিছু কল্পনা। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতা জানাই পূর্বসূরী লেখকদের, যাঁদের সংগৃহীত নানা দুষ্প্রাপ্য তথ্যের ওপর এই কাহিনীর ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছে।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।"
শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগীতা

"বিভিন্ন নদীর উৎস বিভিন্ন স্থানে, কিন্তু তারা
সকলেই যেমন এক সাগরেই তাদের জলরাশি
ঢেলে মিলিয়ে দেয়, তেমনি হে ভগবান
নিজ নিজ রুচির বৈচিত্র্যবশতঃ সোজা ও বাঁকা
নানা পথে যারা চলছে, তুমিই তাদের সকলের
একমাত্র লক্ষ্য।"

"তব রহস্যামৃতং তপ্তজীপনম্...শ্রবণমঙ্গলং"

ঘটনার রকমসকম যা দেখা যাচ্ছে তাতে হরিময় চৌধুরী ছাড়া আর কাউকে দিয়ে এই অমৃতকথা শুরু করা যুক্তিযুক্ত হবে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে এই হরিময় চৌধুরী লোকটি কে? ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের রহস্যামৃতে তাঁর এমন কি ভূমিকা থাকতে পারে যে হরিময় চৌধুরীর নামই প্রথমে উল্লেখ করতে হবে?

সন্দিহান হবার বা অধৈর্য হবার কোনো কারণ নেই। আসুন, হরিময়বাবুর সঙ্গে এই সুযোগে একটু পরিচিত হওয়া যাক। তা হলেই বুঝতে পারা যাবে নিজের অজান্তেই এই মানুষটি কেন এবং কীভাবে শতকের এক অত্যাশ্চর্য রহস্যভেদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন।

ফিকে গেরুয়া রঙের হাফহাতা খাদি পাঞ্জাবি এবং চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের সরকারী খাদি গ্রামোদ্যোগেব বড় দোকান থেকে কেনা মিডিয়াম মোটা ধুতি পরে হরিময়বাবু এই মুহূর্তে তিন ফুট বাই দু ফুট একটা পালিশহীন বিবর্ণ টেবিলের সামনে বসে মাথা নিচু করে গভীর মনোযোগ সহকারে কীসব পড়ছেন।

হরিময়বাবুর ডান হাতে রয়েছে একটা পাতলা চন্দনকাঠের ছুরি। এই ছুরি হরিময় চৌধুরী উপহার পেয়েছেন তাঁর প্রিয় লেখক কথাসাহিত্যিক ভবনাথ সেন মহাশয়ের কাছ থেকে। সেবার মাইশোর ভ্রমণ থেকে ফিরে ভবনাথবাবু তাঁকে বলেছিলেন, "হরিময়, কত লোক তোমাকে কত চিঠি লেখে—এইসব পত্রাবলী ঝটপট খোলা অনেক সহজ হবে এই পেপার নাইফ দিয়ে।"

ভবনাথবাবু শুনেছেন, প্রবাসী পত্রিকার একদা বিখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একরকম একটি চন্দনকাঠের ছুরি দিয়ে সম্পাদকীয় দপ্তরে আসা চিঠিপত্র নিজের হাতে খুলতেন। ছুরির উপহারদাতা স্বয়ং বিশ্বকবি এবং প্রবাসী পত্রিকার নিয়মিত লেখক শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হরিময়বাবু বলেছেন, "প্রবাসী পত্রিকায় কবিগুরু কত লেখা ছাপিয়েছেন, তার পরিবর্তে সম্পাদককে একখানা ছুরি উপহার দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।"

লেখক ভবনাথ সেনের এই প্রীতি-উপহার পাওয়ার পর থেকে সম্পাদক হরিময়বাবুরও নেশা ধরে গিয়েছে। নিজের টেবিলে জমে ওঠা ডাকে আসা সমস্ত চিঠি তিনি সংগ্রহ করেন। তারপর একে একে পাঠকদের পাঠানো খাম এবং অন্তর্দেশীয় পত্রগুলি ছুরি দিয়ে কাটতে শুরু করেন। মাঝে-মাঝে হাতচালানো বন্ধ রেখে ছুরির সরু দিকটা নাসারন্ধ্রে আলতো করে ঢুকিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ চন্দনের গন্ধসুখও উপভোগ করেন হরিময়। আর বলেন, "ওয়ার্লডের বেস্ট চন্দন মাইশোরেই পাওয়া যায়।"

চন্দনগন্ধময় এই ছুরি থেকে হরিময়বাবু একবার সম্পাদকীয় লেখার আইডিয়া পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন চমচম শহিদ স্মরণসংখ্যায় : "আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী স্বাধীনতাসংগ্রামী শহিদদের সহিত একমাত্র তুলনা চলে পবিত্র চন্দনবৃক্ষের—ভূপাতিত হইবার পরেও বহু যুগ ধরে নীরবে গন্ধসুধা বিতরণ করা সম্ভব একমাত্র চন্দন বৃক্ষের পক্ষেই।"

এই লেখার তারিফ করেছিলেন স্বয়ং ভবনাথ সেন। আনন্দে ডগমগ হয়ে ডান চোখটিকে মুহূর্তের জন্য অর্ধেক আকারে নিষ্পেষিত করে হরিময় চৌধুরী বলেছিলেন, "এই সাধুবাদ তো আপনারই প্রাপ্য। আপনার দেওয়া চন্দনের ছুরিটাই তো আমাকে লিখতে ইনসপিরেশন অর্থাৎ অনুপ্রেরণা জোগালো।"

ছুরি দিয়ে চিঠি খুলতে-খুলতে হরিময়বাবুর দরজার বেল হঠাৎ সশব্দে বেজে উঠলো। চমচম অফিসের প্রবেশপথ এখনও বন্ধ আছে দেখে হরিময়বাবু একটু বিরক্ত হয়ে কাজের লোক গুণধরকে ডাকলেন।

"কতবার বলেছি বাবা। দরজাটা সকাল সাড়ে-আটটা বাজলেই হাট করে খুলে দিবি। চমচমের ওপেন ডোর পলিসি, দরজা সর্বদা খোলা না রাখলে লোকে বুঝবে কী করে?"

বকুনি হজম করে গুণধর ছুটে এসে দরজা খুলে দিতেই চৌকাঠের ওপারে স্বয়ং শ্রীমান পিকলুকে দেখে বেজায় খুশি হয়ে উঠলেন হরিময়বাবু। বললেন, "আসুন আসুন পিকলুবাবু!"

পরম সমাদরে ভবনাথ সেনের আদরের নাতিকে ভিতরে ঢুকিয়ে আনলেন হরিময়বাবু। তারপর বললেন, "এই দেখো না গুণধরের কাণ্ড, চমচম সম্পাদককে গুণধর কিছুতেই 'খোলা দরজা' নীতি অনুসরণ করতে দেবে না। গুণধর বোঝে না, এই নীতির প্রথম কথাই হলো সম্পাদকের সিটি অফিসের দরজা সারাক্ষণ হাট করে খুলে রাখতে হবে।"

"মিস্টার পিকলু, এবার আপনি বসুন," সরলভাবে সাদর আহ্বান জানিয়ে

হরিময়বাবু প্রথমেই তাঁর টেবিলের ডান দিকে ড্রয়ার খুলে ফেললেন এবং সেখান থেকে একটা আখরোট কাঠের বাক্স সযত্নে বার করলেন।

হরিময়বাবু বললেন, "এই বাক্সটাও তোমার দাদু ভবনাথ সেন আমাকে প্রেজেন্ট করেছিলেন সেবার কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়ে। আমাকে দিলেন গোল বাক্স, অথচ দুর্দান্ত উপন্যাস লিখলেন 'বাঁকা তলোয়ার' ঝিলম নদীকে নিয়ে। লেখাটা আমাকে দিলেন না চমচম-এ প্রকাশ করতে। বললেন, ওটা চমচম পাঠকদের উপযুক্ত নয়। উপন্যাসটা বেরলো শেষ পর্যন্ত সাগরময় ঘোষের দেশ পত্রিকায়। ভালই হয়েছিল, উপন্যাসে এতই নারীচরিত্র ঢুকে পড়েছিল যে, আমাদের পক্ষে 'ছাবা' সম্ভব হত না।"

কথাটা যে 'ছাপা', ছাবা নয় তা মনে করিয়ে দিয়ে হরিময়বাবুকে লাভ নেই। উনি প্রায়ই বলে থাকেন, 'ছাবাও যা ছাবাও তা!' যেমন সিলেটের এর সম্পাদক সারাক্ষণ ব্যাঙ-কে 'বেঙ' বলতেন, ভুল ধরিয়ে দিলে বিরক্ত হয়ে বলে উঠতেন, 'বেঙও যা বেঙও তা!' আসলে ব্যাঙ কথাটা সিলেট সম্পাদকের কানেই ঢুকতো না।

আখরোটের সুদৃশ্য বক্সটা খুলে হরিময়বাবু পিকলুকে সারপ্রাইজ দিলেন। অয়েল পেপারে মোড়া একটা স্পেশাল সাইজের সাদা রঙের মিঠাই উপহার দিলেন শ্রীমান পিকলু সেনকে। অনুরোধ করলেন, "সোজা মুখে চালান করে দাও ফার্স্ট। তোমার দাদু জানেন, একসময় এখানে এসে অতিথিকে আমি প্রথমেই মর্টন কোম্পানির টফি উপহার দিতাম। তারপর ভাবলাম, স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর এসে গেলো। কাজকর্মে ভাবনাচিন্তায় এবার একটু স্বদেশী ভাব আনা দরকার। আজ তোমার ওপরেই প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করলাম—নো মোর ইংলিশ লজেন্স--এখন থেকে স্বদেশী।.."

অয়েল পেপারে মোড়া জিনিসটা কী তা এখনও বুঝতে পারছে না পিকলু। ফলে খুব মজা পেয়ে গেলেন হরিময়বাবু।

এবার তিনি বললেন, "তুমি তো বম্বেতে মানুষ হয়েছো পিকলু, ওখানে গ্র্যাজুয়েশন করে সবেমাত্র কলকাতার জোকা ক্যামপাসে পড়তে এসেছো, তোমার পক্ষে এই ধাঁধা বোঝা বেশ কঠিন ব্যাপার!"

হরিময়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছে পিকলু। চমচম সম্পাদক এবার কালবিলম্ব না করে আর একটি অয়েলপেপার খুলে ফেলে ভিতরের জিনিসটি ঝটিতি নিজের মুখে পুরে দিলেন। পিকলুকেও রিকোয়েস্ট করলেন, "সময় নষ্ট না করে, মোড়ক খুলে এইভাবে চুষে যাও,

জাস্ট লাইফ লজেন্স! এর নাম গুজিপুরিয়া। বহু রিসার্চ করে, বহু খোঁজখবর নিয়ে বড়বাজারে মহাত্মা গান্ধী রোডে মিষ্টির আড়ৎ থেকে এই একস্ট্রা-স্পেশাল গুজিয়া সংগ্রহ করেছি! তবে সেলোফোন প্যাকেজিঙটা আমাদের নিজস্ব, ধৈর্য ধরে গুণধরকে দিয়ে মোড়ক করিয়েছি।"

না-চিবিয়ে লজেন্সের মত কড়াপাক গুজিয়া চুষতে কিন্তু বেশ ভাল লাগছে পিকলুর। হরিময়বাবু সগর্বে ব্যাখ্যা করলেন, "ওয়েস্টার্ন সিভিলাজেশনকে মাদার ইন্ডিয়া এই গুজিয়া উপহার দিতে পারেন। ক্যাডবেরি বা কোকাকোলা কোম্পানির হাতে পড়লে এই গুজিপুরিয়া বিদেশের বাজারে ডেলি এক বিলিয়ান বক্স বিক্রি হতে পারে।"

"কেমন লাগছে?" জানতে চাইছেন হরিময়বাবু। পুরিয়ায় একটু মিষ্টি বেশি আছে শুনে তিনি কিছুটা দমে গেলেন। নিজের মনেই গভীর দুঃখের সঙ্গে বললেন, "জেনারেশন গ্যাপ! এদেশের এক প্রজন্ম মিষ্টি খেতে চাইলো, কিন্তু পয়সার অভাবে মিষ্টি চাখবার চান্সই পেলো না—আর এক প্রজন্মের সামনে খাবার সুযোগ রয়েছে, সামর্থ্য রয়েছে, কিন্তু মিষ্টিতে তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই!"

"মিষ্টিতে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়," সবিনয়ে হরিময়বাবুকে মনে করিয়ে দিলো পিকলু সেন।

"পিকলু! ওটা একেবারে বাজে কথা! তা হলে ঠাকুর রামকৃষ্ণের দাঁত বলে কিছু থাকতো না। সেই ছোটবেলা থেকে মাখন-মিছরি পেলে আর কিছুই তো তাঁর পছন্দ হতো না! হোয়াট অ্যাবাউট সোয়ামী ভিভেকানন্দ? রসগোল্লা খেতে পাবেন এই প্রত্যাশায় প্রথম ঠাকুরকে দেখতে তিনি উৎসাহ প্রকাশ করলেন। লাস্ট ফিফটিন থাউজেন্ড ইয়ারস্ ধরে ইন্ডিয়ানরা এতো মিষ্টি খেয়েছে যে এতোদিনে সমস্ত জাতটাই ফোগ্‌লা হয়ে যেতো।"

পিকলু হাসছে। "এ-বিষয়ে আপনি সম্পাদকীয় লিখবেন নাকি?" সে জিজ্ঞেস করলো।

"প্রয়োজনে লিখতে হবে। কিন্তু এদেশের ইয়ংদের মনে কথাগুলো আদৌ ঢুকবে কি না সন্দেহ। আমি ইতিমধ্যে নিজে বড়বাজার গুজিয়া সেন্টার-এ দু'দিন ঘুরে এসেছে—বলেছি, পারলে গুজিয়ায় একটু সুগার কমাও। তা ওরা শুনবে না, দুশো বছর আগে বেনারস থেকে গুজিয়ার যে ফর্মুলা সঙ্গে নিয়ে পূর্বপুরুষরা বড়বাজারে এসেছিল তার একচুল রদবদল করতে রাজি নয় বর্তমান পাঁড়েজি।"

পিকলু জানে, হরিময় দাদুর মাথায় প্রায়ই নানা রকম নতুন চিন্তা খেলে যায়।

হরিময়বাবু অবশ্য বলেন, "এসব ঘটে যখন ভবনাথবাবুর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয়। দেশলাই বাক্সর সঙ্গে কাঠির ঘষাঘষি হলেই আগুন জ্বলে ওঠে!"

হরিময়বাবু আর একটা গুজিয়ার পুরিয়া পিকলুর দিকে সস্নেহে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই পুরিয়াটা এখনও গোপন গবেষণার স্টেজে আছে। গুজিয়ার সঙ্গে একডোজ পিপারমেন্ট এবং চিউয়িংগাম অতি সাবধানে মিশিয়ে নতুন একটা স্বদেশী মিষ্টান্ন ডেভেলপ করা যায় কি না তা দেখছি। বহু কষ্টে বড়বাজারের পাঁড়েজির স্পেশাল সাহায্য পাচ্ছি—ওঁরা বোঝেন না, ব্যাপারটা সাকসেসফুল হলে কী কাণ্ড ঘটে যাবে! ইন্ডিয়াতে অন্তত তিরিশ কোটি স্কুলে-যাওয়া ছেলেমেয়ে রয়েছে, সংখ্যায় নেক্সট্ ওনলি টু চায়না। একবার জিনিসটা ছেলেমেয়েদের মুখে লেগে গেলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে বুঝতে পারছো?"

এই নতুন মিষ্টির নামও আগাম ঠিক করে ফেলেছেন হরিময়বাবু—'গুইংগাম'।

পিকলুর মুখের দিকে তাকিয়ে হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা বুঝলে তো? সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে নামটা ভীষণ অ্যাপ্রিশিয়েট করতেন। আরও তারিফ করতে পারতেন ওঁর বাবা সুকুমার রায়। পরলোক থেকে প্যানচেটে তিনি ইতিমধ্যেই ভী-ষ-ণ আনন্দ প্রকাশ করেছেন। গুজিয়ার গু, চিউইং-ইং এবং গাম ইজিকলটু গুইংগাম। একবার যদি আন্তর্জাতিক বাজারে গুইংগাম আইডিয়াটা ধরে নেয় তা হলে ফাটাফাটি ব্যাপার হবে! তার আগে পরিকল্পনাটা চুপি চুপি পেটেন্ট করে নিতে হবে, মগজসম্পত্তি বলে কথা। ইংরিজি নামটাও মিষ্টি ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি।"

পিকলু বললো, "চিউইংগামের দিন ঘনিয়ে আসছে, হরিময়দাদু!"

এই দাদু শব্দটায় আজকাল হরিময়বাবু আপত্তি তুলছেন। "মাই ডিয়ার মিস্টার পিকলু, তুমি বম্বের সিটিজান, সব বিষয়ে তুমি মডার্ন, সব বিষয়ে তোমরা কলকাতা থেকে এক মাইল এগিয়ে আছো। প্লিজ, ওই দাদু কথাটা অমন নিষ্ঠুর ভাবে 'স্প্রে' কোরো না। সারা শরীর জ্বালা করতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায়, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, কেওড়াতলা বার্নিংঘাট আর বেশি দূর নয়। তুমি প্লিজ আমাকে দাদা বলে ডাকবে। দাদু অ্যান্ড দাদা আর সেম থিং।"

পিকলু নিজের ঠাকুমার কাছে বহুবার শুনেছে, জেনেশুনে লোকের মনে আঘাত দিতে নেই। যিনি যা চান সম্ভব হলে তাঁকে তা দিতে হয়। অতএব হরিময়দাদু এখন থেকে পিকলুর হরিময়দাদা।

খুব খুশি হয়ে করমর্দনের জন্য ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন হরিময়বাবু। বললেন, "শর্টে সারবার ইচ্ছে হলে, হরিদাও বলতে পারো! তোমার দাদু ভবনাথ সেন একটা শব্দ বানিয়েছিলেন, লাস্ট গল্পে—শর্টে শার্টাং—ত্যাঁদড় লোকের সঙ্গে ত্যাঁদড়ামো করতে হবে!"

চোখ বুজে হরিময়বাবু এবার বললেন, "চিন্তার জগতে ভবনাথ সেন অ-নে-ক এগিয়ে গিয়েছেন—নব নব সৃষ্টির সমুদ্রকিনারে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইদানীং। লেখনী দিয়ে কখনও আগুন বেরোচ্ছে, কখনও রক্ত, কখনও স্রেফ রসগোল্লার রস। ওঁর মতন লোকই সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মত্ত হয়ে সৃষ্টি করতে পারেন—শর্টে শার্টং। এর অর্থ হলো, ছোট ব্যাপারে ছোট উত্তর।"

পিকলু গুইংগামের রস উপভোগ করতে-করতে বললো, "বড় হোটেলে, রাজভবনে, রাষ্ট্রপতি ভবনে আপনার এই আবিষ্কার সামলাতে খুব অসুবিধে হবে হরিময়দাদা!"

"কেন?" হুঙ্কার ছাড়লেন চমচম সম্পাদক হরিময় চৌধুরী। "ভোঁস ভোঁস করে সিগ্রেট খেয়ে লোকে চিমনির মতন সারাক্ষণ ধোঁয়া ছাড়ছে তাতে রাজ্যপালের এবং রাষ্ট্রপতির অসুবিধে হচ্ছে না, যত রাগ এই মেড-ইন-ক্যালকাটা গুইংগামের ওপর?"

পিকলু বোঝাতে চেষ্টা করলো, "রাগটা মোটেই ক্যালকাটার ওপর নয়, হরিময়দাদা।"

"রাখো রাখো। ক্যালকাটার বিরুদ্ধে সারাক্ষণ সারাদুনিয়ার কনস্‌পিরেসি—অষ্টপ্রহর ষড়যন্ত্র।" ফুঁসছেন হরিময়বাবু।

"প্রয়োজন হলে, আমি গুইংগাম চুষতে চুষতে তাজবেঙ্গল হোটেলে ঢুকবো, তাতে যদি আবার আমাকে জেলে যেতে হয় এই বয়সে তা যাবো। ওখানে অসুবিধে হবে একটু। শুনেছি এখনও আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে সন্ধেবেলায় ইষবগুলের ভুসি সাপ্লাই করে না, ফলে যাদের কিনা ইয়েতে একটু কাঠিন্য...তাদের খুব মুশকিল।"

"আপনার হৃদয়ে কাঠিন্য? অতি বড় শত্রুও এ কথা বলতে পারবে না!" পিকলু সোজাসুজি মন্তব্য করলো।

হরিময়বাবু ডান কানে ডান হাতের দ্বিতীয় আঙুলটা অনেকখানি ঢুকিয়ে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বললেন, "আগে যখন স্বদেশী করে জেলে গিয়েছি তখন বয়সটা কম ছিল। 'কনসটিটিউশন'টা ছিল ভেরি ভেরি স্ট্রং, তাই কনসটিপেশনকে ডোন্টকেয়ার করতে পারতাম, এখন পারি না।"

হরিময়বাবু বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে পিকলু বললো, "শুধু শুধু আপনি আবার জেলে যাবেন কেন? আপনাকে এক সপ্তাহ না দেখলে আমার দাদু তো চোখে অন্ধকার দেখবেন। দাদু বললেন, হরিময়ের সঙ্গে সানডে-মর্নিং আড্ডাটা আমার মানসিক ব্যাটারিকে রি-চার্জ করে।"

"শোনো পিকলু, তোমার দাদুও জেলে যাবার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে এমার্জেন্সির সময়। তখন বাধ্য হয়ে আমিও কাপড়চোপড়, দাঁত মাজবার বুরুশ, দাড়ি কামাবার শেভিং সেট এবং সানলাইট সোপের কেক নিয়ে রেডি হয়েছিলাম, যাতে পৃথক ফলেও এক যাত্রা হয়! তা মুখ্যমন্ত্রী মানু রায় শেষ পর্যন্ত আমাদের অ্যারেস্ট আর্ডারে সই করলো না, কারণ ওর ওয়াইফ মায়া রায় তখন চমচম-এ তোমার দাদু ভবনাথ সেনের ধারাবাহিক উপন্যাসের শেষ পর্ব পড়ছেন। মানু রায় বুঝলেন, এখন অ্যারেস্ট করা মানে, চমচমে ধারাবাহিক বন্ধ হয়ে যাওয়া। ওয়াইফ এতে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। তার থেকে বরং আর দুটো সংখ্যা ওয়েট করা যাক। ইন দ্য মিনটাইম, এমার্জেন্সি উবে গেলো এবং এরপরে ইন্দিরা গান্ধীরও কী হল তা তো তুমি জানো! তখনই তোমার দাদু সেই স্মরণীয় লাইনটা লিখেছিলেন, সময়ই একমাত্র শিক্ষক যিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা দেওয়ার পরে নিজের ছাত্রছাত্রীদেরও গিলে ফেলেন।"

পিকলু এসব খবর ইদানীং কলকাতায় এসে শুনতে আরম্ভ করেছে। বম্বেতে এসব উত্তাপ কখনও তেমন পৌঁছায়নি।

হরিময়দাদুকে আরও উত্তেজিত না করে সে এবার বললো, "বড় বড় হোটেলের ওপর অযথা রেগে যাবেন না হরিময়দাদা। ওদের দামী ওয়াল টু-ওয়াল কার্পেটে চিউইংগাম পড়ে যে কী ভীষণ অসুবিধা ঘটায় তা যদি শুনতেন। বড় বড় ইলেকট্রিক ভ্যাকুয়াম ক্লিনারগুলোর বারোটা বেজে যায় যখন অসাবধানী লোক মুখের চিউইংগামটা গাল থেকে বার করে সোজা কার্পেটে ছুড়ে ফেলে দেয়।"

হরিময়বাবু তাড়াতাড়ি নোটবুকটা খুঁজতে লাগলেন। বললেন, "বুঝেছি। ইম্পার্টান্ট পয়েন্ট—আমাদের গুইংগামকে যে করেই হোক ডিসপোজেব্‌ল করতে হবে, যাতে স্বদেশে বিদেশে কারও কার্পেটের কোনো ক্ষতি না হয়।"

এবার হরিময়বাবু টাকে হাত বুলোতে লাগলেন। "কী একটা চমৎকার ইংরিজি টার্ম আছে, তোমার দাদু ভবনাথ সেন তাঁর লাস্ট উপন্যাসে

লাগিয়েছেন—প্রত্যেক পদার্থ, এমন কী প্লাস্টিকের জিনিসপত্রকে 'বাইবেল' না কী হতে হবে।"

একটু দ্বিধা করে পিকলু এবার মনে করিয়ে দিল, "বাইবেল নয় হরিময়দাদা। বায়োডিগ্রেডেব্‌ল হতে হবে—অর্থাৎ নিজের স্বভাবেই আস্তে আস্তে পচে গিয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হতে হবে, অক্ষয়-অমর হয়ে দুনিয়াতে টিকে গিয়ে গেরস্তকে কষ্ট দেবে না, এই প্লাস্টিক ব্যাগের মতন।"

খুব খুশি হলেন হরিময়বাবু। বললেন, "তোমাকে আর একটা গুইংগাম দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সীমিত স্টক ফিনিশ। সহসম্পাদক গুণধরকে আবার আজ হ্যারিসন রোডে পাঠাতে হবে। ওখানে যা ট্রাফিক জ্যাম হয়, স্বেচ্ছায় কেউ যেতে চায় না!"

সহ-সম্পাদক! গুণধর তো এখানকার কাজের লোক, প্রতিদিন হরিময়বাবুর রান্নাও করে।

প্রশ্নটা আন্দাজ করে হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, "ইয়েস, গুণধর আমার ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, অর্থাৎ আমার ইকমিক কুকার। ইন্দুমাধব মল্লিক ইকমিক কুকার আবিষ্কার করেছিলেন বলেই সে যুগে অনেক দুঃসাহসী যুবক আমার মতন সংসারী না হয়েও সংসারে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিল। এখনও হাওড়ায় আমার ইকমিক কুকার রয়েছে, কিন্তু তা অপারেট করেন বিজয় অথবা এই শ্রীমান গুণধর। কিন্তু লোক বড্ড ভুল বোঝে। তাই চমচম পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রতি সংখ্যায় ওদের নাম ছেপে দিচ্ছি—কার্যনির্বাহী সব-সম্পাদক গুণধর সামন্ত। ব্যাপারটায় একফোঁটা মিথ্যাচার নেই। হুকুম তামিল করার সংস্কৃত হলো কার্যনির্বাহী।"

চমচম পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যাটা হরিময়বাবুর টেবিলে পড়ে রয়েছে। ওটা এখনও সরকারিভাবে প্রকাশিত হয়নি। তবু হরিময়বাবু তাজা কাগজটা পিকলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখতে পারো, পড়তে পারো, কিন্তু বাইরে নেওয়া যাবে না। এখনও ভোগ দেওয়া হয়নি! প্রতিটি সংখ্যার ফার্স্ট কপি বেলুড় রামকৃষ্ণমঠে যাবে, তারপর ডাকে দেওয়া, স্টলে পাঠানো এবং লেখকদের সৌজন্য সংখ্যা।"

এরকম নিয়ম কেন? পিকলু একটু কৌতূহলী হয়ে উঠলো। হরিময়বাবুর নাকি এ ব্যাপারে কোনো হাত নেই। সেই প্রথম সংখ্যা থেকে প্রতিষ্ঠাতা এই নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। হরিময়বাবু মেনে চলেছেন।

"প্রতিষ্ঠাতা বংশগোপালবাবু ছিলেন পাগল মানুষ। তাঁর কথা তোমাকে

একদিন বলগো। কী করে এই চমচম হলো।"

পিকলু দেখলো, হরিময়বাবুর চমচম পত্রিকার প্রথম পাতায় এই নজর আলি লেনের ১৪ নম্বর বাড়িটাকে নগর কার্যালয় বলে দেখানো হয়েছে। হেড অফিস ও মূল কার্যালয় এখনও ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেন, মন্দিরতলা, শিবপুর, হাওড়া ৭১১১০২।

তারপরও অবাক করে দেবার পালা। লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক, শিকাগো, ডালাস, ক্যালিফোর্নিয়া, স্যানযোগে এটসেটরা শহরের নাম ও এক একটা ঠিকানা ছাপানো রয়েছে। স্যানযোগে নামটার সঠিক উচ্চারণ যে স্যানহোসে তা জেনেও হরিময়বাবু আদি বানানটা লেখেন। "ইংরেজরা যদি কথায় কথায় এদেশের গ্রামগঞ্জের ভুল নাম রাখতে এবং ভুল বানান লিখতে পারে তা হলে আমরাও বা সেই ফেসিলিটি পাবো না কেন?"

"স্টেটসম্যান, টাইমস অব ইন্ডিয়ারও এত শহরে অপিস নেই, যত আছে আমাদের মাসিক চমচমের।" সাফল্যের হাসি হাসলেন হরিময়বাবু। "এইটাই আমাদের চমচম পত্রিকার বৈশিষ্ট্য বলতে পারো। আসলে যেখানে-যেখানে আমাদের জানাশোনা বন্ধুবান্ধবদের বাইপো-ভাইঝি অথবা নাতি-নাতনীরা বসবাস করছে সেখানে-সেখানে তাদের নাম আমরা চমচমে ব্যবহার করছি—আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকলে আজকাল আর কাগজ চালানো যাবে না, বুঝলে মিস্টার পিকলু?"

"কিন্তু আপনার তো বাংলা কাগজ!" পিকলু সবিনয়ে মনে করিয়ে দিলো চমচম সম্পাদককে।

হরিময়বাবু এবার মাতৃভাষার গর্বে চোখ বন্ধ করে ফেললেন। 'বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার! বুঝলে মিস্টার পিকলু। আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলা স্রেফ হাওড়া-আমতা কিংবা শিয়াখালার ভাষা নয়। ওয়ার্লডের টপ পাঁচটা ভাষার একটা এবং অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল ভাষা। দুনিয়ায় এমন জনপদ নেই যেখানে বাংলা 'চলেব্‌ল' নয়। লাস্ট শব্দটা বুঝলে তো? নিউ বেঙ্গলি ফর 'চালু'। যত মাতৃভাষার মধ্যে ফরেন গ্যাস মিশবে, যত ভাষা থেকে রঙিন বুদবুদ উঠবে, তত বাংলার হর্সপাওয়ার বেড়ে যাবে, যাকে তোমার দাদু যাকে বলেন কি না 'ঘোটকশক্তি'। আমি আবার খেয়ালের বশে সম্পাদকীয়তে লিখে বসলাম 'ভোল্টেজ'। তোমাদের দাদু হলেন কি না ভাষার বাল্মীকি। বললেন—বুঝছি তোমার যন্ত্রণা। তুমি বাংলা ভাষার ঝাল এবং তেজ একই সঙ্গে বাড়াতে চাও। ভাল কথা। কিন্তু, তাই বলে, গরিব সায়েবদের পকেট মেরো না। তোমার দাদু

এরপর শব্দটা ঠিক করে দিয়েছিলেন : 'ভোলতেজ'! তাঁর নীতি : অপরের শব্দ যত খুশি নিজের ঝুলিতে তুলে নাও,-কিন্তু ঝুলিতে পুরবার আগে নিজের ভাষার মাধুরী একটু মাখিয়ে দাও! তাই ভোলের সঙ্গে তেজ!"

পিকলুর মুখের দিকে তাকিয়ে হরিময়বাবু বললেন, "তুমি ভাবছো সাহেবরা লুকিয়ে লুকিয়ে হাসবে? সে গুড়ে বালি। ওরা যে লুকিয়ে লুকিয়ে হাজার হাজার সংস্কৃত শব্দ চুরি করেছে, তার বেলা? এই তো কাল এক সন্ন্যাসী বললেন, জেলি শব্দটা সায়েবরা এখান থেকে তুলেছে। সংস্কৃতে আচারকে বলা হতো 'জালি'। তেঁতুলের নাম ইংরিজিতে কেমন করে ট্যামারিন্ড হলো? জিনিসটা যখন এদেশ থেকে প্রথম পারস্য দেশে গেলো তারা ভাবলো এটাই বোধ হয় ইন্ডিয়ার বিখ্যাত আম, তাই নাম দিল তামর-ই-হিন্দ। যখন এই তেঁতুল ইউরোপে পৌঁছলে তখন নাম হয়ে গেলো ট্যামারিন্ড। শুধু টক নয়, মিষ্টিতেও চুরি! আমাদের চিনি সংস্কৃতে শর্করা, লাতিনে সক্কর এবং ইংরিজিতে সামান্য ভোল পাল্টে সুগার।"

কার্যনির্বাহী সহকারী গুণধর সামন্ত ইতিমধ্যে দুটো জামবাটিতে খাঁটি গণেশমার্কা সরষের তেলে মাখা মুড়িবাদাম এনে হাজির করেছে।

"মেক্সিকো থেকে আসা মশলাটা দিয়েছিস তো?" চিৎকার করে জানতে চাইলেন হরিময়বাবু।

"আমাদের মেক্সিকোতে প্রতিনিধি সোলেমান আলি আন্তর্জাতিক কুরিয়ার মাধ্যমে এই মশলা পাঠিয়েছে। সোলেমান লাস্ট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স ধরে নিয়মিত এবং ননস্টপ চমচম পত্রিকা পড়ছে।"

উ-উ-প করে একটা আওয়াজ হলো। ভীষণ ঝাল, ব্রহ্মতালুতে আগুন উঠে আসছে। "মেক্সিকো দেখছি চিটাগাঙের বাবা! সুইসাইড করতে হলে এই মশলা এক চামচ মুখে ঢেলে দিলেই যথেষ্ট। সাধে কি আর ইকজফার সেন দাবি করেছেন, ইন্ডিয়ান রান্নায় আদিতে একেবারেই ঝাল ছিল না, ইন্ডিয়াতে গোল মরিচ থাকলেও লঙ্কা এসেছে বিদেশ থেকে এই সেদিন পর্তুগিজদের খেয়ালে।"

ইকজফার কথাটির অর্থ পিকলুর মাথায় ঢুকছিল না। হরিময়বাবু ব্যাখ্যা করলেন, "তুমি অমর্ত্য সেনের নাম শোনোনি? হতেই পারে না।"

"তিনি তো ইকনমিস্ট!" বললো পিকলু।

একমত হলেন না হরিময়বাবু। "সে তো ওয়ান্স-আপন-এ টাইম, যখন ভদ্রলোক দিল্লিতে পড়াতেন। বিদেশে বসবাস করে করে অর্থনীতিবিদ থেকে

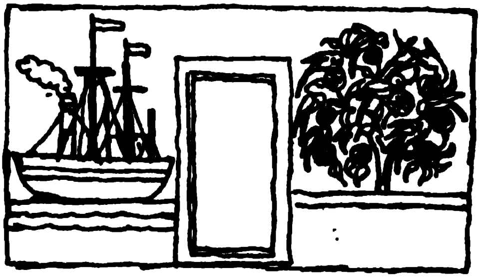
ক্রমে ক্রমে হয়ে উঠেছেন দার্শনিক—সুতরাং ইকজফারটাই ওঁর রাইট টাইটেল। উনিই তো বলেছেন, এক একটা সভ্যতা বেমালুম অন্য একটা সভ্যতার জুস টেনে নিয়ে নিজের করে নিচ্ছে—যেমন ইন্ডিয়ান রান্না এখন ঝাল ছাড়া ভাবা যায় না—লঙ্কা খেয়ে হাঁসফাঁস করবার জন্যেই তো সায়েবরা গাঁটের কড়ি খরচ করে বিলেতের ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয় যায়। অথচ এই ঝাল মোটেই ইন্ডিয়ার নিজস্ব নয়।"

হরিময়বাবু এবার পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "গুয়াতেমালা, কিউবা এবং ভিয়েতনামে কোনও বাংলা জানা লোকের ঠিকানা জানো?"

ওইসব দেশের নামগুলো চমচমের প্রথম পাতায় ছাপবার জন্যে সম্পাদক হিসেবে হরিময়বাবুর মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। "তোমার দিদি শতরূপার বিয়েটা মন্টিকার্লোতে হওয়ায় আমি ভবনাথবাবুকে স্পেশালি কংগ্রাচুলেট করেছিলাম—মন্টিকার্লোতে চমচমের একটা শাখা আপিস না থাকলে কাগজের ঠিক ইজ্জত হচ্ছিল না।"

পিকলু অর্থাৎ পুণ্যশ্লোক সেনের বাবা বহুদিন বোম্বাইতে বিখ্যাত বহুজাতিক কোম্পানি হিন্দুস্থান লিভারে কাজ করেন। ব্যাকবে রিক্লেমেশন অঞ্চলে ওঁদের সদর দপ্তরে হরিময়বাবু একবার গিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের সন্ধানে।

ওইখানেই তিনি খবর পেলেন, প্রাত্যহিক স্নানের অভ্যাসটা এই ইন্ডিয়া থেকেই ইউরোপে গিয়েছিল। প্রচারসচিব ইরফান খান চমচম পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন বলে কৃতজ্ঞ হরিময়বাবু। এখনও সানলাইট ছাড়া অন্য কোনও সাবান ব্যবহার করেন না। যা চুপি চুপি তিনি ভবনাথ সেনের কাছে স্বীকার করেছেন, জামার জন্যে একরকম সাবান, শরীরের জন্যে আরেক রকম সাবান, অতো সহ্য হয় না বলে জামাকাপড় কাচার আগে নিজের শরীরেও সানলাইট সাবান তিনি বুলিয়ে নেন—তাঁর ঝকঝকে তকতকে চেহারার এইটাই হল গোপন রহস্য।



পিকলু বোম্বাই থেকে অর্থনীতিতে বি-এ অনার্স পাশ করে, জোকার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টে পড়তে আসায় দাদু ভবনাথ সেন ও ঠাকুরমার আনন্দের অবধি নেই।

আই-আই-এম হোস্টেল থেকে পিকলু প্রতি উইকএন্ডে ভবনাথবাবুর সল্ট লেক ভবনে চলে আসে।

বাংলাটার ওপর এখনও তেমন দখল নেই, কিন্তু হরিময়বাবু আশ্বাস দিয়েছেন, "ঘাবড়াও মৎ! ভবনাথ সেনের নাতি মিস্টার পিকলুকে বাংলা শেখানো আর মাছকে সাঁতার শেখানো একই কথা!"

ভবনাথ সেন কিন্তু অতটা ভরসা পাননি। তিনি বলেছেন, "ইচ্ছে হলে পিকলু ইংরিজিতেই লেখা শুরু করো।"

হরিময়বাবু ভুল বুঝে মন্তব্য করেছেন, "তার মানে আপনি চাইছেন বিক্রম শেঠ এবং অরুন্ধতী রায়ের মতন লাখ লাখ টাকা আগাম পেয়ে আপনার নাতি শুরু থেকেই বেজায় বড়লোক হোক।"

ভবনাথ প্রতিবাদ করেছেন। "আরে না, হরিময়। প্রথমে ইংরিজিতে লিখে পিকলুর হাতের আড়টা ভাঙুক—তারপর যথাসময়ে নিজেই বাংলায় লেখবার জন্যে সে ব্যাকুল হয়ে উঠবে। রক্তের টান, বংশের দুর্বলতা এসব তো পুরোপুরি মিথ্যা হতে পারে না।"

হরিময়বাবু সঙ্গে সঙ্গে অ্যাডভান্স বুকিং করেছেন। "মিস্টার পিকলুর বাংলা প্রথম লেখাটা যেন চমচমে আসে!"

পিকলু কলকাতায় এসেই কিন্তু দৈনিক ইংরিজি কাগজে কিছু লেখালেখি শুরু করেছে।

আজ পিকলু যে নতুন ভূমিকায় ১৪ নম্বর নজর আলি লেনে উপস্থিত হয়েছে তা শুনে হরিময়বাবু ভীষণ নার্ভাস হয়ে পড়লেন।

"পিকলু, সারা কলকাতায় এতো বিখ্যাত লোক থাকতে আমাকে

ইন্টারভিউ!”

হরিময়বাবু স্বীকার করলেন, “বুকের মধ্যে একটা পিকুলিয়র অস্বস্তি হচ্ছে! জজ যদি আসামি হয়ে কাঠগড়ায় দাঁড়ায় তা হলে এমন একটা অবস্থা হয়।”

পিকলু কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। অগত্যা সাক্ষাৎকারে চোখা-চোখা প্রশ্নের মুখোমুখি হবার জন্যে হরিময়বাবু রেডি হলেন। তাঁর সামনে আবার একটা ছোট্ট ব্যাটারি-চালিত টেপরেকর্ডার বসানো হয়েছে। আজকাল ইংরিজি কাগজের রিপোর্টাররা কেউ খাতাকলম খুলে সাক্ষাৎকার নেয় না। হরিময়বাবু নিজেও আর কোনও সাক্ষাৎকার নেন না। সেবার হ্যান্ডসেট কম্পোজিটারের অসাবধানতায় ‘প্রশ্নকর্তা’র বদলে ‘ক্ষৌরকর্তা’ চমচমে ছাপা হয়ে যাওয়ায় তুলকালাম কাণ্ড, সবাই ভাবলো ইচ্ছে করেই এটা করা হয়েছে।

পিকলুর প্রশ্ন : “চমচমের প্রথম পাতায় কোথাও সম্পাদক হরিময় চৌধুরীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না কেন?”

“থেকেও নেই!” মৃদু হেসে ব্যাখ্যা করলেন হরিময়বাবু। “লাস্ট লাইনটা আট পয়েন্টে ছাপা—কার্যনির্বাহী সম্পাদক ইন্দ্রলুপ্ত চেধুরী! তোমার দাদু জানেন, তেইশ বছর বয়স থেকে আমার মাথায় টাক পড়েছে। ভারতের স্বাধীনতা ও আমার টাক—প্রায় একই বয়সী। দুটোরই বয়স পাঁচ দশক। অভিধান খুললে যে কেউ দেখতে পারে টাকের ভাল নাম ‘ইন্দ্রলুপ্ত’—সুতরাং বুঝতেই পারছো। এই অধমই ওয়ার্লডের ওনলি ছদ্মনামা সম্পাদক।”

“নিজের নাম ছাপাতে আইনগত কোনো বাধা আছে?”

তেমন প্রয়োজন হলে আদালতে এফিডেভিট করে ছদ্মনামটাই নিজের নাম করে নেবো। কই উত্তমকুমারের বেলায়, দিলীপকুমারের বেলায়, নারায়ণ গাঙ্গুলির বেলায়, সমরেশ বোসের বেলায় তো এসব কথা ওঠেনি! এসব তো ওঁদের পিতৃদত্ত নাম নয়।”

“ইন্দ্রলুপ্তবাবু, আপনার কাগজের নামটাও একটু অদ্ভুত—‘চমচম’ কেন?”

“জন্ম থেকেই অন্য দশ জনের মতন আমরা মিষ্টান্নপ্রেমিক। শিবপুর বাজারে শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে এই পত্রিকার প্রথম পরিকল্পনা করা হয়। পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি সংখ্যায় সব বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে। প্রথমে সবাই ভেবেছিল, এ কাগজের একটাই নাম হতে পারে—তা হলো ‘সন্দেশ’, কিন্তু সহজবোধ্য কারণে সুকুমার রায়ের পিতৃপুরুষের কথা ভেবে তা নেওয়া হলো না। তখন নাম ঠিক হলো—লেডিকেনি। কিন্তু ওতে ইংরিজি ভাবটা প্রবল—ভারতের ময়রারা স্বাধীনতা সংগ্রামে তেমন কিছু দেয়নি, বরং লর্ড ক্যানিংয়ের সুন্দরী স্ত্রীর নামে

স্পেশাল মিষ্টি উদ্ভাবন করেছে। সময়ের স্রোতে ক্যানিং এবং তাঁর রাজদণ্ড কোথায় ভেসে গেলো, কিন্তু লেডিকেনি এখনও হাজার বছর রাজত্ব করবেন।"

"তারপর?"

হরিময়বাবু জানালেন, "শেষপর্যন্ত সবাই বললো চমচম। একটু চটচটে, কিন্তু সে তো আর পত্রিকার দোষ নয়। আমাদের চমচম পত্রিকা কিন্তু শুরু থেকেই হিট!"

"তখন চমচম পত্রিকার প্রধান কার্যালয় কোথায় ছিল?"

"যেখানে এখনও আছে পঞ্চাশ বছর পরে! হাওড়া শিবপুরের বিখ্যাত জায়গা হিদারাম হালদার লেনে। আমাদের নজর আলি লেনের সিটি অফিস এবং হাওড়া প্রধান কার্যালয়ের নম্বর একই।"

"তা কী করে হয়?" পিকলু বলে উঠলো। "একটা নম্বর ১৪ আর একটা ৪২/৩!"

"সোজ অঙ্ক মিস্টার পিকলু! বিয়াল্লিশকে তিন দিয়ে ভাগ করলে কত হয়? আমি তো একই নম্বর বলে নজর আলি লেনের বাড়িটা আঁকড়ে বসে আছি, নম্বর মনে রাখার খুব সুবিধে।"

এরপর চমচম পত্রিকার সুদীর্ঘ ইতিহাসটা ক্রমশ প্রকাশিত হলো।

হরিময় চৌধুরী যা-তা লোক নন, ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে দুর্জয় সাহস নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আনন্দবাজারে চাকরির জন্য অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুরেশ মজুমদারের কাছে ঘোরাঘুরি করেছিলেন বর্মণ স্ট্রিটে। যত রাজ্যের স্বদেশী করা লোককে আশ্রয় দিতেন এককালের বাঘা বিপ্লবী পরাণদা ওরফে সুরেশ মজুমদার। চাকরি খোঁজার সময় হরিময়বাবুর কোথাও থাকবার জায়গা নেই, খাওয়ার জায়গাও নেই। সেই অবস্থায় হাওড়ার স্বাধীনতা সংগ্রামী, নেতাজীর অনুগত বিপ্লবী হরেন ঘোষ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন থাকা ও একবেলা খাবার ওই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের বাড়িতে। কয়েকটি বালককে এর পরিবর্তে প্রাইভেট মাস্টারি করাবার কথা ছিল।

হরিময়বাবু বললেন, "এই প্রাইভেট টিউটরিটা না থাকলে মধ্যবিত্ত বাঙালির যে কী অবস্থা হতো! সকাল সন্ধ্যায় ছেলে পার করেও অনেক অভাবী বাঙালি শেষপর্যন্ত বিখ্যাত হয়েছে। ঈশান ঘোষ থেকে হরেন মুখুজ্যে পর্যন্ত ডজন ডজন নাম পেয়ে যাবেন। ইনক্লুডিং সুনীতি চাটুজ্যে এটসেটেরা। তারপর উপন্যাসে দেখুন—সাহেব বিবি গোলামের ব্রজরাখাল চরিত্রটা। বাবুদের ঐতিহাসিক

বাড়িটায় ব্রজরাখাল থাকতেন, ছেলেমেয়েদের পড়াতেন, আর ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ভক্তি করতেন, উনিশ শতকের মস্ত একটা ঐতিহাসিক ফোর্স বলতে পারো!"

খুব আগ্রহের সঙ্গে পিকলু শুনলো। চমচম পত্রিকা ইতিমধ্যেই প্রাইভেট টিউশনের ওপর বিশেষ সংখ্যা বার করেছে।

হরিময়বাবু সগর্বে জানালেন, "একেবারে বাম্পার সেল—হাওড়া এবং শেয়ালদা স্টলে শেষ পর্যন্ত এই সংখ্যা ব্ল্যাক হয়েছে। আড়াই টাকার বই সাড়ে সাত টাকায়।"

হরিময়বাবু আরও জানালেন, "ঐ সংখ্যার দু'খানা নিবন্ধ একেবারে যাকে বলে কিনা সুপার বাম্পার সাকসেস—'শতপতি শিক্ষক কেমন করে কোটিপতি হতে পারেন' আর 'গ্রহনক্ষত্রের আলোকে প্রাইভেট ট্যুশানি'।" একটা প্রবন্ধের লেখক সদাস্নিগ্ধ সেন আর দ্বিতীয়টার রচয়িতা শ্রীভৃগু।

এঁরা কাঁরা জানতে চাওয়ায়, একটু দ্বিধার পর হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন হরিময়বাবু। সলজ্জভাবে হরিময়বাবু জানালেন, "নাম ভিন্ন, কিন্তু মানুষ এক। মিস্টার পিকলু, দু'টিরই লেখক ইওরস্ ফেথফুলি এই অধম!"

হরিময়বাবু আরও জানালেন, "একদা বাংলার লাটসায়েব হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি অধ্যাপনার সময় এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়িতে ছেলে পড়াতেন। তাঁরাই একবার মাস্টারমশায়কে কিছু টাকা বাজারে খেলতে বললেন, শেয়ারবাজারে হরেনবাবুর হাজার টাকাই হয়ে গেলো লাখ টাকা। কিন্তু জাতমাস্টার হরেন্দ্রবাবুর টাকায় কোনো রুচি ছিল না, যথাসময়ে তিনি সব দান করে নিজের ফ্যামিলিকে ফতুর করে গেলেন। পয়সার অভাবে বিধবা বঙ্গবালাদেবী একসময় খুব কষ্ট পেয়েছিলেন।"

নিজের জীবনের গল্পটা হরিময়বাবু লিখতে লজ্জা পেয়েছেন। "সত্যি কথা বলতে কি মিস্টার পিকলু, নিজের গল্পটা লিখতে গেলে কলম সরতে চায় না, লজ্জা এসে যায়। বিপ্লব আন্দোলনের নেতা হাওড়ার হরেন ঘোষ আমার কাহিল আর্থিক অবস্থা দেখে বললেন, চিন্তা কোরো না। অগতির গতি বংশগোপাল বিশ্বাস এখনও হাওড়ায় রয়েছেন। পিকুলিয়র লোক এই বংশগোপালবাবু। অনেকদিন ক্যালকাটার বাইরে ছিলেন, বোধহয় ইন্ডিয়ার বাইরেও কোথাও। এখন বয়স অনেক হয়েছে। তবে স্বদেশী করা লোকদের মনে মনে এখনও একটু পছন্দ করেন, যদিও মুখে ওসব কথা একেবারে তোলেন না। ইংরেজের সঙ্গে চটাচটি করতে কে চায় বলো? বংশগোপাল বরং আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেন, কুইট ইন্ডিয়া বললেই ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে যাবে, এমন কথা

গেঁধোটা ছাড়া আর কেউ ভাবতে পারে না। ভদ্রলোকের মনে মহাত্মাজি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ভক্তি ছিল না। বেশ কয়েক বছর ধরে বংশগোপাল বলে চলেছেন, গান্ধিই ইন্ডিয়াকে বড় একটা বিপদে ফাঁসিয়ে যাবেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমরা তখন যাঁদের সঙ্গে মিশি তাঁরা সকলেই সুভাষ বোস এবং জয়প্রকাশ নারায়ণের ভক্ত। বিয়াল্লিশের হিরো। কিন্তু মহাত্মাজি সম্বন্ধে আমাদের দুঃখ থাকলেও কোনও ঘৃণা ছিল না। বড়জোর একটু ভুল বোঝাবুঝি। আর এই বুড়ো বংশগোপাল বিশ্বাস কট্টর বিপ্লবপন্থী। বোধহয়—ইংরেজকে মেরে তাড়ানো ছাড়া আর কোনও পথ আছে বলে তিনি বিশ্বাসই করতেন না।"

হরিময়বাবুর মনে আছে, হঠাৎ দেখলে বোঝবার উপায় ছিল না, বৃদ্ধ বংশগোপালের মনে কী রয়েছে। দেখা হলে, মোহনবাগান এবং শিশির ভাদুড়ি ছাড়া আর কোনও বিষয়ের উল্লেখ করতেন না।

শেষপর্যন্ত হিদারাম হালদার লেনের এই বংশগোপাল বিশ্বাসের নেকনজরে পড়ে গেলেন হরিময়বাবু।

"কখন যে কী ঘটে যায়," হরিময়বাবু স্বীকার করলেন। "আমার ছেলে পড়ানো শেষ হলে, বংশগোপালবাবু প্রায়ই গল্প করার জন্য আমাকে ডাকতেন।"

স্মৃতিচারণ করে হরিময়বাবু বললেন, "ভদ্রলোক ছিলেন পিক্যুলিয়র প্রকৃতির—রাত সাড়ে-বারোটা থেকে ভোর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত কিছুতেই ঘুমোতে পারতেন না। রাতে কেবল ফলাহার—এই ফলার শেষ করে ঘড়ি ধরে সাড়ে-আটটায় শুয়ে পড়তেন। উঠে পড়তেন বিদঘুটে সময়ে। তখন আমার খোঁজ করতেন। আমি তখনও রাত জেগে পড়াশোনা করি। উপায় নেই, রাতদুপুরে দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে গপ্পো হত। ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার মিস্টার পিকলু!"

পিকলু আগ্রাহভরে জানতে চাইলো, বংশগোপালকে নিয়ে হরিময়বাবু ইতিমধ্যেই কিছু লিখেছেন কি না।

হরিময়বাবু জাতসম্পাদক। নিজে কিছুতেই গল্প-উপন্যাস লিখবেন না, এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। বললেন, "তোমার দাদুকে ঘটনাগুলো কিছুটা বলেছি। ওঁর হাতে এই বংশগোপাল বিশ্বাসের ক্যারাকটারটা খুব খুলবে।'

দাদু শুধু জিজ্ঞেস করেন, ওইরকম বে-আক্কেলে সময়ে বংশগোপালের ঘুম প্রতিরাতে ভেঙে যেতো কেন? আমি দু'-একবার বৃদ্ধ বংশগোপালকে সে কথা যে জিজ্ঞেস করিনি এমন নয়। ভদ্রলোক মূল প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিতেন,

'ষাট বছর ধরে এই অভ্যাস আমার। এখন আপনি জিজ্ঞেস করছেন, কেন ঘুম আসে না? আরে ইয়ংম্যান, পৃথিবীর সব কেনর কি উত্তর পাওয়া যায়? সবই ঠাকুরের ইচ্ছায়! তিনি কাউকে ঘুম দেন, কারও ঘুম তিনি কেড়ে নেন। তাও তো আমি ফরচুনেট, অন্তত রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চোখের পাতা বন্ধ করতে পারি, বাড়িতে তখন ডাকাত পড়লেও বোধহয় আমার ঘুম ভাঙবে না'।"

এই 'ঠাকুরের ইচ্ছে' কথাটা আধুনিক মননের পিকলু একেবারে সহ্য করতে পারে না। অলৌকিক কোনও ব্যাপারে সে থাকতে চায় না। ঠাকুর-ফাকুর পিকলু একেবারেই বোঝে না সত্যজিৎ রায়ের বইতে সে পড়েছে, অনেকে ঠগ মহাপুরুষ সেজে এই সংসারে লোক ঠকায়।

হরিময়বাবু হাসলেন। "ঠাকুরের ইচ্ছে কথাটা কেউ কেউ মুদ্রাদোষে বলে থাকেন। তোমার দাদু অবশ্য রসিকতা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তো টাকাকড়ির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখতেন না ; তা হলে 'মুদ্রাদোষ' কী করে হবে?"

বংশগোপালের ব্যাপারে ক্রমশ আরও কিছু জানা গেলো। তিনি বলতেন, "ঘুম সম্বন্ধে শত শত বই আমি পড়েছি, হরিময়। চার ঘণ্টার একটা সাইক্‌ল থাকে—তারপরে সহজেই একটু আড়মোড়া ভেঙে নেওয়া যায়।"

হরিময় তখন জানতে আগ্রহী। তা হলে তো বংশগোপালবাবু রাত দশটায় ঘুমোতে যেতে পারেন। সে চেষ্টা বংশগোপাল করেননি এমন নয়, কিন্তু কোনো ফল হয়নি।

বংশগোপাল বিশ্বাস একবার হরিময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ বইটা মন দিয়ে পড়লে দেখতে পাবে, ঠাকুর দেহত্যাগ করলেন কাশীপুরের বাগানবাড়িতে রাত্রি একটার পরে। সাড়ে বারোটা থেকে সেরাত্রে বাগানবাড়ির দোতলায় প্রবল উত্তেজনা—তখন কি কারও চোখে ঘুম আসে? তুমি বলো।"

হরিময়বাবু ঢোঁক গিলে পিকলুকে বললেন, "বড়লোকদের পিক্যুলিয়র সব খেয়াল থাকে। মানুষ্যজন্ম যখন হয়েছে তখন মৃত্যু তো আসবেই। যম তো কারফিউ বা সান্ধ্য আইন মানেন না, রাত দুপুরে তিনি সমন জারি করবেন না এমন কোনও কথা নেই। আর মিস্টার পিকলু, একটা জিনিস এখনও বুঝিনি, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রাতদুপুরে মর্ত্যলীলা সাঙ্গ করলেন বলে হাওড়ায় হিদারাম হালদার লেনে একজনের মাঝরাতের ঘুম চিরকালের জন্যে নষ্ট হয়ে যাবে কেন?"

পিকলু উত্তর দিল, "দাদু বলেন, বেঙ্গলে নানা রকম পাগল আছেন, এখানে

সব কিছুই সম্ভব! মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের মঙ্গলের জন্যেও এখানে ভক্তরা তিন মাস রাত জেগে না খেয়ে বসে থাকতে পারেন।”

হরিময়বাবু বললেন, “বংশগোপালবাবুর পাল্লায় পড়ে আমার চায়ের নেশা হয়েছিল। মাঝরাতে গল্প করার সময় আমার ঘুম তাড়াবার জন্যে বংশগোপালবাবু অতো রাতেও ফ্লাস্‌ক থেকে গরম চা ঢেলে আমাকে খাওয়াতেন। এই ফ্লাস্‌ক তিনি যুদ্ধের সময় সংগ্রহ করেছিলেন আমেরিকান এক মিলিটারি অফিসারের কাছ থেকে। অনেক খবর রাখতেন বংশগোপালবাবু। একবার বংশগোপাল বলেছিলেন, ‘জানো হরিময়, স্বামী বিবেকানন্দর কোনও ফ্লাস্ক ছিল না? অথচ খুব চা খেতে ভালবাসতেন। আর ওঁর মেজভাই মহিমবাবু তো চা খেয়ে একবার সিরিয়াস ক্যাফিন পয়জন অসুখেই পড়ে গিয়েছিলেন’।”

বংশগোপাল চায়ের গল্প শুরু করেছিলেন। “হোঁৎকাদাও খুব চায়ের ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। হোঁৎকা নামটা রেখেছিলেন নরেন্দ্রনাথ, স্বামী সারদানন্দকে ওই নামে ডাকতেন। সারদানন্দও কম রসিক নয়, মেজোভাই মহিমবাবুকে একবার বলেছিলেন, দত্ত বাড়িতে যে চায়ের রেওয়াজ ছিল সেটাই বরাহনগর মঠে ঢুকে গিয়েছিল। ভিক্ষে না জুটলে স্রেফ চায়েতে ক্ষিদে মারো। তোমরা হচ্ছো একটা নার্কটিক ফ্যামিলি! খিদের সময় চা খেয়ে সকলের লিভার খারাপ হয়ে গেল’ সারদানন্দ সস্নেহে বলতেন।”

মানুষটা যে কত কি জানতেন, কত সাবজেক্টেই যে বংশগোপালবাবুর গভীর আগ্রহ ছিল ভাবতে অবাক লাগে। মাঝে-মাঝে কিন্তু ভদ্রলোক বেজায় বিমর্ষ হয়ে পড়তেন।

বংশগোপালবাবু তখন বলতেন, “হরিময়, পৃথিবীতে যত শক্ত কাজ আছে তা কম বয়সী ছেলেমেয়েরাই করবে। ওই যে, ঠাকুর বলতেন, ছোটরা হলো খাঁটি দুধ—একটু ফুটিয়ে নিলেই ঈশ্বরের সেবায় লাগবে।”

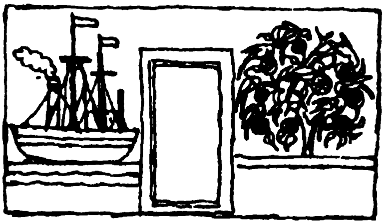
তারপর বংশগোপাল জিজ্ঞেস করেছিলেন, “এই ফুটিয়ে নেওয়া ব্যাপারটা কী বলো তো?”

হরিময়বাবু মাথা চুলকে উত্তর দিয়েছিলেন, “ওদের একটু তাতিয়ে নেওয়া, বাংলায় যাকে বলে কিনা অনুপ্রাণিত করা।”

বংশগোপাল একদিন বললেন, “শুনলাম, শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে বসে বসে তুমি একটা পত্রিকা বার করবার পরিকল্পনা করছো? শোনো হরিময়, বুড়োহাবড়াদের জন্যে এদেশে অনেক কাগজপত্তর আছে, ওসব লাইনে বেজায় ভিড়ও বটে। আমিও ছোটদের কথা ভাবছি কিছুদিন ধরে। তাদের জন্যে একটা

কাগজ বার করা যাক। যার পরিকল্পনা আমার, দায়িত্ব তোমার।”

“তা জানেন মিস্টার পিকলু, কাগজ বার করা তো আর সোজা কথা নয়। জায়গা লাগে, ছাপাখানা লাগে, কাগজ লাগে, টাকা লাগে, লোকবল লাগে। কিন্তু মিস্টার বংশগোপাল বিশ্বাস আমাদের চমচম পত্রিকার জন্যে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। হিদারাম হালদার লেনে বাড়িটার একটা অংশ আনন্দের সঙ্গে ছেড়ে দিলেন চমচমকে। বাড়ির কম্পাউন্ডেই ছাপাখানা বসিয়ে দিলেন। পত্রিকার এক বছরের পুরো খরচ আমার হাতে আগাম দিয়ে দিলেন।”



পিকলু তো অবাক। আশ্চর্য মেজাজের লোক তো এই বংশগোপাল! গাঁটের টাকা ঢাললেন, কিন্তু প্রকাশ্যে অথবা কাগজেকলমে পত্রিকার মালিক হলেন না, সেখানে বসিয়ে দিলেন হরিময় চৌধুরীর নাম।

বংশগোপাল হেসে বলেছিলেন হরিময়বাবুকে, “আমার বয়স হয়েছে। তুমি ইয়ংম্যান। আমার মৃত্যুর পরেও অনেকদিন তোমাকে চমচম বার করতে হবে হরিময়।”

হরিময়বাবু বললেন, “পাগল লোক মশাই! লেখালিখি করতে খুব ভালবাসতেন। পুরনো দিনের অনেক পুরনো কথা জানতেন। কিন্তু দিনের বেলায় একটি কথাও নয়, ওই রাতদুপুরে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ির দোতলায় নিয়ে গিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত বিষয়ে আলোচনা শুরু করতেন।”

মাঝে-মাঝে অবশ্য লিখিত নোট পাঠিয়ে দিতেন বংশগোপাল। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, “হরিময়, বুড়ো লোকের মুখের কথার কোনও দাম নেই। চোখ বুজলে, কে আর জবানের সম্মান দেবে? বংশধরদের সামলে রাখার সবচেয়ে সহজ উপায় লিখিত নির্দেশ দিয়ে যাওয়া। এই সব সম্পত্তি যতটুকু করেছি, তার কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, যদি না লিখিতভাবে কিছু ব্যবস্থা করে যাই।”

একরাতে বংশগোপাল বিশ্বাস হিদারাম হালদার লেনের বাড়িতে জেগে বসে আছেন। হরিময়বাবু সেখানে হাজির হয়ে দেখলেন, তিনি দাড়িতে হাত

বোলাচ্ছেন।

হরিময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বংশগোপাল বিশ্বাস বললেন, "আমাদের কালে ব্রাহ্মসমাজের মাথারা এই রকম দাড়ি রাখতেন ; এখন আর এই দাড়ি ফ্যাশনেবল নয়। হিন্দুদের মধ্যে মাস্টারমশায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর এরকম দাড়ি ছিল। আমি মধ্যিখানে অনেকদিন গোঁফ-দাড়ি সব কামিয়ে ফেলেছিলাম। তারপর একদিন কথামৃত পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ মাস্টারমশায়কে সামনে দেখতে পেলাম। ওঁকে জিজ্ঞেস করলাম, দাড়ি কেন? উনি সুরসিক। উল্টে জিজ্ঞেস করলেন, ঠাকুরের দাড়ি কেন? আমি বললাম, পরমহংসমশায়ের চামড়া ভীষণ নরম ছিল, ক্ষুরের টান সহ্য করতে পারতেন না। দাড়ি রাখা ছাড়া উপায় নেই। মাস্টারমশায় হঠাৎ আমাকে বলে বসলেন, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার ছিল। আমার কিন্তু ইঙ্গিতটা মোটেই ভাল লাগলো না।"

বৃদ্ধ বংশগোপাল রাতদুপুরে হঠাৎ হরিময়বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা তো ভাল ব্যাপার নয়! মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তো দেহরক্ষা করেছেন, নাইনটিন থার্টি টুতে। আর এখন এই নাইনটিন ফরটিসিক্সে আমার সঙ্গে দেখা করার সাধ কেন?" বোঝা গেলো, বুড়ো মানুষ ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

হরিময়বাবু ভরসা দিলেন। "শুধু শুধু মৃত্যুর ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছেন আপনি। রাত্তিরবেলায় ওই কথামৃত বইটা অমন মনোযোগ সহকারে আপনি পড়বেন না।"

বৃদ্ধ বংশগোপাল রাতের অন্ধকারে তখনও অসহায় বোধ করছেন। হরিময়ের হাতটা ধরে বললেন, "ইয়ংম্যান, আমার বয়স বিরাশি। এইট্টি পেরিয়ে মৃত্যুভয় থাকার কোনও মানে হয় না, আমারও নেই। কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরকে ঠিক বোঝা গেলো না। কে যে কি চাইতেন তাঁর কাছে, আর কাকে যে তিনি কি দিতেন তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। ভাবতে গেলে আমার মাথা একেবারে গোলমাল হয়ে যায় হরিময়।"

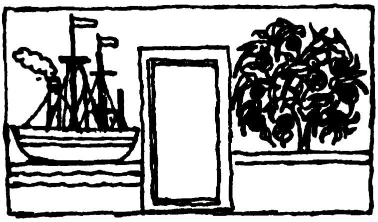
হরিময়বাবু পিলকুকে বললেন, "মনে হতো, ব্রাদার, মানুষটা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে এবং বিবেকানন্দর গুরুভাইদের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানেন। কিন্তু ভদ্রলোক সযত্নে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেন। একদিন মুখ ফসকে বললেন, "মাস্টারমশাই লিখেছেন তাঁর কথা, কিন্তু সে আর কতটা? লিখতে যারা পারতো তারা কিন্তু লেখেনি। শশী, নিরঞ্জন, সারদা, তুলসী, নরেন—এরা তাঁর সম্বন্ধে প্রায় কিছুই লিখলো না। ফলে অনেক কিছু গোপন থেকে গেলো।"

হরিময়বাবু বললেন, "ভাই পিকলু, এই কথাগুলো শুনে তো আমি অবাক!

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ লিটারেচর আমিও কিছুটা পড়েছি কটকে বাল্যকাল কাটাবার সময়।'

বংশগোপাল নিজেই খেয়ালেই একদিন হরিময়কে বললেন, "দিনলিপি লিখতো যদি শশী মহারাজ—ঠাকুরের নিত্য সেবক। তা হলে কী কাণ্ড যে হয়ে যেতো। কিন্তু তিনি কলম ধরলেন না। ঠাকুর চলে যাওয়ার পরেও টানা বারোবছর পুজোর ঘর আগলে রেখেছিলেন, একদিনের জন্যেও কোথাও যাননি। কথামৃতের মাস্টারমশাই তো শুধু ছুটির দিনে আসতেন। মাত্র কয়েকঘণ্টা শুনতেন সব কিছু, তারপর বাড়ি ফিরে গিয়ে ডায়েরিতে নোট করতেন। তবে শ্রুতিধর পুরুষ ছিলেন। শশী মহারাজও শ্রুতিধর—কিন্তু কি একটা ভেবে, সব বিবরণ চেপে গেলেন। শুধু ঠাকুরের নামটাই নিজের শরীরে বহন করে হয়ে গেলেন, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ!"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলো ইয়ং পিকলু। ব্যাপারটা ক্রমশই বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে, যদিও ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবন তাকে তেমন টানে না। গদগদ হয়ে সাধক পুরুষদের ভক্তি করতে গিয়েই তো দেশটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। এদেশে বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি নেই, কোথাও একফোঁটা সায়ান্স নেই, সর্বত্র স্রেফ অন্ধ ভক্তি।



হরিময় একসময় হুড়মুড় করে পিকলুকে চমচম পত্রিকার আদিপর্বটা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

এই পর্বে এক এক গভীর রাতে নিশিজাগা বংশগোপাল বিশ্বাস লিখিতভাবে এক একটা বিষয় হরিময়ের কাছে উত্থাপন করতেন। তারপর আলোচনা চলতে-চলতে রাত তিনটে বেজে যেতো। বিপত্নীক বংশগোপালের চোখে তখনও ঘুম আসতো না। তিনি হরিময়বাবুকে বিদায় দিয়ে আলো নিবিয়ে হিদারাম হালদার লেনের দোতলায় পুব-দক্ষিণের ঘরটায় বসে থাকতেন ঘুমের প্রত্যাশায়।

একদিন বংশগোপাল বললেন, "আমি টাকা জুগিয়েছি বলে চমচম কাগজটা

আমার জমিদারি নয়, হরিময়। কাগজের প্রাণ হলে তুমি, অ্যাজ সম্পাদক। এই আমি লিখিত নির্দেশ দিলাম, আমি মাঝে-মাঝে লেখা পাঠালেও, তুমি মোটেই তো ছাপাতে বাধ্য থাকবে না। তুমি যদি আমার বাজে লেখা ছাপো তা হলে তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া যাবে।"

সেই কাগজটা হরিময়বাবু কাচের ফ্রেমে বাঁধিয়ে এখনও হিরাদাম হালদার লেনের সম্পাদকীয় দপ্তরে রেখে দিয়েছেন।

আরেক দিন গভীর রাতে বংশগোপাল বিশ্বাস এক টুকরো কাগজ হরিময়ের হাতে তুলে দিলেন। চমচম পত্রিকা মাসিক পাঁচসিকে ভাড়ায় এই হিদারাম হালদার লেনে থাকবে অনির্দিষ্ট কাল ধরে।

অদ্ভুত মেজাজ এই বংশগোপালের—ভাড়ার ব্যাপারে একটা আজব শর্ত আরোপ করেছেন। ভাড়া মাত্র পাঁচশিকে করা হলো এই শর্তে যে হিদারাম হালদার লেনের বাড়ির লাগোয়া যে উঠোন রয়েছে সেখানকার তুলসী মঞ্চে নিত্যপ্রদীপ জ্বালাবার ব্যক্তিগত দায়িত্ব থাকবে চমচম সম্পাদকের।

"আপনি এখনও তুলসীতলায় আলো দিচ্ছেন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে পিকলু। "এতো বড় সম্পত্তির ভাড়া মাত্র পাঁচ সিকে!"

"ফিফটি ইয়ার্স ধরে প্রতি সন্ধ্যায় বংশগোপালের বংশে বাতি দিয়ে চলেছে এই চমচম ম্যানেজমেন্ট", সগর্বে জানালেন হরিময়বাবু। "তবে তো, এই যুগেও পাঁচসিকে ভাড়ায় বিশাল জায়গাটা চমচমের আয়ত্তে রয়েছে। ছাপাখানা, গোডাউন, অফিস ফার্নিচার এটসেটরা সব লিখিতভবে চমচমকে দিয়ে দিয়েছেন বংশগোপাল। বলেছেন. কলকাতার সরস্বতী প্রেস শুরু করেছিল বিপ্লবীরা তিনি হাজার টাকার সেকেন্ড হ্যান্ড মেশিন দিয়ে। তার আগে গৌরাঙ্গ প্রেস শুরু করেছিলেন বিপ্লবী সুরেশ মজুমদার, উইথ হেলফ ফ্রেম স্নেহের গণেন।"

"ইনি আবার কে?" হরিময়বাবুর তখন এসব জানা ছিল না।

"গণেন মহারাজের নাম শোনোনি? সে কি? এই তো ক'বছর আগে বহু কষ্ট পেয়ে, অনেক মনোকষ্ট সহ্য করে, কম বয়সে দেহরক্ষা করলেন। ড্রামাটিক জীবন, আমার থেকে বয়স বেশ কম ছিল—ভেরি বোল্ড, ভেরি ব্রাইট। ছাপাখানার ব্যাপারটা খুব ভালো বুঝতো, সিস্টার নিবেদিতার বিশেষ ফেভারিট ছিল। শেষ দিকে গণেন মহারাজের ডায়াবিটিস হয়েছিল। আমাদের এই চমচম প্রেসও একদিন সুবিশাল হয়ে উঠবে—লাভের সব টাকা চমচম পত্রিকাকে আরও ভাল করবার জন্যে খরচ করা হবে।"

হরিময়বাবুর মনে আছে, সেদিন ছিল শনিবার। বংশগোপাল বিশ্বাস

রাতদুপুরে খবর করলেন হরিময়বাবুর। দোতলায় আরাম কেদারায় বসে তিনি বললেন, "লিখিত নির্দেশ রেখে গেলাম, তোমাকে মান্য করতে হবে।"

"আপনার দয়াতে আপনারই আশ্রয়ে রয়েছি, এসব আপনি কি বলছেন?"

পাতলা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বংশগোপাল বললেন, "শ্রীম যেভাবে আমাকে ট্রাবল দিয়ে চলেছেন তাতে ঠিক বুঝতে পারছি না। হয়তো ডেকে নেবেন। কিন্তু শোনো, তোমাকে কথা দিতে হবে, এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের বাড়িটা চমচম কখনও ছাড়বে না, এই আমার অন্তিম ইচ্ছা।"

এই রকম অদ্ভুত রিকোয়েস্ট বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কেউ কখনও শোনেনি এই দুনিয়ায়। কী করবেন, রাজি হয়ে গেলেন হরিময়বাবু. অন বিহাফ অফ দ্য চমচম।

এই যে নজর আলি লেনের ছোট্ট দোতলা বাড়ি এক কাঠা জমির ওপর এ তো বংশগোপালবাবুর প্রপার্টি। সেকালে কর্পোরেশনের নিয়মকানুন অতো কড়া ছিল না, তাই বাড়িটা হয়েছিল।

হরিময়বাবু মানুষটি তারপর এই এত বছর ধরে চমচম ছাড়া আর কোনও কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েননি।

অবিবাহিত মানুষ। রসিকতা করে হরিময় বলেন, "স্ত্রী বলো, পুত্র বলো, কন্যা বলো, নাতি বলো, নাতনী বলো সবই এই চমচম। এই কাগজের উত্তরোত্তর উন্নতি করার পুরো দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন বংশগোপাল বিশ্বাস। সেই বোঝা এই বৃদ্ধ বয়সেও বয়ে বেড়াচ্ছি। মাথায় টাক পড়েছে, কিন্তু মনে টাক পড়তে দিইনি। সেভেনটি সিক্স ইয়ার্সেও দাঁত পড়েনি, তবে মাঝে মাঝে আকস্মিক দন্তহর্ষ হয়।"

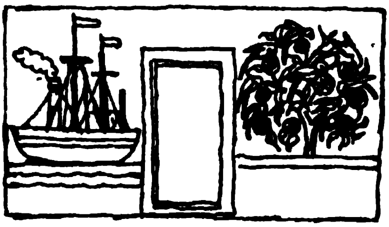
পিকলু একটু অসুবিধায় পড়ে গেলো, দাঁতের হাসি ব্যাপারটা কী?

হরিময়বাবু মজা পেলেন। "দেঁতো হাসি আর দন্তহর্ষ যে এক নয় তা তোমার দাদু ভবনাথ সেনকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে। উনিই সেবার ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করলেন। দেঁতো হাসি মানে মেকি হাসি, হাসতে হয় তাই হাসা। কিন্তু দন্তহর্ষ অতি সিরিয়াস ব্যাপার। দাঁত যখন সিরসির করে তখন লাইফে কোনও আনন্দ অবশিষ্ট থাকে না। এ বিষয়ে বাংলায় সুযোগ্য আর্টিকেল লিখতে পারতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ডেনটিস্ট ডাক্তার আর আমেদ। তিনি যখন নেই তখন রিকোয়েস্ট করবো ওয়াটার্লু স্ট্রিটের ডাঃ বারীন রায়কে, তবে এখন নয়। যখন চমচমের স্পেশাল সংখ্যা বেরুবে। বিষয় অনুযায়ী নামও ঠিক হয়ে রয়েছে, 'দন্তকৌমুদী' সংখ্যা।"

পিকলু নিজেও দাঁতের গোলমালে একটু-আধটু কষ্ট পায়—দাঁতে পোকা, দাঁতে গর্ত এবং আক্কেল দাঁত। সে এই বিষয়ে আগ্রহী। পিকলু বললো, "আপনার এই দান্তে সংখ্যাটা খুব ভাল বিক্রি হবে হরিময়দাদা।"

হরিময়বাবু খুশি হলেন। টেকো মাথা দেখিয়ে বললেন, "ওপরে ঘাস নেই, কিন্তু তা বলে ভেবো না জমি অনুর্বর—যা কিছু আইডিয়া গজায় সব ভিতরের দিকে। অন্তত দেড়শটা স্পেশাল সংখ্যার বিষয় ভিতরে স্টোর করা রয়েছে। ঠাকুরের ইচ্ছায়, কোনও দিন এই চমচম পত্রিকার স্পেশাল ইস্যুর বিষয়ের অভাব হবে না, শুধু বিষয়গুলোকে খেলিয়ে ভালভাবে লেখার লোক কমে যাচ্ছে। ভবনাথ সেনের মতন লেখক তো আর বঙ্গজননী এখন ডজন ডজন সৃষ্টি করছেন না, বুঝেছো মিস্টার পিকলু! আগে কিন্তু এমন খরা ছিল না, সম্পাদক চাইলেই সুযোগ্য লেখক সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যেতেন।"

পিকলু ততক্ষণে ঘড়ি দেখছে, হরিময়দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে এখনই ছুটবে সল্টলেকে। দাদুর টেবিলে বসেই ইংরিজি প্রবন্ধটা সোজাসুজি টাইপ করে ফেলবে। আজই খবরের কাগজে লেখা জমা দেবার ডেড লাইন।



ওইটুকু ছেলে পিকলু যে সাংবাদিক হিসেবে এমন কাণ্ড করে বসবে তা চমচম-সম্পাদক স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি!

আজ সকাল সাতটা থেকে নজর আলি লেনে হরিময়বাবুর সিটি অফিসে ঘন ঘন ফোন আসছে। খুব স্টাইলে হরিময়বাবু ফোন তুলে অ্যানাউন্স করছেন—"দ্য চমচম!"

ভবনাথ সেনই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছেন, বাংলায় যা চমচম, ইংরিজিতে তা হয়ে যায় দ্য চমচম।

"দ্য স্টেটসম্যানে আপনার সম্বন্ধে দুর্দান্ত লেখা পড়লাম, শিশুবিভাগে।"

"তাই তো স্বাভাবিক, বুড়ো বিভাগে হরিময় চৌধুরীর তো এখনও অধঃপতন হয়নি।"

গুণধরকে নিউজস্ট্যান্ডে পাঠিয়ে দু'খানা দ্য স্টেটসম্যান কিনিয়ে আনালেন হরিময়বাবু। আজ যা অবস্থা, শেষ পর্যন্ত চমচমের শেষ সংখ্যার মতন দ্য স্টেটসম্যান না ব্ল্যাকে চলে যায়। কাগজবিক্রেতারা বেজায় বুদ্ধিমান, কোনও বিশেষ গন্ধ পেলেই স্টকের সব কাগজ চেপে দেয়, তারপর প্রত্যেক কপি নগদ পাঁচ টাকায় বিক্রি করবে।

হরিময়বাবু ইংরিজি কাগজটা সবে খুঁটিয়ে দেখছেন। তাঁর চোখজোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠলো। আড়াই কলম জুড়ে বিরাট ছবি তাঁর। "নিজের ছবি কখনও কাগজে দেখিনি ভাই, ফিফটি ইয়ার্স ধরে শুধু পরের ছবি চমচমে ছেপেছি।"

এক ভক্ত টেলিফোনে বললো, "হরিময়কাকু, আপনি তো সেবার সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন, আয়না অন্যকে প্রতিফলিত করে, কিন্তু নিজে কখনও প্রতিবিম্বিত হয় না।"

সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, ছবিটা কোথা থেকে পেলো তা এখনও বুঝতে পারছেন না হরিময়বাবু। সেদিন তো মিস্টার পিকলুর সঙ্গে কোনও ফটোগ্রাফার ছিল না। জানলে, কাপড়ের খুঁট দিয়ে টাকের চকচকে ভাবটা একটু মুছে নিতেন।

ভীষণ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন হরিময়বাবু। কোথা থেকে কে বলে এই ছবি সংগ্রহ করলো? প্রাইভেসি বলে আর কিছু থাকলো না। সিরিয়াস সাবজেক্ট—ছবিতে গাঙ্গুরামের একটা বড় বাক্স থেকে সাজানো মিষ্টি চমচম দেখা যাচ্ছে, আর সেই বাক্স গদগদভাবে ধরে রয়েছেন সম্পাদক হরিময় চৌধুরী।

ব্যাপারটা যখন আরও রহস্যময় হয়ে উঠছে তখন স্বয়ং ভবনাথ সেন টেলিফোন করলেন। "হরিময়, আজ চমচমের গর্বের দিন। সমস্ত ইন্ডিয়ায় তোমার এবং তোমার কাগজের নামটা এবার ছড়িয়ে পড়বে।"

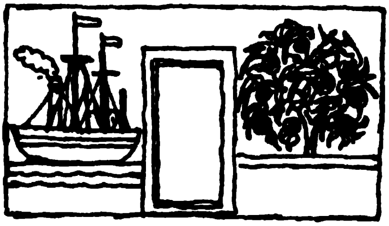
"কিন্তু ছবির ব্যাপারটা আমাকে ভীষণ নার্ভাস করে তুলেছে স্যার। আমার অজ্ঞাতে আমার এমন ছবি কবে এবং কখন তোলা হলো? এ এক বিপুল রহস্য!"

খুব হাসলেন প্রবীণ সাহিত্যিক ভবনাথ সেন। "তুমি সত্যিই হাসালে হরিময়। অপকর্মটি করেছেন চিত্রসাংবাদিক মনা চৌধুরী। বাংলার সমস্ত লেখকের ছবির যিনি চলমান ট্রেজারার! তোমার মনে নেই? সেবার আমার জন্মদিনে তুমি এক বাক্স মানিকতলা গাঙ্গুরামের টাটকা চমচম আনলে। তখন মনা চৌধুরী আমার বাড়িতে বসেছিলেন। তোমাকে হাসতে দেখেই ফ্ল্যাশ মারলেন। এবারে পিকলু ওঁর সঙ্গে চুপিচুপি যোগাযোগ করে ফ্রেম থেকে আমাকে বাদ দিয়ে তোমার

ছবিটা বড় করে নিয়েছে।"

"পিকলু! পিকলু!" এবার আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন হরিময়বাবু। "দাদুর খ্যাতি মনে হচ্ছে নাতি একদিন ম্লান করে দেবে। নাতির কলমের জোর ভীষণ, ভবনাথবাবু।"

"কচি কলম তো, ধার একটু বেশি থাকবেই," সস্নেহে বললেন লেখক ভবনাথ সেন।



বৃহস্পতিবার। কিছুক্ষণ পরেই আবার ১৪ নম্বর নজর আলি লেনের বাড়ির কলিংবেল বেজে উঠলো।

দুজন অচেনা লোক (একজন দাড়িওয়ালা) আচমকা চমচম সিটি অফিসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁরা ঘরে ঢুকেই হরিময়বাবুর পালিশ-চটা তিন ফুট-বাই-দু'ফুট টেবিলখানা টোকা মেরে দেখতে আরম্ভ করেছেন।

মাথায় হাত দিয়ে বসলেন হরিময়বাবু। এঁরা 'পুরাতনী' বলে এক অ্যান্টিক এজেন্সি খুলেছেন। এর পিছনে কৃপালনী বলে হংকংনিবাসী এক কোটিপতি সিন্ধি অনাবাসী ভারতীয় আছেন। লাখ লাখ টাকা ঢেলে পুরনো সব স্মৃতিবিজড়িত জিনিসপত্তর বিভিন্ন পরিবার থেকে ক্রমশ কিনে নিচ্ছেন এঁরা। কিছু দিন পরে এইসব দুষ্প্রাপ্য জিনিস থেকে কোটি কোটি টাকার মুনাফা উঠবে।

হরিময়বাবু দুই অজানা অতিথির হাতেও বড়বাজারের গুপ্তা ব্রাদার্স থেকে আনা গুইপুরিয়া তুলে দিলেন। তারপর গরম চা অফার করলেন। কৃপালনীর ম্যানেজার মিস্টার সামতানি বললেন, "নেপোলিয়নের টয়লেটে যে কমোড ছিল তার এখন কত বিলিয়ন ডলার দাম উঠেছে জানেন? খোদ অস্ট্রিয়ার এম্পায়ার নিজে ওটা প্রেজেন্ট করেছিলেন নেপোলিয়ানকে কোনও একটা বড় যুদ্ধের পরে।"

মিলিয়ন এবং বিলিয়নে ভীষণ গোলমাল হয়ে যায় হরিময়বাবুর। "কোনটা যেন বড়?" তিনি জানতে চাইছেন, ব্যাপারটা মনে থাকে না।

"আরে মশাই, 'পুরাতনী'র বাজারে, মিলিয়ন কোনও ব্যাপারই

নয়—নিতান্তই ছেলেমানুষ। জেনে রাখুন, হাজার মিলিয়নে এক বিলিয়ন হয়। অর্থাৎ একশ কোটি!"

ঘেমে উঠেছেন হরিময়বাবু। আন্টিক এজেন্সির পক্ষ থেকে মিস্টার সামতানি তাঁকে এই ভাঙা সম্পাদকীয় টেবিলখানার জন্যে নগদে তিরিশ হাজার টাকা অফার করছেন। এখনই কাঁচা টাকা গুঁজে দিয়ে এটা কিনে নিয়ে যেতে তৈরি তিনি এবং তাঁর সহকারী।

"চেপে রাখবেন না স্যার, আজই দ্য স্টেটসম্যান কাগজে মিস্টার পুণ্যশ্লোক সেনের প্রবন্ধে পড়েছি, আদি যুগের বিপ্লবীরা আপনার এই টেবিলে বসে কাজ করতেন। বিখ্যাত হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার উৎপত্তি হয়েছিল এই টেবিলে।"

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠছে হরিময়বাবুর। ওঁদের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিয়ে হরিময় প্রকৃত খবর জানতে চাইলেন। সামতানি খাসা বাংলা বলেন, নিউ মার্কেটের পিছনে চৌরঙ্গী লেনে সামতানির জন্ম।

সামতানি বললেন, "আজ সকালে কাগজে দেখলাম, যে-টেবিলে আপনি কাজ করেন সেটি বংশগোপাল বিশ্বাস আপনাকে দিয়েছিলেন, এই শর্তে যে এই টেবিলে সম্পাদকীয় কাজ হবে। এবং এটি এক সময় ব্যবহার করতেন অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত।"

তড়িৎ গতিতে কাজ করতে হয় প্রত্যেক অ্যান্টিক এজেন্সিকে। কাগজ পড়েই পুরাতনীর প্রতিনিধি সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়েছেন, ওঁদের মাইনে করা ঐতিহাসিক সখারাম সেনের কাছে। তিনি কোন এক ডি.আই.জি. সামন্তর লেটেস্ট বই খুলে বললেন, টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির গোড়ায় কুখ্যাত পুলিশ অফিসার শামসুদ্দিন আলমকে কলকাতা হাইকোর্টের সামনে গুলি করে মেরে স্থানীয় দারোয়ানদের হাতে ধরা পড়েছিলেন বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ। তখন সব হইহই করা সিস্টেম—গুলি করে বীরেন্দ্রনাথ ধরা পড়লেন ২৪ জানুয়ারি, আর বিচার শেষ করে বীরেনের ফাঁসি হয়ে গেলো ২১ শে ফেব্রুয়ারি।"

এই বীরেন দত্তগুপ্ত হাওড়ায় থাকতেন এবং এই টেবিল ব্যবহার করতেন। সামতানি বললেন, "এখন শহিদদের অ্যান্টিক বাজার একটু মন্দা। সূর্য সেনের একটা চিঠি দু'হাজার টাকাতেও কেনবার খদ্দের নেই। লোকে এখনও তেমন উৎসাহী হচ্ছে না, কিন্তু সামনে খুবই ভাল সময় আসছে। তখন এইসব জিনিসের দাম হু-হু করে বেড়ে যাবে, কিন্তু তখন হয়তো মালের সরবরাহ থাকবে না।"

হরিময়বাবু অবশেষে হাতজোড় করে বললেন, এসব কিছুই বেচবার ইচ্ছে তাঁর নেই। বরং যদি কখনও বাঘাযতীন মিউজিয়ম হয় সেখানে টেবিলটা দিয়ে

দেবেন, কারণ দত্তগুপ্তর ফাঁসির আগে পুলিশ বুঝতে পেরেছিল এসবের পিছনে রয়েছেন খোদ বাঘাযতীন। তখন মশাই সরষের মধ্যেই ভূত—যতীন মুখুজ্যে ছিলেন কলকাতার রাইটার্স বিলডিংসে খোদ হোম ডিপার্টমেন্টে স্টেনোগ্রাফার। ভাল কাজের জন্যে টপাটপ প্রমোশন পাচ্ছিলেন। দুঃসাহসটা এবং বুকের কলজেখানা বুঝুন।

এই সময় নজর আলি লেনে পিকলুর পুনরাবির্ভাব। আই-আই-এম জোকা ক্যামপাস থেকে সোজা সে চলে এসেছে হরিময়বাবুর সন্ধানে।

সাদর আহ্বান জানালেন হরিময়বাবু। "এসো, এসো মিস্টার পিকলু। পুরাতনীর মিস্টার সামতানি এবং কোম্পানির বিশ্বস্ত কর্মী মিস্টার স্যান্যালের সঙ্গে একটু আলাপ করো। এঁরা বলছেন, জিনিস যত পুরনো হয় তত তার দাম বাড়ে। অলরেডি, রবিঠাকুরের এক পেয়ার চটির দাম আঠাশ হাজারে উঠে গিয়েছে। কেনবার খদ্দের রয়েছে বাংলাদেশে—চেক দিয়ে চটি নিয়ে চলে যাবে।"

পিকলুর কৌতূহলের শেষ নেই। সে জানতে চাইলো, "কার পুরনো চটির দাম এখন সবচেয়ে বেশি?"

সামতানি একটু ভেবে বললেন, "দাম হলেই তো হলো না, মাল সাপ্লাই তো চাই। দিন না এক পেয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চটি—আড়াই লাখ টাকা ইজিলি পেয়ে যাবেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জিনিসের আগে তেমন বাজার ছিল না, এখন হচ্ছে। ভক্তেরা যক্ষের মতন স্মৃতিচিহ্নগুলো আগলে রেখেছেন। বিক্রির কথাই ওঠে না। প্রাইস হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, অথচ বাজারে কোনও সাপ্লাই আসছে না।"

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, "কেন? সময় চলে যাচ্ছে বলে?"

সামতানি বললেন, "আমরা স্যর অ্যান্ট্রিক ডিলার, অতশত বুঝি না। লোকে দাম দিতে চাইলে আমরা জিনিস খুঁজে দিই। ইদানীং ফরেন থেকে অনেক এনকোয়ারি আসছে—রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, সারদা দেবী সম্বন্ধে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে। এমনকি রাজামহারাজ সম্পর্কে। তাই দামও চড়চড় করে বাড়ছে। শ্রীশ্রী মা সারদা দেবীর একটা পিতলের ঘটি আমরা লন্ডনে গোপনে সাপ্লাই করেছি—এক লাখ আশি হাজারে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত গাড়ুর কোনও দাম পাচ্ছি না—অথচ কর্মাটার থেকে ওটা স্পেশালি সংগ্রহ করতে আমাদের সতেরশ টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে।"

সামতানি ও তাঁর সাকরেদ বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছেন হরিময়বাবুর সঙ্গে। তিনি বোধ হয় ইতিমধ্যেই পুরাসংগ্রহ সম্পর্কে চমচমের বিশেষ সংখ্যার কথা ভবছেন।

সামতানিও বেশ খুশি। হরিময়বাবুর কাছে তিনি প্রস্তাব তুললেন, হিদারাম হালদার লেনে তাঁরা যাচ্ছেন শীঘ্রই। আজই ওঁদের যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তা সম্ভব নয়। কারণ একটা সায়েববাড়ির টেন্ডার দেবার জন্য এখান থেকে মেরিলিন পার্কে ছুটতে হবে।

সামতানি বললেন, "পয়সা তো এখন সায়েববাড়ি ভেঙেই! পুরনো সব বাড়িতে বার্মা টিক, ইটালিয়ান মার্বেল, ভেনিশিয়ান কমোড রয়েছে। লোকে এসব কেনবার জন্যে উঁচিয়ে আছে! কলকাতা সায়েববাড়ির মড়ক লেগে গিয়েছে স্যার, সব পুরনো বাড়ি ডেভেলপারদের রাক্ষুসে নজরে পড়ে গিয়েছে। সায়েববাড়ি ভেঙে ফেলে দেশলাইয়ের বাক্সর মতন ফ্ল্যাট না তোলা পর্যন্ত কলকাতার কারও চোখে ঘুম নেই। আমরাও টুপাইস করছি সায়েববাড়ির সর্বনাশের দৌলতে।"

পিকলু এতক্ষণ সামতানির সহকারীকে মন দিয়ে দেখেছে। দাদু ভবনাথ সেনের একটা গল্প গত রাত্রে সে পড়েছে প্রত্যেক মানুষের মুখেই একটা বিশিষ্টতার ছাপ থাকে, সেটা স্মরণে রাখলে চিনতে কখনও ভুল হয় না। হরিময়বাবুর ডান চোখটা মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় এবং কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাঁর চোখের পাতা পিটপিট করে।

সান্যালের বিশেষত্বটাও একটু ভাবতেই নজরে পড়ে গেলো। ভদ্রলোকের উপরের ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটা লম্বা কাটা দাগ রয়েছে—বোধ হয় ঠোঁটকাটা অবস্থায় জন্ম। তারপর প্লাস্টিকসার্জেন চমৎকার মেরামতি করে দিয়েছেন। এবড়ো-খেবড়া দাঁত, কাটা ঠোঁট, ট্যারা চাহনি এসবের যন্ত্রণা আজকাল টাকা থাকলে মানুষকে আর সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয় না। জয় হোক বিজ্ঞানের।

তোতলা এবং মূকবধিরদের এই রকম একটা ডাক্তারি গতি হলে বেশ হতো। হরিময়বাবুকে বলে লাভ নেই। এখনই চমচমের একটা বিশেষ সংখ্যার পরিকল্পনা পাকা করে ফেলবেন। এমনিতেই তো দন্তশূল সংখ্যার জন্যে তিনি প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। পিকলুকে রিকোয়েস্ট করেছেন, একটা স্পেশাল প্রবন্ধ খাড়া করবার জন্যে ইংরিজিতে। তারপর হরিময়বাবু নিজেই সেটা ঝরঝরে বাংলায় অনুবাদ করে নেবেন।

সান্যাল ও সামতানির লোকটি ওঠবার কোনো আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

হরিময়বাবু হাতজোড় করে বললেন, শহিদ বীরেন দত্তগুপ্তর টেবিল তিনি ব্যবহার করছেন বটে, কিন্তু বিক্রি করবার মালিক নন। বংশগোপাল বিশ্বাস মশায় এইসব জিনিস বিক্রি করা সম্পর্কে কোনো নির্দেশ রেখে যাননি।

অতি সরল মানুষ এই হরিময়বাবু। তিনি সরল মনে চমচমের আদিপর্বে বংশগোপালবাবুর বদান্যতার সব কাহিনী পুরাতনীর দুই প্রতিনিধির কাছে নিবেদন করলেন।

এঁরা মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বিস্ময় প্রকাশ করলেন। এরকম অদ্ভুত বাড়িওয়ালার কথা তো ইতিহাসে শোনা যায়নি। ভাড়াটেকে লিখিত নির্দেশ দিচ্ছেন, কিছুতেই হিদারাম হালদার লেন ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

হরিময়বাবু উৎসাহের সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন, "মনে রাখতে হবে, এখানে সব কিছু স্পেশাল। যেমন স্পেশাল চমচম পত্রিকা, তেমন স্পেশাল তার প্রতিষ্ঠাতা এবং শুভানুধ্যায়ী বংশগোপাল বিশ্বাস।"

সামতানির আগ্রহ যেন বাড়ছে। "উনি কি কোনো শোক বা মানসিক আঘাত পেয়েছিলেন, সেই সময়?"

হরিময়বাবু বিরক্ত হলেন। "বিষয়ী লোক আমরা। নজরটা একটু নিচু। তাই ভাবছি, বংশগোপাল বিশ্বাস স্বেচ্ছায় কোনো মহান কাজ করে যেতে পারেন না। আরে মশাই, লোকটার আলমারিতে ঠাসা ঠাসা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের বই ছিল। যাঁরা এই সব নিয়ে চর্চা করেন তাঁরা অবশ্যই একটু অন্যরকম হতে পারেন।"

কেন জানি না, এই দুটি লোককে পিকলুর ভাল লাগছে না। হরিময়বাবু বোধ হয় বুঝলেন ব্যাপারটা। তিনি হাতজোড় করে সামতানি ও সহকারীকে বললেন, "আপনারা তো ভালই বাংলা বলেন। লিখুন না এই সব পুরনো জিনিসের কথা আমাদের চমচমে। শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত ঘটির বিবরণটা পাঠকরা নেবে।"

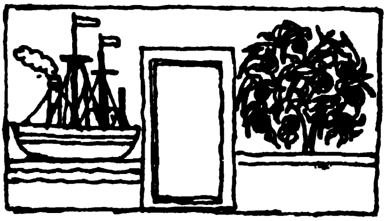
প্রায় জোর করেই এবার দু'জনকে বিদায় দিলেন হরিময়বাবু। এই ভদ্রলোক দু'জন নাছোড়বান্দা। জানিয়ে গেলেন, তাঁরা আবার যোগাযোগ করবেন নজর আলি লেনে।

"এখানে নয়, বরং আপনারা খবর করবেন আমাদের প্রধান কার্যালয় হিদারাম হালদার লেনে," অনুরোধ করলেন হরিময়বাবু। ওঁরা বিদায় নিতে হরিময়বাবু বললেন, "আমার বুদ্ধিটা দেখলে! ইচ্ছে করেই হাওড়ার ঠিকানাটা দিয়ে দিলাম। ওখানে যা ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে, খুব টান না পড়লে কেউ ওদিকে যাবে না সমস্ত দিনটা নষ্ট করতে।"

হরিময়বাবু এবার শ্রীমান পিকলুকে অভিনন্দন জানালেন। চমচম সম্পর্কে

যেসব চাঞ্চল্যকর সংবাদ সে ইংরিজিতে লিখেছে তা যে ভবনাথ সেনের বিশেষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতো না তা তিনি আন্দাজ করেছেন।

হরিময়বাবু বললেন, "পিকলু তুমি আই-আই-এম জোকার ম্যানেজমেন্ট পাঠক্রম ঝপ করে সেরে ফেলো। তারপর দুর্গানাম করে নেমে পড়ো দাদুর এই লেখার লাইনে। ইংরিজি এবং বাংলায় একই সঙ্গে লেখনি চালনা করলে সারা দুনিয়ায় হই-চই পড়ে যাবে।"



পিকলুর মুখে এই মুহূর্তে তেমন হাসি ফুটছে না।

সে বললো, "ঠোঁটে কাটা দাগ লোকটাকে মোটেই ভাল লাগলো না, দাদু।" পিকলু বোধ হয় অজানা কোনো আশঙ্কার আগাম গন্ধ পাচ্ছে।

হরিময়বাবু অবশ্য ব্যাপারটা হাল্কা ভাবে নিতে চাইছেন। "হারাবার কিছু থাকলে তবে তো ভয়? চমচমে আমাদের কিছু লুকোবারও নেই, হারাবার নেই।"

কিন্তু তাঁর মনেও যে কিছু চিন্তা জমা হয়ে আছে তা হরিময়বাবু লুকিয়ে রাখলেন না।

ইংরিজি কাগজে এতো সুনাম বেরিয়েছে চমচমের, তবু যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হবার কারণ রয়েছে হরিময়বাবুর।

পিকলু বুঝতে পারছে, হরিময়বাবুর মনে তেমন আনন্দ নেই। সেই সেবার যখন এই কলকাতাতেই সর্দির ভাইরাস চোরদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তখনও ওঁর মুখে এইরকম আধা-মেঘলা ভাব ছিল।*

এবার একটু নাড়া দিতেই হরিময়বাবু দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করলেন, "সকাল থেকে ফোন তো এলো সাড়ে-সাতাশটা, কিন্তু কাজ কী হবে?"

সাড়ে ব্যাপারটা হরিময়বাবু নিজেই বুঝিয়ে দিলেন। "পুরো ফোন এলো সাতাশটা, কিন্তু একটা হাফ। ফোন এলো, হ্যালো বললাম, কিন্তু কোনও উত্তর কানে এলো না। বোধ হয় হাওড়া কিংবা শিয়ালদার পাবলিক বুথ থেকে কেউ ফোন করছিল। কয়েন ফেললেও কখনও কখনও কাজ হয় না, তখন গোটা

* ত্রক ব্যাগ শংকর

কয়েক থাপ্পড় লাগাতে হয় টেলিফোন বক্সে। যে ফোন করেছিল সে বেচারা বোধ হয় জানে না।"

কাজ বলতে এই মুহূর্তে হরিময়বাবুর মাথায় যা ঘুরছে তা হলো পত্রিকার সার্কুলেশন। যে সাতাশজন সকাল থেকে ফোন করেছেন তাঁরা যদি ঝপ করে চমচম পত্রিকার গ্রাহক হয়ে যেতেন তা হলে মন্দ হতো না! চাঁদার বাৎসরিক হার ২৯ টাকা নিরানব্বই পয়সা, দ্বিবাৎসরিক ৫৭ টাকা নিরানব্বই পয়সা, আর তিন বছরে নব্বুই টাকা নব্বুই পয়সা। এই নয়া পয়সার কায়দাটা হরিময়বাবু বাটা কোম্পানির জুতো থেকে নিয়েছেন। একশ টাকা আর নিরানব্বুই টাকা নিরানব্বুই পয়সার মধ্যে আকাশপাতাল তফাত—মনস্তত্ত্ব নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে কানাডিয়ান জুতো কোম্পানির সায়েবরা এসব বার করেছেন। পিকলু বলেছে, "তিন বছরের গ্রহক চাঁদার অঙ্ক আপনার গোলমাল হয়ে গিয়েছে হরিময়দাদা।"

একগাল হেসে হরিময়বাবু জানালেন, "ইচ্ছে করেই ব্যাপারটা করা হয়েছে মিস্টার পিকলু। যাতে কেউ দু'বছরের বেশি গ্রাহক না হয়—তিন বছর পরে ছাপার কাগজের রিম কত হবে কে জানে?"

হরিময়বাবুর ধারণা, কাগজের মিলেও কিছু অভিশাপ আছে। প্রথমে টিটাগড়ের পেপার মিলের কাগজে চমচম ছাপা হতো, সে মিলে তালা পড়লো। তারপর বেঙ্গল পেপার মিলের কাগজে ছাপা হতো, সে মিলও অসুস্থ হলো। তারপর আই-পি-পি, সে মিলও অসুস্থ হলো—এখন স্থানীয় মিলের কাগজ সাপ্লায়াররা ভয় পেয়ে যায় চমচম ছাপা হবে শুনলে। তারা বলে, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কাগজ নিন, একবার উড়িষ্যার জে-কে, একবার কর্ণাটকের মান্ডিয়া, একবার অন্ধ্রপ্রদেশ, একবার ইন্দোনেশিয়ান ফরেন, যাতে একটা মিলের ওপর অপয়া ভাবটা না গিয়ে পড়ে।"

একটু পরেই পরিস্থিতির পরিবর্তন। এক অজানা পাঠিকা ফোনে দু'বছরের গ্রাহক হতে চাইলেন। হরিময়বাবু বুঝছেন পিকলুর কলমের জোর আছে। এই ফোন পেয়ে হরিময়বাবুর স্থির বিশ্বাস স্টেটসম্যানে একটা প্রবন্ধের জোরেই বেশ কিছু গ্রাহক আসবে। স্পেশাল আশার একটা কারণ যে-ভদ্রমহিলা ফোনে গ্রাহক হতে চাইলেন তিনি সাউথপয়েন্ট ইস্কুলের শিক্ষিকা। হরিময়বাবু শুনেছেন, পৃথিবীর কোনো ইস্কুলে এতো ছাত্রছাত্রী নেই—এরা যদি সবাই চমচমের গ্রাহক হয়ে যায়, তাহলে হরিময়বাবু তো একলা সামলাতেই পারবেন না!

এবার ধীরের মতন তাকাচ্ছেন হরিময়বাবু। পিকলুকে তিনি বললেন, "তোমার দাদুর ধারণা, আমার মাথায় কোনও বিজনেস বুদ্ধি ঢোকে না, ঢুকলে কবে নাকি আমি চমচমের দাম দশ টাকা রেঞ্জে নিয়ে যেতাম। তোমার দাদু বুঝছেন না, আমি আরও চালাক। অতি কম লোভ এবং অত্যধিক সার্কুলেশন, এই হচ্ছে চমচমের বিজনেস পলিসি। বাড়িওয়ালা বংশগোপাল বিশ্বাস মশায়ের মুখে শুনেছি, কথামৃত প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার সময় লেখক শ্রীম পরামর্শ নিয়েছিলেন বসুমতীর উপেন মুখোপাধ্যায়ের। তিনি বলেছিলেন, ভাল কাগজে এবং অত্যন্ত ভাল ছেপে, ভাল দামে বইটা বিক্রি করতে। দূরদর্শী মাস্টারমশাই শেষে ভাল ত্যাগ করে প্রচণ্ড সস্তায় প্রথম খণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ছেড়েছিলেন স্রেফ চার আনা পার কপি প্রফিট্ রেখে। ফলে হই হই পড়ে গেলো। আসলে মাস্টারমশাই বুঝেছিলেন, কাঞ্চনের প্রতি টান যত কমবে কাঞ্চন ততই তোমার পিছু নেবে।"

"দাদুকে আপনার অর্থনৈতিক পলিসিটা বুঝিয়েছেন?" জানতে চাইছে শ্রীমান পিকলু।

পিকলু জানে দাদু ভবনাথ সেনও একটু সেকেলে। সারাক্ষণ দুনিয়ার সব মানুষের মঙ্গল চাইছেন তিনি। এইটাই নাকি বাংলা সাহিত্যের ধারা।

ম্যানেজমেন্ট ইস্কুলে পড়ে পিকলু এখন কিছুটা খবরাখবর রাখছে। সে বলেছে, "দাদু, পৃথিবীর সবার মঙ্গল একসঙ্গে চাইলে শেষ পর্যন্ত কারও মঙ্গল হবে না। দুনিয়ার বড় বড় লেখকরা এটা ভালভাবে বুঝেছেন।"

দাদু তর্কে নামেননি। মৃদু হেসেছেন, কিন্তু এই বয়সে তিনি যে তাঁর মত পাল্টাতে চান না তাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

"জানো দাদু, মুম্বাইতে এমন সব ফিল্ম রাইটার আছেন যাঁদের খোদ ওয়ার্ডেন রোডে তিনখানা ফ্ল্যাট আছে। প্রত্যেকের ইমপোর্টেড গাড়িও আছে।"

ভবনাথ এসব সাফল্যের এবং বৈভবের খবর বিস্তারিতভাবে একবার লেখক বিমল মিত্তিরের কাছে শুনেছিলেন। কিন্তু সেজন্য তাঁর মধ্যে কোনো হিংসে নেই।

ভবনাথ নিজের লেখার টেবিলে বসে মা সরস্বতীর সাধনা করতে করতে বলেছিলেন, "আমার কোনও দুঃখ নেই, পিকলু ভাই। গল্প লিখে, উপন্যাস লিখে, প্রবন্ধ লিখে নিজের সংসার তো চালিয়ে দিয়েছি। শেষ বয়সে ঠাকুরের দয়ার সল্ট লেকে একটা সাড়ে সাতশ স্কোয়ার ফুটের বাড়িও হয়েছে। তোমার বাবাকে যাদবপুরে কম্পিউটার টেকনলজি পড়িয়েছি, আর কি চাইতে পারে একজন বাঙালি লেখক, পিকলু?"

"দাদু, তুমি জানো না, এখন ইন্ডিয়ান রাইটাররাও বই ছাপার আগে কোটি টাকা অ্যাডভান্স পাচ্ছেন!" বললো পিকলু।

ভবনাথ হাসলেন। "ওসব ভবিষ্যতের জন্যে। নতুন যুগে যারা নতুনভাবে লিখবে তারা জনস্বীকৃতি এবং সেইসঙ্গে অর্থসুখ পাবে। আমাদের বাংলায় যেমন সম্পাদক, যেমন প্রকাশক, তেমন লেখক, সবারই এক অবস্থা। আর্থিক টানটানি। জানো পিকলু, স্বয়ং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানা বই বছরে মাত্র বিশখানা বিক্রি হয়। বিশ কোটি বাঙালি রয়েছে পৃথিবীতে, অন্তত এক কোটি নতুন বাঙালি জন্ম নিচ্ছে প্রতি বছরে, তবু স্বয়ং মহাকবির এই অবস্থা, আমরা তো কোন ছার।"

নিজের কথা সব সময় না ভেবে দাদু মাঝে মাঝে তাঁর অনুগামী হরিময় চৌধুরীর কথাও ভাবেন। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, "হরিময়ের মতন লোক চলে গেলে, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবে কারা?"

চমচমের সম্পাদককে ভবনাথ সেন মাঝে মাঝে বকাবকিও করেন। যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ভবনাথ মনে মনে হরিময়ের তারিফ করেন। তাঁর মতে, "এঁরা হলেন খোদ মা সরস্বতীর পাণ্ডা—এঁরা না থাকলে দেবীদর্শন অসম্ভব। এঁদের টিকিয়ে রাখলে ভক্তদেরই কাজ।"

পিকলুর ঠাকুমার নাম কে বিলাসিনী দেবী রেখেছিলেন কে জানে? কারণ এই বয়সেও তাঁর মধ্যে বিলাসের নামমাত্র নেই। সংসারের সব কাজ বিলাসিনী একা করেন। বাংলা বই লিখে যে ভবনাথ সংসার চালাতে পেরেছেন এবং সংসার চালিয়েও যে মাথা গুঁজবার ঠাঁই হয়েছে এবং স্বামী যে এতো সম্মান অর্জন করতে পেরেছেন তাতেই ঠাকুরমার গর্ব।

পিকলুর বাবা বহুবার মুম্বাই থেকে বাবাকে নিয়মিত টাকা পাঠাতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "বাবা কত দিন আর কষ্ট করবেন? হিন্দুস্থান লিভারে আমার চাকরিটা তো খারাপ নয়। এবার আমাকে আমার কর্তব্য করতে সুযোগ দিন।"

চিঠি পেয়ে দাদু হেসেছেন। বলেছেন, "লেখার কষ্ট কোনো কষ্টই নয় পিকলুভায়া—সব লেখক চায়, মরবার সময়েও যেন হাতের কলম হাতে থাকে। লেখকের সব চেয়ে কষ্ট যখন কলম শুকিয়ে আসে, অথচ মনের মধ্যে লেখার আগ্রহটা পুরো থেকে যায়।"

এরপর ভবনাথ সেন তাঁর ছেলেকে চিঠি লিখেছেন, "আমাদের দিন ভালভাবেই চলে যাচ্ছে, বিপদে-আপদে দেখবার জন্যে তুমি, বউমা ও পিকলু

তো রইলেই। আপাতত আমি লেখা নিয়ে ব্যস্ত আছি।"

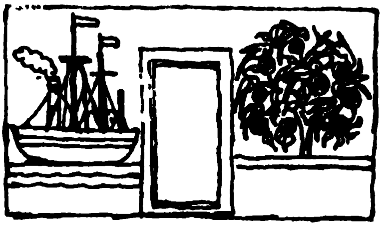
চমচম সম্পাদকও ভবনাথের জীবনের এসব কথা জানেন। তবে ইদানীং মাঝে-মাঝে-মাঝে তিনি হতাশায় ভোগেন।

আজ দুপুরের দিকেও নজর আলি লেনে আরও কয়েকটা টেলিফোন এলো। বোঝাই যাচ্ছে, সবাই ইংরিজি কাগজে পিকলুর লেখাটা পড়েছে।

হরিময়বাবু একসময় পিকলুকে বললেন, "ভীষণ সিক্রেট একটা আইডিয়া এসে গিয়েছে—চমচমের ইংরিজি সংস্করণ প্রকাশ করলে কেমন হয় বলো তো? নামটা 'ফ্রুটকেক' বা ওই ধরনের একটা কিছু করতে হবে।"

"কেন? বাংলায় চমচমে আপনার ক্লান্তি আসছে নাকি হরিময়দাদা?" জিজ্ঞেস করেছে ইয়ং পিকলু। সে চায় বাংলার এইসব বিশিষ্ট জিনিস সগর্বে এবং স্বমহিময় টিকে থাকুক এবং প্রতিটি সংখ্যা আরও ঝলমলে হয়ে উঠুক।

পিকলুর বাবাও মুম্বাইতে বসে হিন্দুস্থান লিভারের বন্ধুদের বাংলার লিটল ম্যাগাজিন সম্বন্ধে একই কথা বলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত খোদ প্রবাসী পত্রিকাও প্রথমে এইভাবে ক্ষুদ্রাকৃতিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পিকলুর বাবার অফিস-সহকর্মীরাও একমত যে কয়েকটা ব্যাপারে বাঙালিরা এখনও একটু আলাদা।



হরিময়বাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "চমচম মার্কেট রিসার্চের রিপোর্টটা আজকেই এলো, মিস্টার পিকলু। তোমার এবং তোমার দাদুর কথামতো গোপনে জানতে চেয়েছিলাম, পাঠকেব মনে চমচমের স্থান কোথায়? কী তারা চাইছে? কোন বিষয়ে লেখা তাদের মনের মতো হবে?"

রিপোর্ট যে আদৌ ভাল নয় তা সম্পাদকের মুখ দেখে পিকলু আন্দাজ করে নিচ্ছে।

হরিময়বাবু ফিসফিস করে বললেন, "এই মুহূর্তে কলকাতার বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই আমাদের চমচমে। বেশকিছু ইংরিজি ইস্কুলের

ছেলেমেয়ে হোল লাইফে চমচমের একটা একটা সংখ্যাও পড়ে দেখেনি। তারা বলেছে, এই ধরনের কাগজ তাদের দেখবার সময়ও নেই। ভবনাথ সেনের নাম শুনেছে তারা, তবে বাংলা গল্পের লেখক হিসেবে নয়, হিন্দি টি ভি সিরিয়াল 'ঘটঘটাও'-এর দৌলতে!"

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন হরিময়বাবু, তারপর বললেন, "অথচ এই নবেল প্রথমে চমচমেই বেরিয়েছিল। বাংলায় নাম ছিল 'চলমান'। পাবলিকের নজরে তেমন আসেনি।

মার্কেট রিসার্চ কোম্পানি চমচম কর্তৃপক্ষকে গোপনে উপদেশ দিয়েছেন, অমিতাভ বচ্চন, আজাহারউদ্দিন আর শচীন তেণ্ডুলকর এই তিনজনকে দিয়ে একটা জয়েন্ট-ধারাবাহিক উপন্যাস লেখবার চেষ্টা করতে এক্সক্লুসিভলি ফর চমচম। অন্য কোনো ম্যাগাজিনে এই উপন্যাসের একলাইন আগামী তিন বছরের মধ্যে পাওয়া যাবে না, আর সেই ঘোষণাটা ডিডি এবং স্টার টিভিতে প্রত্যেক এগারো মিনিট অন্তত বিজ্ঞাপন করা বিশেষ প্রয়োজন।

"পাগল!" বলে উঠলেন হরিময়বাবু। তারপর পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "টিভিতে এর জন্যে কত খরচ হতে পারে? লাখ তিনেক?"

"পাঁচ-ছ' কোটি টাকা!" মার্কেটিং-এর ছাত্র পিকলু হিসেব করে বললো।

পাথরের মতন বসে রইলেন হরিময়বাবু। "পিকলু, তুমি ইংরিজিতে আমার সম্বন্ধে না-লিখলেই ভাল করতে। অমিতাভ বচ্চনের বাবা কবি হরিবংশ বচ্চনের কবিতার অনুবাদ আমি চমচমে ছেপেছিলাম। অমিতাভর শ্বশুর তরুণ ভাদুড়িও লেখা দিতে রাজি হয়েছিলেন চম্বলের মেয়ে-ডাকাত সম্বন্ধে। কিন্তু সে-লেখা ভোপাল থেকে ডাকে আসবার সময় রহস্যজনকভাবে পথে চুরি হয়ে গেলো। আমারই ভুল, ভি-পিতে লেখা পাঠাতে বলা উচিত ছিল! তরুণ ভাদুড়িমশাই লোকটি বড় ভাল মানুষ ছিলেন।"

"ভি-পি করে লেখা পাঠানো?"

"হ্যাঁ, বাইরের অনেক লেখক সম্পাদক সম্মানী দেবেন কি না বিশ্বাস করতে না-পারলে লেখাটা ভি-পি করতেন হাতে-নাতে টাকা পাবার জন্যে।"

হরিময়বাবু এবার রিপোর্ট দিলেন। "মার্কেট রিসার্চ কোম্পানির মিস্টার জয়বিক্রম তলাপাত্র ফোন করেছিলেন। লোকটি বিচক্ষণ, বাঙালিদের আর্থিক এবং মানসিক অবস্থা বোঝেন। তিনি বললেন, অমিতাভ বচ্চন এবং ক্রিকেটারদের পাকড়াও না করতে পারলে আপনাকে একমাত্র রক্ষে করতে পারেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। নেতাজি এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণ এই দুটো বিষয়ে

পড়তে বাঙালির কখনও ক্লান্ত হয় না। রিসার্চে একথা প্রায়ই বেরিয়ে পড়ে।”

“সেই সঙ্গে বোধ হয় উত্তমকুমার।” পিকলু তার নিজস্ব মতামত দিল।

“না, মিস্টার পিকলু। উত্তমকুমারকে নিয়ে চমচমে আমি কিছু করতে পারবো না। সঙ্গে সঙ্গে সুচিত্রা সেনের প্রসঙ্গ চলে আসবে। যেমন রামকৃষ্ণের কথা তুললেই বিবেকানন্দ হাজির হয়ে যান। মাথা টানলে কান আসবেই।”

একটু থামলেন হরিময়বাবু। “একটা খবর আমি ভিতরে ভিতরে পাচ্ছি, সুচিত্রাদেবীও চুপি চুপি ঠাকুরের মস্ত ভক্ত হয়ে উঠেছেন। বরানগর মঠ যেখানে ঠাকুরের আদি ভক্তরা তাঁর মৃত্যুর পর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার লাগোয়া এক বেলতলা ছিল। সেই বেলতলা এতোদিনে নিজের খরচে অথচ খুব গোপনে কিনে দিয়েছেন সুচিত্রা সেন। সিনেমার কোনো কাগজ হাতে থাকলে এই জমি কেনার খবরটাই বড় বড় করে বেরিয়ে যেতো, হৈ হৈ পড়ে যেতো ভক্ত সমাজে।”

পিকলুর ইচ্ছে আরও খবর জোগাড় করে সুচিত্রা সেন সম্বন্ধেও ইংরিজিতে একটা প্রবন্ধ লিখে বসে।

ইতিমধ্যে হরিময়বাবু চোখবুজে গভীরভাবে চমচম সম্বন্ধে কীসব ভাবতে শুরু করেছেন।

চোখ খুলে হরিময়বাবু বেশ উঁচুগলায় বললেন, “গুণধর আমাদের দু'জনকে এখনই ‘শীঘ্রভোজন’ দাও। সুভাষচন্দ্রের শতবার্ষিকী আর রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সেন্টেনারি দুটোই পড়েছে নাইনটি নাইনটিসেভেনে, আর চুপচাপ বসে রয়েছে চমচম। হতে পারে না।”

শীঘ্র-ভোজনের সহজ বাংলা হলো কুইক লাঞ্চ। কিন্তু গুণধরকে তিনি পুরনো বাংলা কথাটাই শিখিয়েছেন।

অর্ডার দেওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যে-খানা অতিথির সামনে উপস্থিত হয় না তাকে হরিময়বাবু শীঘ্র-ভোজন বলতে রাজি নন।

এবার একটা লম্বা টুলে দুটো কাঁসার থালা সাজিয়ে দিল গুণধর। হরিময়বাবু ঘোষণা করলেন : “পৃথিবীর ফাস্টেস্ট ফাস্ট ফুড—ম্যাকডোনাল্ড কোম্পানির বাবা পেরে উঠবে না—রাইস্ড্ রাইস, অর্থাৎ কিনা ভাতে-ভাত। হাঁড়িতে জল গরম করে, তার মধ্যে চাল, হাঁসের ডিম এবং ডিফারেন্ট ভেজিটেবল একসঙ্গে ছেড়ে দাও। তারপর উনুন থেকে নামিয়ে খাঁটি গণেশ মার্কা সরষের তেল দিয়ে মেখে নাও, উইথ নুন।”

এবার প্রথম-দলাটা মুখে পুরে দিয়ে চোখ বুজে হরিময়বাবু বললেন, “অতি

উত্তম শীঘ্র-ভোজন। সুড়ুৎ করে গলা দিয়ে নেমে যায় মুম্বাই মেল স্পিডে।"

পিকলুরও বেশ ভাল লাগছে এই গরম ভাতে-ভাত। সে জিজ্ঞেস করলো, "কোন ম্যাগাজিনে এই শীঘ্রভোজনের আইডিয়াটা পেলেন হরিময়দাদা?"

"ম্যাগাজিন নয় ভাই, স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর রেসিপি—এক জায়গায় তিনি বলছেন, সংসারী লোকেদের বারফাট্টাই ভাতের হাঁড়িতে আলুপটলের লাফালাফি! আঁচ সরিয়ে নিলেই সব শান্ত!"

হড়হড়ে ভাত গিলে খেতে খেতে হরিময়বাবু ঘোষণা করলেন, "যদি কখনও ভাতে-ভাত নিয়ে সগৌরবে কাগজ নিবন্ধ রচনা করো, তহলে লিখো, বিশ্বখাদ্যসম্ভারে পেটরোগা বাঙালিদের একটাই শ্রেষ্ঠ অবদান. জিভে ঘা, দাঁতে ব্যথা, গলায় চোঁয়া ঢেকুর এটসেটরা ডোন্টকেয়ার করে রেকর্ড দু'মিনিটে খানা শেষ করে ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাঙালি যে অফিস টাইমের সঙ্গে এতো দিন লড়াই করতে পেরেছে তার পিছনে রয়েছে এই রাইস্ড রাইস।"

খাওয়া শেষ করে মৌরি চিবোতে চিবোতে হরিময়বাবু চিন্তিতমুখে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে এখন কী করা?"

পিকলু তার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পড়া অভিজ্ঞতায় হরিময়বাবুকে পরামর্শ দিলো, "অন্য সব পরিকল্পনা কোল্ড স্টোরেজে জমা রেখে আপাতত চমচমের দুটো স্পেশাল 'নেতাজি' ও 'রামকৃষ্ণ' সংখ্যা নিয়ে চিন্তা করুন।"

ডিপ ফ্রিজ, কোল্ড স্টোরেজ এইসব নতুন কথা হরিময়বাবু খুব পছন্দ করেন। শুনতে পেলেই নোট বইতে সংগ্রহ করে রাখেন—চমচমের 'শব্দমালা' ফিচারের জন্য। এই তো 'টেফলন' কথাটা শিখলেন গতবার পিকলুর কাছে—এমন রান্নার বাসন যাতে রান্না জড়িয়ে যায় না! ইংরিজি কাগজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে 'টেফলন' বলা হয়েছে, কারণ সংসারে থেকেও সংসারে জড়িয়ে পড়তে চাননি তিনি।

পিকলু বললো, "হরিময়দাদা, চমচম পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা দুটো সম্বন্ধে দরাজ হয়ে ভাবুন।"

"কিন্তু খরচ?" হরিময়বাবু হতাশভাবে প্রশ্ন তুললেন।

"হরিময়দাদা, সম্পাদকের পক্ষে খরচের জন্যে চিন্তা করা আজকাল সেকেলে ব্যাপার হয়ে গিয়েছে," বললো পিকলু। "আপনি যে মডার্ন কাগজগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না! আজকাল খরচাপাতি যা করার সব করে স্পনসর।"

স্পেনসার হোটেলের কথাটা আগে শুনেছেন হরিময়বাবু। কিন্তু স্পনসর রহস্যটা তিনি তেমন জানেন না।

পিকলু বোঝালো, "আগে ভক্তরা এবং সেবায়েতরা টাকা দিয়ে, প্রণামী দিয়ে যা করতো এখন স্পনসররা চেক পাঠিয়ে তাই করেন। যেমন আপনার কাগজের আদি স্পনসর মিস্টার ঘংশগোপাল বিশ্বাস।"

জিভ বার করে হরিময়বাবু বললেন, "বালাই ষাট! উনি আমাদের চমচমের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রমোটার।"

পিকলু হেসে বললো, "আপনার হাতে যদি প্রচারের বড় যন্ত্র থাকে, তাহলে হাসতে, কাঁদতে, স্নান করতে, আপনি স্পনসর পেয়ে যাবেন।"

"স্নান করতে?"

"ইয়েস হরিময়দাদা। একবার পুরীতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার জন্যে স্পনসর আহ্বান করে দেখুন না। ওয়ার্লডের সমস্ত সাবান কোম্পানি পুরিতে পাঁচতারা হোটেলে বসে গরম হাঁড়িতে আলুপটলের মতন লাফালাফি করবে। শুধু বলতে হবে হামাম স্নানোৎসব. অথবা লাইফবয় স্নানযাত্রা, কিংবা মার্গো ফেস্টিভ্যাল।"

আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন চমচম সম্পাদক। "তার মানে, তোমার কর্ম তশ্রীপ্তমি করো, চিনি জোগাবেন চিন্তামণি। এই চিন্তামণিই হচ্ছেন আজকালকার স্পনসর!"

ফিসফিস করে দু'জনের মধ্যে আরও কিছু কথা হলো। হরিময়বাবু ভীষণ খুশি হলেন, প্রবল উ সাহে তিনি টগবগ করছেন।

একটু পরেই পিকলু ও হাবময়বাবু একসঙ্গে বেরিয়ে পড়লো, দক্ষিণ কলকাতার নজর আলি লেন থেকে।

পিকলু যে নিঃশব্দে একটি ঝকঝকে মোটরসাইকেলের মালিক হয়েছে তা জানতেন না হরিময়বাবু।

"দাদু কিনে দিয়েছেন, পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট হয়েছে বলে। কলকাতায় নিজের বাহন না-থাকলে চলে না হরিময়দাদা। বম্বের মতন সুবার্বন ট্রেনের সুবন্দোবস্ত নেই কলকাতায়।"

"টোটো কোম্পানির ম্যানেজারদের পক্ষে অবশ্যই আদর্শ যন্ত্র এই মোটরসাইকেল," স্বীকার করলেন হরিময়বাবু। "আমাদের চমচমে 'মোটর সাইকেল সংখ্যা' বার করলে চলবে ভাল। ওইসময় ভবনাথবাবু যদি হুন্ডা মোটরসাইকেলকে ব্যাকগ্রাউন্ডে রেখে স্পেশাল একটা স্টোরি লিখে দেন তা হলে তো ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে। পাতিরাম নির্ঘাত আড়াইশ কপি একস্ট্রা

নিয়ে নেবে। বাংলাদেশেও বাড়তি পাঁচশ কপি চমচম চলে যাবে।"

তড়াং করে মোটরসাইকেলের পিলিয়নে চড়ে বসলেন হরিময়বাবু, বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না। আর ভটভট আওয়াজ করে বুলেটের বেগে নতুন যন্ত্রে স্টার্ট দিলো পিকলু।

স্পনসর! স্পনসর! একমনে জপ করছেন চমচম পত্রিকার অভিজ্ঞ সম্পাদক হরিময়বাবু।

স্পনসর অনেকটা সেকালের পরীর মতন, সমস্ত পার্থিব চিন্তা মুছে দিয়ে সম্পাদকের সব আর্থিক দায়দায়িত্ব নিয়ে নেবে, প্রয়োজনে টাকার হরির লুট ছড়াবে, আর হাল্কা শরীরে বিপুল উৎসাহে চমচম এগিয়ে যাবে নিজের মেজাজে। সুভাষ বসু, শ্রীরামকৃষ্ণ এঁরা দেশের জন্যে এবং মানুষের জন্যে কত কি করে গিয়েছেন। এঁরা স্পনসরবিহীন হয়ে থাকবেন একথা পিকলু ভাবতেই পারছে না।

বেশ কিছুক্ষণ মোটর সাইকেল চালিয়ে হরিময়বাবুকে একটা ঝকঝকে আপিসের সামনে নিয়ে এলো পিকলু। নামকরা এম-এন-সি অফিস বা বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান। প্রবেশের কাচের দরজা ঠেলতেই কুলকুল করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঘামে ভেজা শরীর শীতল করলো।

সম্পাদকের মনে পড়লো, আগেকার দিনে কলকাতার মেট্রো সিনেমায় এই স্বর্গসুখ পাওয়া যেতো। হরিময়বাবু ম্যাটিনি শো-তে টিকিট কেটে মেট্রোর লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা এই ঠাণ্ডাসুখ উপভোগ করে সিনেমা না দেখেই হাওড়ায় চলে আসতেন।

আ হা! সেই সুখ এখন কলকাতায় বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে! কে বলে কলকাতার অধঃপতন হয়েছে? সমস্ত গায়ে কে যেন ঠাণ্ডা হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

অফিস কাউন্টারে তরুণী মেমসায়েব ঝকঝকে শাড়ি পরে মা-দুর্গার মতন বিশ্বভুবন আলো করে বসে আছেন। সামনে কত টেলিফোন এবং আরও কত যন্তর। হরিময়বাবুর সন্দেহ হলো এই মা দুর্গার ঠোঁটে সিঁদুর দেখেই রাজশেখর বসু বোধ হয় সেবার লিখেছিলেন, "মা, তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হোক।"

ওয়েটিং হলকে আপিস বলে মনেই হচ্ছে না, যেন কোনো সিনেমার সাজানো সেট!

পিকলু চুপি চুপি হরিময়বাবুকে মনে করিয়ে দিলো, "এদের বিরাট বিজনেস। রঙের কারবার, কেমিক্যালের কারবার, সেইসঙ্গে ওষুধের কারবার।"

এইখানেই পিকলুর সহপাঠীর দিদি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেন।

একটু পরেই শাড়ি-পরা আর এক মা-দুর্গা প্রতীক্ষাগারে আবির্ভূতা হলেন। পিকলু ও হরিময়বাবু দুজনকেই তিনি নিজের আপিসঘরে নিয়ে গেলেন।

অদ্ভুত এই অফিসঘর—দেওয়াল আছে অথচ নেই। আসলে, কাচের পার্টিশন্, ফলে হলঘরের সব দেখা যাচ্ছে। অথচ নিজের প্রাইভেসি পুরো অক্ষত রয়েছে।

নতুন দিদি তাঁর ঘরের একটা আলমারি খুলে তিন টিন কোক্ বার করলেন—একেবারে হিমশীতল! ক্যান কোক আগে কখনও খাননি হরিময়বাবু। দেখলেন ফুটো করতে হয় না পেরেক দিয়ে। স্রেফ পাত্রের একটা কান ধরে টান দিলো পিকলু। এবার ক্যানের গর্তের মধ্যে একটা প্লাস্টিকের মোটা খড়কে ঢুকিয়ে নিলো। হরিময়বাবু হারতে রাজি নন, পিকলুকে হানড্রেড পার্সেন্টি অনুসরণ করে, খড়কের মাধ্যমে তিনিও ঠাণ্ডা কোকের রসাস্বাদন শুরু করলেন।

এই মা-দুর্গা পিকলুর সব কথা শুনলেন। তারপর চমচমের লেটেস্ট সৌজন্য সংখ্যাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। সন্দেশ পত্রিকার কথাও তিনি তুললেন। সন্দেশে এই কোম্পানি মাঝে-মাঝে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, স্রেফ সত্যজিৎ রায়ের প্রতি সম্মান দেখাতে। "বিজ্ঞাপনের আবেদনপত্রে সত্যজিৎবাবু নিজে সই করতেন! ভাবা যায় না! সই-করা সেই আবেদনপত্রগুলোর দাম এখন সুভেনির হিসেবে হুড়মুড় করে বেড়ে যাবে।"

মিষ্টির দোকানেও সন্দেশের দর সব সময়ে চমচমের থেকে অনেক বেশি হয়। এইটাই বিশ্বসংসারের নিয়ম, অস্বীকার করে লাভ নেই। হরিময়বাবু দুটো পয়সার লোভে মিথ্যাচার করবো না।

সেকেন্ড মা-দুর্গাটি খুব হিসেবী। সব শুনে ভরসা দিলেন এবং স্পনসরশিপের জন্য লিখিত প্রস্তাব পাঠাতে উপদেশ দিলেন। যে দেশে যেরকম নিয়ম! আগে হরিময়বাবু শুনেছিলে, অজানা কোনও মেয়েকে অযাচিতভাবে কোনো 'প্রস্তাব' পাঠাতে নেই। এখন সময় পাল্টেছে। সায়েবরা বোধ হয় লিখিত প্রস্তাব পেতেই ভালবাসে!

অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার সময় হরিময়বাবু বললেন, "এ কোম্পানিতে নিশ্চয় কেউ আপিস কামাই করে না—বাড়িতে এতো ঠাণ্ডাসুখ পাবে কোথায়? সম্ভব হলে লোকে রবিবারেও আপিস করতে চাইবে!"

রাস্তায় নেমে পিকলু বললো, "নেতাজি সংখ্যার কাগজগুলো আজই তৈরি করে পাঠাতে হবে। কম্পিউটারে আবেদন তৈরি করতে হবে। ম্যানুয়াল

টাইপরাইটারে লেখা চিঠি ওদের নজরে পড়বে না! মস্ত ব্রিটিশ অফিস তো।"

ব্রিটিশ শব্দটা শুনেই মুষড়ে পড়লেন হরিময়বাবু। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগছে না।

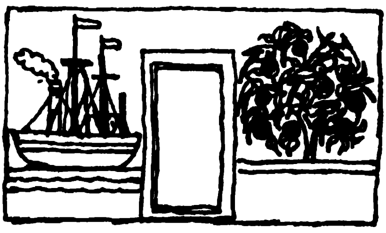
"কী হলো?" বুঝতে পারছে না পিকলু।

হরিময়বাবু উত্তেজিতভাবে বললেন, "মিস্টার পিকলু অত্যাচারী ইংরেজদের তাড়াবার জন্যে আমাদের নেতাজি দেশত্যাগী হলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করলেন, আর তাঁর শতবর্ষে গাঁটের কড়িতে যাতে হাত না পড়ে তার জন্যে ইংরেজ কোম্পানির কাছে ভিক্ষের হাত পাতবো এটা হয় না। তোমার দাদু শুনলে ভীষণ রাগ করবেন। চমচমের নেতাজী সংখ্যায় কোনও ইংরেজের কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হবে না। তবে ইংরেজ গভরমেন্ট লিখিতভাবে ক্ষমা চেয়ে যদি একটা বিজ্ঞাপন দিতে চায় তা চমচমে ছাপানো যেতে পারে।"

পিকলু ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারছে। কিন্তু নির্মম সত্যটুকু হলো, পয়সা ঢেলে সমস্ত পুরনো পাপ এযুগে মুছে ফেলা যায়।

হরিময়বাবু বেশি কথা বলছেন না। কিন্তু অর্থের জন্য কোনো অনর্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে তিনি এখনও উৎসাহী নন। মস্ত বিপ্লবী ছিলেন দক্ষিণেশ্বরের গদাধর চট্টোপাধ্যায়। না হলে কেউ বলতে পারেন, টাকা মাটি, মাটি টাকা? এ-কথার পুরো মানে বুঝতে গেলে স্বয়ং কার্ল মার্কসের মাথা ধরে যাবে। বড়ই গভীর এই রামকৃষ্ণইজম!

হরিময়বাবুর ওপর বিরক্ত হচ্ছে না পিকলু। বরং তিনি যা চাইছেন তারও খোঁজখবর করা যাক। কলকাতা শহরটা তো নিতান্ত ছোট্ট শহর নয়।



মোটর সাইকেলের পিছনে হরিময়বাবুকে পরিবহন করে এরপর যা যা ঘটেছিল তা এইরকম।

অফিসে-অফিসে ঘুরতে ঘুরতে চমচমের রামকৃষ্ণ সংখ্যা স্পনসর করার জন্যে উৎসাহ দেখালো 'ব্রোঞ্জ লেবেল'।

এই লেবেল কথাটা হরিময়বাবুর মথায় একেবারে ঢোকে না। স্পনসরশিপের প্রস্তাব পেয়ে হরিময়বাবু প্রথমে খুবই খুশি হলেন, ধন্যবাদ জানালেন পিকলুকে! তারপর জি-পি-ও'র সামনে ট্রাফিক সিগন্যালে আটকে যখন তার মুখে শুনলেন 'ব্রোঞ্জ লেবেল' মানে নাম করা কোম্পানির বীয়র, অমনি ভীষণ মুষড়ে পড়লেন।

"ঠাকুর তো কখনও মদ্যপান করতেন না!"

পিকলু এবার অধৈর্য হয়ে বললো, "অনেক মাতালের সঙ্গে তাঁর তো বিশেষ ভাব ছিল—তাঁরা তো ওঁকে দেবজ্ঞানে ভক্তি করতো, দাদু নিজে বলেছেন।'

"হ্যাঁ, মাতালদেরও তিনি মদ না খেতে বলতেন না। ওঁর শাসনের ধারাটাই ছিল অন্যরকম। কাউকে বলতেন, প্রসাদ করে কারণ সেবন করবে, কাউকে বলতেন মদ গিলবে কিন্তু খবরদার পা যেন না টলে, কাউকে বলতেন মনের মধ্যে কুচিন্তা এলে ভাববে, তোমার সঙ্গে তোমার গর্ভধারিণী জননী রয়েছেন। মাতালদের শুঁড়িখানা দেখে একবার রাস্তার মধ্যেই তাঁর সমাধি হয়েছিল। কিন্তু তা বলে. আমাদের প্রেমের ঠাকুরকে ব্রোঞ্জ লেবেলের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলা যায় কী করে?"

বিকলু বললো, "কেউ তো বলছে না, মদ খেতেই হবে। ব্রোঞ্জ লেবেল শুধু স্পনসর করছে অর্থ দিয়ে।"

হরিময়বাবু একটু ভাবলেন, তারপর ঠোঁট উল্টে বললেন, "ভায়া, ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। মদওয়ালার টাকা নেবো, অথচ মনে মনে চাইবো কেউ যেন মদ না খায়, এটা সরল মানুষ ঠাকুর বোধ হয় পছন্দ করতেন না।"

অগত্যা এবার অ্যাসকো কোম্পানি। ওখানে পিকলুর বন্ধুর বড় জামাইবাবু ভাল পদে আছেন।

জামাইবাবু দু'জনকেই খুব খাতির করলেন, চমচমের প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহও দেখালেন।

হরিময়বাবুও বিপুল উৎসাহিত হলেন, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সত্যি এখনও কলকাতায় 'প্রচণ্ড' পপুলার।

কিন্তু একটু পরেই হোঁচট খেলেন হরিময়বাবু।

অ্যাসকো বলতে যে আমেরিকান স্মোকিং কোম্পানি বোঝায় তা হরিময়বাবু গোড়াতে আন্দাজ করতে পারেননি। এঁদেরই 'হক্কাইডো' সিগারেট এখন ইন্ডিয়ার স্পনসরবাজার গরম করে রেখেছে। গান-বাজনা পুজোআচ্চার পিছনে

অলিতে-গলিতে সর্বত্র সারাক্ষণ হক্কাইডো।

একবার চোখ বন্ধ করলেন হরিময়বাবু। স্বামী প্রভানন্দের লেখা শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তঃলীলা দু' খণ্ড তিনি দু'বার পড়েছেন। যে মহাপুরুষ গলায় ক্যানসার নিয়ে ডাক্তার-বৈদ্যদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও এতো কষ্ট পেয়ে দেহ রাখলেন তাঁর স্মরণ সংখ্যায় শরীরের পক্ষে বিষময় সিগারেট কোম্পানির ছাপ থাকবে এটা ঠিক নয়।

"ঠাকুর মদ না খেলেও হুঁকোর তামাক তো রেগুলার খেতেন। এখনও তো বেলুড়মঠে তাঁকে নিত্য হুঁকো ভোগ দেওয়া হয় রাত্রের আহারের পর।" মনে করিয়ে দিলো পিকলু। তবু হরিময়বাবু উৎসাহ পাচ্ছেন না।

হতাশ হয়ে পিকলু বললো, "তা হলে তো দা ভিঞ্চি কোম্পানি ছাড়া আর কোনও গতি থাকছে না আমাদের। ওঁরা অবশ্যি খুবই উদারহস্ত। ধর্মকর্মে মতিগতি আছে, ঠাকুরের নাম করে হাজির হলে বর্তমান মালিক বিটলুবাবু কিছুতেই না বলবেন না।"

মোটরবাইক আবার বুলেট গতিতে চৌরঙ্গি থেকে বিবাদি বাগের দিকে ছুটতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর এগোবার প্রয়োজন হলো না।

হরিময়বাবু ভেবেছিলেন, দ্যা ভিঞ্চি যখন নিশ্চয় তখন রেনেশাঁসি আর্টের কোনও এক কোম্পানি হবে। কিন্তু যেই শুনলেন, এরা টাকা খাটায়, তিন বছরে সঞ্চয় দ্বিগুণ করার জন্যে গেরস্থরা এদের পিছনে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায়, অমনি হরিময়বাবু তীব্র আপত্তি জানালেন। "গাড়ি থামাও ভায়া। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের তো টাকাই সহ্য হতো না—কামিনীকাঞ্চনের দাপট কমাবার জন্যেই তো মঠ-মিশনে এতো জপতপ সেবা-সাধনা চলেছে।"

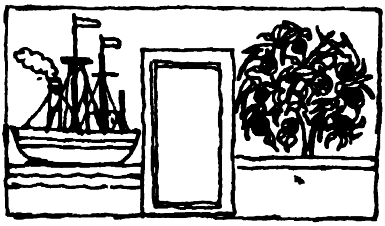
পিকলু একটু নিরুৎসাহ হলেও রাগ করলো না। এখনও হরিময়বাবুর মতন লোক যখন সংসারে রয়েছে তখন থাকুক।

সে হেসে বললো, "মিঠাই বা ডেয়ারিক ছাড়া আর কেউ আপনার চমচমকে স্পনসর করতে সাহস পাবে না। কোনও বড় উকিল বা ডাক্তার যদি নিজের পকেট থেকে এই সংখ্যার জন্যে টাকা দেন তা হলে কেমন হয়?"

"খুবই ভাল হয়। কিন্তু আমাকে হাওড়ায় একটু চেক করাতে হবে রামকৃষ্ণ-বিশারদ প্রফেসর শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছ থেকে। কোন বিশেষ কারণে ঠাকুর উকিল-ডাক্তারদের বাড়িতে অন্ন নিতে রাজি হতেন না? আজই আমি হিদারাম হালদার লেন থেকে রিকশ করে কাসুন্দে ওলাবিবিতলা লেনে শঙ্করীপ্রসাদ

বসুকে কনসাল্ট করে আসবো। কোনো উকিল নাকি বলেছিল, ঠাকুরের কান মলে দেবো! ভালভাবে খোঁজখবর নিয়ে আটঘাট বেঁধে এগোতে হবে, মিস্টার পিকলু।"

পিকলুকে এবার ছেড়ে দিলেন হরিময়বাবু—সোজা সে ফিরে যাবে জোকায়। অনেকখানি রাস্তা। আর হরিময়বাবু গড়ের মাঠে একটু ক্লিন খাওয়া খেয়ে, রবীন্দ্রসদনের সামনে থেকে ট্রাম কোম্পানির বাস ধরে নদী পেরিয়ে শিবপুর মন্দিরতলায় চলে যাবেন।



বাসের জন্য রবীন্দ্রসদনের সামনে হরিময়বাবু অপেক্ষা করছেন। এমন সময় একটা ইলেকট্রিক-নীল মারুতি এইট হানড্রেড গাড়ি এসে তাঁর সামনে থেমে গেলো।

"আরে হরিময়বাবু না? কংগ্রাচুলেশন! আজ আপনার সম্বন্ধে অফিসে খুব আলোচনা হচ্ছিল। দুজন মহিলা তো আপনার সঙ্গে আমার চেনা আছে জেনে এক বছর চমচম সাবশক্রিপসনের টাকা পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

কথা বলছেন স্বয়ং শৈল ব্যানার্জি, বাংলায় এম এ পাস করেও যিনি একদা শিল্পপতি হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। থাকেন হাওড়াতেই, নতুন বিদ্যাসাগর ব্রিজের কাছেই। জোর করে তিনি গাড়িতে তুলে নিলেন হরিময়বাবুকে।

ড্রাইভ করতে করতে শৈলবাবু বললেন, "সুইডেন এবং বেলজিয়াম ঘুরে এলাম, ওখানেও গাড়ির সবচেয়ে জনপ্রিয় কালার ইলেকট্রিক-নীল অথচ এখানে ডিলার আপনাকে সারাক্ষণ রেড মারুতি গছাবার চেষ্টা করবে।"

"আমাকে নয়, বিশ্বস্ত পদযুগল থাকতে আমার গাড়ি কেনার কথাই ওঠে না। আপনাকে অবশ্য গাড়িওয়ালারা জ্বালাবে—ফোর্ড, ডেয়ু, জি এম, ভোলভো, মার্সেডিজ, মারুতি এসটিম কেউ আপনাকে ছাড়তে চাইবে না।'

খুব হাসলেন শৈলবাবু! "ঠাকুরের আশীর্বাদে দু'একটা গাড়ি কেনা তো এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়! কিন্তু হাওড়ার রাস্তার গর্ত। পট-হোল বললে ওইসব

গহ্বরের কিছুই বোঝা যায় না। আমার শ্যালিকা সেদিন নিউ আলিপুর থেকে হাওড়ায় আসতে গিয়ে গ্রান্ড টাঙ্ক রোডের গর্তে এমন মোচড় খেয়েছে যে সিরিয়াস স্পন্ডালাইটিস! ভাগ্যে স্বামী হাড়ের ডাক্তার, না হলে বেলভিউতে বেড নিয়ে চিকিৎসা করাতে একখানা মার্সেডিজ কেনার খরচ লেগে যেতো, বেচারার কী অবস্থা হলো বলুন তো! চিকিৎসা করাতে গিয়ে সব রেস্তো চলে যেতো।"

শৈল ব্যানার্জি রসিকতা করলেন, "তাহলে কবে হাওড়া ছাড়ছে চমচম? একটু নামডাক হলে কেউ তো আর হাওড়ায় থাকে না—এই অধম এবং ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তী এবং ডাক্তার শীতল ঘোষ ছাড়া।"

"চমচম ওখানেই থেকে যাবে, মিস্টার ব্যানার্জি। চমচমের শিকড় পোঁতা রয়েছে ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে। যতোদিন বেঁচে আছি ততোদিন ওখনে সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালাবো তুলসীতলায়। বংশগোপাল বিশ্বাস আমাকে যে অনুরোধ করে গিয়েছেন তার অন্যথা হবে না।"

এবার হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তা আপনি এখনও হাওড়ায় রয়ে গেলেন কেন? আপনার কোম্পানির এতো রফতানি, এতো বিদেশি মুদ্রা উপার্জন!"

"আমাদের স্পোর্টিং ক্লাবের ফাউন্ডার ছিলেন বংশগোপাল বিশ্বাস। নাইনটিন ফর্টি ফাইভে ক্রিকেট টিমে চান্স দেবার সময় প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, কখনও এই শিবপুর ছেড়ে যাবে না। তখন না বুঝে প্রতিজ্ঞা করেছি, এখন চারা নেই!"

গাড়ি চলেছে। শৈল ব্যানার্জি বললেন, "বাইদি বাই, বিয়াল্লিশের তিন হিদারাম হালদার লেনের খবর কী?"

"আছে। একটা অংশে চমচম রয়েছে। মাঠের অন্য দিকে দাসওয়ানিরদের গাড়ি রিপেয়ার গ্যারেজ এবং সেই সঙ্গে এক নাম-না জানা কালোয়ারের পুরনো লোহলক্কড়ের গোডাউন।"

"মেন বাড়িটা তো ভেঙে পড়ছে মনে হলো! কোনও মেরামতি নেই, হোয়াইট ওয়াশিং নেই।" দুঃখ করলেন শৈল ব্যানার্জি।

"একতলায় আগে বিশ্বাসদের আপিস ছিল, এখন খালি পড়ে থাকে। আর দোতলা চিরকাল বংশগোপালবাবুর বংশধরদের জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষিত। ভিটে বলে কথা!"

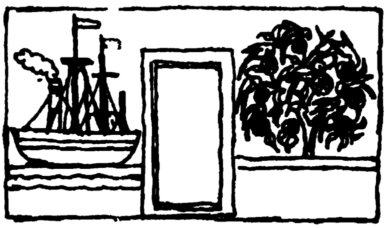
শৈলবাবু বললেন, "ছোটবেলায় ক্রিকেট খেলবার সময় কতবার ও বাড়িতে গিয়েছি। যুদ্ধের আগে থেকে ওঁদের বাড়িতে 'পাই' কোম্পানির বিশাল রেডিও

ছিল—বংশগোপালবাবু যুদ্ধের সময় লুকিয়ে-লুকিয়ে রেডিওতে সুভাষ বোসের বার্লিন এবং টোকিও স্পিচ শুনতেন। নিজে পুরনো এন আর আই, বার্মায় গিয়েছেন এবং যথাসময়ে ফিরে এসেছেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "ওই রেডিও না থাকলে কি আর বংশগোপাল রাত জেগে নিশিযাপন করতে পারতেন? সেই রেডিও, সেই বইপত্তর, সেই চিনেমাটির টি-সেট সব সাজানো রয়েছে। শুধু মানুষটা নেই, ফিফটি ইয়ার্স কেটে গেলো। আমার দুঃখ, বংশগোপালবাবু, চামচমের প্রথম সংখ্যার ডামি ও পেজ প্রুফ দেখে গেলেন, কিন্তু ছাপানো অবস্থায় প্রথম সংখ্যাটা ওঁর হাতে তুলে দিতে পারলাম না।"

ডামি জিনিসটা কি শৈলবাবু জানতেন না। হরিময়বাবু বুঝিয়ে দিলেন, "একেবারে নকল, অথচ আসল নয়। বংশগোপালবাবুর বংশধর—বড় ছেলে, ছোট ছেলে এবং নাতি যেন একই ছাঁচ থেকে তৈরি—পরের পর ছবিগুলো দেওয়ালে টাঙানো আছে, বোঝা যায় না কোনটা কি। বাই দ্য বাই, বর্তমান বংশধর বংশগোলাপ বিশ্বাস বহুদিন প্রবাসে বসবাস করে হঠাৎ নিজের ডেরায় ফিরে এসেছেন। লোকে বলছে, এর সঙ্গেও কিন্তু বংশগোপালবাবুর মুখের বেজায় মিল।"

"আর হাসাবেন না, হরিময়বাবু।" এই বলে হা-হা করে হাসতে লাগলেন শৈল ব্যানার্জি। বংশগোপাল থেকে বংশগোলাপ, নামগুলো কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং! অনেক মাথাখাটিয়ে কেউ নামগুলো সাজিয়েছে।"



হাওড়া শিবপুরে এবার সন্ধ্যা নামছে। ছোট ছোট কারখানায় অসংখ্য চিমনি সারাক্ষণ ধোঁয়া ঢেকুর তুলে হিদারাম হালদার লেনের এই অঞ্চলে নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগেই অন্ধকারকে ডেকে আনে!

পরিবেশ দূষণের দুশ্চিন্তায় ভবনাথ সেন একবার হরিময়বাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভারতবর্ষের গৃহবধূরা কতগুলো চুল্লি জ্বালায়

বলো তো?"

টাকে হাত বুলিয়েছিলেন হরিময়বাবু, পরিসংখ্যানটা তাঁর মোটেই আয়ত্তে আসে না।

ভবনাথবাবু নিজেই উত্তর দিয়েছিলেন, "পিকলুর খবর অনুযায়ী নব্বুই কোটি ভারতবাসীর আঠারো কোটি ঘরসংসার। সব সংসারেই সাঁঝের চুল্লি জ্বলছে। শুতে যাবার আগে চারখানা চাপাটি তো সবাই খেতে চাইবেই। স্বাধীনতার যতো ব্যর্থতাই থাক, নব্বুই কোটি লোকের কারও অভুক্ত হয়ে মরার কারণ ঘটেনি। এইখানেই সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে বড় পরাজয় ঘটেছে। পরাধীন ভারতে কত মানুষ যে দুর্ভিক্ষের বলি হয়েছে তার হিসেব নেই। তবে এখনও দারিদ্র্য আছে, অনিশ্চয়তা আছে, অপুষ্টি আছে—এগুলোও ছোট পয়েন্ট নয়।"

"অর্থাৎ পিকলু বলতে চাইছে, প্রত্যেক রাতে নব্বুই কোটি লোক খেতে বসছে, তবে যতটা প্রয়োজন ততটা খাবার সবার জুটছে না।"

"ইকজফার অমর্ত্য সেনকে জিজ্ঞেস করো—তিনি বলেছেন, রিমার্কেবল কৃতিত্ব ভারতীয় গণতন্ত্রের। পরাধীনতার যুগে ইংরেজরা এর এক-তৃতীয়াংশ মানুষকে খাওয়াতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতি বছর লাখ লাখ লোককে দুর্ভিক্ষের বলি করে শ্মশান এবং গোরস্থানে পাঠিয়েছে সায়েবরা। এই যে এম্পায়ার ভেঙে পড়লো, তার একটা অদৃশ্য কারণ পৃথিবীর শক্তিধর দেশগুলো বুঝে গেলো, সাম্রাজ্যের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে অনশনে মৃত্যু রোধ করা কোনওক্রমেই সম্ভব নয়।"

হরিময়বাবুর চোখ শিবপুরের কারখানার ধোঁয়ায় জ্বালা করছে। এই সময়ে তিনি একটু ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেন চোখে। চোখে ভাল করে জল ছিটিয়ে কালো ফ্রেমের চশমাটা কাপড়ের খুঁটে মুছতে মুছতে হরিময়বাবু ভাবলেন, কবে হাওড়ায় সব সংসারে গ্যাস আসবে? কিংবা সৌরচুল্লি বসবে। তখন হাওড়ার আকাশ আবার নীল আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে-আকাশ একসময় রাতজাগা গভীর রাতে বংশগোপাল বিশ্বাসের হিদারাম হালদার লেনের বাড়ির দোতলায় বসে তিনি প্রাণভরে দেখতেন।

চমচমের হাওড়া হেড অফিসের কাজের লোকটির নাম বিজয়। একেও হরিময়বাবু সম্মান দিয়ে কার্যনির্বাহী সাব-এডিটর হিসেবে চমচমের প্রথম পাতায় নিয়মিত পরিচিত করে চলেছেন। হেড অফিসে ফিরে এসে বিজয়কে দেখতে পাচ্ছেন না হরিময়বাবু।

এই ব্যাপারে পিকলু একবার কৌতূহল প্রকাশ করছিল। ওর দাদু নাকি

বলেছেন, "যত সব হরিময়ের পাগলামো!"

কিন্তু হরিময় অন্য মত পোষণ করেন। তিনি বললেন, "শুধু মাইনে দিলেই আজকাল চলে না মিস্টার পিকলু। মানুষকে যত সম্মান দেওয়া যায় ততো কাজ বেশি পাওয়া যায়। কলকাতা কার্যালয়ের গুণধর কেমন রান্না ও সম্পাদনা দুই সামলাচ্ছে। তেমন হাওড়া শিবপুরে বিজয়ও চমচম সম্পাদকের ক্ষুধানিবৃত্তি ছাড়াও সারাক্ষণ মুদ্রণ ও সম্পাদনা নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে।"

এই মুহূর্তে বিজয়ের পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় কথাসাহিত্যিক চিরন্তন চ্যাটার্জির বাড়িতে সে আটকে পড়েছে। ঔপন্যাসিক চিরন্তনবাবুর ধারণা তিনি বিমল মিত্তিরের দরের লেখক, তাই নিজের গুরুত্ব প্রকাশের অন্য পথ না পেয়ে, ধারাবাহিক উপন্যাসের কিস্তি লাস্ট মোমেন্টে সরবরাহ করেন, যেমন খেয়ালী ও অভিমানী বিমলবাবু শেষজীবনে কখনও কখনও করতেন।

চমচম অফিস থেকে বেরিয়ে শ্রীমান বিজয় হাজির হবে চিরন্তন চ্যাটার্জির বেহালার বাড়িতে। বিজয় উপস্থিত হয়েছে দেখলে তাকে ঘরের বাইরে বসিয়ে রেখে কিস্তি লিখতে শুরু করবেন চিরন্তন চ্যাটার্জি এবং শেষ পাতার শেষ লাইনে একটা মারাত্মক মোচড় দিয়ে তলায় ক্রমশ লিখে পাণ্ডুলিপির কতকগুলি স্লিপ তুলে দেবেন বিজয়ের হাতে।

চিরন্তন বলবেন, "খবরদার জিজ্ঞেস করবে না, এর পরে নায়ক অনন্ত মল্লিকের নাইজিরিয়ার অরণ্যে কী অবস্থা হবে!'

এই অবস্থায় বিজয়ের কাঁচুমাচু মুখ দেখে দয়াপরবশ হয়ে চিরন্তন বলবেন, "তোমাদের মতন পাঠকের দুশ্চিন্তা আমি বুঝি। লিখতে-লিখতে আমার হঠাৎ কিছু হয়ে গেলে চমচমের পাঠকদের কী অবস্থা হবে? অসমাপ্ত উপন্যাসে আধ-কপালে হলে ভীষণ মাথা ধরে, মানুষ ভীষণ কষ্ট পায়, একথা ডাক্তার বিধান রায় পর্যন্ত স্বীকার করতেন।"

এরপর চিরন্তন নিশ্চয় বলবেন, "প্রুফ রিডার রাধারমণবাবুকে অবশ্যই একবার ফোন করতে বোলো, ওঁকে আমি ভীষণ বিশ্বাস করি। ভাবছি রাধারমণবাবুকে আমি উপন্যাসের পরিণতিটা চুপিচুপি জানিয়ে রাখবো। শরীরের যা অবস্থা! তবে আমার অঘটন কিছু ঘটলে, তোমাদের বিভূতি রায়কে দিয়ে আমার অসমাপ্ত উপন্যাস অবশ্যই সমাপ্ত করাবে না। ওই লোকটা প্লটের অ-আ-ক-খ বোঝে না, একেবারে গপ্পোকানা!'

চিরন্তনবাবুর মুখে বিজয় এই ধরনের গল্প শুনে খুবই আনন্দ পায়। হরিময় ভাবেন, হয়তো আজ চিরন্তনবাবু স্লিপ দিতে দেরি করছেন। বিজয়ের জন্যে আর

অপেক্ষা করা ঠিক নয়।

স্নানঘরে ঢুকে হাত-পা ধুয়ে গায়ে একটা নামাবলী জড়িয়ে খালি পায়ে বাড়ির উঠোনের দিকে এগোলেন হরিময়বাবু। এই নামাবলীটি ঐতিহাসিক লাল অক্ষরে সারা গায়ে লেখা—হরে রাম হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। পুরনো চাদর, লেখাগুলো বেশ অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—প্রুফ রিডার রাধারমণ একটু কংগ্রেসি ভাবাপন্ন, বামফ্রন্টকে দেখতে পারেন না। তিনি সখেদে বলেন, নামাবলীতে লেখা : হবে বাম, হবে বাম, হবে কষ্ট, হবে কষ্ট। বিজয়ের মধ্যে কিন্তু বামভাব প্রবল, সে এসব মন্তব্য একেবারেই পছন্দ করে না।

খালি পায়ে, শ্রীঅঙ্গে নামাবলী জড়িয়ে হরিময়বাবু বাড়ির প্রাঙ্গণে তুলসী মঞ্চের কাছে হাজির হলেন।

সন্ধ্যাকালের এই নিত্যকর্মটি বহু বছর আগে বংশগোপাল বিশ্বাস মশায় নিজের হাতে করে আনন্দ পেতেন। বংশগোপাল ধীরে ধীরে পরমযত্নে পঞ্চপ্রদীপ জ্বালাতেন। তারপর প্রদীপগুলি সাজিয়ে দিতেন শ্বেতপাথরে বাঁধানো পবিত্র তুলসী মঞ্চে।

তুলসী সম্বন্ধে কত কথাই জানতেন বংশগোপালবাবু। বলতেন, "এমন মহাশক্তিধর গাছ ঈশ্বর আর দুটি সৃষ্টি করেননি। সাধে কি আর ভারতবর্ষের মানুষ আড়াই হাজার বছর ধরে এই তুলসীকে তোয়াজ করে আসছে। এই তুলসীতলায় যে পরিবার নিয়মিত আলো জ্বালায় তার অমঙ্গল করার সাধ্য কারও নেই। স্বয়ং যমও তাকে সমীহ করেন।"

"আপনি তো সায়ান্স লাইনে কাজ করেছেন, দীর্ঘদিন প্রবাসে থেকেছেন, আপনি এসবে বিশ্বাস করেন?" হরিময়বাবু সেই সময় জিজ্ঞেস করেছেন বংশগোপাল বিশ্বাসকে।

"সায়ান্সের সঙ্গে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর সঙ্গে তো ঈশ্বরের কোনও সংঘাত নেই, হরিময়। বিশ্বস্রষ্টা না থাকলে সায়ান্স কোথায় রাজত্ব করতো?" উত্তর দিয়েছেন বংশগোপাল।

তরুণ হরিময়বাবু তখনও অতশত বুঝতেন না। বংশগোপাল নিজের মনে বলতেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের হরিপ্রসন্ন বলে একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন—ইউ পি-তে বড় সরকারী কাজ করতেন। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ছাড়েননি, ইঞ্জিনিয়ারিংও তাঁকে ছাড়েনি। সন্ন্যাসী হয়ে নাম নিয়েছিলেন বিজ্ঞানানন্দ।"

হরিময়বাবু পরে একবার এই গল্প ভবনাথ সেনের কাছে করেছিলেন। ভবনাথ বললেন, "মস্ত সাধু এই বিজ্ঞানানন্দ—বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মন্দির তো

ইনিই তৈরি করেছিলেন। পরে মঠ-মিশনের অধ্যক্ষ পর্যন্ত হয়েছিলেন, ওখানে যাঁকে বলা হয় কি না প্রেসিডেন্ট মহারাজ।"

দশ মিনিট ধরে প্রাণভরে হরিময়বাবু তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ নিবেদন করলেন। দীর্ঘদিনের প্রথা এবং বংশগোপালের অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী সাঁঝের প্রদীপ জ্বালার পরে হরিময়বাবু তুলসীমঞ্চে কয়েকখানা বাতাসা ছড়ালেন। ভোগ, প্রসাদ, হরির লুট—এইসব বিতরিত হয় বলেই তো ছেলেরা এখনও দেবদ্বিজে কিছুটা আগ্রহ রেখেছে। দেবতা তো কিছু নিয়ে নেন না। সুতরাং তাঁকে নিবেদন করতে আপত্তি কোথায়? নিবেদন করলেই প্রসাদটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

পিকলুর কথাও মনে পড়ছে। আজই সে জিজ্ঞেস করেছে, "কোথায় যেন কী একটা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। বংশগোপাল কোন খেয়ালে আপনার এবং চমচমের ওপর এই তুলীমঞ্চের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন? এতে কার কী মঙ্গল হবে?"

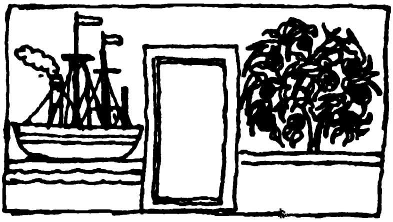
হরিময়বাবু বলেছেন, "অতশত বুঝিনি ভাই। নতুন কাগজ করার নেশায় তখন বুঁদ হয়ে আছি। লোকমুখে শুনেছি রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী সবাই কাগজের সম্পাদনা করেছেন ও লাইনে আমাকেও ঢুকতে হবে।"

পিকলু তখন মিটমিট করে হাসছিল। তাই দেখে হরিময়বাবু বলেছেন, "মিস্টার পিকলু, চমচমকে কেন্দ্র করে তখন যা ঘটছে তা অবিশ্বাস্য। আমরা প্রায় বিনা পয়সায় অনন্তকাল থাকবার সুসবাই কাগজের সম্পাদনা করেছেন, ও লাইনে আমাকেও ঢুকতে হবে।"

পিকলু তখন মিটমিট করে হাসছিল। তাই দেখে হরিময়বাবু বলেছেন, "মিস্টার পিকলু, চমচমকে কেন্দ্র করে তখন যা ঘটছে তা অবিশ্বাস্য। আমরা প্রায় বিনা পয়সায় অনন্তকাল থাকবার সুযোগ পাচ্ছি। তার পরিবর্তে যদি একটু সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার হাঙ্গামা নিতে হয় তো হবে।"

পিকলুর ধারণা, বংশগোপালবাবুর মাথায় হয় ছিট ছিল, না হয় বংশধরদের সম্বন্ধে কোনোও অভিমান ছিল। অথবা বড় ধরনের কোনো গোলমালে তিনি জড়িয়ে পড়ছিলেন যার বিবরণ আমরা এখনও জানি না।

এইসব চিন্তা এতোবছর পরে মাথায় এনে লাভ নেই। এবার প্রদীপ জ্বালাতে জ্বালাতেই হরিময়বাবু দেখলেন, দোতলায় এক আধপাকা দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক বংশগোপালবাবুর ঘর থেকে তুলসীমঞ্চের দিকে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছেন।



সন্ধ্যা হওয়ার একটু পরেই শ্রীমান বিজয় একটা চিরকুট নিয়ে এলো। ওপরের ভদ্রলোক হরিময়বাবুর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন। হরিময় অবশ্যই কথা বলবেন। বাড়ির মালিক বলে কথা!

খবর পেয়ে ভদ্রলোক নিজেই নীচে নেমে এলেন। একটু ভারী শরীর, কিন্তু বাঙালির তুলনায় দীর্ঘ দেহ। ভদ্রলোকের মুখটা বেশ লম্বাটে—দেখলেই বোঝা যায় বংশগোপালবাবুর বংশধর। কিন্তু শরীরের সাদৃশ্যটা প্রায়ই প্রকৃতির খেলায় কখন যে কার সঙ্গে কাকে মিলিয়ে দেয় তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। কখনও বংশধরের মুখের আদলটা পৈতৃক পথ ছেড়ে মায়ের পথ অনুসরণ করে। বাবার মতো দেখতে এমন অনেক ছেলেকে হরিময়বাবু জানেন। আবার কেউ কেউ মায়ের মতন দেখতে হয়। মাতৃমুখী পুত্ররা সাধারণত খুব সুখী হয়, সফল হয়। যেমন ভবনাথ সেন, যেমন হরিময়বাবু নিজে। স্বদেশী বিপ্লব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়বার পরে প্রাণটা যে আদৌ টিকে থাকবে এবং এমন নির্ঝঞ্ঝাট বাকি জীবন কাটবে তা ভাবতেও পারেননি হরিময়বাবু।

চমচমের অফিস ঘরে বসে ভদ্রলোকের পায়ের চটির আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন হরিময়। এঁর নামটি একটু অদ্ভুত—বংশগোলাপ বিশ্বাস। হঠাৎ শুনলে বংশগোপালবাবুর সঙ্গে নামটা গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু বংশগত নাম, ইচ্ছে করলেই এই বয়সে তা পাল্টানো যায় না।

"আসুন, আসুন। পাঁচদিন হলো হাওড়ার পদধূলি দিয়েছেন অথচ এখনও দেখা হয়নি," ভাবতে খুব লজ্জা পাচ্ছেন হরিময়বাবু।

বংশগোলাপবাবুর হাতে হরির লুটের দু'খানা বাতাসা ধরিয়ে দিলেন হরিময়বাবু। আগন্তুক ভদ্রলোক বাতাসা মাথায় ঠেকালেন কিন্তু খেলেন না।

"ব্লাডসুগারটা ইদানিং একটু গণ্ডগোল করছে" সরলভাবে জানালেন বংশগোলাপ।

হরিময়বাবুর মনে পড়লো, বংশগোপালবাবুরও শেষ জীবনে ডায়াবিটিস

হয়েছিল। ডায়াবিটিসের দোষ কি। সারাক্ষণ বারান্দায় বসে ভদ্রলোক একমনে কী ভাবতেন। যাবা খুব বেশি ভাবে ডায়াবিটিস তাদের খুব বেশি পছন্দ করে। ভাবনাটা যদি দুভাবনা হয় তহলে তো কথাই নেই!

হরিময়বাবু এবার চায়ের অর্ডার দিলেন। বিনা চিনি, কিন্তু নতুন আশ্চর্য বটিকা যার বংশনাম অ্যাসপার্টেম এবং ডাকনাম 'ইকোয়াল', যা তাঁর ভাইপো কিছুটা সঙ্গে করে এনেছিল মার্কিনমুলুক থেকে।

"আপনারও কি রক্তে চিনি? ইন্ডিয়ায় বাঙালিদের মধ্যে হায়েস্ট নাম্বার ডায়াবিটিক, সব চেয়ে কম পাঞ্জাবিদের," বললেন বংশগোলাপ। বারাণসীতে এই খারাপ খবরটা তিনি শুনেছেন।

"না মশাই। সায়েবমেমরা রক্তে চিনি না থাকলেও আজকাল চিনি খাবে না—স্রেফ শরীরে একটু স্নেহ জমবে বলে। ব্যক্তিগত ওয়েইং মেশিনের দিকে নজর রাখতে গিয়ে গোটা পৃথিবী থেকে ভোজনসুখ উবে গেলো। ভাবা যায় না। টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরির এইটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি! প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেও বৈরাগ্যের সাধনা এবং ত্যাগের হাতছানি।"

জোরে হাসলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। "আমি অনেকবছর হাওড়া ছাড়া, এবার সব খবর নেবো আপনার কাছ থেকে। তা আপনাকে আজ তুলসীতলায় দেখলাম—এটা কেন?"

হা ঈশ্বর! আপনি নিজেই জানেন না, কার দায়িত্ব কে পালন করছে? "আপনার পিতৃপুরুষের নির্দেশে। শুধু নির্দেশ নয়, লিখিত নির্দেশ!"

"বংশগোপালবাবুর লিখিত নির্দেশে এইটাই প্রধান শর্ত ছিল চমচমের পরিচালকদের ওপর। হয় আমি. না হয় আমার সহকারী সম্পাদক বিজয় ভক্তিভরে রোজ এই কাজটা করি—তুলসী মঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানো।"

"আপনি এসব ওং ভোং-এ বিশ্বাস করেন?" জিজ্ঞেস করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

"দেখুন, আমার বিশ্বাসটা বড় কথা নয়—এটা একটা শর্ত, আমি কেবল পালন করছি, চমচম পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে।"

বংশগোলাপবাবু সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, "এই দায়িত্বটা নিজের বংশধরদের দিলেন না কেন বংশগোপাল?"

প্রথমে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন হরিময়বাবু। তারপর উত্তর দিলেন, "অত চিন্তা করবেন না, মিস্টার বিশ্বাস। হয়তো বংশগোপালবাবু আশঙ্কা করেছিলেন, হাতের গোড়ায় বিশ্বাস বংশের কে কখন এখানে থাকবেন তার ঠিক নেই। অথচ

এই তুলসীমঞ্চ সম্পর্কে ভীষণ দুর্বলতা ছিল তাঁর। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত চমচম পত্রিকার ওপর বাড়তি দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু কোথাও তো প্রদীপ দেওয়ার সম্বন্ধে তেমন বিধিনিষেধ নেই। এখন থেকে নিন না দায়িত্বটা আপনারা। আপনাদের পূর্বরুষদের দায়িত্ব আপনারা পালন করবেন, এর থেকে ভাল কী হতে পারে? চমচমের দিক থেকে কোনো আপত্তি হবে না।"

বংশগোলাপ বিশ্বাস কিন্তু এখনই কোনও দৈনন্দিন হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চান না। সেই শিশুবয়সে বাংলা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, প্রায় সমস্ত জীবন প্রবাসে কাটিয়ে সবে হাওড়ার ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে ফিরেছেন। এখানকার সমস্ত ব্যাপারটা তিনি বুঝে নিতে চান আগে।

আজ যে হরিময়বাবুর সঙ্গে দেখা করবার বিশেষ আগ্রহ বংশগোলাপের তার কারণ ইংরেজি কাগজে হরিময়বাবু এবং চমচম সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধটা তিনি অবশেষে পড়ে ফেলেছেন।

বংশগোলাপ বললেন, "লেখাতে আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস সম্বন্ধেও অনেক নতুন খবর পেলাম, মিস্টার চৌধুরী। খুবই ইন্টারেস্টিং লোক ছিলেন আমার পূর্বপুরুষ।"

"ইন্টারেস্টিং বলে ইন্টারেস্টিং! বংশগোপালবাবু গভীর রাত্রে কয়েক ঘণ্টা একেবারে ঘুমোতে পারতেন না। সেই সময় আমার সঙ্গে যে কত কথা হতো! নিয়মিত নোট করা থাকলে একখানা ভাল বই হয়ে যেতো। স্মৃতিকথার নামটা পর্যন্ত ঠিক করে ফেলেছিলাম—'মাঝরাতে মশগুল'। কিন্তু অতীতের সব কথা ঠিকমতন স্মরণ করতে পারি না। তাই বই লেখা হলো না। আসলে সে সময় নিজের কাঁচাঘুম ভাঙিয়ে গল্প করা তো!"

বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাচ্ছেন হরিময়বাবু। "ওয়েলকাম টু হাওড়া অ্যান্ড টু হিদারাম হালদার লেন। আপনি তো মশাই পৈতৃক ভিটেতে বসবাসই করলেন না, সেই কবে চলে গিয়েছিলেন শৈশবকালে দাদুর কোলে চড়ে। দৃশ্যটা আমার এখনও মনে আছে। তারপর মশাই আপনি তো ছাপমারা প্রবাসী বাঙালি হয়ে এতোদিনে ব্যাক টু বেঙ্গল!"

দাদুর কথা উঠতেই বংশগোলাপবাবু আবার চক্ষু বিস্তার করলেন। "প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাসের কথা আমার একফোঁটা মনে নেই, কিন্তু দাদু বংশবিনয়বাবু তো ছিলেন আমার বাবার মতন। বেনারসে নিজের হাতে তিনি আমাকে মানুষ করেছেন। বাবার অভাব কখনও বুঝতে দেননি।"

হরিময়বাবু বললেন, "মশাই, আপনার বিষয়-সম্পত্তি, ঘরবাড়ি, আপনি এবার ঠিক করে বুঝেসুঝে নিন, আমি তো বংশগোপালবাবুর মৃত্যুকালীন নির্দেশ অনুযায়ী রামচন্দ্রের খড়ম পাহারা দিয়ে বসে আছি।"

"আপনার দাদুর পিতৃদেব বংশগোপালবাবুর বেশ কয়েকটা ছবি আমার কাছে আছে, একখানা ছোট্ট অয়েল পেন্টিং তো অফিস ঘরেই ঝুলছে, কিন্তু কখনও চমচমে ছাপা যায়নি।"

"রঙিন ছবি ছাপতে অনেক খরচ বুঝি?" বংশগোলাপ জানতে চাইলেন। তিনি ভাবছেন খরচের কথা ভেবেই বংশগোপালের রঙিন ছবি চমচমে ছাপা হয়নি।

"হরিময়বাবু সন্দেহের অবসান ঘটালেন। ওঁর ছবি ছাপানোর খরচ নিয়ে মাথা ঘামানোর কথাই ওঠে না বংশগোলাপবাবু। কিন্তু আপনার দাদুর বাবার লিখিত নির্দেশ, আমাকে সবসময় আড়ালে রাখবে, আমাকে নিয়ে কখনও হইচই করবে না। নিজের তীব্র বাসনার জন্য অনেক শিক্ষা পেয়েছি জীবন থেকে—অথচ সেসব ভুল এখন ইচ্ছে থাকলেও সংশোধনের উপর নেই।"

বংশগোলাপবাবু জানালেন, "আমার দাদুব বাবা যে বেজায় খেয়ালি এবং কিছুটা রহস্যময় লোক ছিলেন তার কিছু নমুনা আমার শোনা আছে। এক সময় সুবিধেমতো আপনাকে সব বলা যাবে। ছোটবেলায় বেনারসে পড়াশোনা করে আমার বাংলাটা একটু দুর্বল হয়ে গিয়েছে, থিংকিংটা এবং উচ্চারণটা একটু হিন্দি-হিন্দি হয়ে গিয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য, চমচমটাও নিয়মিত পড়া হয়নি, যদিও আপনি এতো বছর ধরে নিয়মিত সৌজন্য সংখ্যা পাঠিয়ে গিয়েছেন আমার দাদুর কাছে।"

হরিময়বাবু জানালেন, "দেখুন, আমি নেমকহারামি করতে পারি না। আপনাদের সম্পত্তিতে বসবাস করে আপনদের পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত কাগজ সম্পাদনা করি। আপনাদের কাগজ না পাঠিয়ে উপায় আছে?" হরিময়বাবু আরও বললেন, "বংশবিনয়বাবু দেহরক্ষা করা পর্যন্ত প্রতিটি কপি আন্ডার সার্টিফিকেট অফ পোস্টিং পাঠিয়েছি। তারপর আপনাকে গোটা চারেক চিঠি দিয়েছি, নতুন নাম জানাবার জন্যে, কোনও রিপ্লাই আসেনি। তখন লেট বংশবিনয় বিশ্বাস বলেও কাগজ পাঠিয়েছি। শেষে বই ফেরত এলো, অ্যাড্রেসি লেফট বলে। আমিও ছাড়বার পাত্র নই—লেফট যখন তখন অবশ্যই লোকটা অন্য ঠিকানায় চলে গিয়েছেন, কিন্তু বংশের কেউ তো আছে। অবশেষে আপনার সঙ্গে পোস্টাল যোগাযোগ স্থাপিত হলো, তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আপনি

লিখলেন, আমার পরিবারের কেউ বাংলাচর্চা করে না, সুতরাং কাগজ পাঠাবার কষ্ট নেবেন না।"

হরিময়বাবু প্রথমে আন্দাজ করেছিলেন, প্রবাসে কর্মজীবনের পালা শেষ করে, পরিণত বয়সে বংশগোলাপবাবু পৈতৃক ভিটেতে ফিরে এসেছেন।

কিন্তু বংশগোলাপবাবু নিজেয়ই বললেন, "আরও কয়েক বছর চাকরির মেয়াদ ছিল, ইচ্ছে করলে কর্মজীবন চালাতে পারতাম, কিন্তু হঠাৎ ভি আর এস নিয়ে নিলাম।"

"ভি আর এস ব্যাপারটা কী জানেন তো?" জিজ্ঞেস করলেন বংশগোলাপ।

"অবশ্যই জানি। আমাদের হাওড়াকে তো মশাই ভি আর এস নগর বলতে পারেন। এখানে বড় বড় কোম্পানির অবস্থা যত খারাপ হচ্ছে, কোম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজাররা তত মানুষকে ভি আর এস নিতে বাধ্য করছে। এই শহরের লোক জানে, ছাঁটায়ের শোভন সংস্করণ হলো ভি আর এস।"

বংশগোলাপ বললেন, "ওখানে কিন্তু তা নয়। স্বেচ্ছায় যদি চাকরি ছেড়ে চলে যাও তা হলে অনেক বাড়তি সুবিধে দেবে। অনেকে এক কোম্পানি থেকে ভি আর এস নিয়ে আরেক জায়গায় চাকরিতে ঢুকছেন, যদিও আমি ওসব হাঙ্গামায় যাইনি। আমার দাদু বংশবিনয়বাবু, জীবনের শেষপ্রান্তে প্রায়ই তাঁর পিতৃদেব বংশগোপালকে স্মরণ করতেন, তাঁর নানা কথা আমাদের শোনতেন। বংশবিনয়বাবু বলতেন, মরবার আগেও বাবা চিঠি লিখে গিয়েছেন, অবশ্যই আমার প্রতিটি নির্দেশ সারা জীবন মেনে চলবে। জেনে রেখো আমার নির্দেশ বিনা প্রশ্নে অনুসরণ করলে, একসময় তোমাদের হাতে এতো অর্থ আসবে যে তোমরা নিজেরাই বিশ্বাস করতে পারবে না।"

এবার হা-হা করে হাসতে লাগলেন বংশগোলাপবাবু। "ভি আর এস নেওয়ামাত্রই আমার বয়সটা যেন কুড়ি বছর বেড়ে গেলো, হরিময়বাবু। আর সবচেয়ে যা মজার, এখন প্রায়ই দাদুর কথা বসে বসে ভাবি। ভারি পিতৃভক্ত মানুষ ছিলেন বংশবিনয় বিশ্বাস। ওঁর স্থির বিশ্বাস ছিল যে হিদারাম হালদার লেনের বিশ্বাসরা একদিন সত্যিই বংশগোপালের আশীর্বাদে বিশাল ধনী হয়ে উঠবে।"

বংশগোলাপ মজা করে দাদুকে জিজ্ঞেস করতেন, "কোন সময়ে ভাগ্যলক্ষ্মীর দরজা খুলবে দাদু?"

বংশবিনয় বেঁচে ছিলেন ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। তিনি একটু ভেবে বলতেন, "ঠিক সময়টা জানি না। মনে হয়, আরও কিছুদিন পরে। আমার বাবা

বংশগোপাল বিশ্বাসের হাবভাব চালচলন একটু রহস্যময় ছিল। কোনো কিছুই খোলাখুলি বলতেন না। মাঝে মাঝে লিখিত নির্দেশ পাঠাতেন—কখনও সেই সব নির্দেশের ওপরে একটা সংখ্যা লেখা থাকতো। যেন কত লিখিত নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তার একটা হিসেব রয়েছে। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় একবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'বিনয়, নাইনটিন নাইনটিসেভেন আর কত বছর পরে?" আমি ঠিক উত্তর দিতে পারলাম না। তখন আমার মাথার ঠিক নেই। আমি তখন নিজের দুঃখে পাগল হয়ে উঠছি। বাবা মৃত্যুশয্যায় এই খবর পেয়ে দু'দিনের জন্যে বেনারস থেকে হাওড়ায় হিদারাম হালদার লেনে তাঁকে দেখতে এসেছি কোনোরকমে।"

এতোদিন পরে হরিময়বাবু বিশ্বাসবংশের পুরনো কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। স্বাধীনতার সামান্য ক'বছর আগে থেকেই এই বিশ্বাস পরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন। এই পরিবারে অবশ্যই অনেক কিছু ঘটে থাকতে পারে যা তাঁর জানা নেই।

বিশ্বাসবংশের প্রতিনিধি হিসেবে বংশগোলাপবাবুকে এই বাড়িতে ফিরে পেয়ে হরিময়বাবু খুব খুশি হয়েছেন।

"এতোদিনে এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে যেন প্রাণ ফিরে এলো, বংশগোলাপবাবু। এমন সুন্দর বাড়ি, অথচ মূল বাড়ির একতলা-দোতলায় কেউ থাকে না এটা ভাল কথা নয়: নীচে আপনাদের আদি আপিসঘর বহুদিন খালি পড়ে রয়েছে। খোলা জমির এক দিকে পুরনো গাড়ি সারাবার ওপেন গ্যারেজ—বুড়ো বুড়ো গাড়ি গোঁত খেয়ে যেন হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে শুয়ে আছে। ওদিকে পুরনো লোহার স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডে সারাক্ষণ যে কী হয় বোঝা যায় না। লরি থেকে মাল নামছে, আবার লরিতে কিংবা ঠেলাগাড়িতে মাল উঠছে। নামাওঠা চলছে তো চলছেই। মাঝরাতেও এর বিরাম নেই।"

বংশগোলাপবাবু বললেন, "ভাড়াটেরা আছে বলে এই শিবপুরের সম্পত্তি আমাকে ঘরের পয়সা দিয়ে পুষতে হয়নি। এতোগুলো বছর তো শান্তিতে কেটে গিয়েছে।"

হরিময়বাবু বললেন, "বাড়ির ট্যাক্সটা চমচমও কিছুটা দিচ্ছে। যদি আপনি বলেন, আরও কিছু বাড়ানো যায়। বংশগোলাপবাবু অবশ্য লিখিত নির্দেশ দিয়েছেন মোট পাঁচ সিকে দেবার।"

বংশগোলাপবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। "ইচ্ছে থাকলেও নেবার উপায় নেই।

আদি কর্তা বংশগোপাল দাদুকেও লিখিত নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন বংশধরদের চমচম পত্রিকার কাছ থেকে কোনোভাবেই মাসিক পাঁচসিকের বেশি নেওয়া চলবে না।"

হরিময়বাবু বললেন, "বংশগোপালবাবু যখন সস্নেহে ভাড়ার পরিমাণ সম্পর্কে এই সব নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন চমচম বয়সে শিশু—এতো বছর পরে তার তো নাবালক থেকে যাওয়ার কথা নয়। আপনি ভাড়া বাড়ান, চমচম অবশ্যই তা মান্য করবে।"

কিন্তু হরিময়বাবু লক্ষ্য করলেন, পিতৃপুরুষের নির্দেশ অমান্য করার সাহস বা ইচ্ছা কোনওটাই নেই বংশগোলাপবাবুর।

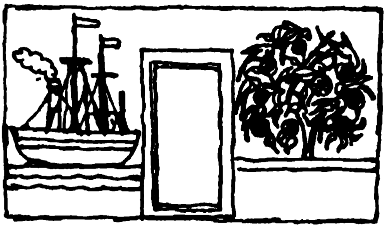
"এতে মশায় বংশের অমঙ্গল হতে পারে।" তিনি সোজাসুজি জানালেন হরিময়বাবুকে। "বংশের অমঙ্গলের কথা উঠলে আদি পুরুষ বংশগোপালও শিউরে উঠতেন। আমারও মশাই, এইসব আশঙ্কা পুরোপুরি যায়নি। এসব ব্যাপারে আমি কোনো ঝুঁকি নিতে রাজি নই।"

"আপনি না মশাই বি এসসি এবং বি কম পর পর পড়েছিলেন বেনারসে?"

"তাতে কী এসে যায়, মশাই? এই বিশ্বাস বংশের দুঃখের একটা মস্ত ইতিহাস আছে। দুঃখের কারণটা আমার দাদু বংশবিনয় খুঁজে বার করবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। ভাবছি আরও খোঁজখবর নেবার জন্যে আমি নিজেই এবার উঠেপড়ে লাগবো যখন হাওড়ায় হাজির হয়েছি। হাতে তেমন কোনো কাজও নেই।"

আর কথাবার্তা নয় আজ। কাজের লোক বিজয় প্রধান কার্যালয়ে ফিরলো বেশ দেরি করে।

যা আশঙ্কা করেছেন হরিময় তাই। লেখক চিরন্তন চ্যাটার্জি ধারাবাহিকের কিস্তি তৈরি করতে বেজায় সময় নিয়েছেন। অথচ বেশি তাগাদা দেওয়ার উপায়ও নেই। অভিমানী লেখক তখনই বলে বসবেন, "এ সংখ্যায় তা হলে লেখা বন্ধ থাক। সম্পাদকীয় পাতায় বক্স করে দশ পয়েন্ট বোল্ড টাইপে দেবেন, চিরন্তন চট্টোপাধ্যায় অসুস্থ। তাই অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় ধারাবাহিক ছাপা গেলো না।" ওই সব হাঙ্গামায় যাবেন না হরিময়বাবু, তারপর যদি অনেক চিঠি এসে যায় উদ্বিগ্ন পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে তা হলে চিরন্তনবাবু আরও বিগড়ে যাবেন এবং নিজের বাজার দর বাড়াবার জন্যে পরের বার লেখা দিতে আরও দেরি করবেন।



চমচম পত্রিকার রেসিডেন্ট কম্পোজিটর উপেনবাবু রেডি হয়ে আছেন, আজ রাত্রেই তিনি চিরন্তনবাবুর লেখাটা 'কম্বোজ' করে ফেলবেন। কোনো অজ্ঞাত কারণ এলাইনে ছাপাকে 'ছাবা' এবং কম্পোজকে 'কম্বোজ' বলা হয়ে থাকে। কলকাতা শহরে উপেনবাবুর থাকবার জায়গা নেই, এই চমচম অফিসেই রাত্রি কাটান। খোদ আপিসঘরে কম্পোজিটর দিবারাত্র বসবাস করলে কর্তৃপক্ষের সুবিধে অনেক—উপেনবাবু রাত্রেও আছেন বলে, কোনও এমার্জেন্সিকেই ভয় করেন না চমচম সম্পাদকীয় বিভাগ। মাঝরাতে কাজ করা যাবে প্রয়োজন হলে। অনেক রাত ধরে হরিময়বাবুও আজ চিরন্তন চ্যাটার্জির ধারাবাহিক উপন্যাসের প্রুফ সংশোধন করছেন।

দ্বিতীয় প্রুফ সংশোধিত হয়ে এখনই আসবে। রাতদুপুরে হরিময়বাবু দেখলেন, বিশ্বাস পরিবারের মূল বাড়ির দোতলায় বংশগোপালবাবুর পুরনো ঘরে আলো জ্বলছে। মনে হলো, তাঁর বংশধরটিও একইভাবে রাত জেগে বসে রয়েছেন।

এবার ওপর থেকে বংশগোলাপবাবুও দেখলেন, হরিময়বাবুর চমচম অফিসেও আলো জ্বলছে।

রাতদুপুরে দূত মারফত একটা স্লিপ পেয়ে হরিময়বাবু তার তক্তপোশ থেকে উঠে পড়লেন। ক্লাসিক স্টাইলের একটা ডেস্কের উপর হরিময়বাবু সম্পাদকীয় কাজ করেন।

বংশগোলাপবাবু অতিশয় ভদ্রলোক। তিনি লিখেছেন, "দূর থেকে দেখলাম আপনি জেগে রয়েছেন। অনুমতি পেলে নেমে আসতে পারি।"

হরিময়বাবু ভদ্রতা করে নিজেই চললেন এই সম্পত্তির মালিক বংশগোলাপের সঙ্গে দেখা করতে।

রাতদুপুরে চমচম সম্পাদককে কাছে পেয়ে খুব খুশি হলেন বংশগোলাপ

বিশ্বাস। রাত জেগে সম্পাদক প্রুফ দেখছেন শুনে তিনি আরও অবাক হলেন। একটা মাসিক ম্যাগাজিন বার করা যে সোজা কথা নয় তা বংশগোলাপ এবার বুঝতে পারছেন।

কিন্তু বংশগোলাপবাবু স্বয়ং কেন নিদ্রাহীন? তিনি বললেন, "এ-বাড়িতে এসে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটেছে, হরিময়বাবু। সন্ধ্যা ন'টা থেকে সাড়ে-বারোটা পর্যন্ত ঠিক ঘুমোই—তারপর হঠাৎ কেন যে ঘুম ছুটে যায়! পাকা চার ঘণ্টা আমি বসে জেগে থাকি—মনে হয় পূর্বপুরুষ বংশগোপালের ছবিটা জীবন্ত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, বিশেষ করে এই মাঝরাতে। এবং বলছে, গোলাপ, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। তোমার ওপর অনেক ধকল গিয়েছে—তোমার বাবা মারা গিয়েছেন অকালে, রাতে তোমার চোখে ঘুম আসে না।"

হরিময়বাবু জানালেন, "বংশগোপালবাবুরও ওই অসুবিধে ছিল। আড্ডাবাজ লোক, একলা থাকতে পারতেন না। রাত দুপুরে আমার খোঁজ করতেন।" যদি বংশগোপালবাবু একটু মনোবল পান এই আশায় কথাগুলো বললেন হরিময়।

হরিময়বাবু আরও বললেন, "রাত্রে অনেক সময় যখন পাচ্ছেন এবং আপনার হাত যখন খালি তখন ধীরেসুস্থে পূর্বপুরুষদের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করুন। পিকলু বলছিল, আমেরিকায় বহু লোক কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে নিজেদের বংশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করছেন। শিকড় না কী বলে। ইংরিজিটা হলো, রুটস। তেমন হলে হিন্দিতে লিখুন—চমচমের বিশেষ হিন্দি সংখ্যায় ছাপা যাবে বংশগোপাল বংশকথা।"

বংশগোলাপবাবু খুশি হলেন। "হরিময়বাবু, আপনি ভাল পরামর্শ দিয়েছেন। আমাদের এই ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট স্টোররুমে অনেকগুলো কালো রঙের ট্রাঙ্ক একের ওপরে এক সাজানো রয়েছে। বংশগোপালের মৃত্যুর পরে বোধ হয় আর খোলাই হয়নি। ওইসব বাক্সে অনেক কাগজপত্তর আছে।

হরিময়বাবু বললেন, "আমার সম্পাদকীয় হাঙ্গামা এখনও শেষ হয়নি। চিরন্তন চ্যাটার্জি তাঁর উপন্যাসের কিস্তির শেষ প্যারাগ্রাফটা এবার বিজয়ের হাতে দেননি। এখনও তিনি ওই নিয়ে ভাবছেন। রাত তিনটের সময় হয়তো অফিসে ফোন করে নিজেই ডিকটেট করে দেবেন। লেখার চাপ থাকলে বিমল মিত্রের মতন উনিও রাত্রে ঘুমোন না। সেদিকে মশাই আমাদের প্রিয় লেখক ভবনাথ সেন ভীষণ ভাল—লেখার কোথাও কোনও আচমকা ঝাঁকানি বা প্যাঁচ নেই, তাই রাত্রে ওঁর ঘুমোতে কোনও অসুবিধে হয় না। রাত দশটা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত চমৎকার ঘুমিয়ে চুপিচুপি উঠে পড়ে ভবনাথ লিখতে শুরু করেন।

ভোরবেলার লেখাগুলো সাধারণত স্নিগ্ধ হয়। যত মারপ্যাঁচ থাকে এই মাঝ রাত্রের বেবিগুলোতে! বিমল মিত্তির মশাই বলতেন, অনেক বড় বড় লোক রাত্রে ঘুমোতে পারে না। যেমন বম্বে ফিলমের গুরু দত্ত। ওঁকে নিয়ে বিমলবাবু বিনিদ্র বলে একটা বই লিখছিলেন। অজ্ঞাত কারণে, মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেলো।"

বংশগোলাপ দুঃখের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের বংশে এই রাত জাগা রোগ কেন এলো বলুন তো?"

"এটা তো মশাই বংশগত ব্যাধি নয়। স্রেফ একটা নির্দোষ ঘটনা।"

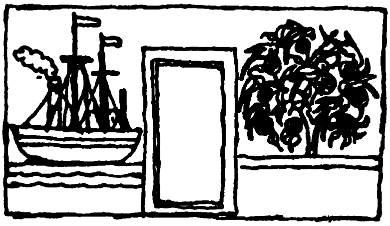
"আমাকে যিনি মানুষ করেছেন, আমার দাদু বংশবিনয়, তিনিও আমাকে বলেছেন, মাঝরাতে তাঁর ঘুম চটে যায়। ফলে অফিসে যেতে লেট করতেন বেনারসে। তিনি আবার রসিকতা করতেন—খেয়ে হাগে, শুয়ে জাগে সে ছেলে না কোনও কাজে লাগে। বাংলায় যে কত রকমের ছড়া আছে এবং কত যে তার মানে!"

আরও খবর জানা গেলো। বংশগোলাপ বললেন, "একসময় আমার দাদু বংশবিনয়ের বড়ি খাবার অভ্যাস হলো। ঘুমের বড়ির জোরে ঘুম। কিন্তু এটা ভাল নেশা নয়। ক্রমশই ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হয়। আমাকে দিয়ে দাদু দিব্য করিয়ে নিয়েছিলেন, কখনও ঘুমের বড়ি খাবে না। জানেন মশাই, এই পিল খেয়েই দাদুর সর্বনাশ হলো। বৃদ্ধ বয়সে ভুলে একবার অনেকগুলো বড়ি খেয়েছিলেন। বাঁচানোর বহু চেষ্টা করা গেলো, কিছু হলো না। অপঘাতে মৃত্যু বলতে পারেন। শেষের দিকে বংশবিনয় বলতেন, সমস্ত দুনিয়া যখন ঘুমোচ্ছে, তখন একলা ধুনি জ্বালিয়ে জেগে থাকার কোনো মানে হয় না। এ মস্ত এক অভিশাপ। ওপরে গিয়ে পিতৃপুরুষের সঙ্গে দেখা হলে আমি আসল রহস্যটা জেনে নেবো।"

হরিময়বাবু জানালেন, "আমি এবং মিস্টার পিকলু, দু'জনে বিজ্ঞানবাদী। আমরা অভিশাপটাকে বিশ্বাস করি না। তবে আমি জানতাম না, বংশবিনয়বাবুর মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়।"

"আমিও এসব বিশ্বাস করতাম না মশাই, কিন্তু নিজের পিতামহ, যিনি আমাকে নিজের মনে কথাটা আওড়াতেন—অভিশাপ, অভিশাপ। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও মহাপাপ থেকে। ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, আমাকে ঘুম দাও।"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বংশগোলাপ এবার আঁতকে উঠলেন। "চারটে বেজে গিয়েছে! আপনি মশাই ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিন। আই অ্যাম ভেরি ভেরি স্যরি।"



ভোর হয়েছে। সকালেই সল্ট লেক থেকে ভবনাথ সেনের ফোন এলো। "হরিময়, তুমি সত্যিই পিকলুকে চার্জ করেছো।"

"চার্জের বাংলাটা যেন কী? চমচমের নতুন নীতি হচ্ছে যথাসাধ্য খিচুড়ি বিদেশি শব্দ ব্যবহার না করা।"

"বাংলায় বলে 'মন্ত্রমুগ্ধ', কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এক নয়। সোজা ভাষায় বলা যায়, পিকলুকে তুমি মজিয়েছ। আই আই এম জোকা কলেজের লম্বা ছুটিতে এবার পিকলু বোম্বাই ফিরছে না। কারণ তার বাবা হিন্দুস্থান লিভারের কাজে সস্ত্রীক মিশরে যাচ্ছেন দু'মাসের জন্যে।"

ভবনাথবাবু খুবই আনন্দিত। আদরের নাতি কয়েকটা সপ্তাহ তাঁরই কাছেই থাকবে।

ভবনাথবাবু এবার জানালেন, "পিকলু তার মোটরসাইকেল নিয়ে আধঘণ্টা আগে বেরিয়ে পড়েছে চমচম সদর দপ্তরের সন্ধানে। সম্পাদকের বিভিন্ন কাজের সঙ্গে একটু জড়িয়ে পড়তে চায়।"

হরিময় সগর্বে ঘোষণা করলেন, "দু চাকা বা চার চাকা থাকলে হাওড়া এবং বিধাননগরের মধ্যে আজকাল কোনও দূরত্বই নেই! কলকাতার ইস্টার্ন বাইপাস এবং বিদ্যাসাগর সেতুর ব্যাক গ্রাউন্ডে স্যর আপনি একখানা 'পমো' লিখুন।"

ভবনাথবাবু প্রথমে বুঝতে পারলেন না, 'পমো' কথাটা আগে কখনও কানে আসেনি।

হরিময়বাবু হাসলেন। "পিকলুকে জিজ্ঞেস করবেন। এখনকার ছেলেমেয়েরা আর পুরো নাম, পুরো কথা ব্যবহার করে না। 'পমো' মানে উপন্যাসোপম বড় গল্প। যেমন পলসায়ান্স মানে পলিটিকাল সায়ান্স। ইটি মানে ইকনমিক টাইমস, হরি মানে হরিময় চৌধুরী। একদিন হয়তো চমচমকেও ওরা ডাকবে 'চম' বলে। অবশ্য তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই, যদি কাগজের গ্রাহক সংখ্যা কয়েকশো বাড়ে।"

টেলিফোন নামিয়ে রেখেই হরিময়বাবু ভটভটিয়ার আওয়াজ শুনলেন।

পিকলুকে ওয়েলকাম করবার জন্য সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে তিনি দ্রুত বেরিয়ে এলেন।

ভটভটিয়া এসেছে, কিন্তু পিকলু নয়। সেই লোকটা যে নজর আলি লেনের হরিময়বাবুর সঙ্গে দেখা করেছিল অ্যানটিকের সন্ধানে। ভটভটিয়ার পিলিয়নে টিশার্ট ও জিন্স্‌পরা সহকারী সান্যালকেও দেখা গেল। পিকলু ঠিকই বলেছে, ঠোঁটের কাটা দাগটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। সাতসকালে এখানকার ঠিকানাও সামতানি খোঁজ করেছে।

মিস্টার সামতানি অফ পুরাতনী এবার হরিময়কে নমস্কার করলেন। অনেক আগে এই প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল প্রাচীনা। সামতানি বললেন, "ইয়েস, নাম কয়েকবার পাল্টেছে। বিদেশে ভীষণ অসুবিধা হচ্ছিল, বাইরের লোকরা ভাবছিল আমরা প্রোচাইনিজ এবং চিনের পুরনো জিনিস বিক্রি করি।"

সামতানি আবার শহিদ বীরেন্দ্র দত্তগুপ্তর উল্লেখ করলো। "টেবিলটা না হয় আপনি রাখলেন, কিন্তু ফাঁসির আগে লেখা কোনও চিঠিপত্তর আপনার কাছে আছে? কিংবা বাঘা যতীনের কোনও কাগজপত্তর? বীরেনবাবু তো ফাঁসিকাঠে ওঠবার আগে বাঘা যতীনের নামে অন্যায় রিপোর্ট করার জন্যে ক্ষমা চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, ভুল হয়েছিল। সেই চিঠিটা বেলজিয়মে একজন বাঙালি কিনতে চান।"

"দাম উঠছে বুঝি?" গভীর আগ্রহে জিজ্ঞেস করেন হরিময়বাবু।

"এবার চড়চড় করে দাম উঠবে, মিস্টার চৌধুরী। টেগার্টের দু'খানা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়রি পাওয়ার চান্স রয়েছে আজ। আর কোথাও যদি কিছু পড়ে থাকে এই অধমকে একটু দেখবেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "যে লোকটা সূর্য সেনের গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়েছিল তার ছেলে ইদানীং কলকাতায় মুখ খুলেছে। শোনা যায় এদের ফ্যামিলি কিন্তু ক্ষুদিরামের ফাঁসি দেওয়ার কাজ রিফিউজ করেছিল, কিন্তু মাস্টারদার ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। ফাঁসুড়ে মশাই নাকি পরে খুব দুঃখ করেছিল। করুন না খোঁজ, হয়তো ফাঁসির দড়িটা পেয়ে যেতে পারেন।"

মিস্টার সামতানি এবার ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তিটা ঘুরে ঘুরে দেখলেন। নানা প্রশ্ন করলেন বংশগোপাল বিশ্বাস সম্পর্কে। "খুবই ইন্টারেস্টিং মানুষ ছিলেন মনে হয়। সেই সঙ্গে কালেকটর।"

হরিময়বাবু সরল মনে বললেন, "এই অদ্ভুত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার আলাপ তাঁর জীবনের শেষ পর্বে। নাইনটিন ফর্টি ফাইভ থেকে যখন আমি

ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে জেল খেটে হতাশায় নেতিয়ে পড়েছি। বংশগোপাল বিশ্বাস নিশ্চয় এক সময় সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করেছেন। গোড়ার দিকে সুরেশ মজুমদার, মাখন সেন, গণেন মহারাজ, বাঘা যতীনদের সঙ্গে ভাবভালবাসা ছিল, সেই সূত্রে নিবেদিতাকেও জানতেন একসময়। তবে নিজে কখনও বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েননি।"

"কেন?" সামতানি প্রশ্ন করলো। "আমার নিজের হিসট্রি সম্বন্ধে একটুও আগ্রহ নেই, কিন্তু পুরনো মাল বেচাকেনা করতে গেলে একটু পুরনো ব্যাপার-স্যাপার জানতে হয়।"

ব্যাপারটায় চাপা কৌতূহল অনুভব করেন হরিময়বাবু নিজেও। তিনি বললেন, "আমি একবার চুপিচুপি বংশগোপাল বিশ্বাসকে এব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি রহস্যময় হাসি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, আমি তখন খুব ধনী হতে চাইছি হরিময়। তা স্বামী সারদানন্দ একবার আমাকে বলেছিলেন, যে বড়লোক হতে চায় তার পক্ষে আর কিছু হওয়া সম্ভব নয়!"

সামতানি জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে, বংশগোপালবাবু স্বামী সারদানন্দকে চিনতেন?"

"তাই তো মনে হয় উনি একটা ডাকনামও ব্যবহার করতেন—দাঁড়ান এক মিনিট—রামকৃষ্ণ মঠের সবাই মনে রাখে, অথচ আমার মাথায় থাকে না—শরৎ মহারাজ—শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।"

"ইনি জন্মেছিলেন হ্যারিসন রোড-আমহার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে—১২৫ নম্বরে। বাবার নাম গিরিশচন্দ্র, মা নীলমণি দেবী, আদিনিবাস জনাই। মেডিক্যাল কলেজের সামনে আরপুলি লেনের ওপরে ওষুধের দোকান ছিল—ইম্পিরিয়াল ড্রাগিস্টস্ হল।"

অবাক হয়ে গেলেন হরিময়বাবু। "কী করে জানলেন আপনি, মিস্টারস সামতানি।"

ওঁর জানবার কথা নয়, কিন্তু তিনি গিয়েছিলেন জ্যোতি বসুর জন্মস্থান সম্পর্কে খোঁজ করতে ওই হ্যারিসন রোড-আমহার্স্ট স্ট্রিটে। "যদি কিছু পুরনো মাল পাওয়া যায়, একসময় গভরমেন্ট নিশ্চয় চড়া দামে কিনবে। তা খোঁজ করতে গিয়ে শুনলাম, একই জায়গায় এই সন্ন্যাসীরও জন্ম! এঁদের কবিরাজি ওষুধের দোকানের খবরটাও পাওয়া গেলো।"

সামতানিকে বিজয়ের হাতে তুলে দিয়ে হরিময়বাবু সেকেন্ড প্রুফটা নিয়ে বসতে চান, এই ফর্মা আজই ছেড়ে দিতে হবে মেশিনম্যানকে।

আরও অনেকক্ষণ জায়গাটা ঘুরিয়ে বিজয় একসময় সামতানিকে চমচমের অফিসঘরে নিয়ে এসে চায়ে আপ্যায়িত করলো। কারণটা পরিষ্কার, বিজয়ের হাতে কড়কড়ে দুখানি পঞ্চাশ টাকার নোট জুটেছে। সামতানি লোহার গোলাতেও ঢুকেছেন, তুলসীতলাও দেখেছেন, তবে বংশগোপালের ওখানে যাননি।

সামতানি চা পান করতে করতে জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে আপনিই এই বিশাল জমিদারির মালিক।"

"আমি মালিক হতে যাবো কোন অধিকারে? চমচমকে দয়া করে একটু অধিকার দিয়ে গিয়েছেন বংশগোপাল বিশ্বাস—সেটুকু সবিনয়ে এবং সসম্মানে ব্যবহার করছি। বেঁচে থাকুন বংশগোলাপবাবু এবং তার বংশধররা। আমি কে? আমি তো বিয়ে-থা করিনি, চোখ বুজলেই সব শেষ—তখন আমার নাম হতে পারে বংশলোপাট চৌধুরী!"

সহকারী সান্যাল সব কথা শুনে গেলো কিন্তু কোনো মন্তব্য করলো না।

এবার ঘরের বাইরে আরেকটা মোটরবাইকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। চোখে কালো চশমা লাগিয়ে আবির্ভূত হলেন স্বয়ং শ্রীমান পিকলু সেন "বিদ্যাসাগর ব্রিজ ধরে আসতে গিয়ে চারদিকে তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায় হরিময়দাদা, হাওড়াকে কলকাতা থেকে বেশি সুন্দরী মনে হয়।"

"হুম! হাওড়া চিরকালই সুন্দর ছিল—গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল! সাধে কি আর নরেন্দ্রনাথ দত্ত বিশ্বভুবন ঘুরে এসে এই হাওড়ায় বেলুড়মঠ স্থাপন করলেন! দুঃখের ব্যাপার তাঁর বন্ধু কালীবেদান্তী স্বামী অভেদানন্দ হাওড়াকে তেমন পছন্দ করতেন না। আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তিনি চেয়েছিলেন মঠকে বেলুড় থেকে কলকাতায় সরিয়ে নিতে।"

সামতানির দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো পিকলু। কিন্তু তখন সামতানি মোটরবাইকে স্টার্ট দিচ্ছেন। পিকলু জিজ্ঞেস করল, "মিস্টার সান্যাল কোথায়?"

সামতানির প্রথম দিনের সঙ্গীর কথা হরিময়বাবু ভুলেই গিয়েছিলেন। দুঃখ করে বললেন, "এবার বোধহয় আমাকে হিমালয় ড্রাগ কোম্পানির মেনটাট খেতে হবে, আয়ুর্বেদিক ওয়ান্ডার ওষুধ, স্মৃতিশক্তি বর্ধনে অপরিহার্য।"

সহকারী সান্যাল হঠাৎ উধাও হয়ে সম্পত্তিটা আর একবার খুঁটিয়ে দেখে এসেছে।

এবার বিজয়ের সঙ্গে পিকলুকেও সম্পত্তিটা ঘুরে দেখানোর কনডাকটেড ট্যুরে পাঠালেন হরিময়।

ফিরে এসে পিকলু মন্তব্য করলো, “এতো একটা রাজত্ব, হরিময়দাদা। চমচম যদি পৃথিবীর প্রধান তেতাল্লিশটা ভাষায় প্রকাশিত হয় তা হলেও জায়গার কোনও অভাব হবে না।”

হরিময়বাবু বললেন, “সবাই যাকে বলে কি না ঠাকুরের ইচ্ছে—তিনিই জুটিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা বুঝলে তিনি কেড়ে নেবেন।”

“জায়গাটা একটু অগোছালো হয়ে পড়ে আছে।” এটা পিকলুর সকৌতুক মন্তব্য।

“এটাই তো স্বাভাবিক। মস্ত জায়গা, কিন্তু সম্পত্তি থেকে তেমন রোজগার নেই। ওই ভাড়াটিয়ারা যা দেয় তার থেকে কোনওক্রমে ট্যাক্সো ও জমাদারের খরচ উঠে যায়। এখন মালিকের বংশধর বাড়ি ফিরে এসেছেন, এবার যদি মাথা ঘামিয়ে তিনি কিছু করতে পারেন। উপার্জন বৃদ্ধি এবং শ্রীবৃদ্ধি একসঙ্গেই হতে পারে।”

পিকলু বললো, “এতোখানি খালি জায়গা, কিন্তু সবুজ দেখলাম কেবল ওই তুলসীমঞ্চের কাছে। ওটার নাম দিন চমচম পার্ক।”

হরিময়বাবু বললেন, “আমি ভাবছিলাম, নাম দেবো বংশগোপাল উদ্যান। কিন্তু ওই ভদ্রলোক কোথাও নিজের নামের কোনও চিহ্ন রাখতে চাইতেন না। সব কিছু লুকিয়ে লুকিয়ে করতে ভালবাসতেন।”

“ইন্টারেস্টিং!” পিকলু বললো।

“লুকিয়ে লুকিয়ে লেখাও!” জানালেন হরিময়বাবু। “বংশগোলাপবাবু গত রাত্রে অনেক সন্ধান করেছেন রাত জেগে—অকস্মাৎ বংশগোপালবাবুর পুরনো কিছু রচনা ও ডায়রির সন্ধান পেয়েছেন।”

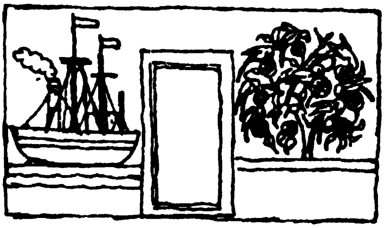
পুরনো ব্যাপারে ইদানীং পিকলুর আগ্রহ জেগেছে। সে বললো, “চলুন না, কাগজগুলো দেখি। অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরনো রচনা।”

“দাদু বলছিলেন, ওঁর ভীষণ ইচ্ছে, একবার অন্তত শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর অরিজিন্যাল ডায়রিগুলো দেখার। উনি অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু সঙ্গে ফোনে এ বিষয়ে কথা বলেছিলেন, কিন্তু শঙ্করীপ্রসাদবাবু নিজেও কখনও ওই ডায়রি দেখেননি।

“অথচ কবে আমেরিকায় ওসবের ফটো কপি চলে গিয়েছে।”

এবার হরিময়বাবু দুঃখ করলেন, “ভাল জিনিস, দামি জিনিস এদেশে কিছুই থাকবে না, মিস্টার পিকলু, সব বিদেশে চলে যাবে—কোহিনূর থেকে আরম্ভ করে কবিগুরুর গীতাঞ্জলির অরিজিন্যাল পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত। বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য,

মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ, এমন কি ক্ষুদিরাম-বাঘা যতীনের জিনিসপত্র সব এক্সপোর্ট হয়ে যাবে।”



হাওড়া শিবপুরের এই জায়গাটা পিকলুর বেশ ভাল লেগে গিয়েছে। “এখানে ইতিহাসের সোঁদা গন্ধ রয়ে গিয়েছে, হরিময়দাদা।”

বিশ্বাস পরিবারের সম্পত্তির ভিতরে বিরাট বিরাট কয়েকটা আম গাছ এবং একটা বটগাছ আছে। এই ধরনের গাছ থাকলে মরুভূমিও বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। না-চাইলেও পাখিরা এসে হাজির হয়, ভোরবেলায় গান গায়। তার সঙ্গে অচেনা অতীতের নীরব হাতছানি।

হরিময়বাবু অতশত ইতিহাস বোঝেন না। বললেন, “কোথায় হিসট্রি? যে লোকটা এই সম্পত্তি তৈরি করেছিলেন তাঁকে আমি দেখেছি। মূল বাড়িটার অবস্থা এখন ভাল নয়- কিন্তু বাড়ির জন্ম-বয়স লেখা রয়েছে—১৮৯৭। তার মানে এই সেদিনের ঘটনা। অথচ সিমেন্ট ব্যবহার না করে স্রেফ সুরকির ওপর কাজ করায় অকালবার্ধক্যর কিছু লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এ দেশে মানুষও বেশি বছর টেকে না, বাড়িও টেকে না।”

“সত্যি এখানে বয়সটা তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, হরিময়দাদা। প্যারিসের, লন্ডনের তিনশ বছরের পুরনো বাড়ির ছবি দেখুন, মনে হবে যেন গত বছর তৈরি হয়েছে।”

হরিময়বাবু ইতিমধ্যে ভবনাথ সেনের সঙ্গে আবার দেখা করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন।

পিকলু বললো, “আজ বিকেলে দাদু কোথাও মিটিঙে যাবেন। দেখা করতে হলে এখনই সল্টলেকে যেতে হবে আপনাকে।”

হরিময়বাবুকে চুপিচুপি ভিতরের খবর দিল পিকলু। “আজ দিদিমা স্পেশাল খিচুড়ি রাঁধছেন উইথ ইলিশমাছ ভাজা, ঢাকা থেকে দাদুর এক ভক্ত দিয়ে গিয়েছেন সকালে। ঢাকার ইলিশ যে ওয়ার্লডের সেরা ভবনাথ সেন এটা বইতে

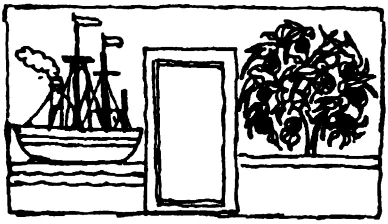
লিখিতভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।"

হরিময়বাবুর মাথায় আচমকা আইডিয়া এসে গেলো। ইলিশের ওভারডোজের পর শরীরের পক্ষে যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় তা হলো দুলালের দই। সাদা মিষ্টি দই হজমের পক্ষে সেরা। বাংলায় একটা প্রবন্ধ পড়ে হরিময়বাবু রঙিন দই কেনা ছেড়ে দিয়েছেন।

কালিবাবুর বাজারের কাছে পিকলুর মোটরবাইক থামিয়ে হরিময়বাবু মিষ্টি দই ও আরও একটা বাক্স নিয়ে নিলেন। বাক্সে যে চমচম রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। "চমচমের পক্ষ থেকে দেখা করতে যাওয়া, অথচ হাতে চমচম নামক মিষ্টান্নের বাক্স থাকবে না এটা গ্রামাটিক্যালি এবং ড্রামাটিক্যালি ভুল, মিস্টার পিকলু।"

"গ্রামার না হয় বোঝা গেলো, কিন্তু ড্রামা?"

হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, "সব সম্পর্কের মধ্যে মাঝে মাঝে একটু নাটকীয়তা একটু বিস্ময় না রাখলে জীবনটা বিস্বাদ হয়ে ওঠে, মিস্টার পিকলু।"



ভবনাথবাবু ঝটিতি হরিময়বাবুর বাক্স থেকে একটা বিগ সাইজ চমচম তুলে নিলেন। দু'মিনিট চোখ বুজে রসাস্বাদন করে তিনি বললেন, "অতি উত্তম! আজ বিশেষ শুভদিন। যাচ্ছি কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে বক্তৃতা করতে। ইচ্ছে আছে, সময় পেলে কাশীপুরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িটাও খোঁজ করে আসবো।"

"সেটা কোথায়?" জানতে চাইছেন হরিময়বাবু।

"সেইটাই তো গোলমাল! ওই বাড়িতে ভক্তদের নিয়ে স্বামীজি কয়েক রাত্রি কাটিয়েছিলেন আমেরিকা থেকে ফেরবার পরেই অর্থাৎ ১৮৯৭ সালে। এই বাড়িতে বহুজনের পদধূলি পড়েছিল। বাড়ির ভিতরকার ছবিও আছে। অথচ একশ বছর যাবার আগেই বাড়িটার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না—স্বামী প্রভানন্দ অফ বেলুড়মঠ হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। অথচ প্রভানন্দ জানেন না এমন খবর রামকৃষ্ণ

মিশনে নেই। বহু বছর ধরে পরম ধৈর্যের সঙ্গে গবেষণা করে যাচ্ছেন, একের পর এক বই লিখে যাচ্ছেন। একটা বাড়ির খবর পাওয়া গেলো, কিন্তু সেটা গঙ্গাতীর থেকে অনেক দূরে। বরুণ মহারাজ ওরফে স্বামী প্রভানন্দ আশঙ্কা করছেন, গোপাললাল শীলের ঐতিহাসিক বাড়িটা সি ই এস সি-র কাশীপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মধ্যে বহু বছর আগেই বিলীন হয়ে গিয়েছে। কাশীপুর পাওয়ার স্টেশনের বয়স তো কম হলো না। কিন্তু দুঃখ করা চলবে না, কারণ স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন, এদেশে প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন হোক এবং তার জোরে দেশের রূপ পাল্টে যাক।"

ভবনাথবাবু যৌবনকালে ও মধ্যবয়সে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। বছরখানেক আগে অসুস্থ হয়ে পি জি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে থাকবার সময় হরিময়বাবু তাঁর হাতে একখানা অখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গছিয়ে দিয়েছিলেন।

হরিময়বাবু রসিকতা করে বলেছিলেন, "স্রেফ সস্তা বলে দিলাম—এই আনন্দ সংস্করণের ছাপা ও বাঁধাই অনবদ্য।"

"তুমিই তো সেবার আমার ক্ষতিটা করলে, হরিময়। পি জি থেকে ফিরে এসেও ঠাকুর সম্পর্কে আমার তৃষ্ণা অপরিতৃপ্ত থেকে গেলো। এখনও কিছু কিছু পড়ে যাচ্ছি, দু' একটা প্রবন্ধও লিখে ফেলেছি, তবে ছোটখাটো লেখা। কিন্তু সেইসব লেখা অনেকের নজরে পড়েছে। ফলে মঠের মহারাজরা আদর করে সভাসমিতিতে ডাকতে শুরু করেছেন।"

হরিময়বাবু রসিকতা করলেন, "সংসারের সর্বস্ব ত্যাগ করে, মাথা কামানো সন্ন্যাসীরা কি করে মহারাজ হন, ভবনাথবাবু? আসলে তো ওঁরা ভিক্ষাজীবী!"

হা-হা করে হাসলেন ভবনাথ সেন। "আদিতে ওরা রাজা মহারাজা কিছুই ছিলেন না। তারপর স্বামীর চেলা স্বামী সদানন্দ এলেন বরানগর মঠে, হাতরাস স্টেশনে কর্মচারী ছিলেন, ইউ-পি-তে অনেক পুরুষের বাস। উনিই উত্তর ভারতের স্টাইলে গৈরিকধারী সন্ন্যাসীদের মহারাজ বলা শুরু করলেন, নিজেও হয়ে গেলেন গুপ্তমহারাজ! দ্যাখো, যাঁরা সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারেন একমাত্র তাঁদেরই মহারাজ হওয়া সাজে!"

এরপর পিকলুর বাজার সার্ভের কথা ঠাণ্ডা মাথায় তুললেন হরিময়বাবু।

"পিকলু বলেছে, এই শতভঙ্গ বঙ্গদেশে এখনও দু'জন মহারাজের মার নেই—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং নেতাজি। আমিও সাহস পেয়ে গিয়েছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্পেশ্যাল সংখ্যায় আমি কাউকে স্পনসর নেবো না, কারণ

কাঞ্চনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কোনও কোম্পানি এখনও দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু ঐ সংখ্যায় আপনার একটা লেখা চাই। ভবনাথ সেন যদি ঠাকুর সম্বন্ধে একটা গরম লেখা চমচমে শুরু করেন তা হলে পাঠকদের মধ্যে ফাটাফাটি শুরু হয়ে যাবে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর মাসিক বসুমতীতে ঠাকুরের ধারাবাহিকের পরে অনেকদিন রামকৃষ্ণসাহিত্যের বাজারে তেমন হইচই পড়েনি।"

প্রস্তাব শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন ভবনাথ সেন। হরিময়কে বললেন, "বড় কঠিন বিষয় এই রামকৃষ্ণ। মাস্টারমশাই মহেন্দ্র গুপ্ত এ লাইনের বারোটা চিরকালের জন্য বাজিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সেই সঙ্গে শরৎ মহারাজের দু'খণ্ডে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ। এ বিষয়ে আর কিছু লেখার প্রয়োজন নেই। শরৎ মহারাজ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে ঠাকুর সম্বন্ধে যা গ্রহণ করবার এবং যা বর্জন করবার তা করে, তবে দেহ রেখেছেন। মস্ত সন্ন্যাসী যে মস্ত লেখক হতে পারেন তার বেশ কিছু উদাহরণ পাবে এই রামকৃষ্ণ মিশনে।"

"পূর্বসূরীদের অনুসন্ধানে কিন্তু কিছু ফাঁক সারাক্ষণ থেকে যায়," ভবনাথবাবুকেই উদ্ধৃত করলেন হরিময়বাবু। "আপনিই তো গত মাসে রবিবাসরীয় বর্তমান পত্রিকায় লিখেছেন, ঠাকুর এখনও খেলা দেখাচ্ছেন এবং দেখাবেনও। তা না হলে অচিন্ত্যবাবুর পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কীভাবে পাঠক মহলে এমন হইচই বাধায়? লোকে তো বোকা নয়, নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছেন। লোকমুখে রটে গেলো : ঠাকুর তোমায় কে চিনতো, না চেনালে অচিন্ত্য!"

পিকলু এতক্ষণ চুপচাপ কথা শুনে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে বলে বসলো, "দাদু, তুমি কখনও রহস্যকাহিনী লেখোনি। সাধারণ মানুষেব সাধারণ জীবনকথা আজকাল আমার বন্ধুরা তেমন পছন্দ করছে না। তারা পছন্দ করে উত্তেজনা, কিছুটা অনিশ্চয়তা, সারাক্ষণ একটা কী হয় কী হয় ভাব।"

"এসেছে! এসেছে—আইডিয়া এসেছে!" সোফা থেকে তড়াং করে উঠে দাঁড়িয়ে হরিময়বাবু এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "ভীষণ ব্যাপার হবে। আমি এ সংখ্যাতেই একটা রঙিন কাগজ পেস্ট করে অ্যানাউনস করছি : বাংলার ডিকেন্স সাহিত্যসাধক ভবনাথ সেনের প্রথম ভক্তিঘন রহস্যকাহিনী! আগামী সংখ্যা থেকে চমচমে প্রকাশিত হবে।"

ভবনাথবাবুর মাথায় তখনও ব্যাপারটা ঢুকছে না। হরিময়বাবু বললেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিয়ে গান লেখা হয়েছে, পুঁথি লেখা হয়েছে, নাটক লেখা হয়েছে, কথামৃত লেখা হয়েছে, পত্রাবলী হয়েছে, কিন্তু রহস্যকাহিনী এখনও

রচিত হয়নি ভবনাথবাবু। ভগবানের ইচ্ছেয় এই দুর্লভ দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে হচ্ছে।"

"কীসব আজগুবি আইডিয়া দিচ্ছো হরিময়!" মৃদু প্রতিবাদ জানালেন ভবনাথ সেন।

হরিময় পাল্টা আঘাত করলেন, "আপনিই এবারে তো লিখেছেন, ঠাকুর হলেন পূর্ণ। কোন দুঃখে বাংলা সাহিত্যে তিনি অপূর্ণ থেকে যাবেন? বিশেষ করে চমচম পাঠকরা যখন প্রস্তুত রয়েছে, ভবনাথ সেনের সব রকম পরীক্ষানিরীক্ষার গিনিপিগ হতে।"

ভবনাথ বললেন, "হরিময় তুমি বুঝছো না। লোকে নিন্দে করবে। বলবে—বুড়ো বয়সে কথাসাহিত্যিক ভবনাথ সেনের মাথায় ব্যারাম হয়েছে! পরমপুরুষদের নিয়ে কস্মিনকালে কেউ কি ডিটেকটিভ গল্প লেখে?"

ব্যাপারটা পিকলুকে খুব আনন্দ দিচ্ছে। সে এবার জিজ্ঞেস করলো, "রামকৃষ্ণকে নিয়ে কি কোনও রহস্য আজও কি রহস্যময় হয়ে আছে? সেইটা নিয়ে প্রথমে খোঁজখবর করা যেতে পারে? তারপর তো রহস্যামৃত।"

ভবনাথ বললেন, "হরিময়দাদুকে জিজ্ঞেস করলে, উনি বলে বসবেন, পরমপুরুষদের সমস্ত জীবনটাই তো রহস্যময়।"

পিকলুর দিদিমা বিলাসিনী সেন চতুর্থ দফায় চিড়ে-ভাজা ও চা সাপ্লাই করতে এসে ব্যাপারটার মধ্যে গল্প গন্ধ পেয়ে স্বামীকে বললেন, "দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা মাত্র নাতি আব্দার করে তোমাকে একটা গল্প লিখতে বলছে, আর তুমি তা শুনছো না!"

ভবনাথবাবু বললেন, "যিনি নায়ক তাঁর কোনো রহস্য না থাকলে রহস্যরচনা কী করে হবে? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষটা তো ছিলেন কাচের মতন স্বচ্ছ—কোথাও কোনও অস্পষ্টতা ছিল না। আত্মীয়দের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল, নিয়োগকর্তার সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল, শিষ্যদের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ছিল এসব তো ভক্তদের কাছে এবং সন্দেহপ্রবণদের কাছেও সব জলের মতন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে।"

পিকলু জানতে চাইলো, "তাহলে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডক্টরেট গবেষক কেন বাঁকা-বাঁকা কথা লিখেছে এই বছরে? স্টেটসম্যান কাগজে গ্রন্থ সমালোচনা পড়েনি দাদু?"

"পড়েছি। কিন্তু ওসব মানসিকভাবে অসুস্থ লোকদের কাজ, পিকলু। লেখকের মনোরোগের চিকিৎসা দরকার। মাথায় একটা বদ্ধ নোংরা ধারণা নিয়ে

প্লেনে চড়ে এদেশে এসেছিলেন, সেটা গোপন করে এদেশের সন্ন্যাসীদের দয়াদাক্ষিণ্যের সুযোগ নিয়েছেন। আতিথেয়তার অপব্যবহার করেছেন, তারপর ফিরে গিয়ে শরীরের ভিতরে জমে ওঠা নোংরাটা বমি করে দিয়েছেন। কিন্তু এতে ফল ভাল হয় না। ঠাকুর যেমন ছিলেন ঠিক তেমনই থাকবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনের সবটাই স্বচ্ছ। কিছুই যে লোকচক্ষুর অন্তরালে নেই তা ভাবতে চাইছেন না হরিময়বাবু। কিন্তু তিনি যুক্তিতে পেরে উঠছেন না। হরিময় বললেন, "ওই যে ভগবান রামকৃষ্ণ নিজেকে একজন পেন্সিলার বলতেন! আপনার বেয়াই, পুলিশের ডি আই জি সি আই ডি রঞ্জন সেন সেদিন টি-ভি-তে বললেন, সাট্টা খেলার চক্রে বড়বাজারে দু'জন পেন্সিলার ধরা পড়েছে।"

"আর হাসিও না, হরিময়। ঠাকুর বেঁচেছিলেন ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত। তখনও পর্যন্ত এখানে কেউ সাট্টার নামও শোননি। আসলে, পেন্সনার অর্থাৎ অবসরভাতার ভোগীকে ঠাকুর সরল মনে পেন্সিলার বলতেন। ওঁর নিজের যে মাসে সাত টাকা পেনসন ছিল, দক্ষিণেশ্বর মন্দির থেকে—পূজা করুন চাই না করুন, এই টাকা পাবেন।"

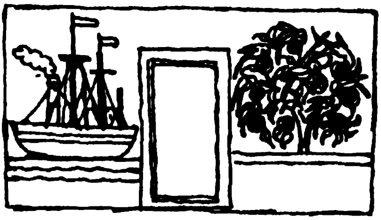
ভবনাথবাবু স্বীকার করছেন, রামকৃষ্ণ রহস্যামৃত নামটা চমচম পত্রিকায় জমবে ভাল, কিন্তু রহস্য গল্পের প্লটটা মাথায় না-আসা পর্যন্ত তাঁর পক্ষে এ-বিষয়ে রাজি হওয়া একেবারেই সম্ভব নয়। "বড় কঠিন সাবজেক্ট এই ঠাকুর অ্যান্ড হিজ টিম, বুঝলে হরিময়, বড় বড় লেখক ওখানে দাঁত ফুটোতে গিয়ে দাঁতে প্রবল ব্যথা নিয়ে সরে এসেছেন।"

এরপর কিছুক্ষণের জন্য ভবনাথবাবু কাঁকুরগাছি যোগোদ্যান ঘুরে এলেন। এই উদ্যানের প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুরের পরম ভক্ত রামলাল দত্ত, সেকালের মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ঠাকুরের মৃত্যুর পরে সংসারী রামলাল দত্ত প্রায় আশ্রম জীবন যাপন করতেন এবং এই উদ্যানেই তিনি নিয়ে আসেন শ্রীরামকৃষ্ণের পূতাস্থি। পূতাস্থি দেওয়া হবে কি না সে নিয়ে রামকৃষ্ণ ভক্তদের মধ্যে মতভেদ হয়েছল, পরে ঠিক হয়ে যায়। এই মঠ কালক্রমে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অঙ্গ হয়ে ওঠে।

ওখান থেকে ফিরে এসে ভবনাথ বললেন, "কাঁকুড়গাছিতে গিয়ে মনটা শান্ত হয়ে গেলো। এখানে পরিবেশ বড় শান্ত বড় স্নিগ্ধ। যোগোদ্যান নামটিও সার্থক।"

ইলিশ মাছ ভাজা খেতে খেতে হরিময়বাবু বললেন, "অনেকের ধারণা, বেলুড় থেকেই রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের শুরু। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যোগোদ্যানের

বয়স বেলুড় থেকে অনেক বেশি। এখানকার পূতাস্থিটা দেখে আসতে হবে একদিন এবং পাঠকদের জানাতে হবে একজন মহাপুরুষের পূতাস্থি দু'জায়গায় কেন রাখা হয়েছে!"



সন্টলেকে রাতের ডিনার সেবে হরিময়বাবু আবার পিকলুর বুলেট বাইকের পিছনে বসেছেন।

প্রচুর খাইয়ে দিয়েছেন পিকলুর দিদিমা, সেই সঙ্গে টিফিন কেরিয়ারে লুচি দিয়েছেন আগামীকালের জন্য। বাসি লুচি উইথ শিবপুর শ্রীদুর্গা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের দরবেশ ইজ অমৃতবৎ।

পিকলু এবার কলকাতায় এসে খাস্তা কচুরিব ভক্ত হয়ে উঠেছে। হরিময়বাবু সারাজীবন ধরে বোঁদে, জিলিপি এবং কচুরি সম্পর্কে রিসার্চ করে যাচ্ছেন। বোঁদের পিছনে নাকি পনেরো হাজার বছরের ধারাবাহিক ইতিহাস রয়েছে।

পিকলু এখন কয়েকটা দিন হরিময়বাবুর সঙ্গেও কাটাবে। "আউটিংকে আউটিং, এডুকেশনকে এডুকেশন ফ্রেন্ডশিপকে ফ্রেন্ডশিপ," মন্তব্য করলেন চমচম সম্পাদক।

হরিময়বাবু কোলের কাছে টিফিন কেরিয়ার ধরে রেখে চলমান মোটরবাইকের পিছন থেকে বললেন, "স্বামী বিবেকানন্দ বাঙালির কচুরি জিলিপি জলখাবারের ওপর বেজায় চটে উঠেছিলেন কেন বুঝতে পারি না। উত্তর কলকাতার নরেন দত্ত তুমি, ময়রার দোকানের জলখাবারের নিন্দে করবে কেন? ওঁর বন্ধু, ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী ব্রহ্মানন্দ কিন্তু কুস্তিলড়ার পর প্রতিদিন আধসের নোনতা এবং মিষ্টি খেতেন। ফলে বাঁচলেনও বেশিদিন, বিবেকানন্দ মারা যাবার পরে প্রথমপর্বে মঠমিশনকে রক্ষে করে ছিলেন এই রাজা মহারাজ ওরফে স্বামী ব্রহ্মানন্দ।"

পিকলু মোটরসাইকেল চালাতে চালাতে বললো, "হরিময়দাদা, ভাগীরথীর ওপর ওই নতুন বিদ্যাসাগর ব্রিজ একখানা যা হয়েছে না!"

"এর নাম হওয়া উচিত ছিল লা-জবাব, অর্থাৎ কিনা যার কোনো জবাব নেই! বিদ্যাসাগরমশাই নিজের চোখে দেখলে খুশি হতেন।"

দ্বিচক্রযানের স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে পিকলু। "অসুবিধে হচ্ছে না তো?" সে জিজ্ঞেস করলো।

হরিময়বাবু যে মোটরবাইকে চড়তে একটু ভয় পান তা কারও অজানা নয়। কিন্তু ক্রমশই তাঁর সাহস বেড়ে যাচ্ছে। এর নামই সঙ্গসুধা!

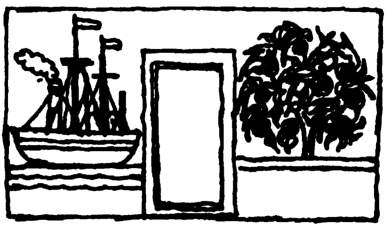
হরিময়ের উত্তর, "অসুবিধে কী? সমস্তটাই তো সুবিধে—ঠাণ্ডা মিষ্টি হওয়া! সমস্ত শরীরে যেন আইসক্রিম স্প্রে করছে, মিস্টার পিকলু।"

ব্রিজের ওপর গাড়ি থামিয়ে পিকলু ও হরিময়বাবু দু'জন কিছুক্ষণ মুখ ঘুরিয়ে কলকাতার অনির্বচনীয় নান্দনিক সৌন্দর্য উপভোগ করলো।

হরিময়বাবু হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "ওয়ার্লডের বেস্ট সিটি মশাই এই কলকাতা! জ্যোৎস্নায় নিউ হাওড়া ব্রিজ থেকে নিউ ক্যালকাটা দেখবার জন্যে হাজার টাকা টিকিট করা উচিত সায়েব ট্যুরিস্টদের জন্যে। তাতেও ডেলি লাখো লোক হবে, আর পূর্ণিমার দিনে তো পুলিশ বসাতে হবে ভিড় সামলাবার জন্যে। বোটার দ্যান তাজমহল আমাদের নিজস্ব এই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।"

"এ বিষয়ে লিখুন না আপনি," পরামর্শ দিল পিকলু।

"এ বিষয়ে ইংরিজিতে লিখতে হবে তোমাকে। বাংলায় লিখলে আজকাল কারও নজরে পড়ে না, কেন জানি না," গভীর দুঃখপ্রকাশ করলেন চমচম সম্পাদক। "আমাদের লেখার দৌড় আসানসোল পর্যন্ত, বুঝলে ব্রাদার।"



পিকলুর বুলেট বাইক যখন শিবপুর মন্দিরতলা পেরিয়ে ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে পৌঁছল তখন রাত অনেক। হাওয়া ব্রিজের শোভায় বিভোর হয়ে রসিয়ে রসিয়ে হাওড়া এবং কলকাতাকে দেখতে গিয়ে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে।

চুপিচুপি গেট ঠেলে পিকলু ও হরিময়বাবু বিশ্বাস কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকে

পড়লেন। কোথাও কোনও পাহারাদার নেই।—উদ্বিগ্ন হরিময়বাবু মন্তব্য করলেন, "নাইট সিকিউরিটির তো দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা উচিত ছিল। অদ্ভুত এই নিউজেনারেশন দারোয়ান পার্টি, এরা দিনেও ঘুমোয়, রাতেও ঘুমোয়। দারোয়ানের ভাইপোটা রান্নাবান্না করে। কিছু বলার উপায় পর্যন্ত নেই—সেই বংশগোপালবাবুর সময় থেকে এদের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা—আজন্ম পারিবারিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছে। প্রথম প্রহরীর নাম ছিল লাট্টু সিং, দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রহরীর নাম টায়ার সিং। তার ভাইপোর নাম রেখেছে ম্যানেজার সিং! এ পাড়ায় কালোয়ারদের সঙ্গে দারোয়ানদের খুব ভাবসাব। পাড়ার প্রহরীদের সমর্থন ও সাহায্য না পেলে এদেশে গুপ্ত ওয়াগন ব্রেকিং শিল্পে টু পাইস উপার্জন হয় না।"

পিকলু জোকার ম্যানেজমেন্ট স্কুলের ছাত্র হিসেবে জানতে চাইলো, "এ অঞ্চলের প্রধান বিজনেস কী?"

হরিময়বাবু সৎ উত্তর দিলেন, "আগে ছিল হাঞ্জানয়্যারং শিল্প এবং ওয়াগন শিল্প—এখন হয়েছে ওয়াগন ব্রেকিং। রেলের ইয়ার্ডে দূরদূরান্ত থেকে আসা যত মালবোঝাই ওয়াগন দাঁড়িয়ে থাকে সেগুলো ভেঙে লুটপাট করলে অনেক পয়সা। সুযোগ পেলে এঁরা বি এন আর লাইনটা উপড়ে কালোয়ারদের কাছে বিক্রি করে দেবেন!"

হরিময়বাবু সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে নামটা পছন্দ করেন না, পুরনো বি এন আরই তাঁর পছন্দ! সস্তায় খুন করবার জন্যেও অনেক পার্টি এখানে নিয়মিত আসেন। হরিময় বললেন, "দাম পড়তে পড়তে বডি ফেলিয়ে দেবার টোটাল ফি এখন মাত্র একশ পঁচাশি টাকা পঁয়তাল্লিশ পয়সায় নেমে গিয়েছে। ভাবছো এরকম অদ্ভুত রেট কেন? আসল চার্জ হল একশ পঁচাশি, বাকিটা হল বিক্রয় কর! শুনছি কিছুদিনের মধ্যে আবার সার্ভিস চার্জও চাপাবে! ট্যাক্সওয়ালাদেরও দোষ নেই, তাদেরও তো সরকারের খরচ তুলতে হবে।"

পিকলুর চোখ এবার ঘুমে জড়িয়ে আসছে। হরিময়বাবু ব্যাপারটা বুঝে তাকে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

বললেন, "আমার তক্তপোশে শুতে পারো—সোফা-কাম-বেডের অনুপ্রেরণায় তৈরি অফিস-কাম-বেড, বিছানা থেকে শুধু চমচমের কাগজগুলো সরিয়ে নিলেই হলো।"

ফিসফিস করে হরিময় বললেন, "বহুবছর আগে একদিন নাকি সিস্টার নিবেদিতা এ-বাড়িতে এসেছিলেন বংশগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। রাত

হয়ে যাওয়ায় এবং হাওড়া ব্রিজ খোলা থাকায় ওঁকে এখানে থেকে যেতে হয়েছিল। সেইরাত্রেই পবিত্র হয়েছিল এই তক্তপোশ।"

ব্রিজ খোলার ব্যাপারটা পিকলু তখনও বুঝতে পারছে না। হরিময়বাব বললেন, "তখন রবীন্দ্রসেতুও হয়নি, বিদ্যাসাগর সেতুও হয়নি—স্রেফ পন্টুন ব্রিজ ওভার দ্য রিভার হুগলী। প্রায়ই ব্রিজ খুলে দেওয়া হতো জাহাজ চলাচলের জন্যে। হাওড়ার লোকদের পুল খুলে দেবার সময় গুণে কাগজে দেখে তবে কলকাতায় আসতে হতো। কেন যে বংশগোপালবাবু এই হাওড়া শহরে এমন সুন্দর বাড়ি করেছিলেন তা তিনিই জানেন!"

পাশের ঘরে স্টিল টিউবের ফোল্ডিং খাট দাঁড় করানো রয়েছে। যুদ্ধের পরে ডিসপোজাল থেকে কিনেছিলেন হরিময়বাবু ফর চমচম—এমার্জেন্সি অতিথি সেবার জন্য এখনও ভাল সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। সেই ভাঁজ করা খাট বিছিয়ে আজ রাত্রে একটু দূরে শোবেন হরিময়বাবু। ওঁর একটু নাক ডাকানোর বদ অভ্যাস আছে। সান্ত্বনা এই, পৃথিবীতে অনেক বড় বড় লোকের নাক রাত্রে সিংহগর্জন করে। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সঙ্ঘসভাপতি রাজা মহারাজের নাক ডাকতো বেজায়। ইদানিং পাকিস্তান বিজয়ী ফিল্ড মার্শাল অচিনলেকের নাক ডাকে। হরিময়বাবু শুনেছেন বিদেশে নাকডাকা মানুষের শব্দদূষণ বন্ধ করতে সায়লেন্সার বেরিয়েছে। বিদেশের ভাইপোকে হরিময়বাবু বলবেন একটা নমুনা পাঠাতে।

কয়েক মিনিটেই পিকলুকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখে খুব খুশি হলেন হরিময়বাবু। কম বয়সের ছেলেমেয়েদের হাজার সুবিধে, ঘুমটা কত সহজে এসে যায়। আর বুড়ো হলে ইঞ্জিনটা ঠাণ্ডাই হতে চায় না, শরীর ও মন দুটোই শান্ত না হলে ঘুম আসবে কী করে?

হরিময়বাবু ভাবছেন, কী করে ভবনাথ সেনের ওপর আর একটু চাপ দেওয়া যায়? একমাত্র ভবনাথই পারেন চমচমকে চাঙ্গা করতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে পরের পর লিখে। অমন চমৎকার নামটা পর্যন্ত ঝট করে এসে গেলো—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত। এই নামে নিশ্চিত সাফল্য। প্রয়োজনে দেওয়ালে চমচমের পোস্টার সাঁটাবেন সারা কলকাতায়—থিয়েটার-সিনেমার স্টাইলে, তাতে যদি কিছু টাকা যায় যাক। চমচমের পলিসিই হলো, বেশি টাকাকড়ির ফাঁদে জড়িয়ে না-পড়া। ঠাকুর আগে বলেছেন, যত মত তত পথ, ভাল করে খুঁজলে হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে যত আয় তত ব্যয়!

কিন্তু ভবনাথবাবুর দ্বিধাটা কোথায়? একটু শ্রীরামকৃষ্ণ গবেষণার? তা

হরিময়বাবু প্রয়োজনে শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছে এখান থেকে রিকশ চড়ে নিয়মিত চলে যাবেন—উনি হচ্ছেন ঠাকুর-স্বামীজি সংবাদের স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া! দুনিয়ায় মঠ মিশন সংক্রান্ত যত পিকুলিয়র খবর ভদ্রলোক ঘুরে ঘুরে, টুকে টুকে এবং পড়ে পড়ে সংগ্রহ করে চলেছেন।

তবে শঙ্করীপ্রসাদ বাবু মহাশয় বেজায় ভক্ত লোক, মহাপুরুষদের সমালোচনা, ভুল ধরা এসব একদম পছন্দ করেন না। প্রত্যেক ভুলের পিছনে যুক্তি খুঁজে বার করবার জন্যে রাতের পর রাত গবেষণা করেন। চমচম থেকে ওঁকে 'ভক্তিরসসাগর' টাইটেল দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। সেই সঙ্গে একখানা গোল্ডেন জিলিপি পুরস্কার। হঠাৎ আরেকজনের কথা স্মরণে এসে গেলো—মিস্টার হুটকো হালদার। এই হিদাবাম হালদারদেরই আত্মীয়। কিছুদিন হলো, বম্বে থেকে কাজে অবসর নিয়ে চলে এসেছেন নিজের জন্মস্থান হাওড়ায় শান্তভাবে বাকি জীবন যাপন করতে।

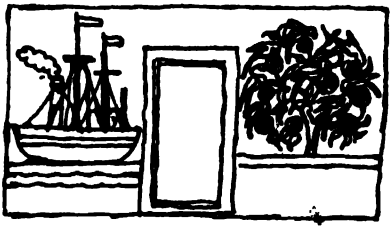
ভদ্রলোক প্রথমে ছিলেন ওলাবিবিতলা লেনে, সম্প্রাত এই মন্দিরতলায় ফ্ল্যাট নিয়ে উঠে এসেছেন। সেদিন চমচমের ব্যাক কপি কিনতে এখানে এসেছিলেন। সেই সময় ঠাকুর-স্বামীজি সম্বন্ধে অনেক মজার মজার কথা বলে গেলেন।

ঠাকুরের মুখে একদম আগল ছিল না, তিনি নাকি বলতেন—হেগো গুরুর পেদো শিষ্য! তার মানে. এই গুরু সিস্টেম সম্বন্ধেই ঠাকুরের মনোভাব একেবারে আলাদা ছিল।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু মহাশয় অবশ্য একপা এগিয়ে আছেন, তিনি ঠাকুর স্বামীজির জীবন সম্পর্কে সম ভুলের মধ্যেও নির্ভুলকে খুঁজে বার করে চলেছেন। ওইটাই ওঁর শক্তি এবং সাধনা।

হুটকো হালদারও দীর্ঘদিন ধরে অনেক খুঁটিনাটি ঠাকুর-সংবাদ সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। তিনি বললেন, "ছোট সংসারের জয়গান গাইছেন হরিময়বাবু। রবি ঠাকুররা পনেরো ভাইবোন, কবি নিজে চতুর্দশ সন্তান। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দও যে দশ ভাইবোনের এক ভাই তা অনেকের মনে থাকে না। বিশ্বনাথ দত্তর চার পুত্র ও ছয় কন্যা। স্বামীজির এক বোন আত্মহত্যা করে স্বামীজীকে খুব কষ্ট দিয়েছিলেন।"

হুটকো হালদারের সক্রিয় সাহায্য পেলে ভবনাথবাবু কি উপন্যাস লিখতে উৎসাহিত হবেন? "হে ঠাকুর দয়া করো।" চোখ বুজে প্রার্থনা করতে লাগলেন হরিময়বাবু।



রাতের অন্ধকারে হরিময়বাবু আপন মনে প্রার্থনা করছেন, ঠিক সেই সময় দরজায় মৃদু টোকা পড়লো। টায়ার সিং গাঁজা-টাঁজা খেয়ে টলমল অবস্থায় অফিসে হাজির হয়েছে।

টায়ার সিং বললো, "উপরের বাবু আপনার খোঁজ করছেন।" খবরটা সে প্রায় সমাধিস্থ অবস্থায় হরিময়কে দিলো।

তার মানে মাঝরাত পেরিয়েছে! এরপর সোজা দোতলায় উঠে এসেছেন হরিময়বাবু। গেরুয়ারঙের হাফহাতা পাঞ্জাবি ও ধুতি পরে চায়ের ট্রে নিয়ে মধ্যরাতের আসর আলো করে বসে আছেন এই সম্পত্তির বর্তমান অধীশ্বর বংশগোলাপ বিশ্বাস। তাঁর মুখ আজ একটু গম্ভীর।

বেশ কাতরভাবেই বংশগোলাপ বললেন, "এবাড়িতে আসার পরে রোগটা জেঁকে বসছে, হরিময়বাবু। মধ্যরাত্রি হলেই আমার ঘুম পালাচ্ছে।"

হরিময় সান্ত্বনা দিলেন, "হতাশ হবেন না বংশগোলাপবাবু। রাতদুপুরে প্রত্যেক মানুষকে ঘুমোতেই হবে এমন কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই। এখানকার কত জুট মিলে এবং গেস্টকিনের কারখানায় নিত্য নাইট শিফট চলছে। দুটো পয়সার জন্যে মানুষ হাসিমুখে রাত জেগে কাজ করছে।"

"জেগে কাজ করা আর শুয়ে জেগে থাকা এক জিনিস নয়, হরিময়বাবু।' কাতরভাবে নিবেদন করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

হরিময়বাবু বললেন, "আরে মশাই, জওহরলাল নেহরু পর্যন্ত বলে গিয়েছেন—ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট—মধ্যরাতে ছাড়া মানুষের জেনুইন স্বাধীনতা কখনও হয় না।"

বংশগোলাপবাবু এবার হরিময়ের সামনে কাপে গরম চা ঢেলে এগিয়ে দিলেন। কাপ দুটো যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে।

বংশগোলাপ বললেন, "আজ পারিবারিক স্টোর রুম থেকে বিলিতি কাপগুলো উদ্ধার করলাম—মনে হচ্ছে পূর্বপুরুষ বংশগোপালবাবু হাফ এ সেঞ্চুরি আগে এই কাপ ব্যবহার করতেন। কাপের বর্ডারে সোনালী জলে লেখা

বি-বি।"

কাপ চিনতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না হরিময়বাবুর। তিনি সবিনয়ে বললেন, "এই অধম বহুবছর আগে এই কাপে এইখানে বসেই বহুবার চা খেয়েছে। যেখানে আপনি বসে আছেন, ঠিক সেখানে পরমশ্রদ্ধেয় বংশগোপাল বিশ্বাস আসর আলো করে বসতেন। এইভাবে চলেছে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত—তারপরেও হাফ এ সেঞ্চুরি কেটে গিয়েছে।"

কথায় কথায় মনে পড়লো, ছেচল্লিশ সালের আগস্ট মাসের ভয়াবহ দাঙ্গার কথা। এইখানে রাত জেগে চা খেতে-খেতে বংশগোপালবাবু একদিন বললেন, "১৫ই এবং ১৬ই আগস্ট ইন্ডিয়ার পক্ষে মস্ত দিন হরিময়। অথচ তিনি যখন একথা বলছেন তখনও দেশের স্বাধীনতার কথাই ওঠেনি। শুধু আমি জানতাম শ্রীঅরবিন্দর পবিত্র জন্মদিন ১৫ই আগস্ট—কিন্তু তখনও তাঁর খ্যাতি অতো ছড়ায়নি—তিনি নিজেও বেঁচে আছেন পণ্ডিচেরিতে।"

বংশগোলাপবাবু সব কথা শুনছেন অধীর আগ্রহে। "আর কিছু?" তিনি এবার হরিময়কে জিজ্ঞেস করলেন।

একটু দ্বিধা করে হরিময় বললেন, "আপনাদের পারিবারিক ট্রাজেডিজটা। আপনার পূজনীয় পিতৃদেব, মানে বংশগোপালবাবুর নাতির ট্রাজেডিটা। ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬ মুসলিম লিগের ডাইরেক্ট অ্যাকশন দিবসে কলকাতা থেকে শিবপুরের বাড়ি ফেরার পথে হাওড়া ময়দানের কাছে বাস থেকে নামিয়ে বংশবিজয় চৌধুরীর অসহায় নিরপরাধ শরীরটা উন্মত্ত দাঙ্গাবাজরা দ্বিখণ্ডিত করলো।"

সেসব অনেক দিনের কথা। পুত্র বংশগোলাপ তখন দুগ্ধপোষ্য শিশু। কিন্তু সেসব কথা নিশ্চয় তিনি যথাসময়ে পিতামহ বংশবিনয়ের কাছে বিস্তারিতভবে প্রবাসের মাটিতে শুনেছেন। সেসব ভয়ঙ্কর কথা এতোদিন পরে আবার শুনবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই বংশগোলাপের। কোন্ ছেলে অকালমৃত পিতার অপঘাত মৃত্যুর বর্ণনায় ফিরে যেতে চায়?

তবে হরিময়বাবুর স্পষ্ট মনে আছে আগস্টের সেই ভয়াবহ দিনটির কথা। দুঃসংবাদ পেয়ে পিতমহ বংশগোপাল বিশ্বাস বেশ কিছুক্ষণ পাথরের মতন বসেছিলেন উত্তর দিকে মুখ করে। কিন্তু তার আগে তিনি দিকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন। পুত্র বংশবিনয়কে কয়েকবার জিজ্ঞেস করলেন, "বেলুড় মঠটা কোন দিকে রে? আমি ঠিক মনে করতে পারছি না।"

পুত্র বংশবিনয় বাবাকে উত্তর দিকটা দেখিয়ে দিলেন। সৎকারের সময়

হরিময়বাবু নিজে শিবপুর শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। স্বয়ং বংশবিনয়বাবুও যথাসময়ে এলেন শিবপুর ঘাটে অপঘাতে মৃত একমাত্র পুত্রের মুখাগ্নি করতে। শোকের সে-দৃশ্য চোখে দেখা যায় না।

তার কিছুদিন পরেই অকালবিধবা যুবতী পুত্রবধূ এবং নাতি বংশগোলাপকে কোলে নিয়ে বংশবিনয় বিশ্বাস বেনারাস চলে গেলেন। পিতৃদেব বংশগোপালকেও সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু শোকার্ত হলেও বংশগোপাল কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন, "আমাকে থাকতে হবে, আমাকে থাকতেই হবে। দয়া করে এখানে থাকতে দাও আমাকে। তোমাকেও একদিন আবার ফিরে আসতে হবে বিনু, না-এসে তোমার যে উপায় নেই বাছা।"

পুত্রের অকালমৃত্যুর দিনে মুরগিহাটায় বংশবিনয়ের কাগজের দোকানও লুটপাট হয়েছিল। বংশবিনয় করুণভাবে পিতৃদেব বংশগোপালকে বলেছিলেন, "আমাদের কী হবে বাবা? আমাদের যে কিছু রইলো না? কী অপরাধ করেছি আমরা ভগবানের কাছে?"

বংশগোপাল দাড়িতে হাত দিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথমে তিনি চোখ বন্ধ করে কাউকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন, তারপর ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। অবশেষে হঠাৎ বললেন, "হবে হবে। বংশগোপাল যা করে তা ভুল করে না। সে যা চেয়েছে তা সে পাবেই। এই বিশ্বাসবংশ একদিন মস্ত বড়লোকের বংশ হবে, বিনু।"

এতো বছর পরে হরিময়বাবুর দিকে তাকিয়ে বংশগোপাল বললেন, "দাদুর মুখে বেনারাসে বসেও আমি একই কথা শুনেছি। অথচ, আমরা তো ধনী নই। আমার পূর্বপুরুষ, বিশেষ করে প্রপিতামহ বংশগোপাল কেন বড়লোক হবার স্বপ্ন দেখতেন? কেন বংশগোপাল একথা বললেন, বিশ্বাসবংশ মস্ত বড়লোকের বংশ হবে? কোথাও একটা গভীর রহস্য থেকে যাচ্ছে।"

মধ্যরাতের আসরে হরিময়বাবু ব্যাপারটা হালকা করবার প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। "রাইটার ভবনাথ সেন এই সেদিন আমাকে বললেন, ধনী অনেক রকমের—তবে এমন ধনে ধনী হওয়া যায় যখন মণিকে মানবার কোনো প্রয়োজন হয় না। অর্থ নয়, সেটা হলো পরমার্থর অনুসন্ধান!"

রাত আরও বাড়ছে। হরিময়বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে বংশগোলাপ বিশ্বাস কাপে আরও চা ঢাললেন আমেরিকান মিলিটারি ফ্লাস্ক থেকে। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, "একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম। বংশগোপাল বিশ্বাস মাঝে-মাঝে দিনলিপি রাখতেন। তারই একটা অংশ আজ উদ্ধার

করেছি—তবে ভেরি ব্যাড লাক। স্টোর রুমের ওইধারে দেওয়ালে কিছুটা উই ধরে আছে—সেই উই দেওয়াল কাঠের আলমারি ফুটো করে বেশ কিছু কাগজপত্র শেষ করে দিয়েছে। ওই আলমারির মধ্যে ছোট একটা অ্যালুমিনিয়াম সুটকেস রয়েছে। সেখানে ঢোকবার চেষ্টা করে উইদের অবশ্য সাফল্য আসেনি।"

"বলেন কি?" হরিময়বাবু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। "আপনি তো মশাই এখানকার রাখালদাস ব্যানার্জি হয়ে উঠবেন—হরাপ্পা মহেঞ্জোদড়োর না হোক আমাদের নিজস্ব হাওড়া সম্বন্ধে ঐতিহাসিক উপাদান পুনরুদ্ধার করে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। আমি আপনাকে বলছি, স্যার মার্টিমার হুইলার যাই লিখুন, আমাদের এই হাওড়া হরপ্পা থেকে কিছু কম যায় না। লোকজন, বাড়িঘরদোরের হাবভাব দেখে মনে হয় হরপ্পা থেকেও পউপুরনো কোনো সভ্যতা এখানে মাটির তলায় ঘুমিয়ে আছে। সাধে কি স্বামী বিবেকানন্দ এই হাওড়াতে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের হেডকোয়ার্টার স্থাপন করলেন। মহাপুরুষ মাহাত্ম্যর সঙ্গে স্থানমাহাত্ম্যকেও তিনি অশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।"

বংশগোলাপ বিশ্বাস সোজাসুজি উত্তর দিলেন, "লজ্জা দেবেন না হরিময়বাবু। রাখালদাস ব্যানার্জি উদ্ধার করেছিলেন হরাপ্পা সভ্যতা অ্যাট মহেঞ্জোদাড়ো, আর নাম হয়েছিল মার্শাল সাহেবের। শুনেছি শেষ পর্যন্ত রাখালদাসের চাকরি নিয়েও টান পড়েছিল তুচ্ছ চুরির অভিযোগে। হাওড়া শহরের বা জেলার ইতিহাস আমি তো সন্ধান করছি না, আমি স্রেফ নিজের বংশের পুরনো বাক্স ঘাঁটছি—বড়জোর বংশগোলাপ নামটা পাল্টে আমাকে বলতে পারবেন বংশপেটিকা।"

হরিময়বাবু ফিক করে হাসলেন। "জেলার ইতিহাস, শহরের ইতিহাস মানে তো ইটকাঠ ইমারতের ইতিহাস নয়, সেখানকার বসবাসকারী কতকগুলো বিশিষ্ট মানুষের ইতিহাস। হয়তো একদিন দেখবেন, ঠাকুরের আশীর্বাদে আপনাদের বংশের ইতিহাসটাই হাওড়ার ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

বংশগোলাপ বলে উঠলেন, "হাওড়া শহর, বিশ্বাস পরিবার এসব নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এটা ভাল কথা, কিন্তু এর মধ্যে আবার ঠাকুরের দয়ার কথা টেনে আনছেন কেন, হরিময়বাবু।'

হরিময়বাবু কথাটা কথার কথা হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু এখন আন্দাজ করছেন, জিনিসটা বংশগোলাপের পছন্দ হয়নি, তিনি একটু অস্বস্তি বোধ করছেন। ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যে হরিময়বাবু বললেন, "চমচম পত্রিকার

'রামকৃষ্ণ সংখ্যার কথা ভাবছি তো, তাই অজান্তেই ঠাকুরের অনন্ত দয়ার কথা মাঝে মাঝে মুখে এসে যায়, বংশগোলাপবাবু।"

অদ্ভুত এক হাসিতে বংশগোলাপের মুখ ভরে উঠলো। "আপনার কী মনে হয়, তিনি শুধু দয়াই করতেন? ওই দয়া পেয়ে কারও কারও কী শোচনীয় অবস্থা হয়েছে তারও একটা হিসেব প্রয়োজন, হরিময়বাবু।"

হঠাৎ বংশগোলাপ বললেন, "ইন এনি কেস এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার মতন শক্তি এবং সময় আমার নেই। আপনি বলবেন, আমার হাতে সময় তো অনেক আছে। আমি আপনাকে সোজা বলছি, সময় যতটুকু আছে তার সবটুকু আমি বিশ্বাসবংশের জন্য নিয়োগ করতে চাই। ভেরি ইন্টারেস্টিং পরিবার এই বংশ বিশ্বাস ফ্যামিলি।

হরিময় বললেন, "এটাও কম কথা নয়, বংশগোলাপবাবু। আজকাল ছেলেমেয়েরা পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কোনো আগ্রহ দেখায় না। অনেকসময় দাদামশায়ের নাম পর্যন্ত বলতে পারে না, অতীত সম্বন্ধে কোনও অনুরাগ, কোনও কৌতূহল নেই। তর্পণের সময় সে সাতপুরুষের নাম লাগে তা খুব ধনী পরিবার এবং সুবর্ণবণিক পরিবার ছাড়া অনেকেই মনে রাখে না।"

বংশগোলাপ বললেন, "আমরা সুবর্ণবণিক নই, কিন্তু সাতপুরুষের নাম করে তাঁদের মুখে সোজাসুজি জল দিতে পারি। শুনুন, আমার দাদু বংশবিনয় প্রতিবছর আমাকে মুখস্থ করিয়েছেন বেনারসে :

(১) বংশবিস্ময় বিশ্বাস

(২) বংশধর বিশ্বাস

(৩) বংশগীত বিশ্বাস

(৪) বংশগোপাল বিশ্বাস

(৫) তাঁর দুই ছেলে—বংশমহিমা এবং বংশবিনয় বিশ্বাস

(৬) বংশবিজয় বিশ্বাস

(৭) তারপর আমি বংশোগোলাপ

এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমার একমাত্র সন্তান বিশ্বাস পরিবারের শিবরাত্রের সলতে (৮) বংশগৌরব বিশ্বাস।"

চোখ বড়বড় হয়ে উঠছে হরিময়বাবুর। বংশ শব্দটিকে যে একটি পরিবারে এইভাবে বিস্তার করা যায় তা তাঁর সামান্য বাংলা জ্ঞানে জানা ছিল না।

হাসলেন বংশগোলাপবাবু—"সে-ব্যবস্থা আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল অনেক আগেই করে গিয়েছেন। সাত নয়, ষাট প্রজন্মের যাতে নামের অভাব

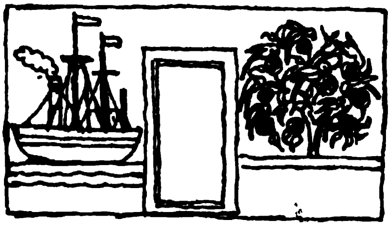
না হয় তার আগাম ব্যবস্থা করে গিয়েছেন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অভিধান ইত্যাদি দেখে। বংশগোপালের ডায়রিটা আপনাকে দেখাবো—ষাটটা সুন্দর সুন্দর নাম সংগ্রহ করে গিয়েছেন যার আদিতে 'বংশ'—যেমন বংশবিকাশ, বংশতনু, বংশবিচক্ষণ, বংশবিত্ত, বংশকিরণ, বংশভানু, বংশধীমান এটসেটেরা, এটসেটেরা। ষাটটা নাম মানে পঁচিশ বছরের গ্যাপে দেড় হাজার বছর পর্যন্ত চলে যাবে এই বিশ্বাস পরিবারের যদি না এই পরিবারে অশুভ কিছু ঘটে যায়।"

কৌতূহলী হরিময়বাবু স্থির করলেন নামগুলো পবের পর খাতায় লিখে রাখবেন। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "মেয়ে হলে কীরকম নাম হবে? বংশলতিকা এবং বংশবিচিত্রা ছাড়া তো আমি তো অন্য কিছু ভাবতে পারছি না।"

"দূর মশাই, সেগুড়ে বালি। বংশগোপালবাবুর এক বড় বোন ছিল, তারপর এবংশে মোটেই জন্মায় না। বংশগোপালের বড় বোন শ্বশুরবাড়িতে মনোকষ্টে আত্মহত্যা করেছিলেন। বংশগোপালবাবু তাঁর দিনলিপিতে লিখেছেন : দুঃখ আমার একার নহে, দুঃখ বিশ্বসংসারের। নরেন্দ্রনাথ আমার শোক সংবাদ পাইয়া লিখিয়াছে, একই আঘাত আমার কপালেও জুটিয়াছে। আমার অতি স্নেহের ভগ্নীও অজ্ঞাত দুঃখে আত্মহত্যা করিয়া তাহার সমস্ত দুঃখযন্ত্রণার অবসান ঘটাইয়াছে। লোকে আমার নিন্দা করিয়াছে, আমার পক্ষে এখন শোক নাকি বিধিবহির্ভূত। কিন্তু বিচিত্র এই মনুষ্যসমাজ!"

নরেন্দ্রনাথ! নরেন নামটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু বংশগোলাপকে জিজ্ঞেস করা গেলো না। কবে এই বংশে কে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে তার স্মৃতি এতোদিন পরেও তাঁকে বিমর্ষ করে তুলছে।

ভদ্রলোক বললেন, "ওপরের কর্তাদের মর্জি বুঝে ওঠা ভার! কারও বংশবিস্তার, আবার কারও বংশলোপ। মশাই, এক এক সময় মনে হয়, যাদের পারিবারিক ইতিহাস নেই তারা আমার মতন অভাগার থেকে অনেক ভাল আছে।"



লজ্জার মাথা খেয়ে হরিময়বাবু অত রাত্রে ভবনাথ সেনকে ফোন করলেন।

"হ্যালো সেদিন আপনি স্বামীজির বোনের আত্মহত্যার কথা বলেছিলেন। কী নাম যেন বললেন?" ভবনাথ উত্তর দিলেন, "শুনুন দশ ভাই-বোনের নাম। প্রথম পুত্র (শৈশবে মৃত), দ্বিতীয় কন্যাও শৈশবে মৃত, তৃতীয় হারামণি (২২ বছর বেঁচেছিলেন), চতুর্থ স্বর্ণময়ী (৭২ বছর বেঁচেছিলেন), পঞ্চম কন্যা (শৈশবে মৃত), ষষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ (৩৯ বছর বেঁচেছিলেন), সপ্তম কিরণবালা (১৯ বছর বেঁচেছিলেন), অষ্টম যোগীন্দ্রবালা (২২ বছর বেঁচেছিলেন), নবম মহেন্দ্রনাথ (৮৭ বছর বেঁচেছিলেন) এবং দশম ভূপেন্দ্রনাথ (৮১ বছর)।"

নামগুলো শুনে নিয়ে, ফোন নামিয়ে রেখে হরিময়বাবু বলে উঠলেন, "জ্যাকপট! বোনের নামটা মিলে যাচ্ছে। তার মানে এই নরেন্দ্রনাথই হচ্ছেন বেলুড়ের স্বামী বিবেকানন্দ। তার মানে বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দর কিছু অপ্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগত চিঠি এই বিশ্বাস পরিবারে এখনও থাকতে পারে।"

"এত রাত্রে কেন মানুষটাকে ফোন করলেন?" একটু অবাক হয়ে গেলেন বংশগোলাপ।

"আর্জেন্ট ম্যাটার। আমার অথর, যাঁকে দিয়ে স্পেশাল একটা ধারাবাহিকের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছি, মিস্টার বিশওয়াস। কিন্তু মুশকিল হল কি, সৃষ্টিধর্মী লেখক, কিছুতেই পুরনো ঘটনার চর্বিতচর্বণ করবেন না। কিন্তু বংশোগোলাপবাবু, যেসব বিখ্যাত লোক বহুযুগ আগে টেঁসে গিয়েছেন তাঁদের সম্বন্ধে নিত্যনতুন ঘটনা আমরা কোথায় খুঁজে পাবো?"

"দয়া করে টেঁসে যাওয়া, পটল তোলা, এসব শব্দ যখন-তখন ব্যবহার করবেন না। বড় মানুষদের 'মহাপ্রয়াণ' হয়, তাঁরা ইহলীলাসংবরণ করেন, অন্তত পক্ষে তাঁরা 'পরলোক' গমন করেন," সাবধান করে দিলেন বংশগোলাপবাবু।

সেই রাত্রে আর কথাবার্তা তেমন হয়নি। বংশগোলাপের হঠাৎ মনে হলো

এবার তাঁর ঘুম আসতে পারে। ঘুমকে ডেকে নিয়ে আসার সহজতম উপায় মুখ বুজে এবং চোখ বুজে শুয়ে থাকা। তবে হিদারাম হালদার লেনের বিশ্বাস পরিবারের ইতিহাস উদ্ধারের জন্যে বংশগোলাপ যে এতোদিন পরে সত্যই উৎসাহী হয়ে উঠেছেন তা হরিময়বাবুর বুঝতে দেরি হলো না।

পরের রাতেও হরিময়বাবুর ঘুমে বাধা পড়লো। ডাক এলো দোতলা থেকে। হাজার হোক এই সম্পত্তির মালিক এবং চমচমের আদি স্থপতিদের অন্যতম এই বংশবিশ্বাস পরিবার। সুতরাং তৎক্ষণাৎ না গিয়ে উপায় নেই।

বংশগোলাপ আজও একটা গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি এবং ধুতি পরে আরাম কেদারায় আধশোয়া হয়ে রয়েছেন।

"গত রাত্রে ঘুম হয়েছিল?" জিজ্ঞেস করলেন হরিময়।

"কোথায় ঘুম? বেনারসে তবু মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোর আসতো, হিদারাম হালদার লেনের এ-বাড়িতে ঢোকা পর্যন্ত যত ঘুম দিনদুপুরে। বলতে পারেন, কোনো এক অভিশাপে রাত্রি আমাকে বেনারসে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন আমার বাবা বংশবিজয় খুন হয়ে যাবার পরে। আমাদের দিন। এটা বংশের ধরা। আমার দাদু বংশবিনয় বিশ্বাস, তিনি তিনি ওরাত্রে ঘুমোতে পারতেন না, বলতেন আমি নিশাচর। অথচ আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল একজায়গায় লিখে গিয়েছেন, একসময় তিনি ছিলেন ভীষণ ঘুমকাতুরে—কোথা দিয়ে রাত কেটে যেতো তা বুঝতেই পারতেন না। তারপর কোনো এক সময় নিশ্চয় কিছু একটা অঘটন ঘটে যায়, যার সম্বন্ধে আমরা তেমন কিছু জানি না। তখন থেকে রাতদুপুরে বংশগোপাল বিশ্বাসের ঘুম ছুটে যেতো। ফলে আকাশ-পাতাল ভাবতে বসতেন তিনি। রাতদুপুরে লোককে হাতের গোড়ায় পাবেন কী করে? ফলে সেই সময় অনেককে তিনি চিঠি লিখতেন, চিরকূট পাঠাতেন অথবা ডায়রিতে নিজের মনোভাব লিপিবদ্ধ রাখতেন।

একটু থামালেন বংশগোলাপ। তারপর বললেন, "তবু বংশগোপাল বিশ্বাস সম্বন্ধে কোনো সমালোচনা আমাদের মুখে মানায় না, হরিময়বাবু। যেখানে যতটুকু বিষয়-আশয় দেখছেন সবই তাঁর সৃষ্টি। তার আগে বংশবিশ্বাসদের কিছুই তেমন ছিল না। বংশগোপাল নিজের চেষ্টায়, নিজের সাধনায় এইসব সম্পত্তি করেছিলেন। আমরা ঠিকমতন দেখাশোনাও করতে পারিনি। আর আমিও দেখুন না, কত যুগ পরে প্রবাস থেকে এখানে ফিরে এলাম। আমি তো জানতামই না, প্রপিতামহের স্মৃতিজড়ানো এতো কাগজপত্র, দলিলদস্তাবেজ এই

শিবপুর মন্দিরতলার বাড়িতে জমা হয়ে আছে।”

বংশগোলাপ ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন দিনরাত পিতৃকুলের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস অনুসন্ধান করে।

আজ তিনি হরিময়বাবুকে বললেন, “পুরনো ব্যাপার যত জানছি তত ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠছে। বংশগোপাল মানুষটিকে চেনা ক্রমশই একটু কষ্টকর হয়ে উঠছে। যতদূর শুনেছি, কলকাতায়ঃছাত্রজীবন অতিবাহিত করে আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল প্রথমে বার্মায় পাড়ি দেন। সেখানে কোনও বিজনেসে দ্রুত বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করে. আবার অজ্ঞাত কোন কারণেই তিনি হঠাৎ হাওড়ায় ফিরে আসেন এবং শিবপুরে সাড়ে-চার বিঘের এই সম্পত্তি কিনে নিজের নকশায় বিশ্বাসদের এই বাড়ি তৈরি করেন। ধনী হবার খুব ইচ্ছে ছিল বংশগোপালের, এটা সহজেই আন্দাজ করা যায়। কারণ প্রায়ই চিঠির শেষে লিখতেন, মা আমাকে বড়লোক করো। বড়লোক না হলে এ পৃথিবীতে কোনো সুখ নেই মা। একবার এক হাবু দত্তর উল্লেখ রয়েছে। ভদ্রলোক কে তা আমি জানি না, তবে নরেন্দ্রর সমসাময়িক হবেন মনে হয়। বাঙালির দারিদ্র সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে নরেন্দ্র বলেছিলেন, হাবু দত্তকে, ‘দাদা, বাঙালির বৈরাগ্য হবে কি? ভোগ করতেই পেলে না! দু'লাখ চারলাখ টাকার ওপর দেখতেই পেলে না, বৈরাগ্য হবে কী করে?’ এই পরিপ্রেক্ষিতে বংশগোপালের দিনলিপিতেও ধনবান হবার প্রার্থনা রয়েছে বেশ কয়েকবার।”

বংশগোলাপ বিশ্বাসের বিশেষ অনুরোধে হরিময়বাবু এবার চোখ বুজে বিশ্বাস বংশের স্মৃতিচারণ করলেন। তিনি বললেন, “সত্যি ইন্টারেস্টিং ক্যারাকটার আপনার প্রপিতামহ এবং চমচমের প্রতিষ্ঠাতা বংশগোপাল বিশ্বাস। আমি তো কম বয়সে তাঁর শেষ বয়েস দেখেছি। সব কথা আমাকে বলতেন না, ওঁর সব কথা আমি বুঝতামও না। বিশেষ করে সুদূর অতীতের কথা। তবে বংশগোপালবাবু প্রতিনিয়ত ধনী হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতেন। বংশগোপাল বলতেন, ‘ধনবান বংশের কথাই আলাদা, হরিময়। এই যে ইস্পাহানি, রাজেন মুখুজ্যে, বিড়লা এবং জালানের এতো সামাজিক প্রতিপত্তি, তার কারণ বংশপরম্পরায় এঁদের হাতে প্রচুর অর্থ এসেছে এবং সেই সম্পদ সঞ্চিত হয়েছে। গেরস্থ বাঙালির মুশকিল হলো স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কিছুটা বেঁকে বসলেন,. অর্থকেই অনর্থের কারণ বলে তিনি চিহ্নিত করে। ভোগের পথ সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি মনুষ্য জাতটাকে ত্যাগের পথে সরে যেতে বললেন।”

হরিময়বাবু সংযোজন : "যখন বংশগোপাল এইসব কথা আমাকে বলতেন, তখন তাঁর হাতের গোড়ায় থাকতো সবুজ মলাটের একখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত।" হরিময়বাবু তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে একখণ্ড কথামৃত সেই বয়েসে পড়েছিলেন। বইটা তখন তেমন টানেনি, ভালও লাগেনি। তবে তিনি বুঝেছিলেন, ঠাকুরের বক্তব্য, সাধনার পথে মস্ত বাধা হলো অর্থ"।

বংশগোপাল বেশি তর্কে যেতেন না। একবার হরিময়বাবুকে বললেন, "সংসারী লোকদের পয়সাকে অসম্মান করতে বলেছেন ঠাকুর একথা আমি বিশ্বাস করি না। মাস্টারমশায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর লেখা আমাকে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। আপনি বলছেন, মাস্টার মশাই ভক্তির স্রোতে ভেসে গিয়ে বানিয়ে লিখে থাকতে পারেন?"

বংশগোপালবাবু সেবার কিন্তু রহস্যময়ভাবে হেসেছিলেন। "অনেক লোক আছে মিথ্যাচার যাদের শরীরে নেই, স্বভাবে নেই। মাস্টারমশাই সেইরকম লোক।"

পাবলিশিং লাইনে তিনিও গিয়েছেন এবং পরম ভক্ত বসুমতীর উপেন মুখোপাধ্যায়ও গিয়েছেন। কিন্তু মাস্টারমশায় প্রকাশনা থেকে অর্থ চাননি। যা উপার্জন করেছেন সব বিলিয়ে দিয়েছেন। আর ভোগসুখের লোভে উপেন মুখার্জি তো চেয়েছিলেন তিনি ধনপতি হবেন।"

রাত দুপুরে বিশ্বাসভবনের দোতলার বারান্দায় বসে বিশ্বাস পরিবারের চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হরিময়বাবু একসময় বংশগোলাপকে মনে করিয়ে দিলেন, "আপনার প্রপিতামহর সঙ্গে কথা বলার সময় আমার বিদ্যে এবং অভিজ্ঞতা অত্যন্ত লিমিটেড ছিল। শঙ্করীপ্রসাদ বোসকেও তখন চিনতাম না। চিনলেও কী হতো? তখন তো তিনি বালক মাত্র। এখন ভবনাথ সেন, শঙ্করীবাবু, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এটসেটরার পাল্লায় পড়ে এবং হুটকো হালদার মশায়ের গালগল্প শুনে শুনে বাড়তি অনেক কিছু কথা জেনেছি। মাস্টারমশায় যখন ঠাকুরের কথা শুনেছেন তখনই সেসব বক্তব্য নোট করেননি। বাড়ি ফিরে এসে সাঙ্কেতিক ভাষায় ডায়েরিতে পয়েন্ট নোট করেছেন। যখন নোট করেছেন তখনও বিস্তারিত বিবরণ লেখেননি। নোট দেখে চোখ বুজে সব 'রিক্রিয়েট' বা পুনর্গঠন করে ভক্তের পাতে গরম গরম পরিবেশন করতে প্রায় হাফ-এ সেঞ্চুরি লেগে গিয়েছে। ঠাকুর দেহত্যাগ করলেন ১৮৮৬ সালে, আর কথামৃতর সমাপ্তি পর্ব প্রকাশিত হলো ১৯৩২ সালে।"

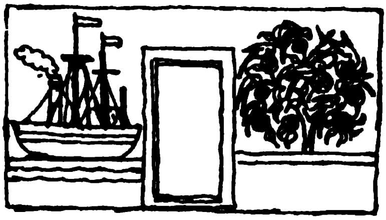
বংশগোলাপবাবু উদাসভাবে বললেন, "ওইসব ভক্তির হাঙ্গামায় বিশ্বাস

বংশকে আমি জড়াতে চাই না, হরিময়বাবু। কেউ ইচ্ছা করলেই তার অভিশাপ একটা বংশের ওপর নেমে আসতে পারে এসব বিশ্বাস করতে কষ্ট লাগে। আমি একই সঙ্গে কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস, কাকাবাবু এবং রামকৃষ্ণ সাহিত্য পড়তে চেষ্টা করছি। কাকাবাবুকে জানেন তো? স্বয়ং মুজফ্‌ফর আহমেদ। তবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ চান্স পেলেই বৈপ্লবিক কথাবার্তা বলে আমার মাথাটা মাঝে মাঝে ঘুরিয়ে দেন। মৃদু হেসে বংশগোলাপ বললেন, "সর্বহারাদের নেতা তো মশাই ওই সন্ন্যাসী নরেন দত্ত' প্রপিতামহ ওঁর কোনো লেখা থেকে একটা উদ্ধৃতি ডায়েরিতে রেখে গিয়েছেন। পৃথিবীর সমস্ত উত্তেজনার অদ্ভুত ডায়গনেসিস মশাই! বংশগোপাল লিখেছেন, 'নরেন সন্ন্যাসী হয়েও সর্বহারার নায়ক। তার মতে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দুটি মহাশক্তি নিরন্তর কাজ করছে। বৈচিত্র্য ও অধিকার তারতম্য মৃত্যুর ছায়ার মতন অধিকার তারতম্য মানবসমাজে উপস্থিত হয়েছে। এই পৃথিবীতে কেউ সমাজ-শাসনে পারদর্শী, কেউ বা পথের ধূলি পরিষ্করণে অভিজ্ঞ। কিন্তু তাই বলে সমাজ-শাসনে পারদর্শী মানুষেরই যে জগতের যাবতীয় সুখভোগে অধিকার থাকবে এবং পথের ধূলি-পরিষ্কারক অনাহারে মরবে, এইটাই সামাজিক অকল্যাণের মূল কারণ।

বংশগোলাপের দাদু বংশবিনয় বলতেন, বংশগোপাল নাকি গোপনে তাঁকে বেলুড়ে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ফলে এত কাছে বসবাস করেও বেলুড় মঠে যাননি তিনি কোনওদিন। "তারপর একমাত্র সন্তানের অকালমৃত্যুর পরে বংশবিনয় বিশ্বাস পৈত্রিক ভিটে ত্যাগ করে আমাকে কোলে নিয়ে হাজির হলেন বেনারসে।"

মধ্যরাতে ঘড়ির কাঁটাও বোধহয় একটু ঝিমিয়ে পড়ে। কারণ হরিময়বাবু দেখলেন এতো কথার পরেও এখন মাত্র রাত দেড়টা। বংশগোলাপ আরও আড়াইঘণ্টা জেগে বসে থাকবেন।

সায়েবরা এই দুপুররাতকে কী করে মর্নিং বলেন তা তাঁরাই জানেন! ওঁদের 'হস্যিদীর্ঘ্যি' জ্ঞান আছে বলে মনে হয় না।



আর এক মধ্যরাতে বংশগোলাপ বোমা ফাটালেন।

"দাদুর বাবার একটা দীর্ঘ লেখা গত রাতে উদ্ধার হয়েছে হরিময়বাবু। বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি।"

হরিময়ের অনুরোধে এবার আস্তে আস্তে বংশগোপালের দিনলিপির অংশবিশেষ পড়তে লাগলেন তাঁর প্রপৌত্র :

"রাত্রে আমার ঘুম আসে না। কেন আসবে? সেই রবিবারে যে অন্যায় করেছিল তার কোনও ক্ষমা নেই।

সেদিন মধ্যরাতের সমস্ত ঘুম আমি শ্রাবণের সেই রাতেই চিরতরে ব্যয় করে ফেলেছি নিজের নির্বুদ্ধিতায় এবং নিজের অসাবধানতায়। সেদিন সকাল থেকেই ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল আমার—রোগাক্রান্ত শরীরে তিনি তো কয়েকবার আসন্ন বিদায়ের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়েছেন।

গতরাতেও অন্য সবার সঙ্গে আমিও ওখানে রাত্রিযাপন করেছি। আমি অবশ্য সাধারণ একজন দর্শক মাত্র, আমি তো তাঁর লীলাপার্ষদ হবার যোগ্যতা অর্জন করিনি, হতেও চাইনি। আমি তো বলেছি, আমি উপীন মুখার্জির মতনই স্রেফ ধনী হতে চাই। আমাকে কিছু অর্থ দাও, প্রাচুর্য এলেই আমি নিজেই অন্য সব সমস্যার সমাধান করে নেবো। সকলকেই নরেনের মতো সংসারে খেয়ালি এবং বোকা হতে হবে কেন? নরেনও তো তাঁর কাছ থেকে চাইবার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল, কিন্তু সে অর্থ চাইতে পারলো না।

উপীন ও আমি। আমাদের লক্ষ্য পরিষ্কার। সেদিন রবিবার। সাতসকালে তিনি প্রিয় যোগীনকে পাঁজি পড়তে বললেন। এই সেই যোগীন রায়চৌধুরী যে তাঁকে প্রথম দর্শনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির মালি মনে করেছিল। এই সেই যোগীন যে বিয়ে করে ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে এলে তিনি অভয় দিয়েছিলেন, 'এখানকার কৃপা থাকিলে লাখটা বিবাহ করিলেও কোনও ক্ষতি হইবে না।' এই সেই যোগীন যাকে তিনি বকুনি দিয়েছিলেন, 'ভক্ত হবি, তাবলে বোকা হবি?'

এই সেই যোগীন যাকে তিনি বললেন, 'সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।' মন দিয়ে পাঁজি দেখা হলো। যথাসময়ে বাগবাজারের রাখাল মুখুজ্যে মশাই এসে সাহেবী কায়দায় তাঁকে মুরগির জুস খাবার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। তিনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। একটু ভেবে বললেন, "খেতে আপত্তি নেই, তবে লোকাচার।"

মুরগির জুস খেলেন না তিনি, কাল দেখা যাবে বলে তখনকার মতন অবস্থা সামাল দিলেন।

সেদিন সকালে আরও অশুভ ইঙ্গিত ছিল। কিন্তু কর্তাব্যক্তিরা সেসব বুঝতে চাইলেন না। মা যে খিচুড়ি তৈরি করছিলেন তা উনুনে ধরে গেলো। সেই সঙ্গে নিশ্চিত অশুভ ইঙ্গিত—একটা মাটির কুঁজো হাত থেকে পড়ে ভেঙে গেলো। আমার পিতৃদেব বংশগীত বিশ্বাসের ইহলোক ত্যাগের সময় শ্যামপুকুর বাড়িতে একটা বড় ছবি দেওয়াল থেকে ছিঁড়ে মাটিতে ভেঙে পড়েছিল। আজ একটা কালো বেড়ালও অনেকক্ষণ ধরে এখানকার উদ্যানবাটিতে বেশ বিরক্ত করছে।

ইতিহাসের সেই রবিবারে আমাদের চোখের সামনে কত কি ঘটলো। মূর্খ আমি, তবু আমার জ্ঞানচক্ষু খুললো না। গলার ক্ষতস্থান থেকে রক্তপাতে কাতর হয়ে একবার তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। অনেক ছোটাছুটির শেষে ডাক্তার এলেন।

যন্ত্রণায় কাতর তিনি ডাক্তারকে বললেন, "বড় কষ্ট হচ্ছে, শরীর জ্বলছে।"

"রোগ সারবে?" তাঁর সোজাসুজি প্রশ্নে উত্তরে ডাক্তার অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে বসে আছেন দেখে তিনি এক প্রিয় ভক্তকে বললেন, "বলে কি গো? এতদিন পরে বলে কিনা সারবে না।"

আমি সামান্য একজন কৌতূহলী দর্শক, এখানে আমাকে তেমন কেউ চেনে না, আমাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রয়োজনে একটু আধটু ফাইফরমাস খাটি। মনে আছে, তিনি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "মরি তাতে ভয় নাই, কিসে প্রাণবায়ু বার হয় বলতে পারো?"

রবিবার সন্ধ্যার আগে তাঁর একটু খিদে হলো। আমার খুব ভাল লাগলো। ওঁকে আমি ভীষণ ভালবাসতে শুরু করেছি। সেই সময় নিকট ভক্তরা তাঁকে সুজির পায়েস দিল। চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি খেতে পারলেন না। তারপর সেই অবিস্মরণীয় কথা : "দেখ, আমার হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল-ভাত খেতে ইচ্ছে। কিন্তু মহামায়া কিছুই খেতে দিচ্ছেন না।"

রাত্রি সাড়ে-আটটা নাগাদ মূর্খের মতন আমার মনে হলো, তিনি এবার নিশ্চয়

শান্ত হয়ে বিশ্রাম করবেন। রোগের প্রকোপ একটু কমের দিকে, আমার কমবয়সী চোখে ততক্ষণে দুনিয়ার ঘুম মেঘের মতন জড়ো হয়েছে।

সেরাত্রে উদ্যানবাটির নীচের তলায় চেনা-অচেনা বহু মানুষের আনাগোনা। তাঁদের অনেকেই আমাকে চেনেন না। যাঁরা মুখ চেনেন তাঁদের ধারণা, হাতের গোড়ায় একটা কমবয়সী ছোকরা থাকলে হাতদুপুরে এখানে ওখানে ছোটাছুটির সুবিধে হবে।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আমারও পেটে কিছু পড়েনি। টুক করে একবার বাইরে গিয়ে খাবারের দোকান থেকে কচুরি খেয়ে এলাম। কচুরিতে যে প্রচণ্ড ক্ষুধানিবৃত্তি হয় তা এই বংশগোপাল ভাবভাবেই জানে। তারপরই সারা শরীর জুড়ে ঘুম এলো, গভীর ঘুম। ঘুম আমার কোনও কথা শুনলো না।

একতলায় ঘরের এক কোণে আমি অঘোরে ঘুমোচ্ছি, আর ওদিকে দোতলায় মহালীলা শুরু হয়েছে। পিঠে বালিসের ঠেসান দিয়ে তাঁকে বসানো হয়েছে। কেউ তালপাখা দিয়ে হাওয়া করছে। কেউ পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কেউ তুলো ভিজিয়ে মুখে জল দিচ্ছে। তখনও তাঁর প্রচণ্ড ক্ষুধা। অন্নের সামান্য মণ্ড খেয়েছেন তিনি সহজে। খেয়ে বলেছেন, "আঃ শান্তি হলো! এখন আমার কোনও রোগ নাই।"

শেষ পর্বে তিনি তাঁর প্রিয়তম শিষ্যকে ডেকে বললেন, "এসব ছেলেদের তুই দেখিস।"

তারপর সেই পুরনো 'ওঁ' উচ্চারণ করতে করতে মহাসমাধি হলো। আর এক প্রিয় শিষ্য ঘড়ির দিকে নজর রাখেন—তিনি দেখেছেন, সময় রাত্রি ১টা ২ মিনিট।

আমি কিন্তু তখনও একতলার একটা ঘরে গভীর ঘুমে অচেতন। মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরে মহাসমাধির সময় সম্বন্ধে লিখেছেন, "তখন সময় ১টা ৬মিনিট।" কিন্তু তিনি তো সেসময় ওখানে উপস্থিত ছিলেন না, যতদূর মনে পড়ে খবর পেয়ে তিনি পরে কাশীপুরে এসেছেন।

আমার ঘুম অবশেষে ভেঙেছিল। অন্য অনেকের সঙ্গে আমিও চোখের জল ফেলতে ফেলতে উপরে গিয়ে তাঁকে দেখে এসেছি অনন্ত শয্যায়। তারপর ছোটাছুটি শুরু করেছি। খবর পেয়ে তখন অনেকেই বাইরে থেকে আসছেন সেই চন্দ্রালোকিত রাতে। উদ্যানবাটির কাছাকাছি কোথাও বোধ হয় কাঙালি বিদায় হচ্ছিল—কারণ অতরাতেও রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না।

আমি তারপর আফসোস করেছি কতদিন। এত কাছে থেকেও, শেষ সময়টা দুটি নয়ন জুড়ে তাঁকে দেখার ভাগ্য হলো না—কী ঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী!

কেন এমন হলো? কেন বিদায়ক্ষণে তিনি আমাকে দৃষ্টির আড়ালে ঠেলে দিলেন। আমি তো চিরকালই লেট—দেরিটা বোধহয় আমার গ্রহের ফের। সাধে নরেন্দ্র রসিকতা করতো—আমাকে লেট ললিত বলে। আমার ডাক নাম ললিত—লেট লতিফের ছোটভাই হওয়াটা আমার পক্ষে বেশ সহজ!

কিন্তু সেই অবিস্মরণীয় রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার মূল্য কি আমাকে সারা জীবন ধরে দিয়ে যেতে হবে?

শ্রাবণের শেষ দিনে সেই রবিবারের মাঝরাতে সেই যে আমার ঘুমের প্রথম পর্ব শেষ করে, মধ্যরাতে জেগে থাকি, কেবল জেগে থাকি। অথচ আমি কোনো লীলায় বিশ্বাস করি না।

আমি সংসারী মানুষ। সংসারের ছোটখাট সুখদুঃখ থেকে নিজেকে আমি অযথা দূরে রাখতে চাই না। আমি তো বারবার বলেছি, উপেন মুখুজ্যের মতন আমিও ধনী হতে চাই। আমি চাই আমার বংশধররা দুধে ভাতে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুক। তাদের যেন কখনও অর্থের অভাব না হয়।

অর্থ মোটেই খারাপ জিনিস নয়। অর্থকে অযথা ভয় করলে এই সংসার তছনছ হয়ে যাবে। তোমরা দেখো, অর্থ ছাড়া এই পৃথিবীর কোনো মূল্য নেই। সাধে কি আর মহাপুরুষরা অর্থকে পেট্রল অফ লাইফ বলেছেন। পেট্রল ছাড়া গাড়ি চলে না এ সংসারে। এর মধ্যে তো কোনো গ্লানি, কোনো লজ্জা থাকার কথা নয়।"

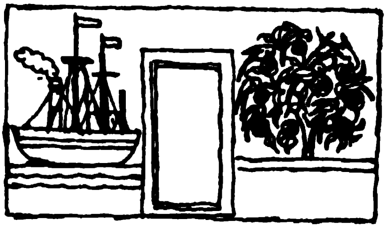
বংশগোপালের নিজের হাতে লেখা দিনলিপি কোনো ডায়েরিতে সংরক্ষিত নয়। একটা প্যাডে রুলটানা কাগজে খেয়ালখুশিমতো। তিনি নিজের ভাবনা চিন্তা চাইনিজ ব্ল্যাক ইংকে লিপিবদ্ধ করেছেন বহুবছর আগে।

কালের খেয়ালে কালো আর কালো থাকে না, ঈষৎ ধূসর হয়ে যায়। কাগজটাও শুভ্রতা বিসর্জন দিয়া হলুদের দিকে এগোতে থাকে।

হরিময়বাবু এবার নিজে দিনলিপি পরীক্ষা করে দেখলেন। বংশগোপাল বিশ্বাস বহুবছর আগে হরিময়ের সঙ্গে বহু বিষয়ে কথা বললেও এই সব প্রসঙ্গ একেবারেই উত্থাপন করেননি।

এখন রাত চারটে। হরিময়বাবু লক্ষ্য করলেন ভারি কুয়াশার মতন ঘুম নেমে আসছে বংশগোপালের নিদ্রাহীন প্রপৌত্র বংশগোলাপ বিশ্বাসের চোখে।

কথা বলতে বলতেই বংশগোলাপ নিজের চেয়ারে ঘুমিয়ে পড়লেন। আহা, মানুষটা ঘুমোতে চায় অথচ ঘুমোতে পারে না। বেচারা ঘুমোক।



হিদারাম হালদার লেনে ভোরবেলা। বিশ্বাস বাড়ির আঙিনায় এখনও পাখি গান গায় ভোরবেলায়। পিকলু বিছানা থেকে ওঠামাত্র চমচম কার্যালয়ের টেলিফোন বেজে উঠলো।

সল্ট লেক থেকে ঠাকুমা বিলাসিনী দেবী স্বয়ং খোঁজ নিচ্ছেন রাতে নাতি পিকলুর ঘুম হয়েছিল কি না।

দাদু ভবনাথ সেই ভোরবেলা থেকেই সল্ট লেকের বাড়িতে লেখায় ডুবে আছেন। ঠাকুরমার দুঃখ, লেখার টেবিলে বসলে তিনি কাউকে চিনতে পারেন না। ভাবের ঘোরে থাকেন। লেখকরা সমাধিস্থ হন না, কিন্তু কলম ধরলেই তাঁদের কিছু একটা হয়, বাইরের দিকে না তাকিয়ে চোখ দুটো ভিতরের দিকে চলে যায়।

পিকলু দেখলো, হরিময়বাবু চায়ের মগ হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা কাগজ পড়ছেন।

রহস্যময় কাগজ। যিনি দিনলিপি লিখেছেন এবং যাঁর মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে সেখানে এতো কথা লেখা হয়েছে কারও নামোল্লেখ নেই কোথাও।

হরিময়বাবু দিনলিপিটা পিকলুর দিকে এগিয়ে দিলেন। একবার নয় দুবার পিকলুও মন দিয়ে কাগজটা পড়লো।

পিকলুর মন্তব্য : "তাহলে, আপনার বংশগোপাল বিশ্বাস কেন গভীর রাতে ঘুমোতে পারতেন না তো এদোদিনে বুঝতে পারা গেল। মনের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ ছিল, এমন সময়ে তিনি ঘুমিয়েছেন যখন ঘুমনো উচিত ছিল না। মহাত্মা গান্ধির আত্মজীবনীতেও এরকম একটা দৃশ্য আছে। দাদু বলেছিলেন মহাত্মার বাবা তখন মারা যাচ্ছেন। আর মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি আত্মসুখে নিমগ্ন হয়ে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন।"

কিন্তু মাথাটা ঘুলিয়ে যাচ্ছে হরিময়বাবুর। দিনলিপিতে বারবার যাঁর উল্লেখ রয়েছে এই "তিনি" লোকটি কে?

পিকলু বোধ হয় কোনো ইঙ্গিত পাচ্ছে। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "একটা পাঁজি আছে?"

অবশ্যই আছে, পি এম বাকচি এবং গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা দুটোই চমচমের সম্পাদকীয় টেবিলে সারাক্ষণ সাজানো থাকে।

পাঁজি দেখে পিকলু বললো, "বংশগোপাল যে ঘটনার উল্লেখ করছেন সেটা ঘটেছিল ১৫ কিংবা ১৬ আগস্ট। এবারের পাঁজিতে ৩১শে শ্রাবণ হচ্ছে ১৬ আগস্ট।"

হরিময়বাবু ধৈর্য ধরতে পারছেন না। ভবনাথ সেনের ওপর তাঁর বিশেষ ভরসা। ফোনে তাঁকেই জিজ্ঞেস করলেন, "ছেচল্লিশ সালের ডাইরেক্ট দাঙ্গা ছাড়া ১৬ই আগস্টে স্মরণীয় আর কী কী হয়েছে স্যার?"

ভবনাথবাবু ওদিক থেকে টেলিফোনেই উত্তর দিলেন, "১৫ই আগস্ট শ্রীঅরবিন্দ জন্মেছিলেন। আর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপারটা। দাঁড়াও একটু ভেবে দেখি। যতদূর মনে পড়ছে, ৩১শে শ্রাবণ রবিবার তিনি কাশীপুর উদ্যানবাটিতে মর্তলীলা সাঙ্গ করেছিলেন। অন্ত্যলীলার শেষ পর্ব।"

"ইউরেকা! ইউরেকা!"

টেলিফোনেই হরিময়ের আনন্দোচ্ছ্বাস শুনতে পাচ্ছেন ভবনাথ। জিজ্ঞেস করলেন, "কী হলো তোমার হরিময়?"

"ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ইতিমধ্যেই চমচমকে নিয়ে তাঁর লীলাখেলা শুরু করে দিয়েছেন! এবার অপ্রকাশিত এমন সব দলিল একে একে আপনার হাতে তুলে দেবো যে আপনি চমচম পত্রিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ রহস্যামৃত না-লিখে থাকতে পারবেন না।"

হরিময় জানালেন, "এবার পেয়েছি প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাবসান! অপ্রকাশিত, অবিশ্বাস্য, অভূতপূর্ব, অভাবনীয় সমকালীন দলিল চমচমের হাতে চলে আসছে।"

"হরিময় তুমি কী বলছো! কোথাও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শেষদিন এবং শেষরাত্র সম্বন্ধে নতুন কোনো বিবরণী পাওয়া গিয়েছে জানলে সাংবাদিকরা এখনই হৈ হৈ ফেলে দেবে। বিপুল চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যাবে আসমুদ্র হিমাচলের ভক্ত মহলে। কিন্তু খুব সাবধান, হরিময়। এসব দলিল অনেক সময় জাল হয়, দলিলগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে খুব সাবধান থেকো তুমি। সব কিছু যাচাই করে

তবে গ্রহণ কোরো।"

হরিময়বাবু লোভ সামলাতে পারলেন না। বললেন, "স্যার আপনার আগামী বইতে একটা অবিস্মরণীয় এবং অত্যাশ্চর্য ক্যারাকটারের নাম হতে চলেছে লেট ললিত। এই চরিত্রটি জীবনে যা কিছু করে তা সব দেরিতে। আপনি কি মনে করেন, কোনও জালিয়াতের মাথায় এমন সৃষ্টির ইঙ্গিত আসবে? শুনে রাখুন স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ এই লেটললিত নামটা দিয়েছেন।"

ভবনাথ সেন উত্তর দিলেন, "মনে রেখো হরিময়, আমি এই ঠাকুর-স্বামীজির ব্যাপারে তেমন কিছু জানি না। এঁদের সম্বন্ধে অসংখ্য খবরাখবর বিভিন্ন জায়গায় নানাভাবে ছড়িয়ে আছে। কিছু কিছু খবরর পাত্তা পাওয়া গিয়েছে, কিছু অনেককিছু এখনও সাধারণের অজানা রয়ে গিয়েছে।"

ভবনাথকে ভরসা দেবার জন্যে হরিময় বললেন, "রম্যাঁ রোলাঁ কতটুকু জানতেন, স্যার? কী করে তিনি অতবড় বই লিখে ফেললেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে?"

ভবনাথবাবু বুঝিয়ে বললেন, "রোলাঁর কথা আলাদা। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত ফরাসী লেখকের প্রথম আগ্রহ হলো ইন্ডিয়ান রাইটার ধনগোপাল মুখার্জির ইংরিজি বই পড়ে। জানো তা ধনগোপালের কথা? বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখার্জির পরিবারের লোক, এদেশ থেকে পালিয়ে হাজির হলেন আমেরিকায়, সেখানে প্রতিষ্ঠা পেলেন লেখক হিসেবে, তারপর অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করলেন। এঁরা স্ত্রী ছিলেন আমেরিকান। রোলাঁ আবার একসময় মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের সঙ্গেও বন্ধুত্ব করেছিলেন।"

"তিনি আবার কে?" হরিময়বাবু বিদেশিনী সম্বন্ধে তেমন খোঁজখবর রাখেন না।

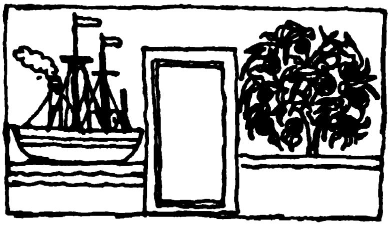
ভবনাথ টেলিফোনে বললেন, "রামকৃষ্ণ মিশনের ট্যানটিন! ওঁর সম্পর্কে সম্প্রতি দুর্দান্ত ইংরিজি বই বেরিয়েছে, লিখেছেন অ্যামেরিকান সন্ন্যাসিনী—প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা। জিজ্ঞেস করো পিকলুকে, বইটার বিদুঘুটে নামটা দেখে সেদিন বইটা উল্টোচ্ছিল।"

উৎসাহী হরিময়বাবু টেলিফোনে বললেন, "বুঝেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যা ছিলেন এই ম্যাকলিওড।"

পিকলু বললো, "না হরিময়দাদা, মিস ম্যাকলাউড কোনোদিন ঠাকুরকে দেখেননি। দেখেছিলেন বিদেশে স্বামী বিবেকানন্দকে। কিন্তু নিজেকে বিবেকানন্দর শিষ্যা বলতে কিছুতেই রাজি ছিলেন না, বলতেন আমি

বিবেকানন্দের বান্ধবী। আর একটা কথা, নামের বানানটা ম্যাকলিয়ড হলেও উচ্চারণটা ম্যাকলাউড। এঁরই ডাকনাম ট্যানটিন। এই মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে পরিচয় ছিল রমাঁ রোলাঁর। তিনিই লেখককে উৎসাহ দিলেন একজন অজানা ভারতবাসী সম্বন্ধে জগদ্বিখ্যাত বই লিখতে।"

হরিময়বাবু এবার পিকলুকে বললেন, "রাখো ভাই বিবেকানন্দজীর কথা। ওসব কথা চমচমে ছাপিয়ে বিপদে পড়ে যাই আর কি! আমার ধারণা ঈশ্বরপ্রেরিত মহাপুরুষদের কখনও বান্ধবী হয় না, বড় জোর ভক্ত হয়!"



বংশগোপাল বিশ্বাসের প্রাচীন দিনিলিপির একটা জেরক্স কপি করিয়ে নিয়ে মূল দলিলটা বিশ্বাসভবনের ওপরে বংশগোলাপকে ফেরত দিতে গেলেন রহিময়। বাড়ির মালিক তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন—বেচারা! দৈনিক সংবাদপত্র আপিসে এমন লোকের খুব কদর হতো। যারা সারা জন্ম রাতে জেগে, দিনের আলোয় ঘুমোতে অরাজি নয় তাদের কাছে পেলে কাগজের মালিক আর কিছু চাইবেন না।

পিকলু এবার বললো, "একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সো-কলড বংশগোপাল বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের বেশ ভাল যোগাযোগ ছিল।"

উৎসাহিত হয়ে হরিময়বাবু কপালে হাত ঠেকালেন। "বংশগোপাল বিশ্বাসই হলেন চমচম পত্রিকার প্রকৃত মালিক। স্বয়ং প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে যখন ঠাকুরের যোগাযোগ ছিল তখন চমচম অবশ্যই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদধন্য।"

কিন্তু প্রশ্ন হলো, জীবিতকালে বংশগোপাল কেন হরিময়ের কাছে রামকৃষ্ণের উল্লেখ করলেন না? এই নীরবতা কি রহস্যময়? কোথাও কি কিছু ঘটেছিল? ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও কি বংশগোপালের সঙ্গে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান ও রামকৃষ্ণ সঙেঘর কোনো যোগাযোগ ছিল? না এমন কিছু ঘটেছিল যা এখনও আমরা জানি না?"

পিকলু সোজাসুজি সন্দেহ করলো, "বংশগোপাল কোনো কারণে কি

ঠাকুরের নিজস্ব মহল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন?"

হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, "মতভেদ হলে কোনও সন্ন্যাসী এই সঙ্ঘ থেকে দূরে সরে যান, কিন্তু তাঁরা তো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি কমান না। বরং তাঁরাও নিজেদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ঠাকুরের প্রচারে নেমে যান। আমি তো দেখেছি এমন কিছু সন্ন্যাসী, যাঁরা দূরে সরে গিয়েছেন স্বেচ্ছায়। সব সময় তাঁদের বিতাড়িতও বলা যায় না। বিশ্বজোড়া বিশাল সঙ্ঘ চালাতে গেলে ঐসব এক-আধটা দুঃখজনক ঘটনা তো ঘটবেই। কিন্তু যাঁরা দূরে চলে গেলেন তাঁদেরও একমাত্র ভরসা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস।"

পিকলু কয়েকদিন ধরে বংশগোপাল বিশ্বাস পরিবারের রহস্য নিয়ে বিশেষভাবে মাথা ঘামাচ্ছে।

প্রয়োজন বোধ করায় সে হুটকো হালদারকেও ফোন করল। এ-অঞ্চলে হুটকো হালদার হলেন কিনা একটি চলমান রামকৃষ্ণ অভিধান। সেই আট বছর বয়স থেকে সুযোগ পেলেই হুটকো বেলুড় মঠে যাচ্ছেন এবং দীর্ঘদিন ধরে পরম ধৈর্যসহকারে শতসহস্র রামকৃষ্ণ-কাহিনী সংগ্রহ করছেন।

"লেট ললিত বলে কারও নাম শুনেছেন হুটকোকাকু?" সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো পিকলু।

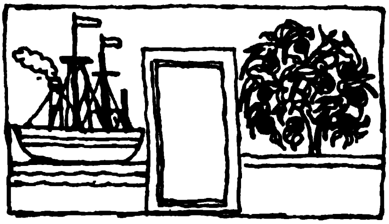
হুটকো হালদার উত্তর দিলেন, "ঠাকুরের কাছে কত যে পিকুলিয়র লোক আসতেন। কত সব অদ্ভুত নাম। এক জনের নামও তো ছিল হুটকো। তবে শুনুন, যদি চমচমে ঠাকুরের সম্বন্ধে কিছু লেখেন, তা হলে জানিয়ে দেবেন ঠাকুরের সরকারি ডেথ সার্টিফিকেটে তারিখের গোলমাল আছে। সরকারি রেজিস্টারিতে বুড়ো গোপালবাবু লিখিয়েছিলেন –১৫ই আগস্ট ১৮৮৬, অথচ মৃত্যু ১৬ই আগস্ট। নামটাও ভুল করেছিলেন—পুলিশের খাতা অনুযায়ী—রাম কিষ্টো প্রোমোহংস! ঠিকানা ৪৯ কাশীপুর রোড, বয়স বাহান্ন। মৃত্যুর কারণ : গলায় আলসার। পেশা : প্রচারক। সংবাদদাতার নাম : গোপালচন্দ্র ঘোষ। খাতায় কলমে উনিও কিন্তু ভক্ত নন—বন্ধু। আরও একটা মস্ত ভুল আছে ডেথ রেজিস্টারে, মিস্টার পিকলু। লেখা আছে জাতি : হুগলি। ওটা জেলা হবে।'

"লেটলতিফ!" ভাবতে লাগলেন হুটকো হালদার। ঠাকুরের ভক্তদের অদ্ভুত অদ্ভুত নাম দিয়ে সবাই মজা পেতেন। কালীপদ মুখোপাধ্যায় মোটা ও ফর্সা ছিলেন, বুটে অর্থাৎ ছোলার ডাল খেতে বেজায় ভালবাসতেন, তাই ওঁর নাম হয়েছিল বুটেকালী। আর একজন কালীপদ (ঘোষ) ডিকিনসন অফিসে কাজ

করতেন, খুব দানের হাত ছিল তাই তাঁর নাম হয়েছিল দানী কালী। সারদানন্দ একটু মোটা ছিলেন, তাই কেউ কেউ হোঁৎকা বলে ডাকতেন।

কিন্তু লেটলতিফের রেফারেন্স খুঁজে দেখতে হবে? শক্ত কাজ, কিন্তু পিকলুর কাছ থেকে কঠিন প্রশ্ন পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন হুটকো হালদার। অনেকদিন পরে কলকাতায় ফিরে এসে তাঁর ধারণা হয়েছিল ঠাকুর-স্বামীজি সম্পর্কে কিছু কিছু মহলে উৎসাহ-উত্তাপ কমে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তাহলে ঠিক নয়। অন্ধ অনুরাগীর দল যেমন কোনো সঙ্ঘের পক্ষে ভাল নয়, তেমন প্রচণ্ড সামাজিক অনীহাও সঙ্ঘের পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয় না।

উৎসাহিত হয়ে হরিময়বাবু এবার বললেন, "ভবনাথ সেনকে অনুরোধ করতে হবে, ধারাবাহিকের জব্বর একটা নাম দিতে। পরমপুরুষ-ফুরুষ আজকালকার বাজারে তেমন খাবে না। নতুন নামটা হতে পারে—প্রোমোহংস রহস্যামৃত, তাহলে সাউথ ক্যালকাটায় আধাসাহেবী বাঙালি পরিবারে চমচমের কিছু বেশি বিক্রি পাবো। প্রোমোহংস কথাটা মডার্ন মহলে সুড়সুড়ি দেবেই।"



দুপুর একটার সময় বাড়িওয়ালা বংশগোলাপবাবুকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ জানিয়ে ভুল করে ফেলেছেন হরিময়বাবু। অতিথির জন্যে বসে বসে তিনি ও পিকলু ধৈর্যচ্যুত হচ্ছেন। হরিময়বাবুর পেটে আবার অনাহারে গ্যাসট্রিক ঢেকুর ওঠে। তাই একটু আলুভাতে পিকুলর সঙ্গে ভাগ করে আলতোভাবে মুখে পুরে দিলেন। এই আলুভাতে মাখার ফর্মুলা ও পদ্ধতিটা খোদ টিপু সুলতানের ফ্যামিলি থেকে নিজে শিখে এসেছেন হরিময়বাবু।

সেবার টিপু সুলতান বিশেষ সংখ্যা হরিময়বাবু বার করেছিলেন বহু খেটে। খুশি হয়ে, টিপুর বংশধররা ওই গোপন পারিবারিক রেসিপিটা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন অন কন্ডিশন যে ফর্মুলাটা কখনও কোনো কাগজে প্রকাশ করবেন না। বহু কষ্টে পরের পর পাঁচজন কাজের লোককে এই সুলতানি রেসিপিটা হরিময়বাবু শিখিয়ে এসেছেন কিন্তু তার আগে গোপনীয়তার দিব্যি গালিয়ে

নিয়েছেন।

অবশেষে তিনটে বাজলো, বংশগোলাপবাবুর দেখা নেই। নিরাশ হয়ে ওঁরা দুজনে এবার খেতে বসলেন।

পিকলু কিন্তু বিরক্ত হয়নি, তার দৃঢ় বিশ্বাস দাদু এবার শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা গল্প পেয়ে যাবেন। হরিময়বাবু এখনও ভরসা পাচ্ছেন না। বড্ড মুডি লেখক তোমার দাদু—প্রচুর গল্পের শাঁস না থাকলে কিছুতেই লেখা শুরু করবেন না।

পিকলুর ধারণা, এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার সম্পত্তিটা দেখলেই মনে হয়, একখানা উপন্যাস এখানে আইসক্রিমের মতন জমাট হয়ে রয়েছে। কতদিন যে বাড়িটা রঙচঙ হয়নি তার হিসেব নেই। কেমন একটা ভুতুড়ে ভাব ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বাসলজের সর্বত্র।

বর্তমান পরিস্থিতির পক্ষে হরিময়বাবু বললেন, "কে রঙ করাবে, মিস্টার পিকলু? দামি সম্পত্তি, কিন্তু তেমন কিছু রোজগার তো নেই। তাছাড়া মিস্টার কারনারির কারবারটাই অন্য রকম—যত সেকেলে বাড়ি হবে তত উনি স্যাটিসফ্যাকশন পান, আর আমি চমচম কার্যালয়ের ভিতরটা কিছুতেই রঙ করাতে পারি না ফর অবভিয়াস রিজন্স।"

"অবভিয়াস কারণগুলি কি?" মুখটিপে হাসতে হাসতে জানতে চাইছে পিকলু।

"একালের অমূল্য সংগ্রহ—চমচমের পুরনো সংখ্যাগুলো। প্রথম সংখ্যা থেকে শুরু করে একে একে ছ'শ ইস্যু প্রকাশিত হয়েছে, প্রত্যেকটির বাড়তি সংখ্যা মার্কামারা অবস্থায় থরে-থরে একটা ঘরে সাজানো রয়েছে—রঙ করার সময় সেখানে চুন পড়লে কী অবস্থা হতে পারে পিকলু? পুরনো কালে রাজাদের স্বর্ণভাণ্ডার কখনও হোয়াইট ওয়াশ হতো না।"

"হরিময়দাদা, একশ বছর ধরে টানা চলছে এমন কাগজ কলকাতাতেই রয়েছে, তাঁদের সাজানো-গোছানো কিন্তু এরকম নয়।" বললো পিকলু।

"একশ বছর?" হরিময়বাবু বিশ্বাসই করতে পারছেন না। "টানা কাগজ বার হচ্ছে মাসে মাসে?"

"তুমি নিশ্চয় স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত উদ্বোধন পত্রিকার কথা বলছো! ওঁরাই একমাত্র চমচমের বয়োজ্যেষ্ঠ। সন্ন্যাসীদের কাগজ, ওঁদের ব্যাপারটাই আলাদা।"

এই সময় হুটকো হালদার সাইকেল রিকশ চড়ে উপস্থিত হলেন। হরিময়বাবু

ওঁকে পেয়ে খুব খুশি। জোর করলেন, "ভাত না খান, এক প্লেট সুলতানী আলুয়া খেতেই হবে।"

হুটকোবাবু ভুল শুনলেন, হালুয়া। মুখে দিয়ে বললেন, "এ তো হালুয়া নয়, আলুভাতের মতন আস্বাদ!"

হরিময়বাবু বললেন, "নামটা আমার নিজস্ব দেওয়া—আলু থেকে আলুয়া। কেউ হালুয়া শুনলে তার জন্যে তো আমি দায়ী নই!"

হুটকো হালদার নিজেও খুব উৎসাহ বোধ করছেন। "যে করেই হোক ভবনাথ সেনমশাইকে রামকৃষ্ণ ময়দানে নামিয়ে দিন। যত লোক এ-লাইনে চলে আসেন তত আমাদের ভাল। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রচার হবে। এই যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত! কীরকম বেপরোয়া বাধাবন্ধনহীন ঝড়ো হওয়া ছিলেন, কেউ কি ভেবেছিল, এই জগাই এমন পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লিখে বসবেন?"

এরপরের মন্তব্যে চাপা হাসি দেখা গেলো হরিময়বাবুর মুখে। হুটকো হালদার হঠাৎ বললেন, "রহস্য উপন্যাস ছাড়া আর সব লেখা যায় আমাদের ঠাকুরকে নিয়ে। তাঁর দয়ার শরীর, প্রেমের শরীর। সেখানে হিংসা এবং হানাহানির বিন্দুমাত্র স্কোপ ছিল না। সেই প্রেমময় শরীরও তিনি বিলিয়ে দিলেন বহুজনের মুক্তিকামনায়।"

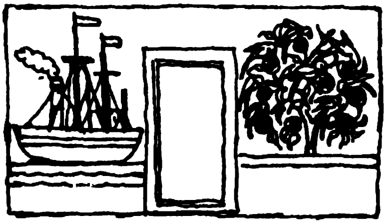
"কেন? ডিটেকটিভ গল্প লেখা যায় না আমাদের ঠাকুরকে কেন্দ্র করে?" জিজ্ঞেস করলেন হরিময় একটু ক্ষুণ্ণ এবং একটু হতাশ হয়ে।

"ঠাকুর তো ডিটেকটিভ ছিলেন না, তিনি তো চোর ধরতেন না। তিনি যে রসের ভাণ্ডারী। লোককে হাসাতে, তাদের নিয়ে মজা করতে করতে ভগবদ বিশ্বাসের দিকে টেনে নিয়ে যেতে ওস্তাদ ছিলেন। এই ধরুন যখন গলায় রোগের চিকিৎসার জন্যে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে দুর্গাচরণ মুখুজ্যে স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে ঢুকলেন, তখন কে যেন জিজ্ঞেস করলেন, দক্ষিণেশ্বর ছাড়লেন কেন? তিনি সোজা উত্তর দিলেন, 'বড় স্যাঁতসেঁতে এবং বাহ্যে যাবার বড় অসুবিধে!' নরদেবতা কখনও নিজেকে দেবতা ভাবেন না হরিময়বাবু। আপনি কৃষ্ণের দিকে দেখুন, রামচন্দ্রের দিকে দেখুন। এই সহজ ভাবটাই জনসাধারণ পছন্দ করে—মনিব যখন মনিবিয়ানা করে তখন তাঁর গ্ল্যামার নষ্ট হয়ে যায়।"

হরিময় আবিষ্কৃত আলুয়া খেয়ে বেশ সন্তুষ্ট হয়ে হুটকো হালদার বললেন, "আমাদের হাওড়ায় রামকৃষ্ণের প্রতাপ চিরকালই প্রবল। দুনিয়ার ঘুম ভাঙবার আগে কবে কোন্‌কালে হাওড়ায় রামকৃষ্ণপুর স্থাপিত হয়েছে ভেবে দেখুন। সেখানে এসেছেন স্বয়ং বিবেকানন্দ। ভক্ত-গৃহে বসে রচনা করেছেন জপমন্ত্র।

হাওড়ার লোকরা দিল্লির লোকের মতন অবুঝ নয়—শর্টে সারবার জন্যে রামকৃষ্ণপুরম্‌কে আর কে-পুরম্ করেনি। চলো পিকলু, তোমায় রামকেষ্টপুরে নবগোপাল ঘোষদের বাড়িটা দেখিয়ে আনি যেখানে সবান্ধব বিবেকানন্দর পদধূলি পড়েছিল ১৮৯৮ সালে। নবগোপাল আদিতে ছিলেন বাদুড়বাগানের অধিবাসী। ঠাকুরের কাছে সস্ত্রীক প্রায় আসতেন, কাজ করতেন এক সওদাগরী অফিসে। কাশীপুরে এঁর স্ত্রীকেই ঠাকুর এক বেড়াল ও তার বাচ্চা পালনের ভার দিয়ে খুব নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। ভক্তের পরিবার, পরে নবগোপালবাবুর মেজ ছেলে সন্ন্যাসী হন হুগলী অম্বিকানন্দ নামে। এঁদের বংশের একজন একবার বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন। পরে বেলুড়ে রাজামহারাজের সমাধিমন্দির গড়েছেন। ভক্ত চূড়ামণি বলতে পারো।"

পিকলুর বুলেট বাইকটা হাওড়ার ভাঙা রাস্তার পক্ষে ঈশ্বরের দূতের মতন। এখানকার রাস্তা এতো এবড়োখেবড়ো এবং সরু যে চারচাকার গাড়ির প্রবেশ প্রায় অসম্ভব।"



অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু এখনও পিকলুর ফেরার লক্ষণ নেই। হুটকোবাবুর কাণ্ড তো। হয়তো শঙ্করীপ্রসাদ বসুর কাছেও পিকলুকে নিয়ে গিয়েছেন, রামকৃষ্ণ সংবাদের হোলসেল আড়ত দেখাতে। কিংবা হয়তো ওর সঙ্গে চলে গিয়েছেন বেলুড়মঠ। গ্র্যান্ড ট্যাংক রোড ধরে এগিয়ে, বাঙালবাবু ব্রিজ পেরিয়ে, লিলুয়ার ওপর দিয়ে ছুটলে বেলুড় মঠ আর কতখানি? ওদিকে রামকৃষ্ণ মন্দির, এদিকে শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, শালকিয়া। দুটোর মধ্যে কী সম্পর্ক কে জানে? হুটকোবাবু আবার বলেন, "ওটা ঢ্যাং নয় ঢং।" অতএব হিসট্রি-জিওগ্রাফি জেনে লাভ নেই। চমচমের তরুণপাঠকরা আজকাল তাজা গল্প চাইছে। যে গল্প চোখের সামনে ঘটছে। তালমিছিরির মতন তালগন্ধ চায় তারা।

হরিময়বাবু পিকলুর অপেক্ষা করছেন, সেই সময় বিশ্বাস লজের দোতলা থেকে চিরকুট এলো। পাঠিয়েছেন স্বয়ং বংশগোলাপ বিশ্বাস। স্থানীয় সংবাদের

রয়টার বিজয়। সে ফিসফিস করে হরিময়বাবুকে জিজ্ঞেস করলো, "এই সম্পত্তি কি গোলাপবাবু বিক্রি করে দিচ্ছেন?" খবরটা টায়ার সিং এবং ম্যানেজার সিং চুপিচুপি জানিয়েছে বিজয়কে। একজন সিন্ধি ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ হচ্ছে, এই যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন ওয়ান মিস্টার কারনানি।

হরিময়বাবুর মতে, সবই সম্ভব। এ-বিষয়ে বেশি মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। যাঁদের বাড়ি তাঁরা যা ইচ্ছে তাই করবেন। এতোদিন যে বিক্রির কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এটাই আশ্চর্য।

বংশগোপালবাবু এই বাড়ি বিক্রির কথা অবশ্যই ভাবেননি। তাঁর সন্তান হয়তো সুযোগ পেলে ভাবতো, কিন্তু কয়েকটা অকালমৃত্যু বিশ্বাসবংশেব ওপর অভিশাপের মতন নেমে এসেছে।

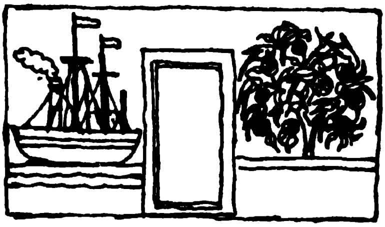
বংশগোপাল বার্মায প্রথম শোক পেয়েছিলেন জ্যেষ্ঠপুত্রের অকালমৃত্যুতে। দ্বিতীয় মৃত্যু ছিনিয়ে নিয়েছিল দ্বিতীয় পুত্রেব একমাত্র সন্তান বংশবিজয়কে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় ছেচল্লিশ সালের সেই শোকাবহ ঘটনাব কথা হরিময় ভোলেননি। এবপরেই সহজবোধ্য কারণে শোকাহত বংশগোপালপুত্র তাঁর একমাত্র নাতিকে নিযেই এই শিবপুর ছেড়ে প্রবাসী হয়েছিলেন। সেই নাতি বংশগোলাপ এত বছর পরে ফিরেছেন পাবিবারিক সম্পদের খোঁজখবব কবতে। তাঁর মাথায় বিক্রির পরিকল্পনা থাকা অবশ্যই আশ্চর্য নয়।

বংশবাটির দোতলায় উঠে হরিময় দেখলেন, একটা লাল বিদ্যাসাগরী চটি পরে বংশগোলাপ বিশ্বাস পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে আরাম কেদারায় বসে আছেন। একেবারে যেন পঞ্চাশ বছর আগেকার দৃশ্য! এখানেই স্বয়ং বংশগোপাল বিশ্বাস এই ভাবে চলে গড়গড়ায় তামাক খেতেন।

বংশগোলাপ প্রথমেই ক্ষমা চাইলেন। বললেন "ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আপনার সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন হলো না। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে আজ স্বপ্ন দেখলাম স্বয়ং বংশগোপালকে। প্রপিতামহ আমাকে হঠাৎ বললেন, 'ভিটেতে এসেছিস, খুব ভাল করেছিস,' তারপর যখন ঘুম ভাঙলো, তখন এতো দেরি হয়ে গেছে যে আপনার কাছে আর যাওয়া যায় না। আমার জন্যে অপেক্ষা না করে করে ততক্ষণে আপনারা নিশ্চয় খেয়ে নিয়েছেন।"

একটু থেমে নতুন খবর দিতে শুরু করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। "এই দেখুন পুরনো পারিবারিক কাগজপত্তর এবং পারিবারিক প্রতীক সব উদ্ধার করছি। কে এম দাসের এই বিদ্যাসাগরী চটি জোড়া বংশগোপালের ট্রাংকে তোলা ছিল—একেবারে পায়ে ফিট করে গেল।" হরিময়বাবুর সঙ্গে সঙ্গে মনে

পড়লো, বহুবছর আগে বংশগোপালের পায়েও লাল রঙের কে এমন দাসের বিদ্যাসাগরী চটি দেখা যেতো। প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস তাহলে মৃত্যুর অর্ধশতাব্দী পরেও একের পর এক বিস্ময় সৃষ্টি করছেন। চাইনিজ ইংকে লেখা নতুন এক দিনলিপিও সবেমাত্র উদ্ধার করেছেন প্রপৌত্র বংশগোলাপ।



শরীরে শিহরন অনুভব করছেন হরিময়বাবু। বংশগোপালের দিনলিপি থেকে ধীরে ধীরে পড়ে শোনাচ্ছেন তাঁরই প্রপৌত্র বংশগোলাপ।

পুরনো দিনের ইতিহাসটা এবার আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বংশগোপাল লিখেছেন:

"আমি মদ্যপান করেছি একবারই। আমার সন্তান বংশমহিমার আকস্মিক মৃত্যুর পরে। মাত্র দশ বছর বয়সে ফুলের মতো নিষ্পাপ কোনও ছেলের এইভাবে মরা উচিত? আপনারা বলুন।

প্রবাসে এই বিপত্তি ঘটার পর আমি বার্মার বিজনেসের পাট চুকিয়ে দিয়ে ফিরে এসেছি হাওড়ায়। অনেক খুঁজে খুঁজে সম্পত্তি কিনেছি হিদারাম হালদার লেনে।

বুঝেছি, তিনি কোনো কারণে অসন্তুষ্ট, এখনও আমার কাছ থেকে পুজো চান—আদর-যত্ন না হলে ওঁর মন কিছুতেই ভরে না। শশী তা জানতো। আমাকেও তিনি দেখালেন কত ক্ষমতা তিনি রাখেন। শক্ত কথা সোজাসুজি বুঝিয়ে দিলেন এই অধম ভাণ্ডারিকে।

স্টোরকিপারমশায়ের চোখ এবার খুললো, সে বুঝলো মদ-টদ চলবে না। ঠাকুর মাতালদের সঙ্গে মেশেন, তাদের পরামর্শও দেন যেন পা না টলে, কথা না জড়ায়, কিন্তু নিজে ফোঁকেন তামুক। দেশে ফিরে এসে দেখি ত্যাগী শিষ্যদের অনেকেই তামাক খাওয়ার এক্সপার্ট। এক নম্বর থেকে শুরু করে হুঁকো টানতে প্রায় কেউ বাদ যায় না। আর বড় চেলার তো হুঁকো, গড়গড়া, চুরুট, সিগ্রেট, টোবাকো, বিড়ি কিছু বাদ যায় না। অবশ্য কোথাও কিছু ঢাকঢাক

গুড়গুড় নেই, নরেন্দ্র লিখিত অনুমতি দিয়েছে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ধূমপান করার, কিন্তু অন্য কোনও মাদকতা নিষিদ্ধ। অন্য নেশা বলতে এখানে ঈশ্বরের নেশা। ঠাকুরের হুঁকোকেও ভোলা হয়নি—বেলুড়ের মন্দিরে রাতের ভোগের পরে ঠাকুরকে হুঁকো দেওয়ার সিস্টেম চালু রয়েছে। তাঁকে এই হুঁকোকল্কে নিবেদন করে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বড় চেলা তো অল্প বয়সে নস্যিও নিতেন—তাঁর ভাইরা নস্যের গন্ধে কাছে শুতে চাইতো না। এক সময় নরেন্দ্রর দেখাদেখি আমি খৈনি খাওয়াও শুরু করেছিলাম। ভাল লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছি।"

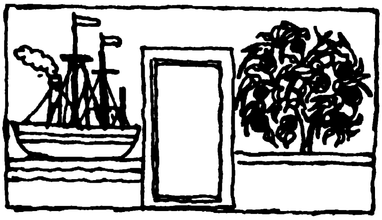
বংশগোপাল বিশ্বাস এর পরেও দিনলিপিতে লিখেছেন : "মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড রসিক মহিলা। বেলুড়ে প্রয়াত নরেন্দ্রকে দেওয়া ভোগ দেখে তিনি মজা পেয়েছিলেন, সেখানে তাঁর প্রিয় হট চকোলেট আইসক্রিমও ছিল। মিস ম্যাকলাউড জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি মনে করো এতে তিনি আনন্দ পাচ্ছেন? উত্তরটি এলো মোক্ষম—অন্তত আমরা তো তাঁকে নিবেদন করে আনন্দ পাচ্ছি।"

বংশগোপালবাবু তাঁর দিনলিপিতে আরও অনেক কথা নিজের খেয়ালে লিখেছেন। বংশগোলাপ পড়তে লাগলেন : "কাশীপুরের উদ্যানবাটিটি দেখতে ওপাড়ায় গিয়েছিলাম অনেক বছর পরে। এবার বাড়ির ভিতরে ঢুকিনি। মনে মনে বললাম, যে যাই বলুক. বিত্তবাসনা ও অর্থলোভে আমি কিন্তু নির্বংশ হইনি। আমার সংসার থেকে প্রিয়পুত্র 'বংশমহিমা' হয়তো বিদায় নিয়েছে, কিন্তু বটগাছে নবকিশলয়ের উদ্ভব হয়েছে। আমার বংশে নতুন অতিথি এসেছে।

আমি তার নামকরণ করেছি বংশবিনয়। ক্ষমা করো, দয়া করো, অধীনের এই বংশ রক্ষা করো, হে ঈশ্বর। সংসারী মানুষের পক্ষে কাঞ্চনের জন্য কাতর হওয়া তো অযথা নয়, অন্যায়ও নয়। একথা তাঁর থেকে স্পষ্টভাবে কেউ বুঝতো না, অথচ কোথায় এক চাপা অতৃপ্তি থেকে যাচ্ছে, কে যেন বোঝাতে চাইছে, তাঁর কাছে এসে পরমার্থ না চেয়ে যে অর্থ চায় সে ভুল করে, ভীষণ ভুল করে। এই ভুলের দুঃখ এ সংসারে কেউ ঘুচোতে পারবে না।

কিন্তু আমার প্রশ্ন এই কঠিন শাস্তি তিনি স্বয়ং কবে দিলেন? আমরা যাঁরা তাঁকে দেখেছি দিনের পর দিন তারা তো তেমন ইঙ্গিত কখনও পাইনি। উপেন মুখুজ্যে অর্থ চেয়ে অর্থ পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অনিবার্যভাবে বংশনাশের বজ্রপাত হয়েছে উপেন্দ্রনাথের মন্দিরে। কিন্তু দুটির মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে বলে আমার মনে হয় না।

এই মুহূর্তে আমি অপরের কথা ভাবতে সক্ষম নই, আমি বারবাব বলছি, হে ভৈরব আমাকে শক্তি দাও, ভক্ত পানে চাহ।"



যে বংশবিনয়ের উল্লেখ রয়েছে বহুদিন আগের বংশগোপালের দিনলিপিতে তাঁরই নাতি স্বয়ং বংশগোলাপ বিশ্বাস এই মুহূর্তে হরিময়বাবুর সামনে প্রপিতামহের আরামকেদারায় আধশোয়া অবস্থায় কথা বলছেন।

বংশমহিমা বলে এই বংশে কেউ ছিল তা আগে ঠিক স্পষ্ট শোনেননি হরিময়বাবু। কিন্তু তিনি নিজের চোখে দেখেছেন দ্বিতীয়পুত্র বংশবিনয়কে, তিনি হাওড়াতেই কনট্রাকটরি করতেন। কলকাতায় তাঁর কাগজের দোকানও ছিল। হরিময়বাবু শুনেছিলেন যুদ্ধের সময় এঁদের সাপ্লায়েব ব্যবসাটা বেশ জমে উঠেছিল। ইস্পাহানি কোম্পানিতে তখন অনেক হিন্দু সাপ্লায়ার ছিল। বংশবিনয় অবশ্য সাপ্লাই করতেন সোজা সরকারকে।

বংশগোপালের স্নেহময় আশ্রয়ে যখন হরিময়বাবু এলেন, তার কিছু পরেই অবশ্য পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটতে শুরু করলো। ছেচল্লিশের ১৬ই আগস্ট সোনার বাংলাকে চিরকালের জন্যে ছিন্নভিন্ন করে দিলো। শত শত বছরের প্রীতির ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ক্ষণভঙ্গুর চিনামাটির বাসনের মতন সময়ের শিথিল হাত থেকে পড়ে ঝনঝন করে ভেঙে গেলো। সে এক উন্মত্ত সময়। তখন আর মানুষকে সংহতির মর্মার্থ বুঝিয়ে কোনও লাভ নেই। ধর্মের নাম করে মানুষ যেন হঠাৎ পাগল হয়ে উঠলো। আসলে ধর্ম হলো একটা আবরণ, একটা ছুতো। সমস্যাটা হলো জীবনযাত্রার, অনিশ্চয়তার এবং প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নিরাপদে বেঁচে থাকবার উৎকণ্ঠা।"

বংশগোলাপ এরপর হরিময়বাবুর কাছে স্বীকার করলেন, "আমার কিন্তু বাবার কথা একটুকু মনে নেই।"

"থাকবে কী করে? তখন তো আপনি বেবি! শিশুরা তো কিছু মনে রাখে না। এইটাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। তাই নতুন প্রজন্ম অতীতকে ভুলে নতুন

ভাবে ইতিহাস শুরু করতে পারে।”

বংশগোলাপ শান্তভাবে হরিময়কে বললেন, “শুনেছি আমার বাবা বংশবিজয় ছিলেন খুবই উদারহৃদয় মানুষ। বিপুল উৎসাহে এ অঞ্চলে তিনি সমাজসেবা করতেন।”

হ্যাঁ, শিবপুর চড়ার বস্তিতে মসজিদের সামনে বসে অনেক গরিব মুসলমান পরিবারের উপকার করতেন বংশবিজয়। আর বংশগোপাল তাঁকে উপদেশ দিতেন, “ইয়ংম্যান বিজনেসে মন দাও। এই বংশে একদিন অনেক টাকা আসবে, বোধহয় তুমিই সেই বিত্তের নিমিত্ত হবে।”

কিন্তু টাকা তো দূরের কথা, সেই নিরপরাধ মানুষটি রায়টে মার্ডার হলো, ভাবা যায় না।

দাদু বংশবিনয় বিনামেঘের এই বজ্রাঘাত সহ্য করতে পারলেন না। শোকে বিপর্যস্ত হয়ে হাওড়া ছেড়ে চলে গেলেন বেনারস।

“আমাকে আর আমার বিধবা মাকে সঙ্গে নিয়ে। আমার ঠাকুমাও স্বামীর সঙ্গে যাবার অনুমতি চাইলেন শ্বশুর বংশগোপালের কাছে। তিনি সজল চোখে বললেন, যাবার হলে যেতে হবে সবই তো তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু আমার হিসেবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বউমা।”

তারপর হিদারাম হালদার লেনের এই বিশাল বাড়িতে নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ এবং অভিশপ্ত দিনাতিপাত করলেন পুত্র এবং পৌত্রশোকাতুর বংশগোপাল বিশ্বাস। সেই পর্বেই হরিময়বাবুর সঙ্গে তাঁর ভালবাসা নিবিড় থেকে নিবিড়তর হয়েছিল।

বিশ্বাসপরিবারে অকালমৃত্যুর বেদনা হরিময়বাবুর অবশ্য আজও যায়নি। পরিবারের সুখদুঃখের সঙ্গে অজান্তে কখন সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়েছেন তিনি।

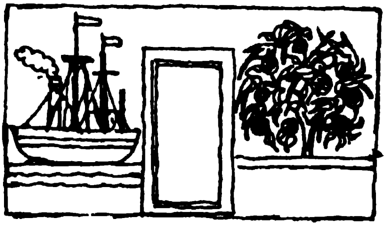
হরিময় বললেন, “সামান্য চব্বিশ বছর বয়সে চলে গেলেন বংশবিজয় বিশ্বাস। বংশগোপালবাবুর টেবিলে নাতির ছবিটা আমি অনেকবার দেখেছি—হাসি হাসি মুখ, কোথাও আসন্ন মৃত্যুর কোনো আগাম ইঙ্গিত নেই। অথচ ছবিটা খুব আনন্দ করে তোলা হয়েছিল হাওড়া ময়দানের বঙ্গবাসী ইলেকট্রিক স্টুডিও থেকে বংশবিজয়ের মৃত্যুর ঠিক তিন মাস আগে।”

“দাদু বলতেন, একটা সৌভাগ্য, ছেলের বিয়ে দিয়েছিলাম বাইশ বছর বয়সে। না হলে বিশ্বাসবংশ লোপ হয়ে যেতো।”

একটু থামলেন বংশগোলাপ। তারপর বললেন, “আমাদের বংশের মানুষগুলোর এক একটা অকারণ এবং আজব খেয়াল থাকে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে দাদু বংশবিনয় আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন, আমার ছেলের

বিয়ে অবশ্যই দিতে হবে চব্বিশে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে। বংশধরদের নাম তো প্রপিতামহ বংশগোপাল অনেক আগেই নির্ধারণ করে গিয়েছেন—আমার পরের প্রজন্মের নাম বংশগৌরব।"

বংশগৌরব বিশ্বাস এয়ারফোর্সে বৈমানিকের কাজ করেন শুনে হরিময়বাবুর গলাটা হঠাৎ শুকিয়ে গেলো। "বিমানবাহিনী!" একটু ঢোক গিললেন তিনি। ভাগ্যে হরিময়বাবুর রিঅ্যাকশন নজরে পড়লো না বংশগোলাপবাবুর।



স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে একে একে বংশগোলাপবাবু নানাকথা বললেন। "বহুদিন পর হাওড়ায় ফিরেছি। চেনাজানা লোকেরা সব কোথায় ছড়িয়ে পড়েছেন। রাস্তায় বেরিয়ে খুঁজেপেতে তাদের বার করতেও ইচ্ছে করে না। এই মুহূর্তে এখানে, আপনিই আমার প্রধান বন্ধু, হরিময়বাবু।"

হরিময়বাবু আশ্বাস দিলেন, "আমরা তো আপনার ঘরের লোক বংশগোলাপবাবু। আপনার প্রপিতামহ বংশগোপালবাবু যা করেছেন চমচমের জন্যে তা তো কখনও ভোলা যায় না। আপনি যখন বেনারস থেকে ফিরে এসেছেন তখন হিদারম হালদার লেনের এই সম্পত্তিতে জাঁকিয়ে বসুন, পারিবারিক সম্পদ ভোগ করুন। মিসেস বিশ্বাসকেও এবার এখানে আনিয়ে নিন। কোনো অসুবিধে হবে না, হিদারাম হালদার লেন জায়গাটা তো খারাপ নয়, দেখছেন তো এই মন্দিরতলা এরিয়ায় জমির দাম কীরকম বেড়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া বিদ্যাসাগর ব্রিজ হওয়ার কল্যাণে হাওড়ার এই দক্ষিণাঞ্চল এখন অ্যাজ গুড অ্যাজ সাউথ ক্যালকাটা। বলতে পারেন, প্রায় কলিকাতায় বসবাস করছি আমরা।"

বেনারসের পাট চুকিয়ে হাওড়ায় ফিরে আসাটা বংশগোলাপবাবুর পক্ষে সোজা নয়। তাঁর স্ত্রী কী এক গোপন মানত করে বসে আছেন বেনারসে। ওখান থেকে কিছুতেই বেরুনো যাবে না আরও দু'বছর—বংশগৌরব চবিবশে পড়লে তার বিয়ে হবে, বিপত্তারিণীর ব্রত উদযাপন হবে, তারপর। এর উনিশ-বিশ হবার

কোনো উপায় নেই, স্বয়ং বংশবিনয় পৌত্রবধূকে এই নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। বাবা বিশ্বনাথের নিরাপদ আশ্রয় ছাড়া বংশবিশ্বাসদের কিছুতেই চলবে না।

ব্রত ইত্যাদির ব্যাপার যদি থাকে, তা হলে বংশগোলাপের একার এখন হাওড়ায় ফেরার কি অর্থ?

প্রশ্নের ইঙ্গিতেই বংশগোলাপের মুখ লাল হয়ে উঠলো। "হরিময়বাবু, অনেক দুঃখের কথা। ধীরে ধীরে বলে বুক হালকা করবো, তাই তো আপনাকে ডেকেছি। আপনার কাছে অস্বীকার করে লাভ নেই, আমাদের এই বিশ্বাস বংশ কারও এক বিচিত্র রসিকতায় এক পিকুলিয়র বংশে পরিণত হয়েছে। কারণে-অকারণে ভবিষ্যৎ বংশধরদের উদ্দেশে লম্বালম্বা লিখিত নির্দেশ রেখে যাওয়ার রেওয়াজ এই পরিবারে রয়েছে। এ সব কখনও করবেন না হরিময়বাবু, ভবিষ্যতে যারা পৃথিবীতে আসবে তাদের সব বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়ে রাখা পূর্বপুরুষদের উচিত। কখনও পিতৃপুরুষের নির্দেশের বেড়ি তাদের পায়ে পরিয়ে দেবেন না।"

"এই অধমের ক্ষেত্রে সে গুড়ে বালি," সলজ্জভাবে জানালেন হরিময়বাবু। "ওইসব হাঙ্গামায় আদৌ যাতে না যেতে হয় তার জন্যেই তো অবিবাহিত থাকা! আমার সৃষ্টি বলতে, সন্তান বলতে, বংশধর বলতে, এই সাধের চমচম। এর মধ্যেই শিয়াখালার চৌধুরী বংশ আরও কয়েকশ বছর টিকে তাকবে, তবে ভবিষ্যৎ চমচম সম্পাদককে আমি সব রকম স্বাধীনতা দিয়ে যাবো।"

কথাগুলো খুব ভাল লাগলো বংশগোলাপের। তিনি বললেন, "আমার অবস্থা বুঝুন। পিতামহ বংশবিনয় বারাণসীতে মৃত্যুশয্যায় আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন, গোলাপ তুমি কথা দাও, সালের শুরুতেই যে করে হোক হাওড়ার হিদারাম হালদার লেনে ফিরে যাবে। তা মশাই, মৃত্যুশয্যায় শুয়ে থাকা মানুষের সঙ্গে কেউ তক্কো করে না। নির্দেশ শুনে আমি চুপ করে বসেছিলাম। আর দাদু ধরে নিলেন, তাঁর ইচ্ছার অন্যথা হবে না।"

বংশগোলাপ বললেন, "দাদু মারা গেলেন এইট্টি এইটে, আর নাইনটিসিক্সের গোড়া থেকে আমার ওয়াইফ ছিনে জোঁকের মতন আমার পিছনে লাগলেন, এই ফেরার ব্যাপারে। যেন এই নির্দেশ অমান্য করলে বিশ্বাস বংশের মহা অপরাধ হয়ে যবে। শেষে তর্ক না বাড়িয়ে, গত মাসে আমি বংশ-আজ্ঞা পালন করেছি। কিন্তু আমি এখনও জানি না, হিদারাম হালদার লেনে ফিরে এসে আমাকে কী করতে হবে? এ-বিষয়ে কোনো পথনির্দেশ আমার হাতে নেই, অথচ অন্ধের মতন আমাকে পিতামহের ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করতে হলো।"

একটু থামলেন বংশগোলাপ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, তিনি এসব বস্তাপচা

সেন্টিমেন্টে আর বিশ্বাস করতে চান না।

এবার হরিময়কে তিনি বললেন, "কিন্তু বুঝুন আমার অবস্থা! আমি যখন শিশু ছিলাম তখন থেকে বংশবিনয় পিতার স্নেহে আমাকে পালন করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, কিছু বিষয়সম্পত্তি করে দিয়েছেন বেনারসে। বেশি না হলেও সংসার চালানোর মতন বাড়িভাড়া সংগ্রহ হয়। তাঁর স্মৃতিকে আমি বংশধর হয়ে অপমান করি কী করে? ঠিক সেই সময় যে-কোম্পানিতে কাজ করতাম তারা স্বেচ্ছা-অবসর প্রকল্প চালু এজ্জলো। কিছু টাকা নিয়ে কয়েক বছর আগেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমি এই হাওড়ায় চলে এলাম। আমার গৃহিণী বললেন, এও ভবিতব্যের লিখন, না-হলে তোমার দাদু যখন কলকাতা যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন ঠিক সেই সময় চাকরি থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নেবার সুযোগ আসবে কেন?"

"বেনারাস থেকে হাওড়ায় এই বিশ্বাস বংশের ডেরায় চলে এসেও আমি কিন্তু শান্তি পাইনি, হরিময়বাবু। এই দোতলায় দু'খানা ঘরে টাঙানো প্রপিতামহ বংশগোপালবাবুর ছবি দেখি, আর ভাবি ভদ্রলোক বোধহয় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসার না করলেই ভাল করতেন। নিচের প্রজন্মের সন্তানদের ওপর তোমার নির্দেশের অধিকার আছে স্বীকার করলাম, কিন্তু তোমার বংশধর বলে নিজের খেয়ালে তুমি তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে কেন?"

"নির্দেশ থাকলেই মানতে হবে কেন?" প্রশ্ন তুললেন হরিময়বাবু। "কোথাও তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। হয়তো এগুলো পূর্বপুরুষদের অনুরোধে মাত্র।"

হাসলেন বংশগোলাপ। "সেইটাই তো মুশকিল হরিময়বাবু। প্রপিতামহ চেয়েছেন আমরা ধনী হই, কিন্তু তেমন ধনবান হবার কোনো লক্ষণ তো কোথাও দেখছি না। তবু বাধ্যবাধকতা নেই বলেই, বংশের ঊর্ধ্বতন পুরুষের ইচ্ছের কাছে নতিস্বীকার না করে উপায় নেই। সবচেয়ে মুশকিল বাধায় বংশের গৃহবধূরা। তাদের আশঙ্কা পিতৃপুরুষের ইচ্ছার সঙ্গে ঈশ্বরের নির্দেশও মিশে আছে। অমান্য করলেই বংশের ওপর আবার অকালমৃত্যুর অভিশাপ নেমে আসবে। ওই যে পরপর দু'পুরুষে দুটো অঘটন ঘটে গেলো। পিতামহের বিশ্বাস ছিল, স্বয়ং বিশ্বনাথদেবের আশ্রয়ে থাকার জন্যেই আমার জীবন রক্ষা হয়েছে। মানুষের যে কতরকম বিশ্বাস! কিন্তু কে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলবে? কে তাদের নিবৃত্ত করবে খামখেয়ালি থেকে? আমি সোজাসুজি স্বীকার করছি, একমাত্র সন্তানের মঙ্গল কামনায় আমি এই বাড়িতে ফিরে এসেছি এতোদিন পরে।"

"ব্যাপারটা সত্যিই ড্রামাটিক,' বেশ রহস্যময়। একটা খেয়ালি ব্যাপারও

বলতে পারেন,” মন্তব্য করলেন হরিময়বাবু।

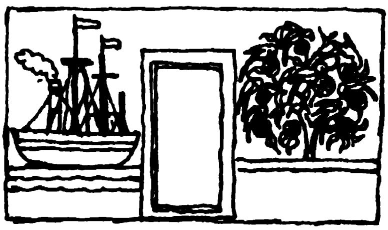
হরিময়ের মনে পড়লো, বংশগোপাল বিশ্বাসকে কিন্তু বার্ধক্যেও কখনও অলৌকিকে বিশ্বাসী অথবা অতিরিক্ত খেয়ালি মন হতো না। “তিনি যেসব কথা বলতেন. তার মধ্যে বেশ যুক্তি থাকতো।”

“তা হলে আপনিও বলছেন? স্রোতে গা ভাসিয়ে, প্রপিতামহ যেসব খেয়ালখুশির নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো মেনে চলো, তাতে তোমার যা হবার হোক।”

হরিময়বাবু উত্তর দিলেন, “আপনি বংশগোপালবাবুর দিনলিপির যে অংশটা আমাকে পড়তে দিলেন তার দ্বিতীয় পাতায় একটা ফুট নোট রয়েছে। বংশগোপাল লিখছেন—“এই শরীর, এই জীবন কি একান্তই আমার নিজস্ব? বংশের কি কোনও ভূমিকা নেই? বংশধারা তো নদীর মতো প্রবহমান। এই বংশধারার মাধ্যমেই তো মহাকালের সঙ্গে মহাদ্বন্দ্বে নিয়োজিত রয়েছে সংসারী মানুষের সমস্ত অহংকার, মৃত্যুঞ্জয়ী হবার মহাসাধ যে তার মনে।”

লেখক এখানে খুব দার্শনিক হয়ে উঠছেন। দিনলিপির এই অংশের সোজা কোনও মানে করতে পারছেন না হরিময়বাবু। কিন্তু পড়তে বেশ ভাল লাগছে।

বংশগোলাপ বললেন, “হরিময়বাবু, এ-বাড়িতে ঢুকে আমি বুঝতে পারছি এতোদিন ধরে নিজের বংশের কিছুই জানা হয়নি। আপনার সঙ্গে মাঝেমাঝে বসতে চাই হরিময়বাবু, কিন্তু আজ একটু আপসেট হয়ে আছি। মনটা একটু চঞ্চল।”



ভোরবেলা ভ্রমণ সেরে চমচম সদর দপ্তরে ফিরে এসে পিকলু দেখলো হরিময়বাবু সংসদ অ্যাংলো-বেঙ্গলি অভিধান খুব মন দিয়ে দেখছেন।

“আপসেট কথাটার মানে কি? না ওটা বাংলা হয়ে গিয়েছে?” জানতে চাইছেন হরিময়বাবু।

বই বন্ধ করে হরিময় বললেন, “মন বা হজম বিগড়ে যাওয়া! তাই হয়েছে।

৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের মালিকের—মানসিক আপসেট।"

পিকলু বললো, "রেসের যে ঘোড়া আচমকা বাজি জেতে তাকেও আপসেট হর্স বলে, হরিময়দাদা।"

"তাহলে তুমি বলতে চাইছো মানুষের পক্ষে যেটা প্রযোজ্য রেসের ঘোঁড়ার পক্ষে তা প্রযোজ্য নাও হতে পারে? এ-বিষয়েই তা হলে এবারের চমচমে সম্পাদকীয় লিখবো—ঘোটকলোক ও মনুষ্যলোক!"

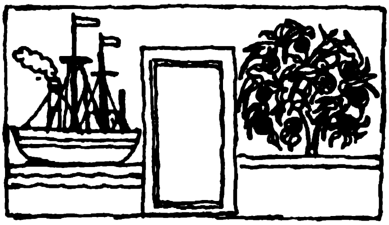
এবার পিকুলকে হরিময় বললেন, "ঘোড়াদের অনেক সুবিধে আছে, সিনিয়র ঘোটকরা অনাগত বংশধরদের জন্যে কোনও নির্দেশ লিখিতভাবে রেখে যায় না। পুওর বংশগোলাপ, একেবারে বংশউত্তাল অবস্থায় চলে এসেছেন পত্নী এবং একমাত্র পুত্রসন্তানকে ফেলে রেখে! পিতামহের মৃত্যুকালীন ইচ্ছা অনুযায়ী হাওড়া শিবপুরে বংশবাটিতে ফিরে এসেছেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। ওঁর সঙ্গে আবার একটা গোপন সিলকরা খাম ছিল! সমস্ত ব্যাপারটাই রহস্যময়! খামটা টু বি ওপেনড ইন জানুয়ারি নাইনটিন নাইনটি সেভেন ওনলি অ্যাট ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেন হওড়া।"

'প্রিয় বংশধর, তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি, জীবনে যাহাই ঘটুক, তুমি অবশ্যই আমাদের ভিটা (৪২/৩ হিদামার হালদার লেন) কোনো অবস্থাতেই কখনও পরিত্যাগ করিবে না। আমার পিতৃদেব বংশগোপাল বিশ্বাস আমাকে লিখিত নির্দেশ দিয়া গিয়াছিলেন যে প্রয়োজনবোধে আমিও পরবর্তী বংশধরদের একই নির্দেশ দিব। আমার অকালপ্রয়াত পুত্র শ্রীমান বংশবিজয়কে এই নির্দেশ দিবার সুযোগ হইতে করুণাময় ঈশ্বর আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। কিন্তু বহুকষ্টে বুকে বহু আশা লইয়া তোমাকে পুত্রসম লালন এবং পালন করিয়াছি। তাই তোমাকেই বংশের গোপন নির্দেশ পাঠাইতেছি। নির্দেশ বুঝিয়া লইয়া, পত্রপাঠ এই নির্দেশনামা নষ্ট করিয়া তুমি একই ভাষায় একই নির্দেশপত্র লিখিবে এবং এক দশক পরে পরবর্তী বংশধরকে পত্রপাঠের নির্দেশ সিলকরা খামের ভিতর রাখিবে। মনে রাখিবে, নির্দেশ অমান্য করিলে বংশবিলোপের আশঙ্কা। আরও মনে রাখিবে, একদিন আমাদের এই পরিবার পূর্বপুরুষ পূজ্যপাদ বংশগোপাল বিশ্বাসের ইচ্ছাপূরণ করিয়া প্রভূত ধনৈশ্বর্যশালী হইবে।"

চিঠিটা নিজের হাতে নকল করে, আর একটা খামে পুরে, বংশগোপাল

হরিময়ের সামনেই আবার ক্যাশবক্সে সযত্নে রেখেছেন, তারপর পিতামহের নির্দেশ মতন তাঁর লেখা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলেছেন টুকরো-টুকরো করে।

হরিময়বাবু ভাবলেন, বহু প্রজন্ম ধরে এই নির্দেশ চলে আসছে হয়তো। বড় বড় ফ্যামিলিতে কত গোপন রহস্যের ধারা এইভাবে প্রবাহিত হচ্ছে তা বাইরের মানুষ জানতে পারে না। জানা উচিতও নয়।



হিদারাম হালদার লেনের রহস্যময় বংশগোলাপ বিশ্বাস ও তাঁর পূর্বপুরু আচরণ নিয়ে শ্রীমান পিকলু অনেক মাথা ঘামিয়েছে। রহস্যটা ক্রমশ যেন ঘনীভূত হচ্ছে।

হরিময়বাবুর সামনে বসে, পিকলু তার পকেট নোটবুকটা বার করে চমচম সম্পাদককে বললো, "পটেন্ট নাম্বার ওয়ান, বিশ্বাসদের পরিবারিক রহস্য কিন্তু খুব পুরনো রহস্য নয়। বংশগোপালবাবু হাওড়ার এই সম্পত্তি কেনার পর থেকে কিছু ঘটেছিল অথবা এখনও ঘটে চলেছে। তার মানে, রহস্য সৃষ্টির সম্ভাবিত সময় ১৮৯৭ সাল। কারণ ওই বছর বংশগোপাল বিশ্বাস আচমকা বার্মা থেকে ফিরে এলেন, অকালে প্রথম সন্তান হারানোর পরে এবং ওই বছরেই হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তি কিনলেন তিনি।"

"কী যেন নাম ছিল? সব বংশ আর বংশ—নামগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে যায়," একথা লুকিয়ে রাখলেন না চমচম সম্পাদক।

তারপর নিজেই মন্তব্য করলেন, "অথচ আমরা অসহায়। বাড়িওয়ালার নাম পরিবর্তন করার অধিকার তো আইনে আমাদের দেওয়া হয়নি। অম্বুজাক্ষ্য পতিতুণ্ড নাম হলেও চমচমকে তা হাসিমুখে মেনে নিতে হতো।"

"বংশগোপালবাবুর অকালপ্রয়াত জ্যেষ্ঠসন্তানের নাম ছিল বংশমহিমা", মনে করিয়ে দিলো পিকলু।

তারপর সম্পাদকের দিকে একটা কার্ড এগিয়ে দিলো পিকলু। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির নাম সুন্দর করে পিকলু লিখে ফেলেছে, শেষে একটা নাম হরিময় ঢুকিয়ে নিতে বললেন—"শ্রীবংশগৌরব বিশ্বাস।"

শ্রীবংশগীত বিশ্বাস
শ্রীবংশগোপাল বিশ্বাস (গল্পের আদিপুরুষ)
শ্রীবংশমহিমা বিশ্বাস (অকাল প্রয়াত)
শ্রীবংশবিনয় বিশ্বাস (বারাণসীতে বসবাস)
শ্রীবংশবিজয় বিশ্বাস (দাঙ্গার সময় অকাল প্রয়াত)
শ্রীবংশগোলাপ বিশ্বাস (আমাদের নায়ক)
শ্রীবংশগৌরব বিশ্বাস (বিমানবাহিনীতে কর্মরত)

এই কার্ডখানা ভবনাথ সেনকে উপহার দেবে পিকলু। অবশ্যই এমন তালিকা থেকে একখানা জমাটি গল্পের ইঙ্গিত পেয়ে যাবেন তিনি।

"নিজেদের নিয়ে কখনোই গল্প লেখা যায় না, পিকলু" সাবধান করে দিলেন হরিময়বাবু।

"কেন যাবে না? আজকাল সবই তো হয়," তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলো পিকলু।

পিকলু বললো, "বংশগোলাপবাবুর আপসেট হবার কারণ, তিনি হাওড়ার হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তি বেচবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। একজন পুরনো লোহার ডিলার এবং এ-বাড়ির এক অংশের প্রাচীন ভাড়াটে কারনানির সঙ্গে কথাও বলছিলেন। অথচ পূর্বপুরুষ বংশগোপাল বারবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এই বংশের হাতে একদিন অনেক টাকা আসবেই। হাওড়া শহরের যত বদনামই হোক সম্পত্তির দাম ক্রমশই চড়ছে, হিদারাম হালদার লেনের জমির পরিমাণ তো কম নয়। আজকে ফিরবার সময় আবার 'পুরাতনী'র মিস্টার ভাবনানি ও তাঁর সহকারী সান্যালের সঙ্গেও দেখা হয়ে গেলো। ওঁদেরও একটা মোটরসাইকেল আছে—বিদ্যাসাগর ব্রিজে নামবার সময় সান্যালের গাড়ি ট্রাবল্ দিচ্ছিল, একটু হেল্প করলাম।"

ওই ভদ্রলোকই পিকলুকে জিজ্ঞেস করলেন "চমচম আপিস কতদিন এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনের ঠিকানায় আছে?"

"সান্যাল জানতে চাইছিলেন, চমচম পত্রিকার সঙ্গে লিজটা কীভাবে হয়েছিল? এ ব্যাপারে আমি কতটা জানি? আমি উত্তর দিলাম, এ-সব খবরাখবর নিখুঁতভাবে একমাত্র জানেন চমচম সম্পাদক। তখন লোকটা জিজ্ঞেস করলো—ইন্দারলুফট্ চৌধুরীটা কে? আমি বললাম, হরিময় এবং ইন্দ্রলুপ্ত একই লোক। মাথায় টাক পড়ে যাওয়ায় হরিময়বাবু এই সম্পাদকীয় ছদ্মনাম নিয়েছেন। আসল শব্দটা হলো ইন্দ্রলুপ্ত—মোদিলুফট অথবা লুফটহানসার সঙ্গে ওঁর কোনোরকম আত্মীয়তা নেই।"

নজর আলি লেনে সান্যালকে যখন প্রথম দেখেছিলেন তখনই লোকটাকে কারও ভাল লাগেনি। কোনও কারণ নেই, কিন্তু হরিময়বাবুর কেমন একটা বিপদ-আঘ্রাণশক্তি আছে।

ভবনাথ সেন তো কাউকে সন্দেহ হলেই সোজা হরিময়বাবুর কাছে পাঠিয়ে দেন, খুঁটিয়ে দেখে একটা দ্বিতীয় মতামত দেবার জন্যে। সেবার চলচ্চিত্র প্রযোজক ফল্গু গুহ এলেন, ভবনাথকে অনেক টাকার লোভ দেখালেন ধারাবহিক টিভি প্রোগ্রামের জন্য। কিন্তু হরিময়বাবু লোকটাকে দেখেই অস্বস্তিবোধ করলেন। হরিময়বাবুর মনোভাব জেনে ভবনাথবাবুও যথাসময়ে ফল্গু গুহকে বিদায় দিলেন। কিছুদিন পরে লোক ঠকানোর দায়ে লালবাজারে ধরা পড়ে গেলেন এই ফল্গু গুহ। ভবনাথ ওঁর সঙ্গে চুক্তিপত্র সই করলে উপন্যাসটির সর্বনাশ হতো।

সান্যাল লোকটা হিদারাম হালদার লেনে এতো সময় কাটাচ্ছে কেন? ভদ্রলোক শুধু দারোয়ান ম্যানেজার সিং-এর সঙ্গে অনেকক্ষণ গল্প করেছেন তা নয়, বিশ্বাসলজের দোতলায় খবর পাঠিয়ে বংশগোপালের সঙ্গেও দীর্ঘ সময় ধরে কথা বলেছেন। গেট দিয়ে ঢোকার মুখে হরিময়বাবু সঙ্গে সান্যালের প্রায় হেড্-অন সঙঘর্ষ!

"এই যে সান্যালবাবু, এখানে কী ব্যাপার?" একটু অবাক হয়ে সরল মনে জিজ্ঞেস করেছেন হরিময়বাবু।

সুশীতল সান্যাল আচমকা হরিময়কে দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে একবার ঢোক গিললেন। অবশেষে বললেন, "এসেছিলাম, যদি কোথাও কোনও পুরনো জিনিস সংগ্রহ করার থাকে।"

"আপনি অ্যান্টিক জিনিস কেনেন? না বেচেন?" সোজাসুজি জিজ্ঞেস করেছেন হরিময়বাবু।

"আমাদের লাইনে কেনাও যা, বেচাও তা মিস্টার চৌধুরী। স্রেফ কমিশনে কাজ আমাদের। আজকাল, কোলকাতায় শুধু পুরাতন সামগ্রী কেনার চেষ্টা করি, কারণ আমাদের অনাবাসী মালিক মিস্টার ভাবনানি বলেন, গরিবের দেশ ইন্ডিয়া, এখানে গাঁটের কড়ি ফেলে ন্যায্য মূল্যে অ্যান্টিক কেনবার লোক কোথায়? জানেন, রবিঠাকুরের একটা আংটি উনি ক্যালিফোর্নিয়ায় এক রবীন্দ্রভক্তকে দশ হাজার ডলারে বিক্রি করেছেন! এখানে কিনতে তো একশ ডলারও লাগেনি, যদিও চোরাই জিনিস। এক সুন্দরী মহিলার বিবাহে কবিগুরু নিজের হাতে

স্নেহের পাত্রীকে উপহার দিয়েছিলেন।”

হরিময়বাবু হৈ হৈ করে উঠলেন। “লেডি নগেনের একটা আংটি কিছুদিন আগে চুরি হয়ে গেলো, কাগজে দেখেছি।”

“ওই একই হলো,” বলে ফিক করে হাসলেন সুশীতল সান্যাল।

এমন লোককে আদর করে ডেকে অফিসের ভিতরে বসানোতে পিকলু মোটেই খুশি হলো না। কিন্তু হরিময়বাবু কড়া হওয়ার লোক নন।

সান্যালকে আপ্যায়ন করে হরিময় জিজ্ঞেস করলেন, “বিপ্লবীদের স্মৃতিবিজড়িত জিনিসপত্রের বাজার ইদানিং কী রকম?”

“ভাল নয়, মোটেই ভাল নয়। দাম হুড়মুড় করে পড়ে যাচ্ছে। সূর্য সেন, রাসবিহারী বসুর ব্যবহার করা জিনিসপত্তর আপনি জলের দামে পেয়ে যাবেন। তবে ইদানিং দাম বাড়ছে নেতাজির—গতমাসে চুপিচুপি একটা ফাউনটেন পেন সরিয়ে দিলাম হংকং-এ দেড় লাখ টাকায়। একটু ধরে রাখতে পারলে দাম দশ লাখে উঠবে। কিন্তু সব কিছু চুপি চুপি করতে হয় এখানে। যদি খবর যায় নেতাজীর পেন বিদেশে চলে যাচ্ছে অমনি একদল লোক হৈচৈ বাধিয়ে দেবে, গভরমেন্টও অর্ডার ইসু করে দেবে অথচ কেউ গাঁটের কড়ি ফেলে নেতাজীর পেন কিনে ভক্তি দেখাবে না।”

সান্যাল দুঃখ করলেন, “সায়েবরা কিন্তু অন্যরকম—ওদেশে যত ভক্তি, যত শ্রদ্ধা, তত দাম।

এবার ফিস ফিস করে বললেন স্যান্যাল, “ভাববেন না শুধু মাল পাচার হচ্ছে, কিছু কিছু মাল বাইরে থেকে আসছেও। নেতাজীব ব্যবহৃত চশমা। ভাবছেন নেতাজীর চশমা তার প্রমাণ কী? আছে প্রমাণ। মিচিকো টাকানাকি বলে এক মহিলার বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে নেতাজী এই চশমা ফেলে এসেছিলেন। পরেব দিন নেতাজী চিঠি লিখে টোকিওর বাড়িতে দূত পাঠালেন। মিচিকো শ্রদ্ধার সঙ্গে লিখলেন, চশমাটা তিনি স্মৃতি হিসেবে রাখতে চান, তার বদলে তিনি একটা নতুন চশমা গড়িয়ে দিতে চান। নেতাজী লিখে পাঠালেন, রেখে দাও। ভারত যেদিন স্বাধীন হবে সেদিন মিচিকো যেন দিল্লি গিয়ে ওটা জমা রেখে আসে। দু'জনের এই পত্রাবলীও চশমার সঙ্গে থাকছে, অকাট্য যুক্তি হিসেবে। তাছাড়া নেতাজীর চোখের পাওয়ার কত ছিল তার হিসেব টোকিওর এক ডাক্তারখানায় পাওয়া যাচ্ছে—দুটো হিসেব চমৎকার মিলে যাচ্ছে! ওঁর ব্যবহৃত স্পেশাল চশমা জাপান থেকে লুকিয়ে এখানে চলে এসেছে।” .

“তার মানে আপনার কাছে নেতাজীর মহামূল্যবান চশমাটি রয়েছে?” পিকলু

সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো।

"সে কথা সোজাসুজি বলতে পারবো না," এই বলে ফিক করে হাসলো সুশীতল সান্যাল। "আমরা তো নিমিত্তমাত্র, কিছু কমিশন পেয়েই আমরা সন্তুষ্ট। আমরা কিন্তু নিজের কাছে কোনোদিন কোনো অ্যান্টিক রাখতে চাই না।"

সান্যাল এবার বললো, "ভাল জিনিস যদি ধরতে চান এবং ভাল দাম যদি পেতে চান তা-হলে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের, শ্রীশ্রীসারদামণির এবং স্বামী বিবেকানন্দের ব্যক্তিগত জিনিসপত্তর এখন থেকে সংগ্রহ করুন। বেলুড় মঠের ওঁরা তো আবার সংগ্রহশালা গড়ছেন। কিন্তু কোথায় পাবেন মাল ওঁরা? সব তো এধার-ওধার হয়ে গিয়েছে। ওঁরা এখনো তো পুরাতনীর সাহায্যে চাইলেন না। ঈশ্বরবুদ্ধি হলেও অনেকসময় সংসারবুদ্ধি হয় না, মিস্টার চাউড্রি।"

সান্যাল আরও বললেন, "হাওড়া তো পুরনো জায়গা। বেলুড়েব এতো কাছে। কিছু যদি ঠাকুরের পুরনো জিনিস কারও সংগ্রহে পাওয়া যায়, ভাল প্রাইস পাবেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "আমি মশাই উটকো লোক, তারপর তো ইংরেজ তাড়াতে গিয়ে ছন্নছাড়া জীবন অতিবাহিত করেছি। প্রাণ বাঁচাতে আজ এখানে থেকেছি, কাল ওখানে। অ্যান্টিক সংগ্রহ করবো কাথা থেকে? অগ্নিযুগের লোকদের চোখে দেখেছি, গল্পও শুনেছি ওঁদের। ওঁদের পেন, ওঁদের চশমা নিয়ে তখন কে মাথা ঘামায়? ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে বসবাস করছেন তখন তো আমার পূর্বপুরুষ কলকাতা দেখেননি, বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠ তৈরি করলেন তখনও আমার দাদামশাই শিয়াখালায় কমপাউন্ডারি করেন।"

সান্যাল বললেন, "সত্যি কথাই বলবো আপনাকে। ভাবছেন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণর এবং বিবেকানন্দর জিনিসপত্তর কী করে আমাদের হাতে আসবে! মনে রাখবেন, খোদ বেলুড় মঠে একবার বড় চুরি হয়েছিল, নৌকো করে নদীর ওপার থেকে চোর এসেছিল—সে-সব জিনিস সাবধানে ভেবেচিন্তে হাত ঘোবাতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যায় মশাই। ভক্তরা যথাসর্বস্ব বেচে ওইসব জিনিস কিনে নিজের আত্মার এবং বংশের সদ্‌গতি করেন।"

সান্যালের সেকেন্ড ভিজিটিং কার্ডখানাও রেখে দিলেন হরিময়বাবু। টেলিফোন নম্বর পাল্টেছে কোম্পানির, নতুন নম্বরটা সান্যাল নিজেই লিখে দিলেন। ভদ্রলোক চলে যেতেই পিকলু কার্ডটা নিয়ে নিজে মানি ব্যাগে পুরলো। বললো, "থাক সঙ্গে, কাজে লাগতে পারে।"

পিকলু যেন রহস্যসন্ধানী ডিটেকটিভের মতন ক্রমশই একটু রহস্যময় কথা

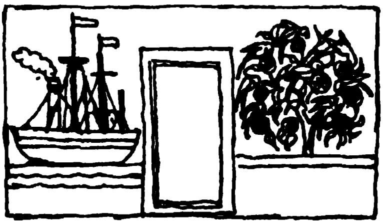
বলছে। হরিময়বাবু এইসময় তাকে ঘাঁটালেন না।

পিকলু বললো, "শেষ পর্যন্ত খারাপ লোকের পাল্লায় না পড়ে যান বংশগোলাপবাবু।"

"কেন?" হরিময়বাবু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

"না, আমার আশঙ্কা, আর কিছু নয়।" পিকলু শান্ত করতে চাইলো হরিময়বাবুকে।

হরিময় জানালেন, "অনেকখানি সম্পত্তি পড়ে রয়েছে, অথচ তার থেকে তেমন আয় নেই, মাথায় নতুন কোনো আর্থিক মতলব আসতেই পারে। তবে আমি কোনও বাধা দেব না। চমচমকে পঞ্চাশ বছর আশ্রয় দিয়েছেন এঁরা এই যথেষ্ট। শুধু আমার মুশকিল, বংশগোপালবাবু গভীর রাতে একদিন ব্যক্তিগতভাবে প্রতিশ্রুতি আদায় কবে নিযেছিলেন, কোনও পরিস্থিতিতেই, কোনওদিন চমচম এই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেন ছাড়বে না। প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ এবং প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের অনুরোধ এর মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু বংশগোপাল যখন চেয়েছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর উত্তরপুরুষরা বিশেষ বিত্তবান হবেন, তখন আমি ওই পথে বাধা হতে পারি না।"



ভবনাথ সেন গত রাত্রে পাক্ষিক সুদর্শনাতে তাঁর সুদীর্ঘ ধারাবাহিক উপন্যাসের শেষ কিস্তি রচনা করে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন।

শেষ পরিচ্ছদে ভবনাথের মন্তব্য : 'পৃথিবীতে যত কাজ আছে তার মধ্যে মেয়েদের মন জোগানো সব চেয়ে শক্ত।"

উপন্যাসের পরিণতিটা দু'রকমভাবে লিখে দশজন পাঠিকার ওপর গোপনে টেস্ট করা হয়েছে, তারপর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে নায়ক-নায়িকার মধুমিলনটাই মেনে নিয়েছেন ভবনাথ সেন। আজকালকার সুদর্শনারা জীবন থেকে নগদবিদায় চায়। আগেকার মতন দুঃখময় পরিণতি অকারণে সহ্য করতে রাজি নয় কেউ। তাদের মতে, পয়সা নিয়ে দুঃখ কেনার কোনও মানে হয় না।

আজ ঠিক সময়ে সল্ট লেকে দাদুর বাড়িতে পিকলু ও হরিময়বাবু একই

সঙ্গে হাজির। শিবপুরের বিশ্বাস পরিবারের ব্যাপারটা কেমন রহস্যময় হয়ে উঠছে। অথচ হরিময়বাবু ব্যাপারটার ওপর ঠিক গুরুত্ব দিতে চাইছেন না।

হিদারাম হালদার লেনে রাতদুপুরে এবং সাত সকালে যা ঘটছে তার বিবরণ অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য নিয়ে শুনলেন ভবনাথ সেন। একটা ছোট্ট কার্ডে তিনি কয়েকটা পয়েন্টও লিখে নিয়েছেন পিকলুর স্টাইলে। নোট করবার এই কার্ডগুলো পিকলুই তাঁকে উপহার দিয়েছে।

ভবনাথ মন্তব্য করলেন, "প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস মশায়কে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পাবা যাচ্ছে না। একদিকে তিনি পয়সা-পয়সা করছেন, অন্যদিকে স্থির বিশ্বাস করে বসে আছেন বংশে একদিন অনেক টাকা হবে। অথচ সেই একই ভদ্রলোক আমাদের চমচম পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে বসতবাটিতে নিত্য সন্ধ্যাবাতি দেবার জন্যে মাসিক পাঁচসিকে ভাড়ায় রেখে যেতে চেয়েছেন। ব্যাপারটা রহস্যময়। চমচমের প্রতি ভালবাসা রয়েছে, কিন্তু তার বাইরেও কিছু পরিকল্পনা আছে কি? আবার ভদ্রলোক জেদ ধরলেন চমচমকে অনন্তকাল এই বাড়িতে প্রায় বিনাভাড়ায় থাকতে হবে, অথচ চমচমকে বাড়িটা দান করেও গেলেন না।"

একটু ভেবে ভবনাথ বললেন, "ভদ্রলোক মরে গিয়েও নানাভাবে তাঁর বংশধরদের ভুতুড়ে নির্দেশ পাঠাচ্ছেন। বলছেন, কিছুতেই শিবপুরের এই ভিটে ছাড়া চলবে না। অথচ লোকটার মনের মধ্যে মস্ত দুঃখ ঘুমিয়ে ছিল—মাঝ রাতে ঘুমোতে পারতেন না। বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি পড়ে তো নিশ্চিত মনে হচ্ছে, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তলীলায় বংশগোপাল উপস্থিত ছিলেন। ব্যাপারটা শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং স্বামী প্রভানন্দ কারও নজরে এখনও পড়েনি। অপ্রকাশিত দিনলিপি প্রকাশ হলে হইহই কাণ্ড হবে। তবে বেলুড় মঠ এই দিনলিপির ঐতিহাসিকতা স্বীকার করে নেবে কি না তা এখনও কেউ বলতে পারে ন। এঁরা তো ঠাকুরের জীবনকাহিনী প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গের বাইরে যেতে তেমন উৎসাহী নন, এই ব্যাপারটা শঙ্করীবাবুও বুঝে গিয়েছেন। দুর্ধর্ষ ঐতহাসিক তিনি, কিন্তু ভক্ত হিসেবে শিশুর মতন দুর্বল, অসহায় এবং নির্ভরশীল।"

ভবনাথ বলে যাচ্ছেন : "আরও একটা কৌতূহলের দিক রয়েছে। বংশগোপালের ডাকনাম ললিত—এবং সর্বত্র একটু দেরিতে পৌঁছনোর জন্য ঠাকুরের মহলে কেউ কেউ তাঁকে লেট ললিত বলে ডাকতেন। লেট ললিতের ধারণা হয়েছিল, তাঁর জীবনে অথবা তাঁর বংশে যা ঘটবে তা সর্বদাই একটু লেটে

ঘটবে—এবং তার জন্যে প্রয়োজন হবে অশেষ ধৈর্যের।"

ভবনাথবাবু বললেন, "এর মধ্যে যেমন একটু হালকা দিক রয়েছে, তেমন কিছুটা বেদনাও রয়েছে। বিশ্বাসবংশে একের পর এক অকালমৃত্যু। আমার কেন যেন মনে হয়, এই বংশগোলাপবাবু নিজের ইচ্ছেয় বেনারস থেকে কিছুতেই ফিরতেন না। বংশে কোনও বিপদ হতে পারে এই আশঙ্কায় একমাত্র বংশধর শ্রীমান বংশগৌরবের মঙ্গলকামনায় পূর্বপুরুষদেওর ইচ্ছার কাছে নতিস্বীকার করে তিনি ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে ফিরেছেন।"

"সাধে কি আর ভবনাথ সেন আমাদের ভবনাথ সেন হয়েছেন। হাতে কলম এবং সেই সঙ্গে কপালে ত্রিনয়ন! আপনি কী করে বুঝলেন, বংশগোলাপ নিজের ইচ্ছেয় বেনারস থেকে হিদারাম হালদার লেনে আসেননি?"

ভবনাথ হাসলেন, "অঙ্ক, হরিময় গ্রেফ, থ্রি মাইনাস ওয়ান ইজিকলটু টু।"

পিকলু এবার দাদুর মতামত চাইছে। "ওই যে বংশগোলাপের পিতামহ বংশবিনয় পৌত্রকে লিখিত নির্দেশ দিয়েছিলেন, ওই যে ওঁর দাদু বলেছিলেন, নাইনটিন নাইনটি সেভেনে হিদারাম হালদার লেনে অবশ্যই ফিরতে হবে। এর তাৎপর্য কী হতে পারে?"

"আমি তো ভায়া ডিটেকটিভ নই, যে তড়াং করে অ্যানসার দেব। পরে একদিন তোমার মায়ের বাবার সঙ্গে এবিষয়ে কথা বলতে হবে, তিনি পুলিশের লোক, ওঁর মাথায় কোনও আইডিয়া খেলে যেতে পারে। হাজার হোক সিনিয়র আই পি এস অফিসার—পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এত বড় পোস্টে রয়েছেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "নাইনটিন নাইনটি সেভেনের তাহলে তাৎপর্য রয়েছে—সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট, স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী উৎসব বলে কথা।"

পিকলু বললো, "আমাদের মনে রাখতে হবে প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস ঊনিশশ ছেচল্লিশে দেহ রেখেছেন। তখনও দেশ স্বাধীন হয়নি। স্বাধীন হবার আগেই তিনি নিশ্চয় স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী উৎসবের সঙ্গে নিজের বংশকে জড়াতে চাননি এবং তারপরে..."

"কোনও বড় ব্যাপার ঘটেনি, এই তো? পিকলু, তোমার সঙ্গে আমি একমত," বললেন ভবনাথ সেন।

"উ-উ-প! এ দেখছি রহস্যরোমাঞ্চ কাহিনীর বাড়া, ভবনাথবাবু। কোথায় যে এর শুরু এবং কোথায় যে শেষ তা তো ঠিক বুঝছি না।" হরিময়বাবু এবার সত্যিই চিন্তিত হয়ে উঠছেন।

ওই যে ঠাকুরের কোনও এক ভক্ত বলতেন, “শুরু যখন হয়েছে তখন শেষও হবে! সুতরাং এখন আর ভেবে কোনও লাভ নেই। আমাদের দেখতে হবে, চমচম কার্যালয়ের যেন কোনও ক্ষতি না হয়।”

হরিময় বিড়বিড় করলেন, “আমার লাইফেও মনে হচ্ছে সব কিছু ঘটে বিলম্বে। বাড়িওয়ালা মারা গেলেন ফর্টি সিক্সে আর লেট করে ফল ধরছে পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে।”

“আমাকেও লোকে না লেট হরি নাম দেয়, যদিও চমচমের প্রায় কোনও সংখ্যা লেটে বেরোয়নি।”

ভবনাথবাবুব মাথা আজ ভাল খেলছে—“হরির আগে লেট কথাটা ঠিক মানায না—তোমার নাম হওয়া উচিত বিলম্ব হরি, অথবা আরও ভাল দেরি হরি।”

“তা বলা যায় স্যার! আমি মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়েছি বাহাত্তর ঘণ্টা দেরি করে। তাও যখন ডাক্তাররা ছুবি, কাঁচি এবং সাঁড়াশি টেবিলে সাজিয়ে ফেলেছেন তখন অনন্যোপায় হয়ে আমি ভূমিষ্ঠ হলাম।”

আজ অকপটে অতীত কথা স্বীকার করছেন হরিময়বাবু।

ভবনাথ সেনের একটা ফাইলের মধ্যে কিছু জেরক্স করা পাতা রেখে গেলেন হরিময়বাবু। লেট ললিত রহস্যটা সমাধান হলেও হতে পারে। “আমি নিজে এখন বিকেলে বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করি। তারপর দেখা যাক কী হয়।”

“বিকেলে ব্রেকফাস্ট হয় না, হরিমযদাদা,” প্রতিবাদ করলো পিকলু।

“হয় হয়, বিকেল তিনটেয় বিছানা থেকে উঠলে ব্রেকফাস্ট কখন হওয়া সম্ভব ভাই? এই বিলম্বিত ব্রেকফাস্টের পরে আমি ও বংশগোলাপবাবু দু'জনে হিদারাম হালদার লেনে বংশবাটির দোতলাব পারিবারিক স্টোররুমে কাগপত্র ঘাঁটি।”

“গোড়ার দিকে এ ব্যাপারে বংশগোলাপবাবুর বেশ ব্যক্তিগত আগ্রহ ছিল, এখন দেখছি তেমন আগ্রহ নেই।”

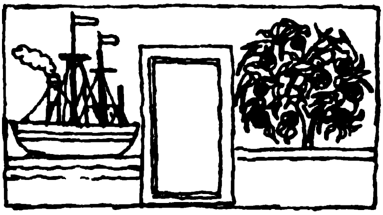
“পুরনো কাগজ কিন্তু আমাকে ভীষণ টানে। বংশগোপাল বিশ্বাসের বার্মার বিজনেস সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি—ওঁর পার্টনার ছিলেন এক বরকত আলি—সিলেটের লোক। জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পেনাং-এ নেমে পড়েছিলেন তিনি। সেখানে সুবিধে করতে না পেরে বার্মায় চলে আসেন ছোট জাহাজে। জ্যেষ্ঠ সন্তানের আকস্মিক অকালমৃত্যুর পরে এঁর কাছেই বংশগোপাল তাঁর বার্মার বিজনেস বিক্রি করে দেন, যদিও ভদ্রলোক প্রায়ই বংশগোপালকে

লিখতেন, দাদা আপনি ফিরে আসুন। দু'ভাই মিলে আবার ব্যবসা করি। কিন্তু প্রথম সন্তানকে অকালে হারিয়ে বংশগোপালের মাথার তখন ঠিক ছিল না।"

বার্মা পেপারস-এর মধ্যে অদ্ভুত কয়েকটা কাগজ পাওয়া গিয়েছে খুব সম্ভবত বংশগোপালের প্রথম সন্তানের অকালমৃত্যুর পরে কোনও সময়ে লেখা।

এই কাগজটাই সযত্নে জেরক্স করেছেন হরিময়বাবু। অদ্ভুত এই সৃষ্টি। জওহরলাল নেহরু একবার মার্কিন রাষ্ট্রদূত অধ্যাপক গলব্রেথকে প্রশ্ন করেছিলেন, বিজ্ঞানের সবচেয়ে সুদূরপ্রসারী দান কোনটা? তারপর নিজেই বলেছিলেন—বাইসাইকেল এবং ইলেকট্রিক বাল্‌বের মতন অন্য কোনো আবিষ্কারই মানুষের এতো কাজে লাগেনি। হবিময়বাবু তার সঙ্গে যোগ করলেন, টেলিফোন আর জেরক্স।

"নকলনবিশি ব্যাপারটা একেবারে হায়েস্ট লেভেলে উঠে গেলো। পাণ্ডিত্যের অন্য মানে হয়ে গেলো।" সাধে কী আর চমচম আপিসে ক্যানন কপিয়ার বসিয়েছেন হরিময়বাবু।



নিজের পাড়ার টেবিলে অনেকক্ষণ বসে আছেন ভবনাথ সেন। বংশগোপাল বিশ্বাস চরিত্রটা ক্রমশ তাঁর ঘাড়েও চেপে বসেছে।

বংশগোপালের লেখার হাত ভালই ছিল, কিন্তু নিয়মিত দিনলিপি লেখেননি। মাঝে-মাঝে কলম ধরেছেন। কখনও লেটার প্যাড, কখনও হিসেব খাতায়, কখনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডায়েরিতে। কোথাও বেশ স্বচ্ছতা, আবার কোথাও রহস্যময় দৃষ্টিপাত।

সবচেয়ে যা আশ্চর্য কোথাও শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম স্পষ্টভাবে লেখা নেই—অথচ শেষদিনের যে ইতিবৃত্ত ভবনাথ আগে পড়েছেন তা যে রামকৃষ্ণদেব ছাড়া আর কারুর হতে পারে না, এ বিষয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসু এবং ছটকো হালদারের মনে কোনও সন্দেহ নেই।

হুটকো তো আনন্দে আটখানা। সম্প্রতি একটি অকালপক্ক মার্কিনী ছোঁড়া বহু নোংরা ঘেঁটে ঠাকুরের মানসিকতা সম্বন্ধে বহু কাদা ছড়িয়েছে। এই ছোঁড়াটি নতুন পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার সম্বন্ধে কী বলে তা জনতে পারলে মন্দ হতো না। স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়সুখের চশমা পরে ভোগে ডুবে আছে পশ্চিমি সভ্যতা। শরীরের দাবির বাইরে তারা অন্য কিছুর উপস্থিতি স্বীকার করতে চায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ আর একবার সুস্থ শরীরে ফিরে এলে হয়তো এর কিছু বিহিত করা যেতো। ইতিমধ্যে সায়েবরা এবং আধাসায়েবরা এদেশে চেলাচামুণ্ডা জোটাচ্ছে নন্দীভৃঙ্গী টাইপ নৃত্যের জন্য। এঁরাও বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা এঁটে ঠাকুরের গায়ে, স্বামীজির গায়ে নর্দমার পাঁক ছেটাতে কম উৎসাহী নন। এদেশের সন্ন্যাসী সঙ্ঘের অশেষ ধৈর্য। তাঁরা এসব মুখ বুজে সহ্য করতেই যেন অভ্যস্ত। সে কথা অবশ্য এইসব নিন্দুকরা ভালভাবেই জানেন এবং তার পুরো সুযোগ নিয়ে নন্দীভৃঙ্গীরা মাঝে মাঝে তাণ্ডবনৃত্য চালাচ্ছেন। ষোলো আনায় এঁরা সন্তুষ্ট নন, এঁরা চান আঠারো আনা।

আঠারো আনা কথাটা কি আজকাল লোকে বুঝবে? ভাবলেন ভবনাথ। টাকা আনা পাই উঠে গিয়ে বাংলা ভাষা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছে—আগে কত কি মজার জিনিস ছিল আমাদের শব্দভাণ্ডারে—কড়া, ক্রান্তি, এখন স্রেফ পয়সা। আঠারো আনার জায়গায় একশ বারো ভাগ বললে ব্যাপারটা জমে না। জয় হোক আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ী টাকা আনা পাইয়ের।

রাতের গভীরে বিছানায় আধশোওয়া অবস্থায় ভবনাথ একমনে পড়তে শুরু করলেন বংশগোপাল বিশ্বাসের আত্মকথা।

কবে কোন্ তারিখে বার্মার কোন শহরের কোন বাড়িতে বসে শতাব্দীরও আগে এই বাংলা লেখা রচিত হয়েছে তা ভবনাথ বুঝতে পারলেন না। তবু পুরনো দিনের পাণ্ডুলিপি পড়তে এই বয়সেও রোমাঞ্চ হয় ভবনাথের। কোন্ মানুষের কোন্ কথা কার জন্যে কালের ইশারা অগ্রাহ্য করে লিপির আড়ালে আজও বেঁচে রয়েছে কে জানে?

ভবনাথ আপন মনে পড়া শুরু করলেন বংশগোপাল বিশ্বাসের আত্মকথা :

"এখন মধ্যরাত। আমার স্ত্রী মনোরমা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। স্বভাবতই আমার চোখে অনিদ্রা—এই রাতের ঘুম আমি নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই কয়েকবছর আগে বিসর্জন দিয়েছি। যিনি আমার নিদ্রাহরণ করেছেন এখন তাঁকে দোষ দিয়ে কোনও লাভ নেই।

আজ একটু বিলম্বে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম, ফলে প্রথম রাত্রে নিদ্রার পরিমাণও বেশ কম। আসলে বিলম্ব আমার অস্তিত্বে, আমার সমস্ত সত্তায়, না হলে নরেন্দ্র কেন আমার লেট ললিত নামকরণ করবে?

প্রলম্বিত এবং বিলম্বিত জীবনের দুঃখ অনেক। আমি এই বিলম্বের মাশুল ও জরিমানা গুনতে অভ্যস্ত, কিন্তু তার বোঝা যে এমন বিপুল, সুদ যে এমন অবাস্তব তা তো জানা ছিল না যেদিন শ্যামপুকুর স্ট্রিটে আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কয়েকন বিচিত্র মানুষকে চলমান দেখতে পেলাম। তখন আইন অনুযায়ী আমি সাবালক হয়েছি, কিন্তু নাবালকত্বের মানসিকতা সম্পূর্ণ ঘোচেনি। এনট্রান্স পাস করে আমি মতিশীল কলেজের ছাত্র বংশগোপাল কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। পিতা বংশগীত বিশ্বাস, রেলের কেরানি, জননী সৌদামিনী।

৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রিটে গোকুল ভট্টাচার্য মশায়ের বাড়ির দোতলায় নতুন ভাড়াটিয়া এসেছে। এবাড়ির কেউ বেশ অসুস্থ—কোনও জবর অসুখ নিশ্চয়, না হলে এতো লোকের উদ্বেগ কেন? একদিন অক্টোবরের সকালে বাড়ির দোতলায় উঠে গিয়ে অসুস্থ মানুষটিকে দেখলাম। ধুতিটি পরা, অবারিত দেহ, দেওয়ালে একটা ছবি কেমন করে টাঙাতে হবে দেখিয়ে দিচ্ছেন কাউকে।

বেশ মনে আছে এক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনার জন্য মাখন-মারা ঘি আনবো?"

তিনি বললেন, "তা এনো।"

লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "স্নানপিঁড়ি আনবো?"

তিনি বললেন, "না না।"

কিছু পরে ওষুধ খাওয়ানোর সময়। এক হিন্দুস্থানি সেবক ওষুধ দেওয়ার আয়োজন করায় তিনি বললেন, "রোগ সারবে কি-না সে খোঁজ নেই, শুধু বলে ওষুধ খাও। ও ওষুধ আমি খাবো না।"

আমি নিজেও শ্যামপুকুরের বাড়িতে তেতো ওষুধ খাবার সময় অমন করি। বুঝলাম, মানুষ ও মহামানুষ এক।

আরও একদিন ৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর স্ট্রীটের দোতলায় অনধিকার প্রবেশ করেছি। পাসকরা কোনও বড় ডাক্তার এসেছেন, তিনি রোগী পরীক্ষা করে কাগজে ওষুধ লিখছেন। তিনি এই ডাক্তারকে বললেন, "আরক ওষুধে বাহ্যে হাওয়াতে দুর্গাচরণ ডাক্তার বলেছিল, ঐ আপনার ধাত।"

বিকেলে কিছু ভিড়। ধীরুবাবু বলে গৌরকান্তি একটু মোটা ভদ্রলোক তাঁকে কারও সম্বন্ধে কিছু বলছেন: "মহিন্দরবাবু এত ভক্ত, তবু তাঁর দশ বছরের ছেলে

মারা গেলো, তাঁর স্ত্রীর মাথায় গণ্ডগোল।"

তিনি মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু কিছু বললেন না, শুধু নীরবে মহিন্দরবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

পরে আরেকদিন এই লোকটিকে তিনি বলেছিলেন, "নাপতে কাল চাই, কাল শুক্রবার।" নিজের অসুখের কথায় বললেন, "টন্‌টন্‌—দুধে কি বেশি বাড়ে বলে?"

আর একদিন সন্ধ্যায় তাঁকে দেখতে বড় ডাক্তার এসেছেন। আমি দোতলায় উঠে গিয়ে উঁকি মেরেছিলাম। দেখলাম রোগী পরম উৎসাহে ডাক্তারদেরই চিকিৎসা করছেন। বলছেন, "কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা যদি একেবারে চলে যায়, তাহলে ঠিক বুঝতে পারা যায় যে দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা। নারকেলের জল সব শুকিয়ে গেলে মালা আলাদা, শাঁস আলাদা হয়ে যায়।"

আরও চিকিৎসা চললো, তবে রোগীর নয়, ডাক্তারের। তিনি সোজাসুজি ডাক্তারকে বললেন, "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ আপনাদের পক্ষে নয়।...সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। ...টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ...কিন্তু তোমরা জানবে যে টাকাতে ডাল ভাত হয়, পরবার কাপড়, থাকবার একটি স্থান হয়, ঠাকুর সেবা—সাধু ভক্তের সেবা হয়।"

এরপর তিনি স্পষ্ট কথায় বললেন, জমাবার চেষ্টা মিথ্যা। অনেক কষ্টে মৌমাছি চাক তৈয়ার করে—আরেকজন এসে ভেঙে নিয়ে যায়।"

তিনি যাই বলুন, টাকা কিন্তু আমার ভীষণ ভাল লাগে। টাকা থাকলে ভীষণ সুখ, ভীষণ স্বস্তি। সব মৌচাকই বা অন্যের হাতে ভাঙা পড়বে কেন? এ-প্রশ্ন অবশ্য তাঁকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করবার কখনও সুযোগ পাইনি। তিনি যা বলেছেন তা যদি সত্যি হতো, তা-হলে কলকাতা শহরে এতো ধনী পরিবার থাকতো না। তিনি কি রামদুলাল সরকারের পরিবার, মতি শীলের ট্রাস্টের কথা শোনেননি? যারা বুদ্ধিমান তারা ধনী হবার পর বিচক্ষণও হয়। আমিও তাই হবো। তখন তিনি আমার যুক্তি বুঝতে পারবেন। আমাকে অবশ্যই তখন ভালবাসবেন, আশীর্বাদ করবেন।

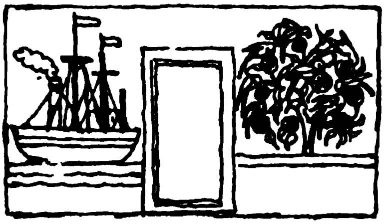
আরও একদিন সকাল এগারোটা নাগাদ এক অদ্ভুতবেশী খ্রিস্টান পাদ্রিকে দেখেছিলাম শ্যামপুকুরে। যদিও সাহেবের পোশাক, ভিতরে গেরুয়া। পরে শুনেছি, ভাইয়ের বিয়ের দিনে সামিয়ানা চাপা পড়ে দু'ভাইয়ের মৃত্যু হয়েছিল। সেদিন থেকে এই মিশ্রজি সংসার ত্যাগ করেন। তিনি হঠাৎ এই ভক্তকে বললেন, "এক রাম, তাঁর হাজার নাম। খ্রিস্টানরা যাঁকে গড বলে, হিন্দুরা তাঁকেই রাম,

কৃষ্ণ, ঈশ্বর—এই সব বলে।”

আরও একদিন, কৃষ্ণাদ্বাদশীর সন্ধ্যা। ডাক্তার পরিবর্তনের আশঙ্কা অনুমান করে তিনি বেশ আপত্তি জানালেন। “রাজবৈদ্যর পর হাতুড়ে!” তাতেও মন ভরলো না বোধ হয়, তিনি আরও বললেন, “এযেন মুণ্ডী পায়েসের পর ডাঁটা চচ্চড়ি!”

কিন্তু তাঁর রোগ বাড়তির দিকে। শুনলাম, কাশীপুরে আরও খোলামেলা একটা বাড়ির ব্যবস্থা হয়েছে। শ্যামপুকুরে শায়িত অবস্থায় তিনি শুনলেন, ঐ বাগানবাড়ির ভাড়া মাসিক আশি টাকা।

ভাড়ার পরিমাণ শুনে ডিসেম্বরের সেই সন্ধ্যায় তিনি আঁতকে উঠলেন। “আমার জন্যে আশি টাকার বাড়িতে কাজ নেই বাপু—যা থাকে কপালে, বরঞ্চ দক্ষিণেশ্বরেই চলে যাই।” পরের দিন বোধ হয় শুক্রবার, ঘোড়ার গাড়িতে চেপে আমার সামনে দিয়ে তাঁর চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু আমি লেট ললিত। যখন মতি শীলের কাজ সেরে নিজের বাড়ি ফিরলাম তখন তিনি আর আমার শ্যামপুকুরের পড়শি নেই।”



দিনলিপির এই পর্যন্ত পড়ে ভবনাথ সেন বিস্ময়ে আবিষ্ট। দিনলিপিটি পাশে রেখে তিনি ভাবলেন, অন্ত্যলীলার অন্য বিবরণগুলি কোনও বই থেকে বার করে মিলিয়ে নেবেন। পরে মনে হলো, প্রয়োজন নেই। লেখাটার একটা কপি করে বরুণ মহারাজের কাছে বেলুড় মঠে পাঠিয়ে দিলেই চলবে। তিনি তো অতি যত্নে, অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে ঠাকুরের শেষ ক'দিনের সমস্ত বিবরণ একত্রিত করেছেন। বরুণ মহারাজের মতামত পেলেই মনটা শান্ত হবে ভবনাথের।

ভবনাথ সেনের মশারি টাঙাতে এসে পিকলুর ঠাকুমাকে ফিরে যেতে হলো। লেখার মধ্যে মজে রয়েছেন তিনি।

স্ত্রীকে ভবনাথ বললেন, “মশা দু-একটা আসে আসুক, কিন্তু ইতিহাসের কী রসিকতা দেখো। দু-একটা ঐতিহাসিক চরিত্রকে বেমালুম গাপ করে দিয়ে আবার

যথাসময়ে উগরে দিতে পারে। লেট ললিতের নাম ভক্তদের মুখে মুখে ফিরতে পারতো, কিন্তু এযুগে আমরা কেউ তাঁর নামই শুনিনি।"

লেটললিত সুরসিক। মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। যেমন ঠাকুর নিজেকে 'মূর্খোত্তম' বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও তাঁর হাতেলেখা পুঁথি স্বামী সারদানন্দ নিজের চোখে দেখেছেন। গদাধরের আরেকটি নাম ছিল তা ভবনাথের খেয়াল ছিল না। 'শম্ভুরাম" নামটি বংশগোপাল কয়েকবার ব্যবহার করেছেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার গল্পও বংশগোপাল শুনেছেন শ্যামপুকুরের বাড়িতে। তখন তাঁর বয়স মাত্র ঊনিশ। সেদিন মন্দিরের প্রসাদ গ্রহণ না করে দোকান থেকে একপয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনে খেয়ে একলা বাড়িতে ফিরে যান।

লেট ললিত ঠাকুরের সর্বধর্ম অভিজ্ঞতার গল্পও কিছু কিছু শুনেছেন। যেমন সুফী গোবিন্দরায়ের কাছ থেকে আল্লামন্ত্র গ্রহণ করে তিনি মাত্র তিনদিনের চেষ্টায় ইসলাম ধর্মীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

আরও একটা ব্যাপার ভবনাথের জানা ছিল না, লেট ললিতের দিনলিপিতে স্পষ্ট হলো। তাঁর গায়ের রঙ ছিল উজ্জ্বল গৌর, ঈষৎ তোতলা ছিলেন। শুধু টাকা স্পর্শ করতে পারতেন না তা নয়, কাপড়ের গিরোও বাঁধতে পারতেন না। সবচেয়ে যা আশ্চর্য, তিনি গুরুগিরি মোটেই পছন্দ করতেন না। আনুষ্ঠানিকভাবে কাউকে কখনও দীক্ষিত করেননি। নিজেই ভক্তদের বলেছেন, "আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপতাপ নিতে হয়।"

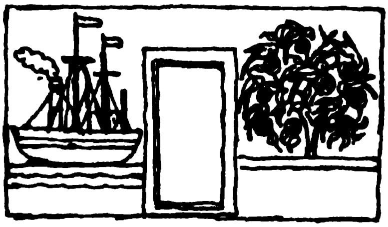
লেখাটা আরও একটু পড়ে নিয়ে ভবনাথবাবু বললেন, "লেট ললিত ইতিহাসের খুব কাছাকাছি রয়েছেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে মহা আন্দোলনে সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়বার সাহস তাঁর নেই। একটু নজরে পড়লে ঠাকুর হয়তো এই ললিতকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুপ্রেরণা দেখিয়ে দিতেন মোহমুক্তির সহজ সরল পথ।"

এরপর গিন্নিকে ভবনাথ বললেন, "খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বংশগোপাল বিশ্বাসের পাণ্ডুলিপিটা পড়তে হবে ; একটু সময় লাগতে পারে। মশারি থাক, ওডোমস আনো, একটু পায়ে মেখে নিই মহিলা অ্যানোফিলিস মশাদের খপ্পরে না পড়বার জন্যে। পুরুষ মশা কামড়ালে যন্ত্রণা হয়, কিন্তু ম্যালেরিয়া ধরে না!"

ভবনাথ লক্ষ্য করলেন, বংশগোপালের হাতের লেখা বেশ পরিণত। বাংলা তো বেশ ঝরঝরে। সেই যুগেও চলতি বাংলাটা ভালই আয়ত্ত করেছিলেন ভদ্রলোক।

আন্দাজ করা যাচ্ছে এইসব দিনলিপি প্রকাশের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা লেখকের ছিল

না, থাকলে দিনলিপিটি তিনি অবশ্যই সাধু ভাষায় রচনা করতেন। মনে রাখতে হবে দিনলিপি রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেঁচে রয়েছেন, বিদ্যাসাগরও তখনও বহাল তবিয়ত। তাঁর মৃত্যু বোধহয় ১৮৯১ সালে।



ভবনাথ আবার বংশগোপালের শতাব্দীপ্রাচীন দিনলিপি রসিয়ে রসিয়ে পাঠ করতে লাগলেন।

"সর্ব বিষয়েই আমি লেট। আমার লেট ললিত নাম মিথ্যা নয়, কারণ শ্যামপুকুর থেকে তাঁর বিদায়কালে আমি সেখানে উপস্থিত থাকলাম না, আমি এবারও লেট।

শ্যামপুকুরে ফিরে রাজপথে ঘুরতে ঘুরতে পুরনো রাস্তার ওপরে আর তাঁর এক ভক্তর সঙ্গে দেখা হলো। শুনলাম, ডাক্তারের পরামর্শে আবার এই স্থান পরিবর্তন। তাঁর দক্ষিণেশ্বরেই ফিরে যাওয়ার বিশেষ ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ উৎসাহ দেখানো তো দূরের কথা, অসহযোগিতা করেছেন। ফিরে যাবার অনুমতি আসেনি। দক্ষিণেশ্বর জনসাধারণের সম্পত্তি নয়, পারিবারিক মন্দির। ওয়ারিশনরা ইচ্ছামতো ঠিক করতে পারেন কে সেখানে থাকবে, কে থাকবে না।

মাস মাস আশি টাকা ভাড়া কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাই গোপাল ঘোষের বাগানবাড়ির। ভক্তদের মধ্যে চাঁদা তোলার কথা উঠছিল। আমি সামান্য লোক, রোজগার নেই। কোথা থেকে চাঁদা দেবো? খবর পেয়ে তিনি নাকি শেষ পর্যন্ত ধনী ভক্ত সুরেন্দ্রকে ডেকে বলেছেন, "দেখ সুরেন্দর, এরা সব কেরানি-মেরানি ছাপাষো লোক, এরা এতো টাকা চাঁদা তুলতে পারবে কেন...বাড়ি ভাড়ার টাকাটা তুমিই দিও।"

একদিন খুঁজে খুঁজে কাশীপুরের উদ্যান বাড়িটা দেখে এসেছি। ৯০ নম্বর কাশীপুর রোডে প্রাসোদোপম অট্টালিকা। দোতলায় রোগজীর্ণ শরীর নিয়ে তিনি শায়িত। কাশীপুরে প্রচুর মশা।·একটা মশারি টাঙানো।

আমি যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম তখন একজনকে তিনি বলছেন, "কাশি কফ, বুকের টান এসব নেই। তবে পেট গরম। ঘরেই পায়খানার ব্যবস্থা করতে হবে। বাইরে যেতে পারবো বলে মনে হয় না।"

এখানে তাঁর সেবকের অভাব নেই। একজন আধাবাংলা আধা হিন্দিতে বলে উঠলো: "যে আজ্ঞে মশাই, আমি তো আপনার মেথর হাজির আছি।" শুনলাম, আমাশয়ের পুরনো রোগ তাঁর, পেটের এ রোগ সারে না।

যতদূর মনে পড়ে, নরেন্দ্র ঐ সময় আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ফলে নিয়মিত যাতায়াত ও সেবাশুশ্রূষায় বাধা পড়ছিল। শেষে বইপত্তর নিয়ে নরেন্দ্র হাজির হলো কাশীপুরে—পড়াশোনা চলতে লাগলো একতলায়। অনেক সময় পড়ার চাপে ওপরে তাঁকে দেখতে যাওয়া হতো না। তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। একদিন নরেন ওপরে উঠেছেন, ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কেন আমার কাছে আসিসনি? নরেন বললো, 'আইন পরীক্ষা দিচ্ছি।' তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'দ্যাখ তুই যদি উকিল হ'স তাহলে তোর হাতের জল আমি খেতে পারব না।' এই কথা শুনে নরেন আর পরীক্ষায় বসলো না।

সেদিন শ্যামপুকুরে বাড়ি ফেরার জরুরি টান ছিল। আমার ভাবী শ্বশুরমশায় খোঁজ-খবর করতে আসবেন শ্যামপুকুরে। রোজগার নেই, পাতি নেই, কিন্তু প্রবল বিবাহ সম্ভাবনা! জন্মমৃত্যুবিবাহের সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে কর্মের বা উপাজর্নের কোনও সম্পর্ক এদেশে নেই। তবু গৃহী মানুষের সুখের সংসারের জন্যে টাকা তো চাই—ধনী হওয়া ছাড়া কলিকালের মানবজন্ম বৃথা। এই নির্মম সত্যটুকু অসুস্থ মানুষটি কেন বোঝেন না?

কয়েক সপ্তাহ কাশীপুরের কোনও খোঁজখবর নেওয়া হয়নি। সোমবার, ১৪ পৌষ হঠাৎ আমার টনক নড়লো। তাঁর খবরাখবর নেওয়ার ইচ্ছে প্রবল হলো। ওখানে ভক্তজনের অভাব নেই। কিন্তু আমি চাঁদা দিই না, সংসারত্যাগের চিন্তা করি না, আমাকে কেউ তেমন পাত্তা দেয় না, নরেন্দ্র ছাড়া। তাকে আমার ভীষণ ভাল লাগে। সে আমার মনের মানুষ। কিন্তু তারও হাজার রকম দুঃখ।

শীতের পড়ন্ত অপরাহ্ণে কয়েকজন ভক্ত কাশীপুর উদ্যানবাটির প্রাঙ্গণে গল্পগুজবে ব্যস্ত। আলোচনাব মধ্যমণিকে যেন থিয়েটারে একবার দেখেছি। স্টেজে গিরিশ দর্শনে টাকা লাগে, এখানে ফ্রি। এঁরা প্রতাপ হাজরাকে নিয়ে রসরসিকতা করছেন। হাজরা নাকি ঠাকুরের দেশের লোক, নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা—নরেন্দ্রর ষোল আনা সত্ত্বগুণের তুলনায় হাজরার নাকি আঠারো

আনা এবং তাঁর মাত্র বার আনা—'এই হচ্ছে লালচে মারছে।' এই হাজরা আবার নরেন্দ্রের 'ফেরেন্ড'!

কে যেন ফাঁস করলো, তিনি নাকি হাজরার সম্পর্কে নিজেই মন্তব্য করেছেন। "দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করতো, আবার ওরই ভিতর থেকে দালালির চেষ্টা করতো, বাড়িতে কয়েক হাজার টাকা দেনা আছে সেই দেনা শুধতে হবে।"

প্রতাপ হাজরার চরিত্রটি আমার মোটেই খারাপ লাগছে না। মানুষকে তো টাকা রোজগার করতে হবেই। সবাই তো বলরাম বসুর মতন টাকার বিছানায় জন্মগ্রহণ করে না। সবাই তো রাম দত্তর মতন মেডিক্যাল কলেজে বসে বিদ্যে ভাঙাতে পারে না।

আরও একদিন অবাক কাণ্ড। রোহিণী রোগ কি সংক্রামক। ভক্তদের মধ্যে যাঁরা সেবা করছেন তাঁদের মনে হঠাৎ সন্দেহ ঢুকেছে, কেউ কেউ একটু ভীত হয়ে পড়েছেন। সেবকদের মনোভাব বুঝতে পেরে নরেন নিজেই একদিন গলারোগের প্রক্ষিপ্ত পুঁজ-রক্তের কিছু অংশ সকলের সামনে পান করলেন। তাঁর দেখা দেখি নিরঞ্জন, শশী ও শরৎ অবশিষ্ট অংশ পান করলেন।

আর একদিন আমি চুপি চুপি কাশীপুর উদ্যানবাটির উপরে উঠে গিয়েছিলাম। বুড়োগোপাল তাঁকে ওষুধ দিচ্ছিলেন। কবিরাজি ওষুধের নাম নাকি হরিতালভস্ম। তাঁকে গয়ার ফেলতে বারণ করলেন সেবক বুড়োগোপাল। ক্লান্তভাবে তিনি বললেন, "একটা জানালা খুলে দাও।"

ওষুধ খেয়ে তিনি এবার কথা বলতে লাগলেন। রুজিরোজগারের কথা। আমি জানতাম না এসব। তিনি বলছেন, "কম বয়সে দেশে ছোট ঠাকুর গড়তাম, আবার পাঁচ আনা ছয় আনা দামে বিক্রি করতাম।" হিন্দুস্থানী লোকটি বললো, "চৈতন্য মহাপ্রভুও নিজে বাজার করতেন, থোড় কিনতেন।" তিনি বললেন, "আবার ছবি আঁকতুম, পুতুল গড়তুম। কলসুদ্ধ হাত পা নড়ছে এইসব।" তিনি আমাকে অবাক করে দিলেন, গোপালকে বললেন, "আবার ইটের কাজও জানতুম।"

ফেরার পথে সেদিন নরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অতি উৎসাহে তিনি বলেছিলেন, "কাল ইংরিজি নববর্ষ, সকাল-সকাল এসো। সকালের দিকেই ওঁর শরীরটা একটু ভাল থাকে।"

সকাল সকাল এসো। কিন্তু আমি তো লেট ললিত! ১লা জানুয়ারি ১৮৮৬ শুক্রবার কী অঘটন ঘটে গেলো কাশীপুরে, আমি আগাম খবর পেয়েও সুযোগের সদ্ব্যবহার করলাম না।

আমি তখনও নিজের খেয়ালে চলেছি। অর্থ উপার্জনের আশায় কিছু তালপাতার টুপি এবং বাঁশি বিক্রি করেছি কাশীপুরেই এক চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে। মনে পড়লো, তাঁর নতুন বাসস্থানের কাছে একটা মদের দোকানও আছে। সেখানেও আজ নববর্ষে তালপাতার টুপি পরে বাঁশি বাজাবার খরিদ্দার পাওয়া যেতে পারে! অতএব সুযোগসন্ধানী আমি সেদিকে এগোলাম।

আমার বিক্রি এবং লাভ আজ ভালই হচ্ছে—অর্থের পুরোপুরি নেশা আমাকে চেপে ধরেছে।

যে ক'টা বাঁশি ও টুপি কিনে এনেছিলাম সব শেষ। আমি তাড়াতাড়ি ছুটেছি শ্যামবাজারে, দ্বিতীয়বার পাইকিরি হারে টুপি এবং বাঁশি কেনবার জন্যে। কলকাতার রাস্তায় সত্যিই টাকা উড়ছে, ধরতে জানলেই হলো। দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্ণ এলো। কিন্তু বিক্রির বিরাম নেই। নগদ পয়সা এলে খাওয়াদাওয়ার টানও সাময়িক বন্ধ থাকে। আমি বিক্রিতে বুঁদ হয়ে আছি।

সেই সময় কাশীপুরের উদ্যানবাটির পাচক গাঙ্গুলি মশাইকে মদের দোকানের সামনে দিয়ে দ্রুতপদে যেতে দেখলাম। লোকটির পুরো নাম আমি জানি না। তিনিই খবরটা দিলেন।

"এখানে কী করছেন ললিতবাবু? ও বাড়িতে যান। ভীষণ কাণ্ড চলেছে। হরির লুট বলতে পারেন—যে যা চাইছে কর্তা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকেই তা দিয়ে দিচ্ছেন। আমি চলেছি আমার ছোট ছেলেটার খোঁজে। ওকে পাকড়াও করে এনে একবার ওঁর সামনে বসিয়ে দিতে পারলে একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

কল্পতরু কথাটা সেই প্রথম শুনলাম। ভালমন্দ যে যা প্রার্থনা করে কল্পতরু তাকেই নির্দ্বিধায় তা দেয়। কী চাইতে হবে তা কিন্তু কেউ বলে দেবে না, সে দায়িত্ব তোমার নিজের।

পাচক গাঙ্গুলিমশাই তাঁর ছোটছেলেকে নিয়ে উদ্যানবাটিতে ফেরবার পথে আমাকে বিক্রিতে ব্যস্ত দেখে বললেন, "এখনও লেট করছেন!" গাঙ্গুলি জানে না, আমার ডাকনাম লেট ললিতা লেট করাই আমার ধর্ম!

আমি বললুম, "টুপি ও বাঁশি বিক্রির স্টক প্রায় শেষ। আর তিনটে মাতাল ধরে কিছু গছিয়ে দিতে পারলেই টুপির স্টক শেষ হবে।" আমার মাথায় আসলো না, উদ্যানবাটিযোঁরা আজ তাঁক দেখতে আসবেন তাঁদের মধ্যে গিরিশবাবু এবং তাঁর ভাই অতুলবাবু থাকবেন। এঁদের খেয়াল চাপলে সমস্ত টুপি কিনিয়ে দিয়ে হয়তো তাঁকেও পরানো যেতো। আমার আনা টুপি পরে তাঁর আনন্দমেলা! সে এক অদ্ভুত দৃশ্য হতো, ভাবা যায় না।

গাঙ্গুলি পাচক সবটা জানেন না। তিনি বললেন, "তিনি আজ বেশ সুস্থ বোধ করায় নিজেই উদ্যানবাটির বাগানে বেড়াবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পতিতপাবন হয়ে আজ যে যা চাইবে তাকে তাই দেবেন তিনি।"

গাঙ্গুলি পরম উৎসাহে আরও জানালো, বাড়ির দোতলায় দেবেন মজুমদারের মামা হরিশ মুস্তাফি উঠেছিলেন দর্শনের জন্য। তিনি কাছে ডেকে শ্রীচরণ দিয়ে হরিশের বক্ষ স্পর্শ করেছেন। দিব্যস্পর্শে সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! বিকেল বেলায় তিনি নীচে নেমেছেন এবং ছেলের খোঁজে বেরিয়ে আসবার পথে গাঙ্গুলি পাচক দেখেছেন, জন তিরিশেক ভক্ত বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করছে।

তাঁকে আজ বড়ই সুন্দর দেখাচ্ছে। গায়ে সবুজ বনাতের জামা, লালপেড়ে ধুতি, সবুজ কাপড়ের টুপিতে কান পর্যন্ত ঢাকা। পায়ে মোজা পরেছেন তিনি, আর লতাপাতা আঁকা চটিজুতো। তাঁর জুতোর শখ অনেক দিনের।

বোঝা গেলো, তাঁর সঙ্গে গিরিশের বিরাট কিছু একটা আদানপ্রদান হয়ে গিয়েছে। কারণ বাংলার সেক্সপীয়র গিরিশ শিশুর মতন কাঁদছেন অভাবনীয় কোনো আশীর্বাদ পেয়ে।

তারপর হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে। রামচন্দ্র দত্ত ব্যস্ত হয়ে তাঁর প্রিয়জনদের ডাকাডাকি শুরু করেছেন।

ভিড়ের মধ্যে উপেনকেও দেখা দিয়েছে, সেই উপেন মুখুজ্যে যে ধনী হতে চাইছে অনেকদিন থেকে, বটতলায় একটা বইয়ের দোকান করেছে, কিন্তু তেমন চলে না। তার আগে শিশিবোতল ধুয়ে উপেন জীবিকানির্বাহ করতো। উপীন পরে বসুমতী প্রকাশ করে মহাধনী হয়েছে।

দ্রুত খবর দিয়ে গাঙ্গুলি এবার ছুটলো তার রন্নাঘরের দিকে। আর আমি বোকার মতন আরও বিক্রির জন্যে আরও লেট করলাম। উদ্যানের প্রাঙ্গণে শেষ টুপিটা বিক্রি হতেই চায় না। কলকাতার মাতালেরা বোধহয় বেলা তিনটের পরে কেনাকাটা কমিয়ে দেয়!

মূর্খ আমি, যখন পণ্যভার মুক্ত হলাম তখন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে ভাঙা হাট। বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে।

বেলেঘাটার হারাণচন্দ্র দাস ফিনলে কোম্পানিতে কাজ করেন। চাকরির উমেদারির সূত্রে আমার মুখ তাঁর চেনা। তিনি সস্নেহে বললেন, "আজ মহাদিনে আমার মহাভাগ্য। তিনি আমার মাথায় পা রেখেছেন।"

তাঁর আপন ভাইপো রামলালও প্রভুর স্পর্শ পেয়ে আনন্দে অধীর। যা

পাওয়ার তো সে পেয়ে গিয়েছে।

লেট ললিত আজ সত্যিই লেট! ভক্তরা এখন অদৃশ্য। ত্যাগী সন্তানরা, যাঁরা পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা বোধ হয় এই মহাসময়ে কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

থাকবেন কী করে? সারারাত রোগদীর্ণ প্রভুর সেবা ও সাধনভজন করে নরেন্দ্র তখন ঘুমুচ্ছে সারা দুপুর ধরে। তার যখন ঘুম ভাঙলো, তখন শুনলেন তিনি আজ কাউকে বঞ্চিত করেননি।

শুধু হরমোহনকে রামদত্ত মশাই যখন প্রভুর সামনে আনলেন, তখন তাঁর বুকে হাত দিয়ে হঠাৎ তিনি 'আজ থাক', এই বলে ছেড়ে দিলেন। মনে হয় আশীর্বাদ বিতরণে ঠাকুরের কোনও আপত্তি ছিল। এই হরমমোহন মিত্রকেই নরেন্দ্র সাদরে হারমোনিয়াম বলে ডাকতেন। একসময় ঠাকুরও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, কিন্তু পরে বিয়ে করে সংসারী হওয়ায় তাঁর বোধ হয় ভাল লাগেনি।

এর পরে প্রতাপ হাজরা মশায় ছুটতে ছুটতে উপস্থিত। আশীর্বাদ বিতরণের মহাসময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। এই হাজরাকেই যুবকরা ঠাট্টা করতো, নরেন্দ্রর ফেরেন্ড।

শুনেছি একসময় হাজরার অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রভু তাঁকে দিয়ে পদসেবা করাতেন। জাতিতে সদ্‌গোপ এই প্রতাপ হাজরার মনে প্রবল ধন-কামনা ছিল।

আজ কিন্তু হায় হায় করছেন হাজরা। অগত্যা নরেন্দ্র দোতলায় উঠে গিয়ে হাজরার জন্য প্রভুর কৃপাস্পর্শ ভিক্ষা করলেন। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরতে হলো নরেন্দ্রকে। হাজরাকে কৃপাবিতরণে তিনি এখন রাজি নন।

"সময়সাপেক্ষ কাজ, শেষে পাবে!" এই বলেছেন তিনি হাজরাকে। এই হাজরাকেই নরেন্দ্র অনেকসময় 'থাউজেন্ডা' বলে ডাকতেন। কৃপা না পেলেও প্রতিশ্রুতি থেকে বঞ্চিত হলেন না হাজরা। হাজরার শেষ সময়ে ইষ্টদর্শন হবে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি, নরেন্দ্র জোর করায়।

আমাকে নতমস্তকে বঞ্চিত অবস্থায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নরেন্দ্র দুঃখ পেলেন। কাছে থেকেও আমি সময়মতন এখানে আসিনি শুনে নরেন্দ্র বকুনি দিলেন। দুঃখ করলেন, "প্রভু আর রাজি নন, তাঁর শরীর মোটেই ভাল নয়।"

ভবনাথবাবু এবার বিছানা থেকে উঠে পড়ে র‍্যাক থেকে একখানা ছাপানো বই নামালেন। তারপর নিজের মনেই বললেন,, "একসাইটিং! কল্পতরুর দিনে অকাতরে করুণা বিলোতে গিয়ে ঠাকুরের শারীরিক মানসিক অবস্থা কী হয়েছিল

তা দেখা যাক আদিগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি থেকে : এই পুঁথির লেখক ঠাকুরের গৃহীভক্ত অক্ষয়কুমার সেন, জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর বাড়িতে ছাত্র পড়াতেন বলে যাঁকে সবাই অক্ষয় মাষ্টার বলে ডাকতেন। কল্পতরু দিবসে এই অক্ষয়কুমারের কানে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তাঁর মহাসমাধির দিনেও অক্ষয়কুমার সেন কাশীপুরে উপস্থিত ছিলেন। দেখতে কালো বলে রসিক বিবেকানন্দ এঁকে বোধ হয় 'শাঁকচুন্নী' বলে ডাকতেন, আর গিরিশচন্দ্র নাম দিয়েছিলেন, 'সাঁওতাল'। এই অক্ষয়কুমার বসুমতী সাহিত্যমন্দিরে উপেন মুখার্জির কাছেও কাজ করতেন।

বই তুলে ভবনাথ পড়তে লাগলেন :

আঠারশ ছিয়াশির সাল গণনায়।
বিশেষতঃ দিন ইহা প্রভুর লীলায়।।
প্রথম দিবস আজি নব বরষেতে।
একাদশী তিথি আজি হিন্দুদের মতে।
প্রভুর প্রতিজ্ঞা ছিল শুন বিবরণ।
হাটেতে ভাঙ্গিব হাঁড়ি যাইব যখন।।
সেই হাঁড়িভাঙ্গা রঙ্গ আজিকার দিনে।
কিভাবে ভাঙ্গিলা হাঁড়ি শুন একমনে।।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি পড়তে পড়তে ভবনাথ বললেন, দিনলিপিতে উল্লেখ করা সময়গুলো হুবহু মিলে যাচ্ছে!

গগনে যখন বেলা তৃতীয় প্রহর।
নিম্নতলে নামিলেন কৃপার সাগর।।
ভবন হইতে পরে উদ্যানের পথে।
সেবাপর ভক্তগণ পাছু পাছু সাথে

নিজের খেয়ালে পড়ে চলেছেন ভবনাথ সেন।

হঠাৎ দাঁড়াইয়া পথে শ্রীগিরিশে কন।
তোমরা কি দেখ মোরে কি বা লয় মন।
গিরিশ পাতিয়া জানু বসি পদমূলে।
করজোড়ে সম্ভাষিয়া প্রভুদেব বলে।

ভবনাথ জানেন এর পরে ঠাকুর পথের মধ্যেই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তারপর বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে সবাইকে আশীর্বাদ করলেন, চৈতন্য হোক।

তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত বলিলেন তিনি।
চৈতন্য হোক আর কি বলিব আমি।

এরপরেও পড়লেন ভবনাথ সেন।

“পাকশালে গিয়া দেখে রাঁধুনী ব্রাহ্মণ।
রুটি বেলিবার তরে করে উপক্রম।।
উপাধি গাঙ্গুলী তাঁর নাম নাহি জানি
গিরিশ আনিতে তাঁরে করে টানাটানি।।
ভাগ্যবান শ্রীগোচরে হইল আগত।
পাইল প্রভুর কৃপা আশার অতীত।।

রাশি রাশি কৃপা ঢালি প্রভু ভগবান।
উপরে দ্বিতল ভাগে করিলা পয়ান।।
নিম্নতলে ভক্তদের আনন্দের মেলা।
এখানে শ্রীঅঙ্গে ওঠে নিদারুণ জ্বালা।।”

ভবনাথ সেন আশ্চর্য হয়ে বললেন, “অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে। হরিময়বাবু ব্যাপারটা শুনলে হয়তো কাঁদতে শুরু করতেন!”

আরও একটু অংশ নিজের মনেই পড়ে ফেললেন ভবনাথ :

“শ্রীঅঙ্গেতে জ্বালা কেন শুন বিবরণ।
যে যে পাপীদের আজি করিলা মোচন।।
তে সবার জীবনের যত পাপভার।
সকলা লইয়া প্রভু অঙ্গে আপনার।।
সন্নিকটে রামলাল কন প্রভুরায়।
শালাদের পাপ লয়ে অঙ্গ জ্বলে যায়।।
করেছে কতই পাপ কিছু নাহি বাকি।
দেরে এনে গঙ্গাজল সর্ব অঙ্গে মাখি।।”

“অতি মূল্যবান ডকুমেন্ট এই বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি। শঙ্করীপ্রসাদবাবুর হাতে গেলে তিনি খুবই খুশি হবেন—বৈকুণ্ঠ সান্যাল মশায়ের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে বসুমশাই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন। এই সান্যাল মশাই চিৎকার করে কল্পতরুর দিনে ডেকেছিলেন, “কে কোথায় আছিস, এই বেলা চলে আয়।”

বৈকুণ্ঠ সান্যালের দুষ্প্রাপ্য জীবনবৃত্তান্তটিও খুলে ফেললেন ভবনাথ। বাইরে

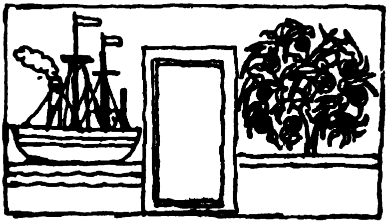
থেকে সেদিন প্রায় ত্রিশজনের বেশি ভক্ত এসেছিলেন ঠাকুরের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে। রামবাবুও লিখেছেন : "সেই দিনকার স্মরণ হইলে আমরা এখনও আশ্চর্য হইয়া থাকি। তাঁহার সর্বশরীর বস্ত্রাবৃত এবং মস্তকে সবুজ রংঙের কান-ঢাকা টুপি ছিল, কেবল মুখমণ্ডলের জ্যোতিতে দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়াছিল।"

ভবনাথের মনের মধ্যে নানা চিন্তা শরৎকালের মেঘের মতন ভেসে যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে, মাত্র দু'একজন ভক্ত ঠাকুরের কাছে তাঁদের মনোবাসনা জানিয়েছিলেন, তিনি কিন্তু নির্বিচারে সকলকে 'তোমাদের চৈতন্য হোক' এই আশীর্বাদ করেছিলেন। সন্ন্যাসীরা এটিকে কল্পতরু না বলে আত্মপ্রকাশে অভয়দান নাম দিতে চেয়েছিলেন। রামচন্দ্র এটিকে কল্পতরু আখ্যা দিয়েছিলেন।

"চৈতন্য কথাটির মানে কি?" ভবনাথ নিজেকেই প্রশ্ন করলেন। তারপর নিজেই ভাবলেন, "সাধকদের কাছে চৈতন্যর অর্থ যতই ব্যাপক হোক, এর সহজ অর্থ নিজেকে জানো। দেহসুখের ঊর্ধ্বে যে তৃপ্তি সেটিই আত্মজ্ঞান বা চৈতন্য। এই চৈতন্য থাকলে মানুষ সমস্ত ব্যথা, দুঃখ, শোক জয় করে জীবনধারণ করতে পারে।"

এবার ভবনাথের দৃষ্টি বংশগোপালের দিনলিপির দিকে চলে গেলো।

ভবনাথ লক্ষ্য করলেন, বংশগোপালের শেষ লাইনটা খুবই দুঃখের। "ডাক পেলাম সময়ে, অথচ হাজির হলাম দেরিতে। এই আমার ভাগ্য। কিন্তু তিনি তো অনন্ত প্রেমময়, তিনি নিশ্চয় আমাকে দেবেন, বড়জোর একটু বিলম্বে। এই বিলম্ববিহারী কী চায় তা তো তাঁর অজানা থাকার কথা নয়।"



পিকলু পরের দিনই ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে চমচম অফিসে হাজির হয়েছে। এখানে এসে সে বেশ আনন্দ পায়। মুম্বাইতে সব কিছুই মডার্ন, পুরনো কিছুর গন্ধই খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রাচীনের আস্বাদ পেতে হলে মুম্বাই থেকে ছুটতে হবে পুনায়।

কিন্তু হরিময়বাবু মুম্বাই বলতে অজ্ঞান। সুযোগ পেলে তিনি চমচমের মুম্বাই

আপিস খুলবেন। "ওখানে অফিস নিয়ে কী করবেন?"

"অতশত জানি না, বিভিন্ন জায়গায় অফিস না হলে একটা কাগজ ঠিক জমে না।" এটাই হরিময়বাবুর সুচিন্তিত অভিমত।

পিকলু বললো, "বংশগোপাল বিশ্বাসের দিনলিপি পড়ে দাদু খুব অনুপ্রেরণা পাচ্ছেন। আজ বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং চরিত্র এই বংশগোপাল এলিয়াস লেট ললিত। লেট হওয়াটাই এঁর জীবনে প্রধান বাধা—কিন্তু এখনও সবটা বুঝতে পারছি না। বংশধরদের ওপব বংশগোপাল অমন খেয়ালি নির্দেশ দিয়ে গেলেন কেন না এখনও পরিষ্কার হচ্ছে না। বংশধরদের কারও ওপর তো কোনও রাগ নেই—বরং বড় ছেলে এবং একমাত্র নাতিকে অকালে হারিয়ে প্রবল মনোকষ্ট পেয়েছেন, যদিও নিজে তিনি দীর্ঘজীবী হয়েছেন।"

হরিময়বাবু বললেন, "আরও একটা পয়েন্ট বোধহয় প্রপৌত্র বংশগোলাপকে জিজ্ঞেস করা উচিত। যে মানুষটি ঠাকুরের এতো কাছাকাছি এলেন তিনি প্রকাশ্যে কেন রামকৃষ্ণ অনুরাগীদের সঙ্গে মেশামিশি করলেন না? হাওড়ায় খবরটা রটলে তখনই শঙ্করী বোসের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমে ঠাকুর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে ভক্তরা অবশ্যই তাঁকে টেনে নিয়ে যেতো। ঠাকুরের ভক্তরা একটু অদ্ভুত শ্রেণীর—যতো তাঁর কথা মুখ বুজে শোনেন ততো তাঁদের তৃষ্ণা বেড়ে যায়। রামকৃষ্ণতৃষ্ণার নিবৃত্তি নেই। থার্টি ফর্টি ইয়ার্স ধরে প্রতি শনিবার ঠাকুরের কথা এবং স্বামীজির কথা এক নাগাড়ে শুনে যাচ্ছেন, কিন্তু অরুচি নেই। প্রশ্ন করলেই ওঁদের মুখে হাসি—ভাতে কখনও অরুচি হয়? অন্ন যে ব্রহ্মা!"

পিকলু বললো, "আপনি ও বিষয়ে রিসার্চ করুন হরিময়দাদা। দাদু আমাকে পাঠাচ্ছেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে। ঠাকুরের জীবনের শেষদিন সম্বন্ধে কয়েকটা খবরাখবর দ্রুত জোগাড় করতে হবে।"

পিকলু বেরিয়ে যেতেই বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে হরিময়ের যোগাযোগ হলো!

হরিময়বাবু আশ্বস্ত করলেন, "এটর্নি অমল সেনের সঙ্গে দেখা হলো। ওঁর বেয়াইবাড়ি থেকে মঠ মিশনের আদি দলিল ড্রাফট হয়েছিল। উনি বললেন, একটা কাগজে কেউ কিছু লিখে গেলেই সে নির্দেশ বাইন্ডিং হয় না। আপনি যা খুশি করতে পারেন এই হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তি নিয়ে।"

বংশগোলাপবাবু কিন্তু পরামর্শ পেয়ে সন্তুষ্ট হলেন না। বললেন, "মশাই, আপনি কিছুই বোঝেন না। আদালতের ভয়ের শতগুণ ভয় বংশবিনাশের। একবার নয়, দু'বার আচমকা ভয়ঙ্কর ট্রাজেডি হয়ে গিয়েছে এই বিশ্বাস পরিবারে।"

বিকেলবেলায় বংশগোলাপবাবু নিজেই এবার একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া করে হাওড়া থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

"ভাল গ্রন্থাগার অনেক রাত্রি পর্যন্ত কোথায় খোলা থাকে?" জানতে চাইলেন।

যাবার আগে তিনি দুঃখ করলেন, "লাইব্রেরি খুলে রাখার দরকার এই শহরের কর্তারা অনুভব করেন না, ফলে গ্রন্থাগার বেশি সময় খোলা থাকে না। আপনারা চাইছেন দেশটা বোস্টন হয়ে যাক, সব গ্রন্থাগার সারারাত খোলা থাকুক।"

"আপনি বরং ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করুন।"

সন্ধের দিকে কোথা থেকে বংশগোলাপবাবু শিবপুরের চমচম অফিসে ফোন করলেন। "হরিময়বাবু, একজন ভাল ডেন্টিস্টের খবর দিতে পারেন?"

হরিময়বাবু ফোনে বললেন, "অবশ্যই পারি। এতো বড় এমার্জেন্সি আর নেই—হাড়ে হাড়ে বুঝেছি বিভিন্ন সময়ে দন্তহর্ষ, দন্তশর্করা, দন্তোচ্ছেদ এবং দন্তশূল থেকে। প্রতিবারই প্রাণ রক্ষে করেছেন ডাক্তার বারীন রায়।"

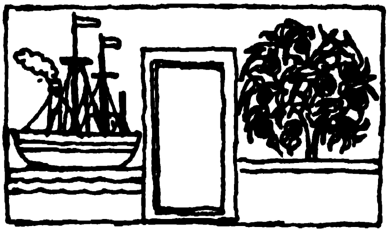
"টেলিফোন নম্বরটা একটু পাতা থেকে দেখে দেবেন?" অনুরোধ করছেন বংশগোলাপ।

"খাতার দরকার নেই—নম্বরটা সারাক্ষণ মনের মধ্যে গাঁথা রয়েছে। খুবই ব্যস্ত লোক, তার ওপর ডাক্তারবাবুর দয়ার এবং দায়িত্বের শরীর।"

ডাক্তার রায়ের আপিসে একটা স্পেশাল ফোন করে দিলেন হরিময়বাবু। ওইখানেই তিনি শিখেছেন, দন্তহর্ষের অর্থ দাঁত সিরসির করা, দন্তর্শকরা অর্থ দাঁতের পাথুরি : দন্তোচ্ছেদ মানে মাড়িতে দাঁত ওঠা! তিনি শুনেছেন, প্রাচীন ভারতে দন্তলেখক বলে একটি জীবিকাও ছিল। দাঁতের ব্যথাওয়ালা কোনো লেখক নন! যে-লেখক জীবিকা হিসেবে দন্তরঞ্জন করেন। অর্থাৎ বিভিন্নভাবে দাঁত রঙ করা সেকালের সুন্দরীদের অঙ্গসজ্জার অঙ্গ ছিল।

পরের দিন সকালে বংশগোলাপ তখনও ঘুমোচ্ছেন। চিন্তিত হরিময়বাবু ফোন করলেন স্বয়ং ডাক্তার রায়কে, "আমার পাঠানো পেশেন্ট কেমন আছেন?"

"পেশেন্ট কোথায় মশাই?" ওঁর দাঁতের তো কোনও সমস্যা নেই, কিন্তু প্রবল কৌতূহল দাঁতের হিস্ট্রি নিয়ে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দাঁতের বই তেমন খুঁজে পাননি। বাংলাতেও তেমন কিছু ভাল প্রকাশনা নেই। শেষে ভদ্রলোককে ডেন্টাল কলেজে পাঠিয়েছি একটা স্পেশাল চিঠি দিয়ে। হাজার হোক আপনার বিশিষ্ট বন্ধু।"



হরিময়বাবু একমনে চমচমের জন্য সম্পাদকীয় লিখছেন, সেইসময় বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে তিনি দেখলেন বংগোলাপবাবু ভাড়ার মোটরগাড়িতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, যাবার আগে জিজ্ঞেস করলেন, "রবি ঠাকুরের ডেন্টিস্ট ছিলেন আর আমেদ. তাঁর ডেন্টাল কলেজটা কোথায় জানেন?"

পিকলু যথাসময়ে চমচম কার্যালয়ে ফিরলো। হরিময়কে সে বললো, "আপনার বাড়িওয়ালার উপকার করতে গিয়ে অনেক সময় লেগে গেলো। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে মুখ চুন করে ভদ্রলোক ঘুরছিলেন। আমাকে দেখে হালে পানি পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, দেশটা দাঁত সম্বন্ধে সজাগ নয় কেন বলুন তো? আমি প্রতিবাদ করলাম, বড় বড় মহাপুরুষের পাদনখকণা, দাঁত এসব নিয়ে আমরা হাজার হাজার বছর ধরে মাতামাতি করেছি, মিস্টার বিশ্বাস।"

বংশগোলাপবাবু বললেন, "বড় বড় লোকদের দাঁতের ইতিহাসের ব্যাপারটা আমাকে একটু জোগাড় করে দিন না।" পিকলু ভাবলো, ভদ্রলোক বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকেন, হয়তো কোথাও কোনো আর্টিকেল লেখার ঝোঁক হয়েছে। পিকলু বললো, বাংলায় লিখলে আপনি চমচমে লিখুন।"

"বংশগোলাপবাবু আমাকে ক্যান্টিনে নিয়ে গিয়ে চা ও টোস্ট খাওয়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন আমি কী পড়তে গ্রন্থাগারে এসেছি? বললাম, আমার সাবজেক্ট বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, কিন্তু পড়ছি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শেষ ক'দিন সম্পর্কে। আমার কথা শুনে ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ওই পুরনো সাবজেক্টে কত আর লেবু কচলাবেন?"

ভবনাথ সেনকে একটা ফোন করা দরকার। "দিয়ে দাও রিপোর্ট—ঠাকুরের কখন যে কি ইচ্ছে তা বোঝা দায়। তোমাকেও জড়িয়ে দিয়েছেন এই প্রোজেক্টে।" মনে হচ্ছে, দাদু এবার পিকলুর অনুরোধ ফিরিয়ে দেবেন না। কিছু একটা লিখবেন।"

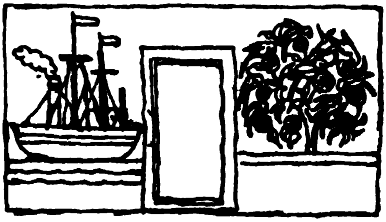
রাত অনেক। বিশ্বাসলজের দোতলার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বংশগোলাপবাবু চাপা গলায় পুরনো দিনের কথা বলছেন হরিময়বাবুর সঙ্গে।

"মধ্য রাতে ঘুম না-থাকা, বিশ্বাস বংশের অভিশাপ। ১৮৮৬ সালের ১৫ আগস্টের মাসুল"—এটা মেনে নিয়েছেন হরিময়বাবু। "বংশোগোপালের দিনলিপি পড়ে আমি বুঝে নিয়েছি ব্যাপারটা। বিবেকানন্দ যদি কল্পতরুর দিনে বেলা তিনটের সময় ভোঁসভোঁস করে ঘুমোতে পারেন না তা হলে হোয়াই নট বংশগোপাল বিশ্বাস? কিন্তু এই ভাঙা বাড়িতে নিজের বংশধরদের এইভাবে আটকে দেওয়া, এটা আমার বুদ্ধির অগম্য।"

"যাই হোক, থ্যাংক্স টু আপনার ইয়ং ফ্রেন্ড পিকলু, আমি এখন লাইন পাল্টে দাঁতের ইতিহাসে চলে যেতে চাইছি! ভেরি ব্রাইট ইয়ং ম্যান এই পিকলু সেন।" বললেন, বংশগোলাপ বিশ্বাস।

"পরিবারটা তো দেখতে হবে! আমাদের সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ভবনাথ সেনের একমাত্র নাতি। একটাই মুশকিল, ভীষণ মডার্ন, কোনও অলৌকিকে বিশ্বাস করতে চায় না। সব ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ চায়।"

বংশগোলাপবাবু বললেন, "আমার ছেলে বংশগৌরব—সে এই সব পুরনো ব্যাপারে এতটুকু ইন্টারেস্টেড নয়। বংশের নির্দেশ মেনে সে এই হৃদারাম হালদার লেনে কখনও বসবাস করবে বলেও মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে পিকলুবাবুকে বিশ্বাসবংশের সব কাগজপত্র আমি দিয়ে যাবো ফর গবেষণা। অন্য কোনও পথ নেই। এই বাড়ি বিক্রি করার জন্যে অনেক মোটা টাকার প্রস্তাব আমি পাচ্ছি। কিন্তু গোঁয়ারগোবিন্দ পূর্বপুরুষ, নিজেদের খেয়ালখুশি মতন মালিকানা সম্বন্ধে অদ্ভুত সব নির্দেশ রেখে গিয়েছেন।"



বংশগোলাপবাবুর কী হলো? অন্য সব সমস্যা ভুলে গিয়ে একটা নতুন নোটবুক করেছেন দাঁত সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

তিনি দুঃখ করলেন, "এতো বছর কেন যে দাঁত সম্বন্ধে কোনো ইন্টারেস্ট

নিইনি! হাজার হাজার বছর আগে প্রাচীন গ্রিসে ডেন্টিস্টের সাঁড়াশির কী নাম ছিল জানেন? 'ওদন্তাগ্রা', ভাবতে পারেন! এতো পণ্ডিত জাত, আধুনিক সভ্যতার লীলাক্ষেত্র, কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ার কাছে দাঁতের ব্যাপারে শিশু। অমন যে অমন মহাপণ্ডিত অ্যারিস্টটল তিনি ৩৪৮ বিসিতে লিখলেন, পুরুষদের দাঁতের সংখ্যা মেয়েদের দঁতের থেকে বেশি, ভাবতে পারেন?

"পৃথিবীকে দাঁতের বুরুশ দিয়ে দাঁত মাজতে শেখালো কে?" প্রশ্ন করলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

নিজেই তিনি উত্তর দিলেন, "চায়না! অমন যে অমন সুসভ্য রোমান, তারাও টুথ ব্রাশের ব্যবহার জানতো না। প্রাচীন রোমে ডিনারের সময় অতিথিদের চামচ এবং ছুরির সঙ্গে দেওয়া হতো সোনার দাঁতখড়কে। দুটো পদের মধ্যে দাঁতে কাঠি ঢুকিয়ে একটু খোঁটাটাই ছিল রোমকদের সামাজিক রেওয়াজ। গৃহস্বামীর গৃহ থেকে বিদায় নেবার সময় সোনার দাঁতখড়কে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার গৃহস্বামীর কোনো আপত্তি ছিল না।"

"বলেন কি মশাই, রোমান সায়েবরা তাহলে দাঁতের মর্যাদা বুঝতো না?" বিস্ময় প্রকাশ করলেন হরিময়বাবু।

"বুঝবে কী করে? যীশুখ্রীস্টের জন্মের ছ'শ বছর পরেও চার্চের ধারণা ছিল, মেয়েদের তিরিশটা এবং পুরুষদের বত্রিশটা দাঁত!" বললেন বংশগোলাপ।

"কী ভয়ঙ্কর কথা, বলুন তো।" হরিময়বাবুর তো মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার অবস্থা।

বংশগোলাপ আবার মুখ খুললেন। "আপনার ডাক্তার রায়কে বলবেন, এই কিছুদিন আগেও বিলেতে ডেন্টাল সার্জেনদের মেরে ফেলা হতো যদি তাঁরা কোনও লর্ডের দন্তোৎপাটনে ভুল করতেন।"

হরিময়বাবু প্রস্তাব করলেন, "ছাড়ুন না একটা গরম ডেন্টাল আইটেম চমচমের পরবর্তী সংখ্যায়। তবে ইন্ডিয়ানরা দাঁত নিয়ে যুগে যুগে কী করেছে তা একটু লিখবেন। টুথ ব্রাশ আবিষ্কারের কৃতিত্বটা তো চাইনিজদের কাছে একটুর জন্যে আমাদের হাতছাড়া হয়ে গেলো।"

"হতাশ হবেন না। পিকলু যা লিখে নিয়ে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, জিভছোলাটা ইন্ডিয়ানদের একান্ত নিজস্ব আবিষ্কার! জেনে রাখুন, হাজার হাজার বছর আগে ইন্ডিয়ানরাই প্রথম দাঁত তোলার যন্ত্র তৈরি করেছেন, নাম ছিল—দন্তশঙ্ক। জানেন মশাই, দু হাজার বছর আগে গ্রিসে প্রচুর পরিমাণ ইন্ডিয়ান মাউথ ওয়াশ এক্সপোর্ট হতো এবং ঘরে ঘরে তা ব্যবহৃত হতো, আর

এখন সায়েবী মাউথওয়াশ ছাড়া আমাদের কিছুই পছন্দ হয় না!"

হরিময় অনুরোধ করলেন, "দেবেন আপনার দন্তসংগ্রহের একটা জেরক্স কপি?"

বংশগোলাপ বললেন, "পিকলুবাবু লিখে এনেছেন, এই যাকে আমরা ঠোঁটকাটা বলি, ক্লেফট্ লিপ তার শল্যচিকিৎসা চিনেরা করেছে যীশুখ্রীস্ট জন্মাবার আড়াইশ বছর আগে।"

"গুড গুড। সাধে কি আর হাওড়ার বেশির ভাগ লোক মঙ্গলাহাটে পুরনো চাইনিজ ডেন্টিস্টের দোকানের সামনে লাইন দেয়!"

বংশগোলাপ এবার তাঁর তৈরি নোটটা সোজা হরিময়ের হাতে তুলে দিলেন। হরিময়ও তৎক্ষণাৎ তা পড়ে ফেললেন।

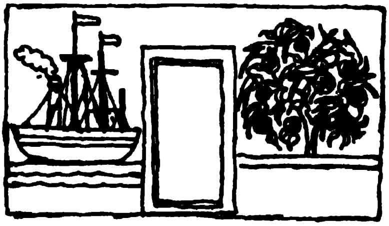
হরিময়বাবুর উচ্ছ্বাস : "এ তো দেখছি, দাঁতের স্বর্ণভাণ্ডার, বংশগোলাপবাবু! রবি ঠাকুরের দাঁতের ট্রাবল ছিল, জর্জ ওয়াশিংটনের সিরিয়াস ধরাবাহিক দন্ত সমস্যা ছিল, যা তাঁর শেষ জীবনের ছবি দেখলেই অভিজ্ঞ ডেন্টিস্টরা এখনও ধরে ফেলেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট অবস্থায় বেশ কয়েক বার তিনি ডেন্টিস্ট পাল্টেছেন। চার জোড়া দাঁতের যন্ত্রণায় চিরকাল পাগল! অথচ দাঁত তোলাবার সাহস তাঁর ছিল না। মশাই এই দাঁতের সমস্যার ফলে রানী এলিজাবেথের মুখে হতো প্রচণ্ড দুর্গন্ধ। সেই জন্যে এতো বড় রাজ্যের অধীশ্বরী হয়েও বিবাহের হাঙ্গামায় গেলেন না, চিরকুমারী রয়ে গেলেন। দাঁত তোলার ভয় কমানোর জন্যে ইংলন্ডের এক রানীভক্ত পাদ্রি তো রানী এলিজাবেথের সামনে নিজের কাঁচা দাঁতই তুলিয়ে ফেললেন। আরও আগে দাঁত নিয়ে যে সব কাণ্ড হয়েছে তা না-বলাই ভাল।"

সবাই কিন্তু শুনতে চাইছে। ফলে হরিময়বাবু আবার দন্তসংবাদ প্রচার শুরু করলেন। "মিশরের ফারাওরা প্রায়ই দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগতেন। পরলোকে যাতে কষ্ট না হয় তার জন্য সমাধির ভিতর নিজের মমির পাশেই দাঁতের ডাক্তারকে মমি করে গিয়েছেন।"

বংশগোলাপ বললেন, "আমার ধারণা ছিল, দাঁতের ডাক্তারদের স্ট্যাটাস অস্ত্রচিকিৎসকদের মধ্যে তেমন উঁচু নয়। কিন্তু এখন শুনলাম, আমেরিকান ডেন্টিস্টরা গত একশবছর এমন সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন, যা জেনারেল সার্জেনরাও নিজেদের কাজে লাগিয়েছেন। যেমন অজ্ঞান করবার ওষুধ, এই অ্যানেসথেসিয়া ছাড়া আজকের কোনও সার্জারি সম্ভব হতো না।"

নিজের অফিস ফেরার পথে হরিময়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, "দন্তশূল না

থাকলে দাঁতের কথা আলোচনা করতে মন্দ লাগে না, পিকলু। কিন্তু হঠাৎ এই দন্তাগ্রহ কেন?" হরিময়বাবু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছেন না।



পরের দিন চমচম অফিসে কাজ করতে করতে পিকলু একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো। স্বয়ং বংশগোলাপবাবু দোতলা থেকে নিভৃতে তাঁকে ফোন করেছিলেন। বললেন, "আমি ডেন্টিস্টদের ইতিহাস এবং স্ক্যান্ডাল অতো জানতে চাইনি, মিস্টার পিকলু। আমি কেবল দাঁতের কথা শুনতে চেয়েছি। পৃথিবীর সব চেয়ে বিখ্যাত এবং দামি দাঁত এখন কোথায় আছে?"

পিকলুর খাতায় কিছু নোট ছিল, সবটা বংশগোলাপের হাতে সে এখনও দেয়নি। পিকলু বললো, "রবীন্দ্রনাথের চুল দাড়ি কেউ কেউ জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এবং নিমতলা শ্মশানঘাট থেকে ১৯৪১ সালে সংগ্রহ করেছে তাঁর মৃত্যুর পরে। কেউ দাঁত সংগ্রহ করে রেখেছে বলে খবর পাইনি। সবচেয়ে ফেমাস দাঁত তো ভগবান বুদ্ধের। শ্রীলঙ্কার কান্দিতে জগদ্বিখ্যাত দন্তমন্দির রয়েছে। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর সমাবেশ হয় সেখানে, স্রেফ দন্ত দর্শনের জন্য।"

বংশগোলাপ জিজ্ঞেস করলেন, "এই বুদ্ধ-দাঁত নাকি আগে পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরের সংগ্রহে ছিল?"

পিকলু বললো, "স্বামী বিবেকানন্দ তো তাই মনে করতেন। উনি অনেক ব্যাপারে খবরাখবর রাখতেন।"

বংশগোলাপ ফোনে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বুদ্ধের দাঁতের ব্যাপারটা ওঁর জানা ছিল না। খুবই কৌতূহলী বোধ করেছেন। তাঁর প্রশ্নটি কিন্তু বিদঘুটে। "বুদ্ধের দাঁতের এখন বাজারদর কত হতে পারে?"

"দাম দেওয়াটা ভক্তদের ব্যাপার তো। জাপানিরা যদি ভ্যান গগের একখানা ছবির জন্যে একশো কোটি টাকা দিতে পারে, তা হলে বুদ্ধের দাঁতের জন্যে দুশো কোটি তো তেমন বেশি নয়।"

প্রবল উৎসাহের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে বংশগোলাপের মধ্যে। "যীশুখ্রিস্টের

দাঁত কোথাও কি রক্ষিত আছে?"

"শুনিনি। দু'হাজার বছর আগে লোকগুলো ঠিক বুঝতে পারেনি, ক্রুশ থেকে নামিয়ে তা হলে এক-আধটা দাঁত সরিয়ে রাখতো। খুব লংলাস্টিং জিনিস—এই দাঁত, চুল এবং পদনখকণা। বুদ্ধ বিতরণ করে গিয়েছেন কিছু কিছু।"

"আপনি বুদ্ধের দাঁতের ঠিকমতো একটা ভ্যালুয়েশন করুন, মিস্টার পিকলু। এবং তারপর আর একটা অঙ্ক আপনাকে কষতে হবে। বুদ্ধের দাঁত যদি একশো হয়, তা হলে আর একজন জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষের দাঁতের দাম অন্তত দশ তো হবে? সোজা অঙ্কে তাই তো বলে, তাই না মিস্টার পিকলু?"

পিকলু একটু থেমে বললো, "বংশগোলাপবাবু, আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধের দাঁতের মন্দির আছে, কিন্তু হায় সেখানে বুদ্ধের আদি দাঁত বোধ হয় সংরক্ষিত নেই।"

"বলেন কী? চুরি গিয়েছে! যেমন কাশ্মীরে হজরত মহম্মদের চুল হজরতবাল উধাও হয়েছিল, পরে ফিরে পাওয়া গেল অনেক কষ্টে। শুধু শুধু উত্তেজিত মানুষেরা দাঙ্গা বাধালো হজরতবাল হারিয়ে যাওয়ায়।"

"না, বংশগোলাপবাবু। বুদ্ধের দাঁত চুরি যায়নি। কিন্তু শত শত বছর ধরে নানা ভোগান্তি সহ্য করছেন ভগবান বুদ্ধ তাঁর পরিনির্বাণের এতোদিন পরেও। বুদ্ধের দাঁত লুঠ হয়েছিল। শুনুন ব্যাপারটা—খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৩ অব্দে বুদ্ধের দেহরক্ষার পরে তাঁর শিষ্য কেমো থোরো এই পরম পবিত্র দাঁত বুদ্ধের মৃতদেহ থেকে ছিন্ন করে নেন। কেমো থেরো পরম যত্নে এই দাঁত কলিঙ্গ শহরে নিয়ে যান। কলিঙ্গ শহরের তখন নাম হয়ে যায় দন্তপুর। ৪১১ খ্রিস্টাব্দে এই দাঁত নানা পথ নানা বিপর্যয় পেরিয়ে শ্রীলঙ্কায় পৌঁছয় এবং আরও ন'শ বছর পরে ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দে মালাবারীরা এই দাঁত জোর করে শ্রীলঙ্কা থেকে আবার ভারতে ফিরিয়ে আনে। কিন্তু তৃতীয় প্রহরমাবাহু নামে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আবার পবিত্র দন্তকে সিংহলে ফিরিয়ে নিয়ে যান। অশান্ত সময়ে পবিত্র দন্তকে রক্ষা করবার জন্যে এটিকে বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা হয়। ১৫৬০ সালে বোম্বেটে পর্তুগিজরা খবর পেয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে এই দাঁত গায়ের জোরে লুঠ করে। গোয়াতে যে বোম্বেটে এই দাঁতটি নিয়ে যায় তার নাম ডন কন্‌স্ট্যানটাইন ডি ব্রাগনজা! এইখানে ইংরেজ গভর্নর এবং তাঁর পারিষদদের সাক্ষী রেখে ভগবান বুদ্ধের দাঁত পুড়িয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়। এরপর বিক্রমবাহু বলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হতাশায় না ভুগে হাতির দাঁত থেকে কেটে একটি নকল বুদ্ধ দাঁত তৈরি করেন। সেইটাই এখন শ্রীলঙ্কায় রয়েছে। সাইজ দেখলেই বুঝবেন এটা মানুষের দাঁত হওয়া সম্ভব

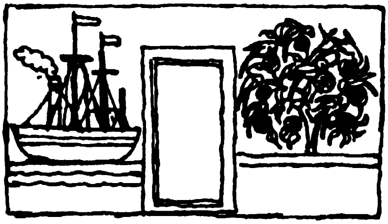
নয়।”

উল্লসিত হয়ে উঠলেন বংশগোলাপ। টেলিফোনে বললেন, “আপনি তো মশাই আচার্য স্যার যদুনাথ সরকার হয়ে উঠবেন।”

“যে কোনও বইতে ব্যাপারটা পেয়ে যাবেন, বংশগোলাপবাবু, ইনক্লুডিং চমচমের পুরনো সংখ্যায়।” নিবেদন করলো পিকলু সেন।

“তা হলে তো অন্য মহাপুরুষদের দাঁতের ভ্যালুয়েশন আরও বাড়বে।”

“লঙ্কায় সোনার দাম বাড়লে আমাদের কী? আমাদের দেশে মহাপুরুষদের দন্তসংগ্রহ কোথায়? ছোটছোট ছেলেদের বলে দিতে হবে, এ বার থেকে দুধে দাঁত ইঁদুরের গর্তে না ফেলে কৌটোয় জমা করে রেখে দাও। ঠাকুর ইচ্ছে করলে হুড়হুড় করে দাম বাড়িয়ে দেবেন।”



সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু সহজ পথে যাচ্ছে না। সমস্যাটা মোটেই সহজ নয়। বংশগোলাপ বিশ্বাসের পারিবারিক রহস্য কীর্তি আরও কিছুটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন এবার।

বংশগোলাপের স্বভাবেরও কোনো পরিবর্তন নেই। সমস্ত দিন তাঁকে কর্মব্যস্ত দেখা যায় না। যত তৎপরতা সব শুরু হয় মধ্যরাতের পরে।

গভীর রাতে পিকলুকে একবার ডেকে পাঠালেন স্বয়ং বংশগোলাপ। মুখে তেমন হাসি নেই। ঘুমোতে চেষ্টা করেছেন অথচ ঘুম আসছে না, ফলে তিনি বিষণ্ণ হয়ে উঠেছেন।

বংশগোলাপ এবার পিকলুকে বললেন “বংশের অভিশাপ বয়ে বেড়াচ্ছি ভাই, এই রাত জেগে। এসব আর আমার ভাল লাগে না। নিশ্চয় কোনো মহা অপরাধ করেছিলেন পূর্বপুরুষ, না হলে কেন এমন হবে? অথচ আমি শুনেছিলাম, এক জনের অন্যায়ের জন্য অপর কারুর ওপর শাস্তি কখনও ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। আমাদের কর্মফলও একথা বলে না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বংশের ব্যাধির মতন, বংশের পাপও একেবারে মিথ্যে নয়। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, জন্মের পর জন্ম আমাদের পরিবারকে এই অভিশাপের বোঝা

বইতে হতে পারে। উপেন মুখুজ্যের পুত্রবধূ সন্তান হারালেন অকালে, এবং কয়েকদিনের মধ্যে স্বামীকে হারালেন। ওঁরা বিশাল সম্পত্তি দান করে দিলেন অনাথ ছাত্রদের আশ্রম তৈরি করাতে।"

এবার ঝরঝর করে কাঁদছেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। হঠাৎ বললেন, বংশধরদের বড়লোক করার জন্যে প্রপিতামহ বংশগোপাল যে কী কাণ্ড করে গেলেন ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট।

মূল রহস্যটা এবার যেন কিছুটা বেরিয়ে আসছে। বংশগোপালের একটা গোপন লেফাফার সন্ধান পেয়ে সেটা সবেমাত্র খুলেছেন স্বয়ং বংশগোলাপ। খামের ওপরে বংশগোপালের নিজের হাতে লেখা ছিল, ১৯৯৭ সালের আগে যে সিল খুলবে সে নির্বংশ হবে।

এই খামই একবার লুকিয়ে খুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বংশবিনয় ১৯৪৬ সালে এবং তারপরেই ১৬ই আগস্টের রায়টে খুন হয়েছিলেন তাঁর একমাত্র সন্তান বংশবিজয়। বংশবিনয় আর খাম খোলেননি. খামের ওপরে আর একটা খাম চড়িয়ে লিখিতভাবে নিজের অপরাধ স্বীকার করে গিয়েছেন পরবর্তী বংশধরের কাছে।

বংশগোলাপ বললেন, "টাকা। বংশধরদের জন্য প্রচুর টাকা চেয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষ বংশগোপাল বিশ্বাস। অথচ যাঁর কাছ থেকে বিত্ত চেয়েছিলেন তাঁর কাছে টাকা মাটি, মাটি টাকা। টাকার কোনো মূল্যই নেই তাঁর কাছে। অর্থই যে অনর্থের মূল তা বারবার তিনি বলে গিয়েছে আপনজনদের কাছে।"

"বড়লোক হতে চেষ্টা করার মধ্যে অন্যায় কী থাকতে পারে?" পিকলু একটু পাকাভাবেই বললো। "কাউকে দোষ দিতে পারেন না বংশগোলাপবাবু। নিজের বশধরদের কে সুখী রেখে যেতে চায় না? পৃথিবীর কোথায় না বিত্তের জন্যে প্রার্থনা এবং সাধনা হচ্ছে?"

"কিন্তু এই কল্পতরু বড়ই বিপজ্জনক বৃক্ষ, মিস্টার পিকলু। আজ ভাল বা মন্দ যা চাইবে তা-ই পেয়ে যাবে, কিন্তু কাল তার জন্য ভোগান্তি। যেখানে এতো লোক কেবল মুক্তি এবং ভক্তি চাইছে সেখানে হঠাৎ লোভী হয়ে বিত্ত চাওয়ার কোনও মানে হয় না, মিস্টার পিকলু।"

পিকলু বললো, "কিন্তু বংশগোপালবাবু তো কল্পতরু দিবসে লেটে হাজির হয়েছিলেন, ঠাকুরের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পাননি।"

বংশগোলাপ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "সেইটাই তো কাল হলো মনে হচ্ছে। আমার পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণভক্ত বংশগোপাল বিশ্বাস তখনই বুঝে

নিয়েছেন, কাশীপুরের এই মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটিকে নিয়ে সারা দুনিয়ায় একদিন বিপুল আলোড়ন হবে। যাবার আগেই শ্রীরামকৃষ্ণ যে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।"

এই ব্যাপারটা কী, পিকলুকে তা ভালভাবে জানতে হবে। বংশগোলাপ বললেন, "আমার জ্ঞান সামান্য—মনে হয়, হাটে হাঁড়ি ভাঙার অর্থ তিনি যে নররূপী দেবতা এটা মানুষের কাছে নিজেই প্রকাশ করে যাবেন। আমার পূর্বপুরুষ তখনও কিন্তু স্রেফ বিত্তবাসনায় মশগুল।"

পুরনো একটা কাগজের টুকরো পিকলুর দিকে এগিয়ে দিলেন বংশগোলাপ। "বহু বছর আগে আমার প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস কী করেছিলেন দেখুন।"

পিকলু ঝট করে লেখাটা পড়ে নিলো, তার চোখ দুটো এবার বিস্ফারিত হয়ে উঠলো।

বংশগোপালের সুন্দর হাতের লেখা : "আজি হতে শতবর্ষ পরে, কে তুমি পড়ছো আমার এই লিপি?

"এ তো রবীন্দ্রনাথের লাইন মিস্টার বিশ্বাস! কিন্তু আশ্চর্য নয়, রবীন্দ্রনাথ তো বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে এই লাইন লিখে ফেলেছেন। বংশোগোপালবাবু সারাজীবন রবীন্দ্রনাথ পড়তেন।"

ভাবীকালের বংশধরদের উদ্দেশে লিখিত বংশগোপালের লিপি পড়তে শুরু করলো পিকলু :

সেদিন সোমবার, ভাদ্র মাসের শুরু। কাশীপুরে ভোর হয়েছে কিন্তু সমস্ত বাড়িতে যেন চাপা উত্তেজনা। শেষ রাতে বেশ কিছু ছোটাছুটি করেছি। আর বাকি সময় অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এখনও আশার আলো সম্পূর্ণ নিভে যায়নি।

এবাড়িতে উপস্থিত গৃহী এবং ত্যাগী সমস্ত ভক্ত এখনও চাপা গলায় বলেছে, ঠাকুর এখনও শরীর ত্যাগ করেননি, তিনি কেবল সামাধিস্থ হয়ে আছেন। পার্ষদরাও সেই কথায় বিশ্বাস করেছেন। সকাল আটটার সময় নেপালি ভক্ত ক্যাপ্টেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় কাশীপুরে উপস্থিত হলেন। সমাধি সম্বন্ধে তাঁর বিপুল জ্ঞান।

ক্যাপ্টেন সাবধানে সব লক্ষ্য করে বললেন, ওঁর সর্বশরীর কণ্টকিত ও কঠিন

হয়েছে কিন্তু মেরুদণ্ড এখনও উষ্ণ রয়েছে। তাঁর সিদ্ধান্ত ঠাকুর এখনও গভীর সমাধিস্থ। শিরদাঁড়ায় গরম গাওয়া ঘি মালিশ করলে অবশ্যই সমাধিভঙ্গ হয়। সেবকভক্ত শশী সেইমতন প্রভুর শিরদাঁড়া মালিশ আরম্ভ করলো, বৈকুণ্ঠ পায়ে ঘি মালিশ করছে, কিন্তু কোথাও কোনো প্রাণলক্ষণ দেখা গেলো না।

একটু পরেই তাঁর স্ত্রী এলেন। স্বামীর দেহের সামনে তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন, "মা কালী গো! তুমি কি দোষে আমায় ছেড়ে গেলে গো।"

আমি ঠিক বুঝলাম না, স্বামীকে তিনি কি মাতৃরূপে পূজা করতেন? স্বামীকে কেন তিনি মা কালী বলে সম্বোধন করলেন? শোকের সময় অবশ্য সবই সম্ভব।

মহেন্দ্র সরকারকে সকালে খবর দেওয়া হয়েছিল। ডাফ স্ট্রীটে এক মহিলা রুগীকে দেখে দুপুর একটা নাগাদ তিনি কাশীপুরে এলেন। এঁকে কে না চেনে? কলকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসক ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। অনেক দিন ধরে শিবের অসাধ্য রোগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করছেন। ডাক্তার সরকার সযত্নে তাঁর দেহ পরীক্ষা করলেন। দূর থেকে দেখলাম, দেহটা বাঁদিকে কাত হয়ে রয়েছে, পা দু'টি ওপরের দিকে সামান্য তোলা, চোখ ফোলা, মুখ কিন্তু পুরো বন্ধ নয়।

"সমাধি নয়, মৃত্যু"—গভীর দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দিলেন ডাক্তার সরকার। এক জন ভক্তকে বললেন, "এই নাও দশ টাকা, একটা ফটো তোলার ব্যবস্থা রেখো।"

আজ কাশীপুরে অন্তিমলীলার অন্তিমপর্বে এখানে বহু মানুষের বিরামহীন আগমন। বিকাল পাঁচটায় তাঁর মহাসমাধিস্থ শরীর দোতলা থেকে নীচে নামিয়ে আনা হলো। মহাযাত্রার মহাপ্রস্তুতি চলেছে। এখন তাঁর পরিধানে পীতাম্বর, সমস্ত শরীর শ্বেতচন্দনে আবৃত। গলায় ফুলের মালা, মাথায় ফুলের চূড়া, কোমরে ফুলের বেড়া, পায়ে ফুলের নূপুর। প্রভু যেন ফুলশয্যায় শয়ন করেছেন।

সুরেন্দ্র মিত্র কেঁদে উঠলেন, "গুরুদেব, আজ আপনাকে এই অবস্থায় দেখতে হল। এ পাপিষ্ঠের শেষ পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করুন।"

আমি নীরবে দূরে দাঁড়িয়ে আছি। অকস্মাৎ ভাদ্রের মেঘ থেকে বড় বড় দানার বৃষ্টি শুরু হলো। কেউ কেউ সবিস্ময়ে বললো, স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে।

আমি দেখলাম, ডান পাশ ফিরে তিনি শুয়ে আছেন। মাথার নিচে একখানি এবং পা-দুখানির মধ্যে একটি বালিশ। কে যেন বললো, "ঠোঁটের হাসিখানি দেখো, সমাধির পরমানন্দের মধ্যেই তাঁর মহাপ্রয়াণ হয়েছে।"

খাট এবার শ্মশানযাত্রীদের কাঁধে উঠলো। সেই সঙ্গে বারে বারে হরিধ্বনি। একদল বোষ্টম মৃদঙ্গ এবং করতাল সাজিয়ে সঙ্কীর্তন শুরু করে আগে আগে চললো শ্মশানের দিকে। এ এক অদ্ভুত শোকযাত্রা। কারণ অপরাহ্নে এখানে সর্বধর্মের পতাকা ওড়ানো হয়েছে—হিন্দুর ত্রিশূল ওঁকার, বৌদ্ধের খুন্তি, মুসলমানের অর্ধচন্দ্র ও খ্রিস্টানদের ক্রুশ সব শোভা পাচ্ছে।

শ্মশানে পৌঁছে খাট ঘিরে অনেকক্ষণ সঙ্কীর্তন চললো। ঠাকুরের প্রিয় গায়ক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় শোকাহত অবস্থায় কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। এঁর রচিত নববৃন্দাবন নাটকে নরেন্দ্র কয়েকবার অভিনয় করেছেন। প্রভু নিজেও এই নাটক দেখতে যান। এঁর রচিত কয়েকটি গান তাঁর খুবই প্রিয় ছিল—'আমায়ে দে মা পাগল করে', 'গভীর সমাধি সিন্ধু অনন্ত অপার', 'নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি', 'চিদানন্দ সিন্ধুপারে প্রেমানন্দের লহরী।' শ্মশান সঙ্কীর্তনের পরে ভক্তদের অনুরোধে সান্যাল মহাশয় কয়েকটি গান গাইলেন, যেসব গান প্রভুর প্রিয় ছিল। এবার যথাবিহিতভাবে গঙ্গায় তাঁর শরীর ধৌত করে, পুষ্পমাল্যে সজ্জিত অবস্থায় চিতায় স্থাপন করা হলো। তাঁর প্রিয় শিষ্যগণ পুত্রবৎ ধর্মপিতার দেহে অগ্নিপ্রদান করলেন।

কী আশ্চর্য! এই সময়ে আবার ভাদ্রের গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হলো। আমি কাছে দাঁড়িয়ে আছি, ভক্তদের দেখছি একমনে। বিশেষ করে উপেন মুখার্জিকে। এই শ্মশানে একটু পরেই যে তার সর্পদংশন হবে এবং তা সত্ত্বেও তার প্রাণ যে রক্ষা পাবে তা জানা ছিল না।

তাঁর শীর্ণ শরীরকে অগ্নি সম্পূর্ণ পরিবেষ্টন করেছে, সেই সময় হঠাৎ আমার ভগবান বুদ্ধের কথা স্মরণ হলো। কোথায় যেন পড়েছিলাম চিতাগ্নিতে প্রবেশ করার পূর্বে বুদ্ধ-দেহ থেকে তাঁর শিষ্য কেমো থেরো একটি দাঁত সংগ্রহ করে নিয়েছিল। আড়াই হাজার বছর পরেও সেই দাঁত নিয়ে পৃথিবীর মানুষের কি বিপুল আগ্রহ। সামান্য একটি দাঁত নিয়ে পৃথিবীতে কত কি ঘটলো।

মাত্র এক ঘণ্টায় সব শেষ। বৃষ্টি বেশ বাধা দিয়েছে। কেন জানি না এই সময় আমি একটু তন্ময় হয়ে ছিলাম।

শশী একটা কলসে চিতাভস্ম সংগ্রহের সময় ঈষৎ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। পূতাস্থি সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা ছিল না, জানতাম নাভিদেশকে অগ্নি গ্রাস করতে অসমর্থ। কিন্তু ভস্মরাশির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আমি একটি দাঁত সহজেই পেলাম এবং সেটি নিপুণভাবে তড়িৎগতিতে পাশপকেটে সংগ্রহ করলাম। শ্মশানে কেউ চোরকে প্রত্যাশা করে না।

আর চৌর্যই বা বলবো কেন? মহাশ্মশানে শশী পূতাস্থিকলস পূর্ণ হবার পরে অনেকেই তো বিশেষ আগ্রহে এগিয়ে এলো। মনে হলো স্বয়ং নরেন্দ্রও তাঁর উত্তরীয়তে কিছুটা পূতাস্থি সংগ্রহ করলেন।

পরে শুনেছি, এই পূতাস্থি নরেন্দ্র রক্ষা করতে পারেননি। কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে নিজের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে নরেন্দ্র জননী অসাবধানবশতঃ সেই কাপড় খুলে কেচে ফেলেন, ফলে নরেন্দ্রর নিজস্ব সংগ্রহ বলে কিছু রইলো না।

সকলেই ভক্তিভরে সংগ্রহ করছে, আমি তার থেকে বঞ্চিত হবো কন? কেবল আমার মধ্যে অন্যদের মতো ভক্তির পূর্ণ উপস্থিতি নেই। আমি তখনও ভাবছি, একদিন যখন ভগবান বুদ্ধের মতন এই মানুষটির বাণী দিকে দিকে সম্প্রচারিত হবে, তখন আমি জীবিত না থাকলেও আমার বংশধররা বিপুল সৌভাগ্যের অংশীদার হবে। বংশগোপাল বিশ্বাসের বংশধররা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দাঁতের মালিক। না, মালিক বা স্বত্বাধিকারী কথাটা তেমন ভাল লাগছে না। তবু বিশ্বাস রাখি যে পবিত্র দেহাবশেষের রক্ষণাবেক্ষণকারী ভাবতে দোষ কোথায়?

মহাসমাধির পরেও কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সময়ের শাসন অমান্য করে, বিবাহের পরেই আমি বর্মায় পাড়ি দিয়েছি জীবনসংগ্রামের তাগিদে, ভাগ্যের সন্ধানে। ভাগ্যদেবী অবশ্যই সুপ্রসন্না হয়েছেন। বিদেশে বেশ কিছু উপার্জন করে একবার কলকাতায় ফিরে শুনলাম যে নরেন্দ্র আর আমাদের নরেন্দ্র নেই!

শিকাগো থেকে বিশ্ববিজয়পর্ব শুরু করে সে আবার দিগ্বিজয়ী আলেকজান্ডারের মতন দেশে ফিরে এসেছে। নরেন্দ্রনাথ মঠ নির্মাণের জন্য বেলুড়ে জমি কিনেছে বিদেশিনী ভক্ত মিস্. হেনরিয়েটা মুলারের অর্থানুকূল্যে, সেইখানেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে একালে মহাতীর্থ রামকৃষ্ণ মঠ। এখানেই মাথায় করে নরেন্দ্রনাথ বয়ে এনেছে আত্মারামের কৌটো, আত্মারাম এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে অন্তত দেড় হাজার বছর পৃথিবীর ওপর আধিপত্য করবেন।

আমি এখন দিশাহারা। আগের তুলনায় আমি কিছুটা সচ্ছল হয়েছি, কিন্তু অবশ্যই আমাকে ধনী বলা চলে না। বার্মায় দ্বিতীয়বার ফিরে এসে আমি বেশ কিছুটা বিচলিত। আমার প্রথম সন্তান প্রাণচঞ্চল, স্বাস্থ্যবান, কোথাও অসুখের কোনও চিহ্ন ছিল না। অনেক প্রত্যাশায় তার নাম দিয়েছিলেন বংশমহিমা। কিন্তু অকালে বংশগোপালকে বজ্রাহত করে একদিন গভীর রাতে সে বিদায় নিল রেঙ্গুনে। শ্মশানে তার পূতাস্থিতেও একটা দাঁত দেখেছিলাম। আমি অবশ্য মাথা

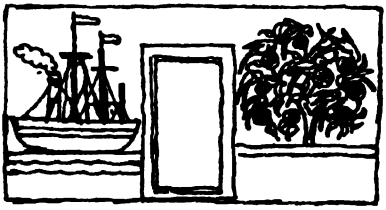
ঘামাইনি।

কাশীপুরে সংগৃহীত পবিত্র দন্তটি রুপোর কৌটোয় সংগ্রহ করে আমি পরম যত্নে ও গোপনে বার্মার বিভিন্ন জনপদে ঘুরে বেড়িয়েছি। বার্মাতেও তাঁর নাম প্রসারিত হয়েছে, মঠ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীরা এখানেও তাঁর নামগানে ব্যস্ত। মনে হয়, তাঁর বাণীতে একদিন সমগ্র বিশ্ব বিমোহিত হবে।

কিন্তু কবে? বুদ্ধের বাণী বিশ্ববাণীতে রূপান্তরিত হতে তো অনেক যুগ অতিক্রান্ত হয়েছিল।

আমি তরুণ এক সন্ন্যাসীকে এই প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, স্বামী বিবেকানন্দ তো রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেছেন ১৮৯৭ সালে, অল্প সময়ের মধ্যে বেলুড় মঠ তো স্থাপিত হয়েছে, এবার অপেক্ষা করতে হবে আত্মরাম কী খেলা দেখান। এক শতাব্দীতেই হয়তো সহস্র বছরের কাজ সম্পন্ন হবে। কে জানে? রামকৃষ্ণ যাঁর নাম, বিবেকানন্দ যাঁর চেলা সেখানে অসম্ভব বলে কিছু নাও থাকতে পারে। শোনেননি ওই গান? দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী...। সুতরাং শতবর্ষেই সহস্র গুণ বেড়ে যাবে তাঁর মূল্য, কিংবা আরও বেশি।

আমি হিসেব করেছি, মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নাইনটিন নাইনটিসেভেন তো মাত্র কয়েক দশক দূরে। ললিতকে তখন আর কেউ লেট ললিত এই দুর্নাম দিতে সাহস পাবে না।"



"অবিশ্বাস্য! স্বয়ং ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত", আনন্দে আত্মহারা হয়ে হরিময়বাবু কী করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না।

ভবনাথবাবু নিজেও এবার উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। প্রথমে ঠাকুর সম্বন্ধে লেখবার তেমন উৎসাহ পাচ্ছিলেন না, আর এখন স্বয়ং ঠাকুরই একখানা রেডিমেড গল্প স্পেশাল মোড়কে পুরে লেখকের শ্রীহস্তে নিজেই তুলে দিতে

চাইছেন।

পিকলুকে তার দাদু এবার কয়েক জায়গায় দ্রুত ঘুরে আসতে নির্দেশ দিলেন।

ঠাকুমা একটু আপত্তি জানালেন। "একরত্তি ছেলে, ছুটিতে রয়েছে। তাকে এইসব জটিল ব্যাপারে ঢোকানো কেন?"

ভবনাথ সেন বললেন, "গিন্নি, যাদের বয়স কম এবং এনার্জি বেশি নবযুগে তাদেরই তো জয়ধ্বনি উঠবে। কম বয়স থেকেই ওরা বিশ্বসংসারকে জানুক, কিছু শিখুক। ঠাকুর-স্বামীজি তো শুধু বড়োদের সম্পত্তি নয়। এই দন্তরহস্য ঠিক মতন উন্মোচন হলে, দেশের মস্ত বড়ো একটা কাজ হবে। এর নামই তো রামকৃষ্ণশক্তি!"

বইপত্তর খোঁজ করে এবং বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলে পিকলু সল্ট লেকে ফিরলো যথাসময়ে। বেলুড়ে স্বামী প্রভানন্দ ওরফে বরুণ মহারাজ অসুস্থ, তাঁর সুচিন্তিত মতামত পাওয়া যায়নি।

শঙ্করী বসু তাঁর ওলাবিবিতলার বাড়িতে বসে পিকলুর সঙ্গে অনেক কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি এতো রেফারেন্স দিয়েছেন বিভিন্ন সূত্র থেকে যেসব খুঁজতে গেলে দশ বছর সময় লেগে যাবে।

সেই সময় হুটকো হালদার সাগ্রহে পিকলুকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। টপাটপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অন্তিম পর্বের ঘটনাগুলো সাজিয়ে দিয়েছেন। অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, কবিরাজ যাঁরা ঠাকুরকে চিকিৎসা করেছিলেন অন্তিমকালে তাঁদের ঘরের খবর দিয়েছেন। কিন্তু ঠাকুর কখনও ডেনটিস্টের শরণাপন্ন হয়েছিলেন কি না এবং হলে সেই ডাক্তারের নাম কী তা হুটকো হালদার বলতে পারেননি। ঠাকুরের ছবি দেখে, হাবভাব দেখে মনে হয় তাঁর দাঁত খুব ভাল ছিল না।

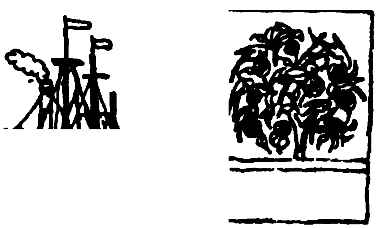
হুটকো হালদার এমনও বলেছেন, শ্মশানে অল্প তাপে দাঁত না পোড়া কোনো আশ্চর্য ব্যাপার নয়। আজকাল বৈদ্যুতিক চুল্লিতে অবশ্য আলাদা ব্যাপার—ছাইটা পাউডারের মতন হয়ে যায়।

দাদু বললেন, "প্রথম কথা, কল্পতরুর পরেও ঠাকুর এক-আধবার কল্পতরু হয়েছিলেন, প্রিয় শিষ্য নরেন্দ্রর অনুরোধে। ঠাকুরের বিদায়-সময় আগত এই আশঙ্কা করে নরেন্দ্র একবার তাঁর খুড়তুতো ভাই সুপ্রসিদ্ধ বাদক হাবু দত্তকে কাশীপুরে নিয়ে গেলেন। বিরক্ত ঠাকুর প্রথমে বললেন, 'আমি মরতে বসেছি, এখন আর কাকেও ছুঁয়ে দিতে পারবো না।' কিন্তু প্রধান শিষ্য নাছোড়বান্দা। তখন

ঠাকুর হাবু দত্তর বুকে আঙুল দিলেন, লোকটা বুঁদ হয়ে পুতুলের মতন মেঝেতে বসে রইলো। নেশাড়ে লোক, একটু দূরে নিয়ে গিয়ে চিন্তিত নরেন্দ্র বললেন, দাদা গাঁজা খাবি? হাবু দত্ত আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় বললো, আমি বুঁদ নেশায় ছিলাম—গাঁজার নেশা ফিকে নেশা—ওই বুঁদ নেশাটা চাই।"

পিকলু খবর পেয়েছে, পরবর্তীকালে সঙ্গীতজ্ঞ এই হাবু দত্ত একটা হাড়ের মালা পরতেন, যা নাকি রামকৃষ্ণের পূতাস্থিতে তৈরি। সে মালা কোথায় হারিয়ে গেলো সে খবর এখনও পাওয়া যায়নি। নিশ্চয় কেউ গোপনে রেখে দিয়েছে, ফাঁস করছে না। কেউ কেউ বলে, বাদ্যাচার্য হাবু দত্তও শ্মশানে ঠাকুরের অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেই অস্থি সারাজীবন পূজা করেছিলেন। হাবু দত্ত সাধারণ শিল্পী ছিলেন না। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী গায়িকা মাদাম কাল্‌ভে বেলুড় মঠে হাবু দত্তর এস্রাজ শুনে মোহিত হয়েছিলেন। এসব খবর আরও দিতে পারতেন, স্বামীজির মেজভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে মহিমবাবু, তাঁর লেখা বইগুলো তো বিচিত্র সংবাদের অমৃতভাণ্ড। ওখানেও খোঁজ করে দেখতে হবে।

পিকলু আরও সংগ্রহ করে এনেছে নরেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর অভিমত। অনেক শিষ্যই শ্মশান থেকে অস্থি সংগ্রহ করেছিলেন। তার মধ্যে একজন ছিলেন বুটো কালী ওরফে কালি মুখার্জী। তিনি কলকাতার বাড়িতে এবং পরে হুগলী জেলার গোপীনাথপুরের বাড়িতে সেগুলো পুজো করতেন।



ভবনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পূতাস্থির ব্যাপারটা তাহলে এখনও কিছুটা রহস্যময় হয়ে রইলো।"

পিকলু ব্যাখ্যা করলো, "এটা বোঝা যাচ্ছে, বেলুড়ে যে আত্মারামের কৌটো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এ ছাড়াও কেউ কেউ ১৬ আগস্ট চিতাভস্ম সংগ্রহ করেছিলেন। পূতাস্থির পুরো হদিস এখনও জানা গিয়েছে কি না সন্দেহ।

আত্মারাম শব্দটি হরিময়বাবুর তেমন পরিচিত নয়। ভবনাথ বললেন,

"বেলুড়মঠে ঠাকুরের দেহাবশেষ যে তামার পাত্রে রাখা হয়েছে তার গায়ে 'আত্মারাম' শব্দটি উৎকীর্ণ। স্বামীজীর দেওয়া নাম।"

ভবনাথবাবু প্রস্তাব করলেন, "পিকলু, হাওড়ার রহস্যটা তুমি ঝটপট সাজিয়ে নাও যেসব তথ্য পেয়েছো তার ভিত্তিতে। তারপর সবাই মিলে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।"

পিকলু বললো, "ব্যাপারটা এখনও পুরো পরিষ্কার হয়নি দাদু। এক : প্রিয় শিষ্যদের কেউ কেউ ঠাকুরের পূতাস্থি কিছুটা নিজেদের শরীরেই ধারণ করেছিলেন, খেয়ে ফেলে। এর মধ্যে বিবেকানন্দ ছিলেন। দুই : বিবেকানন্দ নিজের কাপড়ের খুঁটে কিছুটা ভস্ম নিয়ে গিয়েছিলেন বাড়িতে। সেই ছাড়া কাপড় ভুল করে তাঁর মা ধুয়ে ফেলেছিলেন, সেকথা আগেই জানা গিয়েছে। তিন : অস্থিভস্মের মূল কলসিটা শ্মশান থেকে সোজা গিয়েছিল কাশীপুরে এবং ঠাকুরের বিছানার ওপর তা সযত্নে রাখা হয়েছিল।"

পিকলু এবার নতুন খবর এনেছে। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের চুল এখনও আমাদের আয়ত্তের মধ্যে রয়েছে। তবে এচুল শ্মশান থেকে সংগৃহীত বলে মনে হয় না। রামকৃষ্ণগৃহিণী সারদা দেবী রুপোর কৌটায় এই চুল রেখেছিলেন। কৌটোটি দিয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। এই পবিত্র কেশ এখন বাগবাজার মায়ের মন্দিরে রয়েছে।

এবার পিকলু জানালো, "হুটকো হালদারের মতে, ঠাকুরে পার্ষদরা এই দেহ পুড়নোর ব্যাপারে নাকি মোটেই রাজি ছিলেন না। কিছুটা চাপে পড়েই শ্মশানে যাওয়া হয়েছিল।"

"কিন্তু বংশগোপাল লিখছেন, অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ ধর্মপিতার দেহে অগ্নিপ্রদান করেন।"

"হ্যাঁ," পিকলু ব্যাপারটা মেনে নিলো। "কিন্তু অনেকদিন পরে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ এক ভক্তকে লিখেছেলেন, 'ভগবান রামকৃষ্ণের শরীরে নানা কারণে অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে। উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধহয় মুক্ত হইব।' ঠাকুরেরও ইচ্ছা ছিল তাঁর দেহাবশেষ গঙ্গার ধারে বিশ্রাম করুক। এক ভদ্রলোক মহিমা চক্রবর্তী দশ কাঠা জমি দেবেন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু পরে তিনি পিছিয়ে যান। এসব অবশ্য বেলুড়ের বড় জমি মার্কিন মেমসায়েবের অর্থে কেনবার আগেকার কথা। বেলুড়ের জমির মালিক ছিলেন এক বিহারী

ভদ্রলোক। ওই জমিতে জাহাজ সারানো হতো।”

ভবনাথ বললেন, “পূতাস্থি সম্বন্ধে যা পাওয়া যাচ্ছে তা সংক্ষেপে বলো পিকলু আমাদের এখন অনেক কিছুর খবরাখবর নিতে হবে।”

পিকলু বললো, “প্রথমেই বলে রাখি শ্মশানযাত্রার সময় ঠাকুরের শরীর কিছুটা বিকৃত বা ডিকমপোজড হয়েছিল। স্বামী অভেদানন্দের লেখায় খবরটা স্পষ্ট রয়েছে। দাহকার্য সম্পন্ন করে কলসি নিয়ে কাশীপুরে ফেরা হলো এবং ঠাকুরের ঘরে অস্থি রেখে ঠাকুরের জীবন আলোচনা করলেন নরেন্দ্রনাথ, যাঁকে ঠাকুর আদর করে মাঝে-মাঝে শুকদেব বলে ডাকতেন।”

মহাসমাধির পরে ত্যাগী শিষ্যদের চিন্তা, এখানে থাকতে পারলেই ভাল হতো, কিন্তু বাগানের মালিককে কে ভাড়া দেবে? ভক্ত রামবাবু স্থির করেছেন, আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ভাড়া দেবেন।

অভেদানন্দ লিখেছেন, “অগত্যা আমরা রামবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম—পরে আমরা যাইবো কোথায়? রামবাবু আমাদের সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—তোমরা যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যাইবে। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, অস্থি তাহা হইলে কোথায় রাখা হইবে? রামবাবু বলিলেন, কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যোগোদ্যানে, সেইখানেই শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থি সমাধি দেওয়া হইবে।”

অভেদানন্দ লিখেছেন, “ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ...রামবাবু কিন্তু কোনও কথাই শুনিলেন না। ...তিনি তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত আমাদিগকে জানাইয়া সেই রাত্রেই বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

“রাত্রি অধিক হইল। নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ আমরা সকলেই নির্বাক হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের অস্থিকলসের চতুর্দিকে বসিয়া আকাশপাতাল চিন্তা করিতেছি। এমন সময় নিরঞ্জন বলিল : ‘আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূত অস্থি কিছুতেই রামবাবুকে দিব না।’ আমরা নিরঞ্জনের সহিত একমত হইলাম। নরেন্দ্রনাথ আমাদের নানা কথায় সান্ত্বনা দিয়া বলিল, ‘তোমাদের যা অভিমত, আমারও তাই।’ এখন আমরা সকলে স্থির করিলাম, শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র অস্থির বেশি অংশ কলস হইতে বাহির করিয়া একটি কৌটাতে রাখিয়া ওই কৌটা বাগবাজারের ভক্ত বলরাম বসুর বাড়িতে লুকাইয়া রাখা হউক এবং রামবাবু যেন ঘুণাক্ষরে সেই কথা কোনরকমে না জানিতে পারেন।”

অভেদানন্দ আরও লিখছেন, “...সেই রাত্রে কলস হইতে প্রায় সমস্ত অস্থি বাহির করিয়া একটি কৌটায় রাখা হইল এবং যৎসামান্য অস্থির গুঁড়া, ভস্ম ও

গঙ্গামৃত্তিকা সেই তামার কলসিতে রাখিয়া দেওয়া হইল। তাহার পর নরেন্দ্রনাথ বলিল, 'দ্যাখো, আমাদেব শরীরই শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন্ত সমাধিস্থল। এসো, আমরা সকলে তাঁর পবিত্র দেহের ভস্ম একটু করে খাই আর পবিত্র হই।' নরেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথমে কলসি হইতে সামান্য অস্থির গুঁড়া ও ভস্ম গ্রহণ করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া ভক্ষণ করিল। তাহার পর আমরা সকলেই তাহাকে অনুসরণ করিয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিলাম।"

"এরপর?" জিজ্ঞেস করলেন ভবনাথ সেন। অভেদানন্দর স্মৃতিকাহিনীর এই অংশটি তাঁর জানা ছিল না। "পিকলু তুমি ভাল কাজ করেছো।"

পিকলু বললো, "বিভিন্ন সূত্রে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে অস্থিকলসের ভ্রমণ বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। ৮ ভাদ্র জন্মাষ্টমির দিনে ব্যাপারটা ঘটলো। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। সকলেই সঙ্কীর্তন করছেন।"

অভেদানন্দ বলছেন, "রামবাবু তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই যেতে লাগলেন। শশী (পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) অস্থি কলসটি সযত্নে মস্তকে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে আমাদের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিল। ..সেই দিন রাত্রে আমরা সকলেই যোগোদ্যানে থাকিয়া গেলাম।"

পিকলু বললো, "স্বামী অভেদানন্দ তাঁর লেখায় খবরেব কাগজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। শোভাযাত্রার অগ্রে খোলকবতাল শিঙ্গাসহ থিযেটারের কয়েকজন অভিনেতার সঙ্কীর্তন দল, পরে পাখোয়াজ দল। শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে কলসটি মস্তকে ধারণ করে চলেছেন।"

এরপর একই বিষয়ে লাটু মহারাজের স্মৃতিচারণ বেশ নির্ভরযোগ্য। পিকলু খবর নিয়েছে, "এঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী অদ্ভুতানন্দ। প্রথম জীবনে রামবাবুর গৃহভৃত্য ছিলেন। তখন নাম হয় লাটু। ঠাকুর আশ্বস্ত করে বলতেন, লাটু, লোটা বা লেটো। ১৮৭৯ সালে দক্ষিণেশ্বরে প্রথম ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়। ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে লাটুই প্রথম তাঁর সংস্পর্শে আসেন। বিবেকানন্দ এঁকে প্লেটো বলে ডাকতেন। সন্ন্যাস নামটিও বিবেকানন্দের দেওয়া।" পিকলু বললো, "কাঁকুড়গাছির সমাধিগহ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের পূতাস্থির কলসটি রেখে তার ওপর মাটি ফেলা হচ্ছিল। শশী আর্তনাদ করে উঠলেন, 'ওগো ঠাকুরের গায়ে বড় লাগছে।' সেই কথা শুনে সকলের চোখে জল।"

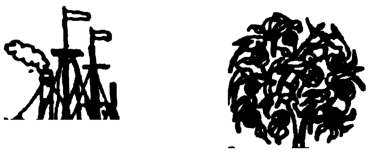
পিকলু বললো, "কাশীপুরে কল্পতরুর দিনে বংশগোপালবাবুর দিনলিপিতে যা লেখা রয়েছে অভেদানন্দের স্মৃতিচারণায় তার যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে দাদু। ঠাকুর সেদিন কাউকে বললেন, তোমাদের চৈতন্য হোক। কাউকে আশ্বাস

দিয়ে বললেন, 'তোর হবে।' বসুমতীর উপেন মুখুজ্যে গরিব অবস্থায় ছিলেন, তিনি অর্থ প্রার্থনা করলে ঠাকুর কৃপা করে জানালেন, 'তোর অর্থ হবে। অর্থ হয়েছিল। কিন্তু শোনা যায় তাঁর সুখ হয়নি। ঠাকুর কাউকে আবার বলছেন, 'পূর্ণ হবে।'"

ভবনাথবাবু মন্তব্য করলেন, "আত্মারামের কৌটো কথাটা খুব মজার। মৃত্যুর পরেও রামকৃষ্ণের রসরসিকতা। এই রসিক ভাবটাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে এমন প্রাণবন্ত করে রেখেছে। হোমড়া মুখো গুরুর গোমড়া বাণী কে শুনে সুখ পায়?"

বহু বছর ঘোরাঘুরি করে এই আত্মারাম যে শেষ পর্যন্ত বেলুড় মঠে চিরআশ্রয় পেলো তা আমরা ভালভাবেই জানতে পারছি।

পিকলু বললো, "প্রয়োজনে আমাদের বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ঘুরে আসতে হবে। যেদিন মঠের নতুন জমিতে পূতাস্থি প্রতিষ্ঠা করলেন, সেদিন বিবেকানন্দ প্রকাশ্যে জানিয়েছিলেন, 'ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি, আর কুটিরই কি।' সেইজন্যে আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নতুন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজন হিতায়' ঠাকুর ওই স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"



হরিময়বাবু ও পিকলু মোটরবাইকে সল্ট লেক থেকে সোজা হাওড়ার হিদারাম হালদার লেনে ফিরে আসছেন।

হরিময়বাবু এখন একটু গম্ভীর গম্ভীর ভাবেই বললেন, "নিজেদের অজান্তেই একটা সিরিয়াস সমস্যায় আমরা ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি। আমার তেমন ভাল মনে হচ্ছে না, পিকলু। ১৮৮৬ সালে শ্রীদন্ত সংগ্রহ করে, ১১১ বছর পরেও এই ১৯৯৭ সালে সেই পরিস্থিতি সামলাতে পারছেন না বংশগোপালের সুযোগ্য বংশধররা।"

হরিময়বাবু নিজের মনোভাব লুকিয়ে রাখলেন না। "কী দরকার ছিল এইসব মহাপুরুষশরীরে নজর দেওয়ার? মহামানবদের নিয়ে খেলতে গেলে ফল কখনই ভাল হয় না, পিকলু। বংশগোপালের পারিবারিক শোক, পারিবারিক আঘাত, পারিবারিক মানসিকতা দেখে মনে হচ্ছে কিনা কোথায় একটা গুরুতর অন্যায় হয়ে গিয়েছে। এবারের বংশগোপাল কাহিনী থেকে আমাদের এইটাই শিক্ষা।"

পিকলু বললো, "সমস্যার সমাধান এখনও হয়নি হরিময়দাদা। এখনও অনেক কিছুই আমরা জানি না। অনুসন্ধান চালাতে চালাতে আরও অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। এখনও আমরা জানি না, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দাঁত আদৌ অক্ষত আছে কি না এবং থাকলেও সেটা কোথায় লুকনো? বুদ্ধের দাঁত নিয়ে পৃথিবীতে যা কেলেঙ্কারি হয়েছে ভাবলে লজ্জা লাগে। ভারতের মাটিতে ক্রিশ্চানরাও কীরকম নিপীড়কের ভূমিকা নিয়েছিল তার একটা প্রমাণ এই বুদ্ধদন্ত ধ্বংসকথা।"

হরিময়বাবু বললেন, "সাধারণ খ্রিস্টানরা নন, বোম্বেটেরা নরেন্দ্রনাথের জীবনও দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন কেউ কেউ। বরাহনগরে প্রচারকরা তো প্রস্তাব দিয়েছিল, তোমরা ধর্মান্তরিত হও, হাতে অনেক মেমসায়েব আছে, বিবাহাদি করে সুখে থাকতে পারবে। এই না শুনে এক ভক্ত এমন তেড়ে গেলো যে প্রচারকরা ল্যাজ তুলে দৌড়।"

এরপর হরিময়বাবু বললেন, "যতোই এই শ্মশান থেকে দাঁত চুরির সমালোচনা করো, বংশগোপাল বিশ্বাসমশায়ের দূরদৃষ্টি ছিল, মিস্টার পিকলু। ঠিক বুঝেছিলেন, নাইনটিন নাইনটি সেভেনে রামকৃষ্ণ মিশনের সেনটেনারি, ওই সময় রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিশেষ ঔৎসুক্যের নতুন ঢেউ উঠবে। সেই ঢেউ শুধু বেলুড়ে আছড়ে পড়বে না, তার প্রভাব ছড়িয়ে যাবে দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তে। রামকৃষ্ণের এবং বিবেকানন্দর জীবনের ছোটখাটো এবং বড়বড় ঘটনা জানবার জন্য সাধারণ মানুষের আগ্রহের শেষ থাকবে না।"

পিকলু বললো, "ছোট এবং বড দুই ব্যাপারেই উৎসাহ ক্রমশ বেড়ে চলবে, হরিময়দাদা। পূতাস্থি সম্বন্ধে খবর করতে গিয়ে দেখি, একজন জার্নালিস্ট খোঁজ করছেন, মিনার্ভা থিয়েটারের কাছে কোন রেস্তোরাঁয় নরেন্দ্রনাথ তাঁর দলবল নিয়ে ফাউল কাটলেট খেতে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে ঠাকুরের কাছে সেই খাওয়ার রিপোর্ট দিয়েছিলেন এবং সুরসিক ঠাকুর সস্নেহে তাঁদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।"

৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে ফিরে এসে হরিময়বাবু এবার সহকারী বিজয়ের সঙ্গে কথা বললেন।

ওর কাছে তিনি শুনলেন, একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। চমচম অফিসের দিকে তিনি অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। বিজয় যখন তাঁকে জানালো, সম্পাদক কলকাতায় গিয়েছেন, পত্রিকার লেখকদের সঙ্গে জনসংযোগ করতে তখন তিনি বিশ্বাস লজের দোতলায় চলে গেলেন।

"সন্ন্যাসী! আহা! আমাদের হিদারাম হালদার লেনের বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের পবিত্র পায়ের ধুলো পড়লো", পুলকিত হলেন হরিময়বাবু। বিজয়কে তিনি বললেন, "মিশনের সন্ন্যাসী দেখলেই পায়ের ধুলো নেবে, আমি না থাকলেও তাঁদের মিষ্টি খাওয়াবে। সাধুসেবার মতন কোনও সেবা পৃথিবীতে নেই, বুঝেছো বিজয়?"

পিকলুর মাথায় এসব কথা ঢুকছে না। সে জিজ্ঞেস করলো, "স্বামীজি ওপরে কতক্ষণ ছিলেন?"

বিজয় জানালো, "তা অনেকক্ষণ। তারপর বোধহয় বংশগোলাপবাবুর নির্দেশে দারোয়ান ম্যানেজার সিং তাঁকে সমস্ত সম্পত্তিটা ঘুরিয়ে দেখালো।

হরিময়বাবু আন্দাজ করলেন. "বংশগোলাপবাবুর মধ্যে নিশ্চয় বংশলোপের ভয় জন্মেছে। বসুমতীর উপেনবাবুর পরিবারে শেষ পর্যন্ত কী হয়েছে তা তো কারও অজানা নয়, আকস্মিক অকালমৃত্যু এমন সুন্দর পরিবারকে ধ্বংস করে দিলো। মনের দুঃখে বসুমতীমা চলে গেলেন পশ্চিমে। সুতরাং এক্ষেত্রে মঠমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা তো বংশগোলাপবাবুর পক্ষে সুবিবেচনার কাজ।"

পিকলুর মাথায় এখনও এসব ঢুকছে না। সে বললো, "একটু শুয়ে নেওয়া যাক হরিময়দাদা। বংশগোলাপবাবুর সঙ্গে ভালভাবে কথা বলতে গেলে তো মাঝরাতে কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে বিছানা থেকে উঠে তাঁর ঘরে টোকা মারতে হবে।"

মাঝরাতে দোতলার ব্যালকনিতে বসে পিকলুর সঙ্গে বংশগোলাপ বিশ্বাসের অনেক কথা হলো। ভদ্রলোকের শরীর খারাপ। স্টোর রুমে পিতৃপুরুষদের পুরনো কাগজপত্র অনুসন্ধান করতে গিয়ে সম্প্রতি প্রচুর ধুলো খেয়েছেন। প্রথমে হাঁচির পর হাঁচি। তারপর নাক দিয়ে জল। আরও কিছুক্ষণ পরে হাঁপানির প্রবল আক্রমণ।

"অর্ডিনারি ধুলো তো নয়, বুঝতেই পারছেন। হাফ এ সেঞ্চুরি আগেকার ধুলো। বিষের মতন হয়ে গিয়েছে। অথচ ধুলো ঘেঁটে তেমন কিছু লাভ হলো

না। প্রপিতামহের প্রত্যেক মাসের হিসেবের খাতা পরীক্ষা করে শিবপুর বাজারে কবে বেগুনের দর কত ছিল তা জেনে আমি কী করবো? এসব জঞ্জাল জমিয়ে রেখে জায়গা নষ্ট করার কোনও মানে হয় না, মিস্টার পিকলু।"

"বলবেন না ও কথা, সযত্নে রেখে দেওয়া হিসেবের খাতা থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের ইতিহাস খতিয়ে দেখছেন এক বিখ্যাত গবেষক। প্রায়ই দাদুর কাছে তিনি আসেন এবং হিসেব খাতা সম্বন্ধে গল্প করেন। রবীন্দ্রনাথের বউঠান আত্মহত্যা করার পর কী পরিস্থিতি হয়েছিল তা এই খরচ খাতা থেকেই পরিষ্কারভাবে আন্দাজ করা যাচ্ছে।"

বিশ্বাস লজে সাধুসমাগম সম্পর্কে কিন্তু একটা কথাও তুললেন না বংশগোলাপবাবু। তিনি এবার প্রসঙ্গ তুললেন, নামী লোকদের ব্যবহৃত নানা জিনিসপত্তর সম্বন্ধে।

পিকলু এই কদিনেই এবিষয়ে কিছুটা বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছে। সে বললো, "জর্জ ওয়াশিংটনের চার জোড়া নকল দাঁতের হদিশ পাওয়া গিয়েছে তা তো আপনি জানেন। জর্জ ওয়াশিংটনের জিনিসপত্তর সংগ্রহের জন্য মার্কিনিরা এখন অবিশ্বাস্য দাম দিতে চায়। প্রেসিডেন্ট কেনেডির স্ত্রীর পুরনো জামাকাপড়ের দাম চড়চড় করে কীরকম উঠছে দেখছেন না।"

পুরনো জিনিসের দাম যে হুড়হুড় করে বাড়ছে সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাইছেন বংশগোলাপবাবু।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের চটির দাম আদিতে ছিল পাঁচসিকে এখন নিশ্চয় পাঁচলাখ টাকা।" বললো পিকলু। এই চটি কিনে দিয়েছিলেন এক চিকিৎসক। বেলুড়ে গিয়ে ঠাকুরের চটি দেখে এসেছে পিকলু।

"রামকৃষ্ণের তিরোধানের দিনে সারদামণির একটা কাপড় চুরি গিয়েছিল। সেই কাপড়টা কেউ হদিশ করলে মোটা টাকা পেতে পারে।"

কলকাতায় আরও কিছু খোঁজখবর নিয়েছে পিকলু। বিবেকানন্দ বিষয়ক দামি সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে মিস জোসেফিন ম্যাকলাউডের লকেট, যা তৈরি হয়েছিল প্যারিসের বিখ্যাত মণিকার লালিক কোম্পানিতে। এই লকেটের মধ্যে ট্যানটিন অর্থাৎ মিস ম্যাকলাউড সযত্নে রেখেছিলেন তাঁর বন্ধু বিবেকানন্দর কেশগুচ্ছ। এই কেশগুচ্ছ তিনি আচমকা কেটে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় ছিলেন। স্বামীজি তো প্রথমে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু মিস ম্যাকলাউড সস্নেহে মুখের ওপর বললেন, "অনুমতি চাইলে আপনি তো দিতেন না, তাই ক্যাঁচ করে চুল কেটে কাজ সেরেছি।"

এই মহামূল্যবান লকেট একবার চুরি হয়ে যায় বেলুড় মঠ থেকে। মিস ম্যাকলাউড তখন মঠে অবস্থান করছেন। চোর এসেছিল রাত্রে। কিন্তু হাতেনাতে ধরা পড়ে যায়। এনিয়ে অনেক মজার কাণ্ড হয়েছিল। মঠের চোর তো।

আর একবার মিস ম্যাকলাউডের এই লকেট হারিয়ে যায় মায়াবতী আশ্রমে। সন্দেহ করা হলো চুরি হয়েছে। পুলিশ এসেই হইচই বাধালো, অনেক নির্দোষ কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পরিবেশ বিষাক্ত করে তুললো। পুলিশের হাত থেকে কর্মীদের রক্ষে করতে গিয়ে সন্ন্যাসীদের লজ্জার শেষ নেই। অবশেষে লকেট ফেরত পাওয়া যায় অপ্রত্যাশিতভাবে এক বছর পরে। মিস ম্যাকলাউড তখন এদেশে নেই। এই লকেটের দাম এখন কয়েক লক্ষ টাকা।

এ ছাড়াও আছে বিবেকানন্দর আংটি, যা মিস ম্যাকলাউড সস্নেহে প্রায় কেড়ে নিয়েছিলেন বিবেকানন্দর কাছ থেকে। এই বলে যে সন্ন্যাসীর হাতে আংটি? প্রশ্ন শুনেই বিবেকানন্দ হাসিমুখে এই আংটি দিয়ে দিয়েছিলেন জোসেফিনকে। এই আংটির মধ্যেও বিবেকানন্দকেশ রেখেছিলেন মিস ম্যাকলাউড। সেই আংটি নানা দেশ ঘুরে এখন রয়েছে কলকাতায়, তবে কোথায় এবং কার কাছে আছে তা পিকলুর জানা থাকলেও বলা চলবে না। খবরটা প্রকাশ করবার অনুমতি নেই।

বিবেকানন্দ লকেটের দাম যদি দশ লাখ হয়, তা হলে ঠাকুরের পবিত্র দন্ত কত গুণ মূল্যবান হতে পারে তা বিলেতের ভ্যালুয়েশন বিশেষজ্ঞ ছাড়া কারও পক্ষে হিসেব করা সম্ভব নয়। লন্ডনে সদবি কোম্পানিতে পিকলুর বন্ধুর মা কাজ করেন, তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে হয়তো কাজটা করতে পারেন। দেখা গেছে সেন্টিমেন্টের জিনিস হলে, হুড়মুড় করে দাম বেড়ে যায়।

অনাবাসী কোনও ভক্ত হয়তো সহজেই মিলিয়ন ডলার দিতে রাজি হয়ে যাবেন। আর সদবির বিখ্যাত নীলামে চড়ালে দাম শেষ পর্যন্ত কোথায় উঠতে পারে তা স্বয়ং সদবিও জানেন না। কয়েক মিলিয়ন ডলারের মালিক এমন রামকৃষ্ণভক্ত বিদেশে অবশ্যই আছেন। কিন্তু ঠাকুর ঐ টাকাকড়ির হিসেবই জানতেন না। কামিনী-কাঞ্চন এড়িয়ে তিনি নিজের জীবনকে সহজ করে নিয়েছিলেন।

মিলিয়নটা আবার হরিময়বাবুর গোলমাল হয়ে যায়। তিনি জানতে চাইলেন, "মানে দশ লাখ, আর বিলিয়ন হাজার লাখ, তাই তো? তার মানে, মিলিয়ন হলেই আমাদের টাকায় দাঁড়াচ্ছে চার কোটি টাকা! নট এ ব্যাড অ্যামাউন্ট। কী বলেন বংশগোলাপবাবু? দেখুন ঠাকুরের দয়ায় আপনাদের পরিবার আবার কোথায় উঠে যায়।"

বংশগোলাপের মুখে কিন্তু কথা ফুটছে না। তিনি বললেন, "চাকরি থেকে স্বেচ্ছাঅবসর নিয়ে আমি হাতে পেয়েছি মাত্র দু লাখ পঁচিশ হাজার। তা হলেই বুঝতে পারছেন তফাতটা!" বংশগোলাপ যেন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন।

এবার পিকলু সোজাসুজি বংশগোলাপকে জিজ্ঞেস করলো, "আজ কোনো সন্ন্যাসী এসেছিলেন আপনার কাছে?"

প্রশ্ন শুনে বংশগোলাপ প্রথমেই অবাক হয়ে গেলেন। "আপনি একেবারে রহস্যসন্ধানী ডিটেকটিভের মতো কথা বলছেন, মিস্টার পিকলু। মাথায় টুপি থাকলে বলতাম, হ্যাটস অফ্ টু ইউ!"

বংশগোলাপ ব্যাখ্যা করলেন, "খবরটা দেখছি চাউর হচ্ছে ক্রমশ। কয়েকজন স্বামীজি নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তলীলা সম্বন্ধে সারাক্ষণ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদেরই একজন আজ বেলুড় মঠ থেকে ফোন করেছিলেন। কোথাও যদি শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে অপ্রকাশিত কিছু তথ্য বা দলিল থাকে ত তাঁরা দেখতে চান। তা তিনিই পাঠিয়ে দিলেন তরুণ সন্ন্যাসীকে।" -

পিকলু ঘর থেকে বেরিয়ে এলো গম্ভীর হয়ে। হরিময় লক্ষ্য করলেন, পিকলুর মুড খারাপ হয়ে গিয়েছে। হরিময়বাবু প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপারটা কী মিস্টার পিকলু? মঠের সন্ন্যাসী, সে তো খারাপ ব্যাপার নয়—সাধুসঙ্গ বলে কথা।"

পিকলু এখন একটু বিরক্ত। বললো, "স্বয়ং স্বামী প্রভানন্দকে নিয়ে মিথ্যাচার চলছে। আজই আমি বেলুড়ে গিয়েছিলাম। স্বামী প্রভানন্দ রয়েছেন মাদ্রাজে, গুরুতর চোখের অসুখে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন। ডাক্তার বদ্রিনাথের ওখানে চিকিৎসা চলেছে। আর বংশগোলাপ বললেন কি না বেলুড় থেকে স্বামীজী ফোন করলেন। ব্যাপারটা মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না, হরিময়দাদা।"

হরিময়বাবুর সরল মন। অবিশ্বাস তাঁর সহজে আসে না। মানুষকে বিশ্বাস করেই তিনি জগৎ থেকে চলে যেতে চান। তিনি তাঁর কাজের লোক বিজয়ের কাছে শুনেছেন, যে-স্বামীজি বংশবাটিতে এসেছিলেন তাঁর নাম স্বামী বহুরূপানন্দ।

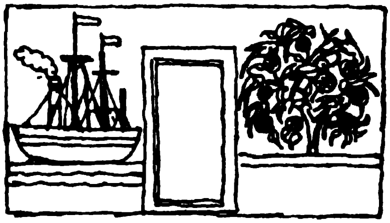
পিকলুর কাছে এই নামটাও যেন কেমন কেমন ঠেকছে।

হরিময়বাবু এবার বললেন, "রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনে সন্ন্যাসীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে, এতো সন্ন্যাস নাম কোথায় পাওয়া যাবে, পিকলু? তোমার দাদু ব্যাপারটা নিয়ে মজার গপ্পো লিখেছিলেন চমচমে। তাতে চরিত্র ছিল—গ্রহণানন্দ, হরণানন্দ এবং ভ্রমানন্দ। এসব শুনলেই তরুণ পাঠকদের সন্দেহ শুরুতেই প্রবল হয়ে ওঠে। গল্পটা গোড়া থেকেই জমে গেলো। যদিও এই গল্পের প্রধান খল

চরিত্র স্বামী ভোজনানন্দ, যিনি রোস্ট চিকেন না খেয়ে জপে বসতে পারেন না!"

পিকলুর অস্বস্তি কাটছে না। হরিময়বাবু বললেন, "হয়তো খোদ উদ্বোধন পত্রিকাতেই বংশগোলাপের বিস্ময়কর কীর্তি সম্পর্কে সুচিন্তিত সুসম্পাদিত কোনও প্রবন্ধ লেখা হবে।"

"উদ্বোধন বেলুড় থেকে প্রকাশিত হয় না, হরিময়দাদা। উদ্বোধন অফিস দীর্ঘদিন ধরে বাগবাজারে। সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহাপণ্ডিত লোক। দাদুর খুব চেনা। স্বামীজির ভারত প্রত্যাবর্তনের তাৎপর্য সম্পর্কে দাদুর লেখা নিজের হাতে নিয়ে গিয়েছেন। পূর্ণাত্মানন্দের পরিচালনায় উদ্বোধনের পাঠকসংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছে।



পরের দিন সকালে পিকলু চা খেতে খেতে স্বামী বহুরূপানন্দর আরও বিস্তারিত খোঁজ নিয়েছে বিজয়ের কাছে।

বিজয় বর্ণনা দিচ্ছে এই স্বামীজির, আর পিকলু স্কেচ আঁকছে কাগজে, আর দেখাচ্ছে বিজয়কে—"এই রকম?"

পিকলুর আঁকা ছবি দেখে হরিময়বাবু ভীষণ খুশি। তিনি বললেন, "এই রকম ছবি যে আঁকতে পারে সে চমচমের জন্যে ইলাসট্রেট করে না তা আমি ভাবতে পারছি না।"

এবার একটা ছবির ঠোঁটে একটা কাটা দাগ এঁকে দিলো পিকলু। বিজয়কে জিজ্ঞেস করলো, "এই রকম?"

বিজয়ের এবার মনে পড়ে গেলো, উপরের ঠোঁটে ডানদিকে একটা লম্বা কাটা দাগ আছে বেঁকানো ভাবে। এই দাগটা মানুষের নজরে না পড়ে যায় না।

পিকলুর চোখ দুটো এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "আমাদের এবার একটু সাবধান হতে হবে, হরিময়দাদা। রামকৃষ্ণ রহস্যটা আর স্রেফ রহস্য থাকছে না! সেই সঙ্গে গুরুতর কিছু ঘটতে চলেছে।"

আজ বিকেলে বিজয় আবার লেখক চিরন্তন চ্যাটার্জির কাছে চমচমের জন্য ধারাবাহিকের কিস্তি আনতে গিয়েছে। লেখা নিয়ে কখন সে ফিরতে পারবে তা কেউ জানে না।

সূর্যাস্তের পর হরিময়বাবু নিজেই মাথায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে, জুতো খুলে একটা পাত্রে বাতাসা নিয়ে বিশ্বাসলজের প্রাঙ্গণে বংশগোপাল প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চে হাজির হলেন। প্রদীপগুলো একে একে জ্বালিয়ে দিয়ে তিনি বাতাসা ছড়ালেন।

পিকলু বললো. "মাথায় একটা আইডিয়া এসে গিয়েছে হরিময়দাদা। প্রতিদিন প্রদীপ জ্বালানো হাঙ্গামায় না গিয়ে পাঁচটা বিদ্যুৎবাতির ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? "সুইচ টিপে সন্ধে দেওয়া যেতে পারে তুলসীমঞ্চে।"

হরিময় বললেন, "সুইচ টিপে দেয়া আর ভক্তিভরে তুলসীমঞ্চে পঞ্চপ্রদীপ প্রতি সন্ধ্যায় জ্বালানো এক কথা নয়। বংশগোপালবাবু যখন আমাকে এই দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখনও তো বিজলিবাতি ছিল হাওড়ায়। কিন্তু প্রদীপ ইজ প্রদীপ। সি ই এস সি ইজ সি ই এস সি। আমি ভদ্রলোকের সেন্টিমেন্টে ঘা দেবো না। আমার এক এক সময় জানতে ইচ্ছে হয়, কেন তিনি চমচমকে পাঁচশিকে ভাড়ায় দীর্ঘদিনের জন্যে রাখতে গেলেন? চমচমের প্রতি ভালবাসা তো আছেই, কিন্তু তার থেকে বেশী প্রতিদিন সাঁঝের বাতি কে জ্বালাবে এই তুলসীমঞ্চে? বাঙালি জীবনের ধারাবাহিকতার সঙ্গে এর অদৃশ্য সম্পর্ক রয়েছে।

হরিময়বাবু দেখলেন, দোতলার বারান্দা থেকে প্রতিষ্ঠাতার প্রপৌত্র বংশগোলাপ উদাসভাবে তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যা দেওয়া লক্ষ্য করছেন।

একটু পরে বংশগোলাপ বিশ্বাস নিজেই নীচে নেমে এলেন। তুলসীতলায় তখনও কয়েকটি প্রদীপ জ্বলছে। হরিময়বাবু একটা বাতাসা এগিয়ে দিলেন তাঁর দিকে।

বংশগোলাপ জিজ্ঞেস করলেন, "এই তুলসীতলা বাঙালিদের জীবনে কেন ইমপর্টান্ট বলুন তো?"

হরিময় হাঙ্গামায় গেলেন না, বললেন, "ভবনাথবাবুকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তবে বঙ্গজীবনের অঙ্গ এই তুলসীতলা।"

"সে তো মশাই বোরোলীন সুরভিত অ্যান্টিসেপ্টিক ক্রিম!" হেসে উঠলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

"পুজোকে পুজো, ওষুধকে ওষুধ, গার্ডেনিংকে গার্ডেনিং—তুলসীমঞ্চ গৃহস্থর কাছে ভীষণ এক ব্যাপার। রামকৃষ্ণ মিশনেও এক বড় সন্ন্যাসী ছিলেন

তুলসীমহারাজ। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, শশীমহারাজের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে দক্ষিণ দেশে চলে গিয়েছিলেন। পিকলুর চাপে পড়ে আমাকে অনেক সন্ন্যাসীর কথা মনে রাখতে হচ্ছে।"

পিকলু ছেলেটি সম্পর্কে আজ বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছেন বংশগোলাপ। "ভেরি ব্রাইট ইয়ংম্যান," তাঁর মুখ দিয়েই মন্তব্যটা বেরিয়ে এলো। "সব ব্যাপারেই ভীষণ জানবার ইচ্ছে, খুঁটিয়ে দেখবার বাসনা।"

"বম্বেতে বড় হয়েছে তো। ওখানকার কাজকর্মের হাওয়াটা একটু অন্য রকমের।" ব্যাখ্যা করলেন হরিময়বাবু।

হরিময় হাসিমুখে বাড়তি কিছু মন্তব্য করলেন। "ডবল ব্রাইট! পিতামহ হচ্ছেন স্বয়ং ভবনাথ সেন, বাংলা কথাসাহিত্যের মুকুটহীন সম্রাট। আর মাতামহ পুলিসের মুকুটপরা কর্তা—সি-আই-ডি-র প্রধান। আগেই ছিলেন কফিপোসাতে।"

"সেটা কি জিনিস? ছাপাষা কথাটা শুনেছি, কিন্তু কফিপোসা!" ভ্রূকুঞ্চিত বংশগোলাপ প্রশ্ন তুললেন।

হরিময় বললেন, "বিদেশি মুদ্রা ইত্যাদি নিয়ে যারা হেরাফিরি করে, বিদেশে যারা বেআইনি মাল পাঠায় তাদের জন্যে সরকারী জাঁতাকল! পিকলুর পুলিশ দাদুকেও অনুরোধ করেছি। সামনের বছরে অবসর নিয়ে ধারাবাহিক চমচমে লিখবেন—'খারাপ লোকের সন্ধানে।' দেখবেন, বেস্টসেলার হয়ে যাবে। অনেক লোকশিক্ষা থাকবে। ওই বই পড়লে দুষ্ট এবং লোভী লোকের খপ্পর থেকে যে কোনো ভাল লোকে সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে।"

বংশগোলাপ বললেন, "আমার এসব ক্রাইমের ব্যাপার আর ভাল লাগে না। হাওড়া শিবপুরের সম্পত্তিটার এক গতি করে দিয়ে পাকাপাকিভাবে বেনারসে চলে যাবো। প্রপিতামহ তাঁর অনাগত বংশধরদের বড়লোক করতে চেয়েছিলেন, আমি ওসব চাইছি না। আমি স্রেফ একটু শান্তি চাইছি, হরিময়বাবু।"

"বংশগোপালকে আপনার এতো ভয় কেন, বংশগোলাপবাবু?" গম্ভীরভাবে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন হরিময়।

"নিজের প্রপিতামহকে কেন আমি ভয় পাবো? তিনি তো আঘাত যা পাবার তা নগদেই পেয়েছেন—প্রথম সন্তানের অকালে মৃত্যু, একমাত্র পৌত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু। আমি ভয় পাই অন্য—আমার ভয়টা কোথায় তা মুখে

আনতেও সাহস হয় না। ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য মহাপুরুষরা জীবিতকালেও খেলা দেখান। আবার মৃত্যুর পরেও খেলা দেখিয়ে চলেন। এঁদের খুব কাছে এসে, এঁদের জীবনের সঙ্গে অযথা জড়িয়ে পড়া গৃহীলোকদের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়, হরিময়বাবু।"

একটু থেমে বংশগোলাপ বিশ্বাস বললেন, "আপনাকে গ্যারান্টি দিতে পারি এখানে আমার একটুও ভয় নেই। এই হিদারাম হালদার লেনের সম্পত্তি কেনবার পার্টি আমি পেয়েছি, অনাবাসী মিস্টার সামতানির কাছে বেচে দিয়ে সহজেই চলে যেতে পারি। আপনাকেও কিছু অর্থ দিয়ে দেবো, সেই টাকায় আপনি সল্টলেকে ছোট একটা প্লট চমচমের জন্যে নিয়ে নিতে পারবেন। কিন্তু ওই যে বংশ তুলে কথা—নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ, ওটা ভাল কথা নয়।"

হরিময়বাবু দুঃখ করলেন, "ব্যাপারটা যে বুঝেও বোঝা যাচ্ছে না! ঠাকুরের মহাসমাধিকালে তাঁর মহামূল্যবান দাঁত বংশগোপালবাবু নিজের কাছে লুকিয়ে ফেললেন, কিন্তু দাঁতটা শেষপর্যন্ত কোথায় গেলো?"

"আমি এখনও বুঝে উঠতে পারিনি মশাই, স্বামী বহুরূপানন্দকে সব কিছু আমি ব্যাখ্যা করেছি। বলেছি, শ্রীশ্রীঠাকুরের হারিয়ে যাওয়া দাঁত উদ্ধার হলে সে দাঁত রামকৃষ্ণ মিশনের সিনিযর সন্ন্যাসীদের হাতে তুলে দেবো, একটি মাত্র শর্তে—তাঁদের ঠাকুর, ওই মিস্টার আত্মারাম এই বিশ্বাস ফ্যামিলির দিকে আর রোষদৃষ্টি দেবেন না।"

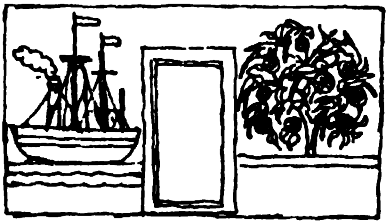
"রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন কী করতে পারে, বংশগোলাপবাবু?" হরিময়বাবু প্রতিবাদ করলেন। "শত্রু হোন, মিত্র হোন, মঠের সন্ন্যাসীরা তো তাঁদের লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন—নিজের মুক্তি এবং জগতের হিত। অহিতের তো কথাই ওঠে না। সেই জন্যেই তো এতোলোক কারণে অকারণে সঙ্ঘকে নিন্দা করে যেতে পারে। আত্মপক্ষ সমর্থন যে সন্ন্যাসীর স্বধর্ম নয় সেকথা তো স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত বলে গিয়েছেন। লোকে সেই বুঝে আরও নিন্দা করেছে, আরও কুৎসা রটিয়েছে। আমার মনে হয় না, রামকৃষ্ণ মিশন আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।"

"পারে।" আমি শুনলাম মিস্টার পিকলুর কাছে—সঙ্ঘই ঠাকুরের শরীর। সঙ্ঘ শরীরেই তিনি নাকি বেঁচে আছেন ভেরি মাচ। সঙ্ঘ যা স্থির করবে তা-ই হবে ঠাকুরের সিদ্ধান্ত—স্রেফ অঙ্কের ব্যাপার, বুঝলেন হরিময়বাবু।"

"এটা আমার জানা ছিল না, জেনে বেঁচেছি। অজানা অভিশাপের বোঝা বইতে শরীর আর চায় না, মন বড়ই ক্লান্ত। মনে রাখবেন, বংশগোপাল এবং

তাঁর বংশধররা ১৮৮৬ সাল থেকে এই বোঝা বহন করে চলেছেন। তাঁরা এখন মুক্তি চাইছেন। শান্তি চাইছেন, ক্ষমা চাইছেন।"

বংশগোলাপ জানালেন, "স্বামী বহুরূপানন্দকে আমি সমস্ত পুরনো কাগজপত্তর দেখিয়েছি—উনি রাখতে চাইলেন। ম্যানেজার সিং আপনার জেরক্স মেশিন থেকে অনেকগুলো কাগজ কপি করে এনে দিলো। স্বামীজি ওইসব পড়ে, সম্পত্তিটা অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে চলে গেলেন। বললেন, কর্তাদের কাছে রিপোর্ট করি, এখন আর কাউকে কিছু বলবেন না। চাঞ্চল্যকর সব ব্যাপার। কাগজে হইচই পড়ে যাবে— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত বলে কথা। মঠ মিশনের শতবর্ষপূর্তির বছরে এইটাই শতাব্দীর সেরা ঘটনা।"



"বিশ্বাসবংশের পুরনো কাগজপত্র দলিলদস্তাবেজ আমি খুঁটিয়ে পড়বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আর ধৈর্য নেই।" পিকলুকে বললেন বংশগোলাপ বিশ্বাস।

"ঠাকুরের জীবনের খোঁজখবর নিয়েছি। কিন্তু অতশত খুঁটিনাটি কে মনে রাখে? ত্যাগী ভক্তদের কে কোথায় বসেছিল? কীভাবে কেশেছিল। ঠাকুর কোন সময়ে কী পরেছিলেন, কী খেয়েছিলেন, এসব জেনে আমার কী লাভ বলো তো? ওই যে স্বামী বহুরূপানন্দ এসেছিলেন, তিনি নিজেই বললেন, ইতিমধ্যেই কাশীপুরের কল্পতরু উৎসব সম্বন্ধে কিছু মতভেদ দেখা দিয়েছে। বংশগোপালবাবু তাঁর দিনলিপিতে কেন লিখলেন না যে সেদিন সবুজ পিরানের ওপর ভাইপো রামলাল একখানা লালপাড় বসানো মোটা চাদর ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছিলেন? ঠাকুরের টুপিটা যে কান ঢাকা টুপি ছিল এটারও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। এ-বিষয়ে এখনকার জীবিত বিশেষজ্ঞ যিনি সেই মহারাজের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় হয়তো বসতে হবে। মনে রাখতে হবে, কল্পতরু বিষয়ে রামকৃষ্ণ মঠ প্রচণ্ডভাবে উৎসাহী নয়। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী সারদানন্দ তো সোজাসুজি লিখেছেন, 'কল্পতরু না বলে 'আমাদিগের বোধ হয়,

উহাকে ঠাকুরের অভয়-প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়-প্রদান বলিয়া অভিহিত করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ...নিজ দেব-মানবত্বের এবং জনসাধারণকে নির্বিচারে অভয়াশ্রয় প্রদানই' এই ঘটনায় সুব্যক্ত হয়েছিল।"

নোট করে নিচ্ছে পিকলু। বংশগোলাপ দুঃখ করলেন, "পুরনো কাগজের যেন শেষ নেই। কখন যে টুক করে খাতার কোণে, রসিদের পিছনে প্রপিতামহ বংশগোপাল বিশ্বাস কী লিখে রেখে গেছেন তার কোনও মাথামুণ্ড নেই। গতকল দেখি, তাঁর লেখা একটি পাদটীকা, একটা ফুট-নোট।"

বংশগোপালের নিজের হাতে লেখা : "কল্পতরুর দিনে আমি বিফল হয়ে ফিরবার পরেও কেউ কেউ কাশীপুর বাটিতে তাঁর আশীর্বাদ পেয়েছিলেন নরেন্দ্রর সহযোগিতায়। বাগবাজারের চুনিলাল বসু বোধ হয় নরেন্দ্র পরামর্শে রাত্রে প্রহরী নিরঞ্জনকে এড়িয়ে তাঁর শয়নমন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। নীরব প্রার্থনার উত্তরে নিজের শরীরটা দেখিয়ে তিনি চুনিলালকে বললেন, 'এটাতে ভক্তি-বিশ্বাস রেখো, তোমারও হবে।' এই চুনীলাল কলকাতা কর্পোরেশনে কাজ করে। বসবাস রমাকান্ত বসু স্ট্রীটে—তার বাড়িতে আমি গিয়েছি। একবার চুনীর হাঁপানি রোগও সারিয়েছিলেন তিনি। চুনীর ভাগ্য ভাল, স্বয়ং নরেন্দ্র তাকে সাদরে 'নারায়ণ' বলে ডাকতো, দুর্ভাগা আমি তো কেবল 'লেট-ললিত'।"

বংশগোলাপের মনের মধ্যে বড় কিছু একটা ঘটেছে। মনের দুঃখে তিনি এবার বললেন, "কোথায় ঠাকুরের দাঁত প্রপিতামহ রেখেছিলেন তা আমি জানি না। পরধনের কোনো খোঁজ নেই, অথচ সারা বংশটা জ্বলেপুড়ে মরছে একশ বছরে ধরে। ১৮৯৭ সালে বংশগোপালের প্রথম সন্তানেব অকালে মৃত্যু হয়েছিল। হোয়াই?"

একটু থেমে পরম দুঃখের সঙ্গে বংশগোলাপ বললেন, "দোহাই! কোটি টাকা আমি চাই না। এই প্রপার্টি বেচলে লাখ দশেক তো পাবো? তাতেই আমি সন্তুষ্ট। শুধু এই বিশ্বাস বংশ রক্ষে হোক। এই আশীর্বাদ সবাই করুন।"

এরপর টেবিলের সামনে রাখা বংশগোপাল বিশ্বাসের সমস্ত অরিজিন্যাল কাগজগুলো পিকলুর হাতে তুলে দিয়ে বংশগোপালের প্রপৌত্র বংশগোলাপ বললেন, "তুমি যদি কিছু হদিশ করতে পারো, দ্যাখো। এসব আমার সাধ্যের অতীত।"

সিঁড়ি দিয়ে বিশ্বাস লজের দোতলা থেকে নামবার সময় হরিময়বাবু নিচুগলায় পিকলুকে বললেন, "ওই বহুরূপানন্দর ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওঁকে একটু সাবধান করে দিলে না?"

পিকলু বললো, "ভদ্রলোক তা হলে আরও ভেঙে পড়তেন। তা ছাড়া আমাদের সন্দেহটা গোপন রাখতে বললেন পুলিশদাদু। ওই যে ঠোঁটে কাটা দাগ! মনে আছে, প্রথম যেদিন নজর আলি লেনে স্টেটসম্যান পত্রিকায় আমার লেখা পড়ে দু'জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন—মিস্টার সামতানি আর মিস্টার সুশীতল সান্যাল? ওঁর ঠোঁটেও তো প্লাস্টিক সার্জারি হয়েছিল।"

প্রবল উত্তেজনায় হরিময়বাবু এবার পিকলুকে জড়িয়ে ধরলেন। "ইউরেকা! পুলিশদাদুর যোগ্য রহস্যসন্ধানী নাতি তুমি পিকলু। অথচ তুমি মোটেই পুলিশ হতে চাও না, তুমি যেতে চাইছ সেল্‌সের লাইনে।"

পিকলু বললো, "পুলিশদাদু এ-বিষয়ে কিছু খোঁজ-খবর করেছেন, আরও করবেন। কফিপোসাতে চাকুরির সময় একটা ঠোঁটকাটা ডেনজারাস স্মাগলারের ফাইল দাদু দেখেছিলেন। লোকটা পুরনো জিনিসের লাইনে ঘোরাঘুরি করে, দামী ঐতিহাসিক কীর্তি সংগ্রহ করে, মাল চালান করে দেয় ব্যাংককে। তার বদলে সে ইন্ডিয়ায় আনায় চোরাই ইলেকট্রনিক সামগ্রী। প্রায়ই নাম বদলায়—বহুরূপী বলতে পারো। কখনও বাঙালী মধ্যবিত্ত, কখনও অফিসার, কখনও বাংলাদেশী। লোকটার একটাই অসুবিধে—ঠোঁটের কাটা দাগ একেবারে মিলিয়ে যায়নি।"



মহাপুরুষদের দেহাবশেষ নিয়ে হরিময়বাবুও পড়াশুনা আরম্ভ করে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা তিনি অন্তত তিরিশবার ইতিমধ্যেই পড়ে ফেলেছেন। এই কবিতায় বিম্বিসার নামে এক মহাপরাক্রান্ত নৃপতি বুদ্ধের পাদনখকণা ভিক্ষা করেন এবং পরে তার ওপরেই এক স্তূপ নির্মাণ করেন।

"অতি অপরূপ!" বলে ঢোঁক গিললেন হরিময়বাবু।

"কোনটা অপরূপ? বুদ্ধের নখ?" একটু হেসে জিজ্ঞেস করেছে পিকলু।

"নখ ইজ নখ! সে ভগবান বুদ্ধেরই হোক আর এই হরিময় চৌধুরীরই হোক। অপরূপ হলো যে শিলাময় স্তূপ বিম্বিসার নির্মাণ করলেন এই পাদনখকণা সংগ্রহের ওপরে।"

হরিময়বাবু বুদ্ধশিষ্য কেমো থেরোর জীবনকাহিনীও পাঠ শুরু করেছেন। "বুদ্ধের ব্যাপার-স্যাপার বোঝা সহজ নয়, শেষ পর্যন্ত ১৮টা দল হয়ে গিয়েছিল। আর এই কেমো থেরো বহুকষ্টে বুদ্ধের শ্রীদন্ত হাজির করলো কলিঙ্গ নগরীতে এবং সংগৃহীত দাঁতের জোরে জায়গার নামটাও পাল্টে গেলো।"

পিকলুও নানা খোঁজখবর সংগ্রহ করছে। তার দৃষ্টি অবশ্য নিবদ্ধ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জীবনরহস্যে—এমন কিছু খবর খুঁজে বার করা প্রয়োজন যা এই বংশবিশ্বাস রহস্যের ওপর কিছুটা আলোকপাত করবে। বংশগোপালবাবু প্রথম জীবনে হিসেবী লোক ছিলেন, তিনি শ্রীদন্ত গোপনে শ্মশানে সংগ্রহ করলেন এবং তারপর কোথায় তা লুকিয়ে রেখে গেলেন যা বংশধররা দিশাহারা হয়ে আজও খুঁজে বেড়াচ্ছে। বংশগোলাপ বেচারা তো সোজাসুজি বলছেন, ভিক্ষে চাই না মা, কুকুর সামলাও। দাঁত বেচে বড়লোক হওয়ার সাধ চুকে গিয়েছে, শুধু রামকৃষ্ণের দাঁতটা খুঁজে পাওয়া যাক, তারপর বেলুড় মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটা কিছু ফয়সালা করা যাবে।

হরিময়বাবুও ইতিমধ্যে প্রচণ্ড পড়াশুনা করেছেন। বিশেষ করে তাঁদের সম্বন্ধে যাঁরা ঠাকুরের মহাসমাধির পরে কাশীপুর মহাশ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। "জানো মিস্টার পিকলু, লেখকরা মন দিয়ে রিসার্চ করেন না বলেই আমাদের দেশের রহস্যকাহিনীগুলো জোলো হয়ে যায়। সায়েবরা রিসার্চ ছাড়া একপা এগোন না, তাই বিদেশী রহস্যকাহিনীগুলো আহারকে আহার আবার ওষুধকে ওষুধ।"

হরিময়বাবুর ধারণা, বংশগোপাল বিশ্বাস নিশ্চয় ১৮৮৬ সালের ১৬ই আগস্ট তাঁর দন্তলাভের বা দন্তদুর্বলতার কথা কারুর না কারুর কাছে গোপনে প্রকাশ করেছিলেন।

দুদিন হরিময়বাবু সম্পূর্ণ উধাও। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বহুরাতে তিনি ফিরে আসেন ক্লান্ত হয়ে। প্রশ্নের উত্তরে জানা গেলো, তিনি ঠাকুরের ভক্ত উপেন মুখোপাধ্যায়ের বংশধরদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সমর্থ হয়েছেন।

"মশাই, এই উপেনবাবুই কাশীপুরে ঠাকুরের কল্পতরু উৎসবের অন্যতম হিরো। ঠাকুর এবং তাঁর ভক্তদের বহুদিন ধরে তিনি অনেক কচুরি, সিঙাড়া এবং

মিষ্টি খাইয়েছেন। পরে ঠাকুরের আশীর্বাদে তাঁর বিপুল আর্থিক সাচ্ছল্যও হয়েছিল।”

এরপর হরিময়বাবু কোথা থেকে একখানা ত্রৈমাসিক পত্রিকা বার করলেন। পত্রিকার নাম ‘নিবোধত’। দক্ষিণেশ্বর শ্রীসারদামঠ থেকে প্রকাশিত হয়।

হরিময়বাবু এই কাগজেই উপেন মুখার্জির এক নাতনীর স্মৃতিকথা সদ্য সংগ্রহ করে এনেছেন। মুখ চুন করে তিনি বললেন, “খুব স্যাড মশাই। উপেন মুখুজ্যে মশাই মারা যান ১৯১৯ সালে, তাঁর দুটি কন্যা বাল্যকালেই মারা যান। একমাত্র পুত্রসন্তান সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চারের দশক পর্যন্ত ভরা সংসার—রামকৃষ্ণের স্নেহধন্যা ভবতারিণী দেবী তখনও দোর্দণ্ডপ্রতাপে বেঁচে রয়েছেন। তারপর যা হলো, তা বর্ণনা করা যায় না।”

হরিময়বাবু এরপর নাতনী প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে পড়তে লাগলেন : “কয়েকবছর পরে চল্লিশের দশকে আমাদের বাড়িতে পরপর কয়েকটা অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেলো। বিশাল সজীব একটা ফলন্ত গাছের উপর বজ্রপাত হলে যেমন তার দশা হয় এই পরিবারটাও সেই মৃত্যুর আঘাতে আধপোড়া গাছের মতো শূন্যে দুটো হাত মেলে দাঁড়িয়ে রইল। উনিশ বছরের ছোড়দি মারা গেলো টাইফয়েডে, বছর দুই পরে একই রোগে গেলো তেইশ বছরের দাদা। আমার বাবা (সতীশচন্দ্র) এরপর আর তিনমাসও ছিলেন না। বাহান্ন বছর বয়স তখন তাঁর।”

উপেনবাবুর স্ত্রী ভবতারিণী দেবী তাঁর নাতনি এবং একমাত্র নাতির অকালবিয়োগে বুকফাটা কান্না কেঁদেছিলেন, কিন্তু ছেলের মৃত্যুর পরে আর পিছনে ফিরে তাকালেন না। সেই দিনই সবার অলক্ষ্যে একবস্ত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হরিময়বাবু বললেন, “দাঁড়ান, ভাবতারিণীর দুঃখ এখনও শেষ হয়নি। পুত্রবধূ তখন ক্যানসার-আক্রান্ত। এই মহিলা অনেক চেষ্টা করে শাশুড়িকে খুঁজে বার করলেন কনখলে এবং অসুস্থ শরীর নিয়ে কাশীতে হাজির হলেন তাঁকে কাশীতে ফিরিয়ে আনবার জন্যে। অবশেষে কাশীতে শাশুড়িকে রেখে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে, তখন তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশ।”

হরিময়বাবু বললেন, “ভীষণ স্যাড্, এতোবড় ধার্মিকের বংশ অথচ এতো শোক, এতো কষ্ট। যে বছর যেখানে কুম্ভমেলা বসতো, ভবতারিণীদেবী সেখানে একমাস আগে কল্পবাস করতেন, নদীতীরে হোগলার ঘরে সাধুসন্তদের মধ্যে

বাস করে প্রতিটি পুণ্যযোগে স্নান করতেন। সমস্ত কষ্টের অবসান হলো পঁচানব্বই বছর বয়সে—দেহ রাখলেন ৫ই মার্চ ১৯৭৩।”

এরপর হরিময়বাবু বললেন, “এসব খবর বংশগোলাপবাবুকে বলবো না, ভদ্রলোক আরও নার্ভাস হয়ে যাবেন। বংশগোপালবাবু ভাগ্যবান, অনেক আগেই চলে গিয়েছেন, তেমন কষ্ট সহ্য করতে হয়নি।”

এরপরেও বোধ হয় হরিময়বাবুর কাছে খবর রয়েছে। পুরোটা ভাঙতে চাইছেন না। শুধু বললেন, “পিকলু, ভবনাথবাবু এবং তোমাকে আমি রহস্যমোচনে পুরো মদত দিয়ে যাবো। যদি কিছু ব্রেক-থ্রু হয় পুরো কৃতিত্বটাই তোমাকে দেওয়া হবে। কারণ তুমিই আমাদের লিডার।”

হরিময়বাবু জানালেন, তিনি ক্রমশই গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। ‘শ্রীদন্ত কোথায় আছে এ রহস্য খুব কম সময়ের মধ্যে ভেদ হবেই।”

হরিময়বাবু বোধ হয় কোনো আগাম গন্ধ পাচ্ছেন, কারণ তিনি ইঙ্গিত দিলেন, আমাদের বংশগোপালবাবুর দূরদৃষ্টি ছিল না একথা কিছুতেই বলা চলে না।




কয়েক দিন পরে হাওড়া স্টেশনের কংকোর্সে দু'জনের হঠাৎ দেখা হয়ে গেলো। হরিময়বাবু কোনো অজ্ঞাত স্থানে অনুসন্ধানে চলেছেন। আর পিকলু চলেছে বেলুড়ে। গ্রান্ড ট্রাংক রোডের হাল এতোই খারাপ যে সবাই মোটরসাইকেলে ওই পথে না যাবার পরামর্শ দিয়েছেন।

টেলিফোনে দু'জন কথা হয়েছে। ভবনাথ সেন পরামর্শ দিয়েছেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি এবং বেলুড় মঠ দুটোই সরেজমিনে দেখে আসা প্রয়োজন পিকলুর।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, “হরিময়দাদা, দক্ষিণেশ্বর কি রামকৃষ্ণ মিশনের অংশ?”

হরিময়বাবু বললেন, “যতটুকু জানি, দুটোর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানকার মাইনেকরা পুরোহিত ছিলেন। রোজ কিছুটা চাল এবং

মাসে সাতটাকা পেতেন। প্রথমে তিনি ছিলেন ছোট ভট্চাজ্যি। তবে ঐখানেই প্রচণ্ড ঈশ্বর সাধনা এবং ওইখান থেকেই পৃথিবীর দৃষ্টি পড়লো ওঁর ওপর। অথচ একবার রাগ করে মথুরবাবুর ছেলে দারোয়ান দিয়ে ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে যেতে হুকুম করেছিলেন। অসুস্থ ঠাকুর অবশ্য শেষপর্যন্ত চিকিৎসার জন্যে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে কলকাতার শ্যামপুকুরে চলে এসেছিলেন। যেখানে বংশগোপাল বিশ্বাস তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন।"

হুটকো হালদার হাসলেন। "মায়ের কী রসিকতা দেখুন। এই ঠাকুর একসময় দক্ষিণেশ্বর ফেরবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মথুরবাবুর ছেলে ত্রৈলক্যবাবু ওঁকে ফেরত নিতে মোটেই আগ্রহ দেখালেন না। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাকেন্দ্র হিসেবেই দক্ষিণেশ্বরের আজ জগৎজোড়া খ্যাতি।"

পিকলুকে হুটকোবাবু বললেন, "দক্ষিণেশ্বরে অনেক অপ্রিয় ব্যাপার ঘটেছে। বিশ্ববিজয় করে বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় ফিরে এসেছেন তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন এবং অপমানিত ও বিতাড়িত হয়েছিলেন। এবারেও ত্রৈলক্যবাবু এবং তাঁর কর্মচারীদের প্রধান ভূমিকা ছিল। বলবার কিছু নেই, কারণ মন্দিরটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি, মালিক ঠিক করবেন, কে এখানে আসতে পারবে, কে পারবে না।"

তবু দক্ষিণেশ্বর ছাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে ভাবা যায় না। তাঁর অধ্যাত্মজীবনের বড় বড় ব্যাপারগুলো ওইখানেই ঘটে গিয়েছে, একথা ভক্তরা কোনোদিন ভুলতে পারবে না।

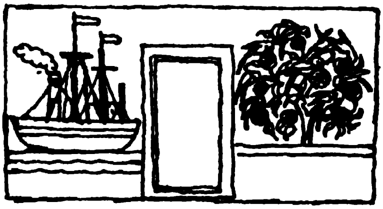
হুটকো হালদার বললেন, "যে আত্মারামের খোঁজ করতে আমরা বেলুড়ে যাচ্ছি তার আদিপর্বে রয়েছে এই দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণীর মন্দির। অথচ মন্দির যেদিন প্রতিষ্ঠা হলো সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার অন্নগ্রহণ করেননি। এসব খবর ভালভাবে জানেন শঙ্করীপ্রসাদ বসু যাঁকে অনেকে মঠ-মিশন এনসাইক্লোপিডিয়া বলে ডাকে।"

ঠাকুরের পরিক্রমার পথটা এবার এঁকে দিলেন হুটকো হালদার। "ফ্রম দক্ষিণেশ্বর টু শ্যামপুকুর, টু কাশীপুর উদ্যানবাটি, টু মহাশ্মশান। তারপর পূতাস্থি ভাগ হলো, একভাগ চললো কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের যোগোদ্যানে, আরেকভাগ কিছুটা বলবাম বসুর বাড়িতে। সেখান থেকে অনেক পাখি নানাদিকে উড়ে গেলো, ত্যাগী সন্তানদের কয়েকজন হাজির হলেন আলমবাজার মঠে। এই আলমবাজার মঠেই ফিরে এলেন বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে এবং মতলব করলেন গঙ্গাতীরে মঠ প্রতিষ্ঠার। এই মঠ থেকেই মিস্টার

আত্মারাম হাজির হলেন বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়িতে। এই উদ্যানবাটির পাশেই বেলুড় মঠ স্থাপনের জন্যে জমি কেনা হয়েছিল।

হরিময়বাবুর মধ্যে ব্যস্ততার লক্ষণ ফুটে উঠছে। বাঁহাতের মণিবন্ধে বাঁধা টাইটান ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন তিনি।

অদৃশ্য হওয়ার আগে তিনি চুপিচুপি পিকলুকে বললেন, "ভাগ্য ভাল থাকলে হারানো শ্রীদন্ত আমি আজই আবিষ্কার করে ফেলবো। রাত্রে দেখা হবে।"



বেলুড় স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশ ধরে পিকলু ও হুটকো হালদার মঠের গেটের সামনে হাজির হলো।

হুটকোবাবু ওইখানেই ভক্তিভরে পবিত্রভূমির ধূলি সংগ্রহ করে মাথায় দিলেন, তারপর বললেন, "মঠ বলে কথা, আজকাল অনেকে জানেই না, কী করে এই পবিত্রস্থানে আসতে হয়। এ সম্বন্ধে ভাল শিক্ষা দিতেন কথামৃতের লেখক শ্রীম অর্থাৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মশাই। বলতেন ভক্তি নিয়ে আসবে, এখানে অন্নগ্রহণ করবে না, সাধুদের বিরক্ত করবে না, তাঁরা আঘাত করলেও প্রতিবাদ করবে না এবং কখনও এদের বিরুদ্ধে কিছু করবে না।"

হুটকো হালদার আরও উদ্ধৃতি দিলেন শ্রীম থেকে। "স্বামীজী এই মঠটি করলেন কেননা, যারা সংসার ছাড়বে তাদের জিরোবার স্থান হবে বলে। যেমন পাখি উড়তে উড়তে পরিশ্রান্ত হলে গাছের ডালে এসে বসে। তেমন সাধুরা এখানে বিশ্রাম করবে। স্বামীজী বলতেন, এরপর ছেলেরা আসবে, তারা অত কষ্ট সইতে পারবে না নিরাশ্রয় জীবনের। তাই এটা করা, এখানে এক মুঠো অন্ন পাবে, আর মাথা গুঁজবার স্থান মিলবে।"

শ্রীম আরও বলতেন, বেলুড়মঠে দুঘণ্টা থাকলেই যথেষ্ট। কি দরকার লোকের সঙ্গে আলাপের? যাবেন, প্রথমে গিয়ে ঠাকুরঘরে প্রণাম করবেন, তারপর সাধুদের দেখলে প্রণাম করবেন। অমৃত ঘটি ঘটি খেলেও অমর, আবার দুর্বার অগ্রভাগ করে একটু খেলেও অমর।"

পিকলু টপাটপ কয়েকটা খবর সংগ্রহ করে নিলো। ১৮৯৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাত একর জমি কেনার জন্যে চুক্তিপত্র সই হয়। ৪ঠা মার্চ ১৮৯৮—৩৯০০০ টাকায় জমি রেজিস্ট্রি হয় স্বামী বিবেকানন্দর নামে, টাকা দিয়েছিলেন কুমারী হেনরিয়েটা মুলার। মঠের পুজো হয় ৯ ডিসেম্বর ১৮৯৮। ঐদিন নীলাম্বর মুখার্জির বাগানবাড়ি থেকে কাঁধে করে আত্মারামের কৌটা অর্থাৎ ঠাকুরের পূতাস্থিকে বেলুড়ে নিয়ে যান স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। মঠ পাকাপাকিভাবে বেলুড়ে উঠে আসে ১৮৯৯ সালে এবং বিবেকানন্দ এখানেই মহাসমাধি লাভ করেন ১৯০২ সালের জুলাই।

হুটকো হালদার নিজের স্টাইলে চলেছেন। বেলুড়মঠে এলে তাঁর প্রথম কাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরে গিয়ে ঠাকুরের মূর্তির সামনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানানো। দীর্ঘ প্রণাম সেরে উঠে হুটকোবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন দেখলেন?"

"এককথায় অপূর্ব!" পিকলু নিজের মনোভাব চেপে রাখলো না।

হুটকো বললেন, "এই মন্দিরের স্বপ্ন স্বামী বিবেকানন্দ বহুদিন থেকে দেখেছেন। নিজেই নানা সময়ে মন্দিরের নানা নক্শা করেছেন, কিন্তু নিজে দেখে যেতে পারেন নি। দেখে যে যেতে পারবেন না তা বুঝেই বিবেকানন্দ স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে মন্দিরের নক্শা নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, "এই দেহটা ততদিন থাকবে না, তবে আমি উপর থেকে দেখবো। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার গাইথার-এর সঙ্গে পরামর্শ করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যে নক্শা তৈরি করলেন স্বয়ং তা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। তবে তার আগে বিবেকানন্দ বেশ কয়েকবার নক্শা সংশোধন করেছিলেন।'

"স্বামীজী কি আর্কিটেকচারও বুঝতেন?" জিজ্ঞেস করলো পিকলু।

"সব ব্যাপারে তাঁর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল, তার মধ্যে মন্দির স্থাপত্যও একটা," বললেন হুটকো।

মঠের ব্যাপারটা কি তা পিকলুকে সোজাভাষায় বুঝিয়ে দিলেন হুটকো হালদার। বললেন, "পরের মুখে ঝাল খাবেন না একেবারে, পিকলুবাবু। পড়ুন শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর স্বামী-শিষ্য-সংবাদ, যেদিন বিবেকানন্দ নতুন মঠভূমিতে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করলেন সেদিনকার বিবরণ মুখস্থ করে রেখেছি আমি।"

"তামার কৌটোয় রক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের ভস্মাস্থি স্বামীজী স্বয়ং দক্ষিণ কাঁধে নিয়ে অগ্রগামী হলেন। সন্ন্যাসী ও শিষ্যগণ পিছন পিছন চললেন। শঙ্খ-ঘণ্টারোলে অট্টহাসি মুখরিত হওয়ায় ভাগীরথী যেন ঢল ঢল ভাবে নৃত্য করতে লাগলো।

যেতে যেতে স্বামীজী বললেন "ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, তুই কাঁধে করে আমায় যেখানে নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই যাব ও থাকব। তা গাছতলাই কি আর কুটীরই কি। সেজন্যই আমি স্বয়ং তাঁকে কাঁধে করে নতুন মঠভূমিতে নিয়ে যাচ্ছি। নিশ্চয় জানবি, বহুকাল পর্যন্ত 'বহুজনহিতায়' ঠাকুর ঐ স্থানে স্থির হয়ে থাকবেন।"

"মস্ত বিপ্লবী ছিলেন এই মানুষটা," বললেন হুটকো হালদার। স্বামীজী একশবছর আগে বলে গিয়েছেন, "আমাদের এই যে মঠ হচ্ছে তাতে সকল মতের, সকল ভাবের সামঞ্জস্য থাকবে। ঠাকুরের যেমন উদার মত ছিল, এটি ঠিক সেই ভাবের কেন্দ্রস্থান হবে, এখান থেকে যে মহাসমন্বয়ের উদ্ভিন্ন ছটা বেরুবে তাতে জগৎ প্লাবিত হয়ে যাবে।"

হুটকো হালদারের চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। "পিকলুবাবু, বঙ্গসন্তানটির দুঃসাহস দেখুন। এই জমিতে দাঁড়িয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, সাধনভজন ও জ্ঞানচর্চায় এই মঠ প্রধান কেন্দ্র হবে। এই আমার অভিপ্রায়। এখান থেকে যে শক্তির অভ্যুদয় হবে, তা জগৎ ছেয়ে ফেলবে, মানুষের জীবনগতি ফিরিয়ে দেবে, জ্ঞান ভক্তি যোগ কর্মের 'একত্র সমন্বয়ে এখান থেকে উচ্চাদর্শ বেরোবে, এই মঠভুক্ত সাধুদের ইঙ্গিতে কালে দিগ্‌দিগন্তে প্রাণের সঞ্চার হবে।"

পিকলু স্বীকার করলো, "মানুষটির তেজ ছিল।"

হুটকো উত্তর দিলেন, "তেজ বলে তেজ। সব চিন্তা তাঁর মাথায় পরিকল্পনার রূপ নিয়ে বসে আছে। ঠিক করে নিয়েছেন, মঠে তিনটে শাখা হবে। প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান এবং সবার ওপরে জ্ঞানদান। এই তিন ভাবের সমন্বয় করতে হবে বেলুড় মঠ থেকে।'

"মানুষের মনটা ভদ্রলোক ভালই বুঝতেন মনে হচ্ছে।"

হুটকো বললেন, "সেকথা বলে! শিষ্যকে বিবেকানন্দ বলছেন, এই যে ত্রাণ কর্ম সেবা কর্ম এটা পাগলামো নয়। ভিক্ষেশিক্ষে করে যদি দুমুঠো অন্ন দীনদুঃখীকে দিতে পারিস, তাহলে ...সৎকাজের জন্যে সকলের সহানুভূতি পাবি। ঐ সৎকাজের জন্যে সংসারীরা তোর সাহায্য করতে অগ্রসর হবে। তুই বিদ্যাদানে বা জ্ঞানদানে যত আকর্ষণ করতে পারবি, তার সহস্রগুণ লোক তোর এই অযাচিত অন্নদানে আকৃষ্ট হবে। ...এরূপে লোকে আকৃষ্ট হলে তখন তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনের স্পৃহা উদ্দীপিত করতে পারবি।"

বিবেকানন্দ সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ হলে সারাদিন এখানেই কেটে যাবে। যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা সেটাই না পণ্ড হয়ে যায়।

পিকলুর লক্ষ্য যে রামকৃষ্ণের পূতাস্থি ও আত্মারামের কৌটা তা হুটকো বাবুর বিস্মরণ হয়নি।

পিকলু জিজ্ঞেস করলো, "বিবেকানন্দ তো আত্মারামকে বেলুড়ে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করলেন। তারপর কী হলো।"

"সেদিনই তা আবার নীলাম্বরবাবুর বাগানে মাথায় করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। সন্ন্যাসীদের এই কাজের অধিকারঃনেই। তাই গৃহীশিষ্যকে এই কাজ করতে নির্দেশ দিলেন বিবেকানন্দ। এরপর মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন হলো বিবেকানন্দের মৃত্যুর অনেক পরে ১৯২১ সালের ১৩ই মার্চ। পরে স্থানের কিছুটা পরিবর্তনের জন্যে নতুন করে ভিত্তি স্থাপন হলো ১৯৩৫ সালের ৫ই মার্চ। ১৯৩৮ সালে মঠ ও মিশনের সভাপতি হিসেবে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ আত্মারামের কৌটাসহ এখানে ফিরে এলেন।"

"আত্মারামকে কোথায় রাখা হলো", জানতে চাইলো পিকলু।

হুটকো বললেন, "উঃ কী সব কঠিন প্রশ্ন, মিস্টার পিকলু। এই যে ঠাকুরের মূর্তি দেখা যাচ্ছে তার নিচে আত্মারামের কৌটো প্রোথিত রয়েছে। মন্দির করতে আটলাখ টাকা লাগে, তার মধ্যে ছ'লাখ দেন ভক্তিমতী আমেরিকান মহিলা হেলেন রুবেল এবং একলাখ টাকা দেন অ্যানা উরস্টার।"

"মন্দির তৈরি করল কারা?"

"এখানে সব সাহেবী ব্যাপার মশাই। মন্দির তৈরি করেন মার্টিন বার্ন কোম্পানি। ঠাকুরের মূর্তিটি তৈরি করেন গোপেশ্বর পাল, জি পাল নামে তিনি বিখ্যাত। ঠাকুরের যে ফটোটি দেখে এই মর্মরমূর্তি তৈরি হয় সেটি তুলেছিলেন অবিনাশ চন্দ্র দাঁ ১৮৮৩ সালে।"

"সন তারিখ সব আপনার কণ্ঠস্থ, মিস্টার হালদার," বললো পিকলু।

হুটকো হেসে বললেন, "পঞ্চাশবছর ধরে তো একটা বিষয়েই খোঁজ-খবর নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমার থেকে অনেক পরে শুরু করে শঙ্করীপ্রসাদ বসু কোথায় পৌঁছে গেলেন দেখুন। সাধনার কোনো বিকল্প নেই, মিস্টার পিকলু। তা যা বলছিলাম, অবিনাশ দাঁর ফটো দেখেই ঠাকুর বলেছিলেন, একদিন ঘরে ঘরে এর পুজো হবে। সময় পেলে স্টেটসম্যানে এই অবিনাশ দাঁকে নিয়েই একটা প্রবন্ধ ছাড়তে পারো।"

পিকলু বললো, "তা হলে বেলুড়ের এই মূর্তিটাই ঠাকুরের প্রথম মর্মরমূতি!"

"মোটেই না।" হাঁ-হাঁ করে উঠলেন হুটকো হালদার। "প্রথম মূর্তি নির্মাণের উৎসাহ দেখান ভবানীপুরের সলিসিটর অচলকুমার মৈত্রের স্ত্রী। কলকাতার

ঝাউতলা রোডে বিনায়ক পাণ্ডুরঙ্গ কারমারকার ১৯১৮ সালে এই কাজ শুরু করেন। এই মূর্তি রয়েছে কাশী-অদ্বৈত আশ্রমের মন্দিরে। যতদূর জানি, এই মন্দির স্থাপন হয় ১৯৩৬ সালে।"

কৌতূহল এখনও রয়েছে। আত্মারামের কৌটায় কোনো দাঁত অক্ষত অবস্থায় আছে কিনা জানতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু পিকলু বুঝলো সে-চেষ্টায় কোনো ফল হবে না—আত্মারামের কৌটা খোলা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

হুটকো বললেন "গর্ভমন্দিরের বাইরের দেওয়াল চুনার পাথরে মোড়া। নাট মন্দিরের দেওয়াল পাথর, প্লাস্টার এবং চুনার রংঢালা কংক্রিটে আবৃত। গর্ভগৃহের মাপ ২৬´×২৬´। নাটমন্দিরের মাপ ৯৮´×৪১´। সমস্ত মন্দিরের মাপ ২০৪´×৮৩´×১১২১/২´। গর্ভগৃহের ভিতরের দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে পুজোর জিনিসপত্তর থাকে। এখানে শ্রীমার পদধূলিও রাখা আছে।"

ঠাকুরের শয়নঘরটি দোতলায়। পিকলু সেটাও ঘুরে ঘুরে দেখে নিলো।

এরপর কিছুক্ষণ ধরে পায়ে হেঁটে সমস্ত মঠটা হুটকো হালদার দেখিয়ে দিলেন পিকলুকে। প্রেসিডেন্ট মহারাজ যে বাড়িতে থাকেন সেটাও দেখলো পিকলু।

তারপর স্বামী ব্রহ্মানন্দর মন্দির, বিবেকানন্দর মন্দির কিছুই বাদ গেলো না। নদীর ধারটা যে এখনও এতো সুন্দর তা পিকলু আন্দাজ করতে পারেনি। হুটকো বললেন, নিজের দাহক্ষেত্রটি বিবেকানন্দ নিজেই নির্বাচন করে গিয়েছিলেন। সৎকারের পরে সেখানেই গড়ে ওঠে বিবেকানন্দ মন্দির।

এবার যে ঘরে বিবেকানন্দ তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত করেন এবং যেখানে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তাও দেখা হয়ে গেলো।

"বড্ড কমবয়সে চলে গেলেন—মাত্র উনচল্লিশ বছর পাঁচমাস চব্বিশ দিন," দুঃখ করলেন হুটকো হালদার। "ঘরটা কিন্তু ঠিক একই রকম রাখা আছে। মনে হবে এই যেন এখানে তিনি ছিলেন, একটু বেরিয়েছেন ভ্রমণে, এখনই হয়তো ফিরে আসবেন।"

পিকলু শুনলো, ঠাকুর ও বিবেকানন্দ দু'জনই রসিক চূড়ামণি ছিলেন। মাঝে মাঝে যখন তিনি ভ্রমণে বেরুতেন তখন থাকতো আলখাল্লা, মাথায় গৈরিক কানঢাকা টুপি এবং হাতে একগাছা মোটা লাঠি। বিবেকানন্দ কোনো ঠাকুর দেবতার কাছে প্রথম জীবনে মাথা নোয়াতেন না বলে রামকৃষ্ণ একদিন সন্দেশের মধ্যে জগন্নাথদেবের প্রসাদ পুরে দিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন।

আর একদিন ভক্ত শরৎবাবু কলকাতার ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন একজন সন্ন্যাসী আহিরিটোলার ঘাটের দিকে আসছেন। সাধু অপর কেউ নন

স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ! তাঁর বাঁ হাতে শালপাতার ঠোঙায় চানাচুর ভাজা, বালকের মতন খেতে খেতে ঘাটের দিকে চলেছেন। শিষ্যকে দেখে বললেন, "চল, তুই মঠে যাবি? চারটে চানাচুর ভাজা খা না? বেশ নুন ঝাল আছে।"

শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন, "মহাশয়, আপনি যে দেশে-বিদেশে এত পরিশ্রম করে গেলেন, তার ফল কি হল?"

তাঁর উত্তর : "কি হয়েছে, তার কিছু কিছু মাত্র তোরা দেখতে পাবি। কালে ঠাকুরের উদারভাবে নিতে হবে, তার সূচনা হয়েছে। এই প্রবল বন্যামুখে সকলকে ভেসে যেতে হবে।"

বিদায়ের দিনে স্বামীজী যে ঠাকুরের ঘরে বসে অনেকক্ষণ ধ্যান করেছিলেন তা হুটকোদা শুনেছিলেন। তাবপর স্বামীজী গাইতে শুরু করেছিলেন, "মা কি আমার কালো? কালরূপ এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।" তারপর অস্ফুটস্বরে যা বলেছিলেন তা তাঁর এক গুরুভাই শুনতে পেয়েছিলেন—"যদি আর একটা বিবেকানন্দ থাকতো তবে বুঝতে পারতো বিবেকানন্দ কি করে গেলো। কালে কিন্তু এমন শত শত বিবেকানন্দ জন্মাবে।"

হাসলো পিকলু, "আপনি বিশ্বাস করেন এই ভবিষ্যদ্বাণী?"

হুটকো হালদার নরম হলেন না। স্বামীজী যা যা বলে গিয়েছেন সব যে সত্যি হবে সে বিষয়ে তাঁর মধ্যে কোনো সংশয় নেই। "দেখে নিয়ো, ছেলেছোকরাদের মধ্যে এমন মানুষ বেরুলো বলে।"

"আর মেয়েদের মধ্যে?" প্রশ্ন করলো পিকলু।

"মেয়েদের মধ্যেও বেরুবে। নদীর ওপারে স্বামীজীর স্বপ্নের সারদা মঠ তো গড়ে উঠেছে। সময় লেগেছে, কিন্তু হয়েছে তো। ওখানেও কীসব কাণ্ড ঘটে দেখে নিও।

সেদিন বেলা এগারোটার সময় ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আহারের সময় স্বামী বিবেকানন্দ অতি তৃপ্তির সঙ্গে ইলিশমাছের ঝোল অম্বল ভাজা দিয়ে ভোজন করলেন। এই দিন সকালে গঙ্গার ইলিশমাছ প্রথম কেনা হয়। তার দাম নিয়ে স্বামী প্রেমানন্দের সঙ্গে কত রসিকতা করেছিলেন। খাওয়ার পরেও বললেন, "একাদশী করে খিদেটা খুব বেড়েছে, ঘটি-বাটিগুলো ছেড়েছি কষ্টে।"

স্বামীজির বিদায়দিনের বর্ণনা তখনও শেষ হয়নি। হুটকো হালদার বললেন, "৪ঠা জুলাই ১৯০২। বেলুড়মঠে সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজলে নিজের ঘরে প্রবেশ করে বিবেকানন্দ গঙ্গার দিকে মুখ করে ধ্যান করলেন। তখন সন্ধ্যা সাতটা। ব্রহ্মচারী ব্রজেন্দ্র কাছেই ছিলেন। তাঁকে বাইরে গিয়ে জপ করতে বললেন

বিবেকানন্দ। প্রায় এ ঘণ্টা পরে তিনি ব্রহ্মচারীকে ভিতরে ডেকে মাথায় বাতাস করতে বললেন এবং গরম বোধ হওয়ায় সমস্ত দরজা-জানলা খুলে দিতে বলে শুয়ে পড়লেন। আরও কিছুক্ষণ পরে, স্বামীজী পাশ ফিরে ডানদিকে শয়ন করলেন এবং ক্ষুদ্র বালকের ক্রন্দনের ন্যায় অস্ফুট শব্দ করলেন। ডান হাতখানি একবার একটু কেঁপে উঠলো এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর নিশ্বাস নির্গত হলো এবং মাথাটি বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়লো। আর দুই এক মিনিট পরে তিনি আবার গভীর নিশ্বাস ফেললেন। তারপর সব স্থির হয়ে গেলো। পরে ডাক্তার বিপিনচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, সন্ন্যাসরোগে দেহত্যাগ হয়েছে। কোনো কোনো সাধু বললেন, জপ ও ধ্যান করতে করতে স্বামীজীর ঊর্ধ্বগামী প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে অনন্তে মিশে গিয়েছে।"

এবার পিকলু দন্ত রহস্যের ওপর আলো ফেলতে চায়। এ বিষয়ে প্রধান ভরসা অবশ্যই স্বামী প্রভানন্দ যিনি মঠ-মিশনে বরুণ মহারাজ নামে পরিচিত। বরুণ মহারাজের বইতে শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকা ছবির পুনর্মুদ্রণ আছে—সেই বিখ্যাত জাহাজ ও আতাগাছে তোতাপাখি।

কিন্তু বরুণ মহারাজকে পাওয়া গেলো না। মাদ্রাজ থেকে তিনি এখনও ফেরেননি। হুটকো হালদার বললেন, "দুঃখ করবেন না, আমি যতদূর শুনেছি তা আপনাকে বলছি। ভক্তদের যত সাধই থাক, ঠাকুরের আঁকা ছবি দেখার উপায় আর নেই। অথচ এই ছবি অনেকদিন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাশে ঠাকুর যে বাড়িতে থাকতেন তার দেওয়ালে আঁকা ছিল।"

হুটকোবাবু এ বিষয়ে সদ্য নন্দলাল বসুর স্মৃতিকথা পাঠ করেছেন। ১৯৩৬ সাল থেকে নন্দলাল আর্ট স্কুলে পড়বার সময়েই উদ্বোধন পত্রিকার অফিসে যেতেন স্বামী সারদানন্দকে দেখতে। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে তিনি একটি ছবি উপহার দেন পরের বছর। গিরীশ ঘোষ তাঁকে বলেছিলেন, যা আঁকবে তার রূপ ও ভাব নিজের ওপর আরোপ করে তার সঙ্গে এক হয়ে যাবে, অভিন্ন হয়ে যাবে।

নন্দলালের মতে, ঠাকুর একজন শিল্পী ছিলেন, ছবি ও মূর্তি দু-ই তৈরি করতেন। নন্দলাল জানিয়েছেন, "দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ যে ঘরে থাকতেন তার উত্তর দেওয়ালে দরজার দুপাশে কাঠকয়লার রেখায় আঁকা দুটি ছবি ছিল। ৪´×৫´ আন্দাজ বড়। আমি ও প্রিয়নাথ সিংহ উহা দেখেছি। ঢুকতে বাঁদিকে একটি জাহাজ, ডানদিকে একটি আতাগাছ আর তাতে টিয়াপাখি বসে।" নন্দলাল অবিলম্বে শ্রীরামকৃষ্ণের আঁকা ছবি দুটি যে রকম দেখেছিলেন তার প্রতিলিপি করে রাখেন।

"এমন অমূল্য সম্পদ মানুষের অবহেলায় চিরদিনের জন্যে নষ্ট হয়ে

গেলো", খুব দুঃখ করতে লাগলেন হুটকো হালদার।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। হুটকো হালদার ও পিকলু বেলুড় রেল স্টেশনের পথ ধরে হাঁটতে লাগলেন।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে কংকোর্সে আবার হরিময়বাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। হরিময়বাবু স্বয়ংক্রিয় ওজন যন্ত্র থেকে ওজন নিচ্ছেন।

কী ব্যাপার? সকালবেলাতেও হরিময়বাবু নিজের ওজন নিয়েছিলেন।

হরিময়বাবু বললেন, "একসাইটমেন্টে, উত্তেজনায় মানুষের ওজন কতটা একদিনে কমে যায় তা মেপে দেখছি। সকালে বেরিয়েছিলাম দুনিয়াকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে। তোমাদের অবাক করে দেবো, গোপন দন্তমন্দির খুঁজে বার করে। সেই পথে এগোলাম, সফলও হলাম, কিন্তু..."

"কী হলো, হরিময়দাদা?"

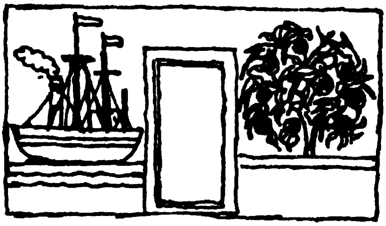
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে হরিময়বাবু বললেন, "এই রহস্যের বোঝা আর বইতে চাইছে না শরীর। পরের সংখ্যার সম্পাদকীয় লিখতে পারছি না, কলমে কালি শুকিয়ে যাচ্ছে। আমি গোপন সূত্রে খবর পেলাম, এই কলকাতার কাছাকাছি দন্তমন্দির আছে—সেটার খবর পেলেই বংশগোপাল বিশ্বাসের রহস্যকথা ফাঁস হয়ে যায়। গোপন খবর অনুযায়ী আমি বালি স্টেশন থেকে কর্ডলাইন ধরে বেলানগর স্টেশনে হাজির হলাম। বিশ্বাস করুন ওইখানেই চোখের সামনে দন্তমন্দির দেখতে পেলাম। কিন্তু..."

"এতোবার কিন্তু কিন্তু করছেন কেন হরিময়দাদা?"

হরিময়বাবুর গলা বোধ হয় শুকিয়ে আসছে। ঢোক গিলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বললেন, "এই দাঁতও কাশীপুর শ্মশান থেকে সংগৃহীত। তবে দুঃখের ব্যাপার এটা ঠাকুরের দাঁত নয়, দাঁতের মালিক ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য বিবেকানন্দর সখা স্বামী অভেদানন্দ, যিনি কালী বেদান্তী বলে পরিচিত ছিলেন। অভেদানন্দ দেহরক্ষা করলেন ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯। তাঁর সেবক ও শিষ্য স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ এই বেলানগর আশ্রমে অভেদানন্দর দন্ত, কেশ ও অস্থিস্থাপনপূর্বক নাম দিয়েছেন পবিত্র দন্তমন্দির।

ঠাকুরের দাঁত খুঁজে বার করতে না পেরে হরিময়বাবু হতাশায় ভুগছেন। বললেন, "একটুর জন্যে ব্যাপারটা হাতছাড়া হয়ে গেলো, মিস্টার পিকলু।"

বেলা দশটার সময় হরিময়বাবুর কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দিলো পিকলু।



"হরিময়দাদা উঠুন।"

ধড়মড় কবে সুখশয্যা থেকে উঠে পড়লেন হরিমযবাবু। বললেন, "ভাই পিকলু, রাতজাগা বাড়িওয়ালার পাল্লায় পড়ে আমাব বায়োলজিক্যাল ঘড়িটা একেবারেই গড়বড় হয়ে গিয়েছে! সকাল দশটায় মনে হচ্ছে সবে রাত এগারোটা!"

পিকলুর ঘুম আগেই ছুটে গিয়েছে। ওপর থেকে আনা পুরনো কাগজপত্তরগুলো খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে সে বললো, "হরিময়দাদা, দুটো ভীষণ ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি!"

হরিময়বাবুর রিকোয়েস্ট: "একটা-একটা করে বলো ভাই, আমি তো তোমার পুলিশদাদু নই যে, একই সঙ্গে দুটো চোরকে পাকড়াও করতে ছুটবো। আমার হচ্ছে ওয়ান বাই ওয়ান, একের বেশি জিনিস এই ছোট্ট ব্রেনে ঢুকতে চায় না।"

পিকলু বললো, "শুনুন, স্বয়ং নরেন্দ্রনাথ একবার গঙ্গায় ডুবে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন ঠাকুরের মহাসমাধির পরে—শোক সামলাতে পারছিলেন না। বংশগোপালবাবু নিজে একটা কাগজে এই কথা লিখে রেখেছেন। এবং এই ব্যাপারে খুব দুঃখ করেছেন। বলেছেন, নরেন্দ্র ইচ্ছে করলেই মস্ত ব্যারিস্টার হয়ে অনেক টাকাকড়ি রোজগার করতে পারতেন। হাজার হোক উকিল বংশের রক্ত। সমকালীন বন্ধু ডবলু সি বনার্জি তো ব্যারিস্টার হয়ে কম টাকা রোজগার করেননি।"

হরিময়বাবু বললন, "নরেন্দ্রনাথ শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করেননি তো? চুকে গেলো! এতো দিন পরে এসব কথা তুলে কাজ নেই। কয়েকজন স্বামীজি, শঙ্করীপ্রসাদবাবু এবং তাঁর প্রকাশক মিস্টার মণ্ডল ছাড়া আর কেউ এই খবর থেকে উপকৃত হবেন না।" হরিময়বাবু ব্যাপারটা হালকা করে দিতে চাইলেন। ভোরবেলায় অন্তত দু'কাপ চা না খাওয়া পর্যন্ত তিনি কোনোরকম উদ্বেগ সহ্য করতে পারেন না।

দ্বিতীয় আবিষ্কারটা সম্বন্ধে যথাসময়ে জানতে চাইছেন চমচম সম্পাদক।

পিকলু বিস্ফারিত নয়নে বললো, "বিলিভ ইট অর নট, বংশগোপাল বিশ্বাস প্রয়োজন হলে কবিতাও লিখতেন।"

কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় একটু বিরক্ত হরিময়বাবু বললেন, "বাঙালির ছেলে কবিতা লিখবে এটা আর এমনকি বড় খবর ভ্াই? নরেন্দ্রনাথ গান লিখতেন, কবিতা লিখতেন, অভেদানন্দ মন্ত্র লিখতেন, অক্ষয় সেন পয়ারে একখানা পুরো রামকৃষ্ণ পুঁথি লিখে ফেললেন, হোয়াই নট বংশগোপাল বিশ্বাস? তিনিও তো বঙ্গমাতার আপন সন্তান।"

হরিময়বাবু যা বুঝতে পারছেন না, বংশগোপালের কবিতার বিশেষ কিছু তাৎপর্য রয়েছে। তাই পিকলু এতো আনন্দিত হয়ে উঠেছে। এগুলো শুধু কবিতা নয়, আরও কিছু।

টেবিলে রাখা বংশগোপাল রচিত কবিতা দেখতে-দেখতে পিকলু এবার হরিময়বাবুকে বললো, "আচ্ছা, বংশগোপাল বিশ্বাস কি পাঁজির খুঁটিনাটি বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন?"

হরিময়বাবু বললেন, "অবশ্যই ছিলেন। অশ্লেষা-মঘা-চন্দ্র-সূর্য এটসেটরা নিয়ে সারাক্ষণ মাথা ঘামাতেন। ওঁর আরামকেদারার একটা হাতের ওপর সারাক্ষণ থাকতো পি এম বাগচী। একবার সেটা চাকর সরিয়েছিল বলে তুলকালাম কাণ্ড করেছিলেন। পঞ্জিকা যাঁরা লেখেন, যেমন মন্দিরতলার কালী পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ভাব ছিল। মাঝে মাঝে এই পঞ্জিকাপণ্ডিতকে বাড়িতে ডেকে তিনি সম্মানী দিতেন।"

মনে হলো পিকলু এবার একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে। হরিময়বাবুকে এবার সে বললো, "দাদু ছাড়া এ-কবিতার রহস্যভেদ এবং পাঠোদ্ধার সম্ভব মনে হচ্ছে না। একটা ফোন করে এখনই সল্ট লেক চলে যাই।"

হরিময়বাবু বললেন, "ধাঁধা যদি হয় আমাকেও একটা চান্স দিতে পারো। চমচমের জন্যে রাত জেগে কত ধাঁধার আমি রহস্যোদ্ধার করেছি। ভবনাথবাবু ছাড়াও তুমি পুলিশদাদু রঞ্জন সেনকেও কবিতার কপি পাঠাতে পারো। সত্যজিৎ রায় তো তাঁর উপন্যাসের ধাঁধা রচনার সময় পুলিশ অফিসারের সাহায্য নিতেন শুনেছি।"

এবার কাগজটা হাতে নিলেন হরিময়। বংশগোপালের শ্রীহস্তে রচিত কবিতা তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করতে লাগলেন :

"যত মাঠ তত আল
দেখিল যে জন
মনের মন্দিরে তাঁর
সেবা সর্বক্ষণ।
বাসাংসি জীর্ণানি
তবু কিছু রয়,
এই কথা দিনমণি
সদা কেন কয়?
দেহের সমস্ত অঙ্গ
পঞ্চভূতে লয়,
দ্বিত্রিংশ কুমুদ তবু
হাসিমুখে রয়!
দয়া কর প্রভুদেব
অগতির গতি
অভয়াচরণে যেন
রহে মতিগতি।"

"কী বুঝছেন?" গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করলো পিকলু।

"হাড়ে হাড়ে বুঝছি। বংশগোপালবাবু বড় কবি নন, দু-এক জায়গায় ভয়ানকভাবে ছন্দপতন হয়েছে, কিন্তু কিছু একটা গোপন কথা অপরিচিত কাউকে ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছেন বংশগোপাল বিশ্বাস।"

"ইঙ্গিতটা কী?" তার জন্যেই তো পিকলু সকাল থেকে মাথা ঘামাচ্ছে এবং বারবার কবিতাটা পড়ছে।

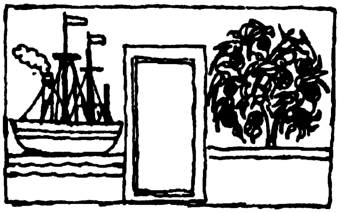
এবার হরিময়বাবু পদ্যটা মুখস্থ কারে নিলেন প্রায়। তারপর বললেন, "মনে হলো বংশগোপালবাবু তাঁর বংশধরদের কোনও গোপন ইঙ্গিত দিচ্ছেন ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে কনে পেন্সিল গুঁজে চোখ বুজে শ্রবণেন্দ্রিয়ে মৃদু খোঁচা মারলেন হরিময়। কিন্তু ধোঁয়াটে ভাবটা ঠিক স্বচ্ছ হচ্ছে না। বাসাংসি জীর্ণানিকে পিকলু আন্দাজ করেছিল বাসি জীর্ণ কোনও খাবার। হরিময়বাবু বললেন, "ওটা গীতাতে আছে, জীর্ণ বাস অথবা বস্ত্র। ওই নামে তোমার দাদু গপ্পো লিখেছিলেন চমচমে। কুমুদ কথাটি খুব খেলিয়েছেন—এর মধ্যে যদি কিছু রহস্য থাকে তা হলে তোমার দাদু ঝট করে ধরে ফেলতে পারবেন। কবিতাটা এখনই

পুলিশদাদুকে ডিকটেট করবে নাকি?”

হরিময়বাবুর চোখে এখনও ঘুম রয়ে গিয়েছে। আর-একবার হাই তুললেন এবং যেমন শুনলেন, পরের খাতাতেও আরও একটা হেঁয়ালি কবিতা রয়েছে তখন হতাশ হয়ে তিনি হাল ছেড়ে দিলেন।

পিকলু তাড়াতাড়ি শিবপুরের মোহনচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত কচুরি ও জিলিপি খেয়ে মোটরবাইক নিয়ে বুলেটগতিতে বেরিয়ে পড়লো সল্টলেকে দাদু ভবনাথ সেনের বাড়ির উদ্দেশে।



ঠাকুমা পিকলুকে নিয়ে একটু চিন্তিত। “কলেজের পড়াশোনায় সময় না দিয়ে ছেলেটা সারাক্ষণ বুড়োদের রহস্যময় ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছে।”

দাদু কিন্তু চিন্তিত নন, বরং তিনি হাসলেন। “ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাপারটা বুড়োদের ব্যাপার নয়। তা ছাড়া বংশগোপাল বিশ্বাসের সমস্যা নিয়ে নানারকম অভিজ্ঞতা হওয়া ভাল, বড় চাকরি করবার সময়ে কাজে লেগে যাবে।”

বংশগোপাল বিশ্বাসের লেখা কবিতাটা বেশ কয়েকবার পড়েছেন ভবনাথ। তিনি বললেন, “প্রথম লাইনটা ভালই—যত মত তত পথের প্যারডি বা ব্যাখ্যা বলতে পারো। তারপর :

বাসাংসি জীর্ণানি
তবু কছু রয়

অর্থাৎ ইঙ্গিত করছেন মৃত্যুর পরেও দেহের কিছু অংশ এই পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে।”

ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছে পিকলু। ভবনাথ বারবার লাইনগুলো পড়ছেন। “সত্যজিৎ রায় বেঁচে থাকলে হয়তো আমাদের হেল্প করতে পারতেন, ওঁর এই

সব বিষয়ে ভীষণ আগ্রহ ছিল। ওঁর পিতৃদেব সুকুমার রায়েরও ছিল।"

পরের পর্বে এসে কিন্তু আটকে যাচ্ছেন ভবনাথ সেন। "শতপদ্ম, সহস্রপদ্ম—একশ এক পদ্ম দিয়ে পুজো প্রায়ই হয়, কিন্তু দ্বিত্রিংশ কুমুদ? বত্রিশটা পদ্ম দিয়ে তো কিছু হয় না, পিকলু।"

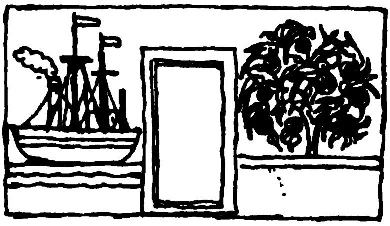
আরও আধঘণ্টা পরে ভবনাথ উত্তেজিতভাবে বলে উঠলেন, "পাওয়া যাচ্ছে পিকলু। বোধহয় বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা।

দেহের সমস্ত অঙ্গ
পঞ্চভূতে লয়
দ্বিত্রিংশ কুমুদ তবু
হাসি মুখে রয়।

চিতায় আগুনের উত্তাপ খুব বেশি না হলে নরদেহর দাঁতগুলো পোড়ে না—ইয়েস মানুষের দাঁতের সংখ্যা তো দ্বিত্রিংশ অর্থাৎ বত্রিশটা! যদিও গ্রিক দার্শনিকরা হিসেবে বারবার ভুল করেছেন।"

ভবনাথ বললেন "ব্যাপারটা এবার দিনের আলোর মতন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে, পিকলু। রেফারেন্সটা অবশ্যই দাঁতের। দন্তকৌমুদী কথাটা শুনেছো তো? ওখানে মানে হচ্ছে চাঁদের হাসি, অর্থাৎ আলোকদায়িনী, আবার দাঁতকে শ্বেতপদ্মের মতন কল্পনা করতেও বাধা নেই। সংস্কৃত সাহিত্যে কয়েকবার উল্লেখ আছে।"

"শেষ ক'টা লাইন, দয়া কর প্রভুদেব/অগতির গতি/অভয়চরণে যেন/রহে মতিগতি। স্রেফ কাব্যরসের ড্রেসিং! কিন্তু বংশগোপালের নিজস্ব রচনা নয়। যত দূর মনে হচ্ছে অক্ষয়কুমার সেনের লেখা, রামকৃষ্ণ পুঁথিতে পাওয়া যেতে পারে। বইটা আজকাল রামকৃষ্ণ ভক্তরাও পড়েন না। খুব বোকামি করেন। অথচ সাতবছর নিরন্তর সাধনা করে পুঁথিটি লেখেন অক্ষয়কুমার, শেষ হয় ১৯০১ সালে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হবার আগে। অক্ষয়বাবু বেঁচে ছিলেন ১৯২৩ সাল পর্যন্ত। শেষ জীবনে বসুমতীর চাকরি ছেড়ে বাঁকুড়ায় বাজে ময়নাপুর গ্রামে ফিরে গিয়ে আমৃত্যু শ্রীরামকৃষ্ণের ভজন-পূজনে নিজেকে নিবেদন করেন।"



বংশগোপালের লেখা পরের কবিতা আরও জটিল। ভদ্রলোক লিখে আবার কলমের এক আঁচড়ে লেখা কেটে দিয়েছেন। বোধহয় পাঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। ঢ্যারা দিয়ে কেটে দিলে কে আর দেখবে?

এইসময় ঠাকুমা ঘরে ঢুকে বললেন, "এসবের মধ্যে এইভাবে ডুবে গেলে তোমাদের খাওয়া হবে না। দুপুরে ভাতে-ভাত করেছি, আগে খেয়ে নাও।"

ভবনাথবাবু খুব খুশি হলেন। "যখন মাথাঘামানোর কাজ করবে তখন স্রেফ ভাতে-ভাত-এর ওপরে থাকবে, ভাই পিকলু। সেই সঙ্গে বড়জোর ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় আলুপোস্ত চচ্চড়ি এবং কলাই ডাল। ব্রেনটা ঠাণ্ডা থাকবে।"

ভাতে-ভাত খাওয়ার পরে পনেরো মিনিট বিশ্রাম নিয়ে ভবনাথ বললেন, "পরের কবিতাটা এবার দেখা যাক। এটা বোঝা যাচ্ছে, শ্রীশ্রীঠাকুরের দাঁতটা নিয়ে মালিক বংশগোপাল বিশ্বাস বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গিয়েছিলেন। তিনি কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। ব্যাপারটা তিনি একেবারেই চাউর করেননি। খুবই গোপন রাখতে সফল হয়েছিলেন। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত যাতে চিরতরে হারিয়ে না যায় তার জন্যে বংশধরদের কিছু ইঙ্গিত দিয়ে যেতে তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। অথচ বারবার পারিবারিক অকালমৃত্যুতে জর্জরিত হয়েছিলেন বেচারা বংশগোপাল।"

ঠাকুমা কথা শুনছিলেন। তিনি বললেন, "কিন্তু সংসারের জন্যে মানুষটার কত ভালবাসা দ্যাখো। নিজের কথা চিন্তা না করে, বংশধরদের বড়লোক করার জন্যে মানুষটা কত কষ্ট সহ্য করে গিয়েছেন। ভাগ্যবান লোক, স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন।"

"বংশধররা কি সেসব বোঝে?" নিজের মনেই মন্তব্য করলেন ভবনাথ। "আর নিষ্ঠুর সময় তার নিজস্ব খেয়ালে আপন খেলা খেলে যায়।"

কবিতাটি আরও একবার পড়ে ভবনাথ বললেন, "মাথায় ঢুকছে না, পিকলু। বিনা দুধ এবং বিনা চিনিতে সুবোধ ব্রাদার্সের দার্জিলিং চা বিশেষ প্রয়োজন।"

পিকলুর ঠাকুমা এ ব্যাপারে সর্বদা প্রস্তুত। এরকম অর্ডার হবে আন্দাজ করেই তিনি রান্নাঘরে চায়ের জল আগেই ফুটোতে দিয়েছেন। মধ্যাহ্নভোজনের পরেও ভবনাথ সেন চা-পানে অভ্যস্ত। সুবোধ ব্রাদার্সের প্রতি দুর্বলতার জন্য তিনি রসিকতা করে নিজেকে এখন সুবোধ বালক বলেন।

গরম চায়ের সঙ্গে বেশ কয়েকবার কবিতাটা পড়লেন ভবনাথ। তারপর বললেন, "পিকলু তুমি পড়ে যাও, আমি চোখ বন্ধ করে শুনি। অনেক গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে এই লেখায়।"

পিকলু ধীরে ধীরে বংশগোপালের রচিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো :

"চতুর্দশ শতাব্দী পরে
প্রিয় সেই চতুর্থ লগ্নে,
শ্রাবণের মৃত্যুসনে
যদি আকাশ ঘনায়,
সিংহ যদি ঘাতে চন্দ্র
শুদ্ধ হবে যারা
কোন দেশে তারা?
প্রভুর মুরতিখানি
বসায়ে হৃদয়পটে
খুঁজিও রতনখানি
তুলসীর তটে।
মনোমাঝে রেখোনা
আর কোনো কামনা,
মনে রেখো ভাবনা
কুমুদের তাড়না।"

"আবার পড়ো," চোখ বুজে বললেন ভবনাথ সেন।

আবার পড়লো পিকলু। বারবার পড়তে-পড়তে কবিতাটা মুখস্থ হয়ে গেলো তার।

ভবনাথ বললেন, "গ্রেট পোয়েট্রি নয়। ছন্দের গোলমাল আছে—কিন্তু কিছু ইঙ্গিত বিশেষ অর্থবহ। এইগুলো মনে হয় বংশগোপালের প্রপৌত্র বংশগোলাপ

অনেক চেষ্টা করে কোনও মানে খুঁজে না পেয়ে তোমার শরণাপন্ন হয়েছেন।"

"শুধু আমাদের শরণ নয়, দাদু। ওই যে সন্ন্যাসী এসেছিলেন তাঁর সাহায্য নিশ্চয় চাওয়া হয়েছিল। স্বামী বহুরূপানন্দ। লোকটা যেন কেমন!"

"নামটাও একটু যেন কেমন ধরনের।" স্বীকার করলেন ভবনাথ সেন।

ঠাকুমা অত সহজে মানুষকে অবিশ্বাস করতে চান না। তিনি বললেন, "কেন ঠাকুরের ওখানে তো কত অদ্ভুত নাম হতো—ন্যাটকো, বুড়ো গোপাল, দমদম মাস্টার, রামনেলো।"

"রামনেলো আবার কার নাম? আগে তো কানে আসেনি," বললেন ভবনাথ।

"তোমার আজকাল কিছুই মনে থাকে না। সেদিন কাঁকুড়গাছির নরেশ মহারাজ জনসভায় বললেন, ভাইপো রামলালকে মাঝে মাঝে রামনেলো বলে ডাকতেন ঠাকুর। শ্রীম অর্থাৎ মাস্টারমশায়ের আমাশয় হয়েছিল। ঠাকুর বললেন, রামনেলোর কাছে যাও, ওর কাছে ওষুধ আছে। তিন দিনে আরাম, চিঁড়ে দিয়ে খেতে হয়।"

"এসব আদরের ডাকনাম। সন্ন্যাসীদের নাম তো অনেক ভেবেচিন্তে দেওয়া হয়।" মন্তব্য করলেন ভবনাথ সেন।

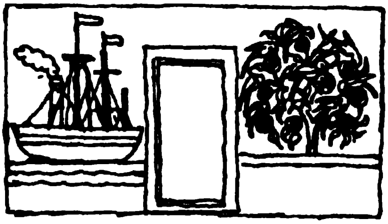
পিকলুর ঠাকুমা বললেন, "অবতারদের শরীরের অংশ নিয়ে বাণিজ্য করতে নেই। বংশগোপালবাবু কাশীপুর শ্মশানে বসে ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি।"

ভবনাথবাবু বললেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভববন্ধন থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি পেলেন?"

পিকলু অনেক খবরাখবর নিয়ে এসেছে। বেলুড় মঠে সে স্পষ্ট শুনে এসেছে, ঠাকুর নিজের মুখে বলে গিয়েছেন, আর একবার আসতে হবে এবং যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁদের মুক্তি হবে না। বায়ুকোণে আর একবার দেহ হবে।"

"শ্রীমা বলেছিলেন, রামকৃষ্ণ আরও দু'বার আসবেন, প্রথমবার সন্ন্যাসী বাউলের বেশে একশ বছর পরে, জন্মস্থান বর্ধমানের দিকে। মধ্যের শতাব্দী তিনি ভক্তদের হৃদয়ে বাস করবেন।"

আরও খবর রয়েছে পিকলুর কাছে। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ যিনি বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ করেছেন, তিনি বলেছেন, দুশো বছর পরে ঠাকুরের আবির্ভাব হবে। এবার তিনি পাঞ্জাবী শরীরে শারীরিক শক্তির রাজা হয়ে আসবেন।"



অপরাহ্ণ গড়িয়ে বিকেল যাবো-যাবো। রহস্য কবিতার কোনও সূত্র এখনও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাৎ ভবনাথবাবু বললেন, "১৩০৪ সালের গুপ্ত প্রেস ও পি এম বাগচীর পাঁজি দুটো নিয়ে এসো তো।"

দুটো পাঁজিই ঠাকুমার হাতের গোড়ায় থাকে। সঙ্গে সঙ্গে এসে গেলো। ভবনাথ বললেন, "প্রথমেই সঙ্কেতটা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে আক্রমণ করে দেখতে হবে। ৩১শে শ্রাবণ অর্থাৎ ১৬ই আগস্টের পাতাটা খুলে দেখি।"

১৬ই আগস্ট ১৯৩৭ শনিবার অর্থাৎ ৩১শে শ্রাবণ ১৩০৪। ঠাকুরের তিরোধানের ১১১ বছর।

পিকলু বললো : "আলো পাওয়া যাচ্ছে, দাদু। চতুর্দশ শতাব্দী পরে প্রিয় সেই চতুর্থ লগ্নে—মোস্ট প্রবাবলি—খুব সম্ভবত। ১৩০৪-এর ইঙ্গিত রামকৃষ্ণ মিশনের শতবার্ষিকী।"

ভবনাথবাবুর নির্দেশে ঠাকুমা পাঁজি দেখে বললেন, "সিংহরাশিতে ঘাতচন্দ্রযোগ রয়েছে ৩১শে শ্রাবণ।"

'তা হলে মিলে যাচ্ছে, শ্রাবণের মৃত্যুসনে মানে মাসের শেষ দিকে, যদিও এবার বত্রিশে শ্রাবণ রয়েছে ১৭ই আগস্ট, কিন্তু ওটা পোয়েটিক স্বাধীনতা। কবিরা সময় নিয়ে সামান্য খেলা খেলতে পারেন।"

"যদি আকাশ ঘনায়? এর মানে কি?" জিজ্ঞেস করলো পিকলু।

"আরে, শ্রাবণ মাসে আকাশে মেঘ ঘনিয়ে একটু বৃষ্টি হবে, এ আর বলবার কী আছে? অর্থাৎ রামকৃষ্ণের মহাসমাধি দিনে বংশগোপাল তাঁর বংশধরদের কিছু রত্ন খুঁজতে নির্দেশ দিচ্ছেন উনিশশো সাতানব্বই সালে বা ১৪০৪ বঙ্গাব্দে।"

"চমৎকার! অঙ্কের মতন মিলে যাচ্ছে ব্যাপারটা," বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে

বলে উঠলো পিকলু।

ঠাকুমা এবার মনে করিয়ে দিলেন, আজই তো ৩১শে শ্রাবণ শনিবার অর্থাৎ ১৬ই আগস্ট

"ব্যাপারটা ভীষণ নাটকীয় হয়ে উঠছে, ঠাকুমা। ঘড়ি মিলিয়ে যেন নাটক হচ্ছে মঞ্চে," বলে উঠলো পিকলু।

ঠিক এই সময় বেল বাজলো। ঠাকুমা দরজা খুলে দেখেন বেয়াইমশায়, পুলিশের ড্রেস পরে হাজির হয়েছেন। ব্যস্ত হয়ে উঠলো সবাই।

রঞ্জন সেন ডি আই জি এবার বললেন, "আপনার নির্দেশমতন ঠিক সময়েই এসে গেলাম।"

"এসেছেন, পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এটা খুব ভাল কথা, কিন্তু আপনাকে নির্দেশ দেবে কে?" প্রশ্ন তুললেন ভবনাথ সেন।

এবার সত্যিই অবাক হবার পালা। ভবনাথবাবুর নাম করে কেউ ডি আই জি অফিসে মেসেজ রেখেছে, রঞ্জন সেনকে আজ বিকেলে সল্টলেকে জল খেতে আসতেই হবে! পিকলুও উপস্থিত থাকবে। সুতরাং আর দ্বিধা করেননি রঞ্জন সেন। আপিসের কাজকর্ম ফেলে রেখে সোজা চলে এসেছেন।

"চোর জোচ্চোরদের তা হলে অন্তত একদিনের জন্যে সুবিধে হয়ে গেলো," রসিকতা করলেন ভবনাথবাবু।

তাঁর স্ত্রী বললেন, "ওঁর কথা রাখুন, আজ যখন সল্টলেকে এসেছেন তখন খিচুড়ি এবং ইলিশমাছ ভাজা খেয়ে বাড়ি ফিরবেন।"

ওঁদের কথা তখনও শেষ হয়নি। আবার বেল বেজে উঠলো। অবাক কাণ্ড, হরিময়বাবু হাঁপাতে-হাঁপাতে প্রবেশ করলেন। ক্ষমা চেয়ে বললেন, "স্যরি, দু'মিনিট দেরি হয়ে গেলো, ছ'টা বেজে দু'মিনিট হয়েছে। আমি মেসেজ পেয়েছি, কিন্তু বাসে উঠতে পারি না। শেষে এসপ্ল্যানেড থেকে একটা ভাগের ট্যাক্সিতে বিধাননগরে হাজির হয়েছি! ট্যাক্সিওয়ালারা ভীষণ চার্জ বাড়িয়ে দিয়েছে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে।"

"মেসেজ?" পিকলু এবার বেশ অবাক হয়ে গিয়েছে।

হরিময়বাবুর চোখ দুটো বিস্ফারিত হচ্ছে। "তুমি টেলিফোনে বিজয়কে খবর দাওনি, যে-করেই হোক বিকেল ছ'টার মধ্যে সল্টলেকে এসে তোমার সঙ্গে জরুরি আলোচনা করতে হবে?"

বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলো পিকলু। ঠাকুমা এবারেও বললেন, "ঠাকুর যা

করেন মঙ্গলের জন্যেই করেন—খিচুড়ি এবং ইলিশ মাছ দেড় ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে। বাংলাদেশের এক পাঠক ঢাকা থেকে আসবার সময় ভবনাথের বাড়িতে মাছ নামিয়ে দিয়ে নরেন্দ্রপুরে চলে গিয়েছে। এমদাদুল খাঁ—ওঁর দুই ছেলে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াশোনা করে, স্বামী লোকেশ্বরানন্দর খুব ফেভারিট এই এমদাদুল। এঁকেও লেখক হিসেবে খুব শ্রদ্ধা করে।"

হরিময়বাবু বললেন, "ভাগ্যে মাথায় টাক পড়েছে, না হলে দুশ্চিন্তায় এবং সাসপেন্সে কখন মাথার সব চুল খাড়া হয়ে উঠতো। আসলে আজ কি পয়লা এপ্রিল?"

"আপনার মাথা খারাপ! আজ ১৬ই আগস্ট, ১৯১৬। কোন দুঃখে ১লা এপ্রিল হতে যাবে?"

"তা হলে কারুর মাথায় কোনও সিরিয়াস অভিসন্ধি রয়েছে। বিশেষ কোনো ঘটনা কেন্দ্র থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে রাখতে চায় কেউ।"

ভবনাথ সেন বললেন, "সারা দুপুর ধরে আমরা দু'জন আপনার বাড়িওয়ালার লেখা কবিতারহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছি। একটা জিনিস পরিষ্কার, ১৩০৪ সনের ৩১শে শ্রাবণ তিনি কোনও লুপ্তরত্ন উদ্ধারের নির্দেশ দিচ্ছেন।"

"এই রত্ন বংশগোপালবাবু কোথায় লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন তা জানতে পারলেই তো সব হাঙ্গামা চুকে যেতো। আমার ধারণা, এসব বার্মার কোথা লুকিয়ে রেখে এসেছিলেন বংশগোপাল।"

"প্রয়োজনে আমাকে এবং পিকলুকে একবার বার্মা ঘুরে আসতে হবে, যদি ভিসা পাওয়া যায়।" হরিময়বাবু কখনও বার্মা দেখেননি।

"বেয়াইমশাই রয়েছেন। অনুমতির অসুবিধে হবে না," বললেন পিকলুর ঠাকুমা।

"সেটা তো পাসপোর্ট—পুলিশের হাতে। কিন্তু ভিসাটা বার্মা সরকারের মর্জি। যাবো বললেই লাল কার্পেট পেতে দেবার জন্যে তাঁরা বসে নেই।" বললেন ভবনাথ সেন।

"পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই, সে পাসপোর্টই বলুন আর ভিসাই বলুন," এই বলে পিকলুর ঠাকুমাকে সগর্বে এবং প্রকাশ্যে সাপোর্ট করলেন হরিময়বাবু।

আবার পড়লেন ভবনাথ :

প্রভুর মুরতিখানি
বসায়ে হৃদয়পটে

খুঁজিও রতনখানি
তুলসীর তটে।

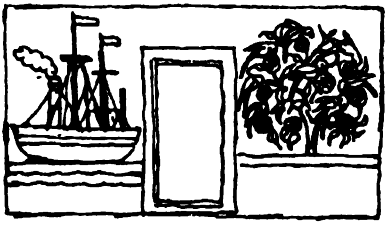
"আচ্ছা, বার্মার অথবা হিদারাম হালদার লেনের কোথাও কোনও তুলসীর ব্যাপার আছে?"

"অবশ্যই আছে! ওইখানেই তো এভরি সন্ধ্যায় চমচমকে লাইটিং সার্ভিস দিতে হয় অর্থাৎ প্রদীপ জ্বালানোর সেবা করতে হয়!" বললেন হরিময়বাবু।

"হুররে," বলে লাফিয়ে উঠলো পিকলু। "হরিময়দাদা, আর এক মিনিট দেরি নয়, রহস্যের সমাধান হতে চলেছে। ওই তুলসীমঞ্চেই আমরা যা খুঁজছি তা পেয়ে যাবো। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত।"

ভবনাথবাবুর মুখও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "পিকলু হ্যাজ হিট দ্য জ্যাকপট! এরপরেই তো দন্তকুমুদের ব্যাপারটা জলের মতন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে—

মনোমাঝে রেখো না
আর কোনো কামনা,
মনে রেখো ভাবনা
কুমুদের তাড়না।"



এবার হুড়মুড় করে দাদুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো পিকলু। ঠাকুমা কত করে বললেন, "দশ মিনিট অপেক্ষা করো। অন্তত ইলিশমাছ ভেজে দিই।"

হরিময়বাবু ইলিশমাছ খেতে ভীষণ ভালবাসেন। বিশেষ করে বাংলাদেশের ইলিশ। তাঁর একটু থেকে যাবার ইচ্ছে।

"যা ১১১ বছর অপেক্ষা করেছে তা আরও ১১১ মিনিট অপেক্ষা করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না," এইটাই হরিময়বাবুর সুচিন্তিত অভিমত।

কিন্তু পিকলু রাজি নয়। গজগজ করে হরিময়বাবু মোটরবাইকের পিছনে চড়ে বসলেন। সংবাদপত্রের 'দিনটি কেমন যাবে' বিভাগে শ্রীভৃগু লিখেছেন, 'সুযোগ এলেও হাতছাড়া হবার প্রবল সম্ভাবনা।'

নিজের মনেই হরিময়বাবু মন্তব্য করলেন, "শ্রীভৃগু যা লেখেন তাই সত্যি

হয়।”

পিকলু এখন চংামন করছে। মাথায় সেফটি হেলমেট পরে, একটা সুরক্ষা হাণ্ডিকা সে হরিময়বাবুকেও দিয়েছে। কিন্তু বৃষ্টি আসছে প্রবলভাবে—ওই যে লিখেছে শ্রাবণের মৃত্যুসনে যদি আকাশ ঘনায়।

হরিময়বাবু বললেন, “সব রহস্যের তো সমাধান হয়ে গেলো মনে হচ্ছে। ওই তুলসীতলায় বংশগোপালবাবু যে মহাসম্পদ লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন তা আমাদের মাথায় একবারও আসেনি। আসলে, সবই ঠাকুরের ইচ্ছা না হলে ট্রিপল ওয়ান ইয়ার্স অপেক্ষা করতে হলো কেন।”

ঠাণ্ডা হাওয়া তীরবেগে যাত্রীদের শরীরকে আক্রমণ করছে তবু হরিময়বাবু শান্ত হতে পারছেন না। ভিতরটা এবং টাকের কেন্দ্রটা ঘন ঘন ঘেমে উঠছে চাপা উত্তেজনায়।

“অদ্ভুত ব্রেন তোমার এবং তোমার দাদুর। দলিলগুলো একটু ক'দিন আগে পেলে এতো উদ্বেগ সহ্য করতে হতো না। আমি তো আবার হুটকো হালদারকে শঙ্করীপ্রসাদবাবুর বাড়িতে ধর্না দিয়ে থাকতে রিকোয়েস্ট করেছি—আমেরিকান কোনও অপ্রকাশিত চিঠিতে যদি নরেন্দ্রনাথ এই দাঁতের কোনও ইঙ্গিত দিয়ে থাকেন, বিশেষ করে মিস ম্যাকলাউডকে। ওঁর কাছে যে কত গোপন খবর ছিল! সেই সঙ্গে অনেক রেলিকুয়্যারি।”

শেষ শব্দটার অর্থ পিকলু জানে না।

“আমিও কি জানতাম! ইংরিজি বুঝতে না পেরে, একদিন লজ্জার মাথা খেয়ে বসুমশাইকে ফোন দিলাম। হাঁটুর ব্যথা, ফোন ধরতে চাইছিলেন না, শেষে চমচমের নাম শুনে হ্যালো বললেন। এবং বুঝিয়ে দিলেন কথাটার মানে—সাধুদের দেহাবশেষ বা পবিত্র বস্তুর আধার।”

পিকলুর মোটরসাইকেল ইতিমধ্যে বিদ্যাসাগর সেতুর পূর্বপ্রান্তে এসে গিয়েছে।

“ধন্যি বটে! স্রেফ কাছি দিয়ে এত বড় একটা ব্রিজ বেঁধে রেখেছে!” বললেন হরিময়বাবু। তাঁর উত্তেজনা এবার বাড়ছে। “দাঁতের ভ্যালুয়েশন অন্তত ওয়ান মিলিয়ন ডলার! ভীষণ ভাগ্যবান এই বংশগোলাপ বিশ্বাস। স্নেহময় পিতৃপুরুষের দূরদৃষ্টিতে সাড়ে চার কোটি টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়ে যাবে।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান।” বলে উঠলো পিকলু।

শ্রাবণ মেঘের দাপটে ব্রিজ প্রায় খালি, কোনও গাড়ি নেই বললেই হয়। দূরে, ওই টিপটিপে বর্ষায় একটা ট্যাক্সি পিছলে গিয়ে রেলিঙে মৃদু ধাক্কা মেরেছে।

বাইক থামিয়ে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে পিকলু হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো, "এই যে বংশগোলাপবাবু! আপনি এখানে? এইভাবে?"

মাথা নামিয়ে হতভম্ব হয়ে বসে আছেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। বললেন, "একটুর জন্যে বেঁচে গিয়েছি—এতক্ষণে না হলে হাসপাতালের মর্গে পড়ে থাকতে হতো।"

"বালাই ষাট। ওসব কথা মুখে আনবেন না বংশগোলাপবাবু। ঠাকুরের ইচ্ছায় আপনাকে এখনও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে, নাতির ভাতে নিজে দাঁড়িয়ে লোক খাওয়াতে হবে!"

"কার ইচ্ছায় বললেন?"

"ঠাকুরের দয়ায়। তিনিই তো সারাক্ষণ অন্য খেলা খেলাচ্ছেন।"

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন বংশগোলাপ। "বলবেন না, ঠাকুর বেশ ক্ষেপে রয়েছেন এই বিশ্বাস বংশের ওপর।"

এবার সুখবরটা দিলেন হরিময়বাবু। তাড়াতাড়ি ছুটছে পিকলু প্রাণসংশয় করে, কারণ তুলসীতলাতেই আজ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দন্তরহস্যের অবসান হবে।

"ওয়ান মিলিয়ন ডলার—বুঝেছেন বংশগোলাপবাবু!" ব্যাখ্যা করলেন হরিময়। "চার কোটি টাকার জিনিস।"

বংশগোলাপ এবার এসে পিকলুর মোটর বাইকে উঠলেন। ব্যাকসিটে দু'জন লোক বহন করা বেআইনি। কিন্তু এখন কী উপায়?

"আপনারা এলেন এখানে দেবদূতের মতন। মিস্টার পিকলু।" অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছেন বংশগোলাপ।

"যে কোনও দায়িত্ববান নাগরিক এখান দিয়ে গেলেই আপনাকে দেখে গাড়ি থামাতো। মনে রাখবেন, গতকালই আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করেছি।"

বিশ্বাসই করতে পারছেন না বংশগোলাপবাবু যে রহস্য কবিতার পাঠোদ্ধার হয়েছে। হরিময়বাবু সাবধান করলেন, "ব্যাক সিটে নড়াচড়া করবেন না, বংশগোলাপবাবু। পিছনের রাইডার নার্ভাস হয়ে পড়লেই দু'চাকার গাড়িতে গড়বড় শুরু হয়ে যায়।"

একটু পরে হরিময়বাবু বললেন, "চার কোটি হাতে পেলে কিছু টাকা শ্রীশ্রীঠাকুরের পুজোতে দিয়ে দেবেন, বংশগোলাপবাবু। আমরা তুলসীমঞ্চের সামনে একটা ফাউন্টেন অফ জয় করবো। নাম হবে আনন্দধারা।"

বংশগোলাপ বললেন, "ওখানে, মানে বেলুড় মঠে দু কোটি দেবো

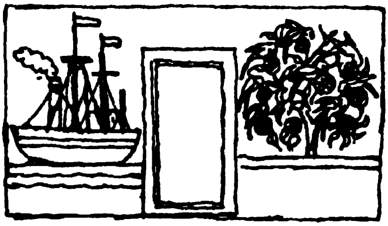
শ্রীশ্রীঠাকুরের মানভঞ্জনের জন্যে...।" বাকি রইলো দু কোটি। হিসেব কষছেন হরিময়বাবু।

এবার বোমা ফাটলেন বংশগোলাপ বিশ্বাস। "আমি দেড় কোটি দেবো চমচমকে, আর পঞ্চাশ লাখ মিস্টার পিকলুকে—উনি আমার বংশধরদের জন্যে যা করলেন!"

"সে কি মশাই! আপনার নিজের? আপনার বংশধরের?"

দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন বংশগোলাপ। "ব্যাপারটা আমি বুঝে নিয়েছি হরিময়বাবু। শ্রীদন্তের টাকা মোটেই বিশ্বাস বংশের ধাতে সইবে না। বংশ রক্ষে করাটা বড়লোক হওয়ার থেকে অনেক বড় কাজ। আমার শিক্ষা হয়ে গিয়েছে, মশাই। দেখলেন না, আজকে আমার মৃত্যুযোগ ছিল। সামান্য একটু টুসকি মেরে যমদূত রসিকতা করে গেলো। ট্যাক্সি যখন কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলে অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, তখনই আমি কাতরভাবে বললুম, ঠাকুর আমি তোমাকে ভাঙিয়ে একটা আধলা নেবো না! বিশ্বাস করুন, ট্যাক্সিটা চুরমার হয়ে গেলো, অথচ আমি প্রাণে বেঁচে রইলাম।"

"কিন্তু কোথায় গিয়েছিলেন আজ?"



বংশগোলাপ নিজের মনেই বললেন, "লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! আমি ওই স্বামীজি বহুরূপানন্দের সঙ্গে গোপন কথা চালাচ্ছিলাম, আপনাদের না বলে। যদি কোনও সোর্সে লুকিয়ে রাখা দাঁতের খবরটা পান এবং বংশগোপালের সাঙ্কেতিক কবিতার পাঠোদ্ধার করতে পারেন। আজ বিকেলে অ্যাজ ইউজাল, আমি ঘুম থেকে উঠেছি, সেই সময় ম্যানেজার সিং এসে বললো, টেলিফোন এসেছিল। স্বামী বহুরূপানন্দর কাছ থেকে জরুরি খবর আছে। আমাকে বেরোতে হবে। সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে স্বামীজি এন্টালিতে ডিহি শ্রীরামপুর লেনে রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমের সামনে আমার জন্যে একলা অপেক্ষা করবেন।"

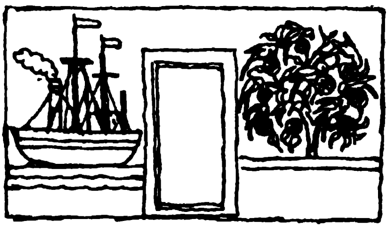
খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটেছেন বংশগোলাপ। একটা ট্যাক্সি করে হাজির হয়েছেন প্রবুদ্ধ ভারতের আপিসের সামনে।

"জানতাম না মশাই। শুনলাম, ঠাকুর স্বামীজির সমস্ত ইংরিজি বই ওঁরা ছাপেন। তা ওখানে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। স্বামীজির নো পাত্তা। শেষে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে আশ্রমের ভিতরে পাঠালাম। অরবিন্দ মহারাজ বলে এক সন্ন্যাসী বলে দিলেন, এখানে বহুরূপানন্দ বলে কোন সন্ন্যাসী নেই।"

"আমি তো তখন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।" হতাশ হয়ে বললেন বংশগোলাপ।

ব্যাপারটা পিকলু কিন্তু বেশ বুঝে উঠতে পারছে। তার মনে যেসব সন্দেহের ইঙ্গিত রয়েছে তা তাকে দ্রুত ৪২/৩ হিদারাম হালদার লেনে হাজির হতে বলছে। সময়টা ভীষণ কম।

"বংশগোলাপবাবু, কেউ সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের সবাইকে হিদারাম হালদার লেন থেকে কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে দিতে চেয়েছে। সেই সঙ্গে পুলিশদাদুকেও জড়িয়ে ভুল করেছে। কারণ কফিপোসার হাঙ্গামা না থাকলে পুলিশদাদুকে ভয় পাবার তো কিছু নেই।"



তিন যাত্রীর এনফিল্ড বুলেট শিবপুর মন্দিরতলা পেরিয়ে যখন হিদারাম লেনে পৌঁছলো তখন ৪২/৩-এ ঘুটঘুটে অন্ধকার।

চমচমের বিজয় ছুটিতে গিয়েছে। তার জায়গায় নজর আলি লেন থেকে গুণধর সামন্ত কাজ করতে এসেছে।

গেটের কাছেই গুণধর দাঁড়িয়েছিল। সে চিৎকার করে বললো, "লোডশেডিং।"

"ম্যানেজার সিং কোথায়?" জানতে চাইলেন বংশগোলাপ, কেউ বলতে পারলো না।

গুণধর দুটো মোমবাতি হাতের গোড়ায় রেখেছিল। তার একটা জ্বলন্ত অবস্থায় বংশগোলাপের হাতে দিল। তিনি বললেন, "আপনারা রাখুন, দরকার হবে।"

পকেট থেকে ঝটিতি একটা চ্যাপ্টা টর্চলাইট বার করে ফেললো পিকলু। সব অবস্থায় সব পরিস্থিতির জন্যে তৈরি হবার ট্রেনিং সে এন. সি. সি.-তে পেয়েছে।

বংশগোলাপবাবু বোকার মতন এই অন্ধকারেই বিশ্বাস লজের দোতলায় উঠতে চাইলেন। বারণ করলো পিকলু, পরিস্থিতিটা কেমন কেমন মনে হচ্ছে। গুলিগোলার বিনিময় না হয়।

ঝট করে সি ই এস সি-র কনট্রোল রুমে ফোন করলো পিকলু। ফোন নামিয়ে রেখে পিকলু বললো, "যা আশঙ্কা করছিলাম তাই। হাওড়ার কোথাও কোনো লোডশেডিং হয়নি—দেদার বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারেন হাওড়ার গ্রাহকরা। সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা আজ বেশ কমের দিকে।"

পিকলু এবার জিজ্ঞেস করলো, "ফিউজ তার আছে?"

"আছে", কিন্তু কোথায় আছে মনে করতে পারছেন না হরিময়বাবু। হঠাৎ হাউমাউ করে তিনি বললেন, "কী সর্বনাশ। আজ ঠাকুরের মহাসমাধি দিবস, আর আজকেই তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালানো হলো না। ঠাকুর তুমি আমাদের ক্ষমা করো।"

গুণধর এবার একগাল হেসে জানালো, "ঠাকুর নিজেই সব ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। সন্ধ্যাবেলায় দু'জন সন্ন্যাসী মোটরসাইকেলে চড়ে এখানে এলেন। সবার খোঁজখবর করলেন। নীচের সায়েব, উপরের সায়েব কেউ বাড়িতে নেই শুনে জিজ্ঞেস করলেন, তুলসীমঞ্চে প্রদীপ দেওয়ার কী হচ্ছে? ম্যানেজার সিং-ও তখন হাওয়া। একজন সাধুজি তখন দয়া করে নিজেই গেলেন তুলসীমঞ্চে, যত্ন করে পাঁচটা প্রদীপ জ্বালালেন। কিন্তু হাওয়ায় একে একে প্রদীপ নিভে গেলো। ঠিক সেই সময় হঠাৎ লোডশেডিং। সন্ন্যাসীরা আধঘণ্টা পরে এবাড়ি থেকে চলে গেলেন।"

"কীসে গেলেন?" জানাতে চাইছে পিকলু।

"একজন মোটরসাইকেলে। আর একজন ট্যাক্সিতে। হলদে-কালো একটা ট্যাক্সি গেটের কাছে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছিল। এঁরা খুব ভাল সাধু!" গুণধরকে একশ টাকা দিয়েছেন। গেটের পাহারায় আর একজন যে ছোকরা ছিল তাকেও একশ টাকা দিয়েছেন স্বামীজিরা।

এবার তীব্র গতিতে ফিউজ সারানোর দায়িত্ব নিলো পিকলু। হরিময়বাবু অতি অল্প সময়ে ফিউজতার খুঁজে পেয়েছেন। হিদারাম হালদার লেনের বিশ্বাস লজ আবার আলায় ঝলমল করে উঠলো।

পিকলু বললো, "একটা শাবল চাই। কুইক।"

চমচম অফিসে কলম আছে, শাবল নেই। কিন্তু বংশগোলাপের হুঙ্কারে ম্যানেজার সিং-এর লোকটি একটা শাবল নিয়ে এলো। টর্চ জ্বালিয়ে, শাবল হাতে তিনজনে তুলসীমঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন। পরিস্থিতি মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না, একটু আগেই কেউ যেন জায়গাটা তছনছ করে গিয়েছে, মনে হচ্ছে।

তুলসীমঞ্চের পাশে একটু খুঁড়তেই ছোট্ট একটা বাঁধানো গর্ভগৃহ চৌবাচ্চার মতন দেখতে পাওয়া গেলো।

হরিময়বাবু বলে উঠলেন, "পিকলু সাবধান।" তিনি শুনেছেন গুপ্তধন পাহারা দেবার জন্যে অনেক সময় বিষাক্ত সাপ রেখে দেওয়া হয়। পিকলু প্রথমে টর্চের আলো ফেললো, তারপর দেখলো ছোট একটি রুপোর কৌটো টর্চের আলোয় ঝকমক করছে।

হাত বাড়িয়ে বাক্সটা তুলে আনতেই হরিময়বাবু ইউরেকা, ইউরেকা বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

আর বংশগোলাপবাবু চোখ বুজে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূজার মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন—

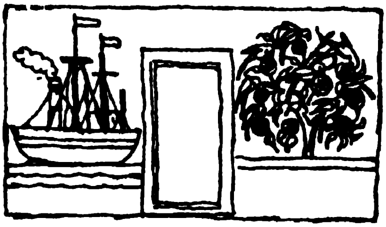
ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে

অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।

বংশগোলাপবাবু এবার আরও চড়া গলায় আবৃত্তি করলেন :

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব

শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গম্।



রুপোর ছোট্ট আধারটি অতি যত্নে ওপরে তুলে আনলো পিকলু। কৌটোর ওপর ইংরেজিতে লেখা রামকৃষ্ণ প্রোমোহংস—১৫ই আগস্ট, ১৮৮৬।

"দেখছেন, দেখছেন। আদি ব্যাপার। এমনকি মহাসমাধিদিবসটাও সেই পুরনো পুলিস রিপোর্ট অনুযায়ী লেখা।" বললেন হরিময়বাবু।

তারপর আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে হরিময় অস্ফুটভাবে বলতে লাগলেন, "কৌটো নয়—রেলিকুয়্যারি—বুঝতে পারছো তো পিকলু। কিন্তু প্লিজ তুমি আগে পায়ের জুতোটা খুলে ফেলো, এই শ্রীদন্ত শ্রীহস্তে ধারণ করবার আগে।"

"জুতো না খুলে কৌটো খুলবেন না প্লিজ," কাতর আবেদন জানালেন বংশগোলাপবাবুও। "হাজার হোক এটা আমাদের ভিটে। দু'বার সর্বনাশ ছোবল পড়েছে বংশের ওপর।"

জুতো খুলে রেখে রুপোর কৌটো খুললো পিকলু। কৌটোর ভিতরে আর একটা পিতলের কৌটো। সেটাও খুললো পিকলু। তার ভিতরে আর একটা তামার বাক্স কিমাম কৌটোর মতন সাইজ।

সেটাও খুললো পিকলু। তারপর সকলে একসঙ্গে হায় হায় করে উঠলো। দাঁত নেই! কিন্তু ভিতরে একটু দাগ রয়েছে। বোঝা যাচ্ছে সেখানে দাঁতের সাইজের কিছু একটা অনেকদিন ধরে সংরক্ষিত ছিল।

পিকলু দুঃখ করলো, "আমরা মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরি করেছি। ইতিমধ্যে ওই পাজিদুটো রহস্য কবিতার অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছিল..."

"বহুরূপানন্দ?" প্রশ্ন করলেন হতাশ বংশগোলাপ।

"না মশাই, ওর নাম বহুরূপানন্দ নয়—সুশীতল সান্যাল। তবে বহুবার বহুরূপ নিয়েছে লোকটা নানা কুকীর্তিতে। অনেক দামি পুরনো জিনিস লোকটা বাইরে চালান করে যাচ্ছে।

"ও লর্ড, আমরা একটুর জন্যে ঠাকুরের শ্রীদন্তের ঐতিহাসিক সুযোগ

হারালাম।" হরিময়বাবু না মূর্ছা যান!

"লোকটা আজ সকলকে বোকা বানিয়েছে—এমনকি বংশগোলাপবাবুকেও। ওঁরও অবশ্য লোভ ছিল শুরুতে, তাই জেনেশুনেই দুষ্টের ফাঁদে পা দিয়েছিলেন। খোঁজও করলেন না, লোকটা আদতেই রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী কি না। বরুণ মহারাজকে বেলুড়ে ফোন করলেই সব জানতে পারতেন। ওঁকে না পেলে হাতের গোড়ায় হুটকো হালদার ছিলেন। অজানা দুষ্ট লোকের হাতে এইভাবে পারিবারিক কাগজপত্তর তুলে দেবার কোনও প্রয়োজন ছিল না।"

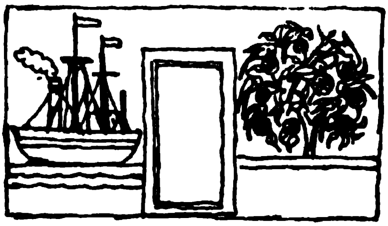
বংশগোলাপবাবুর চোখে জল। কান্না চাপতে চাপতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এ সবই কি ঠাকুরের ইচ্ছেয় হচ্ছে?"

"সে কথা কে বলতে পারে, বংশগোলাপবাবু?" সান্ত্বনা দিলেন বিষণ্ণ ও হতাশ হরিময়বাবু। এতো কষ্ট এতো অনুসন্ধান শেষ পর্যন্ত কাজে লাগলো না—স্রেফ ওই রেলিকুয়্যারিটা ছাড়া।"

বংশগোলাপ এখন কাঁদছেন। যার দাঁত এখানে একশবছর ধরে লুকানো ছিল তিনি ব্যাপারটা কীভাবে নেবেন?

মানুষটিকে দেখে মায়া হলো হরিময়বাবুর। তিনি বললেন, "দাঁত উদ্ধার হোক না হোক আপনিই লাভবান হলেন। যদি দাঁতটা পেয়ে যান তা হলে তো আপনি কোটিপতি। আর যদি দাঁত না পাওয়া যায় তাহলে বিশ্বাসবংশের দায়িত্ব শেষ হলো, দাঁত না থাকলে আপনাদের ওপর অভিশাপও নেই। আপনি হয়ে যাচ্ছেন ফ্রি সিটিজান অফ এ ফ্রি কানট্রি!"

বংশগোলাপ এবার হরিময়ের হাতদুটি জড়িয়ে ধরে বললেন, "আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আপনি শতায়ু হোন।"



পিকলু ইতিমধ্যে পকেট থেকে একটা ছোট্ট এরিকসন মোবাইল ফোন বার করে পুলিসদাদুর সঙ্গে কথা বলে নিয়েছে। দাদুও তাঁর সেলুলারে ওর সঙ্গে কথা বললেন,। মনে হচ্ছে, আজ সল্টলেকে খিচুড়ি-ইলিশ খাওয়া হয়নি।

খারাপ কিছু আশঙ্কা করে তিনিও সোজা চলে এসেছেন লর্ড সিন্‌হা রোডের অফিসে।

বংশগোলাপবাবু তখনও কেঁদেই চলেছেন—"লস্ট আটলান্টা, লস্ট আটলান্টা। ঠাকুরের দাঁত আমরা চোর-ডাকাতের হাতে তুলে দিলাম, স্রেফ নিজের বোকামিতে। ঠাকুর তুমি আমাকে এত বোকা করে পৃথিবীতে পাঠালে কেন? জয় জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, অবতারবরিষ্ঠা!"

হরিময়বাবু বললেন, "আমার অফিসে চলুন। একটু চা খান, শক্তি পাবেন।" ইতিমধ্যে প্রবল বৃষ্টি আসছে—শ্রাবণের শেষ কামড় তো!

চমচম অফিসে পিকলুর পকেটের সেলুলারটা অল্পক্ষণ পরে আবার বেজে উঠলো। "হ্যালো! পিকলু হিয়ার। বলেন কি, দাদু! না আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ছি উইথ বংশগোলাপবাবু এবং হরিময়দাদা।"

"ব্যাপার কী?" ওই বুলেট বাইকের পিলিয়নে চড়ে শ্রাবণ মাসের রাত্রে বর্ষার মধ্যে আবার বেরিয়ে পড়ার প্রস্তাবটা হরিময়বাবু খুব ভাল চোখে দেখছেন না। শারীরিক নিরাপত্তার কথাটাও তো ভাবা উচিত।

পিকলু বললো, "পুলিসদাদু দমদম এয়ারপোর্টে অ্যালার্ট হবার মেসেজ দিয়েছিলেন। ওরা একটু আগে ফরেন ফ্লাইটে একজন লোককে সন্দেহের বশে আটকেছে। লোকটার ঠোঁটে একটা মস্ত কাটা দাগ রয়েছে। আমার নিশ্চিত ধারণা—বহুরূপানন্দ অ্যালিয়াস সুশীতল সান্যাল ব্যাংকক অথবা সিঙ্গাপুর কোথাও পালাচ্ছে।"

হরিময়বাবু বুলেট বাইকের পিছনে চড়তে-চড়তে বললেন, "ঠোঁট কাটা লোক দুনিয়ায় অনেক আছেন পিকলু।"

বংশগোলাপ কিন্তু প্রাণখুলে পিকলুকে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। তিনিও মোটর সাইকেলের পিছনে বসে পড়েছেন। বিদ্যাসাগর সেতু দিয়ে বেশ দ্রুতবেগে যেতে যেতে তিনি বললেন, "ঠাকুরের ইচ্ছে হলে আমাদের ঠোঁটকাটা সান্যালই এবার পুলিসের খপ্পরে পড়েছে। চলুন একটু দ্রুতগতিতে। ঠাকুরের আশীর্বাদ হলে আজ রাত্তিরেই আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীদন্ত উদ্ধার করতে পারবো। তারপরেই ছুটতে হবে মঠের প্রেসিডেন্ট মহারাজার কাছে। শ্রীদন্তর নিত্যপূজা তো সহজ কাজ হবে না। জানতে হবে, শ্রীদন্তকে ভোগ দিতে হবে কি না, কোন মন্ত্র পড়তে হবে? এবং শেষপর্যন্ত কোথায় শ্রীদন্তমন্দির স্থাপিত

হবে? আমি তো ভূতেশানন্দ মহারাজের পা জড়িয়ে ধরে বলবো, মহারাজ মুক্তি দিন, দায়িত্ব নিন এবং বিশ্বাসদের ক্ষমা করুন। আমি মূর্খ হলেও জানি, সঙ্ঘই ঠাকুরের শরীর। শরীর থেকে যা বিচ্ছিন্ন হয়েছিল পূর্বপুরুষের দুর্বলতায় তা আবার শরীরেই ফিরে এলো।"

বিদ্যাসাগর ব্রিজের পূর্বতম প্রান্তে এসে হরিময়বাবু বললেন, "আমার সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান হলো। দাঁত আর নো দাঁত, তুমি ও ভবনাথ সেন যৌথভাবে চমচমের জন্যে ধারাবাহিকটা লিখবে আগামী সংখ্যা থেকে। নামটা ঠাকুরই এইমাত্র আমাকে ধরিয়ে দিলেন—প্রোমোহংস রহস্যামৃত, ঠিক যেমন ওঁর ডেথসার্টিফিকেটে লেখা আছে।"

পিকলু এবার হরিময়বাবুকে বললো, "এখন ড্রাইভ করছি। আমাকে হাসাবেন না, আমাকে মন দিয়ে বাইক চালাতে দিন।" এবার সে গাড়ির গতি দ্বিগুণ করে দিল। আর হরিময়বাবু ও বংশগোলাপবাবু একসঙ্গে কোরাস শুরু করে দিলেন, "নরদেব দেব জয় জয় নরদেব, শক্তি সমুদ্র সমুত্থতরঙ্গ দর্শিতপ্রেমবিহস্তিতরঙ্গম্।"

চিরকালের উপকথা

উৎসর্গ: শ্রীহারাধন চক্রবর্তী-কে, বড় হয়েও যাঁর মন ছোটদের মতন রয়েছে।

লেখকের নিবেদন :

আমার জানাশোনা কয়েকটি ছেলেমেয়েকে মুখে-মুখে গল্প শোনাবার তাগিদেই এই রচনার সূচনা।

গল্পময় ভারতের রঙ্গে পরিচয় না-থাকলে সেকাল একাল ও অনাগত কালের ভারতবর্ষকে জানবার প্রয়াস যে বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে তা আজকাল আমরা অনেকেই বুঝতে পারছি। এককালে যৌথ সংসারের দাদু-দিদিমারাই সকলের অলক্ষ্যে ভারত আবিষ্কারের এই শক্ত কাজটি খুব সহজে সেরে দিতেন—কিন্তু পরিবর্তিত সংসারব্যবস্থায় এখন ছেলেমেয়েরা প্রায়ই সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমার ছোট বইটি গল্পবলিয়ে এবং গল্পশুনিয়ে-দের সামান্য কাজে লাগলে বিশেষ আনন্দিত হবো।

বহুদিন ধরে বহু কষ্টস্বীকার করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে যে সব গবেষক সাধারণ মানুষের মুখ থেকে অসংখ্য উপকথা সংগ্রহ করেছেন তাঁদের সকলকে আমার সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানাই।

সাবধান!
ছোটদের বকাবকি এ-বাড়িতে সম্পূর্ণ নিষেধ।

টাটানগর থেকে অনেকদিন পর কলকাতায় মামাবাড়িতে বেড়াতে এসে বুলবুলের সবচেয়ে ভাল লেগেছে এই নোটিসটা।

দাদুর নির্দেশে ছোটমাসিমা নিজে ঝকঝকে কালিতে মুক্তোর মতো হাতের লেখায় এই বিজ্ঞপ্তিপত্র রান্নাঘরের দরজার কাছে দেওয়ালে এঁটে দিয়েছেন। জায়গাটও খুব ভাল হয়েছে, কারণ রান্নাঘরের সামনে কুটনো কোটার ওই জায়গাতেই মা এবং মাসিরা নানা কাজকম্মো নিয়ে সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন। ছোটদের ওপর একটুতেই তাঁরা তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠেন।

নোটিসটা পড়ে মা ও মাসিমারা প্রথমে ভেবেছিলেন রসিকতা। কেউ যেন স্রেফ ওঁদের সঙ্গে মজা করার জন্যেই বিয়েবাড়িতে এই বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিয়েছে। ছোটমাসিমা আর্ট কলেজে চলে গিয়েছেন, আজ তাঁর পরীক্ষা আছে। ছোটরা তখন বাধ্য হয়ে ছোটমামাকেই ধরে বসলো, মা এবং মাসিদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে।

ছোটমামা বাড়ির প্রত্যেককে সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিলেন, "ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। বাবা নিজেই এই অর্ডার দিয়েছেন। ছোটদের কোনোরকম বকাবকি করতে হলে অবশ্যই দোতলায় গিয়ে কর্তার অনুমতি নিতে হবে।"

তিলক, শিবাজী এবং বুলবুল ব্যাপারটায় খুব খুশি—সেই ভিলাই, রাউরকেলা আর টাটানগর থেকে তারা ছোটমামার বিয়ে অ্যাটেন্ড করবার জন্যে কলকাতায় এসেছে। এখানে এসেও যদি স্বাধীনতা না-থাকে, যদি সব সময় বড়দের বকুনিই খেতে হয়, তাহলে নিজেদের বাড়ির সঙ্গে মামার বাড়ির কী তফাত রইলো? সুতরাং হিপ-হিপ-হুররে। থ্রী চীয়ার্স ফর.....এখানে বুলবুল বলতে যাচ্ছিলো—ছোটমাসি, ছোটমামা অ্যান্ড দাদু। কিন্তু তিলক ও শিবাজী স্লোগান পাল্টে দিয়ে খুশ-মেজাজে গলা চড়ালো : "থ্রী চীয়ার্স ফর দেবলা সেন, থ্রী চীয়ার্স ফর সুবিমল সেন.:...অ্যান্ড থ্রী চীয়ার্স ফল সুনির্মল সেন।

বুলবুলের মা এবং মাসিরা কিন্তু খুশি হতে পারলেন না। তাঁর মুখ ব্যাজার করে বললেন, "মোটেই ভাল করছো না, সুবিমল। শাসন ছাড়া তোমার এইসব ডানপিটে ভাগ্নে-ভাগ্নিদের কন্ট্রোলে রাখা অসম্ভব। তোমাদের এই বিজ্ঞপ্তির সুযোগ নিয়ে এরা দেখো অরাজকতা বাধিয়ে বসবে।"

বড়মাসিমা তো আরও এক পা এগিয়ে গেলেন। "সুবিমলের বিয়েটা তিলকের পরীক্ষার সময়ে হলেই ভালো হতো। দুষ্টুটাকে বাড়িতে ফেলে রেখে আমি একা চলে আসতে পারতাম। হিসট্রির বালগঙ্গাধর তিলক কত শান্ত ভদ্র ছিলেন, আর এই তিলক—"

"দোষটা তাহলে ছোটমামারই," চটপট উত্তর দিলো তিলক।

"উঃ! শোনো একবার কথা! তুমি যে ওর নাম দিয়েছিলে তা ঠিক মনে রেখে দিয়েছে।"

বুলবুলের মেজোমাসিমা মেখলা রায় চোখ দুটো বড়-বড় করলেন এবং জানালেন. "আমি এই বলে রাখছি এইসব দস্যি ছেলেমেয়েদের অত্যাচারে দামী জিনিসপত্তর যদি ভাঙচুর হয়, আমার ব্লাডপ্রেসার যদি বাড়ে আর বিয়েবাড়ির কাজে বাধা পড়ে তাহলে আমাকে অন্তত কিছু বলতে এসো না।"

শিবাজী রায় এতক্ষণ গম্ভীরভাবে কথাগুলো শুনছিল। এবার সে মুখ খুললো, "বকাঝকা করবার যদি এতোই ইচ্ছে, তাহলে ওপরে চলে যাও না! দাড়িওলা বাবা তো মেজোমেয়ের কথা শুনবার জন্যেই ইজিচেয়ারে বসে আছেন!"

"অ্যাই কী হচ্ছে! কী সব পাজি ছেলে দেখো!" চোখ পাকালেন শিবাজীর মা। বাবার কাছে তাঁর নাতিদের নামে অভিযোগ করে যে বিশেষ ফল হবে না, তা বুঝেই বোধহয় মেখলা রায়ের গলা পরক্ষণেই একটু নরম হলো। বললেন, "তোমরা যদি খুব বেশি দস্যিপনা করো তাহলে আমরা অবশ্যই ওপরে যাবো।"

ছোটমামা কিন্তু হাটে হাঁড়ি ভাঙলেন। "বাবার কাছে যাবার সাহস তোমাদের হবে না, দিদি। আর গেলেও খুব কিছু একটা সুবিধে পাবে না। বাবা বলছিলেন, 'সমস্ত জীবন ভুল করে এসেছি—বকাবকি করে কোনো কাজ হয় না।"

তিলকের মা কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "নিজের ছেলেমেয়েরা তো মানুষ হয়ে গিয়েছে, তাই বাবা এখন ওসব কথা বলছেন। বকাবকি ছাড়া ছেলেমেয়ে কখনো মানুষ হয়!"

বুলবুল, তিলক ও শিবাজী অধীর আগ্রহে ছোটমামার দিকে তাকালো। ছোটমামা এবার কী বলেন তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

"ছোটমামা, প্লীজ, মাসির কথায় মত পাল্টিও না," মনে-মনে প্রার্থনা করে

বুলবুল।

প্রার্থনাতেই বোধহয় ফল হলো। ছোটমামা বললেন, "বড়দি, তোমার তা হলে তো সুইজারল্যান্ড যাবার কোনো চান্স রইলো না।"

"কেন? আমি কী দোষ করলাম? সুইসরা তো খুবই ভাল লোক। বিদেশী অতিথিকে দেশ দেখাতে আপত্তি করে না।" বললেন বড়মাসিমা।

"ওপরে বাবার কাছে গিয়েই শুনো।"

ছোটমামা সত্যিই আজ ভাগ্নে-ভাগ্নিদের জন্য জোর ফাইট দিতে লাগলেন।

এরপর একখানা বোমা ফাটালেন ছোটমামা। "বাবা বলছিলেন বাচ্চাদের মারধোর এবং বকাবকি সুইজারল্যান্ডে আইন পাস করে তুলে দেওয়া হয়েছে। ছোট ছেলেমেয়েদের কিছু বললেই সঙ্গে-সঙ্গে পুলিস এসে....."

আর বলতে হলো না। ভাগ্নি ও ভাগ্নেরা আনন্দে হাততালি দিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

ছোটমামার তিনি দিদি অগত্যা গোমড়া মুখে ভাইকে বললেন, "খুব অন্যায় করেছো তুমি.....এদের সামনে এইসব গোপন খবর ফাঁস করাটা মোটেই ভালো হচ্ছে না!"

এরপর সেন-বাড়িতে ছোটদের একটানা আনন্দমেলা শুরু হয়ে গেলো। যা প্রাণ চায় তাই করে চলেছে তারা, বড়রা কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না।

অমন যে গম্ভীর দাদু, যিনি কোনোরকম হৈ-চৈ হট্টগোল সহ্য করতে পারেন না, তিনিও বললেন, "কই, এত্ত বড় বাড়ির তুলনায় কোনো গোলমাল তো নেই! হৈ-হৈ না-হলে কি বিয়েবাড়ী জমে?"

বিয়েবাড়ির এই মজার জন্যেই তো বুলবুল, তিলক ও শিবাজী এতোদিন, যাকে বলে কিনা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। তিতিবিরক্ত হয়ে শেষে বুলবুলের মা প্রমীলা চৌধুরী বললেন, "ঠিকই হয়েছে, তেরোস্পর্শযোগ! হোক যা খুশি—"

"তেরোস্পর্শ কী জিনিস ছোটমামা? কাউকে তেরোবার টাচ করা?" জিজ্ঞেস করে ভিলাই ইংরিজী মিডিয়াম ইস্কুলের ছাত্র শিবাজী।

হেসে ফেললেন ছোটমামা। "যা বলেছিস!" তারপর শান্ত স্বরে বললেন, "নারে, আনলাকি থার্টিনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। মূল কথাটা হচ্ছে ত্র্যহস্পর্শ—বিশেষ একদিনে তিন তিথির মিলন—ত্রি+অহন্+স্পর্শ। যোগটা

নাকি তেমন ভালো নয়।"

রাউরকেলার তিলক এবার চোখ দুটো বড় বড় করলো। "ও বুঝেছি!"

"কী বুঝেছিস?" খ্যাঁক করে উঠলেন তিলকের মা।

"ঠিক বুঝেছি—বুলবুল, শিবাজী ও আমার এই এক জায়গায় দেখা হওয়াটা ভাল নয়—আমরা হলাম কিনা ত্র্যহস্পর্শ!"

এরপর ছোটমামা নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলেন। ছোটমামার ঘরের ভেতরটা যেন কেমন! গাদা গাদা বই আর খাতা। বিছানার ওপরেও বই। দু-তিনখানা টেপরেকর্ডারও সব সময় বিছানার ওপর পড়ে থাকে। আর আছে ডজন ডজন ফোটো।

এই ঘরে এসে নতুন ছোটমামীমা কোথায় শোবে রে বাবা! বুলবুল ভেবেই পায় না।

বুলবুল শুনেছে, ছোটমামা ক্যামেরা আর টেপরেকর্ডার হাতে কত জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। মা নিজের মুখে বলছেন, "তোর মামার অদ্ভুত চাকরি। গাঁয়ে গাঁয়ে গপ্পো সংগ্রহ করে বেড়ায়।"

গাঁয়ের লোকের কাছে বসে তাদের গপ্পো শুনে বাক্সবন্দী করে চলেছেন ছোটমামা, এর নাম নাকি গবেষণা—ফোকলোর রিসার্চ।

বুলবুলের মা নিজেও ব্যাপারটায় তেমন সন্তুষ্ট হন নি। বুলবুলের বাবাকে বলেছিলেন, "কী জানি বাবা! বছরের পর বছর গাঁয়ে-গাঁয়ে ঘুরে গপ্পো জোগাড় করা, এ আবার কী কাজ? এতে কার কী উপকার হবে? গেঁয়ো চাষীদের বস্তা-পচা গপ্পো কে শুনবে?"

বুলবুলের বাবা বলেছিলেন, "না গো, খুব দরকারী কাজ। বড় বড় দেশে মহা-পণ্ডিত সারা জীবন ধরে এই সব রূপকথা আর উপকথা সংগ্রহ করছেন—একটা দেশকে ঠিকমতো জানতে হলে, এই সব গপ্পো ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। গ্রামগঞ্জের গপ্পের মধ্যেই দেশের মানুষদের সুখ-দুঃখের ছায়া ধরা পড়ে। কী তারা চায় এবং কী চায় না তাও জানা যায়।"

"রাখো তুমি!" বকুনি লাগিয়েছিলেন বুলবুলের মা। "গাঁয়ে গাঁয়ে মাসের পর মাস এইভাবে ঘোরা কত কষ্টের বলো তো? আর যে-লোক আদাড়ে-বাদাড়ে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়ায় তাকে কে বিয়ে করবে?"

শেষ অবধি সে সমস্যা অবশ্য মিটেছে। ছোটমামার বিয়ের বাদ্যি বেজেছে। নতুন মামীমাও যে এই গপ্পো খোঁজার গবেষণায় আছেন তা শুনেছে বুলবুল।

নতুন মামীমার নামটাও ফাইন—চিত্রলেখা মজুমদার।

ছোটমামা ঘরের দরজা ভেজিয়ে টেপ চালিয়ে কী সব লিখতে শুরু করেছিলেন। সেই সময় 'তেরোস্পর্শ' সঙ্গে করে তিন দিদি হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লেন।

তিলকের মা বললেন, "ছোটদের এ-বাড়িতে কিছু বলা চলবে না ফতোয়া জারি করে বেশ তো ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছিস। এদিকে যে আমাদের অবস্থা সঙ্গিন!"

শিবাজীর মা জোর গলায় বললেন, "সত্যি অসহ্য হয়ে উঠেছে। একটু আগে দুধের কড়ায় টেনিস বল পড়েছে। এক লিটার দুধ নষ্ট হলো। এতো লোকের চা হবে কী করে?"

বুলবুলের মা অভিযোগ করলেন, "দুষ্টুদের পাল্লায় পড়ে বুলবুলের দুষ্টুমিও বেড়েছে। তিনটে নতুন কাপডিশ পায়ের ধাক্কায় ভেঙেছে। বাবাকে বলতে গেলাম। বাবা ওকে কিছুই বললেন না, উল্টো আমাকে শুনিয়ে দিলেন . শোন্ একবার এইভাবে দামি কাপডিশ ভাঙাব পরে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছিলেন—কাপডিশ তো এই ভাবেই যাবে-–ওরা কী কলেরা বসন্তয় মরবে?"

"কী! তোমরা দুষ্টুমি করেছো?" আদরের ভাগ্নি ও দুই ভাগ্নেকে জিজ্ঞেস করলেন ছোটমামা।

"একটু-একটু", তিনজনের মুখপাত্র হয়ে তিলক উত্তর দিলো।

"একটু একটু?" তীব্র প্রতিবাদ জানালেন শিবাজীর মা। "সমস্ত বাড়ি-ঘরদোর লণ্ডভণ্ড করে এখন বলছিস একটু একটু!"

বুলবুলের মা এবার ছোটমামাকে বললেন, "শোনো সুবিমল, আমি, মেজদি এবং বড়দি বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি যা-হয় একটা ব্যবস্থা করো।"

বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা অবশ্য রসিকতা। তিলকের মা বললেন, "আমরা যাচ্ছি তোমার বউয়ের বেনারসী কিনতে। সেই সঙ্গে বেশ কয়েকটা নেমন্তন্নও সারতে হবে। বিয়ের তিন দিন বাকি, অথচ এখনও অর্ধেক নেমন্তন্ন পড়ে আছে। আর দেরি হলে আত্মীয়-স্বজন কেউ নেমন্তন্ন নেবে না। আমরা কাঞ্জিলালের দোকান থেকে শাড়ি কিনেই চিঠি বিলোতে বেরুবো। টালার ছোটদাদু থেকে টালিগঞ্জের মেসোমশাই, বৌবাজারের কাকিমা থেকে ব্যাণ্ডেলের বউঠাকরুণ পর্যন্ত কেউ এখনও চিঠি পান নি। এখন যদি এই 'তেরোস্পর্শ' না-

সামলাও তাহলে তোমার বিয়ে—বুঝতেই তো পারছো......

"থাকুক না ওরা আমার কাছে," সহজ সুরেই বললেন ছোটমামা।

"ক্ষমতা দেখি একবার কেমন বিনা বকুনিতে এই দস্যুদের সামলে রাখতে পারো!" এই বলে বড়মাসিমা, মেজোমাসিমা এবং অন্য সকলে বিদায় নিলেন।

ছোটমামা, অর্থাৎ মিস্টার সুবিমল সেন এবার ভাগ্নে-ভাগ্নি টীমের দিকে চোখ ফেরালেন। অহিংস উপায়ে এদের সামলানো যে খুব সোজা কাজ নয় তা ভালোই বুঝতে পারছিলেন।

রাউরকেলার তিলক ইতিমধ্যেই ছোটমামার টেপরেকর্ডারটা হাতে তুলে নিয়ে ঝাঁকাতে শুরু করেছে। সে শুনেছে, প্রত্যেক টেপরেকর্ডারের মধ্যে একটা লিলিপুট মানুষকে ঢুকিয়ে রাখা হয়।

হাঁ-হাঁ করে উঠবার আগেই দেখা গেলো তিলক টেপরেকর্ডারের কয়েকটা ইসকুরুপ খুলে ফেলেছে।

বুঝিয়ে সুঝিয়ে টেপরেকর্ডার ফেরত নিতে-নিতে ছোটমামার নজর পড়ে গেলো শিবাজীর দিকে। মাস্টার শিবাজী রায় ততক্ষণে রঙিন ফেল্টপেন নিয়ে নতুন মামীমার ছবিটায় পুরুষ্টু গোঁফ এঁকে ফেলেছে।

"উঃ, ফাস্ট ক্লাস দেখাচ্ছে নতুন মাসীমাকে, উইথ গোঁফ।" উল্লসিত বুলবুল বাহবা দিয়ে উঠল।

"ওয়ান মিনিট মামু! আরও ভাল করে দিচ্ছি—মামীর কপালে দুটো শিঙ বেরিয়ে যাবে এখনই।" শিল্পী শিবাজী রায় উৎসাহে আটখানা। ভিলাইনগর কালীবাড়িতে 'বসে আঁকো চিত্র প্রতিযোগিতা'য় সে সদ্য প্রথম পুরস্কার পেয়েছে।

তিন মূর্তির দৌরাত্ম্য কী করে যে বন্ধ করা যাবে ভেবেই অস্থির ছোটমামা। বাবার নিষেধ না থাকলে এতক্ষণে প্রত্যেকেই প্রচণ্ড বকুনি খেতো।

ছোটমামা এবারে দিব্যি এক মতলব ভাঁজলেন। বুলবুলকে জিজ্ঞেস করলেন, "গপ্পো শুনবে?" সঙ্গে সঙ্গেই তিনজনের রূপ পাল্টে গেল। মুখচোখ দেখেই সুবিমল সেন বুঝলেন গপ্পো শুনবার জন্যে সবাই উন্মুখ।

"তোমরা সবাই চুপচাপ বসো তাহলে। কোনো জিনিসে হাত দেবে না।"

"ভাল ভাল গপ্পো বলবে কিন্তু, ছোটমামা।" জামশেদপুরের বুলবুল সবার আগেই স্পেশাল অনুরোধ জানালো।

"খুব মন দিয়ে শুনতে হবে কিন্তু।" সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামা শর্ত আরোপ করলেন।

"কেন?" তিলকের মনে বুঝি সন্দেহ উঁকি মারলো। গল্পের লোভ দেখিয়ে ছোটমামা বুঝি অন্য কোনো ফন্দি আঁটছেন।

ছোটমামা বললেন, "গল্পের শেষে প্রশ্ন করা হবে—তার উত্তর চাই। উত্তর অনুযায়ী পুরস্কার—ফার্স্ট, সেকেন্ড এবং থার্ড।"

শিবাজী সাবধান করে দিলো, "মামু, বানানো গপ্পো নয় কিন্তু—সত্যি গপ্পো ছাড়া আমরা শুনবো না।"

ত্র্যহস্পর্শ সামলাবার ব্যাপার, তরল গলায় ছোটমামা বললেন, "এসব গপ্পো তো আমার বানানো নয়—গল্পের জঙ্গল থেকে কয়েকটা দুর্দান্ত বুনো গপ্পোকে ধরে আনা হয়েছে, এখনও পোষ মানানো হয়নি।"

বুনো হাতির মতো বুনো গপ্পোর ব্যাপারটা বুলবুলের খুব ভাল লাগলো। সে বললো, "মামা, গপ্পোকেও পোষ মানাতে হয় বুঝি?"

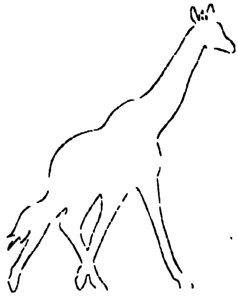
"অবশ্যই। বুনো গপ্পো শহুরে লেখকদের মনের চিড়িয়াখানায় বন্দী থেকে অনেক সময় নির্জীব হয়ে যায়—তোমরা চিড়িয়াখানায় দেখোনি? খাঁচায় আটকানো এক একটা পশুর কী প্যাথেটিক অবস্থা!"

শিবাজী আবার ওই সত্যি-মিথ্যের ব্যাপারে ছোটমামার ওপর চাপ দিলো। বানানো গল্প থেকে সত্যি গল্পের স্বাদ অনেক ভাল।

ছোটমামা বললেন, "বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে আমি ও চিত্রলেখা, অর্থাৎ তোমাদের নতুন মামীমা গপ্পো সংগ্রহ করি—গ্যারান্টি-দেওয়া সত্যি গপ্পো! এই সব গপ্পকথা তো কারুর কলম থেকে বেরিয়ে আসেনি। একশো দুশো চারশো পাঁচশো হাজার বছর ধরে লোকের মুখে-মুখে ঘুরছে—একদম খাঁটি দুধ না-হলে বলো এতো লম্বা পরমায়ু হয় কখনো?"

ছোটমামা লক্ষ্য করলেন তিন-পার্টিই কোনোরকম ঝামেলা না পাকিয়ে শান্ত হয়ে তাঁর কথা শুনছে। হৈ-হল্লা একেবারে বন্ধ।

একটু দম নিয়ে তিনি আবার বললেন, "এই কুড়িয়ে পাওয়া পুরনো গপ্পগুলোরই নাম উপকথা আর উপকথা কি একটা! হাজার হাজার লাখ লাখ উপকথা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে রয়েছে—সেকালের বাঘ সিংহ সাপ বাঁদর থেকে আরম্ভ করে রাজা-রাজড়ারা যা-সব কাণ্ড করে গিয়েছেন! ভাবছি তোমাদের কোন্ গপ্পোটা বলি।"



বুলবুল রিকোয়েস্ট করলো, "রাজার গপ্পো বলো, ছোটমামা। রাজাদের আমার খুব ভাল লাগে। আমি একটা মাত্র রাজা দেখেছি।"

"রাজা! কোত্থেকে দেখলি বুলবুল? ইন্ডিয়া থেকে রাজা তো উঠে গিয়েছেন," শিবাজী বেশ জোরের সঙ্গেই বললো।

"বললেই হলো উঠে গিয়েছে! আমি নিজের চোখে দেখেছি। রাজা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছিল, আমাকে জিজ্ঞেস করল, কী খুকি, কী নাম তোমার?"

'ইমপসিবল।" চিৎকার করে উঠলো তিলক। "রাজারা কখনও বিড়ি খান না। তাঁরা গায়ে সন্দেশ মেখে দুধে চান করেন। লুচি দিয়ে তাঁদের গা মোছানো হয়। সোনার বাটি থেকে তাঁরা রাবড়ি খান।"

নিমেষে গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠলো। কিন্তু বুলবুল জানিয়ে দিলো, জামশেদপুরে গতবারের পুজোয় সে যাত্রা দেখতে গিয়েছিল এবং সেখানেই রাজাকে বিড়ি খেতে দেখেছে।

বুলবুলের দুই ভাই খুব হাসলো। বললো, "তুই এখনও বোকা আছিস। যাত্রার রাজা আর আসল রাজা এক নয়।"

বুলবুল কিন্তু একমত হল না। "রাজা ইজ রাজা—সে যেখানকারই হোক বল মামা।"

"ঠিক আছে, এবারে এক মস্ত রাজার কাণ্ডকারখানা শোনো। ইনি যাত্রা থিয়েটারের রাজা নন, জেনুইন সিংহাসনে-বসা সোনার মুকুট-পরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজামশায়।"

ছোটমামা আরম্ভ করলেন, "এই রাজার গপ্পোটা জোগাড় করেছিলাম তামিলনাড়ুর এক গ্রাম থেকে। প্রথমে ভেবেছিলাম এও বুঝি মানুষের মনগড়া রাজা, বানানো গপ্পো। কিন্তু পরের পর দশটা গ্রামে গিয়ে একই রাজার কথা শুনলাম। তখন বুঝলাম, ইনি নিশ্চয় কোনোকালে রাজত্ব করেছিলেন, না-হলে

এতো লোক এখনও কী করে তাঁর কাণ্ডকারখানা মনে রেখে দিয়েছে?"

ছোটমামা বলে চললেন, "দক্ষিণদেশের এই রাজা মস্ত নরপতি। তাঁর হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজকোষে থান-ইট সাইজের থাক-থাক সোনা আর বস্তা-বস্তা হীরে মানিক-মুক্তো।"

তিলক বললো, "তাহলে বোঝা যাচ্ছে, ইয়া বড় রাজা! নিশ্চয় রাজার বিরাট গোঁফ আর কোমরে ঝকঝকে তলোয়ার ছিল।"

"ঠিকই ধরেছো তোমরা," ছোটমামা সায় কাটলেন। "আগেকার রাজাদেব এই এক সুবিধে। একটু বর্ণনা দিলে সবাই বুঝে নেয়, কীরকম রাজা।"

"তারপর রাজার কী হলো?" জিজ্ঞেস করলো শিবাজী?"

"ভীষণ কিছু একটা হবেই। অত ছটফট করিস না, শিবাজী।" ধমকে উঠলো তিলক।

মামা শুরু করলেন, "যা বলছিলাম, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, কিন্তু রাজার মগজে....."

একটু থেমে মামা প্রশ্ন করলেন, "বোকা হলে মগজে কী থাকে?"

"গোবর," তিনজন গল্প-শুনিয়ে একই সঙ্গে উত্তর দিলো।

ছোটমামা বললেন, " গাঁয়ে-গাঁয়ে খোঁজখবর নিয়ে আমি জানলাম, সত্যিই এক মাথামোটা এই রাজা। অথচ সমস্ত বোকার মতোই এই রাজার ধারণা তাঁর থেকে বুদ্ধিমান নরপতি ত্রিভুবনে নেই।

আরও এক মুশকিল—রাজার স্তাবকরা প্রতিদিন রাজসভায় বলেন, মহারাজ, আপনার মতো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সম্রাট পৃথিবীতে কখনও জন্মাননি। রাজাও খুশমেজাজে সেসব কথা শোনেন আর বিশ্বাস করেন তাঁর মতো বুদ্ধি ভগবান কাউকে দেননি।

কিন্তু বুদ্ধি না থাকলে এই পৃথিবীতে কাজ চালানো খুব শক্ত। দেশের রাজা বোকা হলে দেশ চলাই কঠিন হয়ে ওঠে।"

"রাজা কী রকম বোকা ছিল, মামা?" বুলবুল জিজ্ঞেস করলো।

ছোটমামা বললেন, "প্রত্যেকদিন রাজার বোকামির নমুনা পেয়ে পেয়ে প্রজাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাদের ভোগান্তির একশেষ। এখন এই রাজার বোকামি কী রকম ছিল তার একটা নমুনা শোনো।

ওই রাজ্যে একজন মাদ্রাজী ব্যবসাদার ছিলেন, তাঁর নাম অঙ্গুচেট্টি। এই অঙ্গুচেট্টির রোজগারপাতি বেশ ভালই ছিল, কিন্তু পয়সা হাতে পেলেই তিনি খরচ করে ফেলতেন। একবার প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতে অঙ্গুচেট্টির বাড়ি ভেঙে

পড়লো। কিছু টাকাকড়ি জোগাড় করে বেচারা অঙ্গুচেট্টি কোনোমতে বাড়ির দেওয়াল সারিয়ে নিলেন।"

"অঙ্গুচেট্টির বাড়ি কীরকম মামা?" জিজ্ঞেস করলো বুলবুল।

ছোটমামা বললে, "ভাল প্রশ্ন করেছো। বোকা রাজার হুকুম, তাঁর রাজ্যে তিনি ছাড়া আর কেউ পাকা বাড়িতে থাকতে পারবেন না। ফলে রাজপ্রাসাদ ছাড়া সমস্তই মাটির বাড়ি।"

এবার কাহিনী তরতর করে এগিয়ে চললো—অঙ্গুচেট্টি রাজমিস্ত্রি ডাকিয়ে ঝড়ে-ভাঙা বাড়ি তো সারিয়ে নিলেন। কিন্তু তারপরেই আসল বিপদ ঘটলো।

এক সিঁদেল চোর ঠিক করলো সে অঙ্গুচেট্টির বাড়িতে চুরি করবে। গভীর রাতে সিঁদকাঠি নিয়ে অঙ্গুচেট্টির মাটির বাড়ির দেওয়ালে সে মস্ত এক গর্ত করলো। মতলবটা ছিল, ওই গর্তের মধ্য দিয়ে বড়-বড় সিন্দুক চুপি-চুপি বাইরে পাচার করে দেবে। ঘুমের ঘোরে অঙ্গুচেট্টি কিছুই বুঝতে পারবেন না।

কিন্তু চোরের ভাগ্য খারাপ! লোভের মাথায় দেওয়ালে মস্ত গর্ত কাটতে গিয়ে সে নিজের বিপদ ডেকে আনলো—হুড়মুড় করে সমস্ত দেওয়ালটাই ভেঙে পড়লো। পরদিন সকালবেলা দেখা গেলো মাটিতে চাপা পড়ে নিজের খোঁড়া গর্তের মধ্যে চোর মরে পড়ে আছে।

পড়শীরা ভাবলো, যাক. যেমন পাজি চোর তেমন যোগ্য সাজা হয়েছে। অঙ্গুচেট্টিও ভাবলেন. তাঁব বরাতের জোর, একটুর জন্য যথাসর্বস্ব রক্ষা পেয়ে গেছে।

ছোটমামা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এ বিষয়ে কী ভাবছো বলো।"

তিলক বললো. "টিট ফব ট্যাট! চুরি করতে গিয়ে চোর নিজেই শাস্তি পেয়েছে। ভালই হয়েছে।"

শিবাজীর মতামত, "কত পাজি চোর তা এখনও বোঝা যাচ্ছে না—রাত্রে যারা চুরি করতে বেরোয়, তাদের সঙ্গে ছোরা নয়তো বোমা থাকে। মিস্টার অঙ্গুচেট্টির ভাগ্য ভাল যে তখন তিনি ঘুমিয়েছিলেন। চোরকে বাধা দিতে গেলে নির্ঘাৎ নিজেই জখম হতেন।"

ছোটমামা বললেন, "অঙ্গুচেট্টির ভাগ্য যে ভাল নয় তা পরের দিনই বোঝা গেলো। ওই যে চোর, তার এক মাসতুতো ভাই ছিল, সেও চোর। তোমরা তো জানোই, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! মাসতুতো চোর ভাবলো ভাইয়ের এমন বেঘোরে মৃত্যু চুপচাপ মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। এর একটা প্রতিবিধান চাই।

মাসতুতো চোর সেদিন চুরি করতে না বেরিয়ে নিজের ব্রেন খাটাতে বসলো।

চোর ভাবলো, দেশে যখন বোকা রাজা রয়েছেন তখন একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবার চান্স রয়েছে।

মাসতুতো চোর আর সময় নষ্ট না করে ছুটলো বোকা রাজার কাছে।

নতজানু হয়ে রাজাকে প্রণিপাত করে বললো, "মহারাজ, আমার মাসতুতো ভায়ের মাথার ওপর ওই অঙ্গুচেট্টির দেওয়াল ভেঙে পড়ে সর্বনাশ হয়েছে। আমার মাসতুতো দাদা অকালে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন।" এই বলে সে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো।

"মহারাজ, আপনি যে-দেশের রাজা, সে দেশে এতো বড় অন্যায় তো হতে পারে না। আপনি ওই অঙ্গুচেট্টিকে ফাঁসিতে ঝোলান।"

বোকা রাজা খুব রেগে উঠলেন। বললেন, "আমার রাজ্যে সবাই, এমন কি চোররাও নিরাপদে থাকবে। এই অপঘাত মৃত্যু আমি সহ্য করবো না। এর বিচার হবেই।"

বেচারা অঙ্গুচেট্টি আগের রাত্রে চুরির হাত থেকে বেঁচে গিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছিলেন, ঠিক সেই সময় রাজার সেপাই এসে তাঁকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চললো।

সেপাই বললো, "বড়ো বাড় বেড়েছো তুমি, অঙ্গুচেট্টি। মহারাজের রাজত্বে লোকের বেঘোরে মৃত্যু! চলো এখনই তুমি রাজার কাছে!"

অঙ্গুচেট্টি কাঁপতে-কাঁপতে রাজসভায় হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে তো তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। দেখলেন, রাজার সিংহাসনের কয়েক গজ দূরেই রয়েছে ফাঁসিকাঠ। মহারাজ রাজকার্যে কোনোরকম দেরি পছন্দ করেন না। বিচারে ফাঁসির হুকুম হলে সঙ্গে-সঙ্গে তা কার্যকরী করার জন্যে সিংহাসনের সামনেই ফাঁসিকাঠ খাড়া করে রেখেছেন।

বিপন্ন অঙ্গুচেট্টি মহারাজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মহারাজ রেগে আগুন হয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখ দুটো তামাকের কল্কেতে টিকের আগুনের মতো জ্বলছে।

মহারাজ অভ্যেসমতো একবার গোঁফে তা দিলেন। তারপর আড়চোখে ফাঁসিকাঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার দয়ার সুযোগ নিয়ে রাজ্যে অব্যবস্থা, অন্যায় এবং অশান্তি বড্ড বেড়েছে। এবার আমি কঠোর হাতে দেশ শাসন করবো। যার যা শাস্তি তা নগদ-নগদ দিয়ে দেবো। আমি দেখছি ছোটখাট শাস্তিতে কোনো ফল হয় না, প্রজারা তাতে কোনো শিক্ষাই পায় না। তাই মাথা খাটিয়ে ঠিক করলাম, যত ফাঁসিতে ঝোলাবো তত দেশের উন্নতি হবে।"

অঙ্গুচেট্টি বোকা রাজার হাবভাব দেখে ততক্ষণে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছেন।

তিনি বুঝতে পারছেন, তুচ্ছ কারণেও মহারাজ তাঁকে ফাঁসিকাঠে না-চড়িয়ে ছাড়বেন না।

মহারাজ এবার অঙ্গুচেট্টির দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমার বিরুদ্ধে খুবই সিরিয়াস অভিযোগ। ফাঁসি ছাড়া এক্ষেত্রে বোধহয় অন্য কোনো পথ নেই।"

"মহারাজ, আমি নির্বিরোধী ব্যবসাদার। কারও সাতে-পাঁচে থাকি না। আমি তো কোনো দোষ করিনি।"

"হুম!" এবার হুঙ্কার ছাড়লেন মহারাজা। "দোষ করেছো কি না-করেছো তা ঠিক করবো আমি। কেন তুমি বাড়ির দেওয়াল ভিজে রেখেছিলে? এই ভিজে দেওয়াল চাপা পড়েই তো সিঁদেল চোর বেঘোরে জান খোয়ালো? তুমি কি ভেবেছো আমার রাজত্বে এই অনাচার মুখ বুজে সহ্য করা হবে?"

মহারাজের হুঙ্কার শুনে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন অঙ্গুচেট্টি। তিনি বুঝলেন, মহারাজের সঙ্গে তর্ক করতে গেলে খামোখা প্রাণ যাবে। তার থেকে অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে কোনো ফিকির আঁটাই ভাল।

অঙ্গুচেট্টি এবার সাষ্টাঙ্গে মহারাজকে প্রণাম করলেন।

ছোটমামা এক মিনিটের জন্যে থামলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এই সাষ্টাঙ্গে ব্যাপারটা তোমরা জানো?"

বুলবুল, তিলক, শিবাজী তিনজনেই মাথা চুলকোতে লাগলো। শিবাজী বলল, "খুব সম্ভব মাটিতে শুয়ে পড়ে প্রণাম করা—একেবারে টপ রেসপেক্ট দেখানো আর কী!"

ছোটমামা বললেন, "কাছাকাছি এসেছো, কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। সাষ্টাঙ্গে মানে, জানু, পদ, পাণি, বক্ষ, বুদ্ধি, শির, বাক্য এবং দৃষ্টি—শরীরের এই আটটি অঙ্গ দিয়ে একসঙ্গে প্রণাম।"

"উঃ! দারুণ ডিফিকাল্ট। টপ ক্রিকেট খেলোয়াড় ছাড়া কেউ সাষ্টাঙ্গ ব্যবহার করতে পারবে না।" বলে বসলো তিলক।

ছোটমামা আবার অঙ্গুচেট্টির ঘটনায় ফিরে এলেন।

"সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে অঙ্গুচেট্টি রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনারা হুকুমে ফাঁসিতে যাওয়া, সেও তো আমার মতো অধমের সাতজন্মের সৌভাগ্য! কিন্তু মহারাজ, বিশ্বাস করুন, ভিজে দেওয়ালের ব্যাপারটা আমি কিছুই জানি না। দোষ যদি কিছু হয়ে থাকে তা ওই রাজমিস্ত্রির। খারাপ দেওয়াল বানিয়ে সে আমার কাছ থেকে কড়ায়-গণ্ডায় মজুরি বুঝে নিয়ে গিয়েছে।'

"যাবে কোথায়? আমার রাজত্বে অন্যায় করে পালিয়ে যাওয়া অত সহজ নয়!" হুঙ্কার ছাড়লেন বোকা রাজা। "ধরে নিয়ে এসো ওই রাজমিস্ত্রিকে।" যদি আসতে না চায়, তাহলে মিস্ত্রির মুণ্ডুটা নিয়ে আসবার হুকুম দিলেন মহারাজা।

রাজমিস্ত্রি অন্য এক বাড়িতে সেদিন কাজ করছিল। রাজার সেপাই আচমকা তাকে কোমরে দড়ি পরিয়ে সরাসরি রাজার সামনে এনে হাজির করলো।

মহারাজ হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাবো। ভিজে দেওয়াল তৈরি করে নরহত্যার ফল তুমি হাতে হাতে পাবে। ঐ দেখো ওখানে ফাঁসিকাঠ রেডি হয়েছে।"

রাজমিস্ত্রি বেচারার সর্বাঙ্গ ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে। বেচারা বুঝেছে, বোকা রাজার মাথায় যখন একটা মতলব ঢুকেছে তখন সহজে মুক্তি নেই। নির্ঘাৎ আজ ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তাকে।

রাজমিস্ত্রি এবার করজোড়ে বললো, "মহারাজ, পৃথিবীতে আপনার মতো বিজ্ঞ নরপতি আর একটিও নেই। আপনার হুকুমে ফাঁসিতে ঝোলাও আমার মতো সামান্য রাজমিস্ত্রির পক্ষে পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু....."

এইসব প্রশস্তি শুনে বোকা রাজা খুব খুশি হলেন মনে মনে। তবু হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, "আবার কিন্তু কেন?"

বিনয়ে বিগলিত রাজমিস্ত্রি বললো, "মহারাজ বিশ্বাস করুন, আমার কোনো দোষ নেই; সমস্ত দোষ ওই কুমোরের। সে-ব্যাটা আমাকে এমন একটা মাটির কলসী বিক্রি করেছিল যার মুখটা বিরাট। নর্মাল সাইজের দেড়া মুখ, মহারাজ।" এই বলে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগলো রাজমিস্ত্রি।

কান্না দেখে রাজমিস্ত্রিকে মুক্তির হুকুম দিয়ে দিলেন মহারাজ। বললেন, " কাঁদো মাত্। ওই কুমোরের বজ্জাতি আমি এখনই ভাঙছি। আমার রাজত্বে কোনো অন্যায় হতে দেবো না।"

বোকা রাজার হুকুম মতো কুমোরকে বাজার থেকে পাকড়াও করে আনতে পেয়াদার এক পলকও দেরি হল না। অপরাধের গুরুত্ব আন্দাজ করে, পেয়াদা ইতিমধ্যে কুমোরের হাত দুটো পিছন দিকে বেঁধেছে, চোখে পরিয়ে দিয়েছে ঠুলি, যাতে দোষী সাব্যস্ত হলে ফাঁসিতে লটকাতে বেশিক্ষণ সময় না লাগে।

মহারাজ এবার কুমোরকেও নিজের কথা বলবার একটা চান্স দিলেন। কুমোর বুদ্ধিমান। প্রথমেই সমস্ত অপরাধ মেনে নিলো। তারপর বললো, "মহারাজ, কিন্তু আমার দোষ কী? আমি যখন চাকে ওই কলসী তৈরী করছি সেই সময় পায়ে ঘুঙুর পরে একটি মেয়ে পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। সেই দিকে তাকাতে

গিয়েই এই সর্বনাশ হলো, কলসীর মুখ একটু বড় হয়ে গেলো। মহারাজ, দোষ ওহ ঘুঙুর পরা মেয়েটির।"

বোকা রাজা মাথা দুলিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। আমি তো কুমোরের কোনো অপরাধ দেখতে পাচ্ছি না। ফাঁসি দিতে হলে ওই ঘুঙুর-পরা মেয়েটিরই ফাঁসিতে যাওয়া উচিত।"

রাজার পেয়াদা আবার ছুটলো শহরে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেয়েটিকে পাকড়াও করে ফিরে এলো।

রাজা গম্ভীরভাবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিয়ে দিলেন, "কুমোর যখন কলসী তৈরি করছিল তখন ঘুঙুর পরে ওই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে তুমি ঘোরতর অপরাধ করেছো। তোমার ফাঁসির হুকুম দেবার আগে জানতে চাই তোমার কোনো বক্তব্য আছে কিনা?"

মেয়েটি বললো, "মহারাজ, আমার কী দোষ? গলার হার গড়াবার জন্যে আমি স্যাকরাকে কিছু সোনা দিয়েছিলাম। গয়না দেবার দিনে স্যাকরা কথা রাখলো না, তাই তাগাদা দেবার জন্যে আবার স্যাকরার দোকানে যেতে হয়েছিল আমাকে মহারাজ, আপনি মহানুভব জ্ঞানী ও বিদ্বান, আপনিই বলুন দোষ আমার না ওই মিথ্যেবাদী স্যাকরার?"

চোখ বন্ধ করে মহারাজ খানিকক্ষণ চিন্তা করলেন। জ্ঞান এবং বিদ্যার প্রশংসা শুনে তিনি বেজায় খুশি। চোখ খুলে বললেন, "মেয়েটিকে সসম্মানে মুক্তি দাও, বন্দী করে আনো ওই দুষ্টু স্যাকরাকে।"

ধূর্ত স্যাকরা রাজসভায় এসে বুঝলো তার সামনে সমূহ বিপদ। রাজা বললেন, "তোমার কপালেই ফাঁসি রয়েছে। কেন তুমি মেয়েটির গয়না সময় মতো দাওনি? কেন তাকে ঘুরিয়েছ?"

রাজার হুঙ্কারে স্যাকরা চোখে অন্ধকার দেখলো। কিন্তু যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে নিজেকে সামলে নিলো। স্যাকরা বুঝলো কথাবার্তা সামান্য এদিক-ওদিক হলেই এই বোকা রাজার ফাঁসিকাঠ থেকে তার রেহাই নেই।

স্যাকরা এবার তাকিয়ে দেখলো রাজসভায় একজন নাদুস-নুদুস শ্রেষ্ঠী বসে আছেন। শ্রেষ্ঠ ধনাদি যাঁর আয়ত্বে সেই বণিককে সে যুগে শ্রেষ্ঠী বল হতো। সুযোগ বুঝে স্যাকরা বলে বসলো, "মহারাজ দোষ ওই শ্রেষ্ঠীর। ওঁর কাছে আমি সোনা চেয়েছি, কিন্তু উনি দেননি তাই আমাকে খদ্দের ফেরাতে হয়েছে।"

বোকা রাজা তাতেও সন্তুষ্ট হতে পারছিলেন না। স্যাকরা এবার বললো, "তাছাড়া, মহারাজ, আমার এই রোগা চিমড়ে চেহারা আপনার ওই বিরাট

ফাঁসি-কাঠের পক্ষে বেমানান, আমি ঝুললে ফাঁসিকাঠেরই অপমান। অথচ শ্রেষ্ঠীর স্বাস্থ্য কী নধর দেখুন।"

রাজা সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "সত্যি, শ্রেষ্ঠীকেই ওই ফাঁসি-কাঠে মানাবে।"

এবার ছোটমামা একটু থামলেন। বুলবুল, তিলক, শিবাজী তিনজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলো, "তারপর?"

বুলবুল অভিযোগ করলো, "উঃ মামা! গল্পের এই ডেনজারাস সময়ে কেউ থামে?"

ছোটমামা হেসে বললেন, "থামছি না। কিন্তু ওই মোটা শ্রেষ্ঠীর ফাঁসির ব্যবস্থা করতে একটু সময় লাগবে তো?"

তারপর একটু থেমে বললেন, "এই সব কাণ্ড যখন চলছে তখন রাজসভার কয়েকজন লোক বোকা রাজার ওপর খুব বিরক্ত হয়ে উঠেছেন। তাঁবা ফিসফিস করে আলোচনা করছেন, "এমন বোকা রাজার অধীনে দেশ রাখা তো বিপজ্জনক— কোনদিন কোথা থেকে কী সর্বনাশ হবে ঠিক নেই।"

এরপর নিজেদের মধ্যে তাঁরা গোপনে আরও কী সব পরামর্শ করলেন।

ফাঁসিকাঠের সামনে তখন বেশ ভিড়। শ্রেষ্ঠীকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে দু'জন লোক হঠাৎ হৈ-চৈ করে উঠলো। দেখা গেলো, দু'জনের মধ্যে প্রচণ্ড বচসা চলছে।

রাজা দুজনকেই শান্ত হবার হুকুম দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, স্বয়ং রাজার সামনে কেন এমন ঝগড়াঝাটি চলছে?

একজন লোক বললো, "ব্যাপারটা খুবই গোপনীয়। কিন্তু মহারাজ, আপনি নিজে যখন জিজ্ঞেস করেছেন তখন কিছুই চেপে রাখবো না। কারণ আপনার মতো বুদ্ধিমান রাজার কাছে কোনো কিছুই চাপা থাকবে না।

মহারাজ খুব খুশি হয়ে প্রশ্ন করলেন, "ব্যাপারটা কী?"

লোকটা বললো, "মহারাজ, পাঁজিতে আছে, আজকের দিনে এই সময়ে এই ফাঁসিকাঠে যে ঝুলবে সে সোজা স্বর্গে যাবে আর পরের জন্মে সে-ই রাজা হবে। মহারাজ, মিথ্যে বলবো না, রাজা হবার খুব ইচ্ছে আমার। বন্ধুকে ব্যাপারটা যখন বললাম, তখন সে আমাকে আটকে দিচ্ছে, কারণ বন্ধুরও রাজা হবার ইচ্ছে ষোল আনা। সেই থেকে এই হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেলো, কে রাজা হবার সুযোগ নেবে তা ঠিক করা যাচ্ছে না।"

রাজা এবার তড়াং করে সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হুঙ্কার ছাড়লেন, "এতো বড় আস্পর্ধা! কোন্ নরাধম এদেশের রাজা হতে চায়? আমি ছাড়া কেউ

রাজা হতে পারবে না, সুতরাং আমিই ফাঁসিতে চড়বো—আর কাউকে চান্স দেবো না।" এই বলে বোকা রাজা নিজেই গিয়ে ফাঁসিকাঠে ঝুলে পড়লেন।"

"বুঝলে তোমরা?" গল্প শেষ করে ছোটমামা থামলেন।

শিবাজী জিজ্ঞেস করলো, "তারপর?"

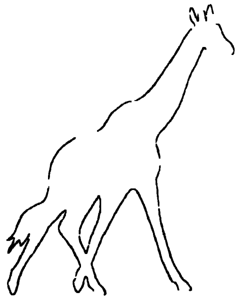
ছোটমামা বললেন, "তারপর আর কী? একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমান লোককে দেশের প্রজারা রাজা করে সুখে দিন কাটাতে লাগলো।"

তিলক বললো, "ঠিক হয়েছে। যেমন বোকা রাজা তেমন শাস্তি পেয়েছে।"

বুলবুল কিন্তু একমত হতে পারলো না। বোকা রাজার বেঘোরে মৃত্যু হওয়ায় তার খুব দুঃখ হয়েছে। সে বললো, "আহা রে! আমি ওখানে থাকলে বেচারী রাজামশায়কে বলে দিতাম, খুব সাবধান মহারাজ, লোকগুলো আপনাকে ঠকাবার চেষ্টা করছে।"

শিবাজী ঠোঁট বেঁকিয়ে বিজ্ঞের মতো বললো, "বুলবুলের সঙ্গে কোনো গপ্পো শোনা যায় না। সব লোকের জন্যে ওর দুঃখু। সবার জন্যে চোখের জল।"

"আহা রে! এমনিই তো এতো দুঃখু রয়েছে, গল্পেও আবার কেন দুঃখ? বোকা রাজা বেঁচে থাকলে কী দোষটা হতো?" বুলবুল কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো।



ছোটমামা আড়চোখে ঘড়িটা দেখে নিলেন। এই তিন মূর্তির মায়েদের ফিরতে এখনও অনেক দেরি। এতোক্ষণে তাঁরা কলেজ স্ট্রীটের কাপড়ের দোকানে পৌঁছেছেন কি না সন্দেহ।

"আরও একটা গপ্পো শোনাও ছোটমামা, না হলে তিলক ওরা ডাইনিং রুমেই টেনিস বল খেলা শুরু করবে।" বলেই বুলবুল পিটপিট করে তাকাতে লাগল।

"না না খেলব না—ছোটমামা। প্লীজ। আর একটা স্টোরি।" যৌথ রিকোয়েস্ট করলো তিলক ও শিবাজী।

"গপ্পো নয়, উপকথা," বললেন ছোটমামা। "মোটেই বানানো নয়—দেশের গ্রামগঞ্জ থেকে জোগাড় করে আনা ঘটনা।"

বুলবুল বললো, "এবার কিন্তু দুঃখের গপ্পো নয়।"

"নো ফাঁসি বিজনেস, বুলবুল বলতে চাইছে," টিপ্পনি কাটলো তিলক।

"বেশ! মারামারি কাটাকাটির কোনো ব্যাপারই এবার থাকবে না।" প্রতিশ্রুতি দিলেন ছোটমামা। "তবে নতুন গল্প শুরু করবার আগে তোমাদের একটা কোশ্চেন করি। বোকা রাজার বেঘোরে মৃত্যু হয়েছিল কেন?"

"বোকা বলে," শিবাজী চটপট উত্তর দিলো।

ছোটমামা প্রশ্ন করলেন, "পৃথিবীর সব রাজাই তো প্রচণ্ড বুদ্ধিমান ছিলেন না—তাঁরা কী করে রাজত্ব করেছেন?"

শিবাজী এবং বুলবুল চুপ করে রইলো, কিন্তু তিলক বললো, "মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে।"

"ভেরি গুড," বললেন ছোটমামা। "বোকা রাজার বুদ্ধিমান মন্ত্রী থাকলে এতোটা বিপদ হতো না।"

ছোটমামা শুরু করলেন, "এবার যে উপকথা শুনবে সেটা জোগাড় করেছিলাম মহারাষ্ট্র থেকে। মারাঠাদের গ্রামে গ্রামে কত রূপকথা আর উপকথা যে ছড়িয়ে আছে তোমাদের কী বলবো। সমস্ত জীবন ধরে কাজ করলেও বোধহয় এইসব সংগ্রহ শেষ হবে না।

শোন, বিজাপুরে এক রাজা ছিলেন। তাঁর নাম বীরসেনা। বিচক্ষণ দয়ালু নরপতি হিসেবে তাঁর সুনাম তখন সমস্ত পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

রাজকার্যে তাঁকে পরামর্শ দেবার জন্যে বীরসেনা চারজন বিচক্ষণ মন্ত্রী রেখেছিলেন।

বীরসেনার ভাগ্য খুব ভাল, এই চার মন্ত্রী ছিলেন যেমন সৎ, তেমন কাজের। প্রয়োজন হলে রাজাকে অপ্রিয় উপদেশ দিতেও তাঁরা ভয় পেতেন না।

একবার রাজা বীরসেনার মাথায় খেয়াল চাপলো, শহরের মধ্যে তিনি নিজের জন্যে বিশাল এক প্রাসাদ বানাবেন। এমন প্রাসাদ, ভূ-ভারতে যার কোনো জুড়ি থাকবে না। যথারীতি মন্ত্রীদের পরামর্শ চাইলেন তিনি।

মন্ত্রীরা সব শুনে বললেন, "মহারাজ, প্রস্তাব অতি উত্তম। এই রাজপ্রাসাদ তৈরির টাকা আসবে কোথা থেকে?"

মহারাজ উত্তর দিলেন, "রাজকোষে যে এতো টাকা নেই তা আমি জানি। সুতরাং সমস্ত প্রজার ওপর নতুন কর বসিয়ে এই প্রাসাদের খরচ তুলতে হবে।"

মন্ত্রীরা সবিনয়ে নিবেদন করলেন, ‘‘মহারাজ, প্রজাদের আর্থিক অবস্থা এ বছর তেমন ভালো নয়। তাঁদের অনেক অভাব রয়েছে, ঠিক এই সময় আর একটা বিরাট প্রাসাদ তৈরির আর্থিক বোঝা প্রজাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা সুবিবেচকের কাজ হবে না। আপনি প্রজাদের শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা হারাবেন, মহারাজ।’’

এই কথা শুনে মহারাজ খাপ্পা হয়ে উঠলেন। তাঁরই নুন খাওয়া মন্ত্রীরা যে নতুন রাজপ্রাসাদ তৈরিতে বাধা দিতে পারে তা তিনি ভাবতেই পারছেন না।

বিরক্ত রাজা তৎক্ষণাৎ চার মন্ত্রীকে বরখাস্ত করলেন এবং হুকুম করলেন, ‘‘তোমরা এখনই দেশ থেকে নির্বাসিত হও!’’

রাজার আদেশ মান্য করে চার বরখাস্ত মন্ত্রী মনের দুঃখে রাজধানী ছেড়ে সাধারণ তীর্থযাত্রীর বেশে পথে বেরিয়ে পড়লেন।

‘‘এই তো দুঃখ এসে গেলো,’’ ফোঁস করে উঠল বুলবুল। ‘‘তুমি যে বলেছিলে গল্পে এবার কোনো দুঃখ থাকবে না,’’ ছোটমামাকে সে মনে করিয়ে দিলো।

‘‘চিন্তা করিস না, বুলবুল। প্রথমে দুঃখ থাকলে অনেক সময় শেষে আনন্দ থাকে।’’ আশ্বাস দিলো তিলক।

শিবাজী বললো, ‘‘ওয়ান কোশ্চেন। ছাঁটাই মন্ত্রীরা ক'মাসের করে মাইনে পেলেন?’’

ছোটমামা হেসে ফেললেন। ‘‘তখন ওইসব ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ছিল না—রাজার মর্জির ওপরেই মন্ত্রীদের গদি আর গর্দান দুই-ই নির্ভর করতো। তাই মনের দুঃখে মুখ বুজে রাজসভা থেকে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া ওই চার বিচক্ষণ বুদ্ধিমান মন্ত্রীর আর পথই ছিল না।’’

রাজধানী থেকে তো বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোথায় যাবেন কিছুই জানা নেই চার মন্ত্রীর।

অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা বিরাট এক বটগাছের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মাথার ওপর তখন প্রচণ্ড রোদ্দুর; মন্ত্রীদের সমস্ত শরীর ঘেমে উঠেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের জন্যে ওঁরা গাছের তলায় আশ্রয় নিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরেই তাঁদের ক্লান্তি দূর হলো। এবার তাঁরা চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। মন্ত্রীরা বুঝলেন, গত রাত্রে এখানে বৃষ্টি হয়েছিল—মাটি তখনও কাদা কাদা হয়ে রয়েছে।

চার মন্ত্রী আবার লক্ষ্য করলেন, নরম মাটিতে উটের পায়ের দাগ রয়েছে।

তাঁরা ভাবলেন, রাজকার্যের ঝামেলা যখন নেই, তখন এই উটের পায়ের ছাপ নিয়ে গবেষণা করা যাক। এতে কিছুটা সময়ও কাটবে।

পায়ের ছাপগুলো ওঁরা যখন মন দিয়ে দেখছেন, তখনই এক গোলমাল শুরু হলো।

মাথায় পাগড়ি বাঁধা এক উটওয়ালা হন্তদন্ত হয়ে সেখানে ছুটে এলো। উটওয়ালা হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, "মশায়রা আমার উট হারিয়ে গিয়েছে। আপনারা কি কোনো উটকে এই পথ দিয়ে যেতে দেখেছেন?"

উটওয়ালার অবস্থা দেখে মন্ত্রীদের মায়া হলো। তাছাড়া এঁদের নীতিই হলো কোনো মানুষ বিপদে পড়লে তাকে যথাসম্ভব সাহায্য করা।

প্রথম মন্ত্রী উঠওয়ালার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন. "ব্যস্ত হবেন না। নিশ্চয় আপনি উট খুঁজে পাবেন। আচ্ছা, আপনার উটের পিছনের পা কি খোঁড়া?"

উটওয়ালার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এলো। সে বললো, "ঠিক বলেছেন। আমার খোঁড়া উটটা তাহলে এদিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?"

উটওয়ালার দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয় মন্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, "শুধু খোঁড়া নয়, আপনার উটের একটা চোখ কানা।"

উটওয়ালা এবার যেন হাতে চাঁদ পেলো। "ঠিক বলেছেন হুজুর, আমার উটের একটা চোখ নেই। ভাগ্যিস আপনারা দেখতে পেয়েছিলেন। এখন দয়া করে বলুন, উটটা কোনদিকে গিয়েছে?"

উটওয়ালার কথায় মন্ত্রীরা একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তৃতীয় মন্ত্রী এবার মুখ খুললেন। "দেখুন, আমরা আপনার উটকে দেখিনি। কিন্তু আমরা জানি যে আপনার উটের লেজও নেই।"

উটওয়ালা বললো, "ঠিক বলেছেন হুজুর। গত বছর এক দুর্ঘটনায় আমার উটের লেজটা কাটা যায়। এবার দয়া করে বলুন আমি কোনদিকে যাবো।"

চার পথচারী কোনোরকম সহযোগিতা করছেন না দেখে এবার উটওয়ালা চটে উঠলো। তার মনে এবার নানা সন্দেহ দেখা দিতে লাগলো।

বিরক্ত মুখ করে উটওয়ালা বললো, "আর লেজে খেলাবেন না আমাকে। নিজের চোখে না দেখলে আপনারা বললেন কী করে আমার উট কানা, খোঁড়া আর তার লেজ কাটা?"

উটওয়ালার গলার স্বর ক্রমশই চড়ে উঠল। আমি বুঝতে পারছি আপনারাই উট চুরি করেছেন। এখনও সময় আছে, যদি গোলমাল পাকাতে না চান তাহলে

বলুন কোথায় আমার উট লুকিয়ে রেখেছেন?"

চতুর্থ মন্ত্রী এবার উটওয়ালাকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। "দেখুন, আমরা একটুও মিথ্যে বলছি না, আমরা উট দেখিনি। তবে আমরা এও জানি যে আপনার উটের শরীর ভাল যাচ্ছে না।"

এবার উটওয়ালার মনে কোনো সন্দেহ রইলো না যে লোকগুলোর মতলব সুবিধের নয়। রেগে-মেগে সে বললো, "তোমরাই যে চোর, তা বুঝতে আর কোনো প্রমাণ লাগবে না। তোমরা যে দেখেছো আমার উট তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। ভাল চাও তো আর বাক্যব্যয় না করে আমার উট আমার কাছে নিয়ে এসো। না হলে এই আমি—রাজার কাছে চললাম।

চার মন্ত্রী উটওয়ালাকে মিষ্ট কথায় বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। "আপনি শুধু-শুধু আমাদের সন্দেহ করছেন। আমরা আপনার উটকে দেখিনি আর আমরা চোরও নই। রাজার কাছে নালিশ নিয়ে না গিয়ে বরং আপনি উটের খোঁজ করুন। তাতেই আপনার লাভ হবে।"

"চোপরাও।" উটওয়ালা রেগে উঠলো। "আর লেকচার দিতে হবে না। তোমরা যে ভদ্রবেশী চোর তা ধরা পড়ে গিয়েছে। যাচ্ছি মহারাজের কাছে; কোটালের লাঠির গুঁতো না খেলে মুখ খুলবে না বুঝতে পারছি।"

মাথার পাগড়ি টাইট করে নিয়ে উটওয়ালা এবার ছুটলো রাজার দরবারে। যেতে যেতে সে চীৎকার করতে লাগলো, "চোর হাতে নাতে ধরা পড়েছে, এখন চোরের শাস্তি চাই।"

মহারাজ বীরসেনা সেদিন বিকেলে তাঁর দেহরক্ষীদের নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন, পাগড়ি-পরা একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁর দিকেই ছুটে আসছে।

লম্বা কুর্নিশ ঠুকে লোকটি বললো, "মহারাজ, আমি দরিদ্র উটওয়ালা। চারজন পাজী লোক আমার উট চুরি করেছে। এরা দিব্যি বলছে আমার উট খোঁড়া, কানা, লেজকাটা আর তার শরীর খারাপ। অথচ বোকা সেজে বলছে, তারা আমার উটকে নাকি দেখেই নি। এদের আপনি যোগ্য শাস্তি দিন, চোরের দলকে শূলে না-চড়ালে আপনার রাজ্যে শান্তি থাকবে না, মহারাজ।"

মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় সেই চোরের দল?"

একটু দূরেই একটা বট গাছের তলায় তারা বসে আছে শুনে মহারাজ অর সময় নষ্ট না করে দেহরক্ষীদের নিয়ে সেদিকেই এগিয়ে গেলেন্য চুরির ফয়সালা তিনি এখনই করবেন।

দূর থেকে বটগাছের তলায় তাঁর প্রাক্তন চার মন্ত্রীকে বসে থাকতে দেখে মহারাজ বীরসেনা অবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মন্ত্রীরা যে উট চুরি করতে পারেন না এ-সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজার কর্তব্য শুধু সুবিচার করা নয়, এমনভাবে বিচার করা যাতে কারও মনে বিচার সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ না থাকে।

মহারাজকে দেখে চার মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে মাথা নত করলেন। উট-ওয়ালা গড় গড় করে তার অভিযোগ বলে গেলো। "মহারাজ, এরা এতো মিথ্যেবাদী যে এখনও বলছে আমার উট দেখেনি।"

মহারাজ বললেন, "আপনারা উদ্বিগ্ন হবেন না। কিন্তু চোখে না দেখেও আপনারা কী করে জানলেন উট খোঁড়া?"

প্রথম মন্ত্রী উত্তর দিলেন, "মহারাজ, বিচক্ষণ ব্যক্তিরা চারপাশের অবস্থা থেকেই অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন, সবকিছু তাঁদের নিজের চোখে দেখতে হয় না। আমাদের হাতে কোনো কাজ ছিল না, সময় কাটাবার জন্যে নরম মাটিতে উটের পায়ের চিহ্ন খুঁটিয়ে দেখছিলাম।"

মহারাজ বীরসেনা নিজেও এবার কৌতূহল বোধ করলেন। তিনি প্রথম মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী কী দেখলেন বলুন তো শুনি?"

প্রথম মন্ত্রী গম্ভীরভাবে বললেন, "নিতান্ত সহজ ব্যাপার, মহারাজ। মাটিতে পায়ের ছাপগুলো থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, উটের পিছনের পা দুর্বল—কোথাও ভাল দাগ পড়েনি। এই অস্পষ্ট দাগ দেখেই আমি বলেছিলাম উট খোঁড়া।"

উটওয়ালা এবার দাগগুলো খুঁটিয়ে দেখলো। তাকেও স্বীকার করতে হলো মন্ত্রী মিথ্যে কথা বলেন নি।

"পায়ের ছাপে না-হয় পায়ের দোষ ধরা পড়ল। কিন্তু উট যে কানা তা জানালেন কেমন করে?" উটওয়ালা এবার প্রশ্ন তুললো।

দ্বিতীয় মন্ত্রী বললেন, "শুধু কানা নয়, কোন্ চোখটা কানা তাও বলে দিচ্ছি। মহারাজ আপনি এই জায়গাটা দেখুন। বাঁদিকে বেশি ঘাস থাকা সত্ত্বেও উট কেবল ডানদিকের ঘাস খেয়েছে। এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে না যে এই উট বাঁ চোখে দেখতে পায় না।"

রাজা এবং উটওয়ালা দুজনেই দেখলেন বাঁ-দিকের সমস্ত ঘাস অক্ষত রয়েছে।

তবুও উটওয়ালার মনের সন্দেহ মিটলো না। "খোঁড়া এবং কানার ব্যাপারটা

না-হয় মেনে নিলাম, কিন্তু চোখে না-দেখলে কী করে এঁরা বললেন, আমার উটের লেজ নেই? মহারাজ, আমি বিচার চাই।"

তৃতীয় মন্ত্রী এবার উত্তর দিলেন, "খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় উটের লেজ নেই। মহারাজ, আমি দেখলাম ঘাসের ওপর কয়েক ডজন মশা বসে রয়েছে। রক্ত চুষে-চুষে তারা এত ফুলে উঠেছে যে নড়তে পারছে না। মহারাজ, উটের যদি লেজ থাকতো তাহলে এইভাবে রক্ত খাবার সুযোগ পেতো না মশাগুলো। উট লেজ দিয়ে মশাগুলো নিশ্চয় তাড়াতে পারতো।"

ভিজে ছোলার মতো ফুলে-ওঠা মশাগুলোকে রাজা ও উটওয়ালা নিজেদের চোখেই দেখলেন। রাজার চোখে এবার বিস্ময় ফুটে উঠেছে। মন্ত্রীদের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁক তাজ্জব করেছে।

চতুর্থ মন্ত্রী এবার এগিয়ে এলেন। "মহারাজ, উট যে অসুস্থ তা বোঝাবার জন্যে কোনো ম্যাজিকের প্রয়োজন নেই। উটের যে নাদি পড়ে রয়েছে তা দেখলেই বলা যায় উটের পেট খারাপ হয়েছে।"

উটওয়ালার চোখ দুটো এবার ছানাবড়া। সে বুঝেছে তার ভুল হয়েছিল—এই চারজন নির্দোষ ভদ্রলোককে সে অকারণে সন্দেহ করেছিল।

মহারাজ নিজেও বিস্মত। তিনি বললেন, "আপনাদের সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং বুদ্ধি আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন আমি বুঝেছি এরকম বুদ্ধি না-থাকলে রাজকার্য চালানো যায় না। আমি আপনাদের ছাড়ছি না, আপনারা আবার আমার মন্ত্রী হোন।"

কোনো কথায় কান না-দিয়ে, প্রায় জোর করে চার মন্ত্রীকে মহারাজ তাঁর রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

"উঃ, বাঁচা গেল।" এবার হাঁফ ছাড়লো বুলবুল। সৎ-মন্ত্রীরা যে শেষ পর্যন্ত বিপদে পড়েননি তাতে সে খুব খুশি হয়েছে।

তিলক বলল, "এইসব মন্ত্রী, যাকে বলে কিনা এক একখানা জুয়েল! বিলেতে জন্মালে এঁরা প্রত্যেকেই শার্লক হোমস হতে পারতেন।"

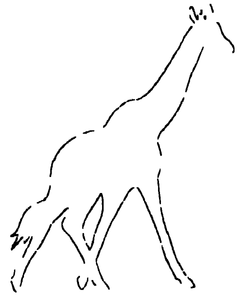
"আর আমাদের ইন্ডিয়াতে জন্মালে?" প্রশ্ন করলেন ছোটমামা।

"ব্যোমকেশ বক্সী কিংবা কিরীটি রায়।" উত্তর দিলো শিবাজী।

ছোটমামা এবার জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের এই দুই উপকথা থেকে কী বোঝা গেল?"

তিলক, শিবাজী ও বুলবুল একই সঙ্গে বলে উঠল : "বোকাদের উচিত সবসময় বুদ্ধিমান লোকদের পরামর্শ নেওয়া।"

সহাস্য ছোটমামা সানন্দে প্রাইজ অ্যানাউনস করলেন, "তোমরা তিনজনেই ফার্স্ট হয়েছো। তিনজনেই একখানা করে চকোলেট পুরস্কার পাবে উইদিন পাঁচ মিনিট।"



প্রাইজ পেয়ে বুলবুল, তিলক ও শিবাজী তিনজনেই খুব খুশি। বিশেষ করে, সবাই ফার্স্ট হয়েছে বলে। তিলক তো স্বীকার করেই বসলো, "আমাদের রাউরকেলার কখনও একজনের বেশি প্রথম হয় না।"

বুলবুল গলা উঁচু করে স্লোগান দিলো, "ছোটমামা যুগ যুগ জিও। ভগবান, ছোটমামাকে আমাদের জামশেদপুর গার্লস স্কুলের হেডমিসট্রেস করে দাও।"

শিবাজী বললো, "ছোটমামা ইজ রাইট! কোন্ বইতে লেখা আছে যে একজনের বেশি ফার্স্ট হতে পারবে না?"

খুশ মেজাজে ছোটমামা ঘাড় নাড়লেন। "রাইট! তোমরা সব হীরের টুকরো ছেলেমেয়ে—কোন্ দুঃখে তোমরা ফার্স্ট ছাড়া অন্য কিছু হবে?"

ছোটমামা এইবার আড়চোখে একবার মণিবন্ধে বাঁধা ঘড়িটা দেখে নিলেন। এতোক্ষণে ছোট কাঁটাটা মাত্র একঘণ্টা এগিয়েছে। তিন দিদিকেই জানা আছে—শাড়ির দোকানে ঢুকলে তাঁদের মাথার ঠিক থাকে না। কতক্ষণে শপিং শেষ হবে কিছু ঠিক নেই।

বুলবুল একটু ব্যস্ত হবার লক্ষণ দেখালো। "ছোটমামা, ওরা মার্কেটিং সেরে এখনও ফিরছে না কেন?"

মামা মিটমিট করে হেসে ফেললেন। বললেন, "বাঙালীদের কমন মিসটেক বাজার করাকে মার্কেটিং বলা। ওটা হবে শপিং!"

যিনি নতুন মামীমা হবেন তাঁর ছবিটা মামার টেবিল থেকে শিবাজী এবার তুলে নিয়েছে। একটা কলমের খোঁজ করছে সে, মামীমার ঠোঁটে যে গোঁফটা কিছুক্ষণ আগে এঁকেছিল সেটা আরও একটু বাড়াবার ইচ্ছে হয়েছে।

ছোটমামা দেখলেন অবস্থা সুবিধের নয়। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্য বললেন, "সায়লেন্ট, সায়লেন্ট। পিন ড্রপ সায়লেন্ট। আবার গপ্পো শুরু হতে পারে।"

মামীমার গোঁফের ওপর থেকে নজর সরিয়ে এনে শিবাজী চটপট সোজা হয়ে বসলো। বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "পিন ড্রপ মানে কি ছোটমামা?"

ভারিক্কি চালে তিলক উত্তর দিলো, "এমন শান্ত অবস্থা যে মাটিতে একটা আলপিন পড়লেও তার আওয়াজ শোনা যাবে।"

"গুড।" তারিফ করলেন ছোটমামা। "ওরকম একটা বাংলা কথা বলো তো।"

মাথা চুলকে বুলবুল উত্তর দিলো, "সূচীভেদ্য অন্ধকাব।"

"মানে?" জিজ্ঞেস করলেন ছোটমামা।

"এমন ঘন অন্ধকার যে কেবল সূচ দিয়ে ফুটো করা যায়," বুলবুল সবাইকে তাক লাগিয়ে দিলো। জামশেদপুর ইস্কুলে ওদের বাংলা চর্চাটা ভালই হয়।

ছোটমামা এবার গপ্পো শুরু করতে যাচ্ছিলেন—কোন এক দেশে...

কিন্তু ওরা তিনজন এক সঙ্গে দাবী করলো, "এবার কিন্তু রাজার গপ্পো নয়।"

ছোটমামা বোধহয় রাজার গল্পই শোনাতে যাচ্ছিলেন, তাই শেষ মুহূর্তে ব্রেক কষলেন। একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বেশ এবারে একজন সাধারণ লোকের গল্পই শোনাচ্ছি তোমাদের।"

"বিয়ের গপ্পো বলো মামা।" বিয়েবাড়িতে এসে বিয়ের গল্প শোনবার ইচ্ছে বুলবুলের।

"ঘাবড়াও মাত! এ-গল্পে বর-কনেও আছে—এক ঢিলে দু'পাখি মারা যাবে," ছোটমামা আশ্বাস দিলেন।

"এক ঢিলে আবার দুটো পাখি মারা যায় নাকি?" মামার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করলো শিবাজী।

"নিশ্চয় কেউ দু'পাখি মেরেছিল—না হলে বইতে কথাটা এলো কী করে?" শিবাজীকে থামাবার জন্যে তিলক বলে উঠলো। ছোটমামার নতুন গল্পটা শোনবার জন্যে সে ছটফট করছে।

ছোটমামার গল্প আরম্ভ হয়ে গেলো,..."ব্যাপারটা ঘটেছিল পাঞ্জাবে। পঞ্চ নদীর দেশ পাঞ্জাব জানো তো? ওখানেই অনেক অনেক দিন আগে কোনো এক গ্রামে এক চাষী আর তার বউ থাকতেন। একদিন চাষীর ঘরে সুন্দর একটি

ছেলের জন্ম হলো।

অমন চমৎকার ছেলে দেখে গ্রামের সবারই চোখ জুড়িয়ে গেলো।

কিন্তু সেবার আকাশে মেঘ নেই, মাঠে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো না। চাষবাস সব নষ্ট।

চাষী কিন্তু দমলেন না। পাঞ্জাবীদের এই একটা গুণ—মনে ভীষণ সাহস। দুঃখ কষ্ট বিপদে পাঞ্জাবীরা সহজে ভেঙে পড়ে না।

চাষী বললেন, "চাষ হয় নি বলে আমি ঘরে বসে কান্নাকাটি করবো না। আমি চললাম গ্রাম থেকে শহরে। ওখানে কিছু টাকা রোজগার হয় কিনা দেখি।"

চাষীর ভাগ্য ভাল। শহরে গিয়ে জিনিসপত্র কেনা-বেচা করে কিছুদিনের মধ্যে তিনি অনেক পয়সা করে ফেললেন। অন্য লোক হলে হয়তো শহরেই থেকে যেতেন, কিন্তু চাষীর মন পড়ে আছে নিজের গ্রামে। তাই তিনি এবার নিজের দেশেই ফিরে চললেন।

ছেলের মাকে চাষী বললেন, "দুটো পয়সার মালিক হয়েছি বটে, কিন্তু নিজের জোরে নয় গিন্নী। এ-সমস্তই পয়মন্ত ছেলের কপালগুণে।"

কয়েক বছর পরে চাষীর ইচ্ছে হলো ছেলের একটা বিয়ের সম্বন্ধ করেন। বেশ বড় ঘরে ফুটফুটে কোনো মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে হোক।

"ওমা! ছেলের কত বয়েস? এর মধ্যেই বিয়ে!" বুলবুল আর কথা না-বলে থাকতে পারলো না।

"বয়স কম। কিন্তু তখনকার দিনে ওরকমই নিয়ম ছিল। ছেলে-বেলাতে বিয়ের কথাবার্তা পাকা হয়ে থাকতো, তারপর একটু বয়েস হলে বিয়ে হয়ে যেতো।" ছোটমামা ভাগ্নীকে শান্ত করলেন।

"ওইটুকু ছেলের বিয়ে হলো?" জিজ্ঞেস করলো শিবাজী।

"হ্যাঁ। পাত্রী পাওয়া গেলো।" ছোটমামা আবার শুরু করলেন। "গ্রাম থেকে অনেক দূরে অন্য এক দেশে ফুটফুটে এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ের সমস্ত কথা পাকা হয়ে গেলো। মেয়ের বাবার মস্ত বাড়ি, প্রচুর জমিজমা, মরাইতে অনেক গম, গোয়ালে ডজন ডজন গরু—ছেলের বাবার সন্তুষ্ট না হওয়ার কোনো কারণই নেই।"

ছোটমামা বললেন, "তখনকার যুগে পাকা কথা হলে সঙ্গে-সঙ্গে বিয়ে হতো না। বিয়েটা সময় মতো কয়েক বছর পরে হবে—এই রকমই ঠিক-ঠাক হয়ে থাকতো।"

এর কয়েক বছর পরে ছেলে আরও বড় হয়ে উঠেছে। চাষী ভাবছিলেন,

এবার বিয়েটা লাগিয়ে বউমাকে নিজের ঘরে নিয়ে আসবেন তিনি। কিন্তু কপালে অত সুখ ছিল না বেচারা চাষীর। মনের সাধ পূরণ হবার আগেই কঠিন অসুখে হঠাৎ মৃত্যু হলো তাঁর।

কিছুদিন পরে মেয়ের বাড়ি থেকে খবর এলো, ছেলের যখন বাবা মারা গিয়েছেন তখন সে মেয়ের বাড়িতে এসেই থাকুক। মেয়ের বাবাই সব দায়-দায়িত্ব নেবেন। কিন্তু ছেলের মা রাজি হলেন না।

তিনি বললেন, "আমার ছেলে ডাগর হয়ে উঠছে, কেন সে ঘর-জামাই হবে? ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে তাকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেবো; বিয়ে করে নতুন বউকে সঙ্গে নিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে বাবার বাড়িতে ফিরে আসবে, এখানেই ঘর-সংসার করবে আর পাঁচজনের মতো।"

মেয়েব বাবা আপত্তি করলেন না। বেয়ান যা বলবেন তাতেই রাজি তিনি।

"নাউ! বেয়ান কাকে বলে?" গল্প থামিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন ছোটমামা।

রাউরকেলার বাসিন্দা তিলক বাংলায় একটু দুর্বল—সে বলতে পারলো না। 'বেয়াড়া' কথাটা সে মার মুখে কয়েকবার শুনেছে—কিন্তু বেয়ান?

শিবাজীও বাংলায় উইক হতো। কিন্তু তার ঠাকুমা ভিলাইতেই থাকেন। তাই অনেক স্পেশাল বাংলা শব্দ সে শুনেছে। সে এবার তড়াং করে উত্তর দিলো, "জামাইয়ের মা হচ্ছে বেয়ান।"

ছোটমামা মিষ্টি হেসে বুঝিয়ে দিলেন, "ছেলের বা মেয়ের শ্বশুর হচ্ছেন বেয়াই এবং ছেলে বা মেয়ের শাশুড়ী হচ্ছেন বেয়ান।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করলো বুলবুল। গল্পটা কোন্ দিকে এগোবে তা সে এখনও আন্দাজ করতে পারছে না। বুলবুল শুনেছে, বিয়েবাড়িতে নানা গোলমাল হতো সেকালে—শেষ মুহূর্তে হয়তো বিয়ে ভেঙেই গেলো। চাষীর ছেলের বিয়েটা ভালয়-ভালয় না হওয়া পর্যন্ত সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

ছোটমামা বুলবুলের উদ্বেগের কারণ বুঝতে পারছেন। মুখের হাসি চেপে রেখে তিনি বলতে লাগলেন : "চাষীর বউ তো ছেলেকে বরের বেশে সাজিয়ে গুজিয়ে ঘোড়ায় চড়িয়ে দিলেন। বললেন, "তুমি বেশ বড় হয়েছো—এবার চলে যাও দূরের সেই দেশে আর রাঙা টুকটুকে বউ নিয়ে ফিরে এসো যত তাড়াতাড়ি পারো।"

ছেলেও খুব সাহসী। একটুও ভয় পেলো না সে। মাকে প্রণাম করে, টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তেপান্তরের মাঠের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

ঘোড়া ছুটছে তো ছুটছে। একটুও ক্লান্তি নেই। সূর্যের আলোয় বরের জামাকাপড় আর পাগড়ি ঝলমল করে উঠছে—দূর থেকে মনে হচ্ছে ঠিক যেন রূপকথার কোনো রাজপুত্তুর পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে চলেছে রাজকন্যের সন্ধানে।

একটানা চলতে চলতে তেপান্তরের মাঠ কখন শেষ হয়ে গিয়েছে। ঘোড়া ঢুকে পড়েছে গভীর জঙ্গলের মধ্যে। কিন্তু কোনো দুর্ভাবনা নেই সাহসী বুকে—তার ঘোড়া আগের মতোই ছুটতে লাগলো টগবগিয়ে।

চলতে চলতে হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে ফেললো। না-থামিয়ে উপায় নেই। পথের ধারেই চলেছে অহি-নকুলের লড়াই।

ছোটমামা বললেন, ''অহি-নকুল জানো তো? অহি মানে সাপ এবং নকুল মানে বেজি। এদের সম্পর্ক মোটেই ভাল নয়। দেখা হলেই লড়াই শুরু হয়ে যায়। তাই বাঙলায় দু'জনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি লেগে থাকলে বলা হয়, এদের মধ্যে অহি-নকুল সম্পর্ক।''

বেজি শব্দটা তিলক তখনও বুঝতে পারছিল না। তারপর শিবাজীর কথা শুনে বললো, ''ও! বেজি মানে 'মঙ্গুজ'—বলবি তো।''

ছোটমামা গল্প বলে চললেন, চাষীর ছেলে দেখলো সাপ ও বেজির মধ্যে লড়াই চলেছে তো চলেছেই। এই অবস্থায় বেশির ভাগ লোক পাশ কাটিয়ে যায়—তারা কোনো হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়তে চায় না। তাদের কথা হলো, তোমরা যদি নিজেদের মধ্যে মারামারি খেয়োখেয়ি করতে চাও তো করো, আমার কী?

কিন্তু ছেলেটির মনে পড়লো বাবার কথা। বাবা বলতেন, যদি কখনও কোথাও দুজনকে মারামারি করতে দেখো তাহলে ভদ্রলোকের কাজ হলো দু'পক্ষকে ছাড়িয়ে আলাদা করে দেওয়া।

বাবার কথা স্মরণ করে সে অনেক চেষ্টায় সাপ আর বেজিকে আলাদা করে দিলো। বললো, ''যথেষ্ট হয়েছে, আর যুদ্ধ নয়।''

চাষীর ছেলের কথায় সাপ শান্ত হয়ে গেলো, কিন্তু বেজি তাকে সহজে ছাড়তে রাজি নয়। সে হঠাৎ আবার সাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আর কোনো উপায় নেই বুঝে, কোমর থেকে তলোয়ার বার করে ছেলেটি বেজিকে দু'টুকরো করে ফেললো। দোষটা যখন পুরোপুরি বেজিরই তখন তাকে শাস্তি পেতেই হবে।

তারপর সময় নষ্ট না-করে সে আবার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলো।

শ্বশুরবাড়ির দেশে ঠিক সময় তাকে পৌঁছতে হবে।

বেশ কিছুটা এগোবার পর বুঝতে পারলো, বিশাল সাপটা তার পিছনে তাড়া করে আসছে তাকে খাবার জন্য। ঘোড়া থামিয়ে পিছনে তাকাতেই বিরাট সাপটা তার ঘাড়ের ওপর এসে পড়লো।

চাষীর ছেলে তো অবাক! একটু আগেই যে-সাপটার জীবন সে বাঁচিয়েছে সে-ই ছুটে আসছে তার সর্বনাশ করতে। কী করে তা হয়? সাপটা নির্বিকারভাবেই বললো, "এতে অবাক হবার কিছু নেই। যস্মিন্ দেশে যদাচার। আমাদের দেশে এই নিয়ম—যদি কেউ উপকার করে তাহলে তার সর্বনাশ করতেই হবে।"

ছোটমামা বললেন, "তিনটে শক্ত শক্ত বাংলা কথা তোমাদের শিখিয়ে দিই। যে উপকারীর উপকার মনে রাখে সে 'কৃতজ্ঞ', যে মনে রাখে না সে 'অকৃতজ্ঞ', আর যে লোক উপকারীর অপকার করে সে 'কৃতঘ্ন'।"

"সাপটা তাহলে কৃতঘ্ন, বুঝেছি" বলে উঠল বুলবুল। সাপের ব্যাপার স্যাপার তার মোটেই ভাল লাগছে না।

ছোটমামা বলে চললেন; সাপটা এবার বিশাল হাঁ করে বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলতে-ফেলতে ছেলেটাকে গিলতে এগিয়ে এলো।

সামনেই যে সর্বনাশ তা বুঝতে পেরে শেষ মুহূর্তে সাপকে সে অনুরোধ করলো, "আমাকে চারটে দিন সময় দাও। শ্বশুরবাড়িতে আমার বিয়ের সব ঠিকঠাক হয়ে রয়েছে। সেখান না-গেলে ওরা খুব অসুবিধেয় পড়বে। আমি কথা দিচ্ছি, চার দিনের মাথায় আমি এখানে ফিরে আসবো; তখন তুমি তোমার কাজ করো।

কথা আদায় করে সাপ তখনকার মতো ছেলেটিকে ছেড়ে দিলো। গভীর অরণ্য ভেদ করে ঘোড়া আবার ছুটতে শুরু করলো।

সাপের ব্যাপারে বুলবুলের চিন্তা আরম্ভ হয়েছে। বেচারী চাষীর ছেলের কথা ভেবে চোখে এখনই জল আসছে। সে জিজ্ঞেস করলো, "তারপর কী হলো ছোটমামা?"

"কী ডেনজারাস অবস্থা বাবা! আমি কখনও অচেনা লোকের উপকার করছি না," তিলক বলে উঠলো।

ছোটমামা শান্তভাবে বললেন, "খুব জাঁকজমকের মধ্যে তো ছেলেটির বিয়ে হয়ে গেলো। সোনার পুতুলের মতো দেখতে বউ—খুব পছন্দ হয়েছে তার।"

সবাই বলতে লাগলো, "আহা কী সুন্দর মানিয়েছে; যেমন বর তেমন

কনে।"

চারটে দিন হৈ-চৈ গান বাজনা খানাপিনার মধ্যে হুস করে কেটে গেলো। তারপর এলো যাবার সময়। লাল বেনারসী শাড়িতে-মোড়া নতুন বউকে চাষীর ছেলে তুলে নিলো ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়া এবার তীরের বেগে ছুটতে লাগলো।

ছুটতে ছুটতে ঘোড়া যতই বনের কাছে আসতে লাগলো ততই ছেলেটির মুখ গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগলো। নতুন বউ লক্ষ্য করলো স্বামীর কথাবার্তা হঠাৎ কমে আসছে।

বনের মধ্যে ঘোড়া ঢুকে পড়ছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত আর দেরি নেই। একটু দূরেই যে সেই ভয়ঙ্কর সাপটা অপেক্ষা করছে তা ভুলবার কথা নয়।

ব্যাপারটা আর গোপন রাখার মানে হয় না। বিষণ্ণ কণ্ঠে ছেলেটি এবার নতুন বউকে সব কথা খুলে বললো। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবারও বৃথা চেষ্টা করলো সে। "আমাকে সাপের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে যাও। আর তো কোনো উপায় নেই। এ-জন্মে তোমাকে কিছু দিতে পারলাম না। পরের জন্মে যেন তোমাকেই আবার পাই।"

নতুন বউয়ের মনে তখন ভীষণ দুশ্চিন্তা, কিন্তু আচমকা বিপদে ভেঙে পড়বার মেয়ে সে নয়। নতুন বউ বললো, "তোমাকে এখানে একলা ছেড়ে আমি কিছুতেই যাচ্ছি না। আমিও তোমার সঙ্গে সাপের কাছে যাবো।"

দূর থেকে এবার সেই বিপজ্জনক সাপটাকে দেখতে পাওয়া গেলো। চাষীর ছেলেকে গিলে খাবার জন্যে বিশাল বিভীষিকার মতো পথের ধারে সে অপেক্ষা করছে।

গরম নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সাপটা এবার ছেলেটির দিকে এগিয়ে আসছে দেখে নতুন বউ আর এক মুহূর্ত দেরি করলো না—স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালো সে।

সাপ একটু বিরক্ত হলো। সামনেই খাবার, এই সময় কে ঝুট-ঝামেলা পছন্দ করে?

নতুন বউ খুব মোলায়েম সুরে সাপকে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি কেন আমার স্বামীর সর্বনাশ করতে চাইছেন?"

সাপ তখন সেই পুরানো কথা বললো, "তোমার স্বামী আমার উপকার করেছে, উপকারীর সর্বনাশ করাই আমাদের দেশের নিয়ম।"

মাথায় হাত দিয়ে বসলো নতুন বউ। "এরকম অদ্ভুত নিয়মের কথা তো কেউ কখনও শোনে নি! পৃথিবীতে সবাই তো উপকারীর উপকারের চেষ্টা করে।"

সাপ বিরক্ত হয়ে বললো, "তোমার বয়স কম, অভিজ্ঞতা নেই, শুনে রাখো যস্মিন দেশে যদাচার—যে দেশে যে নিয়ম।"

নতুন বউ তখনও নাছোড়বান্দা। সে বললে, "হতেই পারে না? যদি কেউ উপকার করে থাকে, ভুলেও তার ক্ষতি করতে নেই। যাতে তার ভাল হয় তার চেষ্টা করতে হয় সারা জীবন।"

কোন পুরুষমানুষ একথা বললে সাপ তখনই বকুনি লাগাতো। কিন্তু নতুন বিয়ে-হওয়া বউ। মুখ ব্যাজার করে সাপ জিজ্ঞেস করলো, "দূরে পাঁচটা গাছ দেখতে পাচ্ছো? ওদেরই জিজ্ঞেস করো কেন এ-দেশে এই নিয়ম চালু হলো।"

যদি কোনো পথের হদিশ পাওয়া যায় এই আশায় নতুন বউ তখনই গাছগুলোর কাছে হাজির হলো। কিন্তু গাছগুলোর কাছে যে ঘটনা শোনা গেলো তা বেশ গোলমেলে।

একটা গাছ গভীর দুঃখ চেপে রেখে বললো, আগে এখানে তিন জোড়া গাছ ছিল। এখন একটা গাছ কমে গিয়েছে। সেই বিরাট গাছটার গুঁড়ির কাছে বড়সড় একটা গর্ত ছিল, যার মধ্যে একজন মানুষ ইচ্ছে করলেই আশ্রয় নিতে পারতো। একদিন এক চোরকে গ্রামের লোকেরা তাড়া করেছে। প্রাণের ভয়ে চোর পালাচ্ছে। আর ধারালো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লোকগুলো ছুটে আসছে।

চোরটা তখন গাছের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদ-কাঁদ গলায় আশ্রয় চাইলো। বললো, "তুমি যদি আমাকে লুকিয়ে না রাখো তাহলে পিছনের লোকগুলো আমাকে এখনই খুন করে ফেলবে।"

গাছটার মনে খুব দয়া ছিল। সকলের মঙ্গল করতে চাইতো সে। বিপদ বুঝে সে নিজের গর্তের মধ্যে চোরকে ঢুকতে বললো। চোর সেখানে আশ্রয় নিতেই নিজের গর্তটা সে এমনভাবে ঢেকে ফেললো যে বাইরে থেকে কার সাধ্য বোঝে ভিতরে কেউ লুকিয়ে আছে।

অনেক চেষ্টা করেও কেউ চোরকে খুঁজে পেলো না। সে সমস্ত রাত গাছের গর্তে লুকিয়ে রইলো এবং পরের দিন ভোরে আবার বেরিয়ে পড়লো। ওই গাছ ছিল চন্দনের থেকেও সুগন্ধ। সমস্ত রাত কোটরে থাকায় চোরের দেহ থেকে তখন ভুরভুর করে গন্ধ ছাড়ছে।

চোর এবার হাঁটতে হাঁটতে এক গঞ্জে হাজির হয়েছে। সেখানকার একজন লোক বললো, "বাঃ, অদ্ভুত সুগন্ধ বেরুচ্ছে আপনার দেহ থেকে। এমন মাতোয়ারা গন্ধ তো আগে কখনও শুঁকিনি। কী সেন্ট মেখেছেন?"

চোর কোনো উত্তর দিলো না। কিন্তু অন্য লোকটাও ছাড়বার পাত্র নয়। সে সোজা রাজার কাছে গিয়ে হাজির হলো। "মহারাজ, এখানে একটি নতুন লোক এসেছে—তার সঙ্গে অদ্ভুত সেন্ট রয়েছে। আমাদের কাছে সে কিছু খুলে বলছে না; কিন্তু আপনি হুকুম করলে বলতে পারে।"

রাজার সেপাইরা সঙ্গে-সঙ্গে চোরকে রাজসভায় ধরে নিয়ে এলো।

রাজা বললেন, "এই সেন্টের ব্যাপারটা যদি খোলাখুলি বলে দাও তাহলে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। আর যদি না বলো, তা হলে তোমার গর্দান নেওয়া হবে।"

গর্দান যাবার ভয়ে চোর ফাঁস করে দিলো "মহারাজ, গতকাল রাত্রে একটা গাছের তলায় আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি কোনো কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য মাখিনি, কিন্তু ওই গাছের গন্ধ আমার জামাকাপড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।"

মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে হুকুম করলেন, "আমার লোকজনদের গাছটা দেখিয়ে দাও।"

চোর তখন বনের মধ্যে গিয়ে যে-গাছ তাকে আশ্রয় দিয়েছিল সেটাই দেখিয়ে দিলো, আর রাজার লোকজন সঙ্গে সঙ্গে কুড়ুল দিয়ে সেই গাছটা কেটে ফেললো।

পাঁচটা গাছ এবার গম্ভীর হয়ে নতুন বউকে বললো, "সেই থেকেই এই বনের নিয়মকানুন পাল্টে গেলো। কেউ উপকার করলে তার সর্বনাশ করার আইন চালু হয়েছে।"

নতুন বউ সমস্ত ব্যাপারটা শুনলো, কিন্তু তার মন তখনও সায় দিতে চাইছে না। মুখ কালো করে সে আবার সাপের সামনে এসে দাঁড়ালো।

সাপ বললো, "এবার সন্দেহ মিটেছে তো? এদেশের নিয়মকানুন কী তা জানা হলো তো?"

নতুন বউ স্বামীকে বাঁচাবার চেষ্টা ছাড়লো না। কাঁদ-কাঁদ হয়ে সে বললো, "আমি তো আপনার কোনো উপকার করিনি—তবু আপনি কেন আমার সর্বনাশ করতে চাইছেন?"

সাপ বিরক্ত হয়ে বললো, "অতশত ভেবেচিন্তে কাজ করবার মেজাজ আমার নেই। তোমার স্বামী যখন আমার উপকার করেছে তখন তার সর্বনাশ আমাকে করতেই হবে।"

বুলবুল এতোক্ষণ চুপচাপ ছোটমামার গপ্পো শুনে যাচ্ছিল। কিন্তু সে আর নিজের দুঃখ চেপে রাখতে পারলো না। কাঁদ-কাঁদ হয়ে বুলবুল বললো, 'ইস্,

অমন সুন্দর বরকে সাপটা খেয়ে ফেলবে। না, এ সহ্য করা যায় না।''

তিলকও চিন্তিত। গম্ভীরভাবে সে বললো, ''আমার ইচ্ছে করছে, মিলিটারিকে বলে দিই—সাপটাকে ফায়ার করে উড়িয়ে দিক।''

শিবাজী বললো, ''আজে-বাজে কথা বলে তো লাভ নেই—তখনকার যুগে মিলিটারি কোথায়? কামান, বন্দুক কিছুই তো আবিষ্কার হয়নি।''

ভাগ্নীর করুণ অবস্থা দেখে ছোটমামা বললেন, ''বুলবুল, তুমি এখন থেকে কেঁদো না। ধৈর্য ধরে সমস্ত ঘটনাটা শোনো। তারপর যা হয় কোরো।''

শিবাজী বললো, ''ছোটমামার অবস্থাটাও বোঝো। বুলবুলের কান্না থামাবার জন্যে যা ঘটেছিল তা উল্টে-পাল্টে দিতে পাবে না। ৬পকথার ব্যাপারে ছোটমামার কোনো স্বাধীনতাই নেই—যা-যা হয়েছিল তাই মামাকে বলে যেতে হবে।''

ছোটমামা আবার শুরু করলেন ঃ

সেই গভীর বনের মধ্যে সাপটা এবার চাষীর ছেলেকে খাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

নতুন বউ কিন্তু তখনও হাল ছেড়ে দেয়নি। সাপের কাছে এগিয়ে গিয়ে সে বললো, ''আমার কথা আপনাকে ভাবতেই হবে। আপনার কোনো উপকার করলাম না, অথচ বিয়ের এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি আমার স্বামীকে খেয়ে ফেলে আমার কপালের সিঁদুর মুছিয়ে, হাতের নোয়া ভাঙিয়ে বিধবার বেশে ফিরিয়ে দিচ্ছেন।''

ছেলেটাকে খাবার জন্যে সাপ ইতিমধ্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু তর্কাতর্কিতে অনেক সময় নষ্ট হচ্ছে। ঝটপট একটা ব্যবস্থার জন্যে সাপ এবার নিজের গর্তের মধ্যে ঢুকে গেলো কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার বেরিয়ে এলো।

নতুন বউকে এবার সাপ বললো, ''তোমার স্বামীকে আমি এখনই খাবো। তবে তোমাকে এই দুটো বড়ি উপহার দিলাম।''

''এই বড়ি নিয়ে আমি কী করবো?'' নতুন বউ কাঁদ-কাঁদ স্বরে জিজ্ঞেস করলো।

সাপ বললো, ''তোমার দুঃখের কথা ভেবেই এই বড়ি দুটো আমি গর্ত থেকে বার করে আনলাম। এই বড়ি খেলে তোমার দুটি রাজপুত্রের মতো ছেলে হবে, তাদের নিয়ে তুমি স্বামীর শোক ভুলে ঘর-সংসার করতে পারবে।''

নতুন বউ এবার কান্নায় ভেঙে পড়লো। ''চাই না আমি তোমার দেওয়া এই বড়ি। বড়ি খেয়ে আমার না হয় ছেলে হলো। কিন্তু আমার কী হবে? আমার

শাশুড়ী আমাকেই দোষ দেবে। বলবে, এই অপয়া ডাইনীটার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পরেই আমার ছেলেটা অপঘাতে মারা গেলো।"

বিরক্ত সাপ আবার গর্তের মধ্যে ঢুকে আর একটা বড়ি নিয়ে এলো। বললো, "তোমার সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছি। এই বড়িটা রাখো। যে তোমার বদনাম করবে এই বড়ির গুঁড়ো তার মাথার ওপর ছড়িয়ে দেবে, দেখবে সঙ্গে সঙ্গে সে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।"

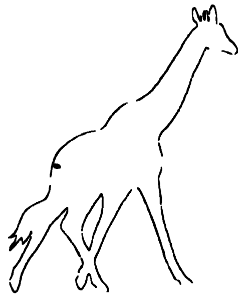
বুদ্ধিমতী নতুন বউ মুহূর্তের মধ্যে পরের ব্যবস্থা ঠিক করে নিলো। যেন কিছুই বোঝে না এমন বোকা-বোকা ভাবে সে জিজ্ঞেস করলো, "কী ভাবে এই বড়ির গুঁড়ো ছড়াতে হবে? এই ভাবে?" সাপ মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়েছিল, আর সেই সুযোগে বউটি আচমকা সেই বড়ির গুঁড়ো সাপের মাথায় ছড়িয়ে দিলো। আর দুর্দান্ত সেই সাপটা সঙ্গে-সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো।

তারপর স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নতুন বউ নিশ্চিন্তে শ্বশুরবাড়ির পথে যাত্রা করলো।

বুলবুল এতোক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। বললো, "উঃ, বাঁচা গেলো। আমি তো গপ্পো শুনতে-শুনতেই ঠাকুরের কাছে মানত করে বসে আছি। ঠাকুর তুমি নতুন বউয়ের সর্বনাশ কোরো না, আমি তোমাকে পুজো দেবো। যাক ঠাকুর আমার কথা শুনেছেন।"

শিবাজী বললো, "যেমন দুষ্টু সাপটা তেমন শাস্তিও হয়েছে। একেই বলে টিট ফর ট্যাট—নিজের প্যাঁচে—নিজে পড়ে গিয়েছে।"

তিলক বললো, "কী অদ্ভুত দেশ বাবা! যে-দেশে লোকে উপকারীর সর্বনাশ করতে চায় সে দেশে কখনও ভাল হতে পারে না।"



দুষ্টু সাপের হাত থেকে চাষীর ছেলেকে বাঁচানোর কথা শোনার পরে বুলবুল তখনও হাঁপাচ্ছে।

"উঃ যা সব কাণ্ডকারখানা! আর একটু হলে কী অঘটনই ঘটতো!" বুলবুল সবাইকে শুনিয়ে বললো।

তিলক বললো, 'দূর বোকা! গল্প ইজ গল্প।"

বুলবুল আপত্তি জানালো। "বললেই হলো! নিশ্চয় এইসব ঘটনা ঘটেছে। না হলে গ্রামের লোকেরা এসব কথা এতোদিন ধরে মনে রেখেছে কী করে?"

ছোটমামা ততক্ষণে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। যা লম্বা ফিরিস্থি নিয়ে শিবাজী, তিলক ও বুলবুলের মায়েরা বেরিয়েছেন! শাড়ির দোকানে, ব্লাউজের দোকানে, মিষ্টির দোকানে, স্যাকরার দোকানে আজ সর্বত্র ভিড়— কোনো জায়গা থেকে ঝপ করে বেরিয়ে আসা যাবে না। তারপর রয়েছে নেমন্তন্নের চিঠি বিলনোর পালা। প্রত্যেক বাড়িতেই কিছুক্ষণ বসতে হবে। না-হলে আত্মীয়-স্বজনদের রাগ হবে—ঠিকমতো নেমন্তন্ন হয়নি বলে তাঁরা বউ-ভাতের দিন হয়তো আসবেন না।

তিনটে ঝকঝকে ভাগ্নে-ভাগ্নীকেও মামা একবার আড়চোখে দেখে নিলেন। দুষ্টু বলে এদের খুবই বদনাম, কিন্তু এখন তারা তিনজনই গল্পের মন্তরে দিব্যি শান্ত হয়ে আছে! কেউ কোনো জিনিস ভাঙছে না, খাটের ওপর উঠে দাপাদাপি করছে না, হৈ-হুল্লোড় করে দাদুর বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না।

মামা নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, "এক দুই তিন—অর্থাৎ তিন শত্রু।"

"তিন শত্রু মানে কী?" শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করলো।

"মানে, তিনটে দিয়ে কখনও শেষ করতে নেই—তাহলে শত্রু হয়," বুলবুল শুনিয়ে দিলো। কথাটা সে মায়ের মুখে অনেকবার শুনেছে।

"ছোটমামা, ব্যাপারটা খুবই ডেনজারাস। তিনটে গল্প হয়েছে, তুমি প্লীজ,

আর একটা স্টোরি শোনাও,'' বললো তিলক।

''হিপ-হিপ্-হুররে। লং লিভ ছোটমামা,'' আরও গল্প শোনার সম্ভাবনায় খুশি হয়ে শ্লোগান শুরু করলো শিবাজী।

ছোটমামা একটু ভেবে নিলেন। বললেন, ''বেশ, এবার তোমাদের মধ্যপ্রদেশের একটা গপ্পো শোনাচ্ছি।''

''এবার যেন বনের মধ্যে ওই রকম ভয়ঙ্কর সাপটাপ না থাকে,'' বুলবুল গোড়াতেই ছোটমামাকে মনে করিয়ে দিলো।

ছোটমামা মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, ''এ গল্পেও সাপ আছে—তবে খুব শান্ত সাপ। কোনো সাতে-পাঁচে থাকে না এমন সাপ!''

''ছোটমামা, একটা মজার গপ্পো চাই,'' শিবাজী ও তিলক একত্রে আব্দার করলো।

''গপ্পোটা মজারই বলতে পারো। তবে আমার নিজের সংগ্রহ নয়। শুনেছিলাম, ভিলাই ইস্পাত কারখানার মিস্টার শুক্লার কাছ থেকে। ভিলাই সম্বন্ধে একটু বলে দাও তো, শিবাজী।''

''মধ্যপ্রদেশে, ডিসট্রিক্ট দুর্গ। মস্তবড় ইস্পাত কারখানা। ওখানে আমার বাবা এবং পিসেমশাই কাজ করেন,'' চটপট উত্তর দিলো শিবাজী। ''বাবা আছেন মাইনিং-এ, আর পিসেমশাই ব্লাস্ট ফারনেসে। লোহা গলানো হয় ওখানে।''

ছোটমামা বললেন, ''বিচিত্র এই মধ্যপ্রদেশ—বস্তার, মালব, বুন্দেলখণ্ড, ছত্রিশগড়ের গ্রাম গ্রামান্তরের হাজার হাজার কথাকাহিনী আর কিংবদন্তী ছড়িয়ে আছে। বড়ো হয়ে তোমরা মধ্যপ্রদেশ সম্বন্ধে পড়াশোনা কোরো।''

বুলবুল, তিলক ও শিবাজী খুব মন দিয়ে ছোটমামার কথা শুনছে। মামাও ক্রমশ গল্পের মধ্যে ডুবে গেলেন।

ছোটমামা বললেন, ''তোমাদের নতুন মামীমা চিত্রলেখা কিছুদিন বস্তারে গল্প সংগ্রহ করে এসেছে। ওর কাছে তোমরা অনেক গল্প শুনবে।

''এ-গল্পটা অনেকদিন আগেকার। তখন এদেশে বিজলীবাতি, রেডিও, টেলিভিশন, গ্রামোফোন, রেকর্ড কিছুই আসে নি। লোকে তখন নিজেরাই গান গাইতো। মাঝি নৌকা বাইবার সময়, বেয়ারা পাল্কি বইবার সময়, চাষী ধান কাটার সময়, ঘরের বউ ধান ভানবার সময় আপন মনে সুর ধরে গাইতো। এইভাবে গান গাইলে কাজটাও ভাল হতো, আর শারীরিক পরিশ্রমের কষ্টও কমে যেতো।

এক গ্রামে ছিল এক বোকা বউ। একটু রাগী প্রকৃতির মানুষ এই বউটি।

স্বামীকে কথায়-কথায় সে মুখ-ঝামটা দিতো।

গ্রামে আরও অনেক বাড়ি ছিল, সেই সব বাড়ির বউরা ধান ভানার সময় সুর করে চমৎকার গান গাইতো। এ-বাড়ির বউ নিজের বাড়িতে বসে-বসে এই গান শুনতো আর রাগে ফুলে-ফুলে উঠতো।

রাগের কারণ আর কিছু নয়, বউয়ের গলায় গান আসে না। ঢেকিতে পা রেখে বউ কতবার গাইবার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

শেষে বউ একদিন প্রতিবেশী অন্য বউদের জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা অমন সুন্দর গান গাও কী করে?"

পাড়ার বউরা জানতো এই বউ বোকা। তারা মজা করে বললো, "কোথায় আর পাবো? আমাদের স্বামীরা দাম দিয়ে কিনে আনে।"

রসিকতাটা বোকা বউয়ের মাথায় ঢুকলো না, সে ভেবে নিলো, গানও নিশ্চয় হাটে-বাজারে কিনতে পাওয়া যায়।

বোকা বউ এবার সোজা স্বামীর কাছে হাজির হলো। অভিমানে মুখ ভার করে বললো, "আমি কিছু শুনতে চাই না। এখনই গঞ্জ থেকে আমার জন্যে খুব ভাল গান কিনে নিয়ে এসো।"

চাষী জানে বদমেজাজী এই বউয়ের সঙ্গে তর্ক করে কোনো লাভ নেই। গান যে কিনতে পাওয়া যায় না একথা কিছুতেই বউয়ের মাথায় ঢুকবে না।

অগত্যা চাষী বললো, "ভাল গানের বোধ হয় দাম অনেক। শুধু শুধু টাকা নষ্ট করাটা কী ঠিক হবে?"

"হোক্ গে দাম, আমি খুব ভাল গান চাই। টাকা নিয়ে কি আমি স্বর্গে যাবো!" মুখ ঝামটা দিলো বউ।

"তাহলে পাঁচটা টাকা দাও। আমি বাজারে বেরোই," এই বলে চাষী একটা বিরাট পাগড়ি মাথায় জড়িয়ে নিলো। এখানকার কেউ খালি মাথায় শহরে যায় না, তাতে মান-সম্মান থাকে না।

বোকা বউ ঝট করে মাটির জালার মধ্যে লুকনো পাঁচটা টাকা বার করে দিলো। ভালো গান তার চাই-ই চাই। বেসুরো গানের জন্যে পড়শিদের অবজ্ঞা .সে আর কিছুতেই সহ্য করবে না।

বাড়ির কর্তা পাগড়ি মাথায় গ্রাম থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে গঞ্জে এসে হাজির হলো। সেখানে একটা দোকানে ঢুকে সে বললো, "খুব ভাল একখানা গান কিনতে চাই আমার পরিবারের জন্যে।"

"পরিবার মানে তো ফ্যামিলি," তিলক বলে উঠলো।

"নিজের বউকেও অনেকে পরিবার বলে," ছোটমামা বুঝিয়ে দিলেন।

"গান কিনতে এসেছে! চাষীর কথা শুনে দোকানি তো মনে-মনে হেসে বাঁচে না। কিন্তু খদ্দেরের মুখের ওপর সে কোনো অভব্যতা করলো না। বললো, "ফুরিয়ে গিয়েছে—অন্য দোকানে দেখুন।"

বেচারাকে বাধ্য হয়ে আবও হেটে অন্য এক দোকানে যেতে হলো। সব শুনে সেই দোকানদারও মজা করে বললো, "আরও এগিয়ে অন্য দোকানে খোঁজ করুন।"

এই করে এক দোকান থেকে আর এক দোকানে ঘুরছে কর্তা, আর দোকানিরা প্রাণভবে হাসছে। ভাবছে যেমন বোকা বউ তেমন তার স্বামী। অত শখ করে গাঁটের কড়ি খরচ করে যখন বউয়ের জন্য গান কিনতে বেরিয়েছো, তখন একটু ভোগো।

এইভাব দোকানে দোকানে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে কর্তা সামান্য বিশ্রামের জন্য এক জায়গায় একটু বসলো। হঠাৎ তার কানে আওয়াজ গেলো—খড় খড়।

কর্তা দেখলো, একটা মেঠো ইঁদুর মাটিতে গর্ত খুঁড়ছে। কর্তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেলো। মাটিতে কান দিয়ে, ইঁদুরের গর্ত তৈরি করা দেখে তার মাথায় চমৎকার একটা গানের প্রথম লাইন গুন গুন করে উঠলো :

খোঁড়ে খড়র খড়র,

কর্তা এবার লাইনটা মনে রাখবার জন্য বার বার সাধতে লাগলো "খোঁড়ে খড়র খড়র।"

তারপর ওখান থেকে উঠে আরও কিছুটা পথ হাঁটার পর কর্তা একটা সাপকে সর সর শব্দে চলে যেতে দেখলো। সাপের এই আওয়াজ কানে পৌঁছতেই তার মাথায় গানের দ্বিতীয় লাইনটা দুম করে এসে গেলো

সরে সড়র সড়র

এবার কর্তা দুটো লাইন একসঙ্গে গুন গুন করে গাইতে লাগলো :

খোঁড়ে খড়র খড়র
সরে সড়র সড়র।

বিনা পয়সায় দু'লাইন গান সংগ্রহ হয়েছে ভেবে কর্তার মনে খুশির হাওয়া বইছে।

আরও একটু পথ এগোবার পরে ছোট ঝোপের মধ্যে কর্তা একটা খরগোশ দেখতে পেলো। খরগোশটাকে পাকড়াও করবার জন্যে কর্তা এমন একটা ফাঁদ পেতে ফেললো যে, খরগোশটা ঝোপ থেকে পালাবার পথ খুঁজে পায় না।

খরগোশের এই অবস্থা দেখে কর্তার মাথায় গানের তৃতীয় লাইন গুন গুন করে উঠলো :

দেখে টগর মগর।

যেমনি এই লাইনটা সুর করে গেয়েছে কর্তা, অমনি খরগোশটা ছুটে পালালো।

কর্তা তখন গানের তিনটি লাইন ভাঁজতে ভাঁজতে আরও একটু এগিয়ে দেখতে পেলো কয়েকটা হরিণ এদিক-ওদিক ঝাঁপাঝাঁপি করছে। হরিণের এই দৃশ্য দেখেই চতুর্থ লাইনটা ঝপাং করে কর্তার মাথায় এসে গেলো :

ঝাঁপায় আলং ফালং

কর্তার ফুর্তি এখন আর ধরে না। একটি আধলা খরচ না করে পুরো একখানা গান জোগাড় হয়েছে। মনের সুখে সে গাইতে লাগলো :

খোঁড়ে খড়র খড়র
সরে সড়র সড়র
দেখে টগর মগর
ঝাঁপায় আলং ফালং।

এই গান গাইতে-গাইতে কর্তা যখন বাড়ি ফিরে এলো তখন ভর সন্ধ্যা। বোকা বউ সেই কখন থেকে পথ চেয়ে দরজার কাছে বসে ছিল।

স্বামীকে দেখে বউ আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। চিৎকার করে উঠলো, "আমার গান কই?"

কর্তা ভারিক্কি চালে উত্তর দিলে, "একটু অপেক্ষা করো।"

বোকা বউ বললো, "না আমি এক মিনিট অপেক্ষা করতে পারছি না। আমার গান কই?"

কর্তা এবার গম্ভীরভাবে বউকে বললো, "গানটা এতোই ভাল যে দাম বেশি পড়ে গেলো। পাঁচ টাকার একটি পয়সা কমে দিলো না। যা টাকা তুমি দিয়েছিলে সব খরচ হয়ে গেলো।"

বউয়ের মনেও খুব আনন্দ। বললো, "ভাল জিনিস কিনতে হলে একটু খরচ বেশী পড়বেই তো।"

কর্তা হেসে এবার বউকে বললো, "তাহলে গানটা নিয়ে নাও। এতো দামী গানটা যেন আবার ভুলে বোসো না।" বলে কর্তা গান ধরলো।

গিন্নীর আনন্দ তো ধরে না। কর্তার কাছ থেকে কয়েকবারেই সে গানটা রপ্ত করে নিলো। মনের আনন্দে ভাবতে লাগলো ভোর হোক, তারপরে ধানভানার

সময় পাড়ার অন্য সমস্ত বউদের তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে।

বোকা বউয়ের মনে এতো আনন্দ হয়েছে যে তর সইবার অবস্থা নেই তার। তখন তো আর ঘড়ি ছিল না। দুপুর রাতের একটু পরেই বোকা বউ ভাবলো ভোর হয়ে এসেছে। সে এবার জাঁতায় গম ভাঙতে শুরু করলো।

এমনই কপাল, সে রাত্তিরে কয়েকটা চোর এসেছে বাড়িতে চুরি করতে। মাটির দেওয়ালে সিঁদ কেটে তারা যেমন গর্ত করেছে ঠিক সেই সময় বোকা বউ গানের প্রথম কলিটা গাইতে শুরু করলো :

খোঁড়ে খড়র খড়র।

চোররা ভাবলো বউ এমনিই বোধ হয় কোনো গান করছে। কিন্তু যেমনি তারা খুব সাবধানে গর্তর মধ্য দিয়ে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টা করলো অমনি দ্বিতীয় লাইনটা তাদের কানে গেলো :

সরে সড়র সড়র।

একেবারে অন্ধকার রাত্রি। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু চোররা বুঝতে পারছে না, বাড়ির বউ সত্যিই তাদের দেখে ফেলেছে কিনা। তারা খুব সাবধানে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। ঠিক সেই সময় গানের তৃতীয় লাইনটা বউ গেয়ে উঠলো :

দেখে টগর মগর।

বাড়ির বউয়ের নজরে যে তারা পড়ে গিয়েছে সে সম্বন্ধে সিঁদেল চোরদের মনে এবার কোনো সন্দেহ রইলো না। চুরি তো দূরের কথা, এখন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতেই তারা অস্থির হয়ে উঠলো। ধরা পড়বার ভয়ে তারা পাঁচিলে উঠে ঝাঁপ দিলো। ঠিক সেই সময়। বোকা বউ মনের আনন্দে গেয়ে উঠলো :

ঝাঁপায় আলং ফালং।

গান নিয়ে বোকা বউ এমন ডুবে ছিল যে চোরদের ব্যাপারটা তার নজরেই আসে নি।

কর্তা বিছানা থেকে উঠে দেখলো, আজ অন্য দিনের তুলনায় অনেক আগে গিন্নীর জাঁতা ভাঙা, ধান কাটা শেষ হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় সিঁদ-কাটা দেওয়ালের দিকে কর্তার নজর পড়ে গেলো। সর্বনাশ। চোর ঢুকেছিল। নিশ্চয় সর্বস্ব নিয়ে পালিয়েছে তারা। কর্তা এবার আর্তনাদ করে উঠলো।

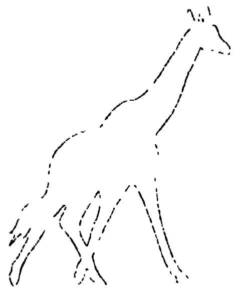
সঙ্গে সঙ্গে কর্তা-গিন্নী দুজনে মিলে ঘরদোর তন্ন-তন্ন করে দেখলো। চোর ঢুকেছিল কিন্তু জিনিসপত্তর কিছুই নেয় নি।

সিঁদ কেটে চোর ঢুকলো অথচ কিছুই নিলো না, এমন তো বড় একটা হয় না। চিন্তিত কর্তা এইবার বোকা বউকে জিজ্ঞেস করলো, "গভীর রাতে তুমি কী করছিলে?"

বউ বললো, "সময় বুঝতে না পেরে মাঝরাতে উঠে পড়েছিলাম। আমি তখন থেকেই তোমার কিনে আনা নতুন গানটা প্রাণ খুলে অভ্যাস করছিলাম। অত দামী গান, পুরো ব্যবহার না-করলে চলবে কেন?"

ব্যাপারটা এবার কর্তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে কর্তা বললে, "গিন্নি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো? তোমার গান এতই কড়া হয়েছে যে চোরের সাধ্য হয় নি চুরি করার।"

বোকা বউয়েরও আনন্দ ধরে না। স্বামীর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে সে বললো, "সত্যি খুব সুন্দর পছন্দ তোমার। বাজারের সেরা গানটাই আমার জন্যে তুমি কিনে এনেছো।"



দুই ভাই ও এক বোন এবার মনের আনন্দে কোরাস শুরু করেছে ঃ

খোঁড়ে খড়র খড়র
সরে সড়র সড়র
দেখে টগর মগর
ঝাঁপায় আলং ফালং।

শিবাজী সেই সঙ্গে টেবিলে তবলা বাজাচ্ছে আপন মনে। ছোটমামাও ভাগ্নে-ভাগ্নীদের কাণ্ড দেখে মজা পাচ্ছেন।

তিলক বললো, "বোকা বউয়ের গানটা মন্দ নয়, মামা। ভাল করে সুর দিয়ে গাইলে হিট গ্রামোফোন রেকর্ড হয়ে যাবে।"

"খারাপ কেন হবে? গাছপালা, নদনদী, পশুপাখী দেখেই তো আদিম যুগের মানুষ নাচ গানের আইডিয়া পেতো," ছোটমামা বললেন।

বুলবুল এখন খুব খুশী। সে বললো, "গপ্পোটা আমার খুব ভাল লেগেছে

ছোটমামা। কোনো খুনোখুনী নেই, কারও ফাঁসী হয় নি, কাউকে জন্তু জানোয়াররা খেয়ে নেয় নি, কোনো রাজকন্যাকে বনবাসে পাঠানো হয় নি। চোরগুলো পর্যন্ত কী মিষ্টি! কী মিষ্টি! পাঁচিল থেকে লাফ দিতে গিয়ে যে ঠ্যাং ভাঙে নি এই যথেষ্ট।"

ছোটমামা আবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। কখন যে এদের মায়েরা ফিরবে!

এদিকে গল্পের নেশা ধরে গিয়েছে ছেলেমেয়েদের। শিবাজী বললো, "ছোটোমামা, প্লীজ, আর একটা গপ্পো শোনাও। সত্যি গল্প হওয়া চাই কিন্তু।"

ছোটমামা বললেন, "আমরা যেসব গপ্পো সংগ্রহ করি সব সত্যি। বিশ্বাস না হলে গ্রামের লোকদের জিজ্ঞেস করোগে যাও। গ্রামের লোকরা বলবে, সত্যি ঘটনা না-হলে আমার ঠাকুর্দা এ-ঘটনা মনেই রাখতেন না। ঠাকুর্দা আবার ব্যাপারটা শুনেছিলেন তাঁর ঠাকুর্দার কাছে। তখন তো কোনো জিনিসে ভেজাল দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না—গল্পও ছিল সেন্ট পার্সেন্ট খাঁটি সত্যি!"

ছোটমামার কথা মন দিয়ে শুনছে শিবাজী, তিলক ও বুলবুল। বুলবুল রিকোয়েস্ট করলো, "এবারেও কিন্তু মজার গপ্পো হওয়া চাই, ছোটমামা।"

ছোটমামা কিছুতেই বুলবুলের কথা ফেলতে পারেন না। হেসে বললেন, "বেশ, তাহলে এবার একটা মধ্যপ্রদেশী উপকথা শোনো। ছত্রিশগড়ে কাজ করতে গিয়ে সেবার তোমাদের নতুন মামীমা এক গ্রাম থেকে ঘটনাটা সংগ্রহ করেছিল। আমি চিত্রলেখার মুখেই গল্পটা শুনেছি।

দুই ভাগ্নে ও এক ভাগ্নী অধীর কৌতূহলে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। গল্পের নেশায় তারা ক্ষিদে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

মামা বললেন, "বুলবুল য' চাইছে তাই হবে। এই গল্পে কেউ কোনো কষ্ট পাবে না—একটাও খুনখারাপী থাকবে না। চুরি একটা আছে—তবে সেটাও খুব মজার চুরি। চোর ধরা পড়েও ধরা পড়বে না। এমন মজা আজকালকার সিনেমা, নাটকে, উপন্যাসে কোথাও পাওয়া যায় না, এইটা তোমাদের নতুন মামীমার অভিমত।"

মামা আবার শুরু করলেন ঃ

অ-নে-ক দিন আগে এক গ্রামে বিরাট ধনী এক ব্যবসাদার ছিলেন। খুব সুখের সংসার এই বিজনেসম্যানের। চারটি ছেলে এই ভদ্রলোকের—চারজনেই খুব বুদ্ধিমান।

ছেলেরা সাবালক হতেই ব্যবসাদার অনেক ভেবেচিন্তে এক মতলব আঁটলেন।

"সাবালক কী জিনিস মামা?" বুলবুল সরল মনে জিজ্ঞেস করলো।

"ভাল বাংলায় যাকে বলে কিনা প্রাপ্তবয়স্ক। যখন কেউ ছোট থাকে তখন আমরা বলি নাবালক। আমাদের দেশে আঠারো বছর হলেই সাবালক। তখন সে নিজেই অভিভাবকের তদারকী ছাড়াই ব্যবসা-বাণিজ্য ও নানা দায়িত্বের কাজ করতে পারে।"

"আমরা তা হলে নাবালক?" শিবাজী জিজ্ঞেস করলো। "আমাদের উচিত অভিভাবকদের কথা শুনে চলা।"

'ইয়েস," উত্তর দিলেন ছোটমামা। "তবে বুলবুলের ক্ষেত্রে কথাটা হবে 'নাবালিকা'।"

"অ্যাঁ! না-বালিকা—তার মানে আমি বালিকা নই!" প্রতিবাদ করে উঠলো বুলবুল।

"অবশ্যই তুমি বালিকা," ছোটমামা হেসে ফেললেন। "মূল কথাটা ফার্সী: নাবালিগ্। এর সঙ্গে বালক-বালিকার কোনো সম্পর্ক নেই।"

ছোটমামা আবাব শুরু করলেন—"যা বলছিলাম। গ্রামের সেই ব্যবসাদার, ছেলেরা সাবালক হওয়া মাত্রই তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিলেন। বড় ছেলেকে দিলেন তাঁর তেজাবতীর কারবার।

"তেজারতী কী জিনিস মামা?" শিবাজী এই অদ্ভুত শব্দটা আগে কখনও শোনে নি।

মামা হেসে উত্তর দিলেন, "তোমরা যদি কিছুদিন গ্রামে থাকতে তা হলে এই প্রশ্ন করতে না। গ্রামের অশিক্ষিত লোকরাও জানে তেজারতী মানে সুদে টাকা খাটানোর ব্যবসা। গ্রামের লোকদের বিপদ-আপদ লেগেই আছে, তখন গয়নাগাটি, বিষয়-সম্পত্তি জমা রেখে টাকা ধার করতে হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ধার শোধ না হলে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়।

"সেকালের ব্যাঙ্কার? তাই না মামা?" শিবাজী জিজ্ঞেস করলো। ওর জানবার কথা, কারণ বড়কাকা ব্যাঙ্কে চাকরি করেন।

"ঠিক বলেছো," উত্তর দিলেন ছোটমামা। "বুড়ো ব্যবসাদার বড় ছেলেকে এই ব্যাঙ্কিং ব্যবসাটি দিয়ে দিলেন। মেজ ছেলেকে দিলেন বিরাট ধান, চাল, ডাল, তেলের আড়ত। সেজকে বললেন, তুমি আমার কাপড়ের আড়তটা নাও। আর ছোট ছেলে পেলো বাবার সমস্ত চাষের জমিজমা। অনেকদিন ধরে খুব দেখাশোনা করে মোটা দাম দিয়ে ব্যবসাদার এ-অঞ্চলের সেরা চাষের জমিগুলো কিনেছেন।

চার ছেলেই খুব কাজের। বাবার বিষয়-সম্পত্তি পেয়ে অনেকে কুঁড়ে হয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যবসাদার দেখলেন, ছেলেরা দায়িত্ব পেয়ে আগের থেকে অনেক বেশি পরিশ্রম করছে। তাদের চেষ্টায় ব্যবসা এবং চাষের উন্নতি হতে লাগলো।

বুড়োর বয়স আরও বাড়ছে। শরীরও তেমন ভাল নয়। একদিন চার ছেলেকে তিনি নিজের ঘরে ডাকলেন। বললেন, "মনে হচ্ছে, ওপার থেকে আমার ডাক আসতে দেরি নেই। আমার খুব ইচ্ছে তোমরা চার ভাই মিলেমিশে থাকো—এতে তোমাদেরই লাভ হবে। নিজেদের মধ্যে কিছুতেই সম্প্রীতি নষ্ট কোরো না। আর আমার মৃত্যুর পর এই চারপায়া সরিয়ে তোমরা একসঙ্গে খোঁজাখুজি কোরো—চারটে অমূল্য পাথর এখানে লুকনো আছে—তোমরা চারজনে এক-একটা করে নিও।"

বাবার মৃত্যুর পরে চার ভাই একদিন ঘরের চারপায়া সরিয়ে দামী পাথরের খোঁজ আরম্ভ করলো। ঝটপট তিনটে বহুমূল্য পাথর উদ্ধার হলো; কিন্তু চতুর্থ পাথরের খোঁজ নেই। অনেকক্ষণ ধরে খোঁড়াখুঁড়ি হলো—কোনো ফল হলো না।

চার ভাই তখন বললো, "বেশ কঠিন অবস্থায় পড়া গেলো। আমরা চারজন ছাড়া পাথরের খবর কেউ জানতো না। কিন্তু পাথর চুরির সন্দেহে আমরা নিজেদের মধ্যে ভাল সম্পর্ক নষ্ট করতে চাই না। বাবা তাহলে স্বর্গে গিয়েও সুখী হবেন না।"

চার ভায়ের মধ্যে এ-বিষয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হলো। শেষে তারা সবাই মিলে ঠিক করলো এমন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্যে রাজার দ্বারস্থ হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ! সুবিচারের জন্য সেদেশের রাজার তখন খুব সুনাম।

রাজার প্রাসাদ গ্রাম থেকে বহুদূরে—তবু চার ভাই অনেক কষ্ট স্বীকার করে কয়েকদিন ধরে হাঁটতে-হাঁটতে অবশেষে রাজসভায় হাজির হলো।

চার ভাই যথাসময়ে রাজার সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো। রাজা মুখ তুলে তাকাতেই তারা একটি হিন্দী ছড়া সুর করে গাইতে শুরু করল ঃ

মাল পায়ে আপনো চোর না জানিও যায়ে
প্রীত-রীত দিন দিন বাঢ়ে, কি যে সোই উপায়ে।

মহারাজ, আপনার সুবিচারের সুখ্যাতি সকলেই করে, আমরা চুরি হয়ে যাওয়া মানিক ফেরত চাই, কিন্তু চোরের নাম কোনোক্রমেই জানতে চাই না। মহারাজ এমন একটা ব্যবস্থা করুন যাতে আমাদের চার ভায়ের সম্পর্ক দিন দিন

আরও ভাল হয়।

রাজা একটু অবাক হলেন। চোরাই মাল ফেরত চায় অথচ চোরের নাম জানতে চায় না এমন কেস তিনি কখনও করেন নি। মৃদু হেসে রাজা বললেন, "আপনারা পথশ্রান্ত। এখন রাজ-অতিথি-শালায় গিয়ে বিশ্রাম করুন। আগামীকাল আপনাদের মামলার বিচার করবো।"

খোদ রাজ-অতিথিশালা। সেখানে আদর-আপ্যায়নের এলাহি আয়োজন। রাজার নিজস্ব প্রতিনিধি ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই চারজনের দেখা-শোনা করছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও প্রচুর।

কিন্তু গালিচায় বসে রুপোর থালা থেকে খেতে-খেতে বড়ভাই বললো, "রাজার অতিথি আমরা, বলাটা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু এই যে পিঠে খাচ্ছি তার ময়দায় রক্ত মিশেল হয়েছে।"

মেজভাই বললো, "কথাটা যখন উঠেছে তখন বলতেই হচ্ছে, পচা ঘি-তে পিঠে ভাজা হয়েছে।"

সেজভাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলে, "পিঠের দুধটাও খাঁটি নয়। এর মধ্যে মানুষের দুধও রয়েছে।"

"রুপোর থালার ওপরে যে কলাপাতা বিছানো হয়েছে তাতে গোবরেব গন্ধ!" ছোটভাই এবার নাক কুঁচকিয়ে অন্য ভাইদের বললো।

রাজার একজন গুপ্তচর এই সব কথা শুনছিল। সে যথাসময়ে রাজার কানে চার ভায়ের কথা তুলে দিলো।

মহারাজা তো ভীষণ চটে গেলেন। খোদ রাজ-অতিথিশালার খাবারের সমালোচনা। তিনি চার ভাই এবং খাস ভাণ্ডারিকে ডেকে পাঠালেন। এত বড় অপমানের শাস্তি দেবার আগে ব্যাপারটা তিনি নিজে একটু বুঝে নিতে চান।

চার ভাইকে সামনে দাঁড় করিয়ে রাজা জানতে চাইলেন, "রাজ অতিথিশালার খাবার-দাবার সম্বন্ধে আপনারা যেসব মন্তব্য করেছেন তা কি ঠিক?"

বড়ভাই বুঝলো রাজা বেশ চটে উঠেছেন, ভালভাবে প্রমাণ না দিতে পারলে প্রাণ বিপন্ন হতে পারে। একটু ভেবে নিয়ে বড়ভাই বললো, "মহারাজ, আপনি যখন এ-বিষয়ে জানতে আগ্রহী হয়েছেন তখন ব্যাপারটা সম্বন্ধে ভালভাবে তদন্ত হোক।"

রাজা হুকুম করলেন তাই হোক।

প্রথমে ডাকা হলো সেই আড়তদারকে যে রাজপ্রাসাদে ময়দা সাপ্লাই করে। ঠক ঠক করে কাঁপতে-কাঁপতে রাজাকে প্রণাম জানিয়ে সে বললো, "ধর্মাবতার,

আমি কিছুই জানি না। এই গম আমি কিনেছিলাম এক চাষির কাছ থেকে।"

চাষীর নাম ঠিকানা নিয়ে রাজার পেয়াদা ছুটলো সেই গ্রামের দিকে চাষীকে ধরে আনতে।

চাষী এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো রাজাকে। সমস্ত অভিযোগ শুনে সে বললো, 'মহারাজ, আমি আপনার সামনে মিথ্যাচারী হবো না। যখন গম কাটা হচ্ছিল তখন একটা বন্যবরাহ ওইখানে হাজির হয়েছিল।"

"হোয়াট ইজ বন্যবরাহ?" জিজ্ঞেস করলো তিলক।

বাংলায় এক্সপার্ট বুলবুল বললো, "বুনো শুয়োর। হিন্দুরা খুব খেতো এককালে।"

"বাঃ।" ছোটমামা প্রশংসা করলেন। তারপর আবার শুরু করলেন গল্প—

"চাষী স্বীকার করলো, "মহারাজ, সেখানে গম ডাঁই করে রেখেছিলাম তার ওপরেই আমি বন্যবরাহকে মেরে ফেলি। মহারাজ, আমি আপনার ক্ষমা ভিক্ষা করছি, যে গম-গুলোর ওপর বরাহ-রক্ত পড়েছিল সেগুলো সরিয়ে ফেলা সম্ভব হয় নি।"

বিস্মিত রাজা নিজের কানেই শুনলেন, বড়ভাই যা মন্তব্য করেছিল তা মিথ্যে নয়।

এবার ঘি-ওয়ালার পালা। চোখের সামনে চাষীর অবস্থা দেখে সে আর মিথ্যে বলতে সাহস করলো না। সে সরাসরি স্বীকার করলো, এক ঝাড়ুদারের কাছ থেকে সে কমদামে ঘি সংগ্রহ করেছিল। এই ঝাড়ুদার যে এঁটো পাতা থেকে ঘি সংগ্রহ করেনি এমন গ্যারান্টি নেই।

ঘি এর খরবরটা পেয়ে রাজার লজ্জার অবধি নেই। খোদ রাজপ্রাসাদেই খাবার-দাবার নিয়ে এইরকম কাণ্ড চলতে পারে তা তিনি ভাবেন নি।

এবার যে দুধ দেয় সেই গোয়ালাকে ডেকে পাঠানো হলো।

প্রতিদিন কয়েক সের খাঁটি দুধ দেওয়ার কথা, তাতে মানুষের দুধের গন্ধ কি করে হবে?

মুখ কাঁচুমাচু করে মাথা চুলকে গোয়ালা বললো, 'মহারাজ, এরকম আর কখনও হবে না, এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করুন। গোয়ালিনী তার কোলের ছেলেটিকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিল। আমি সেই সময় দুধের ঘটিটা তার খুব কাছে রেখেছিলাম। ছেলেটি আচমকা পাশ ফেরার চেষ্টা করায় গোয়ালিনীর বুকের দুধ কয়েক ফোঁটা দুধের ঘটিতে পড়ে যায়। আমি ভগবানের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, এমন অঘটন আর কখনও ঘটবে না।"

যে কলাপাতা সরবরাহ করে তার ডাক পড়লো এবার। সে বুঝলো পরিস্থিতি মোটেই সুবিধের নয়, তাই হাঙ্গামা না বাড়িয়ে সত্যি কথা স্বীকার করলো, "মহারাজ গোবর জলেই পাতা ধোয়া হয়েছিল—কাছাকাছি পাতকুয়োর জল ছিল না।"

চার ভাই যা বলেছে তা অক্ষরে-অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হতে দেখে রাজা এবং তাঁর সভাসদরা বিস্মিত হলেন।

রাজা কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "আপনাদের মতো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বুদ্ধিমান লোক সংসারে বেশি নেই। আপনারা বরং ধরমপুরের রাজার কাছে যান। উনি খুবই বিচক্ষণ নরপতি—হয়তো আপনাদের সাহায্য করতে পারবেন।"

অতিথিশালা থেকে বিদায় নিয়ে পরের দিন চার ভাই ধরমপুরে হাজির হলো। যথাসময়ে রাজদর্শন হলো এবং চার ভাই তাঁদের সমস্ত ঘটনা রাজার কাছে নিবেদন করলে। তারপর তারা এক সঙ্গে করজোড়ে ধরমপুরের রাজাকে বললো, "মহারাজ, এমনভাবে বিচার করে দিন যাতে আমাদের ভায়ে-ভায়ে সম্প্রীতি নষ্ট না হয়।"

ছোটভাই তো সেই হিন্দী গানটা আবার গেয়ে ফেললো ঃ

মাল পায়ে আপনো চোর না জানিও যায়ে
প্রীত-রীত দিন দিন বাঢ়ে, কি যে সোই উপায়ে।

ধরমপুরের রাজা ঠিক করলেন, এদের বুদ্ধির দৌড়টা একবার পরীক্ষা করে নেওয়া যাক। রাজসিংহাসনের তলা থেকে একটা মাটির ভাঁড় বার করলেন তিনি। বললেন, "এই ভাঁড়ের মুখ বন্ধ। কিন্তু বলুন তো এর ভিতর কি আছে?"

বড়ভাই ভাঁড়টা নিজের হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করলো। তারপর বললো, "এর ভিতর কোনো গোল জিনিস আছে।"

ভাঁড়টা এবার মেজভায়ের হাতে দেওয়া হলো। কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে বললো, "ঠিকই। ভিতরের জিনিসটা গোল এবং তার রং লাল।"

সেজভাই এবার ভাঁড়টা নিয়ে নড়াচাড়া করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরে সে বললো, "এই লাল এবং গোল জিনিসটার ভিতরে বিচি আছে।"

ছোটভাই এবার ভাঁড়টা হাতে নিয়ে মন্তব্য করলো, "বলবার কি আছে মহারাজ? ভাঁড়ের মধ্যে নিশ্চয় একটা ডালিম আছে।"

রাজার মন্তব্যের জন্যে অপেক্ষা না-করে সে এবার ভাঁড়টা ভেঙে ফেললো এবং একটা রাঙা টুকটুকে গোল ডালিম বেরিয়ে এলো।

চার ভায়ের বুদ্ধি দেখে রাজা খুব খুশী হলেন। কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, "আপনারা যে রহস্য নিয়ে এসেছেন তার সমাধান আমার পক্ষে সম্ভব নয়। চোরাই মাল ধরা পড়বে, অথচ কে চোর তা আপনাদের জানানো যাবে না, এ কী করে সম্ভব তা আমার মাথায় আসছে না। আপনারা বরং ধারানগরীতে চলে যান।"

অগত্যা চার ভাই ধারানগরীর উদ্দেশে রওনা হলো। ধরমপুর থেকে ধারানগরীর পথ অনেকখানি।

ধারানগরীতে পৌঁছে চার ভাই অনেক খবরাখবর জোগাড় করলো। স্বর্ণগড়ের রাজকুমারী এই ধারানগরীকে ভারত বিখ্যাত করে তুলেছেন। একটি পর্দার আড়ালে বসে স্বর্ণগড়ের এই সুন্দরী সমস্ত লোকের সমস্যা শোনেন এবং বিচার করেন। তাঁর বিচারের খ্যাতি ইতিমধ্যেই দূরদূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

বুলবুল বললো, "মামা, তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ভারতেও মহিলা জজ ছিলেন এবং তাঁরা খুব ভাল কাজ করতেন।"

"ঠিক বলেছো বুলবুল," মামা সায় দিলেন। "দেখা যাচ্ছে, মেয়ে জজের এমন সুনাম যে অন্য দেশের লোকরাও সেখানে বিচার-প্রার্থী হয়ে আসতে সংকোচ বোধ করতেন না। আর একটা মজার জিনিস লক্ষ্য করো। জায়গাটার নাম ধারানগরী—তোমরা তো জানো এখনও আমাদের প্রত্যেকটা আইন কতকগুলো ধারায় বিভক্ত। নিয়ম, পদ্ধতি, রীতি এবং আইনের ক্রমিক বিধিকেই ধারা বলে।

রাজপ্রাসাদের অলিন্দে বসে স্বর্ণগড়ের রাজকুমারী বিচার করতেন। তোমরা অলিন্দ বোঝো তো? ঝুল-বারান্দা, ইংরিজীতে যাকে ব্যালকনি বলে!

রাজপ্রাসাদের প্রধান দ্বারে বিরাট একটা দুন্দুভি থাকে! যদি কেউ বিচারপ্রার্থী হতে চায় তবে তাকে ওই দুন্দুভি বাজাতে হবে। আওয়াজ পেয়েই ধারানগরীর সুন্দরী রাজকুমারী অলিন্দে এসে বসবেন এবং পর্দার আড়াল থেকে সমস্ত অভিযোগ শুনবেন।

এবারও বিরাট দুন্দুভি জলদগম্ভীর সুরে বেজে উঠলো এবং রাজকুমারী অলিন্দে উপস্থিত হলেন।

চার ভাই তখন নিজের সমস্যার কথা সবিস্তারে রাজকুমারীকে জানালো এবং বললো, "হে রাজনন্দিনী, আমরা ওই রহস্যময় চতুর্থ পাথরটি ফিরে পেতে আগ্রহী; কিন্তু কে চোর তা কিছুতেই জানতে চাই না। আমাদের ভাইদের মধ্যে যাতে প্রীতির বন্ধন দিন দিন বাড়ে তার জন্য আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থী।"

রাজকুমারী মন দিয়ে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "বড় কঠিন দায়িত্ব। বিচারের ভার আপনারা আমার ওপর দিয়েছেন কিন্তু এখনই আমি রায় দিতে পারবো না। অনুগ্রহ করে আপনারা আন্তত এক পক্ষ কাল এখানে থেকে যান।"

"পক্ষ মানে কতো?" জিজ্ঞেস করলো তিলক।

"দুই পক্ষে এক মাস," বুঝিয়ে দিলেন ছোটমামা। "শুক্লপক্ষ, কৃষ্ণপক্ষ কথা দুটো নিশ্চয় তোমাদের শোনা আছে?"

নিজেদের কাজকর্মের অনেক ক্ষতি হবে। কিন্তু উপায় নেই—চার ভাই এক পক্ষকাল ধারানগরীতে থাকতে রাজী হয়ে গেলেন।

তখন রাজকুমারী চার ভাইকে বললেন, "এই কটাদিন কিন্তু আলাদা-আলাদা থাকতে হবে—আপনারা কেউ কারও সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবেন না। আমার গুপ্তচররা কিন্তু আপনাদের ওপর নজর রাখবে। হারানো মানিক খুজে পাওয়া মাত্রই আবার আপনাদের দেখাসাক্ষাৎ হবে।"

পরের দিন রাজকুমারী প্রথমে বড়ভাইকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, "আপনাকে একটা গল্প শোনাতে চাই।"

"সে তো আমার সাতজন্মের সৌভাগ্য। স্বয়ং রাজকুমারীর শ্রীমুখে গল্প শোনার সুযোগ ক'জনের হয়?" বড়ভাই বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন।

রাজকুমারী তখন গল্প শুরু করলেন—

"এক দেশে এক রাজা ছিল। রাজপুত্রের সঙ্গে সবচেয়ে ভাব ছিল দেওয়ানপুত্রের। দু'জনে একসঙ্গে খেলাধুলো করে, একসঙ্গে শিকারে যায়, একসঙ্গে দিনের পর দিন গল্পে মেতে থাকে। বন্ধুতে বন্ধুতে এতো ভাব শোনা যায় না। দু'দিন দেখা না-হলে দু'জনেই ছটফট করে।

একবার এই দুই বন্ধু নিজেদের মধ্যে ঠাট্টা তামাসা করতে করতে অদ্ভুত এক প্রতিজ্ঞা করে বসলো। রাজকুমার বললো, "যে আমাদের মধ্যে প্রথমে বিয়ে করবে, ফুলশয্যার রাত্রে সে তার বউকে বন্ধুর কাছে পাঠিয়ে দেবে।"

দেওয়ানপুত্রও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসলো, "অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি রাজি।"

ভাগ্যচক্রে কিছুদিন পর রাজকুমারের বিয়ের ব্যবস্থা হলো। পরমাসুন্দরী এক রাজকন্যাকে ভিন দেশ থেকে বিয়ে করে নিয়ে এলো রাজপুত্র।

ফুলশয্যার রাত্রে রাজকুমারের হঠাৎ বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ে গেলো। কথার খেলাপ হওয়াটা মোটেই ভাল কথা নয়। রাজপুত্র ভাবনায় পড়ে গেলেন।

রাজকুমারকে গম্ভীর দেখে নববধূ জিজ্ঞেস করলো, "তোমাকে এতো চিন্তিত

দেখাচ্ছে কেন?"

একটু দ্বিধার পর রাজকুমার তাঁর প্রতিশ্রুতির কথা স্ত্রীকে বললেন।

নববধূ সব শুনে স্বামীকে বললেন, "চিন্তার কিছু নেই। তুমি যখন কথা দিয়েছো তখন তার সম্মান আমাকে রাখতেই হবে।"

গভীর রাত্রে স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুন্দরী রাজকন্যা ঝলমলে কাপড় পরে দেওয়ানপুত্রের নিবাসের দিকে একাকিনী রওনা হলেন।

পথ জনহীন। কোথাও কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। পথের প্রান্তে কয়েকটি দুর্ধর্ষ ডাকাত অপেক্ষা করছিল। মূল্যবান সব অলংকার পরা রাজকন্যাকে একাকিনী দেখে দুর্বৃত্তরা আর লোভ সংবরণ করতে পারলো না। ডাকাতদের একজন এগিয়ে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো। বললো, "যা কিছু মূল্যবান জিনিস আছে তা আমরা কেড়ে নেবো।"

রাজকন্যা তখন সরল মনে ডাকাতসর্দারকে বললো, "আপনি আমার বাবার মতো! স্বামী প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তাই তার সম্মান রক্ষা করতে ফুলশয্যার রাতে স্বামীর বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। এখন আমার অলঙ্কার খোয়া গেলে মুশকিলে পড়বো। আপনারা এখানে অপেক্ষা করুন। ফিরবার পথে আপনারা যা-যা চাইবেন আমি দিয়ে দেবো।"

অন্য দস্যুরা রাজকন্যার কথায় বিশ্বাস করতে পারছিল না—এতোগুলো অলঙ্কার কেড়ে নেবার সুযোগ ছাড়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। কিন্তু ডাকতসর্দার কী ভেবে রাজকন্যাকে যাবার অনুমতি দিলো। কিন্তু বলে দিলো, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরবে। আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করবো।"

রাজকন্যা এবার কোনোক্রমে দেওয়ানপুত্রের বাড়ি পৌঁছে তার শোবার ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিতে লাগলো। দেওয়ানপুত্রও সেদিন ঘুমোয় নি। রাজপুত্র ফুলশয্যার রাতে তার কথা রক্ষা করে কিনা দেখবার জন্য সে অপেক্ষা করছিল। আওয়াজ শুনেই সে দরজা খুলে দিয়ে, রাজকন্যাকে সাদরে বললো, "এসো বোন এসো। তোমার জন্যেই আমি বসে আছি।"

নতুন বোনের জন্য নানা উপহার কিনে রেখেছিল দেওয়ানপুত্র। সেইসব অলঙ্কার পরে নিলো রাজকন্যা। তারপর একটু মিষ্টিমুখ করে নিঃশব্দে আবার একাকী পথে বেরিয়ে পড়লো।

মাঝপথে এসে ডাকাতদের কথা মনে পড়ে গেলো রাজকন্যার। দূর থেকে সে দেখলো তখনও তারা পথের ধারে অপেক্ষা করছে।

অন্য পথ ধরে গেলে সে ডাকাতদের এড়িয়ে যেতে পারতো। কিন্তু কথা দিয়ে গেছে সে। তাই ডাকাতদের কাছেই ফিরে গিয়ে বললো, "কাজ শেষ করে আমি ফিরে এসেছি। এবার আপনারা আমার কাছ থেকে যা নিতে চান নিন।"

প্রকয়েকজন ডাকাত দেখলো রাজকন্যার গায়ে অলঙ্কারের পরিমাণ আরও বেড়েছে। লোভে তাদের চোখ চকচক করতে লাগলো। এতো দামী দামী গয়না লুঠের সুযোগ জীবনে ক'বার আসে?

কিন্তু ডাকাতসর্দারের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াতে শুরু করেছে। মেয়েটির সরলতায় তার পাষাণ হৃদয় গলে গিয়েছে। সে বললো, "না মা, তুমি যেমনভাবে এসেছো তেমনভাবে স্বামীর কাছে ফিরে যাও। তুমি যে আমাকে বাবা বলেছো।"

যাবার আগে ডাকাতসর্দার মেয়েটিকে একটি সোনার মোহর উপহার দিলো।

রাজকন্যা বাড়ি ফিরে এসে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে রাজপুত্রকে বর্ণনা করেছিল। সব শুনে রাজপুত্র অবশ্যই খুব খুশী হয়েছিল!"

এই পর্যন্ত বলে ধারানগরীর রাজকুমারী চুপ করলেন। বড়ভায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "এখন আপনার কিছু কাজ আছে। শুনেছি আপনি খুব বুদ্ধিমান। আপনি বলুন, এই রাজপুত্র, রাজকন্যা, ডাকাসতর্দার ও দেওয়ানপুত্র সম্বন্ধে আপনার ধাবণা কী?"

বড়ভাই খুব মন দিয়ে গল্পটা শুনেছে। সে আরও একটু চিন্তা করলো, তারপর বললো, "এরা চারজনই খুব সৎ মানুষ। সৎ মানুষ না হলে রাজপুত্র তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন না—কত লোক তো কত প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু ক'জন তা শেষ পর্যন্ত মান্য করে? এ-ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি না রাখলে কিছুই হতো না, তবু রাজপুত্র তা রেখেছেন।

রাজকন্যার ভূমিকাটিও অতি সুন্দর। স্বামী কথা দিযেছেন তাই তার মর্যাদার কথা ভেবে সে এই শর্ত হাসিমুখে মেনে নিয়ে স্ত্রীর যোগ্য কাজই করেছে, যদিও সে সহজেই বেঁকে বসতে পারতো। দস্যুদের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে আবার তাদের কাছে ফিরে গিয়ে সে দ্বিতীয়বাব সততার পরিচয় দিয়েছে।

ডাকাতরাও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছে। আর দেওয়ানপুত্রও বন্ধুত্বের যথাযথ সম্মান রক্ষা করেছে। বন্ধুপত্নীকে বোনের মর্যাদা দিয়ে সে যে আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছে তাও প্রশংসাযোগ্য।"

ধারানগরীর রূপসী রাজকুমারী মন দিয়ে সব শুনলেন। কিন্তু কোনো মন্তব্য করলেন না। তিনি এবার মেজভাইকে ডেকে পাঠালেন।

একান্তে মেজভাইকেও তিনি একই গল্প শোনালেন এবং রাজপুত্র, নববধূ,

ডাকাত ও দেওয়ানপুত্র সম্বন্ধে তার মতামত জানতে চাইলেন।

মেজভাই একটু ভেবে বড়ভায়ের মতো একই মন্তব্য করলো, "রাজকুমারী, এই চারটি চরিত্রই সৎ। এরা অত্যন্ত ভালমানুষ।"

এবার সেজভায়ের পালা। গল্প শুনে সেও রাজকুমারীকে একই উত্তর দিলো।

ধারানগরীর রূপসী রাজকন্যা এবার ছোটভাইকে একান্তে ডেকে পাঠালেন। পর্দার আড়াল থেকে পুরনো গল্পটা তিনি পুনরায় শোনালেন এবং ছোটভায়ের মতামত জানতে চাইলেন।

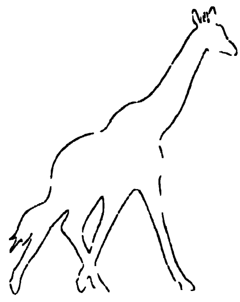
ছোটভাই বললেন, "রাজকুমারী, আপনি যদি আমার সঠিক মন্তব্য চান তাহলে বলবো রাজপুত্র একটি গর্দভ। ফুলশয্যার রাত্রে নিজের বউকে বন্ধুর বাড়িতে পাঠানো বোকামি ছাড়া কী? মেয়েটিরও চরিত্র মোটেই ভাল নয়। ভাল মেয়ে হলে সে কিছুতেই হুট করে মধ্যরাতে অপরিচিত লোকের বাড়িতে একলা যেতো না। দেওয়ান-পুত্রটিও একটি বোকচন্দর। বউটাকে দিব্যি আটকে রাখতে পারত আর ডাকাতরাও খুব বোকা, শুধু শুধু অতোগুলো অলঙ্কার হাতছাড়া করলো।"

ছোটভায়ের উত্তর শেষ হওয়া মাত্রই রাজকুমারী বুঝতে পারলেন ভাইদের মধ্যে কে চুরি করেছে। রাজকুমারী গম্ভীরভাবে ছোটভাইকে বললেন, আপনার বাবার মহামূল্যবান পাথরটা আপনিই চুরি করেছেন। এখুনি পাথরটা আমাকে দিন। না-হলে আপনি খুব বিপদে পড়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি করুন, অযথা আমার সময় নষ্ট করবেন না।"

ছোটভাই প্রথমে একটু গড়িমসি করলো। তারপর বুঝলো ধারানগরীর এই রাজকুমারীর সঙ্গে বুদ্ধির লড়াইয়ে পারা যাবে না। সে স্বীকার করলো মূল্যবান পাথরটা সে-ই গোপনে সরিয়ে ফেলেছিল। জামার ভিতরের একটা গোপন পকেট থেকে পাথরটা বের করে সে ধারানগরীর রাজকুমারীর হাতে দিয়ে দিলো।

রাজকুমারী তার পরে আর ছোটভাইকে বিপদে ফেলেন নি। চার ভাইকে তিনি একসঙ্গে ডেকে পাঠালেন। তারপর পাথরটা বার করে বললেন, "এই নিন আপনাদের হারানো মানিক। কে চুরি করেছিল, কীভাবে এটা উদ্ধার হলো, এসব আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না হারানো মানিক নিয়ে আপনারা স্বদেশে ফিরে যান। আপনাদের ভায়ে-ভায়ে সম্প্রীতি আরও বাড়ুক।"

ভাইরা খুব খুশি হয়ে, রাজকুমারীর জয়গান গাইতে-গাইতে নিজেদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাতে লাগলো।



চার ভায়ের গল্প শুনে শিবাজী, তিলক ও বুলবুল তিনজনেই খুশী। বুলবুল তো রাজকুমারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলো।

দুই ভাইকে শুনিয়ে সে বললো, "দেখলে তো মেয়েদের বুদ্ধি। রাজকুমারী না-ডাকলে চার ভায়ের কী অবস্থা হতো বুঝতে পারছো?"

তিলক ও শিবাজীর মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তারা তাই অন্য পথ ধরলো। অকারণে ঘরের মধ্যে হৈ-চৈ জুড়ে দিল। বুলবুলের কথাটা যেন তাদের কানেই ঢুকছে না!

গোলমালের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চললো। কানের পর্দা ফাটবার অবস্থা!

"স্টপ! স্টপ!" অবস্থা বেগতিক দেখে ছোটমামা আবার হাল ধরলেন। "নো মোর গণ্ডগোল।"

"কেন? গোলমালে কী হয়?" শিবাজী গোলমাল একটু কমিয়ে ছোটমামাকে জিজ্ঞেস করলো।

ছোটমামা ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, "আর একটু বড় হলে তোমরা জানতে পারবে বেশী শব্দ মানুষের শরীর-স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিক এই নয়েজপলিউসন নিয়ে গবেষণা করছেন এবং বড় বড় শহরে নানা যন্ত্র দিয়ে গোলমাল মাপা হচ্ছে।"

"ওরে বাবা! গোলমালও মাপা যায় নাকি?" কথাটা অবিশ্বাস্য ঠেকল তিলকের কাছে।

কিন্তু বুলবুল এবার বকুনি লাগালো, "চুপ করে শোনো না। ছোটমামা কি তোমাদের মিথ্যে কথা বলবে? নিশ্চয় ছোটমামা গোলমাল মাপার যন্ত্রর দেখেছে। বাবার কাছে শুনেছি, সহ্যের অতিরিক্ত গোলমাল হলে মানুষের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। গোলমালের চোটেই তো সেবার বড় জেঠু অজ্ঞান হয়ে গেলেন।"

গোলমালের মাত্রা তেমন কমছে না দেখে ছোটমামা অগত্যা পরিস্থিতি আয়ত্তে আনবার জন্যে লোভ দেখালেন, "তোমরা যদি আমার কথা শোনো, বেশী হট্টগোল না করো, তা হলে আর একখানা গপ্পো শোনাতে পারি।"

"হিপ-হিপ হুররে! ছোটমামা তুমি যুগ যুগ জিও।" মনের আনন্দে শিবাজী শ্লোগান তুললো!

"এটা আবার কোথা থেকে শিখলি?" ছোটমামা একটু যেন ঘাবড়ে গেলেন নতুন শ্লোগান শুনে।

"কেন? তোমাদের দেওয়ালেতে লেখা আছে।" শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামাকে জানিয়ে দিলো।

কথাটা ছোটমামার পছন্দ না-হলেও চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। কলকাতা শহরের অর্ধেক দেওয়ালেই কথাটা যে লেখা থাকে তা অস্বীকার করবেন কি করে?

ভাগ্নে-ভাগ্নীদের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে ছোটমামা বললেন, "আগের গপ্পোটা ছিল মধ্যপ্রদেশের। এবার একটা উত্তর প্রদেশের গপ্পো শোনো। এই উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন জনপদে যে কত উপকথা ছড়িয়ে আছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আমার বন্ধু ডক্টর অনুরাধা চৌহানের মুখে কিছু গল্প শুনেছি—তারই একটা তোমাদের বলবো।"

তিলক আর চুপ করে থাকতে পারলো না। "আমার স্পেশাল রিকোয়েস্ট ছোটমামা—একখানা হাসির গল্প শোনাও। দুঃখের ঘটনা আজকাল আমার ভাল লাগে না!"

বুলবুল ও শিবাজীও বলে উঠলো, "প্লীজ মামা। একখানা হাসির গল্পই হোক।"

মাথা চুলকে ছোটমামা বললেন, "যতহাসি তত কান্না বলে গেছে রাম সন্না! মাঝে মাঝে দুঃখের কাহিনী শুনতে হয়। কিন্তু তোমরা আমার আদরের ভাগ্নাভাগ্নী। তোমরা যখন হাসি চাইছো তখন অ্যাজ এ স্পেশাল কেস এক বোক্‌চন্দ্রের ঘটনা শোনো।

এক গ্রামে এক লোক ছিল। নাম তার ভুলুয়া। গ্রামের সমস্ত লোক এবং অন্যগ্রামের আত্মীয়স্বজন সবাই জানে ভুলুয়া বোকা।

যারা বোকা তাদের একটা বিশেষ লক্ষণ থাকে। লক্ষণটা কী বলো তো?" তিলকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন ছোটমামা। ছোটমামার ওই একটা দোষ, গল্প বলতে বলতে উদ্ভট সব প্রশ্ন করে বসেন।

কিন্তু তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের বুদ্ধি কম নয়। তারাও টপাটপ নির্ভুল উত্তব দিয়ে ছোটমামাকে তাক লাগিয়ে দেয়। এবারেও তিলক তার প্রমাণ দিলো। এক মিনিট দেরি না করে সে বললো, “বেশিরভাগ বোকা জানে না যে তারা বোকা, তাদের ধারণা খুব চালাক তারা!”

“সব বোকা যদি জানতো যে তারা বোকা তাহলে পৃথিবীতে অনেক হাঙ্গামা কম হতো।” এবার খুব ভাল উত্তর হয়েছে, স্বীকার করলেন ছোটমামা। মিষ্টি হেসে ছোটমামা বললেন, “আমাদের এই ভুলুয়া কিন্তু সেরকম বোকা নয়—সে অত্যন্ত গোবেচারা মানুষ। সবার কথা শুনে, আত্মীয়দের উপদেশ মান্য করেই ভুলুয়া চলতে চায়।”

“তারপর?” জিজ্ঞেস করলো বুলবুল। গল্প আরম্ভ হলেই শেষে কী হবে জানবার জন্যে তার প্রাণটা ছটফট করে। এই জন্যে অনেক বইয়ের শেষ পাতাটা বুলবুল আগেই পড়ে নেয়। তিলকও বলেছে, প্রথম পাতা থেকে শুরু করে আস্তে আস্তে শেষের পাতায় পৌঁছতে হয়। ঝপাং করে লাফ দিয়ে শেষের পাতায় পৌঁছনো খুব অন্যায়।

বুলবুলের দিকে তাকিয়ে ছোটমামা বললেন, “ভুলুয়ার বউ একদিন বললো, আমার মন খারাপ। আদরের ছোট বোনটাকে কত দিন দেখিনি! তুমি আমার আইবুড়ো বোনটাকে কয়েক দিনের জন্যে বাপের বাড়ি থেকে নিয়ে এসো।”

“আইবুড়ো মানে কী?” রাউরকেলা ইংলিশ ইস্কুলের ছাত্র তিলক বসু এই কথাটা আগে শোনে নি।

“নাথিং টু ডু উইথ বুড়ো।” ভাইকে মানেটা বোঝাবার জন্যে বুলবুল ব্যগ্র হয়ে উঠলো। “আইবুড়ো মানে যার বিয়ে হয় নি।”

“ইন দিস কেস তাহলে আইবুড়ী!” তিলক মন্তব্য করলো।

“ছেলেমেয়ে যাই হোক, বিয়ে না-হলে আইবুড়ো।” বুলবুল এবার হেসে উঠলো।

ছোটমামা মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলেন। তিনি এবার বললেন, “বুড়োবুড়ী কারুর সঙ্গেই সম্পর্ক নেই। মূল সংস্কৃত কথাটা হলো ‘অব্যূঢ়’ অর্থাৎ অবিবাহিত। অনেক গ্রামে বর যে পথ দিয়ে বিয়ে করতে যায় সে পথ বদলিয়ে অন্য পথ দিয়ে বাড়ি ফেরে—এর নাম আইবুড়ো পথ ভাঁড়ানো।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং, ছোটমামা। প্রত্যেকটা কথার পিছনে কত মজার মজার ঘটনা লুকনো রয়েছে। তুমি এবার ভুলুয়ার ঘটনাটা বলো।” তিলক অনুরোধ করলো।

ছোটমামা বললেন, ''আমাদের ভুলুয়া কখনও বউয়ের অবাধ্য হয় নি। বাক্স-প্যাঁটরা বেঁধে শ্বশুরবাড়ি যাবার জন্যে সে তৈরি হয়ে নিলো। মালপত্তর মাথায় তোলবার আগে সে এক ছিলিম তামাক সেজে হুকোয় গুড়ুক গুড়ুক করে সুখ-টান দিচ্ছে, এমন সময় ভুলুয়ার খুড়তুতো দাদা বাড়িতে এসে ঢুকলেন। লটবহর দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''ভুলুয়া, কোথায় চললে তুমি?''

ভারিক্কি চালে ভুলুয়া উত্তর দিলো, ''বউয়ের বোনকে আনতে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি।''

ভুলুয়ার দাদা তো জানেন ভাইকে। তাই তিনি চিন্তিত হয়ে উঠলেন। বললেন, ''ভুলুয়া তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি কম, তোমাকে খুব সাবধানে চলতে হবে, না-হলে শ্বশুরবাড়িতে অশেষ দুর্গতি হবে তোমার।''

শ্বশুরবাড়িটা সুখের জায়গা, সেখানে কে আর কষ্টে পড়তে চায়? ভুলুয়া তাই দাদাকে চেপে ধরলো, ''কিছু সৎ পরামর্শ দাও যাতে হাঙ্গামা এড়ানো যায়।''

ভুলুয়ার দাদা অনেক ভেবেচিন্তে বললেন, ''আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। কখনও উদ্ধত হবে না, লোকের সঙ্গে দেখা হলে বিনয় দেখাবে এবং বলবে, 'নমস্কার'। কিছুতেই শ্বশুরবাড়িতে বেশি মুখ খুলবে না—যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি একটি কথাও বলবে না। অবস্থা বুঝে কখনও 'হ্যাঁ' কখনও 'না' বলে ম্যানেজ করবে।''

দাদার উপদেশ অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলবার প্রতিজ্ঞা করলো ভুলুয়া এবং যথাসময়ে মালপত্তর মাথায় করে শ্বশুরবাড়ির পথে বেরিয়ে পড়লো।

গাঁয়ের সীমানা পেরিয়ে ধান ক্ষেতের আল ধরে মনের আনন্দে এগিয়ে চলেছে ভুলুয়া। আঃ! কতদিন পরে সে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। সেখানে সে কত খাতির পাবে। যেতে যেতে ভুলুয়া এক জায়গায় দেখলো এক পাখিধরা বেদে জাল পেতে বসে আছে। ঠিক সেই সময় বেশ কয়েকটা পাখি জালের মধ্যে এসে বসেছে, পাখিধরা ব্যাধ জাল টেনে তাদের বন্দী করতে যাচ্ছে, সেই মুহূর্তে ভুলুয়া হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে উঠলো, ''নমস্কার ভাই, নমস্কার।''

আচমকা চিৎকার শুনে পাখিধরা চমকে উঠলো, আর পাখিগুলো সেই সুযোগে ফুড়ুক করে উড়ে পালালো।

পাখি ধরতে না-পেরে ব্যাধ ভীষণ রেগে মেগে এসে ভুলুয়ার গালে ঠাস করে লাগালো এক চড়। ''গর্দভ কাঁহাকার। আমার রুজিরোজগার নষ্ট করলি তুই। সমস্ত পাখি পালালো, এখন আমার কী হবে?''

ভুলুয়া বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলো। হাত জোড় করে ক্ষমা চেয়ে সে বললো,

"আপনি কিছু মনে করবেন না। দাদা আমাকে বলেছিল, লোক দেখলেই নমস্কার জানাতে। এখন বুঝছি খুব ভুল হয়েছে। দয়া করে আমাকে বলুন, আমার তাহলে কী বলা উচিত ছিল?"

পাখিধরার রাগ ততক্ষণে একটু কমেছে। সে বললে, "তোর বলা উচিত ছিল : এসো এসো, ধরা পড়ো।"

ভুলুয়া বললো, "এবার বুঝতে পেরেছি। আর কখনও ভুল কথা বলে আমি বোকা বনছি না।"

মাথায় মাল তুলে ভুলুয়া আবার হাঁটতে শুরু করলো। মাইলখানেক পথ পেরিয়ে চলে এসেছে সে। চুরি করে কযেকটা চোর সেই সময় বাড়ি ফিরছিল। নতুন লোক দেখেই ভুলুয়া মনে মনে ঝালিযে নিলো, "নমস্কার জানিয়ে আমি আর বোকা বনছি না।"

চোরদের মুখোমুখি হওয়া মাত্র ভুলুয়া চিৎকার করে বলে উঠলো, "এসো এসো, ধরা পড়ো।"

সেই না শুনে চোরগুলো তো খাপ্পা! ভুলুয়াকে ধরে তারা আচ্ছা করে উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দিলো।

মার লাগিয়েও চোরদের রাগ কমলো না। একজন চোর ছুরিখানা ভুলুয়ার নাকের ডগায় নাচিয়ে বললো, "এ-বারে খুব জোর জানে বেঁচে গেলি। ফের যদি ওই অলুক্ষুণে কথা মুখে আনিস তা হলে মুণ্ডু আর ধড় আলাদা হয়ে যাবে।"

গর্দান বাঁচাবার জন্যে হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ গলায় ভুলুয়া বললো, "হুজুর আপনাদের কোন ক্ষতি আমি করতে চাই নি। কিন্তু বুঝতে পারছি, যা বলেছি তা মুখে আনা উচিত হয়নি আমার। দয়া করে আপনারা শিখিয়ে দিন আমার কী বলা উচিত?"

ছুরিখানা কোমরে গুঁজতে গুঁজতে চোরের সর্দার বললো, "ব্যাটা বাঁচতে যদি চাস তাহলে বলবি, আউর লে আও, আউর লে আও।"

হিন্দী কথাটা মুখস্থ করে নিলো ভুলুয়া। ঠেকে শিখতে হয়েছে তাকে। আর কি সহজে ভুল হতে দেয়।

আবার রাস্তা দিয়ে চলেছে ভুলুয়া। এমন সময় দূর থেকে শবদাহের দল দেখা গেলো। খুব নিকট এক আত্মীয়ের মৃতদেহ খাটিয়ায় চাপিয়ে কয়েকজন লোক চলেছে শ্মশানে।

ভুলুয়া এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলো না। গলা চড়িয়ে বললো, "আউর লে আও, আউর লে আও।"

লোকটা বলে কী! ভীষণ চটে উঠলো শবযাত্রীরা। রেগেমেগে তারা ভুলুয়াকে যোগ্য শিক্ষা দেবার জন্যে তার ঘাড়ে রদ্দা মারতে যাচ্ছিল। এমন সময় ভুলুয়া কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললো, "আমার অপরাধ নেবেন না। আমাকে একজন বলে দিয়েছিল, এইভাবে কথা বলতে। আমি নাকখৎ দিচ্ছি এই ভুল আর করবো না! দয়া করে আপনারা বলে দিন আমার কী বলা উচিত?"

শবযাত্রীরা ভুলুয়ার ঘাড়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বললো, "ওরে বোকচন্দর, বলবি, এমন যেন আর কখনও না হয়। মনে থাকবে তো?"

"মনে থাকবে না আবার! ঠেকে শিখলে কেউ ভোলে?" ভুলুয়া জায়গাটা ছেড়ে পালাতে পারলে বাঁচে।

আবার চলেছে ভুলুয়া। কিছুটা পথ গিয়ে দেখলো একদল বরযাত্রী খুব হৈ-চৈ করে বরকে নিয়ে বিয়েবাড়ি চলেছে।

ভুলুয়া মনে মনে বললো, "এবার আর ভুল হচ্ছে না—যা বলবার তাই বলবো এবার!"

বরযাত্রীরা যেমন তার কাছাকাছি এসেছে অমনি ভুলয়া বলে উঠলো "ভাই, এমন যেন আর কখনও না হয়।"

সেই না শুনে বরযাত্রীরা খুব চটে উঠলো। শুভকাজে চলেছি, এই সময় কিনা যত অলক্ষুণে কথা বলা! কয়েক ডজন চাঁটি আর কিল পড়লো ভুলুয়ার মাথা এবং পিঠের ওপর।

এবার কিন্তু ভুলুয়া আর বোকামি করে জিজ্ঞেস করেনি—আমাকে কী বলতে হবে শিখিয়ে দিন। অচেনা লোকের কাছে আর কোনোরকম উপদেশ না নেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল সে।

কিল চড় চাঁটি হজম করে আদরের জামাই ভুলুয়া অবশেষে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছলো। শ্বশুরবাড়িতে জামাই এসেছে অনেকদিন পরে। খুব আদরযত্ন শুরু হয়ে গেলো।

ভাল কাপে গরম চা এবং বিরাট প্লেটে বহু রকম মিষ্টি সাজিয়ে শাশুড়ী তার জামাইকে অভ্যর্থনা করলেন। শাশুড়ীঠাকরুণ তারপর ভুলুয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, "তা, বাছা, তোমার সব ভাল তো?"

ভুলুয়ার মনে পড়লো দাদার দ্বিতীয় উপদেশ। শ্বশুর বাড়িতে অপ্রয়োজনে মুখ খুলে সে বোকামির পরিচয় দিচ্ছে না। যথাসম্ভব সমস্ত প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ' এবং 'না' দিয়ে সারতে হবে ঠিক করে নিল।

শাশুড়ীর প্রশ্নের উত্তরে ভুলুয়া বললো, "হ্যাঁ।"

শাশুড়ী এবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মেয়ে ভাল আছে তো?"

"না।" স্টাইলের মাথায় উত্তর দিলো আমাদের ভুলুয়া।

সেই না শুনে শাশুড়ীর মুখ শুকিয়ে গেলো। উদ্বেগের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,"ওর কি অসুখ করেছে?"

আগের প্রশ্নের উত্তরে 'না' বলেছে, তাই ভুলুয়া এবার নির্দ্বিধায় বলে উঠলো, "হ্যাঁ।"

শাশুড়ীর উদ্বেগ আরও বেড়ে গেলো। দুশ্চিন্তায় তার গলা থরথর করে কাঁপছে। "মেয়ের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে তো?"

"না।" গম্ভীরভাবে শাশুড়ীকে শুনিয়ে দিলো আমাদের ভুলুয়া।

শাশুড়ী ভীষণ ভয় পেয়ে গেলেন। জামাই এতো কম কথা বলছে কেন? আসল দুঃসংবাদটা সে নিশ্চয় সইয়ে-সইয়ে ছাড়তে চাইছে। উদ্বেগে শাশুড়ীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার জো। কাঁদ-কাঁদ হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "খুকী কি বেঁচে নেই?"

"হ্যাঁ," ভুলুয়া শান্তভাবেই উত্তর দিলো।

আদরের মেয়ের মৃত্যুসংবাদে শাশুড়ী ভিরমী খেলেন। লোকজন ছুটে এলো, চোখে মুখে অনেকক্ষণ জল ছিটিয়েও তাঁর জ্ঞান আসে না।

অনেকক্ষণ পরে শাশুড়ী চোখ খুললেন। বাড়ির লোকজন জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে? কান্নায় ভেঙে পড়ে তিনি জামাইকে দেখিয়ে দিলেন। "জামাই এইমাত্র খবর এনেছে খুকী আর নেই," এই বলে আবার মূর্ছা গেলেন শাশুড়ী।

শ্বশুরমশায় ততক্ষণে বাড়ি ফিরে এসেছেন। তিনি খুব ফ্যাসাদে পড়ে গেলেন। বললেন, "তা কী করে হবে? কালই তো আমার লোক গিয়েছিল খুকুর কাছে। কাল পর্যন্ত তার তো কোনো অসুখ-বিসুখ ছিল না।"

শ্বশুর এবার জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার মেয়ে কি সত্যিই মারা গেছে?"

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে ভুলুয়া উত্তর দিলো, "না!"

হা-হা! হি-হি! হাহা! বোকা জামাইয়ের কাণ্ডকারখানা শুনে শিবাজী, তিলক ও বুলবুলের হাসি থামতেই চায় না! বুলবুল বললো, "ছোটমামা, এ হতেই পারে না। নিশ্চয় বানানো।"

ছোটমামা গম্ভীরভাবে বললেন, "আমাকে বিশ্বাস না হলে চলে যাও উত্তরপ্রদেশের আলমোড়ায়। সেখানকার প্রত্যেকটি গাঁয়ের লোকের কাছে শুনবে, ভুলুয়া বলে এক বোকা ছিল এবং সে এই আলমোড়াতেই থাকতো।

হা-হা হি-হি—বুলবুল, শিবাজী ও তিলকের হাসি সমানে চলেছে। ছোটমামা সেই সুযোগে ঘড়ি দেখলেন। তিন দিদি এতোক্ষণে নিশ্চয় কেনাকাটা শেষ করে নেমন্তন্নর চিঠি বিলনো আরম্ভ করেছে। বাড়ি ফিরতে আর ঘণ্টাখানেক, ছোটমামা মনে মনে হিসেব করে নিলেন।

"আর হাসি নয়," এবার গম্ভীরভাবে ঘোষণা করে দিলেন ছোটমামা। "কিছুদিন আগে কেরালার এক গ্রামে একজন লোক হাসতে হাসতে হাঁস হয়ে গিয়েছে। বিশ্বাস না-হলে ত্রিভান্দ্রম হাসপাতালে খোঁজ করে এসো।"

গুরুতর এই অঘটনের কথা শুনে বুলবুল সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেলো।

সুযোগ বুজে আরও গম্ভীর মুখে মামা বললেন, "গাঁয়ের লোকেরা হাঁসটাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ডাক্তারা জবাব দিয়ে দিলেন—এ-রোগের কোনো চিকিৎসা তাঁদের জানা নেই। লোকগুলো বলেছিল, রোগীকে কয়েকদিনের জন্য অবজার্ভেশনে রাখা হোক। ডাক্তাররা তাতেও রাজী হলেন না—হাসপাতালে হাঁস রাখার নিয়ম নেই।"

শিবাজী বললো, "তা কী করে হয়? হাঁসপাতাল কথাটার মধ্যেই তো হাঁস রয়েছে।"

ছোটমামা বললেন, "গোড়াতেই তোমার ভুল হয়ে যাচ্ছে। কথাটা হাসপাতাল—চন্দ্রবিন্দুর ব্যাপারই নেই। হাসপাতালের সঙ্গে হাঁস অথবা পাতালের কোনো সম্পর্ক নেই। ইংরিজী হসপিটাল কথাটাই বাংলায় হাসপাতাল হয়ে গিয়েছে।"

তিলক বললো, "তাই তো হওয়া উচিত। সাহেবরাই তো এদেশে হসপিটাল নিয়ে আসে—ব্যাপারটা তো আমাদের জানা ছিল না।"

ছোটমামা বললেন, "কথাটা ঠিক হলো না তিলক। পৃথিবীর প্রথম হাসপাতাল এই ভারতবর্ষেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখন থেকে কয়েক হাজার বছর আগে। বিদেশের পণ্ডিতরাও সে-কথা স্বীকার করেন।

শিবাজী এবার অনুরোধ করলো, "আর একটা গল্প হয়ে যাক।"

"আর হাসির গল্প নয় কিন্তু, ছোটমামা," অনুরোধ করলো তিলক।

"কিন্তু তা বলে দুঃখের গল্পও নয়।" বুলবুলের কথা শুনে ছোটমামা বুঝতে পারছেন ছোটরা আজকাল দুঃখের গল্প শুনতে মোটেই ভালবাসে না।

"বেশ, তোমাদের কথাই থাকছে। এবার হাসিরও না কান্নারও না—স্রেফ

কাজের গল্প একখানা শুনে নাও। এই ঘটনাটা জোগাড় করেছিলাম রবি মেননের কাছ থেকে। মেননরা কেরলের নামকরা পরিবার।"

"আমাদের জামশেদপুরেও মেননকাকু আছেন," বুলবুল বললো, "আমাদের পাশের কোয়ার্টারেই থাকেন।"

"আমাদের ভিলাইতেও মিস্টার মেনন আছেন," শিবাজী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলো।

"মেননরা পৃথিবীর সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছেন," মৃদু হেসে ছোটমামা জানালেন।

ছোটমামা এবার গল্প শুরু করলেন, "সেকালে কেরলে অনেক ছোট ছোট রাজ্য এবং রাজা ছিলেন। এইসব রাজা, তাঁদের রানী, রাজকন্যা এবং রাজপুত্র নিয়ে যে কত গল্প ওখানকার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে আছে তা তোমাদের কী বলবো।"

"শুধু রাজা থাকলেই চলবে না। রাজাব জন্যে হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, সিংহ দরজায় দারোয়ান, মন্ত্রী, কোটাল, পুরোহিত কত কি দরকার। সেই সঙ্গে চাই সেবার জন্যে ভৃত্য।"

"ভৃত্য মানে তো সার্ভেন্ট? তাই না ছোটমামা?" বাংলায় 'উইক' তিলক জিজ্ঞেস করে নেয়।

"ঠিক বলেছো। সেবক, কর্মচারী, সহকারী, চাকর, নোকর, নফর, খাদেম, খিদমদগার আরও কত মানে হয়," ছোটমামা বুঝিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "ভৃত্যের উল্টো কী?"

বুলবুল উত্তর দিলো, "প্রভু।"

"গুড।" তারিফ করে ছোটমামা বললেন, "বুলবুলটা বাংলায় যা স্ট্রং শেষ পর্যন্ত না আশাপূর্ণা দেবী হয়ে যায়।"

বুলবুলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছোটমামা এবার বললেন, "প্রভু ছাড়াও আরও কয়েকটা প্রতিশব্দ হয়—মালিক, মনিব, কর্তা, হুজুর।"

"এবার গল্প শোনো।" ছোটমামা গল্পের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

"এক রাজার দুই চাকর—একজনের নাম গণেশন আরেকজন কেশবন।

এরা দু'জনে একই দিনে একই রাজপ্রাসাদে একই পোস্টে চাকরি শুরু করেছিল। কিন্তু গণেশন সেই চাকরই থেকে গিয়েছে আর কেশবন পটাপট উন্নতি করে চলেছে।

কেশবন এখন রাজপ্রাসাদের কেউকেটা! সেজন্য গণেশনের মনে দুঃখের

শেষ নেই। এর থেকে বেশী অবিচার কী হতে পারে? একই দিনে রাজকার্যে যোগ দিয়ে একজন অফিসার হয়ে গেলো, আর একজন এখনও মহারাজের তামাক সেজে মরছে।

অনেকদিন গুমরে থেকে গণেশন আর পারলো না। একদিন সুযোগ বুঝে রাজার কাছে নিজের দুঃখের কথা সে প্রকাশ করে ফেললো। "ধর্মাবতার, আমি খুব মনোকষ্টে আছি।"

"কেন কী হলো তোমার?" রাজা প্রশ্ন করলেন।

গণেশন খুব দুঃখের সঙ্গে বললো, "মহারাজ আমি দিনরাত আপনার সেবা করে চলেছি, আপনার বিশ্বস্ত চাকর আমি। ওই কেশবন, সেও একই দিনে আপনার চাকরিতে ঢুকেছিল। অথচ সে এখন আমার থেকে অনেক বেশী মাইনে পাচ্ছে। আমার কেসটাও, হুজুর, আপনি একটু বিবেচনা করে দেখুন।"

মহারাজা সেদিন খুব খুশমেজাজে ছিলেন। গণেশনের দাবীসনদে তাই চটে উঠলেন না। মিষ্টি হেসে বললেন, "আমি অবশ্যই তোমার কথা বিবেচনা করবো, গণেশন। সুবিচাব করাটাই তো আমার কাজ।"

ঠিক সেই সময় রাস্তা দিয়ে একটা গরুর গাড়ী যাচ্ছিল। বারান্দা থেকে ওই গাড়ি দেখে রাজা বললেন, "বাছা গণেশন, ওই গাড়িতে কে আছে একবার খোঁজ নিয়ে এসো তো।"

গণেশন সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরেই ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো। রাজাকে সেলাম করে সে বললো, "হুজুর, এরা দক্ষিণ দেশ থেকে এসেছে—এদের নাম নারায়ণ আয়ার ও লক্ষ্মী আয়ার। এদের সঙ্গে একজন চাকর আছে তার নাম গোপালন।"

রাজা বললেন, "যাও, জেনে এসো ওরা কোথায় যাচ্ছে।"

গণেশন এবার তড়িৎগতিতে ছুটলো এবং মহারাজার হুকুম মতো খবর নিয়ে ফিরে এলো। "ধর্মাবতার, ওরা কোট্টায়ম যাচ্ছে।"

রাজা এবার তামাক খেতে খেতে বললেন, "বাছা গণেশন, আবার যাও জেনে এসো ওরা কেন কোট্টায়ম যাচ্ছে?"

গণেশন আবার ছুটলো এবং নারায়ণ আয়ার কেন সস্ত্রীক কোট্টায়ম যাচ্ছে তা জেনে এলো। "ধর্মাবতার, বিবাহ উপলক্ষে ওরা ওখানে যাচ্ছে।"

রাজা আবার গড়গড়ায় টান দিলেন এবং হুকুম করলেন, "গণেশন, আবার যাও, জেনে এসো কার বিয়ে।"

আবার বেরিয়ে গেলো গণেশন এবং হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এলো।

"ধর্মাবতার, ওখানে নারায়ণ আয়ারের ছোট ভায়ের বিয়ে।"

রাজা আবার গড়গড়া থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। "বাছা গণেশন, খবর নিয়ে এসো ওরা কবে ফিরবে।"

হুকুম মাত্র আবার ছুটলো গণেশন এবং ফিরে এসে বললো, "হুজুর, সামনের শনিবার ওদের ফিরবার কথা।"

গণেশন যখন এইভাবে ছোটাছুটি করছে কেশবন তখন রাজপ্রাসাদে ছিল না, বিশেষ কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিল। কাজ শেষ করে কিছুক্ষণ পরে সে রাজার কাছে ফিরে এলো।

রাজাসাহেব তখনও বারান্দায় বসে একমনে তামাক টানছিলেন। ঠিক সেই সময় আর একখানা গোরুর গাড়িকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখা গেলো।

রাজাসায়েব এবাব কেশবনকে বললেন, "ওই গাড়িতে কে আছে একবার খোঁজ নিয়ে এসো তো।"

কেশবন যখন বেরিয়ে যাচ্ছে তখন গণেশনকেও ডাকলেন রাজাসাহেব এবং বললেন, "তুমি এখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকো।"

কেশবন ততক্ষণে রাস্তা দিয়ে ছুটছে। গোরুর গাড়ি থামিয়ে, খবর নিয়ে সে যথাসময়ে ফিরে এলো।

গড়গড়ার নলটা নাচাতে-নাচাতে মহারাজ গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা কারা?"

সেলাম ঠুকে কেশবন উত্তর দিলে, "মহারাজ, ওরা আদুর থেকে আসছে। যাত্রীদের নাম খাদির এবং তার ছেলে আবদুল।"

মৃদু হেসে রাজাসাহেব বললেন, "আবার গিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করো ওবা কোথায় যাচ্ছে?"

মাথা নিচু করে কুর্নিশ জানিয়ে কেশবন উত্তর দিলো, "মহারাজ আমি সে খবর আগেই নিয়ে এসেছি। ওরা কুইলন যাচ্ছে।"

মহারাজ হুকুম করলেন, "কেশবন, আবার যাও, জেনে এসো কেন ওরা কুইলন যাচ্ছে?"

"মহারাজ, সে খবরও এই বান্দা নিয়ে এসেছে। শুনলাম, রাজদরবারে ওদের মামলা আছে।"

"কীসের মামলা তা কি জানা সম্ভব কেশবন?" মহারাজ গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"হ্যাঁ, হুজুর," কেশবন এবার উত্তর দিলো। 'বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে

মামলা—তিন হাজার টাকা নিয়ে হাঙ্গামা। একটা লোক, নাম তার সিরাজুদ্দিন—সে তিন বছর আগে খাদিরের কাছ থেকে তিন হাজার টাকা ধার নিয়েছিল, কিন্তু এখনও ফেরত দেয় নি।"

গড়গড়ার নলটা ডানহাতে ধরে রাজাসাহেব এবার গণেশনের দিকে তাকালেন। বললেন, "গণেশন, এবার বোধহয় বুঝতে পারছো কেশবন কেন তোমার থেকে বেশি টাকা পায়? আমি যা-যা জানতে চেয়েছি তার উত্তর দেবার জন্যে তোমাকে পাঁচ পাঁচবার ছুটতে হলো, আর কেশবন মাত্র একবারেই তোমার থেকে বেশি খবর নিয়ে চলে এলো।"

গণেশন নিজের চোখেই ব্যাপারটা দেখেছে—তাই এখন সে চুপ করে রইলো।

ছোটমামাও এবার চুপ করলেন এবং ভাগ্না-ভাগ্নীদের জিজ্ঞেস করলেন, "কী বুঝলে?"

শিবাজী বললো, "বুঝেছি মামা। শুধু গতর খাটালেই হবে না, তার সঙ্গে মাথাও খাটাতে হবে—নইলে লাইফে উন্নতি করা যাবে না!"



ছোটমামা আড়চোখে আবার ঘড়ির দিকে তাকালেন। এক একটা গল্প হুড়হুড় করে শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ ঘড়িটা যেন কিছুতেই এগোচ্ছে না। তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের মায়েদের বাড়ি ফিরতে এখনও কতো দেরি কে জানে! এতোক্ষণে তারা হয়তো হাওড়া শিবপুরের নেমন্তন্নগুলো সেরে বড়জোর শালকে হাজির হয়েছে।

গল্পের আসর জমিয়ে রাখবার জন্যে ছোটমামা এবার অন্য বুদ্ধি আঁটলেন। বললেন, "একতরফা কোনো জিনিসই ভাল নয়। আমি তো গোটাকয়েক গল্প শুনিয়েছি—এবার তোমরা কিছু বলো।"

দুই ভাগ্নে অমনি একেবারে চুপ! বুলবুলের মুখ দিয়েও কথা বেরুচ্ছে না!

গল্প শোনা খুব সহজ, কিন্তু গল্প বলার যে হাজার হাঙ্গামা তা বুলবুল আন্দাজ করতে পারছে।

ছোটমামা কিন্তু সহজে ছেড়ে দেবার পাত্র নন! তিনি বললেন, "এবারে আমার তিনটে অঙুল এগিয়ে দিচ্ছি—তোমরা তিনজনে ধরো। এর মধ্যে একটা আঙুলকে গল্পবলা আঙুল বলে গোপনে ঠিক করে রাখছি। যে সেই আঙুল ধরবে তাকেই গল্প বলতে হবে।"

তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের বেশ ভয়-ভয় করছে। কিন্তু উপায় নেই। ভাগ্যে যা উঠবে তা মেনে নিতেই হবে।

ছোটমামা বললেন, "লটারির আগে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, পাঁচ আঙুলের নামগুলো তোমরা জানো তো?"

বুলবুল বলে উঠলো, 'ইয়েস। আমাদের ইস্কুলেব অরুণা দিদিমণি শিখিয়ে দিয়েছেন—কড়ে আঙুলের নাম কনিষ্ঠা। তারপব—অনামিকা, মধ্যমা, তর্জনি ও অঙ্গুষ্ঠ।"

খুব খুশি হলেন ছোটমামা। এমন শক্ত প্রশ্নের উত্তর যে বুলবুল এতো সহজে দিতে পারবে তা তিনি ভাবেন নি। ছোটমামা এবারে অ্যানাউন্স করলেন, "লটারিটা হবে অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনির ভিতর।" ওই তিনটে আঙুল কয়েক সেকেন্ড কপালে ঠেকিয়ে রেখে ওদের দিকে এগিয়ে দিলেন ছোটমামা।

ওরা তিনজনে মামার তিন আঙুল ধরলো। ছোটমামা সঙ্গে সঙ্গে ফলাফল ঘোষণা করলেন, "তিলক, তুমি ধরেছো মধ্যমা—তোমাকেই গল্প বলতে হবে।"

বেশ ফ্যাসাদে পড়ে গেলো তিলক। কী গল্প বলবে সে ভেবেই পাচ্ছে না।

ছোটমামা উৎসাহ দিলেন, "কাম অন, তিলক। তুমি একটাও সেকালের গল্প জানো না হতেই পারে না।"

তিলক দু' মিনিট ভেবে নিলো। তারপর বললো, "বলছি। কিন্তু এ-গল্প আমার নিজের নয়।"

"নিজের বানানো গল্প কে শুনতে চাইছে? আমরা চাইছি চিরকালের গল্প—যা সেই আদ্যিকাল থেকে লোকের মুখে-মুখে ঘুরছে এবং এখনও বেঁচে রয়েছে।" শিবাজী এবার সাহস দিলো তিলককে।

"আমার কিন্তু ভীষণ ভয় করছে।" তিলকের বাঁ হাতের সঙ্গে ডান হাতে ঘষা দেখেই ছোটমামা বুঝলেন এটা নার্ভাস হওয়ার লক্ষণ।

"গল্প ইজ গল্প," বললেন ছোটমামা। "আগেকার লেকেরা যেসব কাণ্ড করে

গিয়েছেন তাই গল্প হয়ে বেঁচে রয়েছে—এসব ব্যাপারে আমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। তাঁরা যা করে গিয়েছেন তা বলতে আমাদের লজ্জা কী?'''

তিলক বললো, "একবার আমরা রাজস্থানে গিয়েছিলাম। জয়পুরে একটা ধর্মশালায় উঠেছিলাম।"

শিবাজী জিজ্ঞেস করলো, "হোয়াট ইজ ধর্মশালা? যেখানে ধর্মটর্ম হয়? মন্দির?"

'দূর!" তিলক রেগে উঠলো, "ধর্মশালা ইজ লাইক হোটেল। খুব কম ভাড়ায় চমৎকার থাকা যায়।'

মামা বললেন, "কথাটার মানে : ধর্মের জন্যে অন্নাদি-দানশালা। তীর্থযাত্রীদের ধর্মকর্মে সুবিধের জন্যে ধনীরা এইসব ধর্মশালা তৈরি করেন। সেকালে আদালতকেও ধর্মশালা বলা হতো।"

তিলক আবার গল্প আরম্ভ করলো : "আমরা যে ধর্মশালায় উঠেছিলাম সেখানকার দারোয়ানজীর নাম ছিল ভীম সিং। অমন বিরাট গোঁফ আমি কখনও দেখিনি—বাঁদিক থেকে ডানদিক প্রায় এক ফুট।"

"স্যরি—ফুট গজ এখন আর চলে না, আইন করে বন্ধ।" বলে উঠলো শিবাজী।

"মানে প্রায় তিরিশ সেন্টিমিটার।" হিসেব করে বলে দিলেন ছোটমামা।

তিলক আরম্ভ করলো, "ভীম সিংজীর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনিই আমাকে একটা রাজস্থানী গল্প শুনিয়েছিলেন।

রাজস্থান মানেই আমাদের মনে পড়ে শেঠজীদের। কিন্তু শেঠজী ছাড়াও আরও কত মানুষ হয়েছে রাজস্থানে—নিজের চোখে না-দেখলে বিশ্বাসই হয় না। এতো সুন্দর দৃশ্য, এমন চমৎকার দুর্গ, প্রাসাদ, স্তম্ভ, ইতিহাসের এমন জীবন্ত নিদর্শন, এতো গল্পগাথা গান খুব কম দেশেই আছে।"

তিলক বলে চললো, "শেঠজী মানেই হাজার হাজার লাখ-লাখ টাকা, কিন্তু রাজস্থানে দেখলাম সাধারণ লোক, গরীব লোক এবং ভাল লোক অনেক। এইসব লোকের আবার শেঠজীদের ওপর বেশ রাগ।

আমাদের ধর্মশালার দারোয়ান ভীম সিং বলেছিলেন, বড়লোক শেঠজীরা সুযোগ পেলেই সাধারণ লোকদের ঠকিয়ে এসেছেন চিরকাল। এঁদের হাতে ঠকবার অজস্র গল্প রাজস্থানের যে কোনো গাঁয়ে গেলেই শুনতে পাওয়া যাবে। যেমন এই ভোলারামের গল্প।"

"ভোলারামটি কে?" জিজ্ঞেস করে বুলবুল।

"ভোলারাম একজন গ্রামের চাষী। বেশিরভাগ গাঁয়ের লোক যেমন হয়—সহজ, সরল, মাথায় তেমন প্যাঁচালো বুদ্ধি নেই, মিথ্যে কথা বলতে সাহস পায় না, যা কথা দেয় তা কখনও খেলাপ করে না।

ভোলারাম নিজের জমিতে চাষ করে। অনেক খেটে ক্ষেত থেকে ভোলারাম সোনার ফসল তোলে। সুখের সংসার ভোলারামের। বউ, ছেলে, ছেলের বউ এবং নাতি নিয়ে দিন কাটে। মাত্র কিছুদিন আগে এই নাতিটি হওয়ায় ভোলারামের এখন মেজাজ খুব ভাল।

সহজ মানুষ ভোলারাম—তেমন কোনো চাহিদা নেই, চাষ আবাদ থেকে খাওয়াদাওয়া মোটামুটি ভালভাবেই চলে যায়। শুধু কিছু নগদ টাকা পেলে ভোলারাম শহর থেকে নাতির জন্যে কয়েকটা স্পেশাল জামা এবং খেলনা কিনে আনতে পারে।

কয়েকমাস ধরে ভোলারাম ক্ষেতে একটানা কাজ করলো। ভগবানের দয়ায় সেবার ভাল ফসলও উঠলো গোলায়। এখন গ্রীষ্ম এসেছে, রোদে মাটি ফুটিফাটা হতে শুরু করছে। ভোলারাম দেখলো উঠোনে বেশ কিছু বিচুলি জমা হয়ে রয়েছে—বাড়ির সবকটা গোরুর জন্যে যথেষ্ট রেখেও কিছু বাড়তি হবে। এই সময়ে বেচতে পারলে হয়তো ভালো দামও পাওয়া যাবে।

নাতির কথা মনে করে আর দেরি করলো না ভোলারাম। গোরুর গাড়ি বের করলো। সোনারং বিচুলিতে বোঝাই হলো সেই গাড়ি, তারপর বলদ দুটো জুড়ে দিয়ে, নাতির গালে চুমু খেয়ে ভোলারাম চললো শহরের দিকে।

শহরটা বেশ কিছু দূরে, কিন্তু যা-কিছু বেচাকেনা ওই গঞ্জেই—গ্রামের লেক সবাই ও মণ্ডিতেই চলে আসে তাদের মাল বেচতে।

মণ্ডির খুব কাছাকাছি চলে এসেছে ভোলারাম, এমন সময় পথে এক শেঠজীর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। মাথায় বিরাট পাগড়ি আর পেটে যত রাজ্যের দুষ্টুবুদ্ধি এই শেঠজীর।

দূর থেকে বিচুলি বোঝাই গাড়ি দেখেই শেঠজীর মাথায় লোক ঠকানোর নেশা চেপে গেলো। গোরুর গাড়ি থামিয়ে শেঠজী জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার নাম কী?"

"আমার নাম ভোলারাম।"

ভোলারাম! শেঠজী মনে মনে ভাবলেন ভোলারাম মানে তো যে ভুলে যায়, তার মানে খুব বোকা হবে নিশ্চয়।

বিচুলির ডাঁই আর একবার দেখে নিলেন শেঠজী। "বেশ ভাল বিচুলিই তো

মনে হচ্ছে—তা গাড়ির দাম কতো?''

ভোলারাম সত্যিই সরল। সে ভাবলো শেঠজী জিজ্ঞেস করেছেন এক গাড়ি বিচুলির দাম কতো! সে বললো, 'গাড়ি পাঁচ টাকা।'

''বড্ড বেশি দাম বলছো তুমি।'' দাম কমাবার চেষ্টায় বিরক্তি প্রকাশ করলেন শেঠজী। এমন ভাব দেখিয়ে ছাতাবগলে হাঁটতে লাগলেন যার মানে তাঁর কেনো আগ্রহ নেই। ভোলারামও হ্যাট হ্যাট করে গাড়ি ছেড়ে দিলো।

গাড়ি চলেছে সেই সময় শেঠজী আবার ফিরে এলেন। মুখ ব্যাজার করে বললেন, ''খুবই চড়া দাম হাঁকছো—তবু কী আর করা যাবে, তোমার দামেই রাজী হলাম। গাড়ি নিয়ে চলো আমার বাড়ি।''

শেঠজীর পিছন-পিছন ভোলারামের গাড়ি চললো। নিজের বাড়ির কাছে এসে উঠোন দেখিয়ে দিলেন শেঠজী। ভোলারাম সেখানেই খড়গুলো নামিয়ে দিলো।

শেঠজী এবার পাগড়ির ভাঁজ থেকে পাঁচটি টাকা বার করে দিলেন। ভোলারাম টাকাগুলো খুব সাবধানে নিজের পাগড়িতে গুঁজে নিলো।

এবার ভোলারাম খালি গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরোতে যাচ্ছে। এমন সময় শেঠজী হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন। 'করো কী? করো কী? ভোলারাম, তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়! তুমি আমার গাড়ি নিয়ে কেটে পড়ছো! তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, গাড়ির দাম কতো—তার মানে শুধু বিচুলি নয়, পুরো গাড়িটা এবং বলদ জোড়াও।''

ভোলারাম তো মাথায় হাত দিয়ে রাস্তায় বসে পড়লো। ''আপনি কী বলছেন শেঠজী? আমি পাঁচ টাকায় এই গাড়ি আর বলদ বিক্রি করতে যাবো কোন দুঃখে?''

কিন্তু শেঠজী নরম হবার পাত্র নন। ভোলারাম এবার নিরুপায় হয়ে শেঠজীর পা দুটো জড়িয়ে ধরলো। কিন্তু শেঠজী রেগেমেগে পা দুটো ছাড়িয়ে নিলেন।

পাগড়িতে একবার হাত দিয়ে শেঠজী বললেন, ''এখন কাঁদলে কী হবে? অস্বীকার করতে পারো যে তুমি বলোনি গাড়ির দাম পাঁচ টাকা?''

''যা বলেছি তা কেন আমি অস্বীকার করতে যাবো? কিন্তু শেঠজী, আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা হলো গাড়িতে যে খড় আছে তার দাম পাঁচ টাকা''

''তুমি যা বলতে চেয়েছিলে তা নিয়ে আমার মোটেই মাথাব্যথা নেই—তুমি কী বলেছো সেটাই একমাত্র কথা। আমার সময় আর নষ্ট কোরো না, গাড়িটা এখানে রেখে তুমি সুড়সুড় করে কেটে পড়ো।'' শেঠজী এবার অগ্নিমূর্তি ধারণ

করলেন।

বেচারা ভোলারাম কী করবে বুঝে উঠতে পারছে না। কথার মারপ্যাঁচে সে যে ঠকে গিয়েছে তা বুঝতে পেরেছে ভোলারাম। মুখ অন্ধকার করে তাকে বাড়ি ফিরে আসতে হলো।

ভোলারামের ছেলে বাড়িতে বসেছিল। বাবার মুখ দেখেই সে বুঝেছে কোনো বিপদ হয়েছে। শেঠজীর জোচ্চুরির ব্যাপারটা শুনে ছেলে ভীষণ রেগে উঠলো।

রাগে গরগব করতে করতে ভোলারামের ছেলে বললো, "চিত মে হাথ মে খোট—বুকে এবং হাতে জোচ্চুরি, এই হচ্ছে শেঠজী। এর বদলা নিতেই হবে। শেঠজীকে আমি এমন শিক্ষা দেবো যে ভবিষ্যতে কোনো সরল লোককে ঠকাবার আগে তাকে পাঁচবার ভাবতে হবে।"

পরের দিন সকালে ভোলারামের ছেলে পাশের বাড়ির চাচার কাছ থেকে একটা গোরুব গাড়ি ধার করে আনলো। চমৎকার খড়ে গাড়িটা সে বোঝাই করে নিলো। তারপর বাবাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লো শহরের পথে।

বাবা যে পথে মণ্ডিতে গিয়েছিলেন সেই পথ ধরেই ছেলের গাড়ি চলেছে। গাড়ি চলেছে তো চলেছেই।

মণ্ডি আর বেশী দূর নয়। চারদিকে সতর্ক নজর রেখেছে ভোলারামেব ছেলে। দূর থেকে এবাব যেন একজন শেঠজীকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, চেহারাটা বাবা যেমন বলেছিলেন তেমনই মনে হচ্ছে। নিশ্চয় এই লোকটাই সেই জোচ্চোর!

ভোলারামের ছেলে যা ভেবেছে তাই! শেঠজী গাড়ি থামালেন। খড়গুলো দেখে বললেন, "বাঃ, বেশ ভাল খড়ই মনে হচ্ছে। তা এই গাড়ির দাম কতো?"

এই সুযোগটার জন্যেই ভোলারামের ছেলে অপেক্ষা করছিল। সে সরলভাবে বললো, "শেঠজী আপনাকে সত্যি কথা বলছি, এবারে প্রচুর খড় হয়েছে। গাঁয়ে খড় রাখার জায়গা নেই। আপনার কাছে কী দাম চাইবো?"

শেঠজী বললেন, "না না। একটা কিছু দাম তো বলতেই হবে।"

ভোলাবামের ছেলে মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করলো, "বাড়িতে ছোট ছেলে আছে?"

"অবশ্যই। আমার নিজের ছেলে রয়েছে।" শেঠজী উত্তর দিলেন।

"তাহলে তার পয়সার মুঠো পেলেই আমি সন্তুষ্ট।" ভোলারামের ছেলে জানিয়ে দিলো।

মাত্র একমুঠো পয়সা! তাও ওই ছোট্ট হাতের মুঠোয়! বিশ্বাসই হচ্ছে না শেঠজীর। মনে মনে অনেক হিসেব করে ফেললেন শেঠজী। ঠিক করলেন, মুঠোর মধ্যে সিকি আধুলি দেবেন না—স্রেফ পয়সা। তাহলে আর ক'টা পয়সাই বা লাগছে! তবু নিঃসন্দেহ হবার জন্যে শেঠজী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক তো? পয়সার মুঠো পেলেই তুমি সন্তুষ্ট হবে?"

"আমরা এক কথায় মানুষ, শেঠজী। যা জবান দিই তা রক্ষে করি," সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলো ভোলারামের ছেলে।

শেঠজীর বুকের ভেতরটা আনন্দে গুড়গুড় করতে লাগলো। আজ তা হলে বেশ দাঁও মারা গিয়েছে। প্রায় নিখরচায় একজোড়া বলদ, একখানা গাড়ি এবং গাড়ি-বোঝাই খড় ম্যানেজ করা গেলো।

ভোলারামের ছেলের গাড়ি শেঠজীর পিছুন পিছন তাঁর বাড়ির উঠোনে হাজির হলো। কোথায় খড় নামাতে হবে দেখিয়ে দিয়ে শেঠজী ভিতরে চলে গেলেন, বোধ হয় তাঁর খোকাকে আনতে।

ভোলারামের ছেলে দেখলো উঠোনে বেশ কিছু খড় পড়ে রয়েছে। একটু দূরেই একখানা গাড়ি আর জোড়া বলদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এদের চিনতে একটুও দেরি হলো না ভোলারামের ছেলের।

খড় নামানো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেঠজী তার ছোট ছেলেকে কোলে নিয়ে ফিরে এলেন।

খুবই খুশ মেজাজে রয়েছেন শেঠজী। ছেলের হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও তোমার দাম।"

ভোলারামের ছেলে এই সুযোগের জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ছেলের হাতটা ধরে সে ফস করে পকেট থেকে একখানা ধারালো ছুরি বার করে ফেললো।

"শেঠজী, আপনার মনে আছে নিশ্চয়, আমি বলেছিলাম পয়সার মুঠো।"

"হ্যাঁ, তাইতো বলেছিলে," উত্তর দিলেন শেঠজী। ছুরিটা দেখে একটু অস্বস্তি বোধ করছেন শেঠজী।

"তার মানে শুধু পয়সাগুলো নয়, আপনার ছেলের মুঠোটাও আমার পাওনা," এই বলে ভোলারামের ছেলে এমনভাবে ছুরিটা নাড়াতে লাগলো যেন এখনই সে হাতটা কেটে ফেলবে।

"এসব কী দুষ্টুমি হচ্ছে!" রাগে চিৎকার করে উঠলেন শেঠজী।

"দুষ্টুমি! আমি তো কোনো দুষ্টুমি করছি না," ভোলারামের ছেলে এবার অম্লান বদনে উত্তর দিলো।

"পয়সার মুঠো বলতে পয়সাগুলোই বোঝায়, হাতের মুঠোটা তার সঙ্গে দেবার কথা ওঠে না।" শেঠজী এবার বেশ জোরে বলে উঠলেন।

"কে বলেছে?" ভোলারামের ছেলেও এবার মেজাজ দেখালো।

"আমি বলছি।" উত্তর দিলেন শেঠজী।

"আজে-বাজে বললে তো চলবে না। আপনি যা বলছেন তা যদি ঠিক হয়, তাহলে এক গাড়ি খড় বলতে খড়ের সঙ্গে গাঁড়ি এবং বলদ বোঝায় কী করে?"

শেঠজী এবার নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়ে ঘামতে শুরু করেছেন। হাতজোড় করে বললেন, "আমার ভুল হয়ে গিয়েছে বাপু, আমাকে ক্ষমা কর।"

"আমি কোন্ দুঃখে ক্ষমা করতে যাবো? আমার বাবা যখন আপনার পায়ে ধরে মিনতি করেছিলেন তখন তো আপনি তাঁর দিকে তাকিয়েও দেখেননি। এখন কেন আবার ক্ষমা চাইছেন? আমার পয়সাও চাই, আপনার ছেলের মুঠোও চাই।"

শেঠজীর এমন শোচনীয় অবস্থা। বিশ্বাস নেই লোকটাকে, এবার সত্যিই হয়তো একমাত্র ছেলের হাতটা কেটে নেবে।

শেঠজী কাতরভাবে বললেন, "তোমার বাবার গাড়িটা ফেরত দিচ্ছি এখনই। টাকার ওপর আমার একটুও মায়া নেই। তুমি যা চাইবে তাই দেবো, দয়া করে আমার ছেলের হাতটা কেটে নিও না।"

মুচকি হেসে ভোলারামের ছেলে বললো, "এতোই দিলদার লোক যখন আপনি তখন নিশ্চয় হাজার টাকা দিতে কষ্ট পাবেন না।"

হাজার টাকা! বুক ভেঙে যাচ্ছে যেন শেঠজীর। কিন্তু কোনো উপায় নেই—এমন ফাঁদে তিনি কখনও পড়েন নি।

শেঠজী ছুটে ভিতরে গিয়ে কাঁশবাক্স থেকে হাজার টাকা নিয়ে এলেন।

ভোলারামের ছেলে বললো, "আপনার ওই নোংরা হাত থেকে টাকা নিচ্ছি না আমি। মাথার পাগড়ি নামিয়ে ওর ভিতরে হাজার টাকা রেখে আমার দিকে এগিয়ে দিন।"

পাগড়ি খোলা শেঠজীদের পক্ষে খুব অপমান। কিন্তু কোনো উপায় নেই। পাগড়ির মধ্যেই টাকা পুরে ভোলেরামের ছেলের পায়ের কাছে রাখলেন তিনি।

"যেমন দেবে তেমন পাবে," এই বলে ভোলারামের ছেলে শেঠজীকে ভবিষ্যতে লোক ঠকাতে মানা করলো।

শেঠজী ততক্ষণে আদরের ছেলেকে কোলে করে বাড়ির মধ্যে পালিয়েছেন।

হাজার টাকা ট্যাঁকে গুঁজে, দু'খানা গোরুর গাড়ি নিয়ে ভোলারামের ছেলে

এবার বাবাকে সুখবরটা দেবার জন্যে গ্রামের দিকে ফিরে চললো।"

গল্প শেষ করে তিলক এবার রুমালে নাকের ঘাম মুছে নিলো।

বুলবুল বললো, "তিলকদা, খুব ভাল হয়েছে। দুষ্টু শেঠজী যদি এইভাবে জব্দ না হতো তাহলে কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগতো।"

শিবাজী বললো, "একেই বলে টিট ফর ট্যাট—য্যায়সা কে ত্যায়সা।"

ছোটমামাও খুশি। তিলকের পিঠ চাপড়ে তিনি বললেন, "ওয়েল ডান!"



"একজন অতি চালাক শেঠজীর গল্প যখন তোমরা মজা করে শুনলে, তখন আর একজন শেঠের কাহিনী শোনাতে লোভ হচ্ছে।"

মামার এই কথা শুনে তিলক, শিবাজী, বুলবুল আনন্দে হৈ-হৈ করে উঠলো।

"একজন শেঠে আমাদের মন ভরে নি, ছোটমামা," বলে উঠলো শিবাজী।

বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "ছোটমামা, তোমার শেঠজী কোথাকার লোক?"

ছোটমামা বললেন, "ইনিও রাজস্থানের। বিড়লাই বলো, ডালমিয়াই বলো, গোয়েঙ্কাই বলো সব বড় বড় শেঠের দেশ হলো এই রাজস্থান। মাড়ওয়ার থেকে এসেছেন বলে ওঁদের বলা হয় মাড়ওয়ারী।"

ছোটমামা মৃদু হেসে বললেন, "আমার শেঠজী কিন্তু এখনকার লোক নন—অনেক অনেকদিন আগে তিনি যখন ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন তখন রাজস্থানে রাণাদের রাজত্ব।"

"ওঃ! রাণাদের আমার খুব ভাল লাগে। পাঠান মোগলদের সঙ্গে ওঁরা যা ফাইট দিয়েছেন! বীর বলতে রাজস্থানের রাণাদেরই বোঝায়," বলে উঠলো শিবাজী।

"আর চতুর বলতে বোঝায় শেঠজীদের। টাকা-আনা-পাইয়ের বুদ্ধিতে এঁদের সঙ্গে পেরে ওঠা রাজাদেরও সাধ্য নয়। তাই শ্রেষ্ঠীদের কাছে রাজারা অনেক সময় মার খেয়েছেন," ছোটমামা বুঝিয়ে বললেন।

"স্টার্ট ইওর গল্প মামা," শেঠজীর কাণ্ডকারখানা শোনবার জন্যে শিবাজী উৎসুক হয়ে উঠেছে।

মামা শুরু করলেন : "আমাদের এই শেঠজীর বিরাট বাড়ি, বিরাট ব্যবসা, প্রচুর টাকা পয়সা। কিন্তু শেঠানীর, অর্থাৎ শেঠজীর বউয়ের মনে সুখ নেই।

শেঠজী সেই সকালে বেরিয়ে যান, আর ফেরেন অনেক রাত করে। শেঠানী বলে বলেও শেঠজীর বাইরে থাকার সময় কমাতে পারেন নি।

শেঠানী মাঝে মাঝে খুব অভিমান করেন। ব্যস্ত শেঠজী তখন তাঁর নানা কাজের লম্বা ফিরিস্তি দেন। "গিন্নী, জানোই তো বিরাট ব্যবসা আমার। বড় ব্যবসা মানেই হাজার রকমের হাঙ্গামা। সকালে সেই যে গদিতে বসি তারপর থেকে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাই না।"

"সন্ধেবেলাতেও তোমার কাজ?" শেঠানীর অভিমান আরও বাড়ে।

শেঠজী বললেন, "সন্ধেবেলাতেই তো যত রাজ্যের মিটিং। তোমার স্বামী তো অর্ডিনারি শেঠ নয়, বড় বড় বিজনেস মিটিংয়ে তাকে উপস্থিত থাকতেই হয়।"

"মিটিঙের পর কী করো?" জানতে চাইলেন শেঠ গিন্নী!

"মিটিং-এর পরেও রেহাই নেই। কত বন্ধুবান্ধব আমার সঙ্গে শলাপরামর্শ করতে আসে। কত লোকের কত সমস্যা—আমার উপদেশ ছাড়া কেউ এক পা নড়বে না।" এইবার গর্বে গোঁফ নাচালেন শেঠজী।

শেঠানী বুঝলেন শেঠজী এবার কোন চাঞ্চল্যকর খবর দেবেন। শেঠজী ফিসফিস করে বললেন, "গিন্নী, জেনে রাখো তেমন প্রয়োজনে স্বয়ং রাণা এই অধমের সঙ্গে পরামর্শ করেন।"

কী আর করবেন শেঠানী? স্বামীকে বাগে আনতে না-পেরে মুখ গোমড়া করে বসে রইলেন।

শেঠজী বললেন, "মুখ গোমড়া হবার মতো কিছু তো করিনি। তোমার কোনো অভাব রেখেছি? টাকাকড়ি দাসদাসী কোনো কিছুর অভাব আছে তোমার? যত খুশী দাসী-বাঁদীদের হুকুম করো, টাকা খরচ করো, খাওদাও। যখন ইচ্ছে স্যাকরাকে ডেকে পাঠাও—মনের মতন গয়না গড়াও।"

গয়নার কথা ওঠায় শেঠানীর মুখ বন্ধ হলো, কারণ গয়নাতে তাঁর বেশ লোভ। এবার প্রচুর হীরে জহরত কিনেও দিয়েছেন শেঠজী।

সেদিন ছিল গৌরী দেবীর পুজো। সংসারে যা-কিছু ধন-দৌলত তা এই দেবীরই দয়ায়—তাই পুজোর দিনে ভক্তের দল এক মনে দেবীর মন জয়ের

জন্যে উঠে পড়ে লাগেন।

শেঠজী অনেক রাত পর্যন্ত এই উৎসবে মেতে থাকলেন। অন্য অনেক শেঠজীর সঙ্গে ওঁর দেখা-সাক্ষাৎ করতে হলো। শেঠজীর প্রচণ্ড খাতির, যেখানেই যান লোকে ছাড়ে না, কিছুক্ষণ বসতে হয়। এইভাবে কখন যে অনেক রাত হয়ে গিয়েছে তা শেঠজীর খেয়াল হয়নি। হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে শেঠজী বুঝলেন মাঝরাত পেরিয়েছে।

শেঠজীর এই বন্ধুর বাড়িতে তখন আমোদ-আহ্লাদ হচ্ছিল। তিনি বললেন, "শহরের রাস্তাটা ভাল নয়—রাতও হয়েছে অনেক। তোমাকে এইভাবে ছাড়ছি না। আমার এই ঘোড়াটা চড়ে বাড়ি ফিরে যাও।"

বন্ধুর কথামতো ঘোড়ার পিঠে চড়েই রাতের অন্ধকারে শেঠজী বেরিয়ে পড়লেন। পথ জনহীন, কোথাও কোনো কোলাহল নেই। একটু আলো দেখা যাচ্ছে না—শেঠজীর ঘোড়া ছুটতে লাগলো। পথটা সত্যিই ভাল নয়—এ অঞ্চলে প্রায়ই চুরি-ডাকাতি ছিনতাই হয়।

ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতে দূর থেকে শেঠজী দেখলেন একটা মানুষ যেন পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোর-ডাকাত এইভাবে পথ আগলাতে পারে—কোনোরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। একবার থামলেই বিপদ। শেঠজী ঘোড়াসহই ধাক্কা মেরে এগিয়ে যাবেন স্থির করলেন। এছাড়া মাঝরাতে প্রাণরক্ষার অন্য কোনো উপায় নেই।

শেঠজীর ঘোড়া তীব্রবেগে ছুটে চললো, ধাক্কা মারলো লোকটাকে আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সমান বেগে এগিয়ে চললো।

বেশ কিছুটা এসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন শেঠজী। বিপদ কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখন মাথায় অন্য চিন্তা চাড়া দিল। ঘোড়ার ধাক্কা খেয়ে লোকটার কী হলো তা একবার দেখা প্রয়োজন।

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিলেন শেঠজী—ঘোড়া এবার ছুটতে লাগলো উল্টোদিকে।

শেঠজী দেখলেন অন্ধকার রাজপথে লোকটা তখনও মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে শেঠজী লোকটাকে তুললেন। দেখা গেলো মাথায় ঘোড়ার লাথি খেয়ে লোকটার সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে।

মৃত লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু শেঠজীর রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো। চোর ডাকাত নয়—এ যে রাণার ছোট ছেলে! স্বয়ং রাজপুত্র খুন হয়েছেন! শেঠজীর ঘোড়ার আক্রমণে। আর ভাবতে পারছেন না শেঠজী—এর পরিণাম

যে ফাঁসি তা মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

হে ঈশ্বর, এখন কী কর্তব্য? এতোদিন কতো লোককে বিপদ থেকে বেরিয়ে আসবার পরামর্শ দিয়েছি আমি, কিন্তু এখন কে আমাকে বাঁচবার পথ দেখাবে?

রাজকুমারের মৃতদেহটা কাঁধে নিয়ে শেঠজী আবার ঘোড়ায় চড়লেন।

কিছুদূর গিয়ে ঘোড়া থেকে নেমে একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়লেন শেঠজী। ভাগ্যে রাস্তায় এখন কেউ নেই। চুপি চুপি একটা দেশী মদের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি।

দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। এই দোকানে নিয়মিত মদ খেতে আসতেন ছোটরাজকুমার। প্রায়ই মাতাল হবার বদনাম আছে এই রাজপুত্রের। দরজায় ঠেকা দিয়ে কোনোরকমে দেহটা দাঁড় কবিয়ে দিলেন শেঠজী, তারপর অন্ধকাবে গা ঢাকা দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা বাড়িতে এসে ঢুকলেন। সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কারু সঙ্গে কোন কথা নয়। সটান বিছানায় শুয়ে পড়লেন শেঠজী।

এরপর এক ঘণ্টাও কাটেনি। সবে একটু ঘুমের ঘোর এসেছে শেঠজীর। এমন সময় দরজায় টোকা পড়তে শুরু করলো। কেউ যেন খুব ভয় পেয়ে চাপা গলায় ডাকছে, "শেঠজী শেঠজী, দয়া করে দরজাটা খুলুন।"

বিছানা থেকে না-উঠে খুব রেগেমেগে শেঠজী বললেন, "দেখা করবার আর সময় পেলে না? এত রাত্রে কেউ কারও সঙ্গে দেখা করে?"

লোকটা করুণভাবে বললো, "আমাকে ক্ষমা করুন শেঠজী। ভীষণ বিপদ আমার! না-হলে এতো রাতে আপনার কাছে ছুটে আসতাম না।"

গজর গজর করতে লাগলেন শেঠজী। এদিকে মনে বেশ ভয়ও রয়েছে। অজানা আশঙ্কায় দেহটা শিরশির করে উঠছে।

দরজা খুললেন শেঠজী। যা সন্দেহ করছিলেন তাই! সেই মদের দোকানের মালিক রাতদুপুরে ছুটে এসেছে। লোকটা ভয়ে বলির পাঁঠার মত কাঁপছে।

কাঁদতে কাঁদতে লোকটা বললো, "সর্বনাশ হয়েছে শেঠজী। মদে চুর হয়ে ছোটরাজকুমার আমার দোকানের দরজায় বুঝি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি কিছুই জানতাম না। রাত্রিবেলায় একবার ভিতর থেকে বাইরে আসবার জন্যে দোকানের দরজা খুলতেই ছোটরাজকুমার হুমড়ি খেয়ে সামনে পড়লেন। কপালে এমন চোট লাগলো যে ছোটরাজকুমার আর বেঁচে নেই।"

এবার দোকানের মালিকের কান্না বাড়লো। "রাণা তো খবর পেলে আমাকে

আস্ত রাখবেন না। আমার যা-কিছু আছে সব আপনাকে দেবো—বাঁচার একটা পথ বাতলে দিন শেঠজী।" মদের দোকানের মালিক এবার সুড়সুড় করে পাঁচ হাজার টাকার একটা তোড়া শেঠজীর হাতে গুঁজে দিলো!

রাতদুপুরে অতগুলো টাকা পেয়ে শেঠজী একটু নরম হলেন। আগে ঠিক করেছিলেন মদের দোকানের মালিককে পত্রপাঠ বিদায় করে দেবেন। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হল না।

এবার ব্রেন খাটাতে চেষ্টা করলেন শেঠজী। শেঠের ব্রেন বলে কথা—কত রকমের কূটবুদ্ধি সেখানে সবসময় কিলবিল করছে। পলকের মধ্যে শেঠজী মতলব ভেঁজে ফেললেন।

দোকানদারকে সঙ্গে নিয়ে শেঠজী তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লেন। দোকানের সামনে থেকে রাজকুমারের মৃতদেহটা দু'জনে নিঃশব্দে তুলে নিয়ে চুপিচুপি নানা অলিগলি পেরিয়ে এক মন্ত্রীর বাড়ির সামনে হাজির হলেন।

এতো মন্ত্রী থাকতে এই মন্ত্রী কেন? কারণ শেঠজীর কাছে গোপন খবর আছে, এই মন্ত্রী লুকিয়ে-লুকিয়ে রাণার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন। পা টিপে-টিপে মন্ত্রীর বাড়ির জানালার কাছে চলে এলেন শেঠজী। ঘরে ভিতরে তখন চাপা গলায় কথাবার্তা হচ্ছে।

একজন বলছে, "যত নষ্টের গোড়া হলো ওই ছোট রাজকুমার এক এক সময় ইচ্ছে হয় ওই ছোকরাকে সাবাড় করে দিই।"

আঃ! খুব আনন্দ হচ্ছে শেঠজীর। এমন কথা যে এতো সহজে কানে আসবে তা কল্পনাও করেন নি তিনি।

এবার রাজকুমারের মৃতদেহটা কোনোরকমে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে মুহূর্তের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন শেঠজী আর দোকানী। শেঠজী তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে চান, কারণ পাঁচ হাজার টাকার তোড়াটা এখনও বিছানায় পড়ে আছে, বাক্সে পোরা হয় নি।

শেঠজী বাড়িতে ফেরার পরে আধ ঘণ্টা সময়ও বোধহয় যায় নি। আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল। "দয়া করে দরজা খুলুন শেঠজী। খুব বিপদে পড়ে এসেছি।"

"এখন নয়, এখন নয়। এই কি দেখা করবার সময়?" শেঠজী আগন্তুককে হটাবার চেষ্টা করলেন।

কিন্তু লোকটা করুণভাবে বললো, "আমাকে এইভাবে তাড়িয়ে দেবেন না শেঠজী। আমার ভীষণ বিপদ, তাই রাতদুপুরে আপনার কাছে ছুটে আসতে বাধ্য

হয়েছি।”

দরজা খুলে শেঠজী দেখলেন স্বয়ং মন্ত্রী শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। উদ্বেগে এই শীতের রাত্রেও তিনি ঘামছেন।

কথা শুরু করবার আগে মন্ত্রীমশাই দশ হাজার টাকার একটি তোড়া শেঠজীর হাতে গুঁজে দিলেন। তারপর বললেন, “শেঠজী এমন বিপদে জীবনে পড়িনি। দু'জন বন্ধুর সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত আমোদ-আহ্লাদ করছিলাম। ছোটরাজকুমার মদ খেয়ে মাতাল হয়ে কখন আমার বাড়ির দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন বুঝতে পারিনি। বন্ধুদের বিদায় দেবার জন্যে যেই দরজা খুলেছি, অমনি ধড়াস করে পড়লেন রাজকুমার। এমন চোট লাগলো মাথায় যে রাজকুমার আর বেঁচে নেই।”

এবার মন্ত্রীর চোখে জল এসে গেলো। “এ খবর যেমনি রাণার কানে যাবে অমনি আমার মুণ্ডু কাটার হুকুম হবে। আমার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে ছেলেমেয়েদের রাস্তায় ভিক্ষে করতে বাধ্য করবেন রাণা। শেঠজী আমাকে বুদ্ধি দিন—আমার বাঁচার একটা পথ আপনিই বাব করতে পারেন।”

শেঠজীর বুকের ভিতরটা আনন্দে গুড়গুড় করে উঠলো। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করে গম্ভীরভাবে তিনি বললেন, “খুবই কঠিন এবং বিপজ্জনক কাজ, মন্ত্রীমশাই। আমার মতো একজন অর্ডিনারি লোককে এই হাঙ্গামার মধ্যে না-জড়ালেই পারতেন। আমরা কেনা-বেচা করে খাই, রাজারাজড়ার ব্যাপারে আমাদের নাক গলানো কি ঠিক হবে?”

মন্ত্রীমশাই তো নাছোড়বান্দা। অগত্যা শেঠজীকে বেরোতে হলো। আর রাজকুমারের প্রাণহীন দেহটি তৃতীয়বার বয়ে নিয়ে চললেন।

এবার খোদ রাজবাড়ির সামনেই হাজির হলেন শেঠজী। পুজোর দিনে প্রাসাদে খুব খানাপিনা হয়েছে। সিদ্ধির সরবতের নেশায় বুঁদ হয়ে রাজবাড়ির প্রহরীরা সব ঢুলে বসে ঝিমোচ্ছে।

শেঠজী স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, “বাঁচা গেলো। এরা জেগে থাকলে আমাকে অন্য কোনো মতলব ভাঁজতে হতো।”

রাজার ঘরের দরজায় রাজকুমারের মৃতদেহটা দাঁড় করিয়ে দিলেন শেঠজী।

রাণা তখনও জেগে রয়েছেন। নিজের কানে শেঠজী শুনলেন রাণা তাঁর মহিষীকে বলছেন, “তোমার ছোট ছেলেটি কুলাঙ্গার—বংশের মুখে চুনকালি পড়ছে ওর জন্যে। এতোদিন তোমার কান্নাকাটিতে ওর বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারি নি। কিন্তু আজও যদি ও কোনো গোলমালে জড়িয়ে পড়ে তা হলে তার

ক্ষমা নেই—কী হবে তা আশা করি তুমি বুঝতে পারছো।"

রানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন এবং স্বামীকে অনুরোধ করছেন, "অন্য যে কোন শাস্তি দাও, কিন্তু ওর ফাঁসি দিও না।"

আর এক মুহূর্ত নয়! শেঠজী ফুড়ুক করে ওখান থেকে সরে পড়লেন।

হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ি ফিরে শেঠজী এবার সোজা বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। এতো উত্তেজনা সহ্য হয় না। নেহাত অনেকগুলো টাকার ব্যাপার, না-হলে শেঠজী এইসব ঝামেলায় জড়াতেন না।

শেঠজীর কপালে বুঝি আজ রাতে ঘুম নেই। আধঘণ্টা যেতে যেতেই বাজখাঁই গলায় আর একটা লোক তাঁর নাম ধরে ডাকতে লাগলো। "খুব দরকার, এখনই দরজা খুলুন।"

"এতো রাতে আমি কারও সঙ্গে দেখা করি না। কিছু বলবার থাকলে কাল সকালে আসুন।" বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বিরক্তভাবে উত্তর দিলেন শেঠজী।

লোকটি এবার জানিয়ে দিলো স্বয়ং রাণা দূত পাঠিয়েছেন।

এবার তিড়িং করে উঠে পড়লেন শেঠজী। স্বয়ং রাণার নাম শোনার পরে বিছানায় শুয়ে থাকবার সাহস এখনও তাঁর হয়নি।

দরজা খুলে শেঠজী দেখলেন রাণাব দুই বিশাল দেহরক্ষী ঢাল তরোয়াল নিয়ে গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"রাণা এখনই আপনাকে যেতে বলেছেন।" দেহরক্ষীদের একজন খবরটা শেঠজীকে জানিয়ে দিলো।

রাজার প্রহরী, ধরে আনতে বললে এরা বেঁধে আনে। তাই শেঠজী এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলেন না—ওদের সঙ্গেই চললেন রাণার প্রাসাদে।

রাণা তখনও জেগে বসে অছেন। তাঁর চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ। শেঠজীকে দেখেই রাণা বললেন, "খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি। এমন বিপদ যে মন্ত্রীদের সঙ্গেও পরামর্শ করতে ভরসা হলো না। একমাত্র আপনাকেই আমি বিশ্বাস করতে পারি শেঠজী।"

শেঠজী এমন ভাব দেখালেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। তাঁর মুখে চোখেও উদ্বেগ ফুটে উঠলো। বিনয়ে বিগলিত শেঠজী বললেন, "বিপদে-আপদে এই অধম শেঠ সব সময় আপনার পিছনে আছে। দুঃখের সময় এই অধমকে যে আপনি স্মরণ করেছেন তার জন্যে ধন্য আমি।"

রাজা বললেন, "আপনার কাছে কিছুই গোপন করবো না। আমার ছোটপুত্রটি গোল্লায় গিয়েছিল। আজ রাত্রেই আমি ওর মৃত্যুকামনা করছিলাম।

তার একটু পরেই দরজা খুলতে গিয়েছি, কোত্থেকে এসে সে দড়াম করে সেখানে পড়ে গেলো। মাথায় এমন লাগলো যে সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু। নিজের হাতে পুত্রহত্যা হয়ে গেল।"

"কী বিপদ, কী বিপদ। আপনাকে শোক জানাবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, মহারাজ।" শেঠজী কপট শোকপ্রকাশ করলেন।

রাণা বললেন, "এই মুহূর্তে আমি নিজের বিপদের দিকটাই ভাবছি। প্রজারা যদি সমস্ত ব্যাপারটা জেনে যায় তাহলে আমার সিংহাসন থাকবে না। এই মৃত্যুর ব্যাপারটা কীভাবে ম্যানেজ করা যায় তার একটা পরামর্শ আপনিই বলতে পারেন।"

শেঠজী কিছুক্ষণ ভাবলেন। তাপর বললেন, "আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব ব্যবস্থা বাতলে দিচ্ছি। আপনি মৃত্যু সংবাদটা এখনই প্রচার করবেন না। এখনই আপনি ঘোষক পাঠিয়ে দিন। দুন্দুভি বাজিয়ে তারা পাড়ায়-পাড়ায় প্রজাদের জানিয়ে দিক ছোটরাজকুমারকে কালসাপে কামড়েছে—রাজবৈদ্য তার চিকিৎসা করছেন।"

ঘোষকরা একটু পরেই নগরীর পথে পথে বেরিয়ে পড়লো। প্রজারা শুনলো ছোটরাজকুমার সর্পাহত হয়েছেন!

ভোরের দিকে আবার দুন্দুভি বেজে উঠলো। প্রজারা যা আশঙ্কা করছিল সেই খবরই পেলো। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও রাজকুমারকে বাঁচানো যায় নি।

চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজভক্ত প্রজারা ছুটলো নদীর ধারে রাজকুমারের শেষকৃত্য দেখবার জন্য।

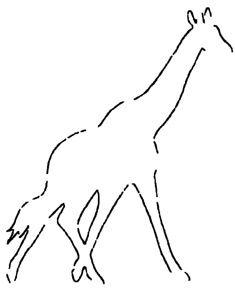
এদিকে শেঠজী তখনও রাজপ্রাসাদে বসে রয়েছেন। কৃতজ্ঞ রাণা বললেন, "আপনার উপদেশে খুব ভাল ফল হয়েছে। কারুর মনে কোনো সন্দেহ ওঠেনি। আপনার উপকার টাকা দিয়ে শোধ হয় না। তবু আপনাকে কিছু দিতে চাই। এই নিন এক লাখ টাকা।"

এক লাখ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে শেঠজী খুশ মেজাজে বাড়ি ফিরে এলেন। রাত্রে কয়েক বার ঘুমের ব্যাঘাত হয়েছে বটে; কিন্তু মা লক্ষ্মীর দয়ায় রোজগারপাতিও মন্দ হলো না। বুদ্ধি খাটিয়ে শুধু নিজের মুণ্ডু বাঁচলো তা নয়, এক রাতে সম্পত্তিও অনেক বেড়ে গেলো।

গৃহিণী দেখলেন শেঠজীর মুখে খুব হাসি। তিনি বললেন, "রাজকুমার মারা গিয়েছেন—সবাই কাঁদছে, আর তোমার মুখে হাসি!"

"এসব তুমি বুঝবে না, গিন্নী", মৃদু বকুনি লাগালেন শেঠজী। তারপর

বললেন, "আমি খুব ক্লান্ত। এখন আমি অনেকক্ষণ ধরে ঘুমবো—কেউ যেন আমায় জ্বালাতন না করে।"



একটানা গপ্পো বলতে-বলতে ছোটমামার গলা শুকিয়ে গিয়েছে। সেটা বুঝতে পেরে বুলবুল নিজেই ছুটে গিয়ে এক গেলাস জল নিয়ে এলো।

খুব খুশি হলেন ছোটমামা, বুঝলেন দিদির হাতে ভাগ্নীর ট্রেনিং খুব ভাল হচ্ছে।

বুলবুল বললো, "মা বলে দিয়েছে, কারুর তেষ্টা পেলে সঙ্গে-সঙ্গে জল আনলে পুণ্যি হয়। মা আরও বলেছে, যখনই দেখবে বাড়িতে কেউ শুয়ে পড়েছে অথচ মাথায় বালিশ নেই তখনই একটা বালিশ এনে দেবে। না-দিলে দেবতারা রাগ করেন।"

তিলক বললো, "আমরা একবার বাপির সঙ্গে আমেদাবাদ গিয়েছিলাম। যে বাড়িতেই আমরা দেখা করতে যাই সে-বাড়িতেই গিন্নী দু'গ্লাস জল হাতে আমাদের রিসিভ করেন! জল খেতে খেতে পেট ফুলে ঢোল।"

ছোটমামা বললেন, "আতিথেয়তা আদর্শ ব্যবস্থা। বুঝতেই পারছো, শুকনো দেশ, জলের অভাব। তাই অতিথি এলে সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়েই ওঁরা তাঁকে অভ্যর্থনা করেন।"

শিবাজী বললো, "জল খেয়ে আরাম বাংলার গ্রামে। কোনো বাড়িতে গিয়ে জল চাইলে শুধু জল দেবে না, সঙ্গে একটু মিষ্টি থাকবেই। অতিথিকে শুধু জল দিতে নেই নাকি!"

ছোটমামা বললেন, "এটাও অতিথি আপ্যায়নের একটা রীতি। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের মতো অতিথিপরায়ণ খুব কম পাবে। যুগ যুগ ধরে সাধ্য অনুযায়ী তাঁরা অতিথি সেবা করে যাচ্ছেন।"

শিবাজীর বোধহয় গল্পের নেশা ধরে গিয়েছে। সে বললো, "ছোটমামা, প্লীজ,

আর একখানা গপ্পো শোনবার জন্যে মনটা ছটফট করছে।"

সুযোগ বুঝে ছোটমামা বললেন, "এবার তোমারই একটা উপকথা শুনিয়ে দাও আমাকে।"

কে গপ্পো বলবে? তিন জনেব কেউ সাহস কবে এগিযে আসছে না। শেষ পর্যন্ত আবার টক্কা-ফক্কা হলো। ডান হাতের তিনটে আঙুল বেশ খানিকটা নাড়িয়ে ছোটমামা কপালে ঠেকালেন, তারপব বললেন, "তোমরা তিনজনে ধবো। তিনটে আঙুলেব মধ্যে দুটো ফক্কা একটা টক্কা।"

ছোটমামা ফলাফল ঘোষণা কবলেন। "বুলবুল, তুমিই টক্কা ধবেছো, তোমাকেই এবার গপ্পো শোনাতে হবে।"

"ওমা! কী হবে?" বুলবুল বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলো।

"কী আবাব হবে? একখানা টপক্লাশ গপ্পো শুনিযে দেবে," শিবাজী সাহস দিলো। .

ঠোঁট উল্টে, ঘাড় বেঁকিয়ে বুলবুল কিছুক্ষণ ভাবলো। কোন গপ্পোটা সে বলবে তা মনে মনে ঠিক করে নিচ্ছে।

বুলবুলেব ঘাড় এবাব সোজা হলো। শিবাজী বললো, "বোঝা যাচ্ছে, গল্প হ্যাজ কাম্—গপ্পো এসে গিযেছে।"

তিলক বললো, "চুপ—এখন নো হাঙ্গামা।"

বুলবুল বললো, "যেটা শোনাবো সেটা পদ্যও বটে গপ্পোও বটে। গল্পেব ছড়া বা ছড়ার গল্পও বলতে পারো। এটা শুনেছি ছোট ঠাকুমার কাছে। বাবার পিসিমা—কতো যে গপ্পো তিনি জানেন।"

"গুড— ভেরি গুড— গপ্পোকে গপ্পো আবার পদ্যকে পদ্য। যেমন টু-ইন-ওয়ান আইসক্রিম!" তিলক নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারলো না।

বুলবুল এবার নিজের স্মৃতি থেকে বলে চললো ঃ

"পথের মাঝে বেঙী বসে
বেঙ ছিল ঘুমিয়ে
সেই পথে এক হাতী গেলো
বেঙেরে ডিঙিয়ে।"

'টপ ক্লাশ! বেশ জমে উঠেছে। তারপর কী হলো?" উৎফুল্ল শিবাজী উৎসুক হয়ে উঠল।

বুলবুল আবার পদ্যের গল্প শুরু করলো ঃ

"দেখে বেঙী রেগে বলে
আরে বেটা গদা-পাও
এত বড় সাধ্যি তোমার
মোর প্রভুকে ডিঙিয়ে যাও?
যদি প্রভু জাগতো
তবেই তো খুনোখুনি লাগতো।"

বুলবুলের এবার নিজেরই হাসি আসছে। কিন্তু নিজে হাসলে গল্প বলা যায় না। কোনোরকমে হাসি চেপে সে বললো :

"শুনে হাতী হেসে বলে
ওগো ভেচ্‌কী-মুখী
তোর প্রভু কি করতে পারে
তুই বা পারিস কি?
যদি আমি মনে করি
তোর প্রভুকে চটকে মারি।"

নাঃ, আবার হাসি এসে যাচ্ছে বুলবুলের। হাসিটা ছেড়ে দিয়ে এবং পদ্য থামিয়ে বললো, 'বেঙী এখন বেগে ফায়ার।"

তারপর সে আবার শুরু করলো :

"রেগে বেঙী বলে যেয়ে
ছুঁচোর মেয়ের কাছে
ওলো গন্ধবেনের ঝি
কথা শুনে—গা জ্বালা করে
আমি নাকি ভেচ্‌কী-মুখী?
ছুঁচোর মেয়ে মুচ্‌কি হেসে
বললে কদর করে
রূপের ডালি বিদ্যাধরী
তুমি যাও ঘরে
ছোটলোকের সঙ্গে কি কেউ
বাক্যি আলাপ করে?"

যেমনি বুলবুল থামলো অমনি একসঙ্গে হাততালি শুরু হলো। "ওয়েল ডান বুলবুল," শিবাজী এবং তিলক দুজনেই আদরের বোনকে অভিনন্দন জানালো।

তিলক বললো, "আমি তো ভাবলাম ব্যাঙের সঙ্গে হাতীর না ফাইটিং শুরু

হয়ে যায়! প্রেস্টিজে ঘা পড়লে কারুর মাথার ঠিক থাকে না।"

"ফাইটিং হবে কী করে? ভেচ্‌কী-মুখীদের কী অত সাহস থাকে?" এই বলে বুলবুল প্রাণখোলা হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুললো।



ছোটমামা বললেন, "আমি আবার টক্কা-ফক্কা করছি। এবার দুটো আঙুলে—একটা ধরবে তিলক আরেকটা শিবাজী।"

আঙুল দুটো জোরসে নাফিয়ে কপালে ঠেকানো হলো—তারপর হলো ভাগ্য পরীক্ষা।

মামা ফলাফল ঘোষণা কবলেন। "এবাব শিবাজীকে গল্প বলতে হবে।"

ফলাফল শুনে বেশ মুষড়ে গেলো শিবাজী। সারাজীবন সে গল্প শুনেই এসেছে—গল্প না-বললে, দাদু, দিদিমা, পিসিমা এবং মায়ের ওপর অত্যাচার করেছে। কিন্তু নিজে কখনও এই ফ্যাসাদে পড়েনি।

"গল্প? গপ্পো?" আমতা-আমতা কবতে লাগলো শিবাজী। তারপর মুখ শুকনো করে বললো, "গপ্পো আমি বানাতে পারি না।"

"বানাতে বলছে কে তোমাকে?" তিলক এবার মুখ খুললো।

"যেসব গপ্পো শুনেছো তারই একটা বলো," সাহস দিলেন ছোটমামা। "আমরা তো কেউ নতুন গপ্পো বলছি না। চিরকালের গপ্পো, যা চিরকাল চলে এসেছে এবং চিরকাল চলবে তাই নিজের মতো করে বলছি।"

তবু মাথা চুলকোচ্ছে শিবাজী। "গপ্পো শুনতে খুব ভাল লাগে—কিন্তু গপ্পো মনে রাখা সোজা কাজ নয়।"

ছোটমামা বললেন, "কথাটা মিথ্যে নয়—গ্রামেগঞ্জে তাই হয়েছে। যে গপ্পো তারা শুনেছে তা আবার বলবার সময় পাল্টেগিয়েছে। মুখে-মুখে গপ্পো ছড়ানোর এই বিপদ—কিন্তু এইভাবেই একই গপ্পো এক এক যুগে দেশের অবস্থা এবং মানুষের মর্জি মতো পাল্টেছে।"

শিবাজী বুঝতে পারছে, ছোটমামা তাকে একটু ভাববার সুযোগ দিচ্ছেন। পটাপট পুরনো স্মৃতিগুলো নেড়ে নিলো শিবাজী।

এইভাবে ভাবতে-ভাবতে একটা মুখ মনে পড়ে গেলো। বাবার পাঞ্জাবী ড্রাইভার বুটা সিং।

শিবাজী বললো, "বুটা চাচাকে আমি একবার পাকড়াও করেছিলাম গপ্পো শোনাবার জন্যে। তখন আমার গপ্পের নেশা ধরে গিয়েছে—রোজ একটা গপ্পো না শুনলে খুব খারাপ লাগে।"

বুটা চাচা বলেছিল, "আমি গাড়ি চালাই, গপ্পো জানি না।"

কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা। "গল্প তোমাকে শোনাতেই হবে বুটাচাচা।"

তখন বাধ্য হয়ে বুটাচাচা বললো, "শোনো তবে। গপ্পোটা আমি শুনেছিলাম লুধিয়ানায়—আমাদের গ্রামে। কতদিন আগেক্কার কথা, কিন্তু গল্পটার পাঁচটা মূল্যবান উপদেশ আমি এখনও মনে রেখে দিয়েছি।"

শিবাজী বললো, "আমি গপ্পোটা ঠিক মনে রেখেছি কিনা জানি না। আমার ভয় করছে!"

"ভগবানের নাম করে ঝুলে পড়ো—তারপর আপীলে আমরা দেখে নেবো," বললেন ছোটমামা।

শিবাজীর পাঞ্জাবি গল্প শুরু হয়ে গেলো :

অনেকদিন আগে এক গ্রামে একটি ছেলে ছিল! নাম তার রাম সিং। যেমন সুন্দর দেখতে তেমন মিষ্টি ব্যবহার—গ্রামের সবাই তাকে ভালবাসতো।

কিন্তু রাম সিং-এর মনে সুখ নেই। রাম সিং-এর সৎ মা দিনরাত গজ গজ করেন আর যা-তা বলেন। অবস্থা এমন হয়ে উঠলো যে রাম সিং বুঝতে পারলো ভিন দেশে গিয়ে রোজগারপাতি করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো ছাড়া কোনো উপায় নেই।

যেমন ইচ্ছা তেমন কর্ম। রাম সিং ঠিক করলো সে দেশ ছেড়ে চলে যাবে। নিজের সামান্য জামাকাপড় যা-ছিল তা গুছিয়ে নিলো রাম সিং। প্রাণ চায় না, কিন্তু ঘর ছাড়তেই হবে!

কাউকে না-জানিয়েই বেরিয়ে পড়তে চায় রাম সিং। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুরুমশায়ের কথা মনে পড়ে গেলো। ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করে রাম সিং—ওঁর পাঠশালাতেই সে লেখাপড়া শিখেছে।

তখনও ভাল করে অন্ধকার কাটে নি। রাম সিং পুঁটুলি বগলে গুরুমশায়ের বাড়িতে হাজির হলো। অভিজ্ঞ গুরুমশায় প্রাক্তন ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়েই

সব বুঝতে পারলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "বাছা, কী হয়েছে? বলো।"

"তেমন কিছু নয়, গুরুমশায়। কিন্তু সংসার ছেড়ে আমি ভাগ্য সন্ধানে বেরিয়ে পড়বো ঠিক করেছি।"

রাম সিং-এর কথা মন দিয়ে শুনলেন গুরুমশায়। তারপর বুঝিয়ে বললেন, "অযথা রাগ কোরো না। বাপের বাড়িতেই থেকে যাও। পণ্ডিতরা বলেন, বিদেশে গিয়ে পুরো পেট খাওয়ার থেকে নিজের ঘরে বসে আধপেটা থাকা ভাল।"

কিন্তু অশান্তির সংসারে থেকে যাবার কোনো ইচ্ছে নেই রাম সিং-এর। গুরুমশায় নিজেও আর ছাত্রকে পীড়াপীড়ি করলেন না।

গুরুমশায় এবার রাম সিং-এর পিঠে হাত রেখে সস্নেহে বললেন, "বুঝেছি, মনস্থির যখন করে ফেলেছো তখন তুমি দেশ ছেড়ে যাবেই। সে ক্ষেত্রে মন দিয়ে আমার কথা শোনো—পাঁচটা পরামর্শ দেবো তোমায়, এগুলো মনে রাখলে তোমাকে বিপদ স্পর্শ করবে না।"

গুরুমশায়ের চরণ স্পর্শ করে রাম সিং বললো, "আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন আর বিদেশে কী করে চলবো উপদেশ দিন।"

গুরুমশায় বললেন, "প্রথম উপদেশ—যাঁর কাছে কাজ করবে তিনি যা আদেশ দেবেন তা নির্দ্বিধায় মেনে চলবে। দ্বিতীয় উপদেশ—কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না বা কাউকে কড়া কথা বলবে না। তৃতীয় উপদেশ—কখনও মিথ্যে কথা বলবে না। চার নম্বর—যাঁরা তোমার থেকে উঁচু শ্রেণীর লোক তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছু করবার চেষ্টা করবে না। আর যেখানেই যাবে সেখানেই ধার্মিক এবং পণ্ডিত লোকদের সংস্পর্শে আসবে, তাঁদের উপদেশও শুনবে যাতে তুমি সত্য থেকে বিচলিত না হও।"

আর একবার গুরুমশায়ের পদধূলি নিয়ে রাম সিং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। যাবার আগে বললো, "আপনার উপদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবো।"

কয়েকদিন ঘুরতে-ঘুরতে রাম সিং বিরাট এক শহরে হাজির হলো। তার অবস্থা এখন সঙ্গীন, সঙ্গে যা পয়সা ছিল তা শেষ হয়ে এসেছে। যে কোনো একটা কাজ জোগাড় করতে না-পারলে তাকে এবার অনাহারে থাকতে হবে।

হাঁটতে-হাঁটতে একটা গমের আড়তের সামনে হাজির হলো রাম সিং। একজন ধনী ব্যবসায়ী সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাম সিং তাঁকেই অনুরোধ করলো, "যে কোনো একটা কাজ যোগাড় করে দিতে পারেন, হুজুর? কাজ

আমার বিশেষ দরকার।''

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ধরে রাম সিং-এর দিকে তাকিয়ে রইলেন, কিন্তু তিনি কোনো কথা বললেন না। বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো রাম সিং—বোধ হয় ভাগ্যে আরও কষ্ট আছে।

শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক মুখ খুললেন। ''আমার কাছে কোনো চাকরি নেই। তবে অন্য জায়গায় একটা ব্যবস্থা হতে পারে।''

''যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন। চাকরি ছাড়া আমার গতি নেই,'' রাম সিং সবিনয়ে বললো।

লোকটা তখন খবর দিলো, ''গতকাল আমাদের রাজার প্রধান উজীর তাঁর চাকরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি একটা পছন্দ মতো লোক খুঁজছেন। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, একাজে তোমাকে মানাবে। বুঝতেই পারছে, প্রধান উজীরের খাস চাকর—একটু সুদর্শন এবং বেশ জওয়ান না হলে ভাল দেখায় না। তুমি বরং ওখানেই একবার চেষ্টা করে দেখো।''

ব্যবসায়ী ভদ্রলোককে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে রাম সিং তখনই উজীবের বাড়ির দিকে ছুটলো। এসব ব্যাপারে দেরি করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়—খবর পেয়ে কে আগে এসে চাকরিটা বাগিয়ে নেবে তার ঠিক নেই।

রাম সিং-এর চমৎকার স্বাস্থ্য এবং সুন্দর ব্যবহার দেখে উজীরের পছন্দ হয়ে গেলো। মস্ত এই লোকের খাস চাকরের পদটি পেয়ে ভগবানকে নমস্কার জানালো রাম সিং।

উজীর কথাটার মানে জানা নেই তিলকের। সে বলে বসলো, ''উজীর কি ব্যবসাদার?''

''মোটেই নয়। রাজাউজীর মারা কথাটা শোনোনি?'' বুলবুল উত্তর না দিয়ে পারলো না। ''উজীর মানে মন্ত্রী—রাজাকে যিনি মন্ত্রণা দেন।''

শিবাজী আবার শুরু করলো : ''রাজা একদিন তাঁর সৈন্য-সামন্ত লোক-লস্কর নিয়ে রাজধানী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। উজীরকেও সঙ্গে যাবার নির্দেশ দিলেন।

রাজার দলবল মানেই বিশাল ব্যাপার। অসংখ্য সৈন্যসামন্ত চাকরবাকর ছাড়াও, গাইয়ে-বাজিয়ে, নর্তকী, হাতি, ঘোড়া, উট থেকে আরম্ভ করে গাধা ছাগল পর্যন্ত সঙ্গে চলেছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে গোটা একটা শহরের লোক দল বেঁধে পথে বেরিয়ে পড়েছে।

তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নানা জায়গা ঘুরে রাজার দলবল এবার অজানা

এক অঞ্চলে ঢুকে পড়লো। এ এক অদ্ভুত জায়গা। চারদিকে শুধু বালি আর বালি। দলবল একটু নড়া-চড়া করলেই এমন ধুলো ওঠে যে সূর্যের আলো ঢেকে যায়, মনে হয় যেন মেঘে ভরে গিয়েছে সমস্ত আকাশ।

এই মরুভূমি ভেঙে যেতে-যেতে দিনের শেষে রাজার দল একটা ছোট্ট গ্রামে উপস্থিত হলো। গ্রামের মোড়ল ছুটে এলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রাজাকে শ্রদ্ধা জানালেন মোড়ল। বললেন, "রাজামশায়ের আবির্ভাবে গ্রামের লোকজন ধন্য, সকলের সেবার জন্য তাঁরা অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। কিন্তু ..."

কিন্তু শুনেই রাজা মুখ তুলে মোড়লের দিকে তাকালেন এবং দেখলেন বেচারার মুখ শুকনো। রাজা তখন মোড়লকে বললেন, "কোনো ভয় নেই। আপনাদের কোনো অসুবিধা থাকলে নির্দ্বিধায় বলুন।"

মোড়ল তখন কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললেন, "মহারাজ, কত ভাগ্য করলে আপনার সেবার সুযোগ পাওয়া যায়। ঈশ্বরের দয়ায় খাবারদাবারও আছে আমাদের ঘরে—কিন্তু এক ফোঁটা জল নেই। অভাগা এই দেশে না আছে কোনো নদী না ঝর্ণা—না কোনো কুয়ো। জল না হলে এতো লোকের চলবে কী করে?"

জলই তো জীবন। জল নেই শুনে সবাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। রাজা সঙ্গে সঙ্গে উজীরকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, "যেখান থেকে পারো জলের ব্যবস্থা করো।"

রাজা হুকুম দিয়েই খালাস—এই মরুভূমির দেশে কীভাবে জল জোগাড় হবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব এখন থেকে বেচারা উজীরের। জলের ব্যবস্থা না হলে উজীরের মুণ্ডুই হয়তো কাটা যাবে।

উজীর কিছুক্ষণ একমনে ভাবলেন, তারপর গ্রামের বৃদ্ধ লোকদের কাছে খবর পাঠালেন। জনে জনে তিনি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন, "এ গ্রামে না হয় জল নেই—কিন্তু আশে-পাশে কোথায় জলের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে?"

গ্রামের বৃদ্ধরা কোনো সাহায্য করতে পারছেন না। "কোথায় জল?"

শেষে দাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ বললেন, "সত্যি কথা বলতে এই গ্রামের মাইলখানেক দূরেই একটা বিরাট কুয়ো আছে। কিন্তু......."

"কোনো কিন্তু নয়, আপনি আমাকে সমস্ত খবর দিন। জলের জোগাড় আমাদের করতেই হবে," বললেন উজীর।

সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ তখন বললেন, "মন্ত্রীমশাই, কুয়ো আছে, কিন্তু কোনো কাজে লাগবে না। কয়েকশ বছর আগে একজন রাজা ওই পাথরবাঁধানো

কুয়ো খুঁড়িয়েছিলেন। এমন গভীর কুয়ো খুব কম দেখতে পাওয়া যায়—ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে যেন পাতাল পর্যন্ত। যত খুশী জল পাওয়া উচিত। কিন্তু ওই সিঁড়ি বেয়ে জল আনতে গিয়ে এখনও পর্যন্ত কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসে নি। ওখানে বোধহয় কোনো দৈত্যদানব আছে।"

মন্ত্রীমশাই বেশ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি নিজেও দাড়িতে হাত বুলিয়ে নিলেন। রাম সিং পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মন্ত্রীমশাই বললেন, "কথায় বলে, কাউকে ভালভাবে না-বাজিয়ে বিশ্বাস করবে না। রাজামশায়ের জন্যে তুমি জল নিয়ে এসো।"

ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোর নাম শুনলে কেউ সেদিকে যায় না। চাকরি রাখতে গিয়ে প্রাণ-হারানোর কোনো মানে হয় না। কিন্তু রাম সিং-এর মনে পড়ে গেলো গুরুমশায় বলেছিলেন, "যাঁর কাছে কাজ করবে, তিনি যা আদেশ দেবেন তা নির্দ্বিধায় মেনে চলবে।"

রাম সিং সঙ্গে সঙ্গে মনিবকে জানিয়ে দিলো, জল নিয়ে আসবার জন্যে সে তৈরি। একটা খচ্চরের দুই দিকে দুটো বিশাল পিতলের ঘড়া ঝুলিয়ে নিলো রাম সিং। দুটো ছোট ঘড়া সে নিজের কাঁধে তুলে নিলো, তারপর ভগবানের নাম করে সে জলের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

নির্জন পথ ধরে চলেছে রাম সিং। সঙ্গে সেই বৃদ্ধ যিনি পথপ্রদর্শকের কাজ করছেন। কিছুটা হাঁটার পরে মরুভূমির দেশে কয়েকটা বিরাট গাছ দেখা গেলো। বৃদ্ধ পথপ্রদর্শক কুয়োটা দেখিয়ে দিলেন দূর থেকে, কিন্তু আর এগোলেন না। বললেন, "আমি বুড়ো মানুষ, তাছাড়া আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন," এই বলে তিনি চটপট বিদায় নিলেন।

রাম সিং-এর অস্বস্তি লাগছে, কিন্তু কোনো উপায় নেই। একটা গাছের সঙ্গে খচ্চরটাকে সে বেঁধে ফেললো, তারপর বড় ঘড়া দুটো তুলে নিয়ে কুয়োর কাছে চলে এলো। এরকম বিরাট কুয়ো রাম সিং আগে কখনো দেখেনি। কুয়োর সিঁড়িটাও রাম সিং-এর নজরে পড়লো। দামী শ্বেতপাথরের সিঁড়ি থাকে-থাকে নিচে নেমে গিয়েছে।

কোথাও কোনো প্রাণের লক্ষণ নেই—শ্বেতপাথরের বুকে রাম সিং-এর খালি পা পড়লেও যেন শব্দ হচ্ছে। রাম সিং-এর সাহস যে ফুরিয়ে আসছে তার প্রমাণ পাওয়া গেলো—একটা ঘড়া ফসকে পড়ে গিয়ে ঝন্‌ঝন্ শব্দে আওয়াজ করে উঠলো।

একবার ইচ্ছে হলো ফিরে যায়—কিন্তু রাম সিং পরাজয় মেনে নেবে না।

সে মনোবল সংগ্রহ করে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে লাগলো। এবার ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘড়া দুটো ভাল করে ধুয়ে রাম সিং জল বোঝাই করলো।

কিন্তু এই সিঁড়ি বেয়ে একসঙ্গে দুটো ঘড়া তুলে আনা অসম্ভব। জলবোঝাই একটা ঘড়া নিয়ে রাম সিং এবার ওপরে উঠতে লাগলো।

দু' এক পা উঠবার পরেই সামনে কী যেন একটা নড়ে উঠলো। রাম সিং-এর বুকের রক্ত এবার হিম হয়ে উঠলো। সে দেখলো বিরাট এক দৈত্য তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দৈত্যটার এক হাতে বিরাট একখানা হাড় আর অন্য হাতে প্রদীপ। প্রদীপের অস্পষ্ট আলোয় দৈত্যের ছায়া ও কায়া মিলে এক ভয়াবহ দৃশ্য।

দৈত্য এবার কথা বললো। গলা নয়তো যেন মেঘগর্জন! "আমার সুন্দরী বউটিকে কেমন দেখছো বলো।"

রাম সিং দেখলো দৈত্য ওই হাড়টার দিকে প্রদীপ তুলে ধরেছে আর মাঝে মাঝে হাড়টাকে আদর করছে।

এখন এই দৈত্যের খুব সুন্দরী এক বউ ছিল। দৈত্য তাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতো। সুন্দরী বউটি হঠাৎ মারা যায়, কিন্তু ভালবাসায় অন্ধ দৈত্য বিশ্বাসই করলো না যে তার বউ মরে গিয়েছে। বউ-এর মৃতদেহটা কাঁধে নিয়ে সেই থেকে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেহটা পচতে পচতে এমন বীভৎস হাড়ের টুকরো ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট নেই।

রাম সিং অবশ্য এই ঘটনা জানতো না, কিন্তু গুরুর দ্বিতীয় উপদেশ তার মনে পড়ে গেলো—কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবে না বা কাউকে কড়া কথা বলবে না।

রাম সিং এবার দৈত্যকে বললো, "সত্যি দৈত্যরাজ এমন সুন্দরী স্ত্রী আপনি দ্বিতীয় আর পাবেন না।"

"ভগবান দেখছি তোমাকে চমৎকার চোখের নজর দিয়েছেন হে।" আনন্দে উৎফুল্ল দৈত্য বলে উঠলো। "তোমার অন্তত দেখার ক্ষমতা আছে। এর আগে আমি কত লোককে খুন করেছি। তারা সবাই আমার স্ত্রীকে অপমান করেছে, বলেছে তোমার স্ত্রী কোথায়? তুমি তো কতকগুলো হাড়ের টুকরো নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছো। ইয়ংম্যান, তোমাকে দেখে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, আমি তোমাকে সাহায্য করবো।"

দৈত্য এবার জলবোঝাই ঘড়াগুলো মুহূর্তের মধ্যে ওপরে তুলে এনে খচ্চরের

পিঠে বেঁধে দিলো। রাম সিং ফিরে যাবার জন্যে তৈরি। কিন্তু দৈত্য ছাড়বে না, একটা বর নিতেই হবে রাম সিংকে।

রাম সিং কিছুই চাইছে না। দৈত্য তখন বললো, "এখানকার রাজার সমস্ত ধনরত্ন কোথায় জমা আছে তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।"

রাম সিং ধন্যবাদ জানিয়ে বললো, রাজার ধনে তার কোনো লোভ নেই। তবে দৈত্য যদি সত্যিই সন্তুষ্ট হয়ে থাকে তাহলে এই কুয়োটা যেন ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়, যাতে সাধারণ মানুষ এখানকার জল ব্যবহার করতে পারে।

দৈত্য বোধহয় ভেবেছিল, রাম সিং বিরাট কিছু একটা চেয়ে বসবে। তাই অল্পে ছাড়া পাবার আনন্দে সে বললো, "তথাস্তু। আমি এই কুয়ো থেকে এখুনি সরে যাচ্ছি।"

জলের ঘড়া নিয়ে রাম সিংকে জলজ্যান্ত অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে মন্ত্রী এবং রাজা খুশী হলেন। কুয়োর ওখানে কী হয়েছিল তার কিছুই প্রকাশ করলো না রাম সিং। শুধু রাজাকে কুর্নিশ করে সে বললো, "মহারাজ, কুয়ো থেকে জল আনতে যাবার আর কোনো অসুবিধে নেই, যে কেউ এখন ওখানে যেতে পারে।"

এরপর সত্যিই জল আনবার কোনো অসুবিধা হলো না—কেউই কুয়োর কাছে দৈত্যকে আর দেখতে পায়নি।

রাম সিং-এর ওপর বেজায় খুশী হয়ে রাজা তাঁর মন্ত্রীকে বললেন, "আমার খাস চাকরকে আপনি নিন, তার বদলে রাম সিংকে আমি চাই।"

এইভাবে রাজকর্ম করার সুযোগ পেলো রাম সিং। এবং ক্রমশই সে রাজার বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠলো।

রাম সিং কিন্তু সব সময় গুরুমশায়ের তৃতীয় উপদেশ মনে রেখেছিল—সৎ হবে এবং মিথ্যে কথা বলবে না। ফলে একের পর এক পদোন্নতি হতে লাগলো রাম সিং-এর। যথাসময়ে রাজা তাকে কোষাধ্যক্ষ করে দিলেন।"

কোষাধ্যক্ষ কথাটার মানে জানা ছিল না তিলকের। ছোটমামা বুঝিয়ে দিলেন, "খুব দায়িত্বপূর্ণ পদ। ইংরিজিতে বলে ট্রেজারার। রাজার ভাণ্ডারে যত রত্ন আছে, যত টাকা আছে তার দায়িত্ব এই কোষাধ্যক্ষের ওপর। সরকারের যা-কিছু খরচাপাতি তা এই কোষাধ্যক্ষের মাধ্যমেই হয়।"

শিবাজী আবার শুরু করলো ঃ "রাম সিং তো কোষাধ্যক্ষ হলো, কিন্তু তার কপালে এখনও বেশ বিপদ রয়েছে। রাজার এক ভাই ছিলেন। এই হিংসুটে দুষ্টু ভাইটা মনে মনে রাজাকে একেবারে দেখতে পারতেন না। তাঁর মতলব ছিল,

যখন যা খুশি টাকা রাজার ভাণ্ডার থেকে সরিয়ে ফেলবেন।

এই টাকায় শুধু নিজের সাধ-আহ্লাদ মেটাবেন তা নয়, গোপনে-গোপনে রাজার সৈন্যদের মধ্যে টাকা ছড়াবেন এবং রাজার কয়েকজন অনুচরকে টাকার জোরে বশ করবেন। তারপর সুযোগ বুঝে রাজাকে খতম করে নিজেই সিংহাসনে চড়ে বসবেন।

এ-ব্যাপারে রাম সিংকে নিজের দিকে টানা বিশেষ প্রয়োজন। রাজার ভাই খুবই চালাক। নিজের মতলবটা নিজের মাথাতেই রেখেছেন, রাম সিংকে কিছুই বুঝতে দিচ্ছেন না, উল্টে সুযোগ পেলেই রাম সিংকে তোষামোদ করতে লাগলেন।"

ছোটমামা এক মিনিট গল্প থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজার ভাইকে সে যুগে কী বলা হতো?" কেউ উত্তর জানে না। মৃদু হেসে ছোটমামা বললেন, "রাজার ভাইকে অনেক জায়গায় বল. হয় কুমার রাজা আব ভায়ের বউ হন কুমাররানী।"

ছোটমামা আবার শিবাজীকে গল্প চালিয়ে যাবার গ্রীন সিগন্যাল দিলেন। শিবাজী আরম্ভ কবলো :

"কুমার রাজা নিজের মতলব সারবার জন্যে এমন মরীয়া হয়ে উঠলেন যে রাম সিংকে দলে টানবার জন্যে নিজের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলেন।

খোদ রাজপরিবারে বিয়ের সুযোগ! যে কোনো লোকই এক কথায় রাজী হয়ে যেতো। কিন্তু গুরুমশায়ের চার নম্বর উপদেশটা রাম সিং-এর মনে পড়ে গেলো। গুরুমশাই বলেছিলেন ঃ যাঁরা তোমার থেকে উঁচু শ্রেণীর লোক তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা কোরো না।

রাম সিং অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে এই রাজকীয় বিয়েতে অক্ষমতা প্রকাশ করলো। "আমরা অতি সাধারণ মানুষ, রাজার বাড়ির মেয়ে বিয়ে করতে যাবো কোন্ সাহসে?"

ষড়যন্ত্রের প্রথম পর্যায়েই বাধা পড়ায় কুমার রাজা একেবারে খাপ্পা হয়ে উঠলেন।

ঠিক করলেন, পথের এই কাঁটা সরাতেই হবে। রাম সিং-এর সর্বনাশ না-করা পর্যন্ত তাঁর চোখে ঘুম নেই।

একদিন সুযোগ বুঝে তিনি রাজার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা বললেন। মিথ্যে করে জানালেন, কোষাধ্যক্ষ রাজার সম্বন্ধে অসম্মানসূচক কথাবার্তা বলেছে এবং রাজপরিবারের মেয়েকে অপমান করেছে।

কী কথা বলেছে রাম সিং, কীভাবে রাজার অপমান হয়েছে তা কেউ জানে না। কুমার রাজা নিজেও তা ব্যাখ্যা করলেন না। সে যুগের রাজাদের আত্মসম্মান জ্ঞান খুব টনটনে ছিল, কেউ রাজনিন্দা করেছে শুনলে তাঁদের মাথার ঠিক থাকতো না। কুমার রাজার গোপন কথা শুনে রাজার মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, যতক্ষণ না রাম সিং-এর মুণ্ডু কাটা হচ্ছে ততক্ষণ তিনি, কুমার রাজা এবং রাজকুমারী কেউ জলস্পর্শ করবেন না।

বেজায় খুশী হয়ে কুমার রাজা বিদায় নিচ্ছিলেন। কিন্তু রাজা হঠাৎ বললেন, ‘‘আমি চাই না কেউ জানুক যে আমারই হুকুমে কোষাধ্যক্ষের মুণ্ডুচ্ছেদন হয়েছে। ব্যাপারটা খুব গোপনে সারতে হবে। কোনো রকমে যদি ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে কিন্তু তোমার গুরুতর শাস্তি হবে।’’

রাজা এবার তাঁর একজন সেনাপতিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, ‘‘কয়েকজন সৈন্য নিয়ে তুমি বনের মধ্যে যে ছোট দুর্গ দৈরি হচ্ছে ওখানে চলে যাও। যদি কেউ ওখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এই দুর্গ তৈরির কাজ কখন শেষ হবে বা এই সংক্রান্ত অন্য কোনো প্রশ্ন তোলে তা হলে তৎক্ষণাৎ তার মাথা কেটে ফেলবে। দেহটাকে বনের মধ্যেই পুঁতে রেখে মাথাটা নিয়ে রাজপ্রাসাদে চলে আসবে।’’

হুকুমটা একটু অদ্ভুতই মনে হলো সেনাপতির। কিন্তু রাজার হুকুম তামিল করাই তাঁর কাজ, রাজা কেন হুকুম করছেন তা জানবার এক্তিয়ার নেই সেনাপতির। স্যালুট করে নির্দেশ মান্য করবার জন্যে সেনাপতি বিদায় নিলেন।

সমস্ত রাত রাজা ঘুমোতে পারলেন না। ভোরবেলায় তিনি রাম সিংকে ডাকলেন। বললেন, ‘‘বনের মধ্যে যেখানে ছোট দুর্গ তৈরি হচ্ছে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করে এসো কাজকর্ম কেমন এগোচ্ছে, কবে দুর্গ শেষ হবে এবং ঝটপট ফিরে এসে আমাকে রিপোর্ট করো।’’

রাম সিং সঙ্গে-সঙ্গে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়লো। যেতে যেতে শহরের শেষ প্রান্তে এসে রাম সিং শুনতে পেলো ছোট এক মন্দিরের ভিতর কে যেন উদাত্ত কণ্ঠে ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছেন। গুরুমশায়ের পঞ্চম উপদেশটা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো : যেখানে যাবে সেখানেই ধার্মিক এবং পণ্ডিত লোকদের সংস্পর্শে আসবে এবং তাঁদের উপদেশ ও শাস্ত্রপাঠ শুনবে।

রাম সিং এবার মন্দিরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর এক কোণে বসে শাস্ত্রপাঠ শুনতে লাগলো। বেশিক্ষণ বসবার খুব একটা সময় ছিল না, কিন্তু জ্ঞানের কথা শুনতে-শুনতে রাম সিং এমন মোহিত হয়ে পড়লো যে উঠবার

তাগিদই রইলো না। এক মনে শাস্ত্র আলোচনা শুনে যাচ্ছে রাম সিং আর ক্রমশই বেলা বেড়ে চলেছে।

এদিকে দুষ্টু কুমার রাজা বেশ অসুবিধায় পড়ে গিয়েছেন। রাজ আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই, কিন্তু বেশ ক্ষিদে লাগছে। ওদিকে রাজকন্যাও ক্ষিদের জ্বালায় কাঁদছেন, রাম সিং এর মুণ্ডু না আসা পর্যন্ত সকালের জলখাবার মুখে দেওয়ার হুকুম নেই।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। দুষ্টু কুমার রাজা ছটফট করছেন আর খবরের আশায় কয়েক মিনিট অন্তর জানলার দিকে ছুটে যাচ্ছেন। শেষে আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না তিনি। তাড়াতাড়ি ছদ্মবেশ ধারণ করলেন—গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে এমন বেশ নিলেন, কারও সাধ্য নেই কুমার রাজাকে চিনতে পারে। তারপর ঘোড়ায় চড়ে ছুটলেন বনের দিকে—এই বনের মধ্যেই যে রাম সিংকে কোতল করা হবে তা রাজার মুখেই শুনেছেন তিনি।

বনের মধ্যে গিয়ে কুমার রাজা দেখলেন, কয়েকজন মাত্র লোক দুর্গ তৈরির কাজ করছে আর কয়েকজন সৈন্য এক মনে তাদের কাজ দেখছে।

বিরক্ত হয়ে ছদ্মবেশী কুমার রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা এখানে হাঁ করে কী দেখছো? তোমাদের যে কাজ শেষ করতে পাঠানো হয়েছে তার কত দেরি?"

এই কথা শুনহে সৈন্যরা সেনাপতির মুখের দিকে তাকালো। চকিতে সেনাপতির নির্দেশ পেয়ে তরোয়াল দিয়ে অচেনা আগন্তুকের মুণ্ডুচ্ছেদ করলো।

মুণ্ডুটা তারা এবার থালায় তুলে নিলো—খোদ রাজার ভাই যে প্রাণ হারালেন তা তারা বুঝতে পারলো না।

সেনাপত্তি এবার কাপড়ে জড়ানো মুণ্ডু নিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে ঘোড়া ছোটালো।

এদিকে রাজা সভা থেকে ফিরে রাম সিং-এর মুণ্ডু এবং তাঁর ভাইকে না-দেখে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন। ভাবলেন, নিজেরই এবার খোঁজখবর নেওয়া প্রয়োজন।

একলা ঘোড়া ছুটিয়ে রাজা নিজেই বনের দিকে চললেন।

রাম সিং তখনও এক মনে মন্দিরে বসেশাস্ত্র পাঠ শুনে যাচ্ছে। হঠাৎ ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনে বাইরে তাকিয়ে দেখলো স্বয়ং রাজামশায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন। রাজার নির্দেশের কথা এবার মনে পড়ে গেলো তার। মন্দির থেকে দ্রুত বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে সে রাজার দৃষ্টি অকর্ষণ করলো। রাজাও এবার ঘোড়া

থামিয়ে নেমে পড়লেন।

রাম সিংকে এখনও বহালতবিয়ত দেখে রাজা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

এমন সময় সেনাপতিও সেখানে হাজির হলেন। হাসিমুখে রাজার সামনে মুণ্ডুর মোড়কটি খুলে ধরলেন।

"এ যে আমার ভায়ের মাথা!" রাজা আর্তনাদ করে উঠলেন। "আমার ভাই ওখানে কী করে গেলো?"

শোকার্ত রাজার মনে এখন নানা সন্দেহ উঁকি মারতে লাগলো। তিনি রাম সিং-এর কাছে কিছুই চেপে রাখলেন না। রাম সিংও এবার কাঁদতে কাঁদতে কুমার রাজার ষড়যন্ত্রের কথা প্রভুর কাছে নিবেদন করলো। যা এতোদিন গোপন ছিল তা সমস্ত ফাঁস হয়ে গেলো।

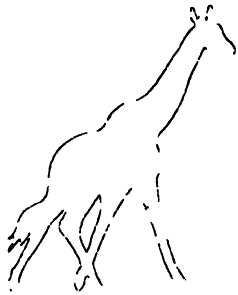
রাজা এবার রাম সিং-এর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেন তারপর তাকে রাজপ্রাসাদে ফিরে যেতে অনুরোধ করলেন।"

এবার একটু থামলো শিবাজী। অধৈর্য বুলবুল জিজ্ঞেস করলো, "তারপর কী হলো?"

শিবাজী বললো, "এর পর বহু বছর ধরে রাম সিং রাজার কাছে কাজ করেছিল। রাম সিং-এর ছেলেপুলে নাতি-নাতনী হয়। বুড়ো বয়সেও রাম সিং নাতিদের বলতো, গুরুজীর পাঁচটি উপদেশ মেনেছিলাম বলেই আজ আমার এতো সুখ এবং আজও আমি বেঁচে আছি। তোমরাও এই পাঁচটি উপদেশ সারাজীবন মনে রাখবে।"

শিবাজীর গল্প শেষ হওয়া মাত্রই তিলক হাত তুললো। এই হাত তোলার মানে সে একটা প্রশ্ন করতে চায়, কিন্তু যেহেতু সে গুড বয় সেহেতু মামার অনুমতি ছাড়া সে মুখ খুলবে না।

মামা অনুমতি দিলে তিলক বললে, "ওয়ান কোশ্চেন। সেযুগে ছোটছেলে ছিল না? আজকে যত গল্প হলো সব তো বড়দের—ছোটদের কোনো ঘটনা তখনকার যুগে ঘটতো না?"



মামা বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তিলক বেশ ভাল প্রশ্নই করেছে। একটু হেসে তিনি জানালেন, "ছোটছেলে সে যুগে অবশ্যই ছিল এবং তারা অনেক গল্পের নায়কও হয়েছে।"

বুলবুল এবার মামাকে ধরলো তাদের বয়েসী ছেলে অথবা মেয়ের একটা গল্প শোনাতেই হবে।

ছোটমামা বললেন, "তোমাদের বয়েসী একটা ছেলে যা করেছিল তা হাজারখানেক বড় বহু চেষ্টা করেও পারেনি। এই ছেলেটির কথা আজও উড়িষ্যাব গ্রামে-গ্রামে শোনা যায়। কিন্তু বড্ড দুঃখের গল্প তাই তোমাদের শোনাবো না ভেবেছিলাম।"

তিলক বললো, "দুঃখটা যতোটা পারো কমিয়ে গপ্পোটা আমাদের বলো, ছোটমামা। ঘটনাটা শুনে রাখা দরকার—মায়ের ধারণা ছোটরা কোনো কাজই বড়দের মতো করতে পারে না।"

"দিদির কথাটা যে সত্যি নয় তা উড়িষ্যার সমস্ত লোক জানে," মামা গম্ভীরভাবেই উত্তর দিলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা বিশ্ববিখ্যাত কোণারকের সূর্যমন্দিরের কথা নিশ্চয়ই শুনেছো?"

"শুধু শুনবো কেন? নিজের চোখে দেখেছি," বলে উঠলো শিবাজী। "সেবার বাপি, মা, আমি এবং প্রফেসর ম্যাকইনটস একসঙ্গে কোণারকে গিয়েছিলাম। প্রফেসর ম্যাকইনটস বাবার বন্ধু, এডিনবরা থেকে এসেছিলেন এই কোণারক মন্দির দেখতে।"

"দেখে কী বললেন?" জানতে চাইলো বুলবুল।

"দেখে একেবারে 'থ'। বাপিকে বললেন, 'সমস্ত পৃথিবী ঘুরেছি আমি, কিন্তু এমন অদ্ভুত শিল্পকর্ম কোথাও দেখিনি। পৃথিবীর সমস্ত লোক তাজমহলের নাম জানে, কিন্তু কোণাবক দেখলে তারা আরও অবাক হয়ে যাবে।"

শিবাজী বললো, "আমি প্রথমে ভেবেছিলাম কোণারক হয়তো কোনো 'রক'—পাহাড়-টাহাড় হবে। কিন্তু প্রফেসর ম্যাকইনটসকে বাবা বললেন, 'কোণ হলো ইংরিজী অ্যাংগ্ল, আর সূর্যের অপর নাম অর্ক। অর্থাৎ কোণাকুণি স্থাপিত সূর্যমন্দির'।"

ছোটমামা মন্তব্য করলেন, "শিবাজী তুমি ঠিকই বলেছো। পৃথিবীতে এমন অসাধারণ শিল্পকর্ম নেই বললেই চলে। ১২৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িষার রাজা নরসিংহদেব এই সূর্যমন্দির তৈরি করেছিলেন। সূর্যের মূর্তি পুজো মধ্য এশিয়া থেকে আগত 'মগ'-নামধারী ব্রাহ্মণরা এদেশে প্রচলিত করেন। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে সূর্যের পুজো করে সেরে যান। ক্রমশ সমস্ত ভারতবর্ষে সাতটি অর্কক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কোণারক তাদেরই একটি।"

"অন্যগুলো কোথায়?" জানতে চায় শিবাজী।

ছোটমামা বললেন, "ঠিক কোথায় তা আমাদের জানা নেই। তবে কয়েকটি নাম পাওয়া গিয়েছে—লোলার্ক, বরুণার্ক, পুণ্ড্রার্ক।"

শিবাজী বললো, "সত্যি, কোণারক দেখলে মাথা ঘুরে যায়। মন্দিরটা সূর্যদেবের রথের আকারে তৈরি। যে বেদির ওপর মন্দির প্রতিষ্ঠিত তার গায়ে চব্বিশখানা বিরাট চাকা খোদাই করা আছে। প্রতিটি রথচক্রের সাইজ ন'ফুট। মন্দিরের চারটে দ্বার ছিল—তিনটে দ্বার এখনও দেখা যায়। পূর্বে সিংহদ্বারে বিরাট এক সিংহমূর্তি, দক্ষিণদ্বারে একজোড়া ঘোড়া, উত্তরে একজোড়া হাতি রয়েছে।"

চোখদুটো বড় বড় করে শিবাজী বললো, "সমস্ত মন্দিরের গায়ে যা কারুকার্য খোদাই করা রয়েছে তা দেখলে মানুষের কাজ বলে বিশ্বাসই হয় না।"

ছোটমামা বললেন, "১৬২৭ খৃষ্টাব্দে রাজা পুরুষোত্তমদেব কোণারকের পরিত্যক্ত মন্দির দেখে তা মাপবার নির্দেশ দেন। তখনও এই মন্দির ২২০ ফুটের বেশী উঁচু ছিল। এখন উচ্চতা ১২৯ ফুট।"

ছোটমামার নজর এবার বুলবুলের দিকে পড়লো। তিনি বুঝলেন সে গল্প শুনতে চাইছে।

মৃদু হেসে ছোটমামা শুরু করলেন :

"বারোশ শিল্পী বারো বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে কোণারকের মন্দির তৈরি করেছিলেন। রাজা.নরসিংহদেব ওড়িশার শ্রেষ্ঠ মন্দির স্থপতিদের নিয়োগ করেছিলেন। এই মন্দির তৈরির কাজে।

বিরাট এই মন্দির যাতে যথাসম্ভব দ্রুত শেষ হয় তার জন্যে রাজা নরসিংহদেব অদ্ভুত এক হুকুম দিয়েছিলেন। কোণারকের মন্দির তৈরি শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোনো কর্মী বাড়ি ফিরতে পারবে না। নরসিংহদেব আশা করেছিলেন বাড়ি ফিরবার তাগিদে কর্মীরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্দিরের কাজ শেষ করবে।

ছোটমামা বললেন, "সেকালের প্রখ্যাত শিল্পীবা কোথাও নিজেব নাম লিখে যান নি। এই ছিল প্রাচীন ভারতের নিয়ম—তাই কালের প্রবাহ পেরিয়ে অসংখ্য সুন্দর শিল্পকর্ম আমাদের হাতে এসেছে, কিন্তু আমরা জানি না কে তাদের স্রষ্টা।"

ছোটমামা বললেন, "কোণারক মন্দির তৈরি হবার পরে অন্তত সাতশ বছর কেটে গিয়েছে। কোথাও মন্দির স্থপতির নাম নেই—কিন্তু কোণারকের আশেপাশেব গ্রামে গিয়ে জিজ্ঞেস করো, সবাই বলে দেবে, এই মন্দিরের প্রধান শিল্পীর নাম : বিশু মহারাণা।

বিশু মহারাণা যখন মন্দির তৈরির কাজ নিয়ে বাড়ি থেকে বিদায় নিলেন তখন তাঁর স্ত্রী সন্তানসম্ভবা। যথা সময়ে একটি ছেলে হলো তাঁর। কিন্তু রাজার আদেশ অনুযায়ী বিশু মহারাণা বাড়ি ফিরে ছেলের মুখ দেখে যেতে পারলেন না।

বারো বছর এইভাবে কেটে গেলো—মন্দিরের কাজও শেষ হয় না, বিশু মহারাণাও বাড়ি ফিরতে পারত না। বিশুব স্ত্রী একাই ছেলেকে আদব-যত্নে মানুষ করে চলেছেন। ছেলের নাম রেখেছেন তিনি ধর্মপাদ। আদর করে ডাকেন ধর্ম বলে।

ধর্মপাদ যাতে বংশগত স্থপতিবিদ্যা শেখে তারজন্যে মা কোনোরকম চেষ্টার ত্রুটি করলেন না। নিজেই ছোট ছেলের সঙ্গে মন্দির-গড়া-খেলায় যোগ দিতেন। আর এ-ব্যাপারে ধর্মেরও আগ্রহের অন্ত নেই। ঘণ্টাব পর ঘণ্টা সে খেলার ছলে ছোট ছোট মন্দির এবং দুর্গ তৈরি করে। প্রথম দিকে মাটি দিয়ে মন্দির-গড়া খেলায় সে বিভোর হয়ে থাকতো। তারপর কখন নিজেরই খেয়ালে সে কাঠ ও পাথর ব্যবহার শুরু করেছে।

দূর থেকে মা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলের খেলা দেখেন অর তার প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হন।

একটু বয়স হতেই ধর্মকে পাঠশালায় পাঠালেন তার মা। পড়াশোনায় তার খুব মনোযোগ। বুদ্ধি এবং শেখার আগ্রহ দেখে গুরুমশায়রাও খুব খুশী হলেন।

একদিন পাঠশালে ছাত্ররা সবাই বসে স্লেট পাথরে লিখছিল। হঠাৎ ধর্মের

হাত ফসকে পেন্সিলটা পড়ে গেলো। একটা ছেলেকে সেটা তুলে দিতে বলতেই সে ফোঁস করে উঠলো। "আমাকে হুকুম করার তুমি কে? তুমি কার ছেলে হে?"

সুযোগ পেয়ে আরও কয়েকটা পড়ুয়া ধর্মের পিছনে লাগলো। তারা বললো, "খুব তো মেজাজ তোমার! বলো দেখি তোমার বাপের নাম? কোনোদিন নিজের বাপকে দেখেছো?"

ধর্ম দুঃখে লজ্জায় মাথা নিচু করলো।

মুখ শুকনো করে সেদিন ধর্ম বাড়ি ফিরলো। তাকে দেখেই মা বুঝলেন কিছু অঘটন ঘটেছে। ছেলেকে অদর করে তিনি বললেন, "চন্দ্রভাগায় তোমার বাবা যখন থেকে মন্দির তৈরি করতে গিয়েছেন তখন থেকে তোমার মুখের হাসিটুকু দেখেই অমি বেঁচে আছি' কী হয়েছে তোমার বাছা?"

চোখের জল কোনোরকমে চেপে রেখে ধর্ম বললো, "আমার বাবাকে তো কখনও দেখিনি। আমার বাবা বাড়ি আসেন না কেন? আজ পাঠশালার ছেলেরা আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করলো, বললো আমার নাকি বাবাই নেই।"

মা ফোঁস করে উঠলেন। "কে বলে তোমার বাবা নেই? কার এতোবড়ো আস্পর্ধা? পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর যে মন্দিরটি এখন তৈরি হচ্ছে তোমার বাবা তার প্রধান স্থপতি।"

একটু থেমে মা বললেন, "আমি তো তোমাকে অগেও বলেছি, ভুবনবিখ্যাত স্থপতি পরিবারের ছেলে তুমি! তোমাদের বংশের শিল্পীরাই উৎকলের বিখ্যাত মন্দির এবং দুর্গ তৈরি করেছেন। এতো বড় বংশে জন্ম হওয়া কি কম সৌভাগ্যের কথা?"

মায়ের কাছে বসে বসে ধর্ম ক্রমশ তার পিতৃপুরুষদের অবিশ্বাস্য কীর্তি-কাহিনী শুনতে লাগলো।

ছেলেকে আদর করে মা বললেন, "তোমাদেরই পূর্বপুরুষ শ্রীক্ষেত্র পুরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেই মন্দিরের কাজ দেখে স্বয়ং রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শিল্পীকে পুরস্কার দিয়েছিলেন। সম্রাট খরভেলার আদেশে তোমাদেরই পূর্বপুরুষরা উদয়গিরি গুহায় পাথর কেটে অমর শিল্পীকীর্তি সৃষ্টি করেছিলেন। একাম্রকানন, অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে, শিবের মন্দির তৈরির দায়িত্ব রাজা ললাটেন্দুদেব তোমাদের পূর্বপুরুষকেই দিয়েছিলেন। কটকে বরাবতি দুর্গ সংস্কারের কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন তোমার ঠাকুর্দা। সেই যে কাজে বেরিয়েছিলেন তিনি আর ফেরেন নি।

দুর্গ সংস্কার শেষ হবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।"

পূর্বপুরুষদের শিল্পকীর্তির কথা শুনতে-শুনতে ছোট ছেলের বুক গর্বে ফুলে উঠতো।ধর্ম বলতো, "মা, তুমি দেখে নিয়ো আমিও একদিন মস্ত শিল্পী হবো।"

মা ছেলেকে কাছে টেনে অদর করতে লাগলেন। তিনি চান তাঁর সন্তানের প্রতিভায় এই বংশের গৌরব আরও বেড়ে উঠুক।

ধর্ম এবার তার বাবার কথা জানতে চাইলো। 'বাবা কোথায় গিয়েছেন? এখন তিনি কী করছেন?"

মা মনের দুঃখ চেপে রেখে ছেলেকে বললেন, "সূর্যদেবের স্তুতিতে রাজা নরসিংহদেব এমন এক মন্দির স্থাপনা করতে চান সারা বিশ্বে যার জুড়ি থাকবে না। তোমার বাবার ওপরেই এই মন্দির তৈরির দায়িত্ব চেপেছে। কিন্তু রাজার আদেশ, যত্দিন না এই মন্দির শেষ হচ্ছে ততদিন কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে কেউ বেরিয়ে আসতে পারবে না, প্রিয়জনদের দেখবার জন্যে বাড়িতে আসা সম্পূর্ণ নিষেধ।"

মা আরও বললেন, "পবিত্র তীর্থক্ষেত্র চন্দ্রভাগায় সমুদ্রতীরে তোমার বাবা কোণারক মন্দির তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছেন—তাই তোমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়নি। তবে অমি লোকমুখে শুনেছি, মন্দির তৈরির কাজ প্রায় শেষ হয়েছে। এবার নিশ্চয় তিনি বাড়ি ফিরে আসবেন।"

ধর্ম কয়েকদিন ধরে এক মনে কীসব ভাবলো। তারপর একদিন মাকে বললো, "মা, তুমি আমাকে চন্দ্রভাগায় যাবার অনুমতি দাও। ওখানে আমি তীর্থ করবো আর সেই সুযোগে আমার বাবকে দেখে আসবো। এতোদিন ধরে বাবা যে-মন্দির করছেন তা শেষ হতে কতো দেরি তাও আমার জানা হয়ে যাবে। তুমি কয়েকদিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে সব খবর পেয়ে যাবে। এইভাবে মুখ বুজে কষ্ট পেতে হবে না তোমাকে।"

বুলবুল এবার বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, "রাজা না হয় বাড়িতে আসতে বারণ করেছিলেন, কিন্তু ধর্মের বাবা তো মাঝে-মাঝে চিঠি পোস্ট করতে পারতো। আমার বাপি তো বাইরে গেলে তাই করে।"

ছোটমামা বললেন, "চিঠি পোস্টিং-এর ব্যবস্থা থাকলে তবে তো। তখন তো রাজকার্য ছাড়া সাধারণ মানুষদের জন্য কোনো ডাকব্যবস্থা ছিল না। নিতান্ত চেনাশোনা কারুর হাতে দিয়ে ছাড়া চিঠি পাঠাবার কোনো উপায় ছিলো না।" ছোটমামা বললেন, "এই ডাকব্যবস্থা, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন—এসব আমরা হাতের পাঁচ মনে করি। কিন্তু এইসব সামান্য সুযোগের জন্য সাধারণ মানুষকে হাজার হাজার বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।"

ধর্মের কথায় ফিরে গেলেন ছোটমামা। বললেন, "চন্দ্রভাগা যাবার প্রস্তাবে মা কিছুতেই রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু ছেলেও নাছোড়বান্দা, সে বার বার মাকে বলতে লাগলো, "একবার অমাকে যাবার অনুমতি দাও মা।"

অগত্যা মা রাজী হলেন। ঠাকুরের কাছে ছেলের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন। "ঠাকুর আমার চোখের এই মণিটিকে নিরাপদে রেখো।"

বাগান থেকে কতকগুলো জাম তুলে আনলেন ধর্মের মা। বললেন, "এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাও। এই জাম খেয়েই তোমার বাবা তোমাকে চিনতে পারবেন—এমন মিষ্টি জাম আমাদের বাগান ছাড়া কোথাও হয় না।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে বারো বছরের ধর্মপাদ চন্দ্রভাগার দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

এইটুকু বয়স, অজানা পথ—তবু ধর্মপাদের মনে কোনো ভয় নেই। চন্দ্রভাগার কাছে যেখানে সূর্যদেবের মন্দির তৈরি হচ্ছে সেখানে নিজের বাবাকে সে খুঁজে বার করবেই।

অবশেষে দূর দিগন্তে নীল সমুদ্র দেখতে পেলো ধর্মপাদ। শত শত অশান্ত ঢেউ ক্রুদ্ধ পশুর মতো গর্জন করতে করতে সোনালী সমুদ্রতটে আছড়ে পড়ছে। সমুদ্রের শাসন অমান্য করে ছোট ছোট ডিঙি নৌকা অজানা উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছে। কিছু জেলে বহুক্ষণের সমুদ্রপাড়ি শেষ করে অনেক মাছ নিয়ে তীরে ফিরছে। কিছু লোভী চিল মাছের লোভে ডিঙির মাথার ওপর পাক খাচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে সমুদ্রের ধারে নতুন মন্দিরের দিকে নজর পড়ে গেলো ধর্মপাদের। এতো সাধারণ মন্দির নয়—যেন পাথরের কবিতা! বিস্ময়ে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না ধর্মপাদ।

আরও কাছে এগিয়ে এসে ধর্মপাদ বুঝতে পারলো বিরাট এক অঞ্চলে বিরামহীন কর্মযজ্ঞ চলেছে। অসংখ্য শিল্পী অপন মনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছেন। ছেনী ও বাটালীর বিচিত্র শব্দে এই জনপদ মুখর হয়ে উঠেছে—ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা বিরাট বিরাট পাথরের বুক থেকে অপরূপ মূর্তি কুঁদে বের করে আনছেন।

অসংখ্য কর্মীর এই ভীড়ের মধ্যে ধর্ম কী করে বুঝবে কে তার বাবা? মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে ধর্মপাদ এবার বাবার নাম করলো। প্রধান স্থপতি বিশু মহারাণাকে এখানে কে না চিনবে?

অবশেষে পিতাপুত্রের সেই বহু অকাঙ্ক্ষিত মিলন হলো। বাবার হাতে মায়ের দেওয়া জামগুলো তুলে দিলো কিশোর ধর্মপাদ। যে সন্তানকে দেখবার জন্যে

একযুগ ধরে অসহায়ভাবে ছটফট করছেন তাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে চোখের সামনে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন কোণারকের প্রধান স্থপতি।

ছেলের হাত ধরে ঘুরে ঘরে মন্দির প্রাঙ্গণের সমস্ত কাজকর্ম দেখালেন বিশু মহারাণা।

পূর্বমুখী দেউলের দিকে অনন্ত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো বারো বছর বয়সের ধর্মপাদ। সূর্যসারথী অরুণের মূর্তি বসানো স্তম্ভটি অনেকক্ষণ ধরে দেখেও চোখের তৃষ্ণা মিটছে না। মন্দিরের গায়ে অপূর্ব কারুকার্যের সমারোহ। নীচের শ্রেণীতে জীবজন্তু, সৈনিক, নাগরিক, শিকার-বাহিনী, শোভাযাত্রা, বিভিন্ন নরনারীর প্রতিকৃতি খোদিত রয়েছে।

রাজা, রাজধানী, হাতি, ঘোড়া, উট, জিরাফ এবং বণিকের মূর্তিও দেখা যাচ্ছে। গাছের ছায়ায় গোরুর গাড়ি এবং রন্ধনে ব্যস্ত নারীর মূর্তি অবাক বিস্ময়ে দেখলো ধর্মপাদ।

মন্দিরের ওপর দিকে নৃত্যরত দেবতা ও নর্তকীদের মূর্তি দেখে মুগ্ধ হলো ধর্মপাদ। এমন এক মন্দির তার বাবার মনের মধ্যে প্রথম সৃষ্টি হয়েছে! ধর্মপাদেব বুক গর্বে ফুলে উঠছে।

ছেলের হাতটি সস্নেহে জড়িয়ে ধরে প্রধান স্থপতি বললেন, "রাজা নরসিংহদেব চান এমন এক মন্দির যা সমস্ত বিশ্বকে মুগ্ধ করবে। দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা আসবে সূর্যদেবের চরণে তাদের পূজা নিবেদন করতে।"

বিশু মহারাণা এবাব একটু থামলেন। "বাবো বছর ধরে কাজ চলেছে—এখনও মন্দির সম্পূর্ণ হলো না। কাজ সম্পূর্ণ করার জন্যে রাজা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মন্দির প্রায় শেষ, শুধু চূড়ায় ওই কলসটুকু বসানো বাকী। কলস বসানোর বহু চেষ্টা করেছি অমরা—কিন্তু প্রত্যেকবারই কলস ভেঙে পড়েছে। কোথাও নিশ্চয় জটিল অঙ্কের কোনো ভুল হয়ে গিয়েছে। না হলে এমন হবে কেন?"

ছেলের সামনে বাবা আবার থামলেন, তারপর দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জানালেন, অধৈর্য রাজা গতকাল অদেশ দিয়েছেন, মন্দির শেষ হবার জন্যে তিনি অনন্তকাল অপেক্ষা করবেন না। যদি আগামী তিন দিনের মধ্যে কাজ শেষ না-হয় তাহলে এখানকার সমস্ত কর্মীকে শূলে চড়ানো হবে।

ধর্মপাদ এবার বাবার মুখেই শুনলো, আজ সন্ধ্যায় সমস্ত শিল্পীদের এক সভা হবে পরিস্থিতি অলোচনার জন্য। কিন্তু কোনো আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। নিরাপদে কলস বসানোর কোনো পথই বার করা যাচ্ছে না।

এতোদিন পরে বাবা ও ছেলের মিলল—কিন্তু সামনেই নিষ্ঠুর মৃত্যুর সর্বনাশা ছায়া। ধর্মের মন খুব খারাপ হয়ে গেলো। সে ঠিক করলো সন্ধ্যায় আলোচনার সময় সে উপস্থিত থাকবে।

কর্মীদের সভা যথাসময়ে শুরু হলো। অনেকে অনেক রকম প্রস্তাব তুললেন, কিন্তু কোনোটাই খুব কাজের মনে হলো না।

শেষ মুহূর্তে বারো বছরের কিশোর ধর্মপাদ উঠে দাঁড়ালো। জোড়হাতে সবিনয়ে সে বললো, "দয়া করে আপনারা আমাকে একটা সুযোগ দিন। আমার বয়স যদিও কম তবু আমার মনে হচ্ছে মন্দিরের মাথায় ওই ভারি পাথরটা আমি লাগাতে পারবো। আপনারা দয়া করে না বলবেন না।"

একরত্তি ছেলেকে এই কথা বলতে শুনে উপস্থিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কেউ কেউ বললেন, "এতোগুলো অভিজ্ঞ শিল্পী প্রাণপণ চেষ্টা করেও যা পারলো না তা এককফোঁটা ছেলে কী করে পারবে। ছোঁড়াটা বড়-বড় কথা বলছে।"

কিন্তু অনেকেই বললেন, "এখন নিজেদের মান-সম্মান দেখানোর সময় না। আমরা যখন মন্দিরের চূড়ায় কলস বসাতে ব্যর্থ হয়েছি, তখন এই ছেলেটিকে একবার সুযোগ দিতে বাধা কী? তাতে তো কিছু এসে যাচ্ছে না।

"যথেষ্টই এসে যাচ্ছে," বললেন, আর এক দল। "যখন সবাই জানবে, বারো শ' নামকরা লোক যা পারেনি বারো বছরের একটা ছেলে তা করেছে, তখন লোকে আমাদের সম্বন্ধে কী ভাববে? খবরটা যখন রাজার কানে পৌঁছবে তখন কী তোমরা ভাবছো তিনি আমাদের জ্যান্ত রাখবেন?"

একজন বৃদ্ধ শিল্পী অনেকক্ষণ ধরে সমস্ত কথা শুনছিলেন। তিনি এবার মুখ খুললেন। "কলস লাগুক আর না লাগুক দু'দিক থেকেই আমাদের প্রাণ-সংশয়। এক্ষেত্রে কলস লাগানোই ভাল ; কারণ আমাদের জাতের মানটুকু অন্তত রক্ষা পাবে। কিন্তু এই মন্দির যদি অসম্পূর্ণ থেকে যায় তাহলে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ আমাদের অপবাদ দেবে। সুতরাং আমাদের নিজদের ইজ্জতের কথা না ভেবে এই ছেলেটির ওপরই দায়িত্ব দেওয়া যাক।"

পরের দিন সূর্য ওঠার মুহূর্ত থেকেই ধর্মপাদ নিজের কাজে লেগে গেলো। সমস্ত মন্দির প্রাঙ্গণ সে বহুক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়ালো, প্রতিটি স্তম্ভের খুঁটিনাটি সে মন দিয়ে লক্ষ্য করলো, মনে মনে অনেক জটিল অঙ্ক কষলো, তারপর ধীরে ধীরে মন্দিরে শীর্ষে উঠে গেলো যেখানে বহু চেষ্টা করেও শেষ পাথরটি বসানো সম্ভব হয় নি। আজ সমস্ত রাত ধর্মপাদ ওখানেই থেকে যাবে এই সঙ্কল্প করলো।

কোণারকের চতুর্দিকে সমস্ত কর্মীশিবিরে সে রাত্রে প্রবল উদ্বেগ—কেউ

ঘুমোতে পারলেন না। পরের দিন ভোরে সূর্যের আলো ফুটে উঠবার আগে সবাই বিস্ময়ে দেখলেন মন্দিরশীর্ষে নিরাপদে কলস বসে গিয়েছে।

ধর্মপাদ লাফাতে লাফাতে নিচে নেমে এলো এবং বাবাকে জড়িয়ে ধরলো। সূর্য ও বিষ্ণুর জয়ধ্বনিতে পদ্মক্ষেত্র মুখরিত হয়ে উঠলো—বারো শ' শিল্পী গর্বে ও আনন্দে বারো বছরের বালককে অশীর্বাদ করলেন।

অবশেষে মন্দিরের কাজ শেষ হলো—বারো বছর ধরে বুকের ওপর চেপে থাকা পাথর সরে গেলো। ঊষা লগ্নে শিবিরে শিবিরে আনন্দের ঢেউ বইতে লাগলো।

কিন্তু সে-আনন্দ মাত্র কিছুক্ষণের জন্য। একটু পরেই সবার মুখে অনাগত বিপদের ছায়া নেমে এলো।

কিশোর ধর্মপাদ এর কারণ জানতে চাইলো।

বিশিষ্ট শিল্পীরা বিষণ্ণ মুখে বললেন, "তুমি এক-শ বছর বেঁচে থেকে বহু মন্দিরের স্রষ্টা হও। তোমার আজকের কীর্তি গোপন থাকবে না—রাজার কানে খবরটা যাবেই। তিনি অবশ্যই তোমাকে পুরস্কৃত করবেন, আর আমাদের জন্যে কী শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তা তো আমরা জানি।"

খুব মন খারাপ হযে গেলো ধর্মপাদের। তাতে আমার কোনো লাভ হবে না। আমার পুরস্কার পাওয়া যদি আমার আপনজনদের মৃত্যুর কারণ হয় তা হলে সে পুরস্কার কোনো কাজে লাগবে না। এই আশ্চর্য মন্দির, ষোড়শদল পদ্মের মতো এই অসাধারণ স্থাপত্যকর্ম আপনাদেরই সৃষ্টি, আমি কেবল মন্দিরের মাথায় শেষ পাথরটি বসিয়ে দিয়েছি। না, আমার কোনো পুরস্কারের প্রয়োজন নেই। এই বলে চোখ মুছতে মুছতে ধর্মপাদ দূরে সরে গেলো।"

ধর্মপাদ মন্দিরের এক কোণে বসে বসে ভাবলো, "যদি আমার বাবা এবং প্রিয়জনরা আমার জন্যেই চরম বিপদে পড়েন তা হলে এই জীবনের মূল্য কী? একটি প্রাণের বিনিময়ে যদি এতোগুলো পরিবার রক্ষা পায় তা হলে তাই ভাল।"

ধর্মপাদ কারুর সঙ্গে কোনো কথা না বলে সবার অলক্ষ্যে মন্দির শীর্ষে উঠে গেলো।

প্রভাত সূর্যের সোনালি আলো তখন সবেমাত্র সূর্যমন্দিরের চূড়ায় এসে পড়েছে। বাবাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে বারো বছরের ছেলে মৃত্যুকে বরণ করবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো নীচে।

"নিজেকে বিসর্জন দিয়ে ধর্মপাদ বাবাকে এবং বহু লোককে রক্ষা করলো।" গল্প শেষ করতে গিয়ে ছোটমামা লক্ষ্য করলেন, বুলবুল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তিলক ও শিবাজীর চোখও শুকনো নেই।

ছোটমামা বললেন, "মাত্র বারো বছর বয়সে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে অমর হয়ে রইলো ধর্মপাদ। শত শত বছরের দূরত্ব পেরিয়ে তার কথা আজও ওড়িশার মানুষ সস্নেহে এবং সগর্বে স্মরণ করে।"

তিনটি ছেলেমেয়ের দুঃখ তবু শেষ হয় না। তারা কেঁদেই চলেছে। ছোটমামা কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না।

এমন সময় হৈ হৈ করে তিলক, শিবাজী ও বুলবুলের মা বাড়ি ফিরলেন। সমস্ত বাজারহাট এবং বিয়ের সব নেমন্তন্ন তাঁরা সেরে এসেছেন।

ওঁরা তিনজন ঘরে ঢুকেই চমকে উঠলেন। 'হ্যাঁরে, কী হলো তোদের? কাঁদছিস কেন? ছোটমামা তোদের বকাবকি করেছে? নিশ্চয় খুব দুষ্টুমি করছিলি।" তিন মা একসঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন।

তিন দিদির দিকে মুখ ফিরিয়ে ছোটমামা বললেন, "এইসব হীরের টুকরো ছেলেমেয়েকে কোন দুঃখে আমি বকতে যাবো? গল্পময় ভারতের সঙ্গে আমি ওদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলাম?"

তিলক, শিবাজী ও বুলবুল এবার নিজেদের সামলে নিয়ে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো, "ছোটমামা, তুমি যেসব গল্প আজ বললে তা চিরকাল আমাদের মনে থাকবে।"

এই তো সেদিন

উৎসর্গ : পরলোকগত লালচাঁদ রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বন্ধুবর শ্রীদিলীপ রায়
প্রীতিভাজনেষু

যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি অনেক, দিইনি কিছুই।

লেখকের নিবেদন :

আমার প্রথম বই কত অজানারে লেখার সূত্রপাত ১৯৫৩ সালে। এই রচনার ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু হয় ১৯৫৪ সালে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশ পরের বছরে। কলকাতা হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্রে আমার জীবনের এই অধ্যায়ে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছিল যা সহজবোধ্য কারণে প্রথম বইতে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। ভেবেছিলাম, কিছু-কিছু প্রসঙ্গ চিরদিনের মতোই অপ্রকাশিত রাখবো। কিন্তু তিরিশ বছরের দূরত্ব পেরিয়ে এখন মনে হয় কোনোকিছু গোপন রাখার অর্থ হয় না। যাঁদের দেখেছিলাম তাঁদের অনেকেই এখন ইহজগতে নেই, কেবল আমি অপ্রকাশিত স্মৃতির গুরুভার বহন করছি। আমার বয়সও বাড়ছে, সুতরাং যথাসর্বস্ব প্রকাশ করে এবার আমি দায়মুক্ত ও ভারমুক্ত হতে চাই।

এই বইয়ের দু'-একটি পরিচ্ছেদ ইতিমধ্যেই অন্যত্র গ্রন্থবন্দী হয়েছিল—সমস্ত অধ্যায়গুলিকে একত্রিত করার বিশেষ প্রয়োজনে সেগুলিও পুনর্লিখিত অবস্থায় এখানে সংযুক্ত করা হলো। কত অজানারের পরিপূরক এই গ্রন্থটি পাঠকদের ভাল লাগবে এই আশা রইলো।

প্রথম সোনার ধান

নিত্যনতুন ঘটনার ঘনঘটায় আমার কৈশোর ও যৌবনের স্মৃতিগুলো যখন ক্রমশ অস্পষ্ট এবং বিবর্ণ হয়ে উঠছিল, ঠিক সেই সময়ে দেশ পত্রিকার লেটার-হেডে লেখা সম্পাদকের চিঠিটা এক বিপর্যয় ঘটিয়ে দিলো। সম্পাদকমশায় হুকুম করেছেন পুরনো দিনের ঘটনা লিখতে— কেন লেখক হলাম, কেমন করে লেখক হলাম, কেমন করে বই ছাপানো হলো ইত্যাদি সমস্ত খবরাখবর পাঠকদের জানিয়ে দিতে। এক কথায় গল্প লেখকের গোপন গল্পটাই লিখে ফেলতে বলেছেন তিনি।

কী আশ্চর্য, সম্পাদকের কথামতো কলম ধরার সঙ্গে-সঙ্গে কলকাতার আকাশ হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছে।

বাইরে অকালবর্ষণ শুরু হয়েছে, আর ঘরের ভিতর আমি কলমের পিছন দিকটা কামড়ে সেই ১৯৫৪ সালে ফিরে যাবার চেষ্টা করছি, যে-দিন কলকাতার চিৎপুর রোডের ধারে বর্মন স্ট্রীটে আনন্দবাজার পত্রিকার জীর্ণ মলিন বাড়িটার দোতলায় দেশ পত্রিকার অফিস ঘরে সম্পাদকের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল।

দৃশ্যটা এইরকম ঃ সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি গায়ে সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ একমনে দামী কলমে প্রুফ সংশোধন করছেন। আমাকে যিনি বর্মন স্ট্রীটে নিয়ে গিয়েছিলেন সেই শ্রীগৌরকিশোর ঘোষ তাঁকে বললেন, "নতুন যে-ছেলেটির কথা বলেছিলাম তাকে এনেছি।"

গৌরবাবুর কথায় মুখ তুলে সম্পাদক আমার দিকে তাকালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "কি লিখেছেন—উপন্যাস, না রম্যরচনা?"

আমি কী উত্তর দেবো বুঝতে পারছি না—একটু তোতলামো এসে গিয়েছে। গৌরবাবু রক্ষে করলেন, বললেন, "উত্তর দেওয়া শক্ত। আপনি বরং পড়েই দেখুন।"

প্রুফের সংশোধনে আবার মন দিয়ে সাগরময় বললেন "রেখে যান।" আমি কম্পিত হাতে আমার পাণ্ডুলিপির কয়েকটি পরিচ্ছেদ সম্পাদকের দিকে এগিয়ে দিলাম। তিনি বেমালুম সেগুলো ডানদিকের ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে

বললেন, "চার সপ্তাহ পরে খোঁজ করবেন।"

সম্পাদক আবার কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন, আর আমি গৌরবাবুর সঙ্গে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। তিনি বললেন, "দেখুন কী হয়—আপনাকে আমি আসল লোকের কাছেই পৌঁছে দিয়েছি।"

সাহিত্যের দরবারে "আসল" লোকেব কাছে পৌঁছে গিয়েছি আমি—কিন্তু আমাকে এখনও অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং এই সুযোগে সুদূর অতীতটা একবার ঘুরে আসা যাক।

সাহিত্যের কথা দিয়েই বোধহয় আজকের কাহিনীটা শুরু করা উচিত। তাই প্রথমেই জানিয়ে রাখি আমার জন্ম পথের পাঁচালীর দেশ বনগ্রামে। তখনকার জেলা যশোহর। সেই ছোটবেলায় মফস্বল ছেড়ে আমরা ই-বি রেলপথে শিয়ালদহ স্টেশন দিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ায় হাজির হয়েছিলাম। দু' বছর হাওড়া জেলা স্কুলে পড়বার পরে অনিবার্য কারণে ভর্তি হয়েছিলাম খুরুট রোডে হাওড়া বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনে। বাংলার বহু ছেলের মতো আমার প্রথম লেখাও ইস্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছিল—তখন আমি ক্লাস এইটের ছাত্র।

সাহিত্যের সঙ্গে আমার পিতৃদেব হরিপদ মুখোপাধ্যায়ের একদা নিবিড় সংযোগ ছিল—অতীতে তাঁর কিছু বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছিল এবং তাব মধ্যে একটি নাটক (রাণী দুর্গাবতী) কোহিনূর থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল এবং সে যুগে চতুর্থ সংস্করণের মুখ দেখেছিল। সংসারের চাপে এরপর বাবা সাহিত্য-সৃষ্টি থেকে সরে এসেছিলেন এবং দুঃখের সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন যে সাহিত্যের নেশায় তাঁব আসল পেশা ওকালতি ইতিমধ্যেই বেশ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ইস্কুল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রথম লেখা হতে নিয়ে বিপুল আনন্দে বাড়ি ফিরে এসে কারও কাছে উৎসাহ পাওয়া তো দূরের কথা বাবার কাছে বেশ বকুনি খেয়েছিলাম। "এইসব পাকামি" না-করে, মন দিয়ে অঙ্ক কষবার পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি।

তখন বেশ মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, একটু অভিমানও হয়েছিল। কিন্তু বাবা কেন বিরক্ত হয়েছিলেন তা পরে বুঝেছি। বাবা চাইতেন, তাঁর ছেলেরা যেন কম বয়সে তাঁর মতো ভুল না করে—সাহিত্যের সোনার হরিণের পিছনে ছুটে-ছুটে তারা যেন অরণ্যে পথ না হারায়।

বাবার এই মনোভাব শেষ পর্যন্ত আমার ওপর কী প্রভাব বিস্তার করতো তা কে জানে? কিন্তু তিনি একদিন অকস্মাৎ দ্বিতীয় পক্ষের বিরাট সংসার আর্থিক অনিশ্চয়তার সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে জীবনসাগরের ওপারে পাড়ি দিলেন। সেই থেকেই শুরু হলো আমার অগ্নিপরীক্ষা।

আমার বয়স তখন মাত্র চোদ্দো। ম্যাট্রিক পাস করে কোনো রকমে কলেজে এসে ঢুকলাম। মন পড়ে রয়েছে চাকরির দিকে। কিন্তু অজানা কলকাতা শহরে ওই বয়সের অচেনা ছেলেকে কে চাকরি দেবে?

সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার খবরদারির অভিভাবক না থাকায় আই-এ পড়বার সময় সুরেন্দ্রনাথ কলেজের ম্যাগাজিনেও চুপি-চুপি একটা লেখা পাঠিয়েছি। (এই কলেজ সম্বন্ধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধার কারণ, আমাদের দেশের লোক ও পথের পাঁচালীর অমর স্রষ্টা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ও একদা রিপন কলেজে পড়াশোনা করেছিলেন।) সৌভাগ্যবশত পাণ্ডুলিপি অবস্থায় অপরিচিত ছাত্রের রসরচনাটি পড়ে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের সহৃদয় সহ-অধ্যক্ষ শ্রী পি কে গুহ আমাকে ডেকে পাঠান এবং বাকি মাইনে মকুব করেন। একটিমাত্র লেখার সৌভাগ্যে আমি কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের নজরে পড়ে যাই। আমার দু'-একজন শুভানুধ্যায়ীরও এই সময় ধারণা হয়, আমি আগামী আই-এ পরীক্ষাতেও খুব ভাল করবো। কিন্তু তাঁদের সকলকে নিরাশ করে আমি সাধারণ ফার্স্ট ডিভিশনে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজকে শেষ নমস্কার জানিয়ে ভগ্নহৃদয়ে মহাত্মা গান্ধীর নামাঙ্কিত পথে এসে দাঁড়ালাম।

একটা চাকরি যোগাড়ের জন্যে তখন আমি পাগলের মতো পথে পথে ঘুরছি, কিন্তু সামনে অজস্র বাধা—বিরাট এই শহর কলকাতার উঁচু পোস্টে কর্মরত কাউকে চিনি না, আমার জামা-কাপড় ময়লা এবং তার ওপর আইনত আমি নাবালক। অগত্যা রাস্তায় ফেরিওয়ালাগিরি করেছি, অর্ডার সাপ্লায়ের নামে দোকানে-দোকানে কিছু মাল বিক্রির চেষ্টা করেছি। এমন অবস্থায় একদিন ক্যানিং স্ট্রীটের চায়ের দোকানে এক অপরিচিত লোককে জিগ্যেস করি, "যাদের কেউ নেই তারা এই শহরে কেমনভাবে বেঁচে থাকে?" ভদ্রলোক বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে বললেন, "অসহায় মধ্যবিত্ত বাঙালিকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যে দু'জন 'ম্যান' সবসময় রয়েছেন—মহাত্মা হ্যানিম্যান এবং মহাত্মা পিটম্যান। অগতির গতি হোমিওপ্যাথি, না হয় শর্টহ্যান্ড।"

মূল্যবান উপদেশ পেয়ে পিটম্যানের পবিত্র নাম স্মরণ করে আমি শর্টহ্যান্ডের মধ্যে ডুবে গেলাম। আমার স্বর্গত পিতৃদেবের স্নেহভাজন বন্ধু অ্যাডভোকেট

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বসুর একটি টাইপরাইটার মেশিন ছিল। নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে এই আনাড়ির হাতে মূল্যবান যন্ত্রটি তিনি নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেন।

লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছি, এই দুঃখ ভুলবার জন্যে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে পড়াশোনা করতাম এবং মাঝে-মাঝে গুরুগম্ভীর কিছু লেখবারও চেষ্টা করতাম। এমনই একটা লেখা আমাদের পাড়ার জনৈক সহৃদয় দাদা শ্রীভবেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের মাধ্যমে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের হাতে পৌঁছয় এবং রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ইস্কুল-কলেজের পত্রিকার বাইরে সরকারীভাবে এইটাই আমার প্রথম প্রকাশিত লেখা।

ভবেশদা বললেন, "দেখো, ওরা নিশ্চয় কিছু টাকা দেবে।" কয়েক সপ্তাহ অপেক্ষা করলাম—কিন্তু প্রত্যাশা পূরণ হলো না। বসুমতীতে আবার লেখা পাঠালাম—আবার প্রকাশিত হলো। এবার সাহস পেয়ে আনন্দবাজারে লেখা পাঠালাম। সে-লেখাও রবিবারে প্রকাশিত হলো। আমি নিজের দুঃখ কিছুটা ভুলতে পারলাম। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, লেখাপড়া শিখি নি—কিন্তু আমার লেখা তো বড়-বড় কাগজে ছাপা হয়।

ইতিমধ্যে যে-সব বিচিত্র কাজকর্মের মাধ্যমে নতুন এক জগতের সন্ধান পেলাম, তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেবো না। সেইসব ঘটনার কিছু-কিছু ইঙ্গিত আমার কয়েকটা বইতে ('যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ' ও 'জন-অরণ্য') ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। অবশেষে শর্টহ্যান্ডের শিরোপা মিললো। ইস্কুলে আমার সহপাঠী অনিলের দাদা শ্রীবিভূতি রায় আমাকে বিখ্যাত ব্যারিস্টার নোয়েল বারওয়েলের কাছে নিয়ে গেলেন। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টারের অন্যতম শেষ বাবু হবার সম্মানটি বিধাতা বোধহয় আমার জন্যেই তুলে রেখেছিলেন।

সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কী ছিল বিধাতার মনে হাওড়ার এক অনভিজ্ঞ, স্বল্পশিক্ষিত, কৃশকায় ছোকরাকে চৌধুরীবাগানের অন্ধকার গলি থেকে বের করে এনে তিনি মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিলেন এমন একজন বিদেশীর সামনে যাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বহু প্রচারিত, কলকাতা হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্রে যিনি প্রথিতযশা। একজন হাওড়া শহরের বাইরে কখনও কোথাও যায়নি, শীর্ণ শরীরটার ওপর হেঁড়ে মাথা, জীবনে সে কখনও সাহেব দেখেনি—আর একজন কেমব্রিজের এম-এ, মিলিটারির অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, নানা সম্মানে ভূষিত প্রথম মহাসমরের বীর যোদ্ধা।

বিভূতিদা, আপনি শতায়ু হোন, ঈশ্বরের সমস্ত আশীর্বাদ আপনার ওপর বর্ষিত হোক। আপনার জন্যেই দারিদ্র্যে-ভরা হাওড়ার এক হতাশ বিভ্রান্ত বালক সায়েব-ব্যারিস্টারের কাছে চাকরি পেলো—তার জীবনের গতিপথ পরিবর্তিত হলো। ভোর বেলার সূর্য পরম স্নেহে সদ্য প্রকাশিত কুঁড়ির ওপর প্রাণের স্পর্শ এঁকে দিলেন, শতদল পদ্মের মতো তার জীবন নিঃশব্দে বিকশিত হয়ে উঠলো।

পড়াশোনা করে খুব বড় হবার যে-স্বপ্ন একদিন দেখেছিলাম, তা সফল হয়নি বলে নির্জনে চোখের জল ফেলতাম। কিন্তু রসিক বিধাতা মধুসূদন দাদার ছদ্মবেশে বিজন অরণ্য থেকে বেরিয়ে আমাকে এমন উপহার দিলেন যা কোনোদিন স্বপ্নেও চাইতে পারি নি। সেই ছোটবেলায় প্রথম যখন মধুসূদনদাদার গল্প পড়েছিলাম তখন চোখের জল রোধ করতে পারি নি। অসহায় বালকের দুঃখ সহ্য করতে না পেরে মধুসূদনদাদা-বেশী ঈশ্বর বন থেকে বেরিয়ে এসে তার হাতে একটা ভাঁড় দিয়েছিলেন। যে-ভাঁড় কখনও ফুরোয় না। যা চাওয়া যায় ভাঁড় উল্টে দিলে তাই এসে পড়ে। এমন পাওয়ার জন্যে আমি নিজেও তো প্রস্তুত ছিলাম না—সে-সব কথা ভাবলে আজও চোখ জলে ভরে ওঠে।

এই মধুসূদনদাদার গল্প সম্বল করেই একদিন সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলাম এবং সেই উদ্দেশ্যেই বর্মন স্ট্রীটের 'দেশ' আপিসে সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।

আইন পাড়ার অদ্ভুত এই বিদেশী মানুষটির কথা একটি বইতে ইতিমধ্যেই বলেছি। কিন্তু যতই বলি, আমার কাছে তা কোনদিনই পুরনো হতে চায় না। পুনরাবৃত্তিকে সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা অপরাধ মনে করেন তাঁরা অনুগ্রহ করে এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করবেন।

নতুন কর্মজীবনে বিদেশী বন্ধুর প্রসন্ন প্রশ্রয়ে আমার চোখের সামনে ক্রমশ এক আশ্চর্য নতুন জগৎ উন্মোচিত হতে আরম্ভ করলো।

কলকাতা হাইকোর্টের বিরাট লাল বাড়িটা দূর থেকে এর আগে কয়েকবার দেখেছি—কিন্তু তার মধ্যে যে এত নাটক ও মহাকাব্য ছড়িয়ে রয়েছে তা জানতাম না। এইসব ঘটনার অনেক তাৎপর্য আমার পক্ষে একলা বুঝে ওঠা সম্ভব হতো না—কিন্তু প্রথম দিকে বিভূতিদা এবং পরে সায়েব নিজেই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আমার সমস্ত কৌতূহলের অবসান ঘটাতেন।

হাজার ব্যস্ততার মধ্যেও এই সদাপ্রসন্ন মধুসূদনদাদা আমাকে হাইকোর্টের নানা কাহিনী শোনাতেন। ইংরিজি কথাবার্তায় আমার মোটেই অভিজ্ঞতা ছিল না—তাই মুখ খুলতে ইচ্ছে করতো না। সেটা আন্দাজ করে সায়েব আমাকে

নির্ভয়ে ইংরিজি বলতে বাধ্য করতেন—এবং যথাসময়ে চা খেতে-খেতে আমাব ভুলগুলো সংশোধন করে দিতেন।

আমার মনে আছে মিটমিট করে হেসে তিনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমাব চমৎকার ইংরিজি। যা একটু-আধটু অসুবিধে আছে তা ঠিক করে নিতে মাত্র দশদিন লাগবে। যাদের কোনোদিনই ইংবিজি বলতে শেখানো যাবে না তারা হলো স্কটল্যান্ড থেকে আসা পাটকলের সায়েবগুলো!"

মনে আছে, ছোট ছোট মন্তব্যে চৌধুরী বাগানের আনকোরা বাবুর মনের মধ্যে তিনি আত্মবিশ্বাসের বীজ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন—ইংরিজি কথা বলবার ভয় আমার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কেটে গিয়েছিল।

ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের টেম্পল চেম্বারের আদালতী কাজের মধ্যে ডুবে থেকেও তিনি আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন—যেন আমিও আইন-টাইন বেশ বুঝি! ইংরিজিতে কোনো জটিল চিঠি বা দলিল ডিকটেশন দেবার সময় কোনো দুর্বোধ্য ল্যাটিন শব্দ থাকলেই সায়েব সজাগ হয়ে উঠতেন। সেই প্যারাগ্রাফটির ডিকটেশন শেষ করেই ল্যাটিন কথাটির অর্থ আমাকে বোঝাতে শুরু করতেন।

মৃদু, হেসে, চশমার মধ্য দিয়ে আমার দিকে তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতেন, "অর্থ না-বুঝে কোনোদিন কোন শব্দ টাইপ করবে না। মানে না বোঝা পর্যন্ত ওগুলো বিরাট পাথরের মতো মাথার মধ্যে ভারি হয়ে থাকে—যেই মানে বুঝলে, অমনি ওগুলো পালকের মতো হাল্কা হয়ে তোমার সম্পত্তি হয়ে গেলো।"

এমন একটি জটিল শব্দ তিনি একদিন ডিকটেশনে ব্যবহার করলেন—'ইউবেরিমি ফাইডাই!' আমি মাথা নিচু করে লিখে যাচ্ছিলাম। সায়েব ডিকটেশন থামিয়ে বললেন, "কই? এর মানে তো আমায় জিজ্ঞেস করলে না?" আমি চুপ করে রইলাম।

কোর্টের কাজ শেষ করে, বিকেলে সায়েব তাঁর বাসস্থানে চলে আসতেন। জামা-কাপড় ছেড়ে একটি লুঙ্গি জড়িয়ে খালি গায়ে ড্রইং রুমের চেয়ারে এসে বসতেন। বলতেন, "গত জন্মে আমি বাঙালী চাষা ছিলাম—গায়ে কোনো জামা-কাপড় রাখতে পারি না।"

আমাকে হাসতে দেখে তিনি মুখটিপে হাসতে-হাসতে বলতেন, "হাসছো কী? একটু সময় পেলেই আমি জওহরলাল নেহরুকে চিঠি লিখবো, ইন্ডিয়ার জাতীয় পোশাক হওয়া উচিত লুঙ্গি ও গামছা!"

সায়েব এবার আমার দিকে তাকালেন। কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, "হেসো না, মাই ডিয়ার বয়। জওহরলাল এবং আমি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কেমব্রিজে অবশ্য আমি ওঁর থেকে অনেক সিনিয়র।"

নেহরুকে ভালভাবেই চিনতেন সায়েব। এবং সে-চেনা সুখের দিনে নয়। পরিচয়টা সেই যুগে যখন জওহরলাল একবার জেল থেকে বেরোচ্ছেন এবং আবার জেলে ঢুকছেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যখন প্রাইম মিনিস্টার নেহরু হলেন তখন তো তাঁকে চেনবার জন্য স্বয়ং উইনস্টন চার্চিলও লালায়িত। শুনেছি, ইংরেজ আমলের সি-আই-ডি এক সময় আমাদের সায়েবের ওপর নজর রাখতো। কারণ, এঁর কলেজের অতি পরিচিত বান্ধবী সরোজিনী নাইডু। বিপ্লবীদের হয়ে সায়েব আদালতে কেস করেছেন, ফাঁসি-হয়ে-যাওয়া বিপ্লবীর পরিবারকে নিয়মিত অর্থসাহায্য করেছেন এবং গান্ধীজীর সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ করেছেন। এঁর বিশেষ বন্ধু কেমব্রিজের আর-এক প্রাক্তন ছাত্র দীনবন্ধু এনড্রুজও ইংরেজ সরকারকে প্রায়ই বিশেষ অস্বস্তিতে ফেলেছেন।

বিভূতিদার কাছে শুনেছি, মৃত্যুর কিছুদিন আগে দীনবন্ধু একবার আমাদের সায়েবের কাছে এসেছিলেন। পি-জি হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় দীনবন্ধু আবার খোঁজ করেছিলেন তাঁর ছাত্রজীবনের বন্ধুকে। অপারেশনের আগে বিছানায় শুয়ে চার্লি এনড্রুজ বলেছিলেন, 'নোয়েল, আমি একটা উইল করতে চাই।' দীনবন্দুর ইচ্ছেমতো হাসপাতালের ঘরে বসে তাঁর লাস্ট উইল এন্ড স্টেটমেন্ট তৈরি করেছিলেন আমাদের সায়েব। সেই শেষ, দীনবন্ধু আর ফেরেন নি।

লুঙ্গি পরে চায়ের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে সায়েব আমাকে এক-একদিন এক-একটা মজার গল্প বলতেন। দীনবন্ধু এনড্রুজকে তিনি চার্লি বলে ডাকতেন।

সায়েব বললেন, "ফোর্ট উইলিয়মে তখন আমি কর্নেল। সিক্রেট সার্ভিসের দায়িত্ব রয়েছে আমার ওপর। দু'জন বিপজ্জনক লোকের যাতায়াত সম্পর্কে তখন প্রায়ই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে গোপন টেলিগ্রাম আসতো। একজনের নাম এম এন রায়। আর একজন চার্লি এনড্রুজ। তখন সবে এদেশে এসেছি। এই এনড্রুজই যে আমাদের ট্রিনিটি কলেজের চার্লি তা কেমন করে জানবো? তারপর হঠাৎ একদিন চার্লির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। আমি ততোদিনে মিলিটারি ছেড়ে কলকাতায় ব্যারিস্টারি শুরু করেছি। জোর করে চার্লিকে আমাদের মিডলটন স্ট্রীটের বাড়িতে ধরে নিয়ে এলাম। অনেকক্ষণ ধরে গল্পগুজব করে পুরনো বন্ধুত্ব আবার ঝালিয়ে নেওয়া গেলো।"

সায়েব বললেন, "আমাদের কেমব্রিজ ডিনারে চার্লিকে নেমন্তন্ন করলাম।

কেমব্রিজের প্রাক্তন ছাত্ররা বছরে একবার ডিনারে জড়ো হতাম। চার্লি বললো, 'আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবে না, নোয়েল।' জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার অসুবিধা কী?' চার্লি গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, 'নোয়েল, তোমাদের পার্টিতে যাবার মতো কোনো ডিনার সুট বা ভাল জামা-কাপড আমার নেই।' আমি বললাম, 'চার্লি, আমাদের এই মিটিং বড়লাটের দরবার নয়। তুমি যা-খুশি পরে আসতে পারো, এমন কি লুঙ্গি পরে এবং গায়ে গামছা জড়িয়ে ডিনারে এলেও আমাদের কোনো আপত্তি থাকবে না।'

আমাদের দু'জনের মধ্যে যখন এই রকম গল্পগুজব চলতো তখন বেয়ারা দেওয়ান সিং চা এনে হাজির করতো। গরম চায়ের সঙ্গে সায়েবের পুরনো দিনের গল্প আরও জমে উঠতো। তারপর কাজ আরম্ভ হতো। ব্রীফের ওপব চোখ বোলাতে-বোলাতে সায়েব ডিকটেশন দিতেন। কিছু-কিছু চিঠিও লিখতেন। আমি শর্টহ্যাণ্ডে ডিকটেশন নিয়ে টাইপরাইটারে টাইপ শুরু করতাম আর সায়েব নথিপত্রের জঙ্গলে ঢুকে পড়তেন।

সায়েবেব অসংখ্য গল্পের ক'টাই বা কত অজানারে বইতে শুনিয়েছি? ছোটখাটো অনেক কাহিনী এখনও ছডিযে রয়েছে। এই পরিচ্ছেদে সেইসব কথা বলতে যাচ্ছি না। আমি তৈরি হচ্ছি সেই ঘটনার জন্যে যা আমাব ব্যর্থ জীবনকে অকস্মাৎ বিচিত্র পথে প্রবাহিত করলো।

সায়েবের চেম্বারে কিছুদিন কাজ করে আমি নিজেও তখন অনেকখানি সাহস অর্জন কবেছি। চিঠি টাইপিং-এ এখন তেমন ভুল করি না, ব্রীফ অথবা বই এগিয়ে দিতে এখন একটুও দেবি হয় না। স্পেনসেস হোটেলে ফিরে গিয়ে, চায়ের আসরে আমাদেব দু'জনের মধ্যে কত বিচিত্র বিষযে আলোচনা হয। আমার মনেই থাকে না যে আমি সামান্য একজন বাবু—আর যাঁর সঙ্গে কথা বলছি সেই বৃদ্ধ বিদেশীব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাব শেষ নেই। এরই মধ্যে তিনি আমাকে ইংরিজি প্রথায় কাঁটাচামচ ধরা শিখিয়েছেন। আমার সঙ্কোচ কাটাবার জন্যে বলেছেন, "তোমরা ইণ্ডিয়ানরা হলে জাত ম্যাজিসিয়ান! খাবার সময় দুটো হাত, দশটা আঙুল এবং ডজনখানেক ছুরি-কাঁটা-চামচ নিয়েও আমরা যা পারি না, তোমরা ডান হাতের পাঁচ আঙুলে তাই সেরে ফেলো।"

বিস্ময়ে, কৃতজ্ঞতায় আমি মুগ্ধ হয়ে আছি। মানুষকে এমনভাবে আপন করে নেওয়া যায় তা আমার জানা ছিল না। সংসারের অভাব অনটনে, আত্মীয়দের হৃদয়হীন অবহেলায় আমি একসময় মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম। সায়েবের সঙ্গে সাক্ষাতের পর মনে-মনে বলেছি, "হে ঈশ্বর, আমাকে ক্ষমা

করো, পৃথিবীকে আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল।”

সত্যি সে এক অপরূপ অভিজ্ঞতা। কুয়োর মধ্যে আজন্ম প্রতিপালিত হয়ে আমি যেন হঠাৎ সাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হয়েছি। প্রতিদিন আদালতে ও চেম্বারে নতুন নতুন কেসের মাধ্যমে আমার চোখের সামনে অভাবনীয় সব নাটকের অভিনয় শুরু হচ্ছে। মানুষের এত রূপ, মানুষের এত সমস্যা, মানুষের এত কামনা-বাসনা-যন্ত্রণার সঙ্গে আমার কোনোরকম পরিচয় ছিল না। অথচ অবিশ্বাস্য এই পৃথিবীকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে এবং বুঝতে আমার কোনোরকম কষ্ট হচ্ছে না—কারণ আমার পাশে সবসময় পথপ্রদর্শক মধুসূদনদাদা বসে রয়েছেন।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই যেম অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে এলাম। সতেরো বছরের সেই বালকের কোমল মনে এমন সব ছবি আঁকা হলো, যার সন্ধানে গ্রামে শহরে প্রান্তরে সন্ধানীকে যুগ-যুগান্ত ঘুরে বেড়াতে হয়।

সায়েবের সান্নিধ্যে এক-একদিন শুরু হতো সাহিত্যচর্চা। সায়েব পড়ে শোনাতেন গিলবার্টের ‘ব্যাব ব্যালাড’। হাসির কবিতা শুনিয়ে কোনো গোমড়ামুখে হাসি ফোটাতে পারলে তিনি ভীষণ খুশি হতেন। আবার কোনোদিন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস এব বায়রনের আসর বসতো। এই সব কবিদের লেখা কাব্য সম্বন্ধে আমাকেও মন্তব্য করতে সায়েব বাধ্য করতেন। আমার সঙ্কোচ আসতো, লজ্জা লাগতো—কিন্তু তিনি কোনো আপত্তি শুনতেন না। বলতেন, “কাম্ অন! বিশ্ববিদ্যালয়ের গুটিকয়েক ছেলের পরীক্ষার বিষয়বস্তু হবার জন্যে এইসব মহাকবিরা তাঁদের সমস্ত জীবন সাহিত্য-সাধনায় ব্যয় করেন নি।”

কপট গাম্ভীর্যে বায়রন সম্বন্ধে সায়েব যা বলতেন তাও আমার মনে আছে। “তোমাদের সাবধান করে দেওয়া উচিত যে বায়রনের সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে কোরোরকম ইঙ্গিত আমি সহ্য করবো না। কারণ তিনি আমার আত্মীয়। সুদূর হলেও বায়রনী রক্ত আছে এখানে”—এই বলে সায়েব নিজের ডান হাতটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন।

বেশ কিছুদিন পরে সায়েব একবার আমাকে বেশ বিপদে ফেলে দিলেন। বেশ মনে আছে দিনটা ছিল শনিবার। ঘরের মধ্যে অন্য কেউ নেই, আমি টাইপের কাজ শেষ করে টেবিল গুছোচ্ছি। এবার বাড়ি পালাবো।

এমন সময় সায়েব বললেন, "শংকর, তোমার বিরুদ্ধে কমপ্লেন আছে।"

চিন্তিত হতাম, যদি না নজরে পড়তো সায়েব মিটমিট করে হাসছেন। জানতে চাইলাম, কোনো ভুল করেছি নাকি টাইপে?

"টাইপে ভুল থাকলে আমি তা হাতে ঠিক করে নিতে পারি", সায়েব উত্তর দিলেন।

এরপর সায়েব যা বললেন তাতে সত্যিই আমার বিব্রত হওয়ার কথা। সায়েবের বক্তব্য, "শঙ্কর, আমি তোমাকে সিনেমা দেখিয়েছি, রেস্তোরাঁয় খাইয়েছি, কিন্তু তুমি আমাকে কোনোদিন সিনেমা দেখাও নি, খাওয়াও নি। কাল রবিবার, তুমি আমাকে সিনেমা দেখাবে এবং খাওয়াবে।"

যদিও প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, তবুও লজ্জা পাবার কথা। আমার তদানীন্তন আর্থিক অবস্থা বুঝতেই পারছেন। হাওড়ার এক আধা-বস্তিতে কোনোরকমে দিন কাটাই। সেখানে এই সায়েবেকে নিয়ে যাবার প্রশ্নই ওঠে না।

সায়েব কিন্তু নিজেই প্রস্তাব দিলেন, "আগামীকাল তুমি আমাকে সিনেমা দেখাবে এবং খাওয়াবে।"

খাস ইংরেজ সায়েবের সঙ্গে তাল রেখে আমি কেমন করে তাঁকে ফ্রেণ্ডের মতো খাওয়াবো এবং সিনেমা দেখাবো? মাথাটা ঘুরে গেলো।

তবু সায়েব নিজেই যখন কথা তুলেছেন তখন একটা কিছু করতেই হবে। বললাম, "বেশ, আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে তখন কালকেই খাওয়াবো।"

সায়েব কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে ফিসফিস করে বললেন, "একজন ভদ্রলোক, তিনি যতই লোভী হেন, তাঁকে এইভাবে নিমন্ত্রণ করলে তিনি কি তা গ্রহণ করতে পারেন? তাঁকে বলো, আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার বারওয়েল। নানা কাজে আপনি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকেন, তাই খুব ইচ্ছে থাকলেও এতোদিন আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে সাহস করি নি। যদি আপনার অন্য কোনো এনগেজমেন্ট না থাকে, তা হলে হোয়াট অ্যাবাউট টুমরো? এই শর্ট নোটিসের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।"

নির্দেশমতো মুখ টিপে হাসতে-হাসতে বললাম, "আমি অত্যন্ত দুঃখিত, মিস্টার বারওয়েল। আপনি যা ব্যস্ত থাকেন, তাতে.....ইত্যাদি ইত্যাদি। হোয়াট অ্যাবাউট আগামী কাল? খুব ব্যস্ত আছেন নাকি?"

সায়েব বেশ কায়দায় অভিনয়ের ভঙ্গিতে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "ও ডিয়ার শংকর, আপনার কাইন্ড এবং উত্তপ্ত ইনভিটেশনের জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আপনি নিজে যখন নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তখন আমার কোনো

কাজই কাজ নয়। আমি অবশ্যই আগামীকাল আপনার আগমনের আশায় বসে, থাকবো।"

শুভরাত্রি জানিয়ে, হাসিমুখে ক্যালকাটা ক্লাব থেকে তো বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু বেশ চিন্তা আরম্ভ হলো। ইনি তো আর যেমন-তেমন অতিথি নন। সায়েবকে খাওয়াতে-দাওয়াতে, সিনেমা দেখাতে বেশ খরচের ধাক্কা। এঁকে নিয়ে তো বৌবাজারের বঙ্গলক্ষ্মীতে ভাত এবং কলেজ স্ট্রীটে জ্ঞানবাবুর দোকানে চা খাওয়ানো যায় না!

সৌভাগ্যক্রমে আমার একটা গোপন বিপত্তারণ তহবিল ছিল। আকস্মিক পারিবারিক বিপদ-আপদের মোকাবিলা করার জন্য বইয়ের আলমারির পিছনে একটা খামে লুকিয়ে-রাখা চল্লিশ টাকার স্মরণ নিলাম।

দশ টাকার সেই চারখানা নোটসহ রবিবার দিন যথাসময়ে ক্যালকাটা ক্লাবে হাজির হলাম। আমার পরনে ধুতি শার্ট, পাশ-পকেটে ধুতির কোঁচা, আর বুকপকেটে বিপত্তারণ ফান্ডের বহুমূল্য সঞ্চয়।

সায়েব আমাকে দেখেই সস্নেহে অভ্যর্থনা করলেন, "গুড মর্নিং, মাই ডিয়ার বয়!"

তারপর অভিনয়ের সুরে বললেন, "মহাশয়, আপনার জন্যেই অধীর আগ্রহে আমি অপেক্ষা করছি।"

আমি মফস্বলের ছেলে, অতশত সামাজিকতা জানি না। কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু একমুখ হেসে ফেললাম।

সায়েব বললেন, "শংকর, আমি একটু বাথরুমে যাচ্ছি। টেবিলে তোমার নামে একটা চিঠি রয়েছে। তুমি ততক্ষণ দেখো।"

খামটা খুলে আমি তো তাজ্জব। তার মধ্যে কোনো চিঠি নেই। আছে ছ'খানা দশ টাকার নোট।

একটু পরেই সায়েব গম্ভীর হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। বললেন, "মহাশয়, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমি এখনই বেরোতে প্রস্তুত।"

আমি বললুম, "তাহলে যাওয়া যাক।"

সায়েব বললেন, "আপনার নিমন্ত্রণের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে আপনার মধুর সান্নিধ্যে আজকের দিনটা আমি যথাসম্ভব উপভোগ করবো।

ঘর থেকে বেরিয়ে ক্যালকাটা ক্লাব লাইব্রেরির দরজায় সায়েবের সঙ্গে বিরাট এক বিদেশী কোম্পানির জাঁদরেল বড়কর্তার দেখা হয়ে গেলো।

"হ্যালো নোয়েল, কেমন আছো?" বড়কর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

সায়েব বললেন, "তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই, ইনি হচ্ছেন .... কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর স্যার ...... আর ইনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু এবং সহকারী মিস্টার শংকর। শংকর আজ ভেরি কাইন্ডলি আমাকে লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নিজের বাবুর সঙ্গে লাঞ্চ খাবার পরিকল্পনাটা এই জাঁদরেল ইংরেজ বোধহয় তেমন উপভোগ করলেন না। তবু ভদ্রতা সহকারে তিনি আমাকে বললেন, "হাউ ডু ইউ ডু? আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে প্রীত হলাম।" তারপরে সায়েবকে বললেন, "হাউ নাইস।"

সায়েব যেভাবে আমাদের সঙ্গে মেশেন তা তাঁর সমপর্যায়ের অনেক লোক পছন্দ করেন না। কিন্তু আমাদের সায়েব ওসব মতামতের মোটেই তোয়াক্কা করেন না। একবার তাঁকে বলেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ক্লাবের ডাইনিং হল্-এ খেতে যাবেন না। সায়েব গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছেন, "আমার কাছে তোমাব বন্ধুত্ব ওই সব লোকের সান্নিধ্য থেকে এক হাজার গুণ মূল্যবান। ভবিষ্যতে আমার কাছে এ-বিষয়ে কখনও কথা তুলবে না। আমি কী করছি তা বোঝবার মতো বয়স আমার হয়েছে।"

সেদিনও তাই আর অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম না। আমরা দু'জনে নুড়ি-বিছানো পথের ওপর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে এবার ক্লাবের বাইরে গেটের সামনে দাঁড়ালাম।

লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে পশ্চিম দিক থেকে একটা ট্যাক্সি আসছিল। সেইটা ধরলাম। গাড়ির দরজা খুলে আমি ঢুকতে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে মৃদু চাপ দিলেন সায়েব। ফিসফিস করে বললেন, "আমি তোমার গেস্ট। অতিথিকে আগে গাড়িতে বসাতে হয়।"

মফস্বলের ছেলে অতশত সামাজিকতা জানা ছিল না। ব্যাপারটা বুঝে, দরজার হাতল ধরে বললাম, "মিস্টার বারওয়েল, আপনি আগে ঢুকুন।"

সায়েব সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "তা হয় না। আগে আপনি, তারপর আমি, মিস্টার শংকর। তাছাড়া আপনি তো জানেন, ক'দিন থেকে আমি বাঁ কানে একটু কম শুনছি, সুতরাং আমি আপনার বাঁ দিকে থাকতে চাই।"

ট্যাক্সিতে চড়ে সেদিন আমরা কলকাতায় অনেক জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরলাম। সায়েব বহু ইংরেজ-ইতিহাসের কথা শোনালেন, সেই সঙ্গে পুরানো যুগের নানা গল্প। মাঝে-মাঝে মুচকি হেসে আমাকে কয়েকবার বললেন,

"আপনার এই আতিথেয়তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে, একটা খোঁচা দিয়ে ফিসফিস করে সায়েব বললেন, "হোস্ট চুপ করে থাকলে অতিথির যে মনে লাগবে। তুমি উত্তর দাও, না মহাশয়, আপনার সুমধুর সান্নিধ্যের সমস্ত আনন্দ আমারই।"

পার্ক স্ট্রীটের এক রেস্তোরাঁয় সেদিন আমাদের লাঞ্চ হয়েছিল। তারপর ট্যাক্সিতে চড়ে মেট্রো সিনেমাতে গিয়েছিলাম।

আমি বুকিং অফিসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ম্যাটিনী শোয়ের টিকিট কাটতে যাচ্ছিলাম। সায়েব ফিসফিস করে আমাকে মনে করিয়ে দিলেন, "আমাকে হল্-এর প্ল্যানটা দেখতে রিকোয়েস্ট করো। জিজ্ঞেস করো, কী ধরনের সীট আমি পছন্দ করবো।"

আমি সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, "কি ধরনের সীট আপনি পছন্দ করবেন, মিস্টার বারওয়েল? প্ল্যানটা দেখুন।"

সায়েব হাঁ-হাঁ করে উঠলেন। "যে-কোনো সীট, মিস্টার শংকর। তবে সীটটা অবশ্যই আপনার পাশে হওয়া চাই। আর প্লিজ, খুব দামী টিকিট কিনবেন না। সিনেমা দেখাটাই আমাদের উদ্দেশ্য, দামী সীটে বসা নয়।"

বিরতির সময় ফিসফিস করে সায়েব মনে করিয়ে দিলেন, "আমি আইসক্রীম কিংবা কফি খাবো কিনা তা এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করোনি কিন্তু! দেখছো না সেইজন্য আমি কেমন মুখ গোমড়া করে বসে রয়েছি।"

আতিথেয়তার ত্রুটি বুঝতে পেরে আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, "একটা আইসক্রীম হোক? কিংবা কফি?"

অতিথি আঁতকে উঠে বললেন, "ওই প্রচণ্ড লাঞ্চের পর আবার আইসক্রীম! আপনি কি কোনো রাক্ষসকে সিনেমা দেখাতে এনেছেন?"

সিনেমার শেষে আমরা পার্ক স্ট্রীটের নাম-করা চায়ের দোকান ফ্লুরিতে গিয়েছিলাম। বেয়ারা আমাদের টেবিলে অনেকগুলো কেক রেখে গেলো। আমি বেয়ারাকে ডেকে বলতে যাচ্ছিলাম, এতো কেক আমাদের দরকার নেই। সায়েব ফিসফিস করে জানিয়ে দিলেন, "ওকে কিছু বলবার দরকার নেই আমরা প্লেট থেকে যে ক'টা পেসট্রি তুলে নেবো, শুধু সেই ক'টার দামই নেবে।"

ব্যাপারটা আমার জানা ছিল না। আমার ভয় হয়েছিল, টেবিলে যখন দিয়েছে, খাই না-খাই পুরো দামটা আমার কাছ থেকে আদায় করবে। মনের সন্দেহ না চেপে রেখে সরল মনে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওরা কী করে বুঝবে, আমরা ক'টা খেলাম?

সায়েব পরম স্নেহে বুঝিয়ে দিলেন, "বিয়োগ কষে। ওরা জানে ক'টা পেসট্রি তোমার টেবিলে দিয়েছে, বিল করবার সময় দেখবে ক'টা পড়ে আছে।"

চা খাওয়ার সময় অনেক গল্প হলো। সায়েব আবার গম্ভীরভাবে বললেন, "আপনি যে সিনেমাটা দেখালেন, চমৎকার। আপনার ছবির নির্বাচন খুব সুন্দর হয়েছে। যেমন চমৎকার নায়ক, তেমন সুন্দরী নায়িকা!"

এবার বিল এলো। চার টাকা চার আনার মতো বিল। আমি একটা পাঁচ টাকার নোট দিলাম। বেয়ারা ভাঙানি ফেরত নিয়ে এলো। সায়েব চোখের ইঙ্গিতে আমাকে সমস্ত চেঞ্জটাই প্লেটে রেখে দিতে পরামর্শ দিলেন। বেয়ারা কিছুই বুঝলো না, ভাল টিপস পেয়ে আমাকে একটা লম্বা সেলাম দিলো। আমি বুক ফুলিয়ে গট-গট করে অন্যসব কেষ্ট-বিষ্টু খদ্দেরের মতো সায়েবী কায়দায় দোকানের বাইরে এসে ডাকলাম, "ট্যাক্সি।"

এবার আর ভুল করিনি। গেট খুলে সায়েবকে গাড়ির মধ্যে আগে ওঠবার জন্যে অনুরোধ কবলাম।

আমাকে খুশী করবার জন্যই বোধ হয় সায়েব এবার আগে গাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

যখন আমরা ফিরলাম, ক্যালকাটা ক্লাবের বাতিগুলো তখন জ্বলে উঠেছে। গাড়ি থেকে নেমে সায়েব বললেন, "আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ দেবো জানি না। আপনার এই আতিথেয়তা এবং দয়া আমার বহুদিন মনে থাকবে।"

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, "আনন্দটা আমারই। আপনার সুমধুর সান্নিধ্য খুব ভাল লেগেছে।"

সায়েব এবার আমার পিঠে হাত বেখে বললাম, ৭াঃ, চমৎকার উত্তর হয়েছে।"

ক্লাবের ফয়ারে দাঁড়িয়ে সায়েব বললেন, "আপনার যদি অন্য কোনো প্রেসিং এনগেজমেন্ট না থাকে তাহলে আজ আমাকে ডিনারে সঙ্গ দিন। আপনাকে কোনো নোটিস না দেওয়ার জন্য লজ্জিত—কিন্তু আমাদের দু'জনের মধ্যে যা সম্পর্ক তাতে এইভাবে আপনাকে ডিনারে নিমন্ত্রণের অধিকার আমার আছে।"

ডিনার পর্যন্ত থেকে গিয়েছিলাম সেদিন। ভারি ভাল লাগছিল। এ যেন এক নতুন ধরনের খেলা সারাদিন ধরে আমরা খেলে এলাম।

কাসুন্দের একটা আধা-গ্রাম্য ছেলের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশের জন্য সায়েব কী পরম স্নেহে সারাদিন ব্যয় করেছিলেন, তখন বুঝি নি। কিন্তু আজ এতোদিন পরে সব কথা ভাবতে গিয়ে সমস্ত ঘটনাটা কেমন যেন গল্প-গল্প মনে

হলো—চোখ দুটো অকারণেই অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে। সংসারের মাঠে-ঘাটে এতো অপ্রিয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরও আমার এই দোষটা গেলো না। আমার হৃদয়ের ওপর কিছুতেই আবরণ টানতে পারি না—একটুতেই সেই বিরলকেশ সদাহাস্যময় বিদেশী মধুসূদনদাদার কথা মনে পড়ে যায়, যিনি আমাকে এই বিরাট পৃথিবীর জটিল জীবনে প্রবেশ করার সাহস ও সুযোগ দিয়েছিলেন।

সেদিন রাত্রে ডিনারের পরও বেশ কিছুক্ষণ ক্যালকাটা ক্লাবে থেকে গিয়েছিলাম। আমার মধ্যেকার সেই লাজুক, সদ্যসন্ত্রান্ত ও বিব্রত বালকটি হঠাৎ সাহসী হয়ে উঠেছিল। প্রাণ খুলে কত কথাই হচ্ছিল সায়েবের সঙ্গে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি সামান্য একজন 'বাবু', আমার চামড়ার রং কালো, আর ইনি একজন ব্যারিস্টার এবং এসেছেন সাত সাগরের ওপার থেকে।

মজার গল্প শোনাতে-শোনাতে সায়েব সেদিন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন। বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, তোমার সঙ্গে জরুরী একটা কথা আছে আমার।"

কথা তো সারাদিনই হচ্ছে। আরও কী কথা থাকতে পারে? আমি একটু অবাক হয়ে গেলাম।

সায়েব আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। "কিছু বলবো বলেই তো তোমাকে ধরে রেখেছি।"

সায়েবকে সাধারণত এমন গম্ভীরভাবে কথা বলতে দেখি না। আদালতে অবশ্য ওইরকমভাবেই তিনি সওয়াল করেন। তাঁর এই রূপটা আমার ভাল লাগে না।

সায়েব এবার বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, ক'দিন থেকেই তোমাকে বলে রাখবো ভাবছি। আমার বয়স হচ্ছে, আমি দেখে যাবো কিনা জানি না, কিন্তু তুমি নিজে কখনও ভুলো না, তুমি একজন অসাধারণ মানুষ—ইউ আর অ্যান এক্সেপশনাল পার্সন।

পরমুহূর্তেই হাল্কা হয়ে গেলেন তিনি। তাঁর সমস্ত মুখে দুষ্টুমিভরা ছেলেমানুষি হাসি ছড়িয়ে পড়লো। বললেন, "রাত অনেক হয়েছে, তোমাকে বাড়ি যেতে হবে। আমাকেও কাল মাদ্রাজে রওনা দিতে হবে কেসের জন্য। তার আগে ছেলেবেলায় দুষ্টুমির জন্যে যা করতাম তাই করা যাক। ইস্কুলে কোনো ছেলের কান মলবার ইচ্ছে হলে বলতাম, মাই ডিয়ার জন, তোমার এবং আমার মধ্যে যে কোনোরকম অপ্রীতি নেই তা প্রমাণ করবার জন্য তোমার কানটা মলে দিচ্ছি।" এই বলে আমার কানটাই মলে দিলেন সায়েব—"ইন অর্ডার টু প্রুফ দ্যাট দেয়ার ইজ নো ইল ফিলিং বিটউইন ইউ অ্যান্ড মি।"

সাযেব এবার বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আর আমার মনে হলো আমার দেহে বিদ্যুতের প্রবাহ শুরু হয়েছে। আমি যেন কোনো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে এতোদিন সংজ্ঞাহীন ছিলাম, বিদ্যুতের মন্ত্রে কে আমাকে অকস্মাৎ জাগিয়ে তুলেছে। উত্তেজনায় আমার দেহের প্রতিটি রোমকূপ খাড়া হয়ে উঠেছে।

পরমুহূর্তে ভীষণ লজ্জা বোধ হলো। মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে আমার। মনে হলো, বেয়ারা দেওয়ান সিং দরজার আডালে দাড়িয়ে সায়েবের সমস্ত কথা শুনেছে —আমি এক্সেপশনাল. আমি অসাধারণ!

আমার মনে হলো, দেওয়ান সিং অবজ্ঞায় হা-হা করে হাসছে। মুখ বেঁকিয়ে বলছে, "ওই চলেছেন অসাধারণ পুরুষ। ইনি থাকেন হাওডায়। বিদ্যে আই-এ পর্যন্ত, চাকরি করেন ব্যারিস্টারের বাবুদের বেঞ্চিতে।"

কিন্তু কোথায় দেওয়ান? সে তো এখানে নেই। তবু আমার ভীষণ অস্বস্তি লাগছে। আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

আমি লুকিযে এখান থেকে পালাতে চাই। কিন্তু আমি ধরা পড়ে গিযেছি। মনে হলো, ক্লাবের রিসেপশন টেবিলের বাবুরা বোধহয় ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন। তাঁরা বলছেন, "একজন বাবুকে কেউ রসিকতা করে অসাধারণ বলেছিল, আর সে কেমন বেমালুম তা বিশ্বাস করে বসে আছে!" আমাকে দেখে ওঁরা চিৎকার করে বলছেন 'ওই চলেছেন এক্সেপশনাল পার্সন!'

আমি কোনো কথায় কান না দিয়ে নিজের গতিবেগ বাডিযে দিয়েছি। কিন্তু গেটের নেপালী দারোয়ানটাও যেন হাসছে।

গেট থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গী রোড ধরে আমি বেশ জোরে উত্তরমুখো হাঁটতে আরম্ভ করেছি। আমার মনে হলো রাজপথের প্রতিটা ল্যাম্পপোস্ট আমাকে ব্যঙ্গ করছে, বৈদ্যুতিক ইশারায় হাসতে-হাসতে বলছে, 'ওই চলেছেন অসাধারণ পুরুষ।'

আমি এখন কী করি? এদের কাছ থেকে আমি পালাতে চাই। নিজের অজান্তেই আমি দৌড়তে আরম্ভ করেছি।

চৌরঙ্গী রোড ধরে দৌড়তে-দৌড়তে থিয়েটার রোডের মোড়ে এসে আমি পশ্চিমদিকে ঘুরে পড়েছি। ওদিকে তখন বেশী আলো ছিল না। বিড়লা তারামণ্ডলের বাড়িও তখন তৈরি হয়নি। অনেক বড় বড় গাছ ছিল ওখানে। প্রায়ান্ধকারে বিরাট একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আমি যেমন একটু স্বস্তি পেলাম। এবার গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমার দৃষ্টি হঠাৎ তারাভরা প্রসন্ন আকাশের দিকে প্রসারিত হলো। কী আশ্চর্য! সুদূর আকাশের নক্ষত্ররা আমার

দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে আছে—আমাকে মোটেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছে না।

প্রায় টলতে-টলতে একটা হাওড়াগামী বাসের পাদানিতে উঠে পড়েছিলাম। বাড়িতে ফিরেও শান্তি পাইনি। চোখে একবিন্দু ঘুম এলো না। গভীর রাতের অন্ধকারে সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এসেছিলাম। সুনীল আকাশের সোনালী তারারা আজ আমার সঙ্গে কথা বলছে। তারা আমাকে মোটেই ব্যঙ্গ করলো না, বরং স্নিগ্ধ ইশারায় আশা দিচ্ছে, ভরসা দিচ্ছে।

আকাশের দিকে একমনে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কখন যে ভোর হয়ে গিয়েছিল খেয়াল করিনি।

বিশ্বাস করুন, অবিস্মরণীয় সেই বিনিদ্র রাত্রে আমার মধ্যে নতুন এক 'আমি' জন্মগ্রহণ করলো। বিশ্বাস করুন, যে-আমি সকাল বেলায় চল্লিশ টাকা পকেটে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, আর এই আমি এক নয়। যে পারে সে এমনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে। এমনিভাবেই সে মানুষের মনের গহন অন্ধকারে গভীর ঘুমে অচেতন পৌরুষকে জাগাতে পারে। ঘুম-থেকে-ওঠা এই নতুন আমি আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। সে বলছে, "আমি চেষ্টা করবো। আমি নিজেকে অবশ্যই মধুসূদনদাদার বিশ্বাসের যোগ্য করে তুলবো।"

এমনই ভাগ্য, সায়েবের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। পরের দিন তিনি মাদ্রাজে কেস করতে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই কয়েকদিন পরে অকস্মাৎ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি আর কথা বলার সুযোগ পাইনি।

মাদ্রাজ থেকে পাঠানো দেওয়ান সিং-এর সেই সর্বনাশা টেলিগ্রামটা হাতের মুঠোয় ধরে আমি ভেবেছি, পৃথিবীতে আমার কেউ রইলো না। আমি একা।

শোকের প্রথম তরঙ্গ যখন কেটে গেলো, তখন বিষণ্ন হৃদয়ে এই বিশাল কলকাতার বিরাট জনপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে ভেবেছি এই দয়াহীন উদাসীন স্বার্থসর্বস্ব পৃথিবীতে অন্তত এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি আমাকে ভালোবেসেছিলেন—আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। যিনি ভেবেছিলেন আমি অসাধারণ—একজন অর্ধশিক্ষিত অসহায় দরিদ্র যুবকেরও পৃথিবীতে কিছু দেবার রয়েছে।

আমার খুব ইচ্ছে করতো, এই আশ্চর্য মানুষটার একটা বিরাট মর্মর মূর্তি তৈরি করিয়ে রাজপথে রেখে দিই। কয়েকটা টাকা আমি জমিয়েও ফেলেছিলাম। তারপর এক বন্ধু খুব বকুনি লাগালো—"ওরে মূর্খ, স্ট্যাচু করা কি সোজা

কাজ—ওর জন্যে লাখ লাখ টাকা লাগে।”

মূর্তি তো দূরের কথা, সামান্য একটা তৈলচিত্রের টাকাও আমার ছিল না অথচ ইচ্ছে হতো,অমন একটা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ পৃথিবীর মানুষদের বলি, “আপনারা আমাকে যাই ভাবুন, পৃথিবীতে অন্তত একজন মানুষ আমার ওপর ভরসা বেখেছিলেন।”

শহরের জননেতাদের সঙ্গে আমার জানাশোনা থাকলে সায়েবের নামে একটা রাস্তার নামকবণ করা যেতো। কলকাতায় কত রাস্তা রয়েছে তো। যাঁরা ভাল লোক তাঁদের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার কোনো উপায় কি এই দয়াহীন শহরে নেই!

শেষে খবব পেলাম, শহরেব রাস্তার নাম করতে পয়সা লাগে না। সাহস সঞ্চয় করে এক স্বদেশী নেতার কাছে গিয়েছিলাম। “কী চাও তুমি?” জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বললাম, “এই বিরাট শহরে কত রাস্তা রয়েছে। আমি একজন খুব ভাল মানুষের খবর এনেছি—যিনি মানুষকে ভালবাসতেন, আপন-পর ভেদাভেদ জ্ঞান তাঁর ছিল না—তিনি আমার মনেও আশা যুগিয়েছেন স্যার।”

নাম জিজ্ঞেস করলেন তিনি। নাম শুনে বেজায় চটে উঠলেন। বকুনি লাগালেন, “তোমার লজ্জা করে না? জানো না ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়েছে? স্বদেশী ভারতবর্ষে তুমি এসেছো ইংরেজের নামে রাস্তা করাতে!”

হতাশ হয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম। সামান্য মানুষ আমি, যতই বলি এক আশ্চর্য মানুষের সন্ধান পেয়েছি, কেউ আমার কথা শুনতে চায় না। এখন আমি কোথায় যাই? আমাকে কিছু করতেই হবে। তিনি যে আমাকে বলে গিয়েছিলেন, নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না।

আর কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পুরনো খাতায় একদিন সায়েবের কথা লিখতে শুরু করেছিলাম। লেখা থাক, না হলে কোনোদিন হয়তো স্মৃতিও বিশ্বাসঘাতকতা করবে। অনেক দিন পরে যখন বুড়ো হবো, আমার পরিচিত বয়োজ্যেষ্ঠদের অনেকেই যখন পৃথিবীতে থাকবেন না, তখন ছোট-ছোট ছেলেদের ডেকে বলবো, “শোনো গল্প শোনো। আমি যখন ছেলেমানুষ, তখন সাত সাগরের ওপার-থেকে-আসা এক অরুণবরণ মধুসূদনদাদার সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। মানুষকে তিনি ভালবাসতেন, বিশ্বাস করতেন। একদিন রাত্রে তিনি আমার মধ্যেও এমন একজনকে দেখেছিলেন যে আমার থেকেও বড়।”

আমার মনের যখন এই অবস্থা তখন ডালহৌসি পাড়ার সওদাগরী তীর্থক্ষেত্র বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে টাইপিস্টের চাকরি করি। তার আগে কিছুদিন পোস্টাপিসেও ভাগ্য পরীক্ষা করে এসেছি, তেমন সুবিধে হয়নি। বেঙ্গল চেম্বারে টিফিন টাইমে আমার নিত্য আড্ডাসঙ্গী ছিলেন শ্রীভবানীপ্রসাদ ঘোষ। রসিক ভবানীবাবু হাল আমলের বাংলা সাহিত্যের নানা খোঁজ-খবর রাখতেন। আমার এক-আধটা লেখা তিনি শুনতেন এবং বলতেন, "চালিয়ে যান। বেশ জমছে মনে হচ্ছে।"

আর একজন মানুষ এই সময় আমার খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু বিবেকানন্দ ইস্কুলে আমার থেকে কয়েক বছর সিনিয়র ছিলেন, পরে বাংলায় এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে আমাদের ইস্কুলের মুখোজ্জ্বল করেন। বাংলায় প্রতি বছরেই কেউ-না-কেউ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন, কিন্তু শঙ্করীদার রসবোধ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণক্ষমতা আমাকে চিন্তিত করতো। গল্পচ্ছলে শঙ্করীদাকে আমার মানসিক অবস্থার কথা বলি এবং দু'একটা লেখার কিছু অংশ দেখাই। অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সেগুলি পড়ে এমন দু'একটি উৎসাহজনক কথা শঙ্করীদা আমাকে বললেন যে আমার মাথায় সত্যিই লেখার ভূত চেপে গেলো।

বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে তখন আমার সুখের দিন নয়। আমার ভবঘুরে কর্মজীবনে মানুষের যা ভালবাসা পেয়েছি তার কোনো তুলনা নেই। কিন্তু যতটা যন্ত্রণা জুটেছে তার প্রধান অংশ এসেছে বেঙ্গল চেম্বার পর্যায়ে। কোথায় যেন হিসেবের গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কয়েকজন সহকর্মীর অবহেলা, উচ্চপ্রতিষ্ঠিতদের হৃদয়হীনতা আমাকে প্রতিদিন নিরন্তর জর্জরিত করে তুলতো। এর মধ্যে দুটি মরূদ্যান ছিল—সাহিত্যিক মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর ভবানী ঘোষ। মোহনলাল সহযোগী প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোশিয়েসনে মস্ত চাকরি করতেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে উচ্চনীচ বোধ ছিল না, মাঝে-মাঝে আমার টাইপ মেশিনের কাছে এসে কানে-কানে বলতেন, "আজ রেডি থাকবেন, কফি হাউসে যাবো।" কফি হাউসে নষ্ট করবার মতো পয়সা তখন আমার ছিল না। কিন্তু মোহনলাল কফির সঙ্গে চিকেন ওমলেট খাওয়াবেনই এবং সেই সঙ্গে সাহিত্য সম্পর্কে কত আলোচনা।

ভবানী ঘোষের টেবিলটা ছিল আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছুটা দূরে—কিন্তু বাংলা সাহিত্যের তপোবন বললেও কিছু বলা হয় না। ওখানে টিফিন টাইমে যাঁরাই জড়ো হতেন তাঁদের ছিল সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ। ভবানীবাবু

প্রচুর পড়তেন এবং সবাইকে উসকে দিতেন।

আমার জন্য ওঁর ভালবাসা যে একটু বেশি ছিল তা আজ পিছন ফিরে তাকালে বেশ বুঝতে পারি—কেন যেন তিনি আমাকে এই বাড়তি ভালবাসাটুকু দিয়েছিলেন তা আজও আমার অজানা। একটা কারণ বোধ হয়, ওঁর ওখানে আমি স্নেহের কাঙাল হিসেবে যেতুম, আমার জীবনের সমস্ত নিরাশা ও দৈনন্দিন সমস্ত গ্লানি ওখানেই ভুলবার চেষ্টা করতাম। স্বল্পবাক অথচ পরমস্নেহশীল ভবানী ঘোষ যতরকমে সম্ভব আমাকে উৎসাহ দিতেন এবং মনের মধ্যে উচ্চাশার দীপ জ্বেলে দিতেন। মনে আছে, ওইখানে বসেই, ভবানীবাবু আমাকে বঙ্গবাসী কলেজের সান্ধ্য বি-এ বিভাগে ভর্তির পরামর্শ দিলেন। ওইখানে আমরা যারা জড়ো হতাম তাদের সকলেরই দুঃখ ছিল, কিন্তু সাহিত্যের অমৃতধারাই ছিল আমাদের শান্তিবারি। সাহিত্যের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কী হতে পারে তার সম্যক ধারণা আমার ওই টেবিলেই হয়েছিল।

ইতিমধ্যে দুঃখ বেড়েই চলেছে। বেঙ্গল চেম্বারের একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সায়েব কারণে-অকারণে নিরন্তর অপমান করে যেতেন। তা মুখ বুজে সহ্য করতে হতো। কেরানিত্বের অন্ধকার কারাগারে যে যাবজ্জীবন বন্দী হয়ে পড়েছি তা-ও ক্রমশ বুঝতে শুরু করেছি, সংসারে, আত্মীয়মহলে, কর্মস্থলে নিরন্তর অবহেলার গ্লনি। তার ওপর বি-এ পাসের স্ট্যাম্পের অভাব।

চোখ খুলে বাইরে তাকিয়ে দেখি বিশ্বভুবনের সর্বত্র আমার জন্য নিরাশা। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কোনো কিছুই আমার নেই—অথচ এই ভূমণ্ডলের অসংখ্য মানুষের মতো আমিও একদিন কত স্বপ্ন দেখেছি। অফিসে তখন এমনই অশান্তি যে উপায় থাকলে একদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করে পথে বেরিয়ে পড়তাম। এই অবস্থায় গভীর রাত্রে মনে পড়তো, এই বিশ্বসংসারে এমন একজন অন্তত ছিলেন যিনি আমাকে ভালবেসেছিলেন। আদালতের আঙিনায় তিনি বিশ্বভুবনের ছায়া দেখিয়েছেন আমাকে এবং সমস্ত সাময়িক দুঃখ ও ব্যর্থতার উর্ধ্বলোকে আমার মধ্যেও কিছু অসাধারণত্বের ইঙ্গিত আবিষ্কার করেছেন। বন্ধুহীন এই বিশ্বসংসারে অন্তত এমন একজন ছিলেন, যিনি বিশ্বাস করতেন আমি সাধারণ নই, আমার মধ্যেও একজন অসাধারণ কেউ বিরাজ করছেন।

এই স্মৃতিও ভঙ্গুর—কতদিন সে এইভাবে সদাবিক্ষুব্ধ মনের মধ্যে অক্ষয় থাকবে? তাই হারিকেনের আলোর সামনে (সহজবোধ্য কারণে আমাদের হাওড়ার বাড়ির বৈদ্যুতিক সংযোগ কাটা গিয়েছিল) একদিন আদালতী কর্মক্ষেত্রের আরও কিছু পরিচ্ছেদ লিখে রাখতে শুরু করেছিলাম।

ভবানীবাবুকে ব্যাপারটা বলতে সঙ্কোচ হয়েছিল। তার বদলে কয়েকটা অধ্যায় দেখিয়েছিলাম আমাদের ডিপার্টমেন্টের এক সহকর্মীকে। তিনি পড়ে মোটেই উৎসাহিত বোধ করলেন না, আড়ালে আর একজনকে বললেন, "কিসসু হয়নি। সময়ের অপচয়।" যাঁকে বললেন তিনি আমাকে ভালবাসতেন, গোপনে তিনি বললেন, "চেনা কোনো লোকের কাছে কখনও লেখা সম্বন্ধে মতামত চাইবে না।"

বলা বাহুল্য, আমার দুঃখ আরও বাড়লো। সমস্ত পৃথিবী যেন আমাকে অন্যায়ভাবে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে। আমার কিছুই করবার নেই।

সেই সময় একদিন ভবানীবাবু বললেন, "আমার বন্ধু সাহিত্যিক রূপদর্শী আজ আসবে।" মুজতবা আলী ছাড়া আর কোনো জলজ্যান্ত সাহিত্যিক আমি দেখি নি। রূপদর্শী আমার প্রিয়তম লেখকদের একজন—আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে 'নকশা', 'সার্কাস' এবং 'এই কলকাতা' বই তিনটির জন্যে তিনবার নোবেল প্রাইজ তিনি ইতিমধ্যেই পেয়ে যেতেন।

রূপদর্শী অর্থাৎ গৌরকিশোর ঘোষ অবশেষে বিকেলের দিকে এলেন। তাঁকে দেখে অদ্ভুত ভাল লাগলো—মনে হলো যেন কত আপনজন, যেন কতদিনের বন্ধু। সৌভাগ্যবশত আমার অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সায়েব সেদিন দাঁতের ব্যথায় জর্জরিত হয়ে লাঞ্চের পরে বাড়ি চলে গিয়েছেন। (ঈশ্বর, আপনি তাহলে বেঙ্গল চেম্বারেও আছেন!) টাইপের চাপও কম ছিল, তাই চারটে থেকে ভবানীবাবুর টেবিলে হাজিরা দিলাম। রূপদর্শী তখন পাঠকমহলে এক জনপ্রিয় নাম—রবিবার আনন্দবাজারে 'কথায় কথায়' সিরিজ প্রকাশিত হচ্ছে—কত লোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ভবানীবাবু আমার ওপর একটু বেশী দয়া করলেন, "ছুটির পর আরও আড্ডা দেওয়া যাবে।"

সাড়ে-চারটের সময় ছুটি হলো—আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মতলবটা এই যে আরও কিছুটা গল্প করে আমি শিয়ালদহ স্কট লেনে বঙ্গবাসী কলেজে চলে যাবো। গৌরকিশোরের মতো মুহূর্তে অপরিচিতকে আপন করে নেবার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই আছে। চরম দুঃখের মধ্যেও তিনি হাসতে পারেন, হাসাতে পারেন।

একটু পরেই পথে চলমান গৌরকিশোর বললেন, "রেগুলার কলেজে ক্লাস করে কেউ কোনোদিন পৃথিবীর মঙ্গল করেনি ; আজ ড্রপ দিন। ভগবান সুপ্রসন্ন হলে আপনার সায়েবের দাঁতের ব্যথা আগামীকাল আরও বাড়বে।"

কলেজ ফাঁকি দিয়ে আমরা কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে এলাম। তারপর শুরু হলো নানা বিষয়ে নানা গল্প। কথা প্রসঙ্গে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ওঁর লেখা

একটি নাবিক চরিত্রের কথা উঠলো। সেই সঙ্গে ছিল অহিভূষণ মালিকের আঁকা এক অবিস্মরণীয় ছবি 'টেমপোরারি আনফিট'! কথায় কথায় বললাম, 'আমিও একজন জাহাজ কর্মীকে চিনতাম—সেও 'আনফিট হয়ে পড়েছিল।' এর পর শুরু করলাম গল্পটা। নাবিকের নাম নিকোলাস স্কিনাস। অদ্ভুত মেজাজের গ্রীক—যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাবেই, তাতে তার নিজের সর্বনাশ হলেও কিছু এসে যায় না।

নিকোলাস স্কিনাসের গল্পটাই আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দিলো। গৌরবাবু বললেন, "এ-রকম কতগুলো ক্যারাকটারকে আপনি জানেন?"

"অনেক," ভবানীবাবু আমার হয়ে উত্তর দিলেন। "সেই ছোটবেলা থেকে বেচারা জীবনের অনেক ঘাটে জল খেয়ে বেড়াচ্ছে।"

"এসব আপনার লিখতে ইচ্ছে করে না? যদি না লেখেন আমাকে দিন, আব যদি নিজে লেখেন তা হলে তো কথাই নেই।"

ভবানীবাবু বললেন, "লেখার চেষ্টা ছিল। কিন্তু কেথায় কী ধাক্কা খেয়ে ইদানীং হাত গুটিয়ে বসে আছে।"

লজ্জায় মরে যাবার মতো অবস্থা তখন। গৌরবাবু বললেন, "সেকেন্ড-হ্যান্ড মালের কারবার করবেন কোন দুঃখে?"

বললাম, "কয়েকটা লিখে ফেলেছি।" যা বলতে পারলাম না ওগুলো পড়ে আমার সহকর্মী রামকৃষ্ণ মুখার্জি কী মন্তব্য করেছেন।

গৌরবাবু কী ভাবলেন, তারপর বললেন, "লেখাটা একদিন আমার বাড়িতে দেখিয়ে যাবেন।"

কিছুদিন পরে ভবানীবাবুর দয়ায় পাইকপাড়ার বাড়িতে আবার গৌরকিশোর ঘোষের সঙ্গে দেখা হলো। তখন ওঁর চোখের অসুখ চলেছে। তবু আমাকে বললেন, "পড়া শুরু করুন।'

আমি শুরু করলাম—"অবাক হয়ে হাইকোর্টের উঁচু চুড়োটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলো—এর নাম হাইকোর্ট।"

"থামুন," গৌরবাবু চোখ বুঁজে হুকুম করলেন। এবার বললেন, "কথাটা এগিয়ে নিয়ে আসুন—স্টার্টিং-এই বলুন 'এর নাম হাইকোর্ট!' আপনি তো যশুরে বাঙাল? বাংলা সাহিত্যে একবার বাঙালরাই হাইকোর্ট দেখাক।"

পাইকপাড়া থেকে বাসে ভবানীবাবুর সঙ্গে শিয়ালদহ ফেরার পথে শুনলাম, "গুড নিউজ! গৌরবাবু আপনার সঙ্গে সাগরময় ঘোষের আলাপ করিয়ে দেবেন।"

"ওর সঙ্গে তো সাগরবাবুর প্রচণ্ড আলাপ?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"অতি অমায়িক এবং আমুদে লোক এই সাগরময় ঘোষ—কিন্তু লেখার ব্যাপারে ভীষণ কড়া। লেখা পছন্দ না হলে স্বয়ং সরস্বতী এসে রিকোয়েস্ট করলেও লেখা ছাপাতে পারবেন না।"

ব্যাপারটা আমার অজানা নয়। একবার ডাকযোগে একটা লেখা পাঠিয়েছিলাম দেশ পত্রিকায়। সে-লেখা ফিরে এসে মনে ভীষণ দাগা দিয়েছিল। লেখাটা সঙ্গে-সঙ্গে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছিলাম।

এবারও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সেইদিন থেকেই পাণ্ডুলিপি নিয়ে আবার ধস্তাধস্তি শুরু হলো। শঙ্করীদার কাছে ছোটাছুটি বাড়লো। ওঁর মতো পাঠক ভূ-ভারতে নেই। অনেক কপাল করলে ওই রকম 'সাহিত্যদাদা' পাওয়া যায়। প্রতিটি লাইন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তিনি যেমন-যেমন মন্তব্য করছেন বাড়িতে সারারাত ধরে তেমন-তেমন সংশোধন কাজ চালাচ্ছি। উত্তেজনায় ঘুমই আসছে না।

আমার সম্পাদক-ভীতি কমাবার জন্যে ভবানীবাবু বললেন, "ভেরী ভেরী কড়া ম্যান—নো ডাউট! তবে গৌরের খুব বন্ধু—আর সাগরময়বাবুর নতুন লেখক খুঁজে বের করতেও খুব আগ্রহ।"

তবুও আমি ভরসা পাচ্ছি না। ভবানীবাবু বলে উঠলেন, "চিন্তা কী? আপনার সময়ও তো এখন ভালর দিকে। আপনার সায়েবের দাঁতের ব্যথা না হলে বাড়ছে কেন?"

দেশ পত্রিকার বর্মন স্ট্রীটের সেই অফিসটা আজও আমার মনের মধ্যে অমলিন হয়ে আছে। হ্যারিসন রোড-চিৎপুর রোডের মোড় থেকে হাঁটতে-হাঁটতে নানা বিচিত্র জনপদ পেরিয়ে অবশেষে আনন্দবাজার অফিসে পৌঁছানো গেলো। প্রায় অসম্ভব কয়েকখানা করিডর পেরিয়ে ধরণীর এককোণে সাগরময় ঘোষেব দপ্তর। দাঁড়িয়ে আছি গৌরবাবুর অপেক্ষায়।

তিনি এলেন। বললেন, "ভিতরে চলুন।"

সেই প্রথম সাগরময়কে দেখলাম। প্রথম দর্শনেই প্রেম। আমার সমস্ত সাহিত্যজীবনে আর কোনো লোককে আমি এমন শ্রদ্ধা করিনি —শতাব্দীর সিকিভাগের ওপর বিস্তৃত সম্পর্কের সূচনা হলো বর্মন স্ট্রীটের ওই ছোট্ট ঘরটিতে।

গৌরকিশোর ঘোষ যা বলবার বললেন। সুগম্ভীর সাগরময় বললেন, "রেখে যান, দেখে রাখবো।"

আর কোনো কথাই হলো না। ভয়ে ভয়ে চলে এলাম।

সেই রাত্রে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। ঘন কালো রঙের একটা ব্যারিস্টারি গাউন ভৌতিক হাওয়ায় উড়তে-উড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছে এবং বলছে, 'দূর হটো, দূর হটো'। আচমকা আমার ঘুম ভেঙে গেলো। সেই রাতেই আমি নতুন এক পরিচ্ছেদ শুরু করলাম যার নাম—কালো গাউন।

চার সপ্তাহ পরে নির্ধারিত দিনে আবার বর্মন স্ট্রীটে।

সেদিন আমাকে দেখেই সাগরময় ঘোষের মুখ হাসিতে ভরে উঠলো। "আরে আরে আসুন—আপনার কথাই ভাবছিলুম। আপনার লেখাটা যাবে।"

এবার চায়ের অর্ডার দিলেন সাগরময়। খোদ সম্পাদকের দপ্তরে বসে সম্পাদকের খরচে চা-পান—সে তো ছোটখাট একটি নোবেল পুরস্কার।

এরপরে সম্পাদক জিজ্ঞেস করলেন, "নিজের নামে লিখবেন তো?"

আমি বললাম, "না। ছদ্মনামে, যদিও ঠিক ওটা ছদ্মনাম নয়। আমার সায়েব আমাকে ওই নামে ডাকতেন।"

সম্পাদক বললেন, "ঠিক আছে।"

বইয়েব নাম তখনও ঠিক করা যাচ্ছে না। গৌরবাবু বলছিলেন, "এব নাম হাইকোর্ট।" নামটা সবাব পছন্দ হলো না।

নামের জন্য সাগরময় ঘোষ কিন্তু অপেক্ষা কবলেন না। প্রতিটি পরিচ্ছেদ আলাদা-আলাদা নামেই ছাপতে লাগলেন।

এমনই এক সময় বর্মন স্ট্রীটের অফিসে বিমল মিত্রের সঙ্গে আলাপ হলো। সাহেব বিবি গোলাম তখন সামান্য কিছুদিন বেরিয়েছে। বাজারে ভীষণ হৈ-চৈ।

বিমলবাবুকে খুব দেখবার ইচ্ছে ছিল। বিমলবাবু আমাকে ইশারায় পাশেব ঘরে যেতে বললেন। সেখানে চুপি-চুপি বললেন, "আমার প্রকাশক নিউ এজ আপনার বইটাতে বিশেষ আগ্রহী।"

বিমল মিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়াটাও আমাব সাহিত্যজীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা। এই বহুবিতর্কিত লেখক ও মানুষটি তাঁর জীবনের এক পর্বে আমার খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। আমি তাঁর নিবিড় সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছিলাম।

বিমল মিত্রের পরিচয়পত্র হাতেই প্রথম কলেজ স্ট্রীটের নিউ এজ অফিসে এসেছিলাম। ওখানে তখন বিমল মিত্রের সঙ্গে সুদীর্ঘ আড্ডা জমতো। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিটি পরিচ্ছেদ তিনি শুধু মন দিয়ে পড়তেন না, প্রায়ই নানা মূল্যবান পরামর্শ দিতেন। বইটির ভূমিকাও তিনি নিজের কলমে সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

ভূমিকা তো হলো—কিন্তু নাম সমস্যার তখনো কোনো সমাধান হলো না। এমন অবস্থায় প্রকাশক জানকীনাথ সিংহরায় ও প্রচ্ছদশিল্পী অজিত গুপ্ত আমাকে প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাছে নিয়ে গেলেন। বললেন, "প্রেমেন্দ্র মিত্রই হচ্ছেন নামের রাজা।"

নামের রাজা প্রেমেন্দ্র মিত্র আমাকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলেন। তিনিই নামকরণ করলেন, 'কত অজানারে'।

সেই থেকেই শুরু। সাহিত্যের গোড়ার কথা কী তা আমার ঠিক জানা নেই। কিন্তু শেষ কথাটা আমি সেই আশ্চর্য বিদেশীর জীবন থেকে শিখেছি। তা হলো—মানুষকে বিশ্বাস করো, এবং ভালবাসো, ভালবাসো। ঘুমন্ত অণুর মতো আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অনন্ত শক্তি নিহিত রয়েছে, মানুষ একবার জাগলে তার অসাধ্য কিছু থাকে না—সে অনায়াসে গিরি ও সমুদ্র লঙ্ঘন করতে পারে।

এই পরিচ্ছেদ শেষ করার আগে সায়েবের একটি পুরনো গল্প পুনরাবৃত্তির লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। সায়েব প্রায়ই বলতেন, "শংকর, পরের জন্মে আমি বাংলার জামাই হবো।" আমার দিকে সকৌতুক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলতেন, "তুমি ভেবো না যে, বাঙালি মেয়েরা খুব সুন্দরী বলে আমার এই লোভ। আমার নজর বাঙালি শাশুড়ীদের দিকে। এমন শাশুড়ী ত্রিভুবনে কোথাও পাওয়া যায় না। এঁদের দয়ার শেষ নেই। নতুন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসে দশ টাকা দিয়ে নমস্কার করলে শাশুড়ী আশীর্বাদ করে কুড়ি টাকা ফেরত দেন। বিয়ের পরে আমি ধার করে লক্ষ টাকা নিয়ে যাবো। সেই টাকার তোড়া দিয়ে নমস্কার করবো শাশুড়ীকে তারপর বড়লোক হয়ে বাকি জীবন সুখে-শান্তিতে কাটিয়ে দেবো!"

তখন ভাবতাম, সায়েব রসিকতা করছেন। কিন্তু পরে বুঝেছি, ব্যাপারটা মোটেই রসিকতা নয়। লেখার মাধ্যমে আমি তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু রাতারাতি আমিই অনেকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠলাম। আমি নাকি সাহিত্যিক, সত্যদ্রষ্টা, শিল্পী। যা তাঁকে নতমস্তকে করজোড়ে নিবেদন করেছিলাম, মরণ সাগরের ওপার থেকে তিনি তা দ্বিগুণ করে ফেরত দিলেন।

নিজের বোকামির জন্যে এখন মাঝে-মাঝে দুঃখ হয়। তখন কেন তাঁকে মাত্র এক টাকা দিয়ে নমস্কার করেছিলাম। যদি যথাসর্বস্ব দিয়ে তাঁকে নমস্কার করতাম—কষ্ট করে, চেষ্টা করে সেদিন যদি সত্যিই সেই আশ্চর্য মানুষটার কথা আরও ভালভাবে লিখতাম, তাহলে তিনি আমাকে আরও কত কী দিতেন কে জানে?

মনে পড়ে

সুখ-দুঃখ ভরা, উত্থান-পতনে উত্তাল জীবনের এই অনিশ্চিত যাত্রাপথে কত বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তো দেখা হলো, কিন্তু জীবনের এই অপরাহ্ণবেলায় অনেক চেষ্টা করে আজও সায়েবের কথা ভুলতে পারলাম না।

সে অনেক দিন আগেকার কথা, হাওড়া কাসুন্দের এক সহায়-সম্বলহীন বালক সদ্য পিতৃহারা হয়ে অনেকগুলি নাবালক ভাইবোনের বিরাট সাংসারিক দায়িত্ব মাথায় তুলে নিতে মায়ের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ। কলেজের পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে সংসারের প্রেমহীন রণক্ষেত্রে সে প্রবেশ করেছে নিতান্ত অপরিণত বয়সে। হাওড়া খুরুট রোডের বিবেকানন্দ ইস্কুলে-পড়া বালকটির মনের মধ্যে তখন একটি মাত্র প্রতিজ্ঞা—বয়স আঠারো হয়নি, শিক্ষা অসমাপ্ত, কাউকে এমন চিনি না যাঁর সঙ্গে বিরাট এই শহরের অফিস কিংবা কারখানার যোগাযোগ আছে, তবু আমাকে বাঁচতে হবে।

সেই দুঃসময়ে সবচেয়ে সাহায্য করেছিলেন আমাদের ইস্কুলের হেডমাস্টারমশাই সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য—গৈরিক বস্ত্র পরিধান না করেও যিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো নীরবে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শকে তরুণদের মধ্যে প্রচারের সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করেছিলেন। কেন জানি না, সেই ছোটবেলা থেকে স্নেহপ্রবণ হেডমাস্টারমশাই আমার ওপর বাড়তি কিছু প্রত্যাশা রেখেছিলেন, আশা করেছিলেন একদিন আমি তাঁর পরম আদরের বিবেকানন্দ ইস্কুলের মুখ উজ্জ্বল করবো। কিন্তু মুখোজ্জ্বল তো দূরের কথা, প্রায় সমস্ত সহপাঠী থেকে আমি পিছিয়ে পড়লাম। কোনোক্রমে ম্যাট্রিক পাস করে, সামান্য কিছুদিন কলেজে যাতায়াতের পর আমার ছাত্রজীবনে ইতি পড়লো। আমি অসময়ে হারিয়ে গেলাম ব্যর্থ মানুষের ভিড়ে।

এই আশাভঙ্গে হেডমাস্টারমশাই অবশ্যই দুঃখিত এবং আমি লজ্জিত। কারণ আমি বিজয়ী হবো এই প্রত্যাশায় তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞান ও ভালবাসা আমাকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। তাঁর মূল্যবান সময়ের বড় অংশ বেশ কয়েক বছর ধরে আমার ওপর অপচয় হলো। যে-গাছে জলসিঞ্চন হলো, সে যদি বড়

না হয় তা হলে অবশ্যই দুঃখ হয়। আর গাছেরও নিশ্চয় লজ্জা আছে! আমি তখন ইস্কুলের মাস্টারমশায়দের থেকে পালিয়ে-পালিয়ে বেড়াতাম, কারণ ব্যর্থতা মানুষকে একই সঙ্গে দুর্বল ও নিঃসঙ্গ করে তোলে। মনে হতো, আর মুখ দেখাবার উপায় নেই, আমি আমার প্রিয়জনদের প্রত্যাশার উপযুক্ত হতে পারলাম না—অবশ্যই নিজের দোষে।

হেডমাস্টারমশাই মাঝে মাঝে আমার বন্ধুদের মাধ্যমে খবর পাঠাতেন দেখা করবার জন্যে, কিন্তু আমি যেতাম না। শেষে ইস্কুলের বেয়ারা গজেনদা একদিন আমাকে খুরুট রোডের ওপর পাকড়াও করলেন এবং কোনোরকম কথা না বাড়িয়ে তৎক্ষণাৎ আমাকে হাজির করলেন হেডমাস্টারমশাইয়ের ঘরে। আজকালকার খবর তেমন রাখি না, বিশ্ববিদ্যালযের ভাইস-চ্যান্সেলারকেও অনেক ছাত্র নাকি এখন তোয়াক্কা করে না, কিন্তু সে সময় গজেনদাকেও আমরা ভীষণ ভয় করতাম। আমাদের আচরণ সম্পর্কে বিবেকানন্দ-অনুরাগী বেয়ারা গজেনদারও একটা বিশেষ প্রত্যাশা ছিল।

ভেবেছিলাম, হেডমাস্টারমশায় কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন করে আমাকে লজ্জা দেবেন। কিন্তু তিনি আমার পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া, পিতৃহীন সংসারের বিরাট দায়-দায়িত্বের কথা কিছুই উল্লেখ করলেন না। কথা না-বাড়িয়ে তিনি আমাকে ইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগে একটা মাস্টারির প্রস্তাব দিলেন। এমন ভাব দেখালেন যেন ইস্কুলের স্বার্থেই আমাকে তাঁর ভীষণ প্রয়োজন। পরবর্তী জীবনে অনেক চাকরি পেয়েছি, কিন্তু হেডমাস্টারমশায়ের অযাচিত অসীম দয়ার সঙ্গে কারও কোনো তুলনা হয় না।

ইস্কুলে চাকরি হলো, কিন্তু মাস্টারির সাড়ে-বাষট্টি টাকায় আমার বিরাট সংসার চলে না। বাড়ি ভাড়াই লাগে পঁচিশ টাকা। ভাইবোনরা ইস্কুলে ফ্রি পড়ার সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু তাদের অসুখ-বিসুখের দায় রয়েছে। যে যত দরিদ্র ঈশ্বর তাকে শারীরিকভাবে তত দুর্বল করে তুলতে আনন্দ পান, তাদের রোগ লেগেই থাকে।

কম কথার মানুষ ছিলেন সুধাংশুশেখর। তবু তিনি একদিন আমাকে বলেছিলেন, "ভয় পেয়ো না, নিরাশ হয়ো না। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছেন—সতত প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের নামই জীবন।" আমি তখন কোনো রকমে আপন প্রাণ রক্ষার সংগ্রামেই ব্যতিব্যস্ত, প্রকাশিত অথবা বিকশিত হবার কোনো দুঃসাহসিক বিলাসিতা আমার বিন্দুমাত্র

নেই সেই মুহূর্তে!

হেডমাস্টারমশাই চুপি-চুপি আমাকে বলেছিলেন, "তুমি অন্য জায়গাতেও চাকরি দেখো। যদি এর থেকে ভাল কিছু পেয়ে যাও আমাদের এখান থেকে ছুটি নিও।"

এই সময় পাড়ার এক দাদা গৌরমোহন সামন্ত আমার উপকারে লেগেছিলেন। যোগমায়া দেবী লেনের গৌরমোহন একদিন বললেন, "পাটের থলে ডিপার্টমেন্টে একজন স্টেনো টাইপিস্ট নেবে। চল্, লাক ট্রাই করবি।"

ভাগ্যপরীক্ষার সে এক আজব গল্প। গৌরদা বারবার বলে দিয়েছিলেন, "যদি দেখিস বাবুজী তোকে পছন্দ করেছেন তাহলে বলবি, আমি চাকরি করছি, মাসিক একশ কুড়ি টাকার কমে চাকরি ছেড়ে আসতে পারবো না।"

সেই মতো রিহার্সাল দিয়েছি কয়েকবার। ভেবেছি, একশ কুড়ি টাকা মাইনে! সে তো রেঞ্জার্স লটারির ফার্স্ট প্রাইজের চেয়েও বেশি। যথারীতি সওদাগরী অফিসের গানি ডিপার্টমেন্টের বাবুজী পরীক্ষা নিলেন, তারপর ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কত মাইনে চাও?"

আমার তখন বুকের ভিতরটা দপ-দপ করছে, মাসিক একশ কুড়ি টাকা মাইনে চেয়ে এই সুবর্ণ সুযোগটা কিছুতেই হারাতে পারবো না। কথায় বলে, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! আমি তাই বীরদর্পে বাবুজীকে জানালাম, "আমি পঁচাত্তর টাকার কমে কিছুতেই পারবো না।"

বাবুজীর চেম্বার থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার পর আমার মুখে সব শুনে গৌরদা খুব বিরক্ত হলেন। বললেন, "এই ভুল তুই করলি কী করে? এতো করে তোকে ট্রেনিং দিলাম।"

আমি নিজেও তখন আঙুল কামড়াচ্ছি, যারা বোকা কোনো ট্রেনিং-এই তাদের কিছু হবার নয়! বাড়ি ফিরে মায়ের কাছেও আর এক প্রস্থ বকুনি খেতে হবে আমাকে। কোথায় পঁচাত্তর, আর কোথায় একশ কুড়ি! প্রতি মাসে পঁয়তাল্লিশ টাকার ফারাক। রাতারাতি ভাগ্য পরিবর্তন হতে-হতে আমারই নিজের দোষে তা হলো না!

বিধবা মাকে সব কথা বললাম। মায়ের সংসারে তখন অভাবের শেষ নেই। কিন্তু অত দুঃখের মধ্যেও মা রাগ করলেন না। বললেন, "মনিবকে ঠকাতে নেই। মন দিয়ে কাজ করে যাও, দেখবে মনিব নিজেই একদিন তোমাকে একশ কুড়ি টাকা কেন, তার থেকেও বেশি দিচ্ছেন।"

কথাটা তখন বিশ্বাস হয় নি, কিন্তু পরে দেখেছি, ব্যাপারটা একেবারে অলীক

কল্পনা নয়। কী পাচ্ছ তার হিসেব নিয়ে অযথা মাথা না ঘামিয়ে যারা অকাতরে কাজ করে যায় তারা এই সংসারে কখনও ঠকে না।

রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেসে পাটের থলে বিভাগের কাজকর্ম—সে এক বিচিত্র জগৎ। সে-জগতের গল্প অন্য কখনও সুযোগ পেলে লেখা যাবে।

এখন শুধু বলি, কাজ করছি কিন্তু মনে একটুও সুখ নেই। বিরাট এই অফিসের বিশাল বৈভব থেকে অনেক বেশী সুখের ছিল আমাদের বিবেকানন্দ ইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগের টিচার্স-রুম। হেডমাস্টারমশায়কে পরবর্তী জীবনে আমি বলেওছি, "বহুদিন ধরে জীবনের অনেক বন্দর ঘুরে, শেষ পর্যন্ত আমি আবার ফিরে আসবো ছোট কোনো বাংলা ইস্কুলে।" সত্যিই যে অন্তত একবার ইস্কুলের মাস্টারমশাই হয় নি বিশ্বসংসারে তার শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছে। শুনেছি, কোনো সৈন্যবাহিনীর শিক্ষা সমস্ত নাগরিকের পক্ষে আবশ্যিক। দূরদর্শী হলে দেশনায়করা কয়েক মাসের জন্যে ইস্কুল-শিক্ষকতাকেও আবশ্যিক করবেন।

সুধাংশুশেখর তখনও খুব উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। উৎসাহিত হবারই তো কথা! বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রি সসম্মানে লাভ করেও নিজের কেরিয়ার গঠনে বিন্দুমাত্র উৎসাহী না হয়ে তিনি অখ্যাত ইস্কুলে ছোটদের গড়ে তোলার দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির কী খেয়াল! সর্বস্ব ত্যাগের পরও জীবনের শেষপ্রান্তে তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। তখন সত্তর দশকের অশান্তি বাঙালীর জাতীয় জীবনের ভিত্তিস্থল ধরে নাড়া দিচ্ছে। শৃঙ্খলা ও আদর্শ রক্ষা করতে অসমর্থ হয়ে সুধাংশুশেখরের মতো মানুষও শিক্ষাজগৎ থেকে সরে যাবার কথা চিন্তা করেছেন। সেইসময় অসুস্থ অবস্থায় একবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল হাসপাতালে। রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের বেডে শুয়ে তিনি তখন বিচিত্র এক কথা বলেছিলেন আমাকে। "কমবয়সী ছেলেদের আমার চোখের সামনে এনো না। বিশৃঙ্খল, স্বার্থসর্বস্ব, অধঃপতিতদের দেখলে আমার কষ্ট হয়।"

কী আশ্চর্য! সেই লোক, যিনি ছোটদের শিক্ষার জন্য তাঁর জীবন এবং সমস্ত রোজগার বছরের পর বছর বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি মনে করছেন—সমস্ত জীবনের বিনিয়োগ বিফল হয়েছে। তাঁর আজীবন সঞ্চয় যেখানে গচ্ছিত ছিল সেই ব্যাংক যেন ফেল করেছে। না, আবার আমি পথভ্রষ্ট হচ্ছি, হেডমাস্টারমশায়ের জীবন, সাধনা, যন্ত্রণা ও শেষ মুহূর্তে উত্তরণের ছবিটা মৃত্যুর আগে আমাকে লিপিবদ্ধ করে যেতেই হবে, তার মধ্যে হয়তো গল্প নেই, কিন্তু ইতিহাস রয়েছে এবং সম্ভবত কিছু শিক্ষাও আছে।

আসুন, আমরা একবার ফিরে যাই বিভূতিদার কাছে। প্রত্যেক যন্ত্রের একজন স্টার্টার প্রয়োজন হয়, অচল অবস্থা থেকে তবে সে সচল হয়। বিভূতিদা, কাসুন্দে চৌধুরী বাগানের নানা দুঃখে ক্ষতবিক্ষত, নানা ভয়ে সন্ত্রস্ত একটি বালকের স্তব্ধ গাড়িটাকে অনেকক্ষণ ধরে ঠেলে অসীম করুণায় আপনিই সচল করে দিয়েছিলেন। বিভূতিদা, আপনার ঋণ আমি এজন্মে শোধ করতে পারলাম না। সংসারের নানা জটিল শিকড়ে অসহায়ভাবে জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু কী ঘটেছিল আমি তা এখনও ভুলি নি ; কিন্তু সহজ করে সুন্দর করে স্মৃতি রোমন্থনের অবসরটুকুও নেই এই কঠিন কর্মব্যস্ত জীবনে। পরীক্ষা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে নিরন্তর। প্রতিযোগিতায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবার শিক্ষা ও শাসন আপনার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম, কিন্তু সেই পরীক্ষা যে জীবনের প্রান্তসীমা পর্যন্ত একইভাবে চলবে তা কে জানতো, বিভূতিদা?

পাটের থলে বিভাগে কাজ করছি বটে, ইস্কুলের থেকে মাইনেও বেশি, কিন্তু মন যেন ভরে না! আর্থিক প্রয়োজনের তুলনায় তখন মনের অবশ্য কোনো গুরুত্বই ছিল না। পাঁচ টাকা বেশি মাইনেব জন্য যে কোনো অপ্রিয় পরিস্থিতিতে নতুন কাজ নিতে প্রস্তুত এবং উৎসুক আমি। পছন্দ-অপছন্দ তখন এক স্তরের বিলাসিতা, শরীরের ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রচেষ্টাতেই আমি বিপন্ন।

তবু বিভূতিদা আমার খবর রাখতেন, কারণ তাঁর সঙ্গে দেখা হতো শর্টহ্যান্ড পরিশীলনের এবং প্রাত্যহিক রুটিনে। বারওয়েল সায়েবের বাবু বিভূতিদা বেশ ভয় পেয়েছেন—মধ্যবয়সে সম্পূর্ণ রোজগারহীন হবার সম্ভাবনায়। বারওয়েল সায়েবের বয়স বাড়ছে, আর বিভূতিদার শর্টহ্যান্ড স্পিড কমছে। এই অবস্থায় প্রতিযোগিতার বাজারে বিভূতিদার নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ সুদূরপরাহত হচ্ছে।

অবশেষে বিভূতিদা একদিন বিজয়দর্পে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন। সায়েবের সাহায্যেই তিনি এমন এক চাকরি পেয়েছেন যা তাঁর কল্পনারও বাইরে ছিল। বিভূতিদাকে এখন আর ডিকটেশন নিতে হবে না, এখন তিনিই বিখ্যাত এক অফিসে স্টেনোগ্রাফার ব্যবহার করবেন। বাঙালির সংসারে এমন আনন্দময় নাটকীয় ঘটনাও ঘটতে পারে!

বিভূতিদা এরপর বললেন, "আমার এখন চিন্তা সায়েবকে নিয়ে। একটা ভাল ছেলে তাঁকে দিতেই হবে।"

বিভূতিদা কী ভাবলেন, তারপর আমাকেই প্রস্তাব দিলেন। আমি তো প্রথমে

আকাশ থেকে পড়লাম। নিরাপত্তার ভয়ে যে-মানুষের চাকরি ছেড়ে চলে যেতে বিভূতিদা নিজেই উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছেন, সে-মানুষের কাছে তিনি আমাকে পাঠাতে চাইছেন কেমন করে? তাঁর তো অজানা নয়, একমাস মাইনে না পেলে আমার পক্ষে অনাহার ছাড়া কোনো পথই খোলা থাকবে না।

সব জেনে-শুনেই বিভূতিদা হঠাৎ বলে বসলেন, "আমার মনে হয় বারওয়েল সায়েবের বাবুর কাজটা তোমারই পাওয়া উচিত।"

প্রস্তাবের পক্ষে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। বিভূতিদা ইতিমধ্যে ভাবতে আরম্ভ করেছেন আমার সুদূর ভবিষ্যতের কথা। "তুমি তো চিরকাল এই শর্টহ্যান্ড টাইপের কাজে সন্তুষ্ট থাকবে তা তো আমি চাই না। আমি জানি তোমাকে অনেক এগিয়ে যেতে হবে।" কী যেন মনে-মনে ভাবলেন বিভূতিদা, তারপর পরামর্শ দিলেন, "যদি মানুষ হতে চাও, যদি নিজেকে তৈরি করতে চাও, তা হলে সায়েবের কাছে আসা ছাড়া তোমার পথ নেই।"

যদি হঠাৎ কোনো সকালে সায়েব চোখ বোজেন? তখন? লজ্জার মাথা খেয়ে আমাকে অপ্রিয় অথচ সত্য প্রসঙ্গ তুলতে হলো।

বিভূতিদা আশ্চর্য মানুষ। আমার এই দুশ্চিন্তার ওপর যোগ্য গুরুত্ব দিলেন। তিনি বললেন, "তুমি যা ভয় পাচ্ছো তা মোটেই অন্যায় নয়। কিন্তু মনে রেখো, কলকাতা শহরে এখনও কাজের লোকের ভীষণ চাহিদা। যে মন দিয়ে কাজ শিখেছে, পরিশ্রমকে যে ভয় পায় না সে কখনও এই পৃথিবীতে নিরন্ন হয় না। আমার মনে হয়, সায়েবের কাছে যে লোক কাজ শেখবার সুযোগ পাবে সমস্ত দুনিয়ার দরজা তার সামনে অবশ্যই খোলা থাকবে।"

কিন্তু মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজে না। তখন বিভূতিদা হঠাৎ প্রতিশ্রুতি দিলেন, সায়েবের অঘটন কিছু ঘটলে তিনি কিছু দিনের জন্যে আমার মাইনের দায়িত্ব নেবেন, যতদিন না আমি আর একটা কাজ খুঁজে পাচ্ছি।

হাওড়া কাসুন্দের এক অপরিণত বালকের চোখের সামনে কালী ব্যানার্জি লেনের বিভূতিদা মহাসৌভাগ্যের সিংহদ্বার খুলে দিলেন।

যে-লোক কোনোদিন ইংরেজিতে কথা বলেনি, যে কখনও কাছ থেকে সায়েব দেখেনি সে-ই চললো খোদ এক বিলিতি সায়েবের বাবু হতে। তার ইংরিজি কেমন? কেউ তা জানতে চাইলো না। তার দ্রুত লিখনের গতি কতটুকু? তা পরীক্ষিত হলো না, তবু তার নতুন চাকরি নির্ধারিত হয়ে গেলো। বিভূতিদা বললেন, "সায়েবের সঙ্গে আমি কথা বলে রেখেছি। সায়েব তোমাকে না দেখেই বলেছেন, ছেলেটি যে ভীষণ ভাল সে সম্বন্ধে আমার মনে কোনো

সন্দেহ নেই!"

সায়েব! সে তো ইংলন্ডে জন্মায়। তারপর গট-গট করে এদেশে চলে আসে। সায়েবরা মানুষ কেমন হয়? ভীষণ ভয় ছিল আমার মনের মধ্যে। আমি শুনেছিলাম, সায়েবরা ভীষণ রাগী হয়। সোডা-লেমনেডের বোতল আচমকা খুলে দিলে যেমন শব্দ হয় তেমন ভট-ভট আওয়াজ করে সায়েবরা ইংরিজি বলে। কোনো কথাই সায়েবদের বোঝা যায় না। সায়েবরা ভীষণ কড়া, পান থেকে চুন খসলেই গুরতর বিপদ!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দূর থেকে দ্রুত ধাবমান মিলিটারি ট্রাকে সায়েবদের দেখেছি।

আমাদের পাড়ার চা-ওয়ালা বিশুদার অনেক অভিজ্ঞতা। তিনিই আমাদের প্রথম বুঝিয়েছিলেন, "জেনে রাখ, সায়েব দু'রকমের! ইংরাজ সায়েব আর আমেরিকান সায়েব। ইংরাজ সায়েব হচ্ছে আমাদের প্রভু। আর ওঁদের প্রভু হচ্ছেন আমেরিকান সাযেব। বলতে পারিস আমেরিকানরা আমাদের দাদু সায়েব!"

আমাদের বিস্ময়কে আরও বাড়িয়ে চা-ওয়ালা বিশুদা ব্যাখ্যা করেছিলেন, "ইংরেজ সায়েবকে জাপানীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে দাদু সায়েবরা ইউ-এস-এ থেকে এসেছেন।"

তারপর মনে আছে, একদিন অঘটন ঘটালো। রাস্তার ওপর বিশুদার চায়ের দোকানে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লো এক আমেরিকান মিলিটারির ট্রাক। অমন সুন্দর দোকানের সর্বস্ব ভেঙে চুরমার। কিন্তু ভাগ্যক্রমে কেউ প্রাণে মারা যায় নি।

দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শী আমি হাফ-প্যান্ট পরে ছুটে গিয়েছিলাম। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। আমেরিকান সায়েব ট্রাক ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে এসে মনের আনন্দে চিউয়িং গাম বিতরণ করছেন। সেই আমার জীবনের প্রথম চিউয়িং গাম চিবনোর সুযোগ। চিউয়িং গামের হরির-লুটের খবরটা বিদ্যুৎবেগে সমস্ত পাড়ায় প্রচারিত হলো।

সেইদিনই বিকেলে বিশুদার সঙ্গে আবার দেখা হলো। ভেবেছিলাম এতোদিনে তিনি আমেরিকানদের শাপশাপান্ত করবেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, বিশুদা সম্পূর্ণ শান্ত। তাঁর মুখে কোনো বিরক্তির ছায়া নেই। মনের সুখে অদ্ভুত এক প্যাকেট থেকে লাকি স্ট্রাইক সিগারেট বার করে ধূমপান করছেন বিশুদা।

বিশুদা তখন আমাদের বলেছিলেন, "বিরাট জাত এই মার্কিন সায়েবরা।

হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে ক্ষয়-ক্ষতি করতেও যেমন এঁদের জুড়ি নেই, তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে ক্ষতিপূরণ করতেও এঁদের তুলনা নেই।" মনের সাধ মিটিয়ে আবার দোকান ঢেলে সাজাবার মতো যথেষ্ট টাকা যে বিশুদা মার্কিনীদের কাছে পেয়েছেন তা সহজেই আন্দাজ করা গেলো।

মনে আছে, কে একজন জিজ্ঞেস করে বসলেন, "ইংরেজ সায়েবরা কেমন, বিশু?"

"সে ইংরেজ আর নেই!" দুঃখ করেছিলেন বিশুদা। "জার্মানরা ধোলাই দিয়ে সেরা ইংরেজদের শেষ করে দিয়েছে। কিছু সৎ ইংরেজ পুরোপুরি আমেরিকান হয়ে গিয়েছে। যেগুলো পড়ে আছে সেগুলো কিপ্টের রাজা! ক্ষতি করতে ইংরেজেরও তুলনা নেই। গত বছরে, একটা ইংরেজ মিলিটারি জীপও তো আমার কাকার দোকানের দু'খানা বেঞ্চি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ তো দূরের কথা, উল্টে ডায়রিতে কাকার নাম-ঠিকানা লিখে নোটিস পাঠালো কেন রাস্তার ওপর বেআইনি দোকান করা হয়েছে? কেন কাকার জরিমানা হবে না?"

মহাযুদ্ধের সময় আরও একবার আমাকে সায়েবদের হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছিল! সেবার আমরা এক সিনেমা হাউসে ইংরিজি ছবি দেখতে গিয়েছিলাম। সিনেমায় তখন ইংরেজ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক দেখিয়ে 'গড সেভ দ্য কিং' সঙ্গীত পরিবেশিত হতো। সবাইকে তখন শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে হতো—পরাধীন দেশের রাজসঙ্গীত।

সেবার কিন্তু ভীষণ কাণ্ড! হঠাৎ হলের মধ্যে হৈ-চৈ এবং প্রবল উত্তেজনা। কানে যে সব খবর এলো তাতে আন্দাজ করতে অসুবিধে হলো না যে পরিস্থিতি ঘোরতর! দু'জন মত্ত মার্কিন মিলিটারি সায়েব রাজসঙ্গীতের সময় ঠ্যাং ছড়িয়ে সীটে বসে রইলো, উঠে দাঁড়িয়ে ইংরেজ-এর কিং এমপারার-এর প্রতি সম্মান দেখানোর বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাচ্ছে না এই দুই মার্কিন সায়েব। পাশের সীটগুলিতে কয়েকজন ইংরেজ সৈন্যও ছিল। তাঁরা ভীষণভাবে অপমানিত বোধ করে, এদের উঠে দাঁড়াতে পরামর্শ দিচ্ছে। মত্ত মার্কিন যুবক দুটি মনের সুখে বলে চলেছে "বৎস, কেন তোমরা পরিস্থিতি বুঝে কাজ করছো না? ভগবান কী করে তোমাদের রাজাকে রক্ষে করবেন? আমেরিকা উইল সেভ দ্য কিং।"

সে এক প্রচণ্ড উত্তেজনার সময়। শোনা গেলো রাজভক্ত ইংরেজও নাছোড়বান্দা, তারা এম-পিকে খবর পাঠিয়েছে। সে যুগে এম-পিকে সবাই বিশেষ সম্মান করে চলতো। এম-পি বলতে তখন পার্লামেন্টের মেম্বার

বোঝাতো না—মিলিটারি পুলিশ। মিলিটারি পুলিশ কী ভাবে সেই জটিল ভগবান-ভরসাস-আমেরিকান প্রটোকল সমস্যার সমাধান করেছিলেন তা নিজের চোখে দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। কারণ গুলি বিনিময় হতে পারে এই আশঙ্কায় আমরা অনেকেই তখন সিনেমা হল ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলাম।

তারপর মিলিটারি সায়েব সম্বন্ধে শ্রদ্ধা নৈব নৈব চ! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবাদে প্রতিদিন শত শত গোরা সৈন্য দেখা হয়েছে আমাদের। তালগাছের মত চেহারা এক-একটা —হাতে থাকে স্টেনগান। এমন ভাব যেন যে কোনো মুহূর্তে ফায়ারিং শুরু করতে পারে। সবাই বলে দিয়েছিল—মিলিটারি থেকে দূরে থাকো। বাঁচতে যদি চাও, তফাত যাও। মিলিটারি দেখতে গিয়েই তো আমাদের পাড়ায় একটি ছেলে গাড়ি চাপা পড়লো। সবাই অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলো, কেউ কিছু করতে পারলো না।

আমাদের এক বন্ধুর বাবা পুলিশে কাজ করতেন। এই বন্ধুটি মিলিটারি সায়েব দেখলেই বলে দিতে পারতো সেপাই না লেফটেনাণ্ট না ক্যাপ্টেন না মেজর। লেফটেনান্ট কর্নেল বানানটা ইংরেজিতে ম্যানেজ করা ছিল শিবেরও দুঃসাধ্য। ভুল বানানের জন্যে দু'দিন আমাকে ইস্কুলে দাঁড়াতে হয়েছে। শেষে একজন বন্ধু চুপি-চুপি বানানের মন্তরটা শিখিয়ে দিয়েছিল—মিথ্যে তুমি দশ পিঁপড়ে! মিথ্যে মানে Lie, তুমি —U, দশ অর্থাৎ Ten এবং পিঁপড়ে —Ant। কোনো ভুল হবার চান্স নেই— Lieutenant। যাব বানানেই এমন বিপত্তি সেই পদের সায়েবরা কী বিপজ্জনক হবেন তা সেই বয়সেই আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম।

এরপর দীর্ঘদিন ধরে শ্বেতাঙ্গ থেকে আমি শত হস্ত দূরে থেকেছি। কী দরকার নিজের অস্বস্তি বাড়িয়ে?

আর একবার রামকৃষ্ণপুর-চাঁদপাল ফেরি স্টীমারে এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে স্পেশাল টিকিট কিনেছিলাম। বন্ধুই আমাকে জানিয়েছিল, এই স্পেশাল ক্লাসে যেসব সায়েব-মেম যাতায়াত করেন, তাঁদের পাশে বসলে সেন্টের স্পেশাল গন্ধে নতুন এক অভিজ্ঞতা হয়। মিষ্টি গন্ধে মেজাজ মাতোয়ারা হয়ে ওঠে।

কথাটা খুব মিথ্যে নয়, কারণ মেমসায়েবদের শরীরে ছড়ানো উগ্র সেন্টের গন্ধ স্পেশাল ক্লাস সত্যিই ভরপুর হয়েছিল। কিন্তু একটু পরেই বিরাট মোটা এক মেমসায়েবকে রাগের মাথায় এক সায়েবকে চড় এবং ঘুষি মারতে দেখেছিলাম। একেবারে সাক্ষাৎ রণরঙ্গিনী মা দুর্গা! শুধু আটখানি হাত কম, কিন্তু তাতে কিছুই এসে যায় না! মেমসায়েবের প্রতি হাত দশটি হাতের স্পিডে

অসুরমর্দন করে চলেছে! মেমসায়েবদের সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গিয়েছিল, কিন্তু অনেকদিন পরে নিয়মিত হাইকোর্টে যাতায়াতের সময় আবিষ্কার করেছিলাম এঁরা কেউ খোদ সায়েব নন! স্থানীয় মতে এঁরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ইংরিজি মতে এঁরা ইউরেসিয়ান—হাওড়ায় চটকলে কাজ করে এঁরা নিয়মিত এই জলপথে এলিয়ট রোড অঞ্চলে ফিরে যেতেন।

বিদেশী সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র অভিজ্ঞতা সম্বল করে কেমন করে একদিন 'অম্বা' নামক স্টীমারে নদী পেরিয়ে চাঁদপাল ঘাটে নেমে, হাইকোর্টের দক্ষিণ দিকের রাস্তা ধরে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের অন্যতম আদালতী কর্মক্ষেত্র টেম্পল চেম্বার্সে পদার্পণ করেছিলাম এবং এক পরম পুণ্য লগ্নে বারওয়েল সায়েবের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম সে গল্প আপনাদের অজানা নয়।

সে এক আশ্চর্য যোগাযোগ! একদিকে শাসক ইংরেজের জয়তিলক আঁকা একজন খাঁটি ইংরেজ ব্যারিস্টার যিনি একদিন রণক্ষেত্রেও বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন, আর একদিকে আমি—যে পয়সার অভাবে পড়াশোনা বিসর্জন দিয়েছে, যার বয়সের সার্টিফিকেটে নজর দিলে কেউ তাকে চাকরি দেবে না। নাবালকটি ইংরেজি লেখায় এবং বলায় অপটু, অথচ তাকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ উচ্চশিক্ষিত ইংরেজের দপ্তর-সংক্রান্ত সমস্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে ইংরিজী ভাষায়। আপাত অসম্ভব এই মিলন। কেনো হিসেবেই এই যোগাযোগ সার্থক হতে পারে না। আমার বুক জুড়ে ভীষণ ভয়। লোভনীয় ভবিষ্যতের কথা আগাম ভাবতে গিয়ে আমি গানি ডিপার্টমেন্টের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় অকারণে বিসর্জন দিয়ে এলাম। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু!

সেই মুহূর্তে তিনটি মানুষের অভয়বাণী আমার অজানা অনিশ্চিত পথের সম্বল হয়েছিল। বিভূতিদা, যিনি বলেছেন, "সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে, একদিন তুমিও তরতর করে ইংরিজি বলে যাচ্ছো এবং সায়েবদের প্রতিটি কথা ডিকশনারি না-খুলেও বুঝতে পারছো।"

আর একজন বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশনের পরম স্নেহময় হেডমাস্টারমশাই, যিনি আমার ভবিষ্যৎকে নতুনভাবে গড়ে তুলবার জন্যে আমাকে আরও একটা সুযোগ দিতে চান, যাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস তিনি ভুল করেন নি, একদিন আমি তাঁর প্রত্যাশা পূরণ করে বিবেকানন্দ ইস্কুলের মুখোজ্জ্বল করবো। তাই চুপি-চুপি নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ইস্কুলের খাতা থেকে আমার মাস্টারির নাম তিনি কেটে দেন নি। কেবল উইদাউট-পে করে রেখে দিয়েছিলেন। ভাগ্যের অরসিকতায় যদি আমি নতুন এই অ্যাডভেঞ্চারে পরাভূত হই তা হলে কোনোরকম অসম্মাননায়

জর্জরিত না করেই তিনি আমাকে নিঃশব্দে ফিরিয়ে নেবেন বিবেকানন্দ ইস্কুলের প্রাথমিক বিভাগে। আজকাল নাকি ইস্কুলে নিয়মের বন্ধন অনেক বেড়েছে, এইভাবে নিছক ভালবেসে এবং কারও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কাউকে মাস্টারি দেওয়া যায় না। আইনের ফিতেয় বন্দী হয়ে পৃথিবী ক্রমশঃই যেন নিঃস্ব হয়ে উঠেছে, বহুবিচিত্র পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা-সংগ্রামের সুযোগ আমাদের মধ্যবিত্ত জীবন থেকে বিলুপ্ত হচ্ছে। বিবেকানন্দ স্কুলের প্রধান শিক্ষক সুধাংশুশেখর, বহু দুঃখের বোঝা শেষ জীবনে বহন করে যে-অমৃতলোকে আপনি গমন করেছেন সেখানে বসেই আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আপনার নিঃশব্দ ত্যাগ, আপনার সমস্ত পরিশ্রম মানব সমাজের কতটুকু মঙ্গল করেছে তা জানি না, কিন্তু একজন অসহায় ছাত্রের জীবনে আশার স্নিগ্ধ আলোটি নিশ্চিতভাবে আপনিই জ্বালিয়ে দিয়েছেন।

• আরও একজন ছিলেন। তাই না অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে নড়বড় না করে আমি তেপায়ার ওপর নির্ভর করে আত্মবিশ্বাসী হতে পেরেছিলাম। তিনি আমার গর্ভধারিণী জননী। নামে এবং কর্মে অভয়া। ইস্কুলের লেখাপড়ার সুযোগ পান নি মা, কৈশোর যৌবনও কাটে নি সুখে।

সুখে কাটতে পারতো। কিন্তু সেখানেও সায়েবী সংঘাত! আমার দাদু এক বিলিতি অফিসে কাজ করতেন। কিন্তু সেখানে এক সায়েব তাঁর চেয়ারে পা তুলে দিয়ে কথা বলায় তিনি ইংরেজনন্দনকে একটি চপেটাঘাতের দুর্জয় দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। তারপর যা হয়, তিনি সেই যে অফিস ছেড়েছিলেন আর সে-মুখো হন নি। দারিদ্র্যের দুর্ভাগ্য খোঁজখবর নিয়ে নকফুল গ্রামে অবিলম্বে পৌঁছেছিল এবং আমার মা হয়েছিলেন তার অনিচ্ছুক বলি। সুন্দরী হওয়া সত্ত্বেও অর্থাভাবে তাঁর বিবাহ হয়েছিল প্রায় পিতার বয়সী আমার পিতৃদেবের সঙ্গে। তাও অর্থসুখ আসে নি, আসে নি নিরাপত্তা। একের পর এক আটটি সন্তানের জননী হয়েছেন তিনি। ভাগ্যসন্ধানে আমার আইনজীবী পিতা বনগ্রামের আশ্রয় ছেড়ে কলকাতার উপকণ্ঠে হাওড়ায় এসেছেন। নতুন করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সমস্ত ঝঞ্ঝাট ও যাতনা মা নীরবে বহন করেছেন। তারপর ভাগ্য যখন সবে সুপ্রসন্ন হতে চলেছে, স্বামী যখন আবার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন, তখন নিষ্ঠুর মৃত্যু এসে সমস্ত তছনছ করে দিলো। ইনসিওর কোম্পানির সামান্য কিছু টাকার ওপর নির্ভর করে, আমার মা কোন্ উপায়ে দুঃস্বপ্নের দীর্ঘরাত পেরিয়ে আসবার কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করলেন তা আজও আমার কাছে এক মহাবিস্ময়।

আগেই বলেছি, নামে ও কাজে দুয়েতেই অভয়া। কোনো অবস্থাতেই মাকে

আমি বিন্দুমাত্র ভয় পেতে দেখি নি। অমন নির্ভয় জননীর গর্ভে আমার মতো সদাসন্ত্রস্ত সন্তানের জন্ম হলো কী করে তাও আমি ভেবে পাই না।

আমার মায়ের নীতিবোধ ছিল প্রখর, আর ছোটখাটো বাধা তাকে কোনোক্রমেই বেঁধে রাখতে পারতো না। কোনোরকম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা না নিয়েই তিনি ছিলেন এক অবিশ্বাস্য পরিশীলিত মনের অধিকারী।

এই চাকরির ব্যাপারে মাকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি বলেছিলেন, "বিভূতি তোমাকে ভালবাসে। সে তোমার কোনো ক্ষতি করবে না। ভাল লোকের সঙ্গে কাজ না করলে ভাল কাজ শেখা যায় না।"

মায়ের এই কথাটি আমি আজও প্রাণভরে বিশ্বাস করি। যারা ভাল মানুষের কাছে কাজ করার সুযোগ পায় নি তারা বুঝবে না পৃথিবীতে তারা কী হারালো। আমার অসীম সৌভাগ্য, ভাগ্যের দেবতা আমাকে বারবার নিষ্ঠুর পরীক্ষার মধ্যে ফেললেও তিনি কখনও আমাকে ভালমানুষের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেন নি।

শৃন্বন্তু বিশ্বে! হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ করো। আমার সংক্ষিপ্ত সামান্য জীবন-পথে আমি শুভ-সান্নিধ্যের অমৃতধারায় অবগাহন করেছি। আমার সমস্ত অভিমান, আমার সমস্ত দুঃখময় স্মৃতি সহনযোগ্য হয়েছে, মানুষের ভালবাসায় আমি চিরদিনের জন্য ধন্য হয়েছি।

মনের মানুষ

প্রথম দর্শনেই চোখে পড়লো বারওয়েল সায়েবের টাক! অচেনা লোকের মাথায় বিশাল টাক দেখলে সেই ছোটবেলা থেকে আমি ভরসা পাই! আমার বাবার মাথায় টাক ছিল। আমাদের রসিক মাস্টারমশাই ধীরেনবাবুর মাথায় টাক ছিল। আমাদের রিসিভারী এস্টেট-এর দিলদরিয়া গোমস্তামশাই বরদাপ্রসন্ন মণ্ডল, যিনি আমাকে প্রায়ই লুকিয়ে লুকিয়ে রাজেন মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে বোঁদে কিনে দিতেন, তাঁর মাথাতেও টাক ছিল। টাক থাকলেই দেখেছি তাঁরা খুব আপনজন হয়ে যান আমার। টাক আমার কাছে প্রায়-নিশ্চিত বন্ধুত্বের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসে।

সায়েবের ইংরিজি কথাবার্তা সম্পর্কেও ভয় ছিল। কিন্তু প্রথম দিনেই বুঝলাম—সোডার বোতল খুলে দেবার মতো ইংরিজি শব্দ নয়, ভুজিওয়ালার

দোকানে ভুট্টার খই ভাজবার মতো চড়বড় আওয়াজও নেই। কী আশ্চর্য! হাওড়া বিবেকানন্দ ইস্কুলে পড়া ইংরিজি বিদ্যে নিয়ে আমি সায়েবের প্রায় সব কথাই বুঝতে পারছি—কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

দ্বিতীয় দিনেই সায়েব বললেন, "আমি তোমার লেফটেনান্ট বানানের গোপন গল্প শুনেছি। ভাবছি অক্সফোর্ড ডিক্সনারির এডিটরকে লিখে দেবো।"

আমি একটু লজ্জা পেলাম। কিন্তু সায়েব হাসলেন।

"রণক্ষেত্রে দশটা পিঁপড়ের জোর কিন্তু একজন লেফটেনান্ট কর্নেল থেকে বেশি হতে পারে!" সায়েব এবার গল্প শুরু করলেন প্রথম মহাযুদ্ধের এক সহকর্মী বীরের। প্রবল প্রতাপান্বিত হয়েও তিনি অনেক দিন যুদ্ধক্ষেত্রে ট্রেঞ্চের ভিতর লুকিয়ে ছিলেন। অবশেষে একদিন সকালে তিনি মরিয়া হয়ে পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে শত্রু-অধিকৃত অঞ্চল আক্রমণ করলেন। শত্রুপক্ষ হঠাৎ এই আক্রমণের জন্য তৈরি ছিল না—তারা আত্মসমর্পণ করলো। মহাসমারোহে এই বিজয়ী অফিসারকে নানা পদক দিয়ে সম্মানিত করা হলো।

মেডেল-টেডেল পরার পর তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আচমকা ঐ আক্রমণের অনুপ্রেরণা তাঁর মাথায় কেমন করে এলো?

বীর সৈনিক মাথা নিচু করে জানালেন, "সত্যি বলতে কী, গোটাকয়েক পিঁপড়ে কীভাবে ড্রেসের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। তাদের অসহ্য কামড়ে ট্রেঞ্চ থেকে বেরিয়ে আসা ছাড়া আমার গতি ছিল না। এমনি বেরিয়ে এলে তো শত্রুর গুলিতে সাক্ষাৎ মৃত্যু। তাই নিজেই গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে সামনে এগিয়ে গেলাম!"

সায়েবের চেম্বারে কয়েক মাস কাজের পর মনে হলো, আমি যেন আজন্ম এখানেই প্রতিপালিত হয়েছি! কর্মস্থলকে আনন্দময় করে তুলে ভাগ্যের দেবতা সেদিন ভাগ্যহীন এক কিশোরের দুঃখের বোঝাকে বোধহয় কিছুটা লাঘব করতে চেয়েছিলেন!

এমন অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হলো তা আমি নিজেও কখনও বিশ্লেষণ করে দেখি নি। যাঁরা আমাকে অতিমাত্রায় ভালবাসেন, তাঁরা বলেন, আমি নিজেও কিছু দিয়েছিলাম নিশ্চয়। যাকে ভাল লাগে আমি যে অবুঝের মতো তার কাছে অত্মসমর্পণ করি, আমার নিজত্ব যে সেখানে লোপ পায়, তা আমার অন্তরঙ্গদের অজানা নয়। কেউ কেউ বলেন, এই ইমোশনের দাসত্ব থেকে আজও নাকি আমার মুক্তি হয় নি, তাই কর্মকুরুক্ষেত্রের অগ্নিপরীক্ষায় আমি কখনও পরিপূর্ণ সাফল্যের জয়তিলক অর্জন করি নি। আমি কর্মজীবনে থেকেও বৃহত্তর দায়িত্ব বহনের যোগ্যতা অর্জন করি নি। আমার চিত্তবৃত্তির কোথাও

অন্তর্বেগ-দোষ থেকে গিয়েছে। যে-দোষে আমি কর্মক্ষেত্রে পরিবারকে প্রত্যাশা করেছি এবং পরিবারের মধ্যে সহকর্মীদের স্বপ্ন দেখে সর্বত্র ছন্দপতন ঘটিয়েছি। অকারণে জটিল হয়ে উঠেছে আমার জীবন।

বারওয়েল সায়েবের চেম্বার। সে আমার কাছে বহু মানুষের বিচিত্র তীর্থক্ষেত্র। এতো দুঃখী মানুষ যে এতো অদ্ভুত সমস্যা নিয়ে আইনজ্ঞের চেম্বারে উপস্থিত হতে পারেন তা আমার অজানা ছিল।

এইসব মানুষই যে আইনের শরণাপন্ন হতে শেষ পর্যন্ত আদালতে যেতেন এমন নয়। আমার অভিজ্ঞতা হলো যে যাঁরা মামলার ঝামেলা এড়িয়ে আদালত থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে চান, আইনজ্ঞের সময়োচিত উপদেশ তাঁদের পক্ষে আরও প্রয়োজনীয়।

সায়েব মাঝে-মাঝে রসিকতা করতেন, "ডাক্তাররাই একমাত্র পেশাদার যাঁরা সজ্ঞানে রোগের বিস্তার কমাবার গবেষণা করেন। রোগী কমিয়ে নিজেদের প্রফেশনের মূলে নিজেরাই কুঠারাঘাত করতে তাঁদের তুলনা নেই।"

কিন্তু বারওয়েল সায়েবের চেম্বারে আমার অভিজ্ঞতা হলো সৎ আইনজ্ঞরাও সেই একই দলে যোগ দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না। বহুকাল পরে মার্কিনদেশ ভ্রমণকালে একজন কৃতী আইনজীবীর কাছে নতুন একটি কথা শুনেছিলাম : প্রিভেনটিভ ল' —প্রিভেনটিভ মেডিসিনের মতোই মিষ্টি।

গল্প শোনার ব্যাপারে আমার অবশ্য অশেষ সৌভাগ্য। মক্কেলের কাহিনী শোনার হাতে খড়ি অবশ্যই আমার বারওয়েল সায়েবের চেম্বারে নয়। তার আগে আমাদের চৌধুরী বাগানের বাড়িতে বাবার বৈঠকখানায় কিছু কিছু মক্কেল আসতেন। আমার পড়বার জন্যে আলাদা ঘর ছিল না। তাই ঐ বৈঠকখানার এক কোণে আমি বসে থাকতাম। অঙ্ক, ব্যাকরণ এবং ইংরিজি কমপোজিশন থেকে অনেক ভাল লাগতো আগন্তুকদের সঙ্গে বাবার এবং মুহুরিমশায়ের আলোচনা।

আমি প্রাণভরে ওইসব আইনসংক্রান্ত আলোচনা শুনতাম, লেখাপড়া মাথায় উঠতো। বাবার বৈঠকখানায় দিনের পর দিন বসে বসে আমার ধারণা হয়েছিল, মানুষ শুধু সম্পত্তি রক্ষার জন্যেই নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করছে। এক আধ হাত জমি গোপনে অধিকার করে নেবার জন্যে সারা বিশ্ব গোপন চক্রান্তে নিয়োজিত রয়েছে। উকিলবাবুর কাজ, কাউকে হরণ করতে সাহায্য করা, আবার হরণে বাধা দেওয়ার জন্য কারও বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।

টেম্পল চেম্বারে যখন এসেছি তখন বয়স কিছুটা বেড়েছে। বিশ্বের আদালতে মানুষের যে বহু বিচিত্র অভিযোগ পেশ করবার রয়েছে তা বুঝবার

মতো দূরদৃষ্টি উন্মোচিত হতে লাগলো ধীরে-ধীরে আমার মধ্যে।

এইসব সুখে-দুঃখে ভরা নানা সমস্যাকণ্টকিত মানুষদের কিছু ছবি অনভিজ্ঞ মানুষের দৃষ্টিতে আমার প্রথম প্রচেষ্টা 'কত অজানারে'তে নিবেদন করেছি। তখন ভয় ছিল ভুলে যাবার। যাঁদের একদিন দেখে মুগ্ধ হয়েছি, দূর থেকে এসেও যাঁদের কাছে টেনে নিয়েছি তাঁদের ব্যক্তিগত দুঃখকে মূলধন করে সাহিত্যিক হয়ে উঠবার সামান্যতম পরিকল্পনাও তখন ছিল না। তখন একমাত্র চিন্তা, ভাগ্যের স্রোতে এই পরিবেশ থেকে আমাকে আবার সরে যেতে হবে, এঁদের আমি স্মৃতির মণিকোঠায় বহু যত্নে রক্ষা করে চলেছি, কিন্তু কতদিন?

আইনী কাহিনীর সঙ্গে-সঙ্গে সায়েব তাঁর যোদ্ধা জীবনের গল্পও বলতেন। যুদ্ধ মানেই তো যন্ত্রণা। আমি একদিন বোকার মতো বলে বসলাম, "মজার গল্প বলুন, যুদ্ধে মজা হয় না?"

টাকে হাত বুলোতে বুলোতে সায়েব ভাবতে লাগলেন। তারপর বললেন, "একবার হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) প্রচণ্ড লড়ায়ের পর একটা শত্রুশিবির দখল করে নিয়েছি আমরা। কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে একজন অর্ধশায়িত শত্রুসৈন্যকে গুলি করতে গেছি, এমন সময় হঠাৎ শুনলাম, সে ইংরিজিতে আমার নাম ধরে কাতরভাবে বলছে, 'প্লিজ আমাকে মারবেন না, আমি আহত, আমার হাতে কোনো অস্ত্র নেই।' বিদেশের এই রণাঙ্গনে শত্রুর মুখে নিজের নাম শুনে আমি চমকে উঠেছি। লোকটাকে না মেরে রাইফেল সরিয়ে নিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কে? আমার নাম জানলে কী করে?' লোকটি তখন উত্তর দিলো, 'আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি ফ্রেডরিক—লন্ডনে আপনার জার্মান নাপিত ছিলাম। আপনি তখন ব্যারিস্টারি পড়ছেন, প্রতি মাসে আমার কাছে চুল ছাঁটতে আসতেন।"

সায়েব বললেন, "এবার ফ্রেডরিককে সত্যিই চিনতে কষ্ট হলো না। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন আগেই বুদ্ধিমানের মতো সে নিজের দেশে ফিরে গিয়েছিল। তারপর কে জানতো এইভাবে রণাঙ্গনে ফ্রেডরিকের সঙ্গে আবার দেখা হবে!"

একটু থামলেন সায়েব। তারপর রসিকতা করলেন, "আমার খুব ইচ্ছে ছিল যুদ্ধ থেকে যাবার পর সব কিছু আবার স্বাভাবিক হলে ফ্রেডরিককে দিয়ে আর একবার চুল কাটাবো। ছোকরার হাতটি খুব ভাল ছিল। কিন্তু আমার সেই মনস্কামনা আর পূর্ণ হলো না।"

"কেন? যুদ্ধ শেষে ফ্রেডরিককে আর খুঁজে পেলেন না?" আমি জানতে চাই।

"চেষ্টা করলে নিশ্চয় তাকে খুঁজে বের করা যেতো। জার্মান দেশে ক'জন

আর নাপিত থাকতে পারে?”

“তাহলে?” ব্যাপারটা এবার আমার কাছে জটিল হয়ে উঠেছে।

“সে অনেক দুঃখের কথা। আমাকে ওসব জিজ্ঞেস করে মনের দুঃখ বাড়িয়ে দিও না, শংকর, প্লিজ!”

সায়েব যে কপট দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন—তা এবার আন্দাজ করতে পারছি!

“আমাকে দেখে কখনও দুঃখের কারণটা বুঝতে পারছো না?” এবার অভিযোগ করলেন সায়েব। তারপর ঐ চাপা দুঃখের কপট ভঙ্গিতে মাথায় হাত দিয়ে বললেন, “ফ্রেডরিকের সঙ্গে দেখা হয়ে কী লাভ হতো? আমাব মাথায় চুল কই? কাটবে কী?”

নিজের টাক নিয়ে এমন নির্মম রসিকতা আমার গোমড়া মুখেও হাসি ফুটিয়েছিল। মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বলেছিলেন, “ইন্ডিয়া ছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র টেকোরা দুঃখী। তাদের দুঃখের শেষ নেই এমন কথাও বলা চলে, কারণ একবার টাক পড়লে সে-মাথায় আর চুল গজায় না। টাক মানুষের এক গভীর পার্সোনাল ট্রাজেডি—অথচ ছোট ছেলেমেয়েরা তা বুঝতে চায় না। তারা নির্মম রসিকতা করে।”

আমি সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। তিনি মিটমিট করে হেসে বললেন, “এদেশে যখন প্রথম এসেছি তখনও আমার মাথায় কিছু চুল ছিল। কিন্তু নির্দ্বিধায় সেই সব কেশ বিসর্জন দিয়ে পরিপূর্ণ টাকের মালিক হয়েছি—কারণ এদেশে টাক একটা প্রিভিলেজ।”

“কেন?” আমি জিজ্ঞেস কবলাম।

বড়-বড় চোখ করে সায়েব বললেন, “আমি কিছু খবর রাখি না ভাবছো? বাঙালিদের ধারণা টাকা থাকলে টাক পড়ে। টেকোকে তাই সবাই সম্মান করে—তার ধার পেতেও অসুবিধে হয না। কারণ সবাই জানে টেকোর হাতে টাকা মার যাবে না। একেই তোমরা বলো, অয়েলিং এ অয়েলি হেড। অর্থাৎ তেলা মাথায় তেল দেওয়া!'

আজ বহুদিন পরে অনেক দূরে সরে গিয়ে বুঝতে পারি, আমার শুকনো মুখে হাসি ফোটাবার জন্যেই তিনি নানারকম মজার গল্প ফাঁদতেন।

স্মৃতি যতই মধুর হোক তা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ-কথা সায়েব নিজেই একবার আমাকে হাসতে-হাসতে বলেছিলেন।

“এই মনে হবে, সব তো মনের মধ্যে সাজানো রয়েছে, চিন্তা কী? তারপর একদিন হঠাৎ খোঁজ করতে গিয়ে দেখবে তারা নেই, কোথায় পালিয়েছে।”

স্মৃতি যাতে এমনভাবে আমাকে না ঠকাতে পারে সেই ভয়েই শুরু হয়েছিল আমার লিখে ফেলার প্রথম প্রচেষ্টা। কোনো উদ্দেশ্য নেই লেখার মধ্যে, লেখক হবার বাসনাতেও আমি তখনও ভারাক্রান্ত নই, আমি শুধু চেয়েছিলাম যাদের একদিন ভালবেসেছিলাম লেখার পাতায় তাদের চিরদিনের জন্যে ধরে রাখতে।

কিন্তু এই এতোদিন পরে অনুভব করেছি, সব কিছুই অনেক আগে নিঃসঙ্কোচে লিখে ফেলা উচিত ছিল। যা ভাল লেগেছে তা যেমন লিপিবদ্ধ হয়েছে, যা ভাল লাগে নি তার জন্যেও লেখায় স্থান করে দেওয়া উচিত ছিল।

আরও একটা কথা। সব কি লেখা যায়? সব কি লেখা উচিত? এ-প্রশ্নও আমাকে দীর্ঘদিন বিব্রত করে চলেছে। আমার পরম সৌভাগ্য, ওল্ড পোস্টাফিসের আদালতী কর্মক্ষেত্রে একদিন আমি যাঁদের ভালবাসতাম তাঁরাও এখন পাঠকের প্রিয়জন হয়ে উঠেছেন। ভালবাসাহীন এই বিশ্বমরুভূমিতে কোথাও সামান্য প্রীতির পরিচয় পেলেই তাঁরা সন্ধানীর কণ্ঠে জয়ের মালা পরিয়ে দেন, আমি অসীম ভাগ্যবান।

কিন্তু অনেক বছর পরে আজ মনে হয় সবটা তখনই বলা হলো না কেন? আমি কি ইচ্ছে করেই কিছু অংশ লিখলাম না? অথবা সব লিখতে নেই?

প্রিয় পাঠক, যখন একটু অবসর মিলবে তখন একটু সময় নিয়ে ভেবে দেখবেন, মানব-সম্পর্কের সব কথা কারও লেখা উচিত কিনা? লেখা যায় কিনা? উচিত-অনুচিত বড কঠিন নৈতিক প্রশ্ন। এর একটি মাত্র ব্যাখ্যা—যা তুমি গোপনে জেনেছো আইনজ্ঞের চেম্বারে, কোন অধিকারে তুমি তা সকলের কাছে প্রকাশ করবে? সেই প্রকাশ থেকে যদি কারও কোনো ক্ষতি হয়? সেইসব ক্ষেত্রে সহজ পথ, চরিত্রগুলির পরিচয় না দিয়েই ঘটনাগুলিকে ধরে রাখা। সাহিত্যের আসরে মানুষ সমস্যাকে জানতে চায়, নায়ক-নায়িকার প্রকৃত নামধাম সংগ্রহে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই রসিক পাঠকের।

তবু সব সমস্যার দুস্তর বাধা পেরিয়ে আসা গেলো না বোধ হয়। লেখক আর মানুষের মধ্যে সংঘাত আছেই।

আমার মধ্যে যে-বারওয়েল সায়েবের বাবুটি বসবাস করছে সে বলে, "ধন্য আমি, সায়েবের স্নেহাশীর্বাদে অভিজ্ঞতার অমৃত আনন্দ আস্বাদন করেছি, স্বর্ণময় সেই পাত্র থেকে আনন্দের কিছুটা অংশ তুলে দিয়েছি তোমাদের। এবার আমায় আপন মানুষদের নিয়ে একলা থাকতে দাও, আমাকে একলা ভাবতে দাও, প্লিজ, সেখানে অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ।"

আমার মধ্যে লেখক বলে, "নিজেকে নিঃস্ব করে ঢেলে দাও সাদা কাগজের

ওপর নীল কালিতে। মানব-সমাজের এই তো মহাশক্তি। মানুষ সমস্ত জীবনের আনন্দ-যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যা আহরণ করে তার সর্বস্ব দিয়ে যায় ভবিষ্যৎকে, তোমার সুখে সুখী হওয়ার জন্যে, তোমার দুঃখে দুঃখী হওয়ার জন্যে শুধু নয়, তোমার দুর্বলতা থেকে শিক্ষা পাবার জন্যে, মানুষ যে দোষে-গুণেই মানুষ তা বার-বার আবিষ্কারের জন্যে।"

এই লেখকই কাতর আবেদন জানায় ব্যারিস্টারের উদাসীবাবুর কাছে—"দয়া করে সব কিছু নিজের কাছে লুকিয়ে রেখো না। সব বল। কোনটা প্রয়োজনীয়, কোনটা অপ্রয়োজনীয় তা বিচারের গুরুতর দায়িত্বটা মহাশক্তিমান সময়ের ওপরেই ছেড়ে দাও।"

লেখক আরও বলে, "আমারও বয়স বাড়ছে, এই বিশ্বভুবনের নানা ঘটনা আমাকেও অভিজ্ঞ করে তুলছে—শোনো ব্যারিস্টারের বাবু, মানুষকে *দেবলোকের নির্বাসনে ঠেলে দিও না, তাকে রক্তমাংসের মানুষ থাকতে দাও।"*

ব্যারিস্টারের বাবু এবার মুখ তুলে তাকায়। বলে, "আমিও একদিন এক রসিক পণ্ডিতের সঙ্গে দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসবাস করেছি। মানব-ইতিহাসের নানা বিচিত্র ঘটনা সহজ করে সহাস্যে তিনি আমাকে শুনিয়েছেন। আমি জানি, মানুষ নিজেকে দেবত্বে তুলতে চেয়েছে কখনও-কখনও। তাতে কারও লাভ হয় নি। বরং ক্ষতি হয়েছে।"

ইতিহাসের মহাপরাক্রমশালী সম্রাট আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট, স্বয়ং এই চেষ্টা করেছিলেন,—সায়েবের মুখে শুনেছি।

তিনি চেয়েছিলেন, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হয়েছি অবিশ্বাস্য অল্প বয়সে, আমি নিশ্চয় রাজাধিরাজের থেকে উচ্চতর পর্যায়ে আসীন হয়েছি। "আমি মানুষ নই, দেবতা, তোমরা বলো।"

সায়েব বলেছিলেন "শক্তিমানরাও পরিস্থিতির চাপে এমনভাবে মহাশক্তিমানের ক্রীড়নক হয়ে ওঠেন যে কালের আসরে তাঁদের মুখ দেখানো মুশকিল হয়।"

আলেকজান্ডারের মহাশক্তিমান অনুরাগিবৃন্দ প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য অবশেষে তাঁকে দেবতা বলেই ঘোষণা করেছিলেন। সেই ঘোষণাপত্র সময়ের শাসন পেরিয়ে আজও আমাদের হাতে রয়েছে। সেই অনুরাগীবৃন্দ ইতিহাসের অগ্নিপরীক্ষায় একটুর জন্য চূড়ান্ত অবমাননা থেকে রক্ষা পেলেন। কারণ ঘোষণাপত্রের এক অংশে অতি সাবধানে তাঁরা লিখেছিলেন ঃ "যেহেতু আলেকজান্ডার সেইরকম চাইছেন, সেহেতু আমরা তাঁকে দেবতা বলে ঘোষণা

করলাম।"

দেখা যাচ্ছে, অনেকে চেয়েছেন মানুষ থেকে দেবতা হয়ে উঠতে। সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরকেও চাইতে হয়। শোনো লেখক, "আমি যাঁর কাছে কাজ করেছি তিনি কিছুই চান নি। কোনো প্রত্যাশা ছিল না তাঁর কমবয়সী বাবুর কাছে, তিনি কেবল চেয়েছিলেন একটি বিড়ম্বিত মলিন মুখে একটু হাসি দেখতে, একজন অপরিণত বয়স্ক বালকের দুঃখময় অস্তিত্বকে সহনীয় করে তুলতে।"

তিনি চান নি, আমিও চেষ্টা করি নি। বারওয়েল সায়েব তবু কোনো সময়ে সাধারণ পাঠকের হৃদয়ে সেই সাধের আসনটি লাভ করেছেন যা একমাত্র প্রিয়জনের জন্যে তোলা থাকে। প্রিয়জনরাও কিন্তু সর্বগুণান্বিত নন। তাঁদের শুধু সাফল্যই থাকে না—সমস্যাও থাকে, ব্যর্থতাও থাকে। আলো এবং আঁধারী দুই নিয়েই তো মানব-জীবন।

যৌবনের ঊষালগ্নে নতুন এক প্রাপ্তির মহা আনন্দে আমি তখন আলোকেরই প্রার্থী। অন্ধকার, সে তো অনেক দেখেছি এবং আরও দেখবো, রাশি রাশি কালো মেঘ সমস্ত কিছু অন্ধকারাচ্ছন্ন করার জন্যে ওই তো দূর-দিগন্তে অপেক্ষা করছে। ভালবাসার স্পর্শই আমাকে ধন্য করেছে, আমি এক আনন্দময় অস্তিত্বের ইঙ্গিত লাভ করেছি।

সায়েব বলেছিলেন, "ভালবাসাই সব। ভালবাসার এমনই শক্তি যে পর্বতও নড়ে ওঠে। ভালবাসা এমনই ঐশ্বর্য যে তা ভাগ করলেই দ্বিগুণ হয়ে যায়। দুঃখের এমনই দৈন্য যে তাকে ভাগ করে নিলে তখনই অর্ধেকেরও কম হয়ে যায়।"

ভালবাসা ভাগ করার দুর্লভ সৌভাগ্য আমিও লাভ করেছি। আমার আর কী প্রত্যাশা থাকতে পারে? এই অভিজ্ঞতার কিছু কথাই আমার প্রথম বই 'কত অজানারে'তে লিপিবদ্ধ করে আমি ভারমুক্ত হতে চেয়েছি। আমি আনন্দ পেয়েছি।

তবু আজ জীবনের অপরাহ্নবেলায় আমি সভয়ে আবিষ্কার করছি, কিছু কথা এখনও বলা হয় নি।

"বলা হয় নি তো কী হয়েছে?" আমার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ব্যারিস্টারের বাবুটি বলছে। আর একজন তর্ক করছে, "সে কি! সব না বললে মানুষকে পুরোপুরি বোঝা যাবে কী করে? তুমি তো শুধু বৃত্তান্তকার—তোমাকে তো শেষ বিচারের ভার দেওয়া হয় নি। তুমি তো কেবল একজন সাক্ষী।

তোমার কর্তব্য তোমার সমস্ত বক্তব্য নির্দ্বিধায় লিপিবদ্ধ করা।”

এরপরও আমি ভেবেছি! অন্তত একটি ঘটনা, যা আমাকে স্তম্ভিত করেছিল। বারওয়েল সায়েব একবার মাত্র আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিলেন, মিথ্যা কখনও চাপা থাকে না, মিথ্যার বিষ বড় ভয়াবহ। সেই মিথ্যা ভাষণের কথাও যথাসময়ে লিখে রাখবো। যাঁকে আমি সর্ব তুচ্ছতার উর্ধ্বে কল্পনা করে পূজার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করেছিলাম তিনিও মানবিক দুর্বলতার সম্পূর্ণ উর্ধ্বে ওঠেন নি। পৃথিবীর লোকরা একদিন অন্তত তা জানুক—আমার মৃত্যুর পরেই তা প্রকাশিত হবে।

সেইরকম ভাবনা-চিন্তা নিয়েই প্রস্তুত হচ্ছিলাম, মরণোত্তর প্রকাশিতব্য একটি স্মৃতিচিত্রের ভূমিকা রচনা করতে। কিন্তু আবার মনের মধ্যে নানা দ্বন্দ্ব।

প্রথম দ্বন্দ্ব ঃ এখন লিখবো। অথচ মরণের পর প্রকাশিত হবে কেন? রাজরোষ? অবশ্যই আইনের রক্তচক্ষু থেকে রক্ষা পাবার জন্যে যাঁরা এমন করে থাকেন তাঁদের সমাজ ক্ষমা করে। তুমি কোন রোষে ভীত হলে যে মরণের সুরক্ষা লাভে আগ্রহী?

না, কারও রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে যাবার জন্য আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠি নি। আমি তো তাঁকে এতোদিন এমনভাবে এঁকেছি যাতে তিনি আমার বন্ধু, আমার প্রিয়সখা হয়ে উঠেছেন। অনেক দুঃখ, অনেক যন্ত্রণায়, (হয়তো অনেক লজ্জায়) তিনি যদি আমার অপ্রিয় কিছু করে থাকেন, তাহলে সে-বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনোরকম আলোচনা না করার অধিকার অবশ্যই আমার আছে। যা আমাদের নিতান্ত ব্যক্তিগত তা কেন গোপন না থাকতে পারে? মনের দ্বন্দ্ব যেন বেড়েই চলেছে। আমার অধিকার হলো বলার অথবা না-বলার। কিন্তু এখন লিখে রাখবো অথচ প্রকাশিত হবে মৃত্যুর পর, এ-কেমন কথা?

কালের ঝুলি থেকে কিছু সময় ভিক্ষা করে নিয়ে লেখা প্রকাশ বিলম্বিত করে কী লাভ হবে? তাতে তুমি ছোট হবে, না তোমার প্রিয় সায়েব ছোট হবেন? আর ঐ যে বললে, শুধু আলো দিয়ে কাউকে আঁকা যায় না। সেই সঙ্গে আঁধারেরও প্রয়োজন।

মনে পড়ছে, সায়েবের কাছে যেসব অদ্ভুত নতুন শব্দ শুনেছিলাম তার মধ্যে একটি হলো 'হ্যাগিওগ্রাফি'! অটোবায়োগ্রাফি জানি, বায়োগ্রাফি জানি, কিন্তু তৃতীয় এই শব্দটি কী?

সায়েব বুঝিয়েছিলেন, “জীবনী লেখার নাম করে অনেক বইতে থাকে কেবল গুণকীর্তন। রক্তমাংসের মানুষকে দেবতা করবার জন্যে সারা বিশ্বে যুগযুগান্ত ধরে কি অবিরাম অথচ হাস্যকর প্রচেষ্টা চলেছে। তাই নির্ভরযোগ্য

জীবনবৃত্তান্তের মুখোশ পরে অসংখ্য 'হ্যাগিওগ্রাফি' রচিত হয়েছে—যা মানুষকে ঠকায়, সমাজকে বিভ্রান্ত করে। অতি আধুনিককালে তাই এই ধরনের জীবনীকারদের কদর কম। এখনকার জীবনীকাররা দেখেছেন, নানা দুর্বলতাও অনেক সময় একজন মানুষকে মহৎ করে তোলে। এখন জীবনীকারদের প্রচেষ্টা পরিপূর্ণ মানুষটাকে জানতে হবে। অহেতুক কৌতূহল থেকে এর উৎপত্তি নয়, মানুষকে সম্পূর্ণভাবে জানাটা মানবসমাজের অধিকার বলেই নতুন এই মনোবৃত্তির সমাদর। মানুষ নিজেই এখন ইতিহাসের ন্যায়-সিংহাসনে বসে বিচারকের দায়িত্ব পালন করতে আগ্রহী।

নতুন এই দর্শনকে অন্যায় বলা যায় না। তাছাড়া এখন না বলে পরে বলবো এই মনোবৃত্তির মধ্যে মানসিক অপরিণতির লক্ষণও রয়েছে বোধ হয়।

যা পরে বলা যায়, তা এখনও বলা যায়! আমার মা বলতেন, "লোককে নগদ দেবে, কখনও ঘোরাবে না।" তার দার্শনিক অর্থ বোধ হয়, যা দেবার তা এখনই দেবে সম্ভব হলে, পরে নয়। তুমি যখন এই পৃথিবীতে নেই তখন কিছু প্রকাশিত হতে দেবার মধ্যে কিছুটা ফাঁকি আছে। সময়ের হিসেব খাতায় যখন-তখন নেই, সবই শেষ পর্যন্ত জমাখরচে উঠবে, সুতরাং সাময়িক দ্বিধা কেন?

আমি বুঝছি, যা আমি এতোদিন ধরে বলি নি, যা আমার বলাব ইচ্ছে ছিল না, তা হয়তো এবারেই এই শেষ অধ্যায়ে বলতে হবে।

মানুষকে দেবতা বানাবার কোনো গোপন ষড়যন্ত্রে আমি লিপ্ত হই নি। আমি শুধু আলো-আঁধারীতে ভরা আমার জীবন-অধ্যায়ের কিছু উজ্জ্বল মুহূর্ত অন্য সকলের সঙ্গে ভাগ কবে নিতে আগ্রহী। কিন্তু দিনেব শেষে শেষ-খেয়ায় পাড়ি দেবাব আগে যা সম্পূর্ণ সত্য তা প্রকাশিত হওয়াই ভাল। অবিলম্বে আপনারা সকলেই সেই অনিন্দ্যসুন্দর মানুষটিকে—যিনি এক অসহায় বালকের মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে শত দুঃখের মধ্যেও ব্যস্ত হতেন—তাঁকে পূর্ণভাবে বিচার করবাব সুযোগ পাবেন। আর আমি? এই লেখা লিখতে-লিখতে আর একটু সময় ভিক্ষা করে নিতে চাই।

আসুন, টুকরো-টুকরো আনন্দের স্মৃতি, ঘটনার ঘনঘটা-মুক্ত কিছু স্মরণীয় মুহূর্ত, যা এখনও লিপিবদ্ধ হয় নি তা শেষ বারের মতো স্মরণ করি।

"দামী জিনিস, বাক্স থেকে বের করে মাঝে-মাঝে গুনে দেখতে হয়, না হলে হারিয়ে যায়। দামী কাপড় প্যাঁটরা থেকে বের করে রোদে দিতে হয়, না হলে নষ্ট হয়ে যায়", আমার মা বলতেন। কী যত্ন করে আমার বিধবা মা তাঁর বিবাহের বেনারসীটিকে ভাদ্রের রৌদ্রে তপ্ত করতেন তা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে।

এখন আমিও অতীতের মহামূল্যবান সম্পদগুলো স্মৃতির রৌদ্রে উষ্ণ করে নিই।

সেদিন ছিল ছুটির দিন। চেম্বারে না এসে সায়েবের সাময়িক বাসস্থান স্পেনসেস হোটেলে কাজকর্ম হচ্ছে। সায়েব এবং আমি ইতিমধ্যেই বেশ বন্ধু হয়ে উঠেছি।

এর আগে বেয়ারা দেওয়ান সিং একদিন আমায় জিজ্ঞেস করেছিল, "আমার সবচেয়ে গভীর দুঃখ কী?"

উত্তর দিতে একটুও দেরি হয় নি। আমার দুঃখ—হে ঈশ্বর, আমি গ্র্যাজুয়েট হতে পারলাম না। চিরকাল স্বল্পশিক্ষিত হয়ে থাকার গ্লানি আমাকে সহ্য করতে হবে।

এই রিপোর্ট যে সায়েবের কানে যাবে তা আন্দাজ করি নি। ছুটির দিনে সায়েব হঠাৎ বললেন, "শংকব, আমি প্রার্থনা কব্বি তুমি একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের সম্মান অর্জন করো। কিন্তু মনে রেখো, বিরাট এই বিশ্বভুবন ইস্কুল-কলেজের বাইরেই পড়ে রয়েছে। প্রকৃত জ্ঞানীরা বিরাট এই পৃথিবী থেকেই তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। সেই শিক্ষার শেষ নেই—মৃত্যুর দিন পর্যন্ত যিনি শিক্ষা নিতে পারেন তিনিই বিদ্বান।"

আমি চুপচাপ শুনে গেলাম। তাঁর কথার তাৎপর্য বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছিল।

ছুটির মেজাজে সেদিন নানা বিষয়ে আমাদের গল্প চলেছে। সায়েব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন "মনে করো গভীর বনের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে গেলো সেই ঈশ্বর, যিনি সবাইকে খুব ভালবাসেন, অথচ যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। ঈশ্বরের কাছে তোমাকে একটি মাত্র প্রশ্ন করার সুযোগ দেওয়া হলো তাকে কী প্রশ্ন করবে?"

এর আগে ইস্কুলে রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' কবিতাটি আবৃত্তি করে কয়েকটা বই পুরস্কার পেয়েছিলাম। "যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো!"

কিন্তু না। সে-প্রশ্ন তখন আমাকে মোটেই বিব্রত করছে না। যে-প্রশ্ন আমি করতে চাই, তা অতি সহজ। সংসারে কত জিনিস পেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পয়সা না থাকলে সেসব আমার নাগালের বাইরে। আমি বললাম, "প্রশ্ন করবো, বিশ্বসংসারে সব জিনিসের এতো দাম কেন? তোমার সৃষ্টিতে মূল্য ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না কেন? কেন তুমি এই দাম সৃষ্টি করেছো ঈশ্বর?"

সায়েব আমার কথা শুনলেন। একটু গম্ভীর হয়ে কী যেন ভাবলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "তুমি কী চাও?"

আমি একটু ভেবে নিয়ে বললাম, "একদিন স্বপ্ন দেখলাম আমি খুব বড়লোকের ছেলে হয়েছি। আমার আর কোনো চিন্তা নেই। আমার পকেটে বিরাট ব্যাংকের মোটা চেকবই আছে, আমি যখন খুশি যত খুশি টাকা তুলতে পারি।"

সায়েব আবার কী ভাবলেন। তারপর ছোট ছেলের মতো বললেন, "চলো, আমরা বেড়িয়ে আসি। বলা যায় না, এই ভোরবেলায়, গড়ের মাঠে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের দেখাও হয়ে যেতে পারে। এই ভোরবেলাটা হেভেনলি। স্বর্গীয়।"

এক হাতে বেড়াবার লাঠি এবং আরেক হাতে আমাকে ধরে পায়ে হেঁটে স্পেনসেস হোটেল থেকে বেবিয়ে পড়লেন তিনি। ডালহৌসি থেকে ট্রামে চড়ে আমরা গড়ের মাঠে এলাম। চোখের সামনে সবুজ ঘাসের নরম গালিচা আদিগন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। মৃদু হাওয়া বইছে এবং সেই হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো সামান্য কাঁপছে। আমরা দু'জন মনের আনন্দে গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে হেঁটে চলেছি।

সায়েব প্রস্তাব দিলেন, "শংকর, আমরা কি বাদামভাজা খাবো?"

আমি বললাম, "ইয়েস। হোয়াই নট?"

এই ভোরবেলাতেই একটা বাদামভাজাওয়ালা তার দোকান খুলে বসে আছে। দু'আনার বাদাম কিনে একটা আধুলিই বাদামওয়ালাকে দিয়ে দিলেন সায়েব। সে ভাবলো, লোকটা পাগল নাকি?

সায়েব আমাকে বললেন, "এর নাম চৌথ! আগেকার দিনে তোমাদের দেশের রাজারা চাষীর কাছ থেকে ফসলের চার আনা জোর করে আদায় করে নিতেন।"

বাদাম খেতে-খেতে আমরা এগোচ্ছি। সায়েব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি দামের কথা বলছিলে, তাই না?"

"হ্যাঁ, স্যর। জিনিসের বড্ড দাম। দাম ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। আর দাম ক্রমশ বেড়েই চলেছে।"

"ঠিক বলেছো।" সায়েব আমাকে প্রথমে উৎসাহ দিলেন। "এই আমার হোটেলের মাসিক চার্জ আগে যা ছিল এখন তার ডবল হয়ে গিয়েছে।"

সায়েব কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, "আমাদের এই পৃথিবীতে

সব জিনিসের এখনও কিন্তু দাম ধরা হয় নি। কথাটা তোমাকে খুব চুপি-চুপি কানে-কানে বলে রাখছি। খবরদার, আর কাউকে বোলো না—এখনই তারা ঐসব জিনিসের দাম ধরবার জন্যে ছুটে আসবে।"

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। তিনি মজা করে গলা নামিয়ে আমাকে বললেন, "এই দুর্মূল্যের বাজারেও পৃথিবীর সমস্ত সেরা জিনিস বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে।"

আমি যেন ক্রমশ অন্য এক অভিজ্ঞতার স্বপ্নরাজ্যে চলে যাচ্ছি। সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "সব চেয়ে দামী কী জিনিস তুমি দেখেছো?"

"সোনা।" এ উত্তর দিতে আমার এক মুহূর্তও লাগলো না।

সায়েব হঠাৎ পূর্ব আকাশের দিকে ছড়িটা বাড়িয়ে দিলেন। "শংকর, ওই দেখো।"

আমি দেখলাম, দুটো গাছের মধ্য দিয়ে সোনালী সূর্যের আলো সবুজ ঘাসের ওপর গ্যালন-গ্যালন তরল সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পরম বিস্ময়ে সায়েব ওই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। বললেন, "এই সোনার এখনও কোনো দাম ধরা হয় নি। বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে বলে এই সোনায় আমরা স্নান করি না। এই সোনা মনের মধ্যেও আমরা জমা করে রাখি না।"

সায়েবের কথাতেই সেদিন হঠাৎ আমি আবিষ্কার করেছিলাম, রোদ বৃষ্টি ঝড় হাওয়া, মেঘ, আকাশের চলচ্চিত্র, প্রকৃতির রত্নসম্ভারের জন্য আমাদের কোন খরচ করতে হয় না। অতি দরিদ্র আমিও এইসব উপহার বিনামূল্যে উপভোগ করে অপার আনন্দ অনুভব করতে পারি।

সায়েব বলেছিলেন, "আরও অনেক মহামূল্যবান জিনিস এখনও বিনামূল্যেই আমরা পেয়ে থাকি, শংকর। মায়ের স্নেহ, ভায়ের ভালবাসা, বোনের ভালবাসা, স্ত্রীর ভালবাসা, সন্তানের ভালবাসা, মানুষের ভালবাসা—এসবের এখনও কোনো দাম ধরা হয় নি ঈশ্বরের এই রাজত্বে। এবং আশ্চর্য জিনিস এই ভালবাসা—যত দেবে তত বেড়ে যাবে, ঘটি থেকে যতই ঢালো কিছুতেই ফুরোবে না। তোমাদের মধুসূদনদাদার সেই অক্ষয় ভাঁড়ের গল্প আমি শুনেছি। মোটেই বানানো গল্প নয় ওটা।"

হাঁটা বন্ধ করে, এবার আমরা ট্যাক্সি চড়ে বসেছি। কোথায় চলেছি, আমি জানি না। গাড়িটা রেসকোর্সকে উত্তরে রেখে দক্ষিণ দিকে মোড় নিলো। এর আগে একবার সায়েবের সঙ্গে চিড়িয়াখানাও ঘুরে এসেছি আমি।

সায়েব বললেন, "তুমি বিরাট ধনীর দুলাল হতে চাইছিলে। রকফেলার

কিংবা ফোর্ড পরিবারের কেউ—যার মুঠোর মধ্যে থাকবে দুর্লভ রত্নভাণ্ডার। এখনও তোমার আমার জন্যে এমন রত্নভাণ্ডার সম্পূর্ণ খোলা আছে। তোমারই মতো আমিও একদিন প্রার্থনা করেছিলাম ঈশ্বরের কাছে খুব ছোটবেলায়। আমার বাবাও তো সামান্য লোক ছিলেন, বিশেষ অর্থবল ছিল না তাঁর।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস না-করে থাকতে পারলাম না।

সায়েব বললেন, "ঈশ্বর তাঁর দূতকে আমার সঙ্গে স্বপ্নে দেখা করতে পাঠালেন। বললেন, "টাকাকড়ি তো অতি সামান্য কথা। তার থেকেও অনেক মহামূল্যবান সম্পদ তো ঈশ্বর অন্য ব্যাংকে রেখে দিয়েছেন—তুমি ইচ্ছে করলেই তো চেক কাটতে পারো। কোনো পয়সা লাগবে না, সেই সম্পদে তোমাদের সকলের সমান অধিকার।"

সায়েব বললেন, "হঠাৎ আমি লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিটা চোখের সামনে দেখতে পেলাম। ঈশ্বরের দূত ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছেন। কিন্তু আমার মনে হলো, কী আশ্চর্য! সত্যিই তো ব্যাংকের ভল্টে কতটুকু সম্পদ থাকতে পারে? তার থেকে লক্ষ-লক্ষ গুণ মূল্যবান জ্ঞানের সম্পদ তো যুগযুগান্ত ধরে মানুষ তিলে-তিলে সঞ্চয় করে লাইব্রেরিতে সাজিয়ে রেখেছে। এই জ্ঞানের জন্য কত লোকের কত কষ্ট হয়েছে, কত নিগ্রহ সহ্য করতে হয়েছে—কেউ পান করেছেন হেমলক বিষ, কেউ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, কেউ জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সঞ্চিত জ্ঞানের সম্পদ তো আমার জন্যেই পড়ে রয়েছে। আমি চাইলেই লাইব্রেরির র‍্যাক থেকে উঠিয়ে আমার সামনে সেই সব রত্নকে হাজির করা হবে, তার জন্যে কোনো অর্থ লাগবে না।"

দূরে আলিপুরের ব্রীজ পেরিয়ে ততক্ষণে বড়লাটের বেলভেডিয়র ভবন দেখা যাচ্ছে। সায়েব বললেন, "আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি এখানেই উঠে এসেছে। সময় পেলে ঘুরে যেও। তোমার ভাল লাগবে।"

কতদিন আগেকার কথা। কিন্তু আজও জাতীয় গ্রন্থাগারের গেট পেরিয়ে একলা হাঁটতে আরম্ভ করলে অনেক দিন আগে ট্যাক্সি থেকে দেখা সেই ভোরবেলাটার কথা মনে পড়ে যায়। মনে হয়, সত্যিই আমি কোনো রকফেলার, ফোর্ড, টাটা অথবা বিড়লার ভাগ্যবান বংশধর। আমার পকেটেও লাইব্রেরির চেকবই আছে। যুগ-যুগান্তের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার আমার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছে, আমি স্লিপে সই করলেই তারা আমার কাছে চলে আসবে।

ট্যাক্সিগাড়ি সেদিন ভোরে আবার মোড় নিয়েছিল। সায়েব ততক্ষণে আবার হাল্কা মেজাজে গুনগুন গান শুরু করেছেন।

নতুন এক অভিজ্ঞতার উষ্ণকিরণে আমি তখন অভিভূত। সায়েব কিন্তু আমার গাম্ভীর্য মোটেই বরদাস্ত করলেন না। তিনি বললেন, "আমার খুব খিদে লাগছে। স্পেনসেসে ফিরে গিয়ে দু'জনে স্পেশাল ব্রেকফাস্ট না খাওয়া পর্যন্ত আমি আর একটি কথাও বলবো না—খোদ ঈশ্বরের সঙ্গে যদি ভবানীপুর কবরখানার সামনে হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, তা হলেও না!"

উকিলদের গল্প

বারওয়েল সায়েব এক-একদিন এক-এক রকম কথায় আমাকে অভিভূত করে রাখতেন।

স্বাধীনতা এসেছে। তবু কলকাতার উকিল ও ব্যারিস্টারের মধ্যে তখনও অনেক মানসিক এবং সামাজিক পার্থক্য। যিনি বিলেতে না গিয়ে আইনজ্ঞ তিনি উকিল, ইংরিজি উচ্চারণে 'ভাকিল'! স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক উকিল অংশ গ্রহণ করতেন বলে, বিদেশীরা ব্যঙ্গ করতেন স্বাধীনতার পরে এদেশে ভাকিলরাজ আসতে বাধ্য। বিলেতের কোনো 'ইন' থেকে যাঁরা আইন পাস করেছেন তাঁরা ব্যারিস্টার। যতদূর মনে আছে, সায়েব বলতেন, ব্যারিস্টারিতে ফেল করা খুব কঠিন কাজ! কারণ ব্যারিস্টারিতে লিখিত পরীক্ষার কোনো ভূমিকা নেই, ক'দিন ইনে উপস্থিত থাকা হয়েছে এবং ক'দিন ভোজন হয়েছে সেইটাই নাকি প্রধান বিচার্য বিষয়।

সায়েব মজা করতেন, "তোমাদের এখানেই শুনি, লোকে বলে মিস্টার অমুক ব্যারিস্টারি 'পাস' করেছেন! আমরা ইংরিজিতে অনেক হুঁশিয়ার, কখনও পাস ফেলের কথা তুলি না, সোজা বলি 'কল্ড্ টু দ্য বার' অর্থাৎ তাঁকে যেন ডাকা হয়েছে মহৎ এক বৃত্তিতে অংশ নেবার জন্যে!"

তারপর সায়েব রসিকতা করতেন ব্যারিস্টারের কালো গাউন নিয়ে। বলতেন, "যে ক'টি 'মহান' (নোবেল প্রফেশন) সামাজিক বৃত্তি আছে তার মধ্যে ব্যারিস্টারি একটি, তাই গাউন পরতে হয়। দেখবে, ব্যারিস্টারির কালো গাউনের পিছনে এখনও ছোট্ট একটা ঝুলি আছে। বোধহয় মহান বৃত্তিতে পয়সা চাওয়া বারণ ছিল, যার যা সাধ্য তা ঐ ঝুলিতে ফেলে দিতে পারতো। তাই ইংরেজ ব্যারিস্টার তাঁরা পাওনা ফি-এর জন্যে মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন

না। এদিকে ডাক্তাররা ভাগ্যবান—তাঁর পাওনা বিলের জন্যে রোগীকে আদালতে টানতে পারেন!"

সায়েব প্রায়ই বলতেন, "বিলেতে ট্রেনিং-এর ওপর অবশ্যই সবটা নির্ভর করে না! বড়-বড় ব্যারিস্টারদের "লজ্জা দেবার মতো কত প্রতিভাধর উকিলের কথা শুনেছি আমি। হাইকোর্টে তাঁদের কয়েকজনকে দেখেছি, আবার জেলা আদালতেও তাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।"

যে সব নাম উঠতো তাঁদের মধ্যে মতিলাল নেহরু আছেন। তিনি যে ব্যারিস্টার ছিলেন না তা আমার জানবার কথা নয়। যেমন রাসবিহারী ঘোষ, আইনের একজন কিংবদন্তি পুরুষ, কিন্তু ব্যারিস্টার নন। যেমন সায়েবেব বিশেষ পবিচিত এবং বহু বিখ্যাত মামলার বিজয়ী নায়ক কৈলাশনাথ কাটজু। যেমন সায়েবের সমসাময়িক আইনজ্ঞ অতুল গুপ্ত।

আর একজন অ-ব্যরিস্টারের কথা বলতে সায়েব ভীষণ গর্ব বোধ করতেন। সায়েব যখন আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তখন তিনিই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি—ফণিভূষণ চক্রবর্তী।

আইনের পত্রিকা ক্যালকাটা উইকলি নোটসে কয়েকটি অসাধারণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পড়ে সায়েব যখন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, উকিল ফণিভূষণ তখনও প্রায় অপরিচিত। লেখাগুলো ছদ্মনামে বেরিয়েছিল এবং সায়েব নিজেই চেষ্টা করে তাঁকে খুঁজে বের করেছিলেন, যোগ্য সম্মান জানিয়েছিলেন এবং যথাসময়ে সে-সময়কার ইংরেজ প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি এই অসাধারণ মানুষটির প্রতি আকর্ষণ করেছিলেন।

বিচারকের আসনে বসবার পরেও এই শ্রদ্ধাসম্পর্কের শেষ হয় নি। মাঝে-মাঝে পত্রালাপ হতো দু'জনে। যতদূর মনে আছে, মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও তিনি যে দু'জনকে পত্রাঘাত করেছিলেন তার মধ্যে ফণিভূষণও ছিলেন। এই চিঠির উল্লেখ হয়েছিল হাইকোর্টের সায়েবের শোকসভায়। আদালতের আইনজ্ঞ এবং বিচারপতিদের সমবেত সভায় প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ বলেছিলেন : "তাঁর সাম্প্রতিক এক চিঠিতে মিস্টার বারওয়েল রসিকতা করে তাঁর ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের কথা উল্লেখ করেছিলেন ; মৃত্যু এসে সেই 'ওয়েওয়ার্ড' লাইফের সমস্ত সংঘাত ও যন্ত্রণা মুছে দিলো, আসুন আমরা সকলে মিলে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করি।" প্রধান বিচারপতি শোকস্তব্ধ সকলকে মুগ্ধ করে তাঁর নিবেদন পেশ করেছিলেন।

এই 'ছন্নছাড়া ভবঘুরে' জীবনের উল্লেখ কী রসিকতা মাত্র? না, তার থেকেও

বেশী কিছু ছিল? সেকথা যথা সময়ে এই বইতেই আলোচনা করতে হবে। এখন বরং আইনজ্ঞদের নিয়ে একটু পরচর্চা করা যাক।

আইনজ্ঞদের নিয়ে কত রকমের গল্পই যে সায়েবের জানা ছিল, সেগুলি ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে এমন সুন্দরভাবে তিনি বলতেন যে নিতান্ত গোমড়ামুখেও হাসি ফুটতে বাধ্য।

একবার এক বিখ্যাত ব্যারিস্টার আপিল কোর্টে তাঁর মামলার প্রতিটি খুঁটিনাটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে এমন বিস্তারিতভাবে পেশ করে চলেছেন যে আপিল কোর্টের দুই মাননীয় বিচারপতি অধৈর্য হয়ে উঠলেন। অথচ বিখ্যাত ব্যারিস্টার—জজরা কিছুতেই নিজেদের অধৈর্যভাব প্রকাশ করতে পারছেন না। শেষে একজন বিচারপতি বললেন, মিস্টার অমুক, বিচারকদের কিছুটা কমনসেন্স আছে, এটা কি আপনি ধরে নিতে পারেন না?" বিখ্যাত ব্যারিস্টার সঙ্গে-সঙ্গে বিনয়ে বিগলিত হয়ে উত্তর দিলেন, "আমি অসহায় মি লর্ড! এই ভুলই তো করেছিলাম নিম্ন আদালতে!"

আর একজন দুষ্ট আইনজ্ঞের কথা সায়েব খুব মজা করে বলতেন। লন্ডনের বিখ্যাত চিকিৎসাপল্লী হার্লে স্ট্রীটের একজন বিখ্যাত ডাক্তার আর একজন হার্লে স্ট্রীটের বিশেষজ্ঞের পিছনে লাগতে চান! সহজ কোন পথ খুঁজে না পেয়ে সেই বিশেষজ্ঞ গোপনে পরামর্শ নিলেন। দুষ্ট আইনজ্ঞ সব শুনে এক গাল হেসে পরামর্শ দিলেন, "খুবই সহজ কাজ। কয়েকেটি হাঁস এনে প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তারের চেম্বারের কাছাকাছি রেখে দিন।"

তারপব ভীষণ কাণ্ড! কয়েকদিনের মধ্যে সেই ডাক্তারের চেম্বার খালি হয়ে গেলো! কারণ যে লোকই সেখানে আসে সে আওয়াজ শোনে—"কোয়াক! কোয়াক!" অর্থাৎ হাতুড়ে, হাতুড়ে! শেষ পর্যন্ত নাকি মানহানির মামলাও হয়েছিল! মাননীয় বিচারপতির বিচার্য বিষয় : হাঁস দিয়েও যদি 'কোয়াক কোয়াক' বলানো হয় সেটা ডাক্তারের পক্ষে মানহানিজনক কিনা!

আমি বললাম, "দুষ্ট মোক্তার নিয়েও নানা গল্প মফস্বল আদালতে ছড়ানো আছে।"

সায়েব মজা করে বললেন, "আইনজ্ঞরা বেশ রসিক। নিজেদের সম্বন্ধে যত মজার গল্প তাঁরা ছড়িয়েছেন তা অন্য কোনো প্রফেশনে পাবে না, একমাত্র ডাক্তার ছাড়া। যেমন ধরো, আমাদের দেশে বলা হয়—ডাক্তার ভাগ্যবান। তাঁদের প্রতিটি ব্যর্থতা কবরে চাপা পড়ে যায়, কিন্তু ডাক্তারের সাফল্য সর্বত্র

ঘুরে বেড়ায়।

"শক রাজপুত্র অ্যানাকারসিস খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বছর আগেই আইন সম্বন্ধে অতি অপ্রিয় একটি মন্তব্য করেছিলেন। পৃথিবীর সাতজন প্রাজ্ঞ মানুষের মধ্যে একজন বলে এই রাজপুত্রকে এখনও অনেকে শ্রদ্ধা করেন। বিজ্ঞ অ্যানাকারসিস নানা দেশ ভ্রমণ করে অবশেষে মন্তব্য করেছিলেন : "লিখিত আইন হচ্ছে মাকড়সার জালের মতো—দুর্বল ও দরিদ্রকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরতে তার তুলনা নেই ; কিন্তু শক্তিমান ধনীদের পক্ষে এই জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসাটা কিছুই নয়।"

সায়েব এরপর দুষ্টু হেসেছিলেন এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন, "রাজকুমার অ্যানাকারসিসের এরপর কী হয়েছিল বলো তো?"

আমি মাথা চুলকে আন্দাজ করলাম, "জ্ঞানী হিসেবে আরও সম্মান বেড়েছিল।"

"পারলে না!" সায়েব মজা করলেন, "সাইথিয়ানদের হাতেই তাঁর বেঘোরে মৃত্যু হয়েছিল!"

"না, খুন-জখম দিয়ে গল্প শেষ করবো না", সায়েব এবার আশ্বাস দিয়েছিলেন। "একবার কম বয়সে স্পেনে বেড়াতে গিয়েছিলাম।সেখানে লোকশ্রুতি—যে-দেশে মানুষ যত বোকা এবং একগুঁয়ে হবে সে-দেশে বড়লোক উকিলের সংখ্যা তত বাড়বে!"

"শুধু স্প্যানিশদের নামে বদনাম ছড়িয়ে লাভ কী? একজন দুর্মুখ স্কটসম্যানের কথাই ধরা যাক। প্রখর বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে ইনি পরে ব্যারন হয়েছিলেন—হেনরি পিটার ব্রুহাম। বিখ্যাত পিটার ব্রুহাম ঘোড়ারগাড়ির (চারচাকা এবং এক ঘোড়া) প্রথম নকশা ইনিই ডিজাইন করেছিলেন। বহুদর্শী এই ব্রুহাম বলেছিলেন, "প্রতিপক্ষের হাত থেকে আপনার সম্পত্তি উদ্ধার করে যিনি নিজেই সেই সম্পত্তি ভোগ করেন সেই ভদ্রলোকের নাম উকিল।"

"ঘোড়ারগাড়ির ডিজাইনারের পক্ষেই এরকম রসিকতা করা সম্ভব!" আমার এই মন্তব্য শুনে সায়েব বললেন, "ওহো, তোমাকে বলাই হয় নি, হেনরি পিটার ব্রুহাম নিজে মস্তবড় আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন। সম্রাট চতুর্থ জর্জের রানী ক্যারোলিন পর্যন্ত তাঁকে ব্রীফ দিয়েছিলেন!"

এবার অস্কার ওয়াইলডের কথা এসে গেলো। সায়েবের প্রিয় লেখক। এঁর কত মন্তব্যই যে সায়েবের কণ্ঠস্থ ছিল ভাবলে অবাক হতে হয়! "অস্কার ওয়াইল্ড কী বলেছেন শোনো : পৃথিবীতে খারাপ লোক না থাকলে ভাল

উকিলও থাকতো না!"

এসব অবশ্যই রসিকতা! কারণ আইনজ্ঞেরা ত্যাগ ও সেবার কোন মহৎ লোকে উঠতে পারেন তার নিদর্শন প্রায় সব দেশের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। খারাপ মানুষদের দিয়ে কখনও কোনো ভাল পেশার বিচার হয় না দোষে-গুণে ভরা এই পৃথিবীতে।

আরও অনেক আইনজ্ঞের কথা উঠলো। সায়েব বললেন, "আমার স্ত্রীর সঙ্গে যখন দেখা হবে তখন তাকে জিজ্ঞেস কোরো। আমারই একজন জুনিয়ার উকিল একবার কী ভাবে ম্যারিয়নকে ভীষণ আঘাত দিয়েছিলেন। তখনও বোধ হয় তোমার জন্ম হয় নি, আমি বহু বছর আগেকার কথা বলছি। এই গল্প তোমাকে বলবো একদিন।"

প্রচণ্ড বই পড়ার নেশা ছিল সায়েবের। আইনের অজস্র বই, আইন ছাড়াও কত বিভিন্ন বিষয়ের রচনা যে সায়েব রাত জেগে পড়তেন তা ভাবলে আমি আজও অবাক হয়ে যাই।

স্নাতক পর্যায়ের লেখাপড়া করার সৌভাগ্য থেকে আমি তখন বঞ্চিত। সায়েব কিন্তু আমার মধ্যেও পড়ার নেশা ঢুকিয়ে দিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যে-বই ইচ্ছে সে-বই পড়বে। যেখানে সম্ভব সেখানে আদি বইটা পড়বে, মহা-মহা পণ্ডিতদের টীকাটিপ্পনীতে ভয় পেয়ে পথভ্রষ্ট না হওয়াই ভাল!"

এতোদিন পর্যন্ত ইংরিজি বইয়ের সঙ্গে সব সময় আমি সময় আমি মানে-বইয়ের সাহায্য প্রত্যাশা করে এসেছি। অর্থপুস্তকের দাসত্ব কাটিয়ে নিজেই মানে বোঝবার অ্যাডভেঞ্চারে নামবার উৎসাহ তিনি আমাকে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন কাব্য, উপন্যাস, নাটকের সঙ্গে আমি একের পর এক পরিচিত হচ্ছি। নতুন এক অনুভূতির আলোকে পঠনের অভূতপূর্ব আনন্দ আমি উপভোগ করছি। সায়েব বলতেন, "মনে রাখবে, কলেজের মাস্টারমশাইদের কথা স্মরণে রেখে শেলী, কীটস, সেক্সপীয়র কেউ সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। তাঁরা চিরদিন তোমার আমার মতো স্বাধীন পাঠকের সান্নিধ্য কামনা করেছেন।"

অনেকেই গোগ্রাসে পড়েন, কিন্তু তারপর সেগুলো তাঁদের দেহের অথবা মনের কোথায় হারিয়ে যায় তা খুঁজে পাওয়া যায় না। পাঠের আনন্দটা তাঁরা একান্তভাবেই নিজেদের মধ্যে রেখে দেন। সায়েব ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি মজার কিছু পাঠ করলে সে-আনন্দ অবশ্যই ভাগ করে নিতেন—সে আমার সঙ্গেই হোক অথবা বেয়ারা দেওয়ান সিং-এর সঙ্গেই হোক! অনেক ইংরিজি বই সম্পর্কে তিনি প্রাণ খুলে দেওয়ানের সঙ্গে আলোচনা করছেন দেখে আমি

নিজেও বিস্মিত হয়েছি।

তখন আমার মাথায় ঢোকে নি, কিন্তু এখন প্রায়ই মনে হয় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিশীল সাহিত্যের একটা অত্যন্ত সহজ সরল দিক আছে। এদেশের সাধারণ মানুষকে অস্পৃশ্যের মতো জ্ঞানের অমৃতকুম্ভ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার যে ধারা ভারতবর্ষে প্রকট হয়ে উঠেছে তা জনগণের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয়। সায়েবের এই বিশ্বাসের মূলে ছিল—ভারতবর্ষের প্রাচীনতা এবং এদেশীয় সভ্যতার ধারাবাহিকতা। তিনি বলতেন, "অক্ষর জানলেও মানুষ যে কত বর্বর থাকতে পারে তা যদি দেখতে চাও তাহলে কিছুদিন ইউরোপ ঘুরে এসো। আর নিরক্ষর হলেই যে মানুষ অশিক্ষিত হয় না তা এদেশে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সময় সর্বদা মনে রাখবে।"

কঠিন জিনিসকে অত্যন্ত সহজ করে বলবার দুর্লভ শক্তি ছিল এই মানুষটির। আর সহজ সত্যের সঙ্গে তিনি মিশিয়ে দিতেন অনাবিল মাধুর্যের রস। শত দুঃখের মধ্যেও এই হিউমার-বোধই মানুষটিকে চলমান রেখেছিল এবং তাঁকে একেবারে ভেঙে পড়তে দেয় নি।

নানা দুঃখ যখন চারদিক থেকে আমাদের জড়িয়ে ফেলতে চাইছে, যখন নিরাশ হবার সময়, সায়েব তখনও দুঃখকে প্রশ্রয় দিতে রাজী হতেন না। বলে উঠতেন, "সংসারে কত বিপদ ঘটবার আশঙ্কা আছে তার আলোচনা বন্ধ থাক। আমি এখন একটু হৈ-চৈ করতে চাই।"

সব দুশ্চিন্তা হাসিমুখে সরিয়ে ফেলে সায়েব এবার বললেন, "তুমি আর্থার মারফির নাম শুনেছো? মারফি কোথায় যেত বলেছিলেন, ইংরেজ জাতের সুখের সীমা থাকে না যখন তারা শোনে যে ইংরেজ ধ্বংস হতে চলেছে।"

সেদিন চেম্বারে তেমন কাজ ছিল না। কোনো বিচারকের মৃত্যুর জন্যে আদালত বন্ধ।

সায়েব ঠিক করলেন, চেম্বার থেকে তাঁর সাময়িক আবাস স্পেনসেস হোটেলে ফিরে যাবেন। কী কারণে আমি বোধ হয় একটু গম্ভীর হয়ে ছিলাম, সায়েব তা লক্ষ্য করেছেন। আমাকেও তিনি হোটেলে নিয়ে গেলেন। বললেন, "অনেক পড়াশোনা হয়েছে, আর নয়! আজ আমি কিছুতেই আরও পণ্ডিত হবার সাধনা করছি না।"

আমি ভাবলাম, কী হলো?

সায়েব মৃদু হেসে বললেন, "এখন থেকে যতটুকু বাড়তি সময় পাবো, সবটুকু সহজ জ্ঞানের সন্ধানে লাগাবো। গতকাল রাত্রে আমি শিকাগো থেকে

প্রকাশিত একখানা বইপড়ে ফেলেছি! এই বই আমার চোখ খুলে দিয়েছে। ছোট-ছোট ইংরিজি কবিতায় সমাজের গভীর সত্যগুলো সেখানে চমৎকারভাবে বলা হয়েছে।"

এরপর সায়েব আবৃত্তি করলেন ঃ

"জ্ঞানের থেকে পাণ্ডিত্য অনেক নিকৃষ্ট
সুতরাং বুদ্ধিমানরা জ্ঞানবান হবার চেষ্টা করেন।"

জ্ঞানার্জনের সার সত্যটি সায়েব যেন এতো দিনে জানতে পেরেছেন। তিনি বললেন, "অতি মূল্যবান কথা, আগে জানলে কেমব্রিজের কিছু দর্পিত অথচ নির্বোধ পণ্ডিতকে শুনিয়ে আনন্দ পাওয়া যেতো!"

এবার হেঁয়ালির কায়দায় সায়েব জিজ্ঞেস করলেন, "বুড়ো বয়সেও কোন জিনিসের তেজ কমে না বলো তো?"

আমি অনেকক্ষণ চেষ্টা করেও উত্তর দিতে পারলাম না। তখন সায়েব উত্তর দিলেন ঃ

"বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে চুল পাকে,
দাঁত নড়ে, চোখ ও কান দুর্বল হয়।
কিন্তু বার্ধক্যের গতি যতই দ্রুত হোক
যা চির নবীন থাকে তার নাম—লোভ।"

"আরও একটা মূল্যবান মানিক সংগ্রহ করেছি", একটু থেকে সায়েব জানালেন। "পার্থিব জ্ঞানের চূড়ান্ত বলতে পারো ঃ

যা অতীত, যা মৃত, যা হারিয়ে গিয়েছে
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনও তার জন্য অনুশোচনা করেন না,
জ্ঞানী এবং মূর্খের মধ্যে
মাত্র এইটিই পার্থক্য।"

ইংরিজিতে ছোট-ছোট এই সব কবিতা শুনিয়ে সায়েব খুব আনন্দ পাচ্ছেন। এবার মজা করে তিনি বললেন, "কেন যে এমন মহামূল্যবান বই কম বয়সে পড়ি নি! তাহলে এতোদিন আমাকে মূর্খ থাকতে হতো না!"

আমি কোনো মন্তব্য না করে শুনে যাচ্ছি। সায়েব বললেন, "আরও একটা কথা শোনো। এইটাই এখন থেকে তোমার এবং আমার জীবনের নতুন পলিসি ঃ

যতক্ষণ না সে কাছে আসছে
অবশ্যই ভয়াবহকে ভয় পাবে,
কিন্তু বিপদের মুখোমুখি যখন হতেই হবে

তখন ভয়কে ভুলে সমানে আঘাত করো।"

সায়েব মজা করে বললেন, "মাত্র একদিনে আমি একশ বছরের জ্ঞান অহরণ করেছি। আর একটি মূল্যবান জিজ্ঞাসা—নবনিযুক্ত ভৃত্যের কাজে উৎসাহে, অতিথির প্রশংসায় রমণীর চোখের জলে এবং দুষ্ট লোকের বক্তৃতায় ঠকে নি এমন লোক কি পৃথিবীতে আছে?"

কথাগুলো শুনে আমি বেশ মজা পাচ্ছি। সায়েব বললেন, "শংকর, তুমি আমাকে একটা ছোট নোট বই কিনে দিও। কিছু মূল্যবান জ্ঞান আমি এবার থেকে লিখে রাখবো। রসের সঙ্গে জ্ঞানের এমন সংমিশ্রণ একমাত্র তোমাদের রসগোল্লা ছাড়া এখনও পর্যন্ত কোথাও দেখা যায় নি।"

আমি এই সময় বোকার মতো জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলাম, "কোন সায়েবের রচনা থেকে এসব উদ্ধৃতি দিচ্ছেন?"

সায়েব চোখ বড়-বড় করলেন। "কোনো ইংরেজ যদি এগুলো রচনা করতেন তা হলে কী ভালই না হতো! দূরদর্শী পণ্ডিত হিসেবে আমাদের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তো! খৃষ্টের জন্মের অন্তত শ' দুয়েক বছর আগে এগুলি যখন রচিত হয় তখনও ইউরোপ সুসভ্য হয়ে ওঠে নি। শোনো মাই ডিয়ার বয়, আসল কথাটাই তোমাকে বলা হয় নি। এগুলি বিখ্যাত ইন্ডিয়ান বই 'পঞ্চতন্ত্র' থেকে উদ্ধৃত! আমি অস্টার রাইডারের ইংরিজি অনুবাদ পড়েই মুগ্ধ! একদিন তুমি আদি বইখানা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে আসবে, আমরা দু'জনে যতগুলি পারি শ্লোক মিলিয়ে নেবো এবং তোমার সাহায্যে মিস্টার বিষ্ণুশর্মার মূল বইটা পড়বার আনন্দ উপভোগ করবো। পঞ্চতন্ত্র পড়ে একটা জিনিস বুঝতে পারছি, ইন্ডিয়ানদের থেকে সুরসিক জাত পৃথিবীতে নেই!"

সান্নিধ্য

আমি মানসচক্ষে ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের টেম্পল চেম্বারে সেই ঘরটা এবং ক্যালকাটা ক্লাবের বারওয়েল সায়েবের সুইট দেখতে পাই। মিডলটন স্ট্রীটের বাড়ি আর্থিক কারণে তুলে দিয়ে, মেমসায়েবকে রানীক্ষেতে পাঠিয়ে সায়েব প্রথমে উঠেছিলেন স্পেনসেস হোটেলে এবং তারপর ক্যালকাটা ক্লাবে। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত লোয়ার সার্কুলার রোডের ঐ ক্লাবেই তিনি ছিলেন, যদিও পৃথিবী

থেকে চিরবিদায় নেবার মুহূর্তটা কলকাতায় আসে নি, এসেছিল মাদ্রাজে। সেখানে রেল সম্পর্কে এক জটিল মামলায় ট্রাইবুনালের সামনে সওয়ালের জন্যে তিনি গিয়েছিলেন এবং আদালতেই অকস্মাৎ অসুস্থ হয়ে লেডি উইলিংডন নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত হয়েছিলেন।

যে-মানুষ সমস্ত জীবন নিজের পছন্দমতো সাজানো বাড়িতে দাসদাসী পরিবৃত হয়ে বসবাস করেছেন, সে-মানুষের পক্ষে জীবনসন্ধ্যায় আর্থিক কারণে স্ত্রীকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে হোটেলের এক ছোট্ট ঘরে কাটানোর মধ্যে কী কষ্ট আছে তা বোঝবার মতো অভিজ্ঞতা তখনও আমার হয় নি। কিন্তু এতোদিন পরে বুঝি, এই দুঃখকে প্রশ্রয় না দিয়ে জগতের আনন্দ-মঞ্চে নিজেকে অনাহৃত না রাখার জন্যে সায়েব যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। অন্তত তাঁর নিজস্ব দুঃখ যাতে তাঁর নিতান্ত কাছের মানুষদের নিরানন্দ না করে সে বিষয় তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল সব সময়।

আমি যখন টেম্পল চেম্বারের চাকরিতে এসেছি তখন সায়েবের আইনী পসার কমতে আরম্ভ করেছে তার কারণ অনেকেরই অজানা নয়। রানীক্ষেত ক্লাবের মামলা নিয়ে এদেশে ইংরেজ মহলে তখন তাঁর সম্বন্ধে অত্যধিক বিরক্তি। অপমানিত কলোনিয়াল ইংরেজ কখনও বাঙালিদের মতো 'প্রতিশোধ নেবো' এই বলে প্রকাশ্যে আস্ফালন করে না, তারা নীববে মানুষকে ভাতে মারার ব্যবস্থা করে।

রানীক্ষেত ক্লাবের ব্যাপারটা অনেকের জানা থাকলেও, আর একবার বলতে হচ্ছে। এদেশে ইংরেজরা নিজেদেব আনন্দ ও মেলামেশার জন্যে যেসব সুখ-সুবিধের ব্যবস্থা করেছিলেন সেসব তাঁরা এদেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতে লাগলেন। উত্তরপ্রদেশের কুমায়ুন পাহাড়ে রানীক্ষেত ক্লাব ছিল এমনই এক সংস্থা যেখানে ভারতীয়দের সভ্য করা হতো না। সহজবোধ্য কারণে এই ক্লাবের সভ্যসংখ্যা স্বাধীনতার কিছু আগে বেশ কমে গেলো। অথচ ক্লাবের নিজস্ব সম্পত্তি এবং সম্পদ অনেক। হাতে গোনা যায় কয়েকজন সভ্য দেখলেন যে ক্লাব বন্ধ করে দিয়ে বাড়ি ঘর জমি বেচে দিলে প্রত্যেক সভ্যই মোটা টাকা পেতে পারেন।

সায়েব ঐ ক্লাবের সভ্য। তিনি বললেন, রানীক্ষেতের মতো জায়গায় এই ধরনের ক্লাবের প্রয়োজন রয়েছে। এই ক্লাবে ভারতীয় সভ্য নেওয়া হোক, তাহলেই ক্লাবের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

কয়েকজন ধুরন্ধর ইংরেজ মোটেই সায়েবের ওপর সন্তুষ্ট হলেন না। তাঁরা

গোপনে-গোপনে নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করার ষড়যন্ত্র আঁটলেন এবং ক্লাবের সভায় হঠাৎ একদিন প্রস্তাব দিলেন ক্লাব তুলে দিয়ে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করা হোক। বিপক্ষে মাত্র একটি ভোট, সেটি সায়েবের।

ভোটে হেরে গিয়েও সায়েব কিন্তু দমলেন না। অন্যায়ের সঙ্গে আপসের স্বভাব তাঁর রক্তে নেই। কলোনিয়াল ইংরেজের দলগত স্বার্থের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার মূল্য যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে তা জেনেও তিনি রুখে দাঁড়ালেন। রানীক্ষেত থেকে সায়েব সোজা চলে গেলেন এলাহাবাদে—স্বার্থপর সায়েবদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে। এই মামলায় তাঁর পরামর্শদাতা ছিলেন তখনকার বিখ্যাত ব্যারিস্টার স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং তরুণ গোপালস্বরূপ পাঠক, যিনি পরে ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

এদেশের ক্লাব সংক্রান্ত আইনকানুনে রানীক্ষেত মামলাটি আজও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে আছে। আইনের যে সূক্ষ্ম অথচ জটিল পথটি সায়েব গ্রহণ করলেন তা হলো—সমস্ত সভ্যের সর্বসম্মত ইচ্ছা ছাড়া কোনো প্রতিষ্ঠান তুলে দিয়ে সম্পত্তি বেচে ফেলা যায় না। সৌভাগ্যক্রমে তখনও এই ক্লাব লিমিটেড কোম্পানি ছিল না। সায়েবের পক্ষে একটা বিশেষ সুবিধে ছিল, যেসব ইংরেজ ক্লাব তুলে দেবার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগেই ক্লাবের সভ্য হয়েছিলেন এবং সম্পত্তি বেচলে তাঁদের পকেটেও মোটা টাকা আসতো।

এই মামলার আইনগভ গুরুত্বের কথা চিন্তা করে এলাহাবাদ হাইকোর্টের তিনজন বিচারকের স্পেশাল বেঞ্চে কেস পাঠানো হলো। হাইকোর্ট অব আগ্রা অ্যান্ড আউধে মামলা চললো বহুদিন। কলকাতার সব কাজ ফেলে রেখে প্রায়ই সায়েবকে প্রভূত ক্ষতিস্বীকার করে এলাহাবাদে ছুটতে হতো।

আদালতে সায়েবের বক্তব্য : এই সিদ্ধান্ত যখন সর্বসম্মত নয়, তখন তা বেআইনী। কারণ এটি মেনে নিলে এদেশের কোনো প্রতিষ্ঠানই নিরাপদ থাকবে না। রাতারাতি ঢুকে-পড়া স্বার্থপর সভ্যরা ভোটের জোরে প্রাচীন প্রতিষ্ঠানকে লিকুইডেশনে পাঠিয়ে বড়লোক হতে পারবেন। লিমিটেড কোম্পানির কথা আলাদা, কারণ সেখানে প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্রেই কার কতখানি অধিকার আছে এবং কোম্পানি লিকুইডেশনে পাঠানো যাবে তা শুরুতেই বিস্তারিত লেখা আছে।

তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চের মধ্যে দু'জন ভারতীয় বিচারক শেষ পর্যন্ত সায়েবের পক্ষে রায় দিলেন, বললেন, এই ক্লাব বন্ধ করা

যাবে না। যিনি বিপক্ষের রায় দিলেন তিনি একজন ইংরেজ। শুনেছি, এই রায়ের আগে এদেশের কোনো ক্লাবই লিমিটেড কোম্পানি ছিল না। আইনের অসুবিধে এড়াবার জন্যে অনেকেই এবার নিজেদের লিমিটেড কোম্পানি করে নিলেন।

রানীক্ষেত ক্লাবের হলঘরে এখনও একটি ছবির তলায় একটি ফলকে এই ক্লাবকে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার পেছনে বারওয়েল সায়েবের অবদানের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি রয়েছে। কিন্তু যা সেখানে লেখা নেই তা হলো, ইংরেজের গোষ্ঠীস্বার্থে হাত দিয়ে কিছু ইংরেজকে প্রকাশ্যে হেয় করার সৎসাহস দেখানোর জন্য কী ভীষণ মূল্য সায়েবকে দিতে হয়েছিল। বিভিন্ন ইংরেজ প্রতিষ্ঠান থেকে দীর্ঘদিন ধরে সায়েবের কাছে যেসব আইনের কাজ আসতো তা রাতারাতি বন্ধ হলো। শুনেছি, সায়েবকে আকারে ইঙ্গিতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল এবং চুপিচুপি মামলা তুলে নিতেও বলা হয়েছিল। কিন্তু যা ন্যায়সঙ্গত বলে তিনি মনে করেছেন তা থেকে সায়েবকে সরিয়ে আনা প্রায় অসাধ্য। চরম আর্থিক মূল্য দিতে একটুও ভয় নেই সায়েবের।

কিন্তু যা অপ্রত্যাশিত ছিল : স্বদেশীয়ানার আঘাতও এই ভারতপ্রেমীর ওপর প্রায় একই সঙ্গে এসে পড়লো। সায়েবের ব্রীফের একটা প্রধান অংশ আসতো বিভিন্ন রেলপথ থেকে। স্বাধীনতার পরে ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের একজন নতুন ভারতীয় প্রধান যেদিন শুনলেন এই রেলপথের মামলা এখনও একজন বিদেশীর কাছে যায় তখন তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। একদিন রেলপথের কর্ণধাররা সায়েবের কাছে নতুন ব্রীফ পাঠানো বন্ধ করে নিজেদের স্বদেশীয়ানার পরিচয় দিলেন। এ-নিয়ে হয়তো উচ্চ পর্যায়ে দরবার করলে কিছু লাভ হতো, কিন্তু সায়েব মুখ খুলবার লোক নন, কারণ ব্যারিস্টার হিসেবে ব্রীফের জন্য তদারকি করা মানেই তো নীতিভ্রষ্ট হওয়া।

অথচ সবাই জানে, নেহরু পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। কেমব্রিজ-সূত্রে জওহরলালের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে তাঁর যোগাযোগও ছিল। এবং এই জওহরলালই সেই সময় এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসেছেন। পেনড্রেল মুন নামক একজন তরুণ ইংরেজ আই-সি-এসকে কোনো এক সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সামান্য সহানুভূতি দেখানোর অভিযোগে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী পদচ্যুত করেন। ভারত স্বাধীন হবার পর সমস্ত ইংরেজ আই-সি-এস যখন দেশ ছাড়ছেন, সেই সময় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল পুরনো ফাইল খোঁজ করে সেই অভাবনীয় কাণ্ডটি করলেন। পেনড্রেল মুন স্বাধীন ভারতের সরকারী চাকরিতে পুনর্নিযুক্ত হলেন। এই পেনড্রেল মুন পরবর্তীকালে স্বদেশে ফিরে

গিয়ে ট্রান্সফার অফ পাওয়ার সংক্রান্ত ইংরেজ নথিপত্রের সম্পাদনা করে ঐতিহাসিক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

একই সঙ্গে ইংরেজ এবং ভারতীয়দের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়ার চেয়ে দুর্ভাগ্যের কী থাকতে পারে? এবং প্রায় একই সময়ে তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন। মেমসায়েব প্রস্তাব করেছিলেন, "নোয়েল, এবার রানীক্ষেতে ফিরে চলো। কলকাতায় থাকবার আর কোনো প্রয়োজন নেই। আমার যা সামান্য পৈতৃক অর্থ আছে তাতেই কোনোরকমে দু'জনের চলে যাবে।" সায়েবের নিজস্ব সঞ্চয় বলে কিছু নেই, রানীক্ষেতে খরচও অনেক কম। দু'জনে সাধারণভাবে থাকলে কোনো অসুবিধা হবার কথাও নয়। কিন্তু পরাজয় মেনে নিয়ে জীবনযুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর শিক্ষা নোয়েল বারওয়েলের নয়!

বাধ্য হয়ে মেমসায়েব একা ফিরে গেলেন রানীক্ষেতে। কিন্তু সায়েব সাজানো সংসার তুলে নিয়ে ভাগ্যের সঙ্গে তার এক হাত লড়বার জন্যে পুরনো স্পেনসেস হোটেলের একখানা ভাঙা ঘরে আশ্রয় নিলেন।

এইভাবেই চলছিল জীবন সংগ্রাম। কিন্তু নিজের ছোট্ট পরিবেশকে মুহূর্তের জন্যেও নিরানন্দ করে তোলেননি আমাদের সায়েব।

স্পেনসেস হোটেলের ছোট্ট ঘরের এক কোণে বসে তিনি আমাকে নতুন এক জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন আপন খেয়ালে। আগে টেলিফোন-আচরণ শিখিয়েছেন, তারপর শেখালেন টেবিল-আচরণ,—ইংরিজিতে যাকে বলে টেবিল ম্যানারস। এই পর্বের প্রথম পদক্ষেপ ছুরি-কাঁটা-চামচের যথার্থ ব্যবহার।

সায়েব একদিন কাসুন্দের বালককে বিলিতি আদবকায়দার মূল তত্ত্বগুলো পরম উৎসাহে শেখাতে লেগে গেলেন। সে এক শক্ত সময়। ভোজনের সময় দক্ষিণ হস্তের পাঁচ আঙুল ছাড়া কোনো কিছুর সদ্ব্যবহার করি নি কখনও (শৈশবে ঝিনুক ছাড়া)।

আমাকে ভরসা দেবার জন্যে সায়েব বললেন, "খাবার আগে এবং খাবার পর হাত মুখ ধোওয়ার সিস্টেমে ভারতীয়রা বিশ্বের মধ্যে তুলনাহীন!"

পাঁচ আঙুলের ব্যবহারও যে বিজ্ঞান এবং স্বাস্থ্যসম্মত তাও জানালেন তিনি। কিন্তু হোটেলে আমার সামনে তখন অনেকগুলি ছুরি কাঁটা এবং চামচ শোভা পাচ্ছে।

জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না, তাই আমাকে ভোজনের মধ্যেই শিক্ষা

দিয়েছেন সায়েব। নির্বাচন করে নিয়েছেন হোটেলেব ডাইনিং রুমের একটি বিশেষ কোণ যাতে বেশী লোক আমার শিক্ষানবিশি সাধনার ওপর নজর দিতে না পারে।

আমার মনে আছে, সায়েব হেসে বলেছিলেন, "শ্রেষ্ঠ হিন্দুরা খাওয়ার সময় সম্পূর্ণ নীরব, শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয়রা মুখর। কথা বলতে-বলতে খাওয়া এবং খেতে-খেতে কথা বলাটাই পশ্চিমীদের স্বভাব। শ্রেষ্ঠ হিন্দুরা ভেজনাসনে বাক্যহীন হলেও শব্দহীন নন। খাওয়ার সময় নানা আওয়াজ করেন তাঁরা। পশ্চিমী টেবিলে চা, স্যুপ, ব্রথ, চাটনি কোনো কিছু উপভোগের সময় সামান্যরকম মুখশব্দ করা চলবে না। গরম চায়ে আওয়াজ না করার জন্যে যদি ঠোঁট পোড়ে তো পুড়ুক।"

"আরও একটি নিয়ম", সায়েব রসিকতা করেছিলেন, "কাঁটা ও ছুরির জাতিভেদ। কাঁটা যখন খুশি মুখে পোরা যাবে অথচ ছুরি কোনোক্রমেই ঠোঁটে ঠেকানো চলবে না—এই আইন কে করেছিলেন এবং কেন করেছিলেন তা কেউ জানে না। কিন্তু তাই-ই আইন।"

আমার সভয়ে মনে পড়লো, কলকাতাব কেষ্ট কাফে, অনাদি কেবিন এবং দিলখুশায় বহুজনেই মনের সুখে মুখে নাইফ পোরেন। স্বাধীনতার আগে আমার এক বন্ধু অবশ্য বলেছিলেন, ইংরেজের নিয়মকানুনকে অশ্রদ্ধা দেখাবার এইটাই চমৎকার সুযোগ।

আরও একটি ব্যাপারে সায়েব আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। "ভোজনান্তে অতিথি ঢেকুর না তুললে গৃহস্বামী পরিতৃপ্ত হতেন না আমাদেব এই দেশে, কিন্তু পশ্চিমী টেবিল-কেতায় ঢেকুর তোলার থেকে অসৌজন্যমূলক ব্যাপার আর কিছু হয় না। এর থেকে খাওয়ার টেবিলে বমি করাও বোধ হয় ভাল!"

"যে দেশের যেমন আচার", সায়েব আমাকে বুঝিয়েছিলেন। "আমার স্ত্রী প্রায়ই তাঁর ইংরেজ বান্ধবীদের বলেন, তোমরা খাওয়ার সময় ঢেকুর তোলা নিয়ে এতো চিন্তিত, কিন্তু তোমরা কী জানো যে খাওয়ার পর মুখ না ধুয়ে ন্যাপকিনে মুখ মুছে আমরা উঠে পড়ি শুনলে ভারতীয় মহিলাদের কী মানসিক অবস্থা হয়?"

সায়েব আরও রসিকতা করেছিলেন, "তোমাদের সঙ্গে আমাদের আর একটি মস্ত পার্থক্য—খাওয়ার পরে সব ভারতীয় গৃহস্বামীই অতিথিকে কৃতজ্ঞতা জানান, খাবার কষ্ট স্বীকারের জন্যে, কারণ অতিথি নারায়ণ। আমাদের নিয়ম,

খেয়েদেয়ে অতিথিই একপ্রস্থ গৃহিণী এবং গৃহকর্তার গুণকীর্তন করবেন!"

নানা ট্রেনিং-এ আমি ক্রমশই বেশ চৌকশ হয়ে উঠেছি! আমি এখন টেলিফোন ধরতে পারি, সকাল দুপুর সন্ধ্যার জন্য প্রচলিত নানা সূক্ষ্ম নিয়মকানুন মেনে বিদেশীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করতে পারি, লাঞ্চ এবং ডিনার টেবিলে নিয়মভঙ্গের ভয়ে আমার বুক দুরদুর করে না। মাছ কাটার নাইফ এবং চিকেন কাটার নাইফ যে এক অস্ত্র নয় তা এখন আমার অজানা নয়। খাওয়ার পরে ন্যাপকিনকে কীভাবে আবার মুড়ে টেবিলের কোথায় রাখতে হয় তাও আমার জানা হয়ে গিয়েছে।

সবচেয়ে সুবিধে হয়েছে ভাবের আদান-প্রদানে। ইংরিজি ভুল হবে এই আশঙ্কায় মুখে চাবিতালা লাগিয়ে বসে থাকাটা সায়েব বরদাস্ত করতেন না। তিনি সব সময় উৎসাহ দিতেন, "মুখ খোলো, মনের মধ্যে যেসব সন্দেহ আছে তা নিরসন করো। কখনও অন্ধভাবে সব কিছু মেনে নেবে না।" ডিকটেশনের সময়েও সায়েব একই কথা বলতেন--"কোথাও বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে জেনে নেবে।"

"আমি আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি, প্রাচীন ভারতবর্ষে ছাত্রদের শিক্ষার তিনটি পদ্ধতি ছিল—প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন এবং সেবয়া। পরিপ্রশ্নেন শব্দটার ওপর আমি সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করছি!" সায়েব আমাকে সাহস যোগাতেন।

সেই সাহসের সুযোগ নিয়ে কত প্রশ্নই যে সায়েবকে করেছি এবং কত অজানা তথ্য যে তিনি গভীর স্নেহে আমার কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। এই শিক্ষা না পেলে সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশের দুঃসাহস অবশ্যই আমার হতো না। মানব সমাজকে নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে দেখবার দুর্লভ সুযোগও মিলতো না। সমস্ত জীবন ধরে আমি রয়াল এক্সচেঞ্জে পাটের থলে বিভাগে বসে একই চিঠি বার বার টাইপ করে যেতাম।

চীন-চর্চা

সেদিন ছিল ছুটির দিন। সায়েব তখন আইনের এক বই লিখছেন! বিষয় 'ল অফ মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন্ট'—প্রভু এবং ভৃত্য সম্পর্কে যত আইন আছে তার সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ।

এই বইয়ের কিছুটা তিনি বলে গেলেন এবং আমি লিখে নিলাম শর্টহ্যান্ডের সাঙ্কেতিক রেখায়।

প্রতিটি বাক্য তখন আমার জন্যে নতুন অভিজ্ঞতার দ্বার খুলে দিচ্ছে। দেশে-বিদেশে কর্মী মানুষ এবং তার নিয়োগকর্তার মধ্যে কত বিচিত্র সম্পর্ক যুগযুগান্ত ধরে গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের বৈচিত্র্যের তো কথাই নেই।

ভারতের একটি শব্দ তো ইংরিজিতেও স্থান পেয়ে গিয়েছে—'বদলি' বা 'budli'। এদেশে প্রভুর গৃহ থেকে ছুটি নিয়ে দেশে যাবার সময় ভৃত্যরা একজন বদলি দিয়ে যেতো যে তার অনুপস্থিতিতে কাজের দায়িত্ব পালন করবে। কালক্রমে পাটকল এবং অন্যত্রও এই 'বদলি' নেবার নিয়ম ছড়িয়ে পড়ে।

এই সম্পর্কে লম্বা নোট মনের সুখে টাইপ করে চলেছি। কিন্তু সায়েবের মন আজ অন্য কোথাও পড়ে রয়েছে। তিনি কয়েকবার আড়চোখে দেখে গেলেন আমি কতখানি এগিয়েছি। আমাকে ডিস্টার্ব না করে কাজের অগ্রগতির ওপর নজর রাখার একটা বিশেষ ধরন ছিল তাঁর। ভাবটা এমন যেন আমিই এই মুহূর্তে এখানকার অধীশ্বর এবং তিনি ভয়ে-ভয়ে উঁকি মারছেন।

অবশেষে সায়েবের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো। তিনি বললেন ; "অনেক হয়েছে মাই ডিয়ার বয় ! আজ আর কাজ নয়। এখন আমাদের ছুটি। কাজকে ফাঁকি দিতে যে না জানে সে কেমন করে মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন্ট সম্পর্কে বই লিখবে? আমার তো ইচ্ছে 'ফাঁকি' সম্পর্কে একটা সুবৃহৎ অধ্যায় জুড়ে দেবো এই বইতে যদি প্রকাশক ওরিয়েন্ট লংম্যানের কর্মকর্তা মিস্টার জন অ্যাডামের কোনো সিরিয়াস আপত্তি না থাকে!"

যাঁর কাজ তিনিই ফাঁকি দেবার পরামর্শ দিচ্ছেন! এমন মধুর বিচিত্র অবস্থায় খুব কম লোকেই পড়েছে! আমি তখনও আরও দু' একটা পাতা টাইপ করে ফেলতে আগ্রহী। কিন্তু এবার সায়েব গম্ভীর ভাষায় নির্দেশনামা জারি করলেন—"হল্ট! এখনই কাজ বন্ধ্ না হলে আমি লক-আউট ঘোষণা করবো।"

টাইপ রাইটার মেশিন বন্ধ রেখে আমি সোফায় এসে বসলাম ওঁর মুখোমুখি হয়ে।

মজা করে সায়েব বললেন, "বেশী পরিশ্রমী এবং বেশী সাহসী মানুষরাই আমাদের বিপদে ফেলে গিয়েছেন! কারও-কারও রক্তে রয়েছে সারাক্ষণ কাজের নেশা। কিন্তু ভগবান কি মানুষকে কেবল কাজ করবার জন্যেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন? যত কাজ তত খেলা এই হলো আদর্শ সংমিশ্রণ। কী বলো?"

আমার কী বলার থাকতে পারে? তবু বললাম, "কোথাও কোথাও—আজ খেলা, কাল কাজ!"

"বাঃ! চমৎকার বলেছো! কথাটা খুবই মূল্যবান। সাহসী লোকদের সম্বন্ধে বার্নার্ড শ দুঃখ করেছেন। বলেছেন, এই পৃথিবীর মুশকিল হলো এখানে অত্যধিক সাহসী লোক রয়েছেন, যাঁরা অন্যের নির্দেশে কোনো কিছু প্রশ্ন না তুলেই নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত আছেন।"

তিনি নিজে কথাটার পক্ষে, না বিপক্ষে তা সেদিন ঠিকমতো বুঝতে পারি নি। হাজার হোক মিলিটারিতে তিনি কৃতী পুরুষ ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ফরাসী রণাঙ্গনে অভূতপূর্ব বীরত্বের জন্য পেয়েছিলেন মিলিটারি ক্রশ, যার সম্মান ভিক্টোরিয়া ক্রশের পরেই। মিলিটারিতে যিনি অল্প সময়ের মধ্যে লেফটেনান্ট কর্নেল হয়েছিলেন তিনি কেন মিলিটারিতে থাকলেন না তা অবশ্য তখনও জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাই নি। একবার কেবল বেয়ারা দেওয়ান সিং-এর কাছে প্রশ্নটা তুলেছিলাম এবং সে স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছিল : "আপনার সঙ্গে ভাব করবার জন্যে! মিলিটারিতে থাকলে তো সায়েবের বাবুর প্রয়োজন হতো না!"

সায়েব এবার ইংরিজিতে কবিতা মুখস্থ বলতে আরম্ভ করেছেন। তিনি বললেন, "কয়েক রাত ধরে আমি নানা জ্ঞান আহরণ করে চলেছি। রাত্রে ভাল ঘুম আসছে না, তাই চলছে কিছু মাজার পড়াশোনা। তুমি শোনো একটা কবিতা।"

যে ইংরিজি কবিতাটি সায়েব শোনালেন তার মোটামুটি অর্থ হলু :

"যে অন্যকে জানে সে পণ্ডিত,
কিন্তু নিজেকে যিনি জানেন তিনিই জ্ঞানী।
অন্যকে যিনি জয় করেন তাঁর পেশী অবশ্যই শক্তিমান,
কিন্তু নিজেকে যিনি জয় করেন তিনিই বলবান।
যাঁর সন্তোষ এসেছে একমাত্র তিনিই ধনী
যিনি দৃঢ়সংকল্প ; কেবল তিনিই মনোবলের অধিকারী।
যিনি ভারসাম্য হারান না তিনিই টিকে থাকেন,
মৃত্যুর পরেও লোকে যাঁকে স্মরণ করে তিনিই দীর্ঘজীবী।"

এবার সায়েবের প্রশ্ন : "কে এই সত্যি কথাগুলো মজার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন বলো তো?"

"নিশ্চয় কোনো ইউরোপীয় সত্যদর্শী—মানুষকে এখন তাঁরা কত বিচিত্র

দৃষ্টিভঙ্গীতে যাচাই করে চলেছেন।”

“হলো না!” সায়েব আমাকে নম্বর দিলেন না। “ইউরোপের লোকেরা কর্মী, কিন্তু জ্ঞানী নয়!” সায়েব আবার রসিকতা করলেন।

“একমাত্র প্রাচ্যের ঋষিরাই মানুষকে নির্ভেজাল জ্ঞান উপহার দিয়ে এসেছেন। নিজেকে জানার এই ব্যাপারটা লেখা হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগে। যিনি লিখেছেন সেই লাওৎসের জন্ম খৃষ্টের জন্মের ৫৭০ বছর আগে—বুদ্ধের থেকেও বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি।”

আমাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি বললেন, “শোনো আর একটি লাওৎসে-বাণী—

যিনি জানেন তিনি মুখ খোলেন না।
যিনি মুখ খোলেন তিনি জানেন না!”

“এর থেকে সত্যি কথা এই পৃথিবীতে কী হতে পারে?” সায়েব হাসতে লাগলেন।

“কোন মানুষ সবচেয়ে সম্মানের যোগ্য এই প্রশ্নেরও ভারি সুন্দর উত্তর দিয়েছেন লাওৎসে—

ভালবাসা অথবা ঘৃণা কিছুই তাঁকে স্পর্শ করে না
লাভ-লোকসানের হিসেব তাঁর কাছে পৌঁছয় না,
সম্মান অথবা অসম্মান কিছুতেই তিনি যখন বিচলিত নন
পৃথিবীর সব সম্মান তখনই তাঁর কাছে পৌঁছয়।”

আমি মন দিয়ে শুনে যাচ্ছি সায়েবের সরস আবৃত্তি। সায়েব বললেন, “হাজার-হাজার বছর আগে সংসারের কঠিন সত্যগুলো ঋষিরা কী সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দেখো! লাওৎসে মানুষকে সাবধান করে দিচ্ছেন এক কবিতায়, যার নাম ‘রেসের ঘোড়া’—

সন্তুষ্টির অভাব থেকে বড় অভিশাপ নেই এই পৃথিবীতে
বিত্তের বাসনাই আমাদের এক নম্বর পাপ।
কেবল সন্তুষ্টি পেলেই যিনি সন্তুষ্ট হতে রাজি
একমাত্র তিনিই হবেন চিরসন্তুষ্ট।”

আড়াই হাজার বছর আগেকার এই সব ঋষির বচন থেকে আমি উপকৃত হচ্ছি অবশ্যই, কিন্তু আমাকে সবিনয়ে মনে করিয়ে দিতে হলো আমার ইস্কুল-কলেজের শিক্ষা সীমিত, যা সুশিক্ষিতদের সহজ আয়ত্তে তা আমার কাছে সম্পূর্ণ অজানা।

এই ধরনের কথা সায়েব যে পছন্দ করেন না তা তিনি সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, "জ্ঞান সঞ্চয়ের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কোনো সম্পর্ক নেই। মনে রাখবে, পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানে তোমার পরিপূর্ণ অধিকার।"

এরপর সায়েব সকৌতুকে আরও একটি লাওৎসে-বাণীর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—

"নিজের বাড়ির দরজা না পেরিয়েই জানা যেতে পারে
পৃথিবীর কোথায় কখন কী ঘটছে।
নিজের জানলা দিয়ে বাইরে না তাকিয়েও
আমরা পেতে পারি স্বর্গের স্বাদ।"

অথবা—

"যে যত বেশী জ্ঞানের কচকচিতে নিমগ্ন
সে তত কম জানে।
ঋষিরা তাই ভ্রাম্যমাণ না হয়েই জ্ঞান আহরণ করেন,
না দেখেই সব বুঝে নেন,
কিছু না করেই সব কর্ম সম্পন্ন করেন।"

লাওৎসেবাদী চীনা ঋষিদের একটা ছবি তখন মনের মধ্যে আঁকবার চেষ্টা করছি।

রসিক সায়েব বললেন, "প্রাচীন চীনা তত্ত্বজ্ঞানীদের নিয়ে ইউরোপে অনেকে এখন রসিকতা করছেন! কিন্তু আমার মনে হয় এই সব লোক বোকামি করছেন। এবং একদিন তাঁরা নিজেদের লজ্জা ঢাকবার পথ পাবেন না।"

"চীনা ঋষিবাক্যের প্রধান আকর্ষণ এর সরলতা। মূল বাণীটি বোঝবার জন্যে কোনো অভিধান খুলে বসবার দরকার নেই। আর একটি প্রধান গুণ হলো এগুলি খুব ছোট—বিন্দুর মধ্যেই তুমি সিন্ধু দর্শন করতে পারো।" সায়েব বললেন।

আমার খুব ভাল লাগছে সায়েবের কথা। চাইনীজ জুতোওয়ালা ছাড়া আর কোনো চৈনিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। ছেলে-ভুলনো অ্যাডভেঞ্চার গল্পে কিছু চীনা গুণ্ডার কথাও পড়েছি, যারা মাদকদ্রব্যের চালান করে এবং খুনোখুনি বাধিয়ে অবশেষে পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পৃষ্ঠার শেষ লাইনে।

সায়েব বুঝলেন আমার অবস্থা, কিন্তু বললেন, "চীনা ঋষিদের বাণীর ওপর নির্ভর করেই জীবনদর্শন গড়ে তুলবার লোভ হয়েছিল আমার। বিশেষ করে আর্থার ওয়েলির অনুবাদ পড়ে।"

এই ঋষিরা কেমন তা সায়েব ব্যাখ্যা করলেন আর একটি লাওৎসে-বাণী উদ্ধৃতি দিয়ে—

"ঋষির কোনো বাঁধাধরা মতামত বা অনুভূতি নেই,
কিন্তু নানা মানুষের মতকেই তিনি নিজের বলে মনে করেন!
ভালকে আমি অবশ্যই ভাল বলি,
কিন্তু খারাপকেও ভাল বলতে দ্বিধা নেই আমার।
গুণময় হবার এইটাই সুবিধা।
যা সৎ তাকে আমি বিশ্বাস করি
যা অসৎ আমি তাকেও বিশ্বাস করি ;
গুণময় হবার একটাই গুণ।"

সায়েব এমনভাবে ইংরিজি আবৃত্তি করছেন যে আমি হাসি চেপে রাখতে পারছি না।

সায়েব গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, "যখন সময় পাবে তখন একটু ভেবে দেখো। খুব গভীর তত্ত্ব বলা হচ্ছে—ভালও ভাল, খারাপও ভাল। অত্যন্ত দুরূহ কথা এমন সহজ করে বলেছেন লাওৎসে যে মনে হচ্ছে কোনো একজন কবি কিছু না ভেবেই লোক হাসাবার জন্যে কবিতা আওড়ে চলেছেন!"

আমাদের চাইনীজ জ্ঞানসঞ্চয়ন বেশ জমে উঠেছে! সায়েব বললেন, "বহু মূল্যবান উপদেশ অনেকদিন অব্যবহৃত হয়ে পড়ে আছে। কিন্তু আমাদের উচিত যাঁরা দেশের মাথার ওপর বসে আছেন তাঁদের সকলকে এইসব প্রাচীন জ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত করা।"

আমি সায়েবের জ্ঞানের গভীরতা দেখে অভিভূত হচ্ছি। সায়েব রসিকতা করলেন, "প্রাচীন ঋষিরা কোনো সময়েই বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যকে খুব উচ্চাসন দিতেন না, মাই ডিয়ার বয়। মনে রাখবে, অতিমাত্রায় পণ্ডিতদের সব সময় সন্দেহের চোখে দেখা উচিত!"

আবার উদ্ধৃতি—

"অতিমাত্রায় জ্ঞানের জন্যেই
মানুষের এখন এতো অশান্তি।
পাণ্ডিত্যের জোরে যারা রাজত্ব চালাতে চায়
তারা সত্যিই অভাগা!"

এবারও আমার হাসি বন্ধ হচ্ছে না। সায়েবও মৃদু হাসলেন, কিন্তু আমাকে সাবধান করে দিলেন, অনেক গভীর সত্যকে পৃথিবীর মানুষ প্রথমে হাস্যকর

বলে উড়িয়ে দিয়েছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়েব ঘোষণা করলেন, "চীনা জ্ঞানকে বোধগম্য করে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন চাইনীজ খাদ্য।"

টেলিফোনে স্পেনসেস হোটেলের রুম সার্ভিসে চাইনীজ খাবারের অর্ডার হলো।

খাবার এলো। কিন্তু সায়েব হুঙ্কার ছাড়লেন, "চপস্টিক কোথায়?" ঐ কাঠি না-হলে নাকি চীনা খাদ্যের অর্ধেক স্বাদ উবে যায়।

এবার শুরু হলো আমার চীনা কাঠির ট্রেনিং। স্টিক চালনা করা এবং তা আয়ত্তের মধ্যে রাখা বেশ কঠিন কাজ, অনভিজ্ঞ আমি হিমসিম খেতে লাগলাম।

সায়েব মন্তব্য করলেন, "বোঝা যাচ্ছে পূর্বজন্মে তুমি চীনে জন্মাও নি। কিন্তু আমি সামান্য চেষ্টাতেই চীনা কাঠিকে আয়ত্ত করে ফেলেছি।"

একবার চোখ বুজে কল্পনা করো, তুমি এখন একজন প্রবীণ চীনা ঋষির পদতলে বসে নতমস্তকে পার্থিব জ্ঞান আহরণ করছো। চপ স্যুয়ের সঙ্গে একটু-একটু করে কবিতা আস্বাদন করা যাক, তবেই তো স্বর্গীয় চীনা পরিবেশ গড়ে উঠবে আমাদের এই চীনা দিবস উৎসবে।"

সায়েব আস্তে-আস্তে আবৃত্তি করতে লাগলেন—

"সাহসী সৈন্য কখনও হিংস্র হয় না,
প্রকৃত যোদ্ধা কখনও রেগে ওঠেন না।
মহান বিজয়ী কখনও ছোট ব্যাপারে অস্ত্র ধরেন না,
মানুষকে যাঁরা কাজে লাগাতে জানেন বিনম্র হতে
কোন সঙ্কোচ নেই তাঁদের।"

আমি ইতিমধ্যে চীনা চপস্টিক নিয়ে আরও বিব্রত হয়ে পড়েছি।

সায়েব মৃদু হেসে বললেন, "প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয় সাধন করা যাক। চীনা কাঠি ছেড়ে, এসো আমরা এবার কাঁটা-চামচের সদ্ব্যবহার করি।"

চাইনীজ লাঞ্চের শেষ পর্যায়ে চাইনীজ চা এসেছিল।

"চায়ের সঙ্গে জুঁই ফুল মেশাবার মতো উদ্ভাবনী শক্তি একমাত্র চীনারাই দেখাতে পেরেছে!" সায়েব আমাকে বললেন এবং জানালেন, "আমরা কিন্তু বোকামি করে ফেলেছি। আমাদের উচিত ছিল লাঞ্চের শুরুতেই চায়ের আয়োজন করা। কারণ অভিজ্ঞ চীনা নাকি এক-একটি পদের শেষে চায়ের সাহায্যে নিজের জিভ ধুয়ে ফেলার সুযোগ নেন।"

সায়েবের কণ্ঠে চাইনীজ কবিতার উদ্ধৃতিটি আজও আমার মনে আছে।

ইংবিজির যথাযোগ্য কাব্যানুবাদ হলে সুন্দর হতো। কিন্তু স্মৃতি থেকে আমি যতটুকু স্মরণ করতে পারছি তাতেই সন্তুষ্ট হতে হবে আমাদের।

সায়েবের বলার ভঙ্গিতে শেষ উদ্ধৃতিটি যে সত্যিই মনোরম হয়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য।

রসিকতা ও গাম্ভীর্যের অভাবনীয় সমন্বয় হয়েছিল চীনা ঋষিদের বক্তব্যে। সায়েবও সেই কায়দাতেই চা-প চর্চায় তাঁর কৃতিত্ব দেখালেন—

“পৃথিবীর সবাই নিন্দায় মুখর, আমার সমস্ত শিক্ষা নাকি ভুলে ভরা।
যা মহৎ তা তো প্রায়ই মনে হয় ভুল।
যদি আমার শিক্ষা ভুল না মনে হতো
তাহলে বুঝতাম আমাকে কিছুই শেখানো হয় নি

তিনটি মাত্র হীরে জহরত আছে আমার—
নজরে রেখো, সাবধানে রেখো তাদের।
প্রথমটির নাম ‘ভালবাসা’,
দ্বিতীয়টি হলো—‘কখনই বেশী নয়’,
তৃতীয়—‘কোনো ব্যাপারেই প্রথম হয়ো না পৃথিবীতে’।

ভালবাসার অমৃতে ভয় দূর হয় ;
প্রত্যাশার সীমা থাকায়, সর্বশক্তি বিনিয়োগে রিক্ত হই না আমি,

প্রথম হবার উত্তেজনা মুক্ত হয়ে
আমি প্রতিভার উন্নয়ন কবতে পারি।
ভালবাসা শূন্য হয়ে যায় ভয়ের বোঝা মাথায় নিয়ে,
প্রথম হবার জন্যে যে নিত্য ছুটবে
সে মরবে।

ভালবাসা সব আক্রমণেই বিজয়ী
এবং আত্মরক্ষায় অজেয়।
বিনাশ থেকে যাদের রক্ষা করার ইচ্ছে

ঈশ্বর তাদেরই প্রেমের অস্ত্রে সজ্জিত করেন!"

চাইনীজ চা শেষ হয়েছে আমার। হাতলবিহীন চায়ের পাত্র থেকে শেষ চুমুকটি নিয়ে সায়েব বললেন, "আমার ক্ষমতা থাকলে ইংলন্ডে সব ইস্কুলে এই শিক্ষাই দিতাম। কিন্তু সারাক্ষণ উল্টো শেখানো হচ্ছে মানুষকে। বলা হচ্ছে, ভালবাসা থেকে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনেক বেশী। যে কমে সন্তুষ্ট আজকের পৃথিবীতে কোথাও তার সম্মান নেই। আর প্রথম হবার নেশা, সে তো ইস্কুলের নিম্নতম শ্রেণী থেকেই শিশুদের রক্তের মধ্যে ইন্‌জেকশন করে দেওয়া হচ্ছে। সব সময় প্রথম হতে গিয়ে পৃথিবীতে যে কত অশান্তি ডেকে আনা হচ্ছে তার শেষ নেই।"

আমাদের গল্প বোধ হয় আজ শেষ হবে না! ন্যাপকিনে মুখ মুছতে-মুছতে সায়েব বললেন, "তিন হীরে জহরতের ব্যাপারে ইয়ংম্যান হিসেবে তোমার হয়তো প্রতিবাদ করার কিছু থাকতে পারে। কিন্তু আজ তোমাকে তর্ক করতে সুযোগ দেবো না। শোনো, এ-বিষয়ে ঋষিরা হাজার-হাজার বছর আগে কীভাবে সত্যকে আবিষ্কার করে গিয়েছেন।"

সায়েব এবার শুরু করলেন---

"সত্যি কথা মিষ্টি শোনায় না ;
মিষ্টি কথাও সত্যি নয়।
ভাল মানুষ কখনও তর্ক করে না ;
যে তর্ক করে সে ভাল মানুষ নয়।
যিনি বিজ্ঞ তিনি অনেক কিছু জানেন না ;
যিনি অনেক বিষয়ে পণ্ডিত তিনি বিজ্ঞ নন।
সাধুজন নিজের জন্যে আহরণ করেন না,
অপরের জন্যে জীবনপাত করে
তিনি নিজেই ধনী হয়ে ওঠেন ;
অপরকে সব দিয়ে তিনি
নিজের প্রাচুর্যকে অবধারিত করেন।
স্বর্গে যেমন আশীর্বাদ আছে, অভিশাপ নেই
সাধুজনের জীবনে তেমন কর্ম আছে, তর্ক নেই।"

সেদিন আমি আবার কাজ শুরু করার আগ্রহ দেখিয়েছিলাম। সায়েব রাজী

হলেন না। "অনেক হয়েছে। এখন চাইনীজ চিন্তা করতে-করতে বাড়ি যাও।"

বিদায়ের আগে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন তিনি। "তুমি এখনও রোগা। তোমাকে তাড়াতাড়ি আমি আর একটু ভারিক্কী দেখতে চাই", এই বলে সকৌতুকে আমার কানটা একটু মলে দিয়ে সেদিন তিনি স্পেনসেস হোটেল থেকে আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

ছোকাদার গল্প

আদালতী পাড়ায় সায়েবের পরেই যাঁকে আমার বিশেষ করে মনে পড়ে তাঁর নাম ছোকাদা। ব্যারিস্টারের বাবু ছোকাদার অনেক গল্প 'কত অজানারে'-র পাঠক-পাঠিকাদের জানা। তবু সব গল্প বলা হয় নি।

অনেকদিন পরে সেবার হাইকোর্টে ছোকাদার সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল।

শনিবারটা হাইকোর্টে প্রায়-ছুটির দিন, ওদিন কোর্ট বসে না। ব্যারিস্টার সায়েবরা কালো কোট না চাপিয়েই বার-লাইব্রেরিতে আসেন, বাবুদেরও অতো ব্যস্ত থাকতে হয় না। ছোকাদার ভাষায়, "কাজের আঠাটা হঠাৎ যেন একেবারে জোলো হয়ে যায়—হড়-হড় করে, কিন্তু চ্যাট-চ্যাটে ভাবটা থাকে না।"

কাজের তেমন তাড়া নেই, কোর্টে হাজিরা দেবার তাগিদ নেই ; সায়েবদের ঘন-ঘন সেলাম দিতে বেঞ্চি ছেড়ে ওঠার প্রয়োজনও নেই। তাই যেন বার-লাইব্রেরির সামনে বাবুদের বেঞ্চিতে আড্ডাটা বেশ জমাট হয়ে উঠেছে আজ।

অভিজ্ঞ ছোকাদা বেশ আসর জমিয়েই গল্প করছিলেন। এতো জমাট যে, আমি যে কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি তা ওঁরা দেখতেই পান নি।

আমি শুনলাম, ছোকাদা হাত-পা নেড়ে বলছেন, "ওরে, এর নাম কলকাতা হাইকোর্ট। মরা হাতীও যাকে বলে কিনা, লাখ টাকা!"

"মানে," একজন বাবু ফোড়ন কাটলেন।

"মানে ; এর আর তুলনা নেই। যেমন 'বার' তেমন 'বেঞ্চি'। যত বড়ো আইনের কেষ্ট-বিষ্টু হও না কেন, এই কলকাতা হাইকোর্টেশ্বরের কাছে ছুঁচ বিক্রি করতে এসো না।"

"ওরা বুঝি সবাই ছুঁচের ব্যবসা করে?" একজন বাবু এবার ছোকাদাকে চটিয়ে দেবার জন্যে জিজ্ঞাসা করলেন।

"পাকামো করিস নি বিশে। ছুঁচ বিক্রি না করুক, চান্স পেলে আমাদের এই আবাগী কলকাতার পিছনে ছুঁচ ফোটাতে কেউ ছাড়ে না। দেখছিস না, যে পারছে সে গলা ফাটিয়ে বলছে, শহর না ট্যাঁড়স—আসলে একটা দুঃস্বপ্ন ; দুনিয়ার ওঁছা, নোংরাতম এবং ত্যাঁদড়তম জায়গা। এমন বদমেজাজী এবং ফিচেল শহর আর কোথাও পাওয়া যাবে না।"

ছোকাদার কলকাতা-প্রীতি সম্বন্ধে লেকচার হয়তো আরও অনেকক্ষণ চলতো, কিন্তু ঠিক সময়ে আমার উপর তাঁর নজর পড়লো এবং আমাকে দেখেই তাঁর বক্তৃতায় বাধা পড়ল। "আরে, এই যে ভায়া, এসো। সূর্য কী আজ পশ্চিমে উঠলো?"

আমার বসবার জায়গা করে দিয়ে ছোকাদা বললেন, "শুনে রাখো, আইনবুদ্ধিতে কলকাতা চিরকালই কলকাতা। দুনিয়া ঢুঁড়লে এমন বার-লাইব্রেরি কোথাও পাবে না। আমরা দেখেছি—লর্ড সিন্‌হা, স্যার এন এন সরকার, বিনোদ মিটার, এস এন ব্যানার্জী, এল পি ই পিউ, ল্যাংফোর্ড জেমস্। অথচ তখনই শুনেছি, বনোয়ারীবাবু বলতেন, "সে বার নেই, সে বেঞ্চিও নেই।"

"যেমন তুমি এখন দুঃখ করো, সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই", একজন বাবু ব্যঙ্গের সুরে বললেন।

ছোকাদা একটু রেগে উঠলেন। "যা বলছি, তার উপর কোনো আপিল নেই—একেবারে সুপ্রীম কোর্টের রুলিং।" একটু থেমে ছোকাদা মন্তব্য করলেন, "আমার কথা তোরা এখন কানে নিচ্ছিস না। পরে যখন এইগুলোই জড় করে কেউ লিখে দেবে, তখন হুমড়ি খেয়ে পকেট থেকে টাকা খরচ করে পড়বি। এই তো বাঙালিদের স্বভাব।"

এবার সবাই আমরা হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। "যে এবার ছোকাদার কথার স্রোতে বাধা দেবে তাকে খরচার ডিক্রি দিতে হবে। এতোগুলো লোককে চা-সিঙাড়া খাওয়াতে হবে তাকে।"

ছোকাদা আরম্ভ করলেন—

"গল্পটা তোদের বলি। শুনলে যদি তোদের চৈতন্যোদয় হয়। সবটা শুনলে বুঝতে পারবি, এ শর্মা যা বলে তা ভেবে-চিন্তেই বলে। এ তোদের আজকালকার কাউন্সেল নয়, ছাইভস্ম মুখে যা এলো তাই ধর্মাবতারের কাছে বলে গেলো ; কষ্ট হবে বলে ব্রেনটাকে একবারও খাটালো না।"

একজন বললো, "দাদা, গল্প যদি শুনতেই হয়, তবে এখানে কেন? তার থেকে পাঞ্জাবীর চায়ের দোকানে চলুন না কেন? সামনেই বাবা হাইকোর্টেশ্বর

থাকবেন। ত্রি-কাল ধরে তিনি হাইকোর্টকে রক্ষা করে এসেছেন, আমাদের সুবিধা-অসুবিধাটাও বুঝবেন। আর শনিবারের এই অসময়ে দোকান ভরিয়ে রাখলে সর্দারজীও খুশী হবে।"

"ওর তো খুশী হওয়ারই কথা", ছোকাদা বললেন। "দোকানের ওই টিবিটাতে উবু হয়ে বসে সর্দারজী এতোদিন ধরে যা আইনের গল্প শুনেছে, তাতে আমার ভয় হয় কোনদিন না দোকানে তালা লাগিয়ে আদালতে প্র্যাকটিস শুরু করে দেয়। আর একথাও তোদের বলে রাখলাম, সর্দারজী যদি প্র্যাকটিস আরম্ভ করে নেহাৎ খারাপ করবে না। এটা জেনে রাখিস, এ-লাইনে এক্সপিরিয়েন্সই সব। ওল্ড রাইস সব সময়ে ভাতে বাড়ে। যেমন এই কলকাতা হাইকোর্ট—ওল্ড রাইস। যতই অন্য জায়গায় বড়ো-বড়ো আদালতবাড়ি করো, যতই মোটা-মোটা কেতাব নিয়ে বেঁকিয়ে ইংরিজির ফোয়ারা ছোটাও, বুড়ী ক্যালকাটা ইজ্ ক্যালকাটা।"

এবার অধৈর্য হয়ে বললাম, "আপনাব গল্পটা আমরা শুনতে চাই!"

"বেশ, তোমরা তাহলে খরচার ভয়ে এখানে বসেই গ্যাঁজাতে চাও! চায়ের দোকানে যাবার ইচ্ছে নেই।" ছোকাদা বললেন। "এখানেই তাহলে গল্প শুরু করছি।"

আমরা সবাই একসঙ্গে বললাম, "শুরু করুন।"

"কিন্তু ওয়ান কন্ডিশন। আমি যখনই তোমাদের কোনো কোশ্চেন করবো, তখনই উত্তর দিতে হবে। আর যদি তোমরা মেঠো উকিলের মতো বোকা জবাব দাও, তাহলে সঙ্গে-সঙ্গে গল্প বন্ধ করে আমি উঠে চলো যাবো। মনে রেখো, এটা যা-তা কেস নয়, ইন্ডিয়ার সব নামকরা আইন রথী মহারথীরা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন—তেজবাহাদুর সপ্রু, মতিলাল নেহরু, এমন কী তোমাদের জওহরলালও।"

"উনিও বুঝি মস্ত ব্যারিস্টার ছিলেন?" আমাদের শম্ভুচরণ দাস প্রশ্ন করলেন।

ছোকাদা রেগে উঠলেন! "একি তোমাদের শেয়ার-বাজার যে আজকের ব্যাঙের ছাতা কালকে বোটানিকাল গার্ডেনের বটগাছ হয়ে যাবে! এর নাম কোর্ট। উনি আর প্র্যাকটিস করলেন কই যে বড়ো হবেন? হ্যাঁ, তবে বাপের বহু ব্রীফ ছিল, গান্ধীজীর পিছনে না ঘুরে একটু বুঝে-সুঝে যদি চালাতেন, তা হলে হয়তো বাপকেও ছাড়িয়ে যেতেন।" ছোকাদা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

ব্যারিস্টারির বাইরেও যে বিরাট জীবন আছে ছোকাদা কিছুতেই তা বুঝবেন না। পুত্র নেহরু যে পিতার গৌরবকে ম্লান করে দিয়েছেন, ছোকাদা কিছুতেই

তা স্বীকার করবেন না। প্রোফেশনকে যাঁরা অবহেলা করেছেন ছোকাদা কিছুতেই তাঁদের ক্ষমা করেন না—সে তিনি চিত্তরঞ্জন দাশ, মোহনদাস গান্ধী বা জওহরলাল নেহরু যে-ই হোন না কেন।

যা-হোক, ছোকাদা এবার শুরু করলেন—

"এ-গল্পের আরম্ভ এখানে নয়। এ-কেসের গোড়াপত্তন যখন শুরু হয়েছে তখন এই হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হয় নি। তোমরাও কেউ জন্মগ্রহণ কর নি। তোমরা কেন, তোমাদের বাবারাও তখন পৃথিবীর আলো দেখেছেন কিনা সন্দেহ। চলো পিছিয়ে যাই গত শতকের মাঝামাঝি, যখন দেশী সিপাইরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। ইংরেজের প্রেস্টিজের টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছে, রাজত্বও যায়-যায়।

"সেই দুর্দিনে বেসামাল ইংরেজকে সহায়তা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের যশোবন্ত সিংহ। কিছু জমিজমা ছিল যশোবন্ত সিংহের, আর সামান্য কিছু লোকবল। সেই নিয়েই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। ইংরেজরা তারপর অনেক কষ্টে সিপাইদের হারাল, পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দআনা হিন্দুস্থানের রাজত্বও রক্ষে পেয়ে গেলো।

"অবস্থা আয়ত্তে আসবার পর পুরনো মনিবরা দুঃখদিনের বন্ধুদের ভুললেন না। ইংরেজরা পুরস্কারের হিসেব-নিকেশ করতে বসল। যশোবন্ত সিংহ বাদ গেলেন না। তিনি পেলেন মস্ত এক জমিদারি। এক-আধ টাকার সম্পত্তি নয় হে। সেযুগে একটা টাকার কত দাম ছিল জানো তো? যখন এই এস্টেট নিয়ে মামলা বাধলো তখনই তার দাম ধরা হয়েছিল পঞ্চান্ন লাখ টাকা।

"ও-হরি, প্রথমেই মামলার কথা তুলছি কেন? সবে তো সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করেছি। ওই আমার বদস্বভাব—শেষের কথা আগে এসে যায়, আগের কথা শেষে চলে যায়, ফলে গল্প রক্ষে হয় না! তবে ভায়া, রাণী কিশোরীর এই কেসটাকে তোমরা বানানো গল্প বলে ভুল ক'রো না। ভূ-ভারতে এমন অদ্ভুত ঘটনা আর কখনও ঘটেছে বলে তো শুনি নি। এমন ঘটনা একমাত্র ঘটলেও ঘটতে পারতো কাজীদের সময়ে। তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস না করো, স্রেফ ছাপানো ল' রিপোর্টার খুলে কেস দেখিয়ে দেবো। এতে জেলা-কোর্টের জজ ছিলেন, হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস ছিলেন, প্রিভিকাউন্সিলের বাঘা-বাঘা বিচারক ছিলেন, তেজবাহাদুর সপ্রু, মতিলাল নেহরু, স্যার জন সাইমন (ওই যে, তোমাদের সাইমন কমিশনের সাইমন—যাকে কালো পতাকা দেখিয়ে বলেছিলে—গো ব্যাক সাইমন), কাটজু সাহেব, এমন কি তোমাদের জওহরলাল

নেহরুও ছিলেন। তখন অবশ্য উনি এ-সব নিয়ে....” আরও কি সব ছোকাদা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলেন।

“ওহো, আসল গল্পকে রাস্তায় বটতলায় বসিয়ে রেখে আমি কতদূর চলে এসেছি। যা বলছিলাম, যশোবন্ত সিংহের দিকে লক্ষ্মী তো মুখ তুলে চাইলেন। তিনি তখন রাজা যশোবন্ত। রাজা থাকলেই রাণী থাকতে হবে। তাঁর এক রাণীর নাম রতন কুয়ার। রতন কুয়ারের গর্ভে জন্ম নেন তাঁর একমাত্র পুত্রসন্তান বলবন্ত সিংহ। বলবন্ত সিংহের জন্ম হয়েছিল অবশ্য সিপাহী-বিদ্রোহের অনেক আগে—১৮৪১ সালে। অর্থাৎ, যে-সালে কিনা বিদ্যাসাগর মশায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে মাস্টারি করতে ঢুকলেন।”

“দাদা আবার হিস্ট্রি-ফিস্ট্রির মধ্যে কবে থেকে ঢুকলেন?” আমাদের একজন বন্ধু টিপ্পনী কাটলেন।

আর তা শুনেই ছোকাদা বেজায় চটে উঠলেন। “কেন? কুঁজো বলে চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে করে না? হাইকোর্টে বাবুগিরি করি বলে কি হিস্ট্রি-জিওগ্রাফির সঙ্গে আমাদের জুডিসিয়াল সেপারেশন হয়ে গিয়েছে? ঠিক হ্যায়, তোমরা তোমাদের রেসের ঘোড়া, থিয়েটারের মেয়েছেলে, আর সায়েবদের ব্রীফ নিয়ে বসে থাকো। এ শর্মা আর তোমাদের সামনে কোনোদিন মুখ খুলছে না। মুখে গডরেজের তালা লাগিয়ে চাবিটা এই সমুদ্রের জলে ফেলে দিলুম।”

বলবার সঙ্গে-সঙ্গে ছোকাদা এমনভাবে হাত ঘোরালেন যেন অদৃশ্য একটা তালায় চাবি লাগিয়ে সত্যই চাবিটাকে রেলিঙের উপর দিয়ে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন। আর একজন ছোকরা বাবুও মুহূর্তের মধ্যে এমনভাবে হাত নাড়লেন যে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই মূল্যবান চাবিটাকে কোনোক্রমে লুফে নিলেন। তারপর আবার সাধাসাধির পালা! আর কখনও হবে না। এই শেষ। আপনি মুখ খুলুন। যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আপনার কাসুন্দের সবচেয়ে ঘেয়ো কুকুরটাকে আমার নাম ধরে ডাকবেন, ইত্যাদি।

“বেশ, এই তোমাদের লাস্ট চান্স দিচ্ছি। তবে মনে রেখো, আপিল করতে-করতে এবার সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত তোমাদের শেষ হয়ে গেলো।” এই বলে ছোকাদা আবার আরম্ভ করলেন—

“রাজা যশোবন্ত সিংহের একমাত্র পুত্রসন্তান বলবন্ত সিংহ রাজার নয়নের মণি। কিন্তু স্বভাবে দু’জন যেন উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। অমন ধর্মভীরু সৎচরিত্র বাবার অমন দুশ্চরিত্র ছেলে! ছেলেকে সংশোধন করবার জন্য রাজা অবশেষে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করলেন—ছেলের বিয়ে দিলেন। কিন্তু এমন

পেনিসিলিনেও কাজ হলো না! ছেলের চরিত্র যেমন তেমনিই রয়ে গেলো।

"কেউ বললো, ভাগ্য! বাপের কপালে কষ্ট লেখা না থাকলে এমন ছেলে হয়?

"আবার কেউ আড়ালে বললো, 'সিপাইদের নিষ্পাপ রক্তে হিন্দুস্থানের জমি এখনও ভিজে রয়েছে। উপরের উনি যতই উদাসীন হোন কিছুই কি আর দেখছেন না?"

"এদিকে মনের দুঃখে রাজার ঘুম হয় না। হা ঈশ্বর, আমার কপালে এই ছেলে ছিল?

"তারপর একদিন মহারাজা দুঃসংবাদ পেয়ে চমকে উঠলেন। তাঁর ছেলে খুনের দায়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে। এমন-যে কোনোদিন হতে পারে তা অনেক দিন থেকেই তিনি আশঙ্কা করছিলেন। খুন! পুলিস! আদালত! তারপর ফাঁসি-কাঠ, না জেল? কে জানে?

"পুত্রস্নেহে অন্ধ রাজা কিন্তু চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না। কর্মচারীদের তলব হলো। সেরা উকিলদের ডাক পড়লো। আমার ছেলেকে রক্ষে করবার জন্য যা প্রয়োজন করুন। আপনাদের মাথায় আইনের যত কূটবুদ্ধি আছে সব আদালতে পেশ করুন। অনুগ্রহ করে আমার ছেলেকে প্রাণে বাঁচান। আমার বংশের একমাত্র পুত্র-সন্তান—আমার এই রাজত্বের একমাত্র উত্তরাধিকারী। অর্থের ব্যাপারে কোনো চিন্তা নেই—আমার রাজকোষে অনেক টাকা আছে। আপনাদের যোগ্য সম্মানমূল্য দিতে আমি একুটও দ্বিধা করবো না। রাজা যশোবন্ত সিংহ কাতর অনুনয় করলেন।

"কিন্তু বাপু, এর নাম ইংরেজ রাজত্ব! টাকা ঢাললেই কি আর সবসময় আইনের হাত থেকে ছাড়ান পাওয়া যায়! আসামীর পক্ষে উকিলরা খুব লড়লেন, রাজা যশোবন্ত সিংহের প্রচুর অর্থব্যয়ও হলো। তারপর একদিন আদালতের রায় বেরুলো। বলবন্ত সিংহের গলাটা তেলমাখানো দড়ির ফাঁস থেকে কোনোরকমে বেঁচেছে; কিন্তু যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

"কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হত্যাপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বলবন্ত সিংহ মাথা নিচু করে যেদিন নিজের দণ্ডাদেশ শুনলেন তখন তাঁর বয়স মাত্র তিরিশ বছর।

"শোকে মুহ্যমান রাজা যশোবন্ত প্রাসাদে ফিরে এসে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ১৮৭১ সালের ২রা সেপ্টেম্বর। তাঁর জীবনের পঞ্জিকা ওইখানেই এসে যেন চিরকালের জন্যে থেমে গেলো। যশোবন্ত সিংহের ছেলে খুনী! জেলখানার খাতায় একজন ঘৃণ্য অপরাধীর নামের পাশে লেখা

আছে—কয়েদীর বাবার নাম রাজা যশোবন্ত সিংহ!

"মর্মবেদনার একটা গুণ আছে। বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করে তোলে। নিজের বেদনায় কাতর হয়ে নিজেকে অনেকদিন ভুলে ছিলেন রাজা যশোবন্ত সিংহ। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি যেন আবার মনকে দৃঢ় করে বাইরের দিকে চোখ মেলে তাকালেন। ভাগ্যদেবতা তাঁকে ঐশ্বর্যে মুড়ে রাখলেও আঘাত কম দিলেন না। পুত্রের দুঃসংবাদ সহ্য করতে না পেরে বড়ো রাণীর একদিন অকালমৃত্যু হলো।

"বলবন্তের সুন্দরী স্ত্রী নারায়ণী। পুত্রবধূর দিকে তাকাতে সাহস করতে না রাজা যশোবন্ত। রাজপ্রাসাদের নির্জন কক্ষে পালঙ্কে শুয়ে-শুয়ে সে চোখের জল ফেলছে; আর তার স্বামী জেলখানার সেলে কয়েদীর পোশাক পরে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রাত্রি অতিবাহিত করছে।

"আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রাজা যশোবন্ত অন্তর্যামীকে প্রশ্ন করছিলেন, 'আর যে সহ্য হয় না। বলো কী করবো?'

"রাজা যেন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলেন তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। হিসেব করতে বসলেন তিনি। তাইতো, তিন বছর আগেই তিনি ষাট বছরের সীমানা পেরিয়ে এসেছেন! তাঁর আর কোনো আশা নেই। আর একটি পুত্রের মধ্যে দিয়ে বংশধারা রক্ষা করবার আশা চিরদিনের মতো হারিয়ে গিয়েছে।

"হয়তো পাগলা হয়ে যেতেন তিনি। কিন্তু পুত্রভাগ্য খারাপ হলেও স্ত্রীভাগ্যে তিনি গর্বিত। তাঁর কনিষ্ঠা স্ত্রী রাণী কিশোরী। সত্যি কিশোরী। তাঁর সঙ্গে অনেক বয়সের পার্থক্য ওই আলোকসামান্যা রূপসীর। রূপসী তিনি অনেক দেখেছেন। কিন্তু এ রূপসী স্বয়ং লক্ষ্মী—যেমন প্রখরা বুদ্ধিমতী তেমন কর্তব্যপরায়ণা। তাঁরই স্নেহ-প্রচ্ছায়ে এই অসহনীয় দিনগুলো কোনোক্রমে সহ্য করে চলেছেন রাজা।

"রাজা বলেন, 'রাণী, তুমি না থাকলে আমার কী যে হতো! সুখের কথা কখনও চিন্তা করলে না তুমি, সর্বদা নিজের কর্তব্যই করে গেল।'

"রাণী কিশোরী মুখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকেন। লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমার কর্তব্য তো করতে পারি নি। আপনাকে দ্বিতীয় বংশধর দিতে পারি নি। আপনার রক্তধারাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য একটি কন্যাসন্তানকে পৃথিবীতে এনেই তো চুপচাপ বসে আছি।'

"রাজা যশোবন্তের সুবিশাল দেহটা এবার কেঁপে উঠলো। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'না রাণী, তোমার কর্তব্যের এখনও শুরু হয়নি। তোমাকে আরও

অনেক দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।'

"দায়িত্ব?" রাণী চমকে উঠলেন। 'আমি স্বল্পশিক্ষিতা গৃহবধূ। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে কোনো পরিচিতি নেই। আমি কী দায়িত্ব পালন করতে পারি মহারাজ?'

"এই রাজ্যের দায়িত্ব। আমার অবর্তমানে এই রাজ্য পরিচালনার সব দায়িত্ব তোমাকেই তো গ্রহণ করতে হবে।"

"রাণী কিশোরী মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। অমঙ্গলের আশঙ্কায় তিনি মুখে আঁচল চাপা দিলেন। 'ঈশ্বরের অনুগ্রহে এ-বিষয়ে চিন্তা করার অনেক সময় পাবেন, প্রভু। এখন থেকে অযথা নিজেকে কেন যন্ত্রণা দিচ্ছেন?'

"যন্ত্রণা!" রাজা যশোবন্ত সিংহ ম্লান মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলেন। 'যন্ত্রণাকে আর ভয় পাই না কিশোরী। আমি জেনেছি, আমার কোনো পুত্র-সন্তান নেই। এটাওয়া জেলে যে-লোকটা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে সে আমার কেউ নয়। সে আমার বংশধর নয়।'

"সে কি মহারাজ, এ-সব কী বলছেন আপনি?" রাণী কাতরভাবে প্রশ্ন করলেন।

"ঠিকই বলছি রাণী, তাকে আমি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করবো ঠিক করেছি। আমার সম্পত্তিতে তার কোনো অধিকার থাকবে না। আমার যা থাকবে তা সবই তোমার—তোমার যেমন খুশী তেমনভাবে ওগুলো পরিচালনা করবে।'

"কিন্তু মহারাজ, যাবজ্জীবন মানে তো আর যাবজ্জীবন দণ্ড নয়। আপনিই তো সেদিন বললেন, পনরো-যোলো বছর পরে সে আবার ফিরে আসবে।'

"হ্যাঁ, সে নিশ্চয় ফিরে আসবে। কিন্তু অভ্যর্থনা করবার জন্য রাজপ্রাসাদে সেদিন আমি দাঁড়িয়ে থাকবো না। আর রাজপ্রাসাদের মালিক হিসেবে প্রহরীরা যে তাকে সেলাম করবে, আমার বিদেহী আত্মা তাও সহ্য করবে না।'

"রাণীর চোখে জল। রাজার চোখে কিন্তু জল নেই।

"রাণী ফিসফিস করে স্বামীকে কী যেন বললেন।

"উত্তরে নিজের মনেই যশোবন্ত সিংহ বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আমারই পুত্র-সন্তান। আমারই একমাত্র পুত্র-সন্তান। কিন্তু আমি জানবো সে নেই।'

"আইনজ্ঞদের কাছে খবর গেলো। তাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ গোপন আলোচনা করলেন যশোবন্ত সিংহ। 'আপনারা আর সময় নষ্ট না করে অবিলম্বে দলিল প্রস্তুত করুন।'

"দলিলের খসড়া লিখে নিয়ে আইনজ্ঞরা আবার রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। 'আপনার নির্দেশমতো সব কিছুই আপনার অবর্তমানে রাণী কিশোরী পাবেন। সেইভাবেই দলিল তৈরি হয়েছে।'

"হ্যাঁ", যশোবন্ত সিংহ কোনোরকমে উত্তর দিলেন।

"কিন্তু একি, রাজাকে যেন কেমন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে! 'আপনি কি নতুন কোনো বন্দোবস্তের কথা চিন্তা করছেন?' তাঁরা প্রশ্ন করলেন।

'আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে-ভেবে চিন্তার ভাণ্ডার আমি শূন্য করে ফেলেছি। আমার অপদার্থ সন্তানকে আমি কোনো অধিকারই দিয়ে যেতে পারি না। কিন্তু ধরুন, আমার পুত্রের সন্তান—আমার নাতি?'

"আপনার পুত্রের আবার সন্তান কোথায়? আপনার পুত্রবধূ রাজপ্রসাদে, আর পুত্র কারাগারে, কবে সে ফিরবে?'

"যদি?', মহারাজ কোনোরকমে শব্দটা উচ্চারণ করলেন। 'যদি। পৃথিবীতে কত যদিই তো সম্ভব হয়েছে, যদি আমার ছেলে ফিরে আসে, যদি তার সন্তান হয়?"

"কোনো যদি তো অন্তহীন নয় মহারাজ', আইনজ্ঞরা বললেন। 'কোথাও তো আপনাকে সীমারেখা টানতেই হবে।'

"হ্যাঁ, তা তো বটেই।' মহারাজ উত্তর দিলেন। 'ষোলো বছর। এই দানপত্রের ষোলো বছরের মধ্যে যদি বলবন্তের কোনো বৈধ পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে সে-ই আমার রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। রাণী কিশোরী তার হাতে সব কিছু বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন।'

"আইনজ্ঞরা রাজী হলেন। দলিল তৈরি হলো ; রাজা সই করলেন, সরকারী শিলমোহর পড়লো।

"তখন ১৮৭৫ সাল। রাজার বয়স তেষট্টি, বলবন্তের চৌত্রিশ। তখনও কেউ কী জানতো যে এমন হবে!"

ছোকাদা নিজেই আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "আসল গল্পে আমরা এখনও আসি নি। এবার সেই অংশটা শোনো।"

"১৮৭৯ সালের ২৪শে আগস্ট রাজা যশোবন্ত সিংহ তাঁর প্রিয় রাণী কিশোরী এবং প্রজাদের শোকসাগরে নিমজ্জিত করে ধরাধাম থেকে বিদায় নিলেন।

শোকের প্রথম আঘাত কাটিয়ে রাণী কিশোরী জমিদারির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এবং তারপরও আরও অনেকদিন অতিবাহিত হলো।

সে-ও আগস্ট মাস। কারাগারের লৌহকপাট একদিন ভোরে উন্মুক্ত হয়ে যাবজ্জীবন দণ্ডের এক আসামীকে বাইরে বের করে দিলো। দীর্ঘ শ্মশ্রু এবং দীর্ঘদিনের অবহেলাও সদ্যমুক্ত পুরুষটির জন্মের আভিজাত্যকে ঢাকতে পারছে না। লাখনা স্টেটের উত্তরাধিকার নিয়ে যিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁর যে এমন হবে কেউ কি জানতো? প্রৌঢ় বলবন্ত সিংহ নিঃশ্বাসে মুক্ত পৃথিবীর বায়ু গ্রহণ করলেন। ভোরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর আপন মনে হাঁটতে শুরু করলেন।

কিন্তু জেলের দরজার কাছে যেন একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে? হ্যাঁ, লাখনা এস্টেটের ফিটন গাড়ি। রাণী কিশোরী তাঁর সতীনের বিপথগামী সন্তানকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি পাঠিয়েছেন।

গাড়িতে চড়েই প্রাসাদে ফিরে এলেন বলবন্ত সিংহ। অভ্যর্থনা এবং আদর-আপ্যায়নের ক্রটি করলেন না রাণী। সময়মতো তাঁকে স্বামীর দানপত্রের কথাও জানালেন। সেই সঙ্গে বললেন, 'তবে তাতে কিছু এসে যায় না। অনেকদিন কষ্ট সহ্য করেছো। বিনা অপরাধে বৌমাও বহু কষ্ট পেয়েছেন। এবার দু'জনে মিলে সংসার করো, শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করো।'

কোনো উত্তর দিলেন না বলবন্ত সিংহ। বয়স তাঁরও কম হলো না। স্ত্রী নারায়ণীর চোখের জলও যেন বাধা মানতে চাইছে না। জীবনের বাকী ক'টা দিন বিনা উত্তেজনায় এবং বিনা অশান্তিতেই তিনি কাটাতে চান। রাণী কিশোরী তাঁর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো ক্রটিই করবেন না। বাবা তাঁকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে গিয়েছেন, কিন্তু বলবন্তের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কিছু আছে। ভালভাবেই চলে যাবে।

কিছুদিন সত্যই ভালভাবে চললো। তারপর অস্থির বলবন্ত সিংহের রাজকীয় রক্ত আবার উষ্ণ হয়ে উঠলো। অসম্ভব। বাবার ত্যজ্যপুত্র সে। অসহ্য এ অপমান। বিমাতার করুণাভিখারী হয়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের একমাত্র পুত্রকে বেঁচে থাকতে হবে! কিছুতেই নয়।

সব বাজে। কে বললে, ঐ দানপত্রের কোনো মূল্য আছে? আইনের কাছে, অন্তরাত্মার কাছে একটুকরো ঐ কাগজের কোনো মূল্য নেই। রাজা যশোবন্তের দানপত্র বে-আইনী। সম্পূর্ণ মূল্যহীন। লাখনা এস্টেটের যদি কেউ মালিক থাকে সে আমি—রাজা যশোবন্তের একমাত্র পুত্র বলবন্ত সিংহ।

শান্তভাবে বিধবা রাণী কিশোরী সপত্নীপুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 'বলবন্ত, তোমার সবরকম অনুরোধ রক্ষা করতে আমি প্রস্তুত আছি। তোমার

এবং বৌমার সুখের জন্য কোনোরকম ব্যয় করতেও আমি কার্পণ্য করবো না। কিন্তু মনে রেখো তোমার বাবার শেষ ইচ্ছা পালন করবার দায়িত্ব আমার। সেখানে আমি পর্বতের মতো অটল, কোনো আঘাতই আমার কিছু করতে পারবে না।'

হা হা করে হেসে উঠলেন বলবন্ত সিংহ।

শান্তভাবে স্বামীর ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন রাণী কিশোরী। ঠাকুরকে বললেন, 'আমায় শক্তি দাও। আমাকে দৃঢ় করো প্রভু।'

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন বলবন্ত সিংহ। আদালতে মামলা দায়ের করলেন—যশোবন্ত সিংহের দলিল আইনত অসিদ্ধ।

রাণী কর্মচারীদের ডাকলেন, মামলার তদ্বিরে যেন কোনোরকম গাফিলতি না হয়। এ-যুদ্ধে এক পা পিছিয়ে আসতে তিনি প্রস্তুত নন। আইনের লড়াই যখন শুরু হয়েছে তখন তা ভালভাবেই চলুক।

এ তো আর হাতে-হাতে যুদ্ধ নয়। জটিল আইনের কুটিল কুস্তি—ফয়সালা হতে সময় লাগে। বিশ্বযুদ্ধও এর অনেক আগে শেষ হয়ে যায়। এক আদালতে হেরে গিয়ে বলবন্ত আর এক আদালতে আপিল করেন। রাণী কিশোরীও পিছন-পিছন ছোটেন, আবার হারিয়ে দেন। আইন যে তাঁর পক্ষে—যশোবন্ত সিংহের দলিল করবার ক্ষমতা ছিল না, এ-কথা কে মেনে নেবে?

প্রতিবারে রায় বোরোয়—রাণী হাসেন এবং বলবন্ত সিংহ আরও জ্বলে ওঠেন। কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। রাণী কিশোরীকে সমুচিত শিক্ষা দিতেই হবে।

সব আদালতে হেরে গিয়েও দমলেন না বলবন্ত সিংহ। বললেন, 'ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। রাণী কিশোবী এবার বুঝতে পারবেন।'

'কী বুঝতে পারবেন?'

'শীগ্‌গিরই বুঝতে পারবেন। এখনও দানপত্রের যোলো বছর পেরিয়ে যায় নি। আমার প্রথমা স্ত্রীর আর সন্তানসম্ভাবনা নেই। আমি আবার বিয়ে করছি।'

'বিয়ে! কেন, আমি কী অপরাধ করেছি? তোমার অপরাধে আমার সমস্ত যৌবন নিষ্ফল অপেক্ষায় অতিবাহিত হয়েছে, কী অপরাধের তুমি এখন আমাকে আবার অপমান করবে?' নারায়ণী বাঈ প্রতিবাদ করেছিলেন।

বলবন্ত সিংহ উত্তর দেন নি। কর্মচারীদের বলেছিলেন, 'ঘোড়া সাজাও, নহবত বসাও। উৎসবের আয়োজন করো'—আটঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বলবন্ত সিংহ বিবাহ-বাসরে যাবেন।"

"আঠারোশো নব্বই সালের সে বিয়ের বর্ণনাও তোমাদের দিতে পারতাম" ; ছোকাদা আমাদের বললেন। রাজা-রাজড়ার বিয়ের গল্প তোমাদের ভালও লাগতো। কিন্তু, আমাদের আসল গল্প এখনও শুরু হয় নি। সবে তো বিয়ে হলো। একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলে তবে আমরা নায়কের জন্মদিনে এসে হাজির হতে পারবো।

এ-গল্পের নায়ক নরসিংহ রাও-এর জন্মদিবস আঠারোশো চুরানব্বই সালের ২রা মার্চ। আকাশে হাউই উড়লো ; বলবন্ত সিংহের নতুন প্রাসাদের অঙ্গনে বাজি ফুটলো। আশেপাশের গ্রামের লোকদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরিত হলো।

'কী ব্যাপার?'

'পরম সৌভাগ্য। ঈশ্বরের কৃপায় আমার একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমার প্রথমা স্ত্রী যা পারে নি, আমার বধূ দুন্নাজু তা দিয়েছে। লাখনারাজের বংশধারা এতোদিনে সুদৃঢ় হলো!'

রাণী কিশোরীর কাছেও যথাসময়ে খবর গেলো। রাণী প্রথমে হাসলেন। 'বলবন্তের ঔরসে দুন্নাজুর গর্ভে লাখনারাজের বংশধর জন্মগ্রহণ করেছে! বটে! তাই বুঝি এতো উৎসব, নৃত্য-নাট্য-সঙ্গীতের আয়োজন!'

রাণীর বিশ্বস্ত চররা ইতিমধ্যে গোপন অনুসন্ধান শেষ করে রাজপ্রাসাদে ফিরে এলেন। রুদ্ধদ্বার-কক্ষে সভা বসলো। রাণীর সঙ্গে সেখানে তাদের কী আলোচনা হলো কে জানে। কিন্তু সভার পরই রাও যশোবন্ত সিংহের মূল দানপত্রের খোঁজ পড়লো। মন দিয়ে সেই ঐতিহাসিক দলিল রাণী সাহেবা আবার পড়লেন। দলিলের দু'টি নকল তৈরি করা হলো।

তারপর রাণীর দু'জন বিশ্বস্ত প্রতিনিধিকে সেই নকল দু'টি নিয়ে লাখনা থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গেলো। রেল-স্টেশনে এসে তাঁরা ট্রেন ধরলেন। "তাঁরা কোথায় চললেন জানো?"—ছোকাদা আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমরা কি জান-বাড়ির জান যে, টিকিট না দেখেই কে কোথায় যাচ্ছে বলে দেবো?" একজন বাবু রেগে উত্তর দিলেন।

ছোকাদা কিন্তু রাগ করলেন না। হেসে বললেন, "তাঁদের একজন এলাহাবাদ স্টেশনে নেমে গেলেন। তিনি দেখা করবেন উকিল মতিলাল নেহরুর সঙ্গে। আর একজন সোজা চললেন কলকাতায়।"

মতিলাল নেহরু রাণীর দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? রাণীসাহেবার খবর ভাল তো?'

'আজ্ঞে, বলবন্ত সিংহ ঘোষণা করেছেন, তাঁর একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। দানপত্রের মেয়াদ শেষ হবার কয়েক মাস আগেই। কিন্তু রাণীসাহেবা বিশেষ সূত্রে সংবাদ পেয়েছেন খবরটা সম্পূর্ণ মিথ্যে। একেবারে সাজানো। নরসিংহ রাও বলে যে শিশুটিকে বলবন্ত সিংহ বুকে করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার জন্মের পিছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। নরসিংহ রাও আর যাই হোক, বলবন্ত সিংহ এবং দুন্নাজুর সন্তান নয়।'

মতিলাল নেহরু কাগজপত্তর ঘাঁটলেন। ছোকরা আইনজ্ঞ মতিলাল, তখন মাত্র তেত্রিশ বছর বয়েস। ফাইল থেকে মুখ তুলে তিনি বললেন, 'তাই তো, খবরটা মোটেই ভাল নয়। এখনই এই ষড়যন্ত্র ফাঁস না-করলে ভবিষ্যতে যথেষ্ট বিপদ ঘটতে পারে।'

মতিলাল নেহরু তাঁর মতামত লিখলেন—'আমার মনে হয়, রাণীসাহেবা এখনই আদালতে মামলা করুন। আদলতকে ঘোষণা করতে বলা হোক : নরসিংহ রাও বলবন্ত সিংহের সন্তান নয়।'

এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল রাণীর প্রতিনিধিকে বললেন, 'আপনার কাছে সমস্ত ঘটনা তো শুনলাম। দলিলটা আজকের মতো রেখে যান।'

কয়েকদিন পরে রাণীর প্রতিনিধি আবার খোঁজ নিতে এলেন। বললেন, 'বলবন্ত সিংহের ষড়যন্ত্র কি সর্বনাশা বুঝুন। তাকে বুদ্ধি দেবার জন্য অনেক বাঘা-বাঘা আইনজ্ঞের মাথা খাটছে। আমরা এখন থেকে সাবধান না-হলে ওরা আমাদের ক্ষতি করবার চেষ্টা চালাবে।'

অ্যাডভোকেট-জেনারেল ব্যস্ত মানুষ। তাঁর কানে যেন কোনো কথাই পৌঁছল না। একটা কাগজে নিজের হাতে লিখে দিলেন, 'দলিলটা মন দিয়ে পড়লাম। অনেক গণ্ডগোল আছে। রাণী কিশোরীর বর্তমানে নিজেকে ব্যস্ত করবার কোনো প্রয়োজন নেই।'

দুটি মতামতই রাণী শুনলেন। তাঁর নিজেরও তখন কোর্টে যেতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল। একটি নবজাত শিশু তার তথাকথিত পিতা-মাতার সন্তান নয়, এই অভিযোগ নিয়ে আদালতে যেতে তাঁর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না।

কর্মচারীরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করবেন?'

রাণী বললেন, 'মনস্থির করে উঠতে পারছি না। আরও কিছুদিন যাক।'

রাণী কিশোরীর মৃত্যুবাণ এদিকে বলবন্ত সিংহের কোলে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে। বলবন্ত ডাকেন—রাও নরসিংহ! নবজাত শিশু বলবন্তের নয়নের মণি

হয়ে উঠেছে। সর্বদা তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন তিনি। এক মুহূর্তের জন্যও সঙ্গছাড়া করতে চান না। উৎসব-অনুষ্ঠানে ইংরেজ কালেক্টর, ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন ঃ আমার একমাত্র বংশধর। এই শিশু, সে যারই হোক না কেন, বলবন্তের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে এলো। যে-বলবন্ত পঁচিশ বছর আগে জেলে গিয়েছিল এ-বলবন্ত যেন সে নয়।

সে বুঝি ১৮৯৯ সালের কথা। নরসিংহ রাওয়ের মায়া কাটিয়ে রাজা যশোবন্ত সিংহের হতভাগ্য বংশধর বলবন্ত সিংহ ওপারের উদ্দেশে রওনা হলেন।

আবার গোলযোগের সূচনা হল। রাণী কিশোরীর আশ্রিতা, বলবন্তের প্রথমা পত্নী নারায়ণী বললেন, 'আমি আর সহ্য করবো না। বলবন্তের কোনো পুত্রসন্তান নেই ঘোষণা করা হোক।'

কর্তৃপক্ষের কাছে নারায়ণী আবেদন করলেন, মৃত বলবন্তের সম্পত্তি দু'জন অপুত্রক বিধবা—নারায়ণী এবং দুন্নাজুর মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হোক। নরসিংহ রাও এর মধ্যে আসেনই না।

দুন্নাজু উত্তর দিলেন, 'বলবন্ত সিংহের সম্পত্তিতে আমাদের দু'জনের কোনো অধিকার নেই। সে অধিকার একমাত্র আমার নাবালক পুত্রের।'

নারায়ণী জানালেন, 'আর লোক হাসিও না। ও-ছেলে যে তোমার গর্ভজাত নয় তা আমাদের জানতে বাকী নেই। যদি সে তোমারই সন্তান, তবে ডাক্তার ডাকছি, পরীক্ষা দাও তার কাছে।'

রেভিনিউ কোর্টের কাছে দুন্নাজু কাতর আবেদন জানালেন। 'আমি নাবালক পুত্র নিয়ে স্বামী হারিয়েছি। সুযোগ পেয়ে ওরা হিন্দু বিধবার সম্মান নিয়ে টানাটানি করছে।'

রেভিনিউ কোর্ট নারায়ণীর অভিযোগে কান দিলেন না। নরসিংহ রাওকেই তাঁরা উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করে নিলেন ; বংশগত 'রাও' উপাধি ব্যবহারের অধিকারও এই ছ'বছরের বালককে দেওয়া হলো। নাবালকের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোর্ট অফ ওয়ার্ডের ব্যবস্থা হলো।

কোর্ট অফ ওয়ার্ড নরসিংহকে ভাল ইস্কুলে পাঠালেন। সেইখানে সে পড়াশোনা করতে লাগলো। অনেকে রাণী কিশোরীকে পরামর্শ দিলেন, 'আপনার নাতিটিকে আপনিই দেখাশোনা করুন।'

'নাতি? আমার কোনো নাতি নেই!' রাণী ঘৃণাভরে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

আর বালক নরসিংহ রাও দিন গুনতে লাগলো, কবে সে সাবালক হবে।

১৯১৫ সালে নরসিংহ রাও একুশ বছরে পড়লেন। এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই রাণী কিশোরী নোটিস পেলেন—'আমি বলবন্ত সিংহের পুত্র নরসিংহ রাও। আমার পিতামহ রাজা যশোবন্ত সিংহের ব্যবস্থামতো লাখনা এস্টেটের মালিকানা এখন থেকে আমার। কয়েকদিন আগে আমি বয়োপ্রাপ্ত হয়েছি। সুতরাং রাজ্যের দায়িত্ব এবং হিসেব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বুঝে নিতে চাই।'

রাণী কিশোরী স্তম্ভিত। এতোদিন পরে এমন নোটিস যে আসতে পারে তা তাঁর কল্পনাতেই আসে নি।

রাও নরসিংহ সময় নষ্ট করলেন না, আদালতে মামলা দায়ের করলেন। সে-মামলার বিবরণ যখন কাগজে প্রকাশিত হলো তখন সমস্ত উত্তর ভারত চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিচারকের রায়ের উপর পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার জমিদারি এবং অগাধ সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এমন অদ্ভুত মামলার কথাও কেউ কখনো শোনে নি। মনে রেখো, ভাওয়াল মামলা তখনও শুরু হয় নি, ভাওয়ালের মেজোকুমারকে তখনও সকলে মৃত বলেই জানে। দার্জিলিং-এর স্টেপ-অ্যাসাইড থেকে তাঁর মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁর দেহের সৎকার হয়েছে বলেই তখনো লোকে জানে।"—ছোকাদা আমাদের মনে করিয়ে দিলেন।

আমাদের কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে ছোকাদা আবার আরম্ভ করলেন—"মতিলাল নেহরু সমস্ত ব্রীফটা পড়লেন। 'সঙ্গে জুনিয়র জওহরলালকে নিয়েছেন। ব্রীফটা মুড়তে-মুড়তে বললেন, তখনই বলেছিলাম। একুশ বছর আগে রাণী কিশোরীকে মামলা করতে উপদেশ দিয়েছিলাম।'

রাণী কিশোরী প্রথমে চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমি স্থির জানি, নরসিংহ ওদের সন্তান নয়। দুন্নাজু কোনো সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে নি।'

মতিলাল নেহরু হাসলেন। 'একুশ বছর আগে ষড়যন্ত্রটা ফাঁস করবার চেষ্টা করলে কতো ভাল হতো। তখন অনেক প্রমাণও হয়তো পাওয়া যেতে পারতো। এখন কঠিন লড়াই।' পাশের একজন জুনিয়রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী বলো?'

'তা তো বটেই!' জুনিয়র উত্তর দিলেন। 'বিশেষ করে যখন অপরপক্ষে ডক্টর তেজবাহাদুর সপ্রুর মতো ব্যারিস্টার রয়েছেন, তখন আমাদের লড়াইটা খুব সহজ হবে না।'

'আমি জানি, আমাকে বিপদে ফেলবার জন্য এবং নিজের বাবার উপর

প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বলবন্ত এই বিষবৃক্ষ পুঁতেছিল। বলবন্ত আজ আর নেই, কিন্তু তার চারাগাছে এতোদিনে ফল ধরেছে। কিন্তু আমিও রাণী কিশোরী।'

'আমাদের কী বক্তব্য হবে? নরসিংহের দাবির বিরুদ্ধে আমাদের কী বলবার আছে?' আইন-উপদেষ্টারা প্রশ্ন করলেন।

'বলবার একটি মাত্র বিষয় আছে। বলবন্ত সিংহের ঔরসে কোনোদিন কোনো সন্তান জন্মগ্রহণ করে নি। সে অপুত্রক অবস্থায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।' রাণী স্পষ্ট উত্তর দিলেন।

'তাহলে? এমন অদ্ভুত ষড়যন্ত্র পৃথিবীর ইতিহাসে বড়ো একটা হয় নি।' ওঁরা বললেন।

জেলা আদালত লোকে লোকারণ্য। আইনজগতের এতোগুলো তারকার একত্র আবির্ভাবে এই সামান্য আদালত নতুন রূপ ধারণ করেছে।

ডক্টর তেজবাহাদুর সপ্রু তখনও বড়লাটের ল' মেম্বার হন নি। সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর বিরাট প্রতিপত্তি। যেখানেই দুরূহ মামলা, যেখানেই আইনের চুল-চেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন, সেখানেই সপ্রু সায়েবকে দেখা যায়। এমন কি তোমাদের এই কলকাতা হাইকোর্টেও।

ডক্টর সপ্রু বললেন, 'ইওর অনার, আমার ক্লায়েন্টের কেস খুবই সহজ। এক ভদ্রলোক লিখিত দলিলের মাধ্যমে তাঁর বিপথগামী পুত্রসন্তানকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার স্ত্রীর উপর দেন—যত দিন না তাঁর পুত্রের কোনো সন্তান হয়। সেই পুত্রটি একুশ বছর আগে জন্মগ্রহণ করে ; এখন সে বয়োপ্রাপ্ত হয়েছে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে লাখনা রাজ্যের মালিকানা দাবি করছে।'

মতিলাল নেহরু বললেন, 'কেস্ এত সোজা হলে, ইওর অনার, তেজবাহাদুরের মতো বিখ্যাত আইনজ্ঞ আজ এখানে উপস্থিত থাকতেন না। এই কেসের পিছনে দীর্ঘদিনের যে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে তা আলোচনা করবার স্থান দুর্ভাগ্যক্রমে এই আদালত নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা ঃ মৃত বলবন্ত সিংহের কনিষ্ঠা স্ত্রীর কোনোদিন কি সন্তান-ধারণের দৈহিক সৌভাগ্য হয়েছিল? যদি হয়েই থাকে, তবে সে-বিষয়ে বাদী পক্ষ কোনোরকম সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে কেন কুণ্ঠাবোধ করছেন?'

সত্যি, ঐ বিষয়ে প্রমাণ হাজির করবার কোনো উৎসাহই বাদীপক্ষ দেখাচ্ছিলেন না। জেলা জজ একটু চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

তখন সবার সহানুভূতি রাণী কিশোরীর দিকে। তিনি বলছেন, 'কোথাকার কে এক অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের হাতে জমিদারি তুলে দেবার জন্য আমার স্বামী

আমাকে দায়িত্বভার দিয়ে যান নি।'

এই রহস্যে একমাত্র যিনি আলোকপাত করতে পারেন তাঁর নাম দুন্নাজু। একমাত্র তিনিই জানেন নরসিংহ রাও কার সন্তান। তাঁর এবং বলবন্ত সিংহের? না, কোনো গভীর রাত্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্য কোনো শিশুকে গোপনে প্রাসাদে আনা হয়েছিল? ঘোষণা করা হয়েছিল—'বার্থ : টু বলবন্ত সিংহ অ্যান্ড দুন্নাজু, এ বয় অন সেকেণ্ড মার্চ, এইট্টিন নাইনটি ফোর। বোথ মাদার অ্যান্ড সন ডুইং ওয়েল।'

এই কাহিনীর চাবিকাঠি যে-রমণীর হাতে তিনি কিন্তু পর্দানশীন। অর্থাৎ রাজদ্বারে সবার সমক্ষে হাজির হতে কেউ তাঁকে বাধ্য করতে পারে না। যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, আদালত অন্তঃপুরে যাবেন। পর্দার আড়ালে তিনি আসন গ্রহণ করবেন, আর অন্যদিকে বসবেন বিচারক এবং দু'পক্ষের ব্যারিস্টার।

এই দীর্ঘ মামলায় সাক্ষ্য নিতে এবং তা লিখে রাখতে সময় লাগে। পিতৃত্ব সম্বন্ধে আলোকপাত করবার জন্য বলবন্ত সিংহ আজ বেঁচে নেই। যাঁর মাতৃত্ব সম্বন্ধেও গভীর সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ করতেও সময় লাগছিল। মাতৃত্বের প্রমাণ দেবার জন্য বলবন্তের স্ত্রী ডাক্তারী পরীক্ষা দিতে রাজী নন। সে-কথা উঠলেই তিনি গম্ভীর হয়ে ওঠেন ; উত্তর দেন না।

মতিলালের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আর ডক্টর সপ্রুর মুখের দিকে তাকালেই দুর্যোগের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

'তাহলে আপনি ডাক্তারী পরীক্ষাতে রাজী নন?' অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে মতিলাল আর একবার দুন্নাজুকে জিজ্ঞাসা করেন।

তখন যে এমন উত্তর আসবে তা কেউ কল্পনা করে নি। জেরাতে জর্জরিত দুন্নাজু পর্দার আড়াল থেকে জ্বলে উঠলেন। বললেন, 'আমি রাজী আছি। একজন কেন? একশোজন ডাক্তারকে আমি আমার দেহ পরীক্ষা দিতে রাজী আছি, যদি রাণীসাহেবা পয়সা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ না করেন। কিন্তু পরীক্ষার আগে রাণী কিশোরী কথা দিন যে, যদি প্রমাণ হয় আমার দেহে সন্তান প্রসবের চিহ্ন আছে তাহলে তিনি নরসিংহকে এখনই জমিদারি দিয়ে দেবেন।'

ঘরের মধ্যে যেন বাজ পড়লো। এমন পরিস্থিতির জন্য মতিলাল নেহরু মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ডক্টর তেজবাহাদুর সপ্রু এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন। 'তাহলে এই শর্তে আমার বন্ধু রাজী আছেন তো?'

মতিলাল আমতা-আঁমতা করতে লাগলেন। বিচারক বললেন, 'কেন? এই

ডাক্তারী পরীক্ষার জন্যই তো আপনি বরাবর দাবি জানাচ্ছিলেন!'

'ইওর অনার, আমি এখনই কোনো কথা দিতে পারছি না। ক্লায়েন্টের সঙ্গে পরামর্শের জন্য আমি সময় প্রার্থনা করছি।'

'সামান্য এই ব্যাপারের জন্য সময় প্রার্থনা কেন?' ডক্টর সপ্রুর কণ্ঠে শ্লেষের সুর! 'যদি বিবাদি পক্ষ নরসিংহ-এর মাতৃত্ব-ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে এতোটাই নিঃসন্দেহ থাকেন, তবে ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রমাণিত হবেই দুন্নাজু কোনোদিন গর্ভে সন্তান-ধারণ করেন নি।'

মতিলাল বললেন, 'ইওর অনার, আমাকে কয়েকদিন সময় দেওয়া হোক।'

প্রার্থনা মঞ্জুর হলো। কিন্তু এক মুহূর্তে যেন সমস্ত অবস্থার পরিবর্তন হলো। কী করবেন মতিলাল? বিধবার এই বিরাট সম্পত্তি একটা ডাক্তারী পরীক্ষায় লটারী খেলবেন? রাণীসাহেবার কোনো সন্দেহ নেই, ডাক্তারী পরীক্ষায় তাঁর সন্দেহ সত্য প্রমাণিত হবে। কিন্তু আইনজ্ঞ হিসেবে নেহরু আর কোনো সাবধানতা অবলম্বন না করে, বিধবা মহিলাকে কী করে এতো বড়ো ঝুঁকি নিতে পরামর্শ দেবেন?

তছাড়া ডাক্তারী শাস্ত্রের সমস্যাও রয়েছে। দেশ-বিদেশের বিখ্যাত ডাক্তারদের কাছ থেকে লিখিত উপদেশ নিলেন মতিলাল। এই অবস্থায় এতোদিন পরে দেহপরীক্ষা করে কোনো নারী সন্তান ধারণ করেছেন কিনা তা বলা সম্ভব কী? ডাক্তাররা জানালেন, তা সম্ভব। এমন কিছু কঠিন পরীক্ষা নয়।

এ-দিকে সাধারণের সহানুভূতি তখন সম্পূর্ণ নরসিংহ রাও-এর পক্ষে। 'বেচারার মা যখন ডাক্তারী পরীক্ষা দতে রাজী হলেন তখন রাণী কেন পিছিয়ে যাচ্ছেন?' তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন।

বেশ কিছুদিন পরে রাণী কিশোরীর পক্ষে আদালতে আবার আবেদন করা হলো। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত। ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা হোক। সমস্ত দেশ তখন সেই পরীক্ষার ফলাফল জানবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

ডাক্তার ঠিক করা হলো। দিন ঠিক হলো। রাণী কিশোরীর আইনজ্ঞদের চোখে এখন ঘুম নেই। এই জুয়াখেলার ফলাফল কী হবে কে জানে?

কিন্তু এই রহস্যের শেষ যদি অত সহজেই হতো তাহলে তো কথাই ছিল না! নির্দিষ্ট দিনে যন্ত্রপাতি সমেত বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা বিফলমনোরথ হয়ে দুন্নাজুর প্রাসাদ থেকে ফিরে এলেন। বলবন্ত সিংহের বিধবা দরজা খুললেন না; তিনি দেহ পরীক্ষায় রাজী নন। কোনো আবেদন-নিবেদনেই ফল হয়নি।

মতিলাল নেহরুর মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'ইওর অনার, আমার আর কোনো কথা বলার প্রয়োজন আছে কী? দিনের আলোর মতো সমস্ত ব্যাপারটা স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে।'

আর বেশী সময়ের অপচয় হলো না। সবাই যেন রহস্যটা এবার বুঝতে পেরেছেন। নরসিংহ রাও হেরে গেলেন। তাঁর মামলা ডিসমিস হলো।

তবু হাইকোর্টে আপীল করলেন নরসিংহ রাও। সেখানেও কোনো ফল হলো না। চীফ জাস্টিস এবং আর একজন বিচারপতি মন্তব্য করলেন, 'বলবন্ত সিংহের বিধবাকে আমরা এখনও সুযোগ দিতে প্রস্তুত আছি। ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়ে তিনি মাতৃত্বের দাবি প্রতিষ্ঠা করুন।'

দুন্নাজুর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়া গেলো না। আপীলেও হেরে গেলেন রাও নরসিংহ। কোর্ট তাঁদের রায়ে বললেন, 'দৈহিক জেরার সামনে (ফিজিক্যাল ক্রশ এগজামিনেশন) দাঁড়াতে রাজী না হয়ে দুন্নাজু-এ-কেস্ নষ্ট করেছেন।'

যে-মানুষটা জানতো সে বলবন্ত সিংহের পুত্র এবং সাধারণের অনেকেই যা বিশ্বাস করতো সে-মানুষটার অবস্থা একবার ভেবে দেখো। শুধু লাখনার রাজত্ব নয়, তার সঙ্গে তার পিতৃত্ব পর্যন্ত কলুষিত হয়ে উঠলো। শুধু ধনে নয়, সম্মানেও ধ্বংস হলো হতভাগ্য নরসিংহ রাও।"

ছোকাদা এবার থামলেন। তারপর বললেন, "মেয়েদের মন যে কি দুর্জ্ঞেয় রহস্যে ঢাকা কে জানে।'

একটা বিড়ি ধরিয়ে ছোকাদা প্রশ্ন করলেন, "সমস্ত ব্যাপারটা তোমরা তো শুনলে, এখন বলো তো তোমাদের কী মনে হয়? নরসিংহ রাও সত্যই কী দুন্নাজুর সন্তান?"

"নিশ্চয়ই নয়। তা যদি হতো তাহলে ডাক্তারের মুখের তিনি দরজা বন্ধ করে দিতেন না।" হারুবাবু মন্তব্য করলেন।

সেন সায়েবের বাবু বললেন, "আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম, রাণী কিশোরী যা বলছেন তাই ঠিক। রাজত্বটি পাবার লোভে কোথা থেকে একটা ছেলে যোগাড় করে এনেছিল। পয়সা থাকলে আগেকার দিনে ও সব আকছার হতো। এখনও হচ্ছে।"

ব্যারিস্টার চ্যাটার্জীর বাবু হরেন মান্না বললেন, "তোর বাজে বকিস না। যদি ছেলে গর্ভে নাই ধরে থাকবেন তবে ভদ্রমহিলা কোন সাহসে মতিলালকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন?"

"ওইটাই তো গণ্ডগোলের ব্যাপার।"—হারুবাবু বললেন। "ভদ্রমহিলা হয়তো ভেবেছিলেন রাণী কিশোরী ওই চ্যালেঞ্জ শুনেই ঘাবড়ে যাবেন। মামলা মিটমাটের চেষ্টা করবেন।"

ব্যারিস্টার এস কে বিশ্বাস সায়েবের হাতে অনেক বিবাহঘটিত কেস্। তাঁর বাবু বললেন, "জিনিসটা অত সহজ নয় হে, হয়তো কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়বার ভয় ছিল।"

"মানে?" ছোকাদা জিজ্ঞাসা করলেন।

"মানে আবার কী! বড়োঘরের বড়ো-বড়ো ব্যাপার জানোই তো।"

হারুবাবু একটু সেন্টিমেন্টাল। বললেন, "আহা হাজার হোক গর্ভধারিণী মা তো। নিজের ক্ষতি হবার ভয়ে ছেলের অতবড়ো সর্বনাশ কখনও কেউ করতে পারে? আমি অন্তত বিশ্বাস করি না।"

হরেন মান্না বললেন, "যাই বলো, যদি আসলে তার ছেলে নাই হয়, তাহলে নরসিংহ যখন কেস করলে তখনই দুন্নাজুর বারণ করা উচিত ছিল।"

হারুবাবু বললেন, "তুমি তো বলেই খালাস। কিন্তু মায়ের সাইকোলজিটা বোঝো। বেচারা নরসিংহ জানে, সে তার মায়েরই সন্তান। মা অথচ তাকে এতোদিন মিথ্যে বলে এসেছে। যখন ছেলে বললো কেস্ করবো, তখন বাধা দিলেই তো মা ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া মা তখন জানতো না যে রাণী কিশোরী ডাক্তারী পরীক্ষা চাইবেন।"

আমাদের যজ্ঞেশ্বরদা এতক্ষণ এক কোণে চুপ করে বসেছিলেন। তিনি বললেন, "তবে যাই বলো ভাই, এটা বুঝতে পারছি এর মধ্যে কিছু রহস্য ছিল এবং দুঃখের বিষয়, সে-রহস্য আর কোনোদিন সমাধান হবে না।"

ছোকাদা একবার নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করলেন, "সে-রহস্য যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। এখন সেই গল্পই তোমাদের শোনাবো।"

হারুবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "তাহলে গল্পের শেষ হয় নি?"

"শেষ কী রে হতভাগা! সবে তো অর্ধেক হয়েছে।"—এই বলে ছোকাদা আবার শুরু করলেন।

"হাইকোর্টে মামলা জিতে রাণী কিশোরী নিশ্চিত হলেন। স্বামীর দেওয়া দায়িত্ব পালন করতে তিনি যে ব্যর্থ হন নি এই বিশ্বাস নিয়েই একমাত্র কন্যাকে রেখে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলেন।

কিন্তু নরসিংহ রাও তখনও আশা ছাড়েন নি। তিনি হাইকোর্টে আবেদন করলেন, 'ধর্মাবতার, আমাকে ইংলন্ডের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করবার

অনুমতি দিন।' হাইকোর্ট কিন্তু সে আবেদন না-মঞ্জুর করলেন।

ইংরেজের আদালতে জিততে গেলে যে-বস্তুটি সবচেয়ে প্রয়োজন, সেই ধৈর্যের কোনো অভাব নরসিংহের মধ্যে ছিল না। তিনি লিখলেন, 'ধর্মাবতার, এই মামলার জন্য আমি সর্বস্ব হারাতে বসেছি। আমার মাকে এতদিনে ডাক্তারী পরীক্ষায় রাজী করাতে পেরেছি।' হাইকোর্ট সেই আবেদনও বাতিল করলেন।

নরসিংহ কিন্তু নাছোড়বান্দা। এর শেষ তিনি দেখবেনই। তিনি বিশেষ অনুমতির জন্য সোজা প্রিভিকাউন্সিলে আবেদন করলেন। আবেদন করেই তিনি বসে রইলেন না। কিছু পয়সা যোগাড় করে একদিন বোম্বাই থেকে বিলেতগামী জাহাজে চেপে বসলেন তিনি।

এবার কেন্দ্র লন্ডন। স্থান জুডিসিয়াল কমিটি অফ প্রিভিকাউন্সিলের কোর্ট। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারালয় হিসেবে এর খ্যাতির কথা কে না জানে? তোমরা তো দেখছো, স্বাধীনতার পরও কত বছর হয়ে গেলো, এখনও আমাদের সায়েবদের কথায়-কথায় প্রিভিকাউন্সিলের রায়ের শরণাপন্ন হতে হয়।

বিচারকরা আইনের বই ছাড়া কিছুতেই উৎসুক বা বিচলিত হন না। কিন্তু নরসিংহের করুণ কাহিনী তাঁদেরও হৃদয় স্পর্শ করলো।

নরসিংহ রাও বললেন, 'ধর্মাবতার, আমার বিধবা মাকে হাতে-পায়ে ধরে বিলেতে নিয়ে এসেছি। তিনি অন্য এক ঘরে ঘোমটার আড়ালে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করে আমার জীবন রক্ষা করুন।'

প্রিভিকাউন্সিলের ইতিহাসে যা হয় নি এবার তাই হলো। তাঁরা ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করালেন। বিচারকরা গোপনে দু'জন নামকরা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদকে ঠিক করে রাখলেন। কারা পরীক্ষা করবেন, কী পরীক্ষা করবেন তা জানানো হলো না ; শুধু একটি নির্দিষ্ট জায়গায় ভদ্রমহিলাকে অপেক্ষা করতে বলা হলো। সেই নির্দিষ্ট দিনে লন্ডনের দু'জন খ্যাতনামা চিকিৎসককে দুন্নাজুর ঘরে ঢুকে যেতে দেখা গেলো। দুন্নাজু এবার কোনো বাধা দিলেন না।

পরীক্ষা শেষ করে চিকিৎসকরা রুদ্ধদ্বার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন। 'ইওর লর্ডশিপস, আমরা এই হিন্দু বিধবাটিকে পরীক্ষা করে দেখছি।'

'তিনি কি কোনোদিন মা হয়েছিলেন?'

'নিশ্চয়ই হয়েছিলেন। সন্তানধারণের সমস্ত লক্ষণই ওঁর দেহে রয়েছে।'

তাহলে বলবন্ত সিংহ তাঁর সন্তানের জন্ম সম্বন্ধে যে ঘোষণা করেছিলেন তা মিথ্যা নয়। নরসিংহ রাও তাঁর পিতৃত্ব প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

প্রিভিকাউন্সিল হুকুম করলেন, এই ডাক্তারী সার্টিফিকেট এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। সেখানে তারপর থেকে আবার কেস চলুক।

কিন্তু দুন্নাজু বলে যে মহিলাকে ডাক্তাররা পরীক্ষা করলেন তিনিই দুন্নাজু কিনা কে জানে?

প্রিভিকাউন্সিল অবশ্য আগে থেকেই সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তাররা যাঁকে পরীক্ষা করেছেন তাঁর সনাক্তকরণের জন্য আঙ্গুলের ছাপ এবং ছবি তুলে নেওয়া হয়েছিল।

এবার এলাহাবাদ হাইকোর্ট। আইনের দিকপালরা আবার কোর্ট রুমে জড়ো হয়েছেন। মতিলাল নেহরু, ডক্টর কৈলাশনাথ কাটজু, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু। আদালতে সাক্ষী দিচ্ছেন নরসিংহ রাও। অন্য এক ঘরে বসে রয়েছেন দুন্নাজু। মতিলাল নেহরু আবার সেই প্রশ্ন তুললেন—'প্রিভিকাউন্সিলের আদেশে ডাক্তাররা যাঁকে পরীক্ষা করেছিলেন তিনিই কি দুন্নাজু?'

জজ বললেন, 'সব সমস্যা সমাধান হয় যদি মিস্টার নেহরু আপনার মাকে একবার দেখতে পান। তিনি বিলেতের ফটোর সঙ্গে আপনার মায়ের মুখ মিলিয়ে নিতে পারবেন।'

সাক্ষী কিছুতেই রাজী নয়। 'ধর্মাবতার, আমার মা হিন্দু বিধবা, তিনি কেন অন্য পক্ষের ব্যারিস্টারের কাছে মুখ দেখাতে যাবেন?'

'তাহলে কেসে সময় লাগবে। দেরির জন্যে আপনি তো কম ভুগলেন না।' জজ বললেন।

'দরকার হয়, ধর্মাবতার আপনি চলুন, কিন্তু অন্য লোক কেন?' নরসিংহ রাও প্রতিবাদ করলেন।

বিচারকরা তখন আবার বুঝোতে শুরু করলেন। এবং নরসিংহ রাও শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রস্তাবে রাজী হলেন।

প্রধান বিচারপতি, নরসিংহ রাওয়ের ব্যারিস্টার স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং রাণী কিশোরীর মেয়ে বেটী লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রতিনিধি হিসাবে মতিলাল নেহরু এক-সঙ্গে পাশের ঘরে চললেন।

অনেকে ভেবেছিল, তাঁদের বেরিয়ে আসতে বহু সময় লাগবে। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিট। বিচারপতি এবং দু'জন ব্যারিস্টার মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলেন।

আবার কোর্ট শুরু হলো। মতিলাল নেহরু বিরস-বদনে বললেন, 'মাই লর্ড, বিলেত থেকে যে ছবি পাঠানো হয়েছে তা যে দুন্নাজুর ছবি সে-সম্বন্ধে আমার

মনে কোনো সন্দেহ নেই।'

আইন-যুদ্ধের আর অল্পই অবশিষ্ট রইলো। এমন অবস্থায় অনেকদিন আগে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল রাণী কিশোরীকে যে লিখিত মতামত দিয়েছিলেন তারও ডাক পড়লো। কিন্তু এলাহাবাদে হাইকোর্ট রায় দিলেন—'নরসিংহ রাও জিতেছেন, লাখনার রাজত্ব তাঁরই।'

"কিন্তু হায়রে অদৃষ্ট!" ছোকাদা বললেন। "কেস আবার চললো প্রিভিকাউন্সিলে।"

সেখানে বেটী লক্ষ্মীবাঈ-এর হয়ে কেস করলেন স্যার জন সাইমন। তিনি বললেন, 'আমি স্বীকার করছি, নরসিংহ রাও বলবন্ত সিংহের ছেলে। কিন্তু, (এবার তিনি কলকাতার অ্যাডভোকেট-জেনারেলের আইনের প্যাঁচটা প্রয়োগ করলেন) যশোবন্ত সিংহ নাতিকে সম্পত্তি দেবার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা আইন-বিরোধী। ওটার কোনো মূল্য নেই।'

প্রিভিকাউন্সিলও অবাক হয়ে দেখলেন, সত্যি তাই। দলিলের সেই প্রয়োজনীয় অংশটা ব্যাড ইন ল।

রাজা যশোবন্ত সিংহের বংশধর নরসিংহ রাও তেরো বছর ধরে মামলা করে জিতেও হেরে গেলেন। প্রমাণিত হলো তিনি বলবন্ত সিংহের সন্তান, কিন্তু সম্পত্তির অধিকারী নন। এতোদিন ধরে অর্থ এবং সময় ব্যয় করবার পর আবিষ্কৃত হলো দ'পক্ষ ছায়া নিয়ে লড়াই করছিলেন। কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল ১৮৯৪ সালে যে মতামত দিয়ে গিয়েছিলেন তাই ঠিক।"

ছোকাদা এবার একটা বিড়ি ধরালেন। বিড়িতে টান দিয়ে বললেন, "আমি এর থেকে কোনো নীতি প্রচার করতে চাইনে। তোমরা তো বলবে আমি কলকাতার কোনো দোষ দেখতে পারি না। কিন্তু তোমরা এবার যা বোঝবার বুঝে নাও। এতো আর আমার বানানো গল্প নয়।"

গল্প শেষ হলো। আমরা এতেই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে মন্তব্য করার সামর্থ্যও ছিল না। হাইকোর্ট নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছিলাম না। আমি ভাবছিলাম, বেচারা নরসিংহ রাওয়ের কথা—সর্বস্ব ব্যয় করে, সাফল্যের সিংহদ্বারে এসে যিনি দেখলেন কোনো কিছুই তাঁর নয়।

কৌতূহল বেড়ে গিয়েছিল। জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আইনের কোন কূট তর্কে নরসিংহ রাও তাঁর জন্মগত অধিকার থেকে এমন নির্মমভাবে বঞ্চিত হলেন। ছোকাদা সংক্ষেপে তা বুঝিয়ে দিলেন।

বললেন, "ব্যাপারটা শুনলে তোমাদের দুঃখ আরও বেড়ে যাবে। তোমাদের প্রিভিকাউন্সিল, হিন্দু ল'-এর মস্ত পণ্ডিত বলেই বাজারে চালু আছে। কিন্তু মাঝে-মাঝে ওঁরাও গণ্ডগোল পাকিয়ে বসেছেন, সে নিয়ে স্যার হরি সিং গৌর একবার বিরাট এক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। কিন্তু মুশকিল হলো, প্রিভিকাউন্সিল ভুল করলে তার উপর তো কোনো আপীল থাকে না। ওঁদের ভুলটাই ঠিক বলে চলে যায়। প্রশ্নটা ছিল, হিন্দু আইনে আনবরন্ পারসন্স অর্থাৎ যে এখনও জন্মায় নি তার জন্যে কোনো সম্পত্তির ব্যবস্থা করা যায় কি না। প্রিভিকাউন্সিল একটা কেসে হঠাৎ রায় দিয়ে ফেললেন—হিন্দু আইনে একমাত্র জীবিত লোকদেরই কোনো কিছু দান করা যায়। দানপত্রের দিনে অজাত বংশধরকে কোনো কিছু দেওয়া হয়ে থাকলে তার আইনগত মূল্য নেই। কিন্তু প্রিভিকাউন্সিলের সায়েবরা হিন্দু আইনটা ঠিকমতো না বুঝেই বোধ হয় এই ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু বিচারকবাক্য তো মিথ্যে হতে পারে না! প্রিভিকাউন্সিল যখন বলেছেন তখন সেইটেই ভারতের সব আদালত মেনে নেবেন। ফলে ওঁদের ভাষ্য থেকে রক্ষা পাবার জন্য বাধ্য হয়ে আইন সভায় নতুন আইন পাস করানো হলো—হিন্দু ডিসপোজিশন অফ প্রপার্টি অ্যাক্ট। অজাত বংশধরকে সেখানে আইনগত স্ট্যাটাস দেওয়া হলো। কিন্তু সে-আইনে শুধু ভবিষ্যতের কথাই লেখা হলো, আগের থেকে এর ফল, যাকে বলে কিনা রেট্রসপেকটিভ এফেক্ট, তা দেওয়া হয় নি। রেট্রসপেকটিভ এফেক্টের ব্যবস্থা যদি আইনে থাকতো, তাহলে বেচারা নরসিংহ রাওয়ের জন্যে আমাদের আজ দুঃখ করতে হতো না।"

আমাদের গল্প শেষ হলো। নিজের ছাতাটা নিয়ে ছোকাদাও উঠে পড়লেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম শনিবারের হাইকোর্ট খাঁ-খাঁ করছে। কেউ কোথাও নেই। যেন রূপকথার পাষাণপুরীতে দৈত্যের যাদুমন্ত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কেবল আমরা কয়েকজন বাবু জেগে রয়েছি।

কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। ছোকাদার হাত ধরে সন্ধ্যার অন্ধকারে দ্রুত বেরিয়ে এলাম আমি।

জিরাফ জেব্রা গাধা ঘোড়া

টেম্পল চেম্বার ও সায়েবের হোটেলে অনেক আইনের কাজ করেছি। বিরাট-বিরাট ব্রীফ, বিরাট আইন-বইয়ের পাণ্ডুলিপি টাইপ হয়ে গিয়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কীভাবে টাইপরাইটারের সামনে কেটে গিয়েছে খেয়াল থাকে নি। কাজের ফাঁকে-ফাঁকে অকাজও হয়েছে এবং এই এতদিন পরে সেই অকাজের স্মৃতিই মনকে ভরে রেখেছে। বলাবাহুল্য, সায়েব তাঁর ছেলেমানুষী উৎসাহে সেইসব 'অকাজ'-কেও কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

সময়ের দূরত্ব থেকে অকাজ-এর কথা স্মরণ করে মাঝে-মাঝে অন্য সন্দেহও হয়। মনে হয় আমার বিড়ম্বিত দুঃখভারাক্রান্ত জীবনের কথা মনে রেখেই সায়েব শত অসুবিধা সত্ত্বেও মাঝে-মাঝে অকাজের খেলায় মাততেন। আমাকে খুশি করবার জন্যেই এমন ভাব দেখাতেন যেন এইসব অ্যাডভেঞ্চার তিনি খুব উপভোগ করছেন। কিন্তু আসলে তিনি আমাকে এমন আনন্দ দিতে চাইতেন যা কোনোদিন আমার ভাগ্যে জোটে নি।

কাজের মধ্যে আনন্দ ও শিক্ষা একই সঙ্গে পাবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছি আমি, আমার থেকে ভাগ্যবান কে আছে পৃথিবীতে?

ছোট-ছোট ঘটনা, হয়তো নাটকীয় তেমন কিছুর উপস্থিতি নেই, তবু সায়েবের মধুর ব্যক্তিত্বে ও কৌতুকবোধে সব অভিজ্ঞতা আমার কাছে রসময় হয়ে উঠতো। বারওয়েল সায়েবের চেম্বার থেকে বিদায় নিয়ে অন্যত্র সরে আসবার পরেও আমার জীবনে তো অনেক ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু কর্মজীবনের সেই অধ্যায়ের কথা তো তেমনভাবে মনের মধ্যে দাগ কেটে বসে নেই। এমনই বোধ হয় হয়ে থাকে এই পৃথিবীতে।

কমবয়সী একটি ছেলেকে আনন্দময় সান্নিধ্য উপহার দিতে গিয়ে বারওয়েল সায়েব প্রায়ই ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন। তিনি এমন সব কাজ করতেন যা হাইকোর্টের অন্য লোকরা শুনলে ভাববে মানুষটা পাগল হয়ে গিয়েছে। একবার ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের ফুটপাথে এক ভিখিরির শিশুকে কাঁদতে দেখে

সায়েবের কী উদ্বেগ। ফর্সা জামাকাপড় পরা অবস্থায় তিনি তাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে আদর করে তার কান্না থামিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে অদ্ভুত এই দৃশ্য দেখবার জন্যে রাস্তার পথচারীদের ভিড় জমে গিয়েছে। আমার লজ্জা লাগছে, কিন্তু সায়েবের খেয়াল নেই, একটি শিশুর দুঃখ লাঘবের জন্য তিনি তখন কত ব্যস্ত।

সেই দৃশ্য দেখে কেউ-কেউ মন্তব্য করেছিল—পাগলা সায়েব। তাদের কথা শুনে আমার বেশ রাগ হয়েছিল। যা নিজেরা পারি না তা অন্য কেউ করলেই আমরা তার মানসিক সুস্থতাকে সন্দেহ করে বসি। কাউকে পাগল বলে নিজের বিবেককে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টায় আমাদের জুড়ি নেই।

আমার বাড়িতে তখন ভাইদের নানারকম অসুখ-বিসুখ চলেছে। ডাক্তার শুধু খাওয়া-দাওয়া ভাল করবার পরামর্শ দিচ্ছেন, কিন্তু সেই বাড়তি সামর্থ কোথা থেকে আসবে? কাউকে এসব কথা বলাও যায় না, তাই মনটা সারাক্ষণই খারাপ হয়ে থাকে। সায়েব আমার গম্ভীর মুখ দেখে জিরাফ চর্চার জন্যে আমাকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা শুনলে অনেকেই তাঁকে পাগল ভাববে। কিন্তু জিরাফ চর্চা থেকে সেই সময় আমি যে নির্মল আনন্দ পেয়েছিলাম তা সমস্ত জীবন মনে থাকবে।

সায়েব তখনও লাট ভবনের সামনে স্পেনসেস হোটেলে আছেন। বহুদিনের পুরনো বাড়ি। এশিয়ার প্রাচীনতম হোটেল। অনেক ঘরের ছাদ থেকে জল পড়ে। এই জলকে এড়ানোর জন্যে আমরা কয়েকবারই ঘর পাল্টেছি।

ছুটির দিনে সায়েব আবার প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। এখন মনে হয়, ছুটির দিনে কাজটা ছিল এক ধরনের ছুতো। আসলে সায়েব চাইতেন, কিছু খাইয়ে আমার ওজন বাড়াতে।

সেবার হোটেলে সায়েবের ঘরে ঢুকতেই তিনি প্রশ্ন করলেন, "তোমাকে আজ স্পেশাল হাসি-খুশি মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি? কোথাও কোনো মজার ব্যাপার দেখলে নাকি?"

আমি এতদিনে বেশ সাহসী হয়ে উঠেছি। সায়েবের সঙ্গে মন খুলে সহজ হয়ে কথা বলতে এখন আমার সঙ্কোচ হয় না। আমি জানালাম, গতকাল থেকে খবরের কাগজে ভেজাল সংক্রান্ত নানা খবর পড়ে মনটা চিন্তিত ছিল। দুধে ভেজাল, চায়ে ভেজাল, তরকারিতে ভেজাল, এমনকি চাল-ডালেও কাঁকরের ভেজাল। আমার মা চিন্তা করছিলেন, এইসব ভেজাল জিনিস কিনে কখন নিজেদের বিপদ আসবে তার ঠিক নেই।

এইসব আলোচনার পর রাত্রে শোবার সময় এক অভিনব ভেজালের গল্প পড়ে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেলো।

স্পেশাল কৌতূহল দেখিয়ে সায়েব জানতে চাইলেন, "কী স্বপ্ন দেখলে? কেউ ভালবাসায় ভেজাল দিতে শুরু করেছে? আজকাল কেউ-কেউ আইনেও ভেজাল দিচ্ছে! ছোট আদালতে আইনের পুরনো বই দেখিয়ে এবং নতুন আইনের কথা চেপে গিয়ে তরুণ বিচারকের কাছে মামলা জিতে নিচ্ছেন এমন আইনজ্ঞের কথাও আমার কানে এসেছে। বিশেষ করে বিপক্ষে যদি তেমন কোনো বিচক্ষণ উকিল না থাকেন!"

আমি জানি এটা হতে পারে। কিন্তু হাসির উপাদান নেই এই ভেজাল আইনে, যদি-না লুকিয়ে ভেজাল ঢুকিয়ে নতুন করে আইন-বই ছাপিয়ে নেওয়া হয়।

আমার মজার কথা এবার সায়েবকে বলতে হলো, যা গল্পতে পড়েছি। এক ভদ্রলোক ঘোড়া কিনে রঙ লাগিয়ে জেব্রা তৈরি করেন। ভেজাল হলেও বাজারে এই জেব্রার ভীষণ কদর!

"তারপর?" সায়েব ব্যাপারটা ভীষণ সিরিয়াসলি নিয়েছেন।

বললাম, "তারপর এক কাণ্ড! সারারাত ধরে স্বপ্ন দেখছি, অসংখ্য ঘোড়াকে স্প্রেয়িং মেশিনের রঙ ছিটিয়ে জেব্রা করা হচ্ছে। শেষে এমন অবস্থা ঘোড়ার সাপ্লাই কমে গিয়েছে এবং বাজার দরও চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছে!"

"তখন?" সায়েবের কণ্ঠে গাম্ভীর্য! কোনো রসিকতাকেই যেন প্রশ্রয় দিচ্ছেন না তিনি।

বললাম, "এই অবস্থায় যা হয়, ঘোড়া বদলে গাধাকে রঙ করে জেব্রা করা হতে লাগলো। সব ঠিকমতো চলছিল, সেই সময় দেখা গেলো একটা ভেজাল জেব্রা বাজারে গাধার ডাক ডাকছে। তরপরেই হুলস্থূল কাণ্ড! কিছুই করবার নেই। যেখানে ভেজাল জেব্রাদের রাখা হয়েছিল, তাদের মুখ থলে দিয়ে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও পরিত্রাহি গাধার ডাক ডেকে চলেছে।

"সেই ডাক শুনে কর্পোরেশনের ভেজাল ডিপার্টমেন্টের ইন্সপেক্টররা যখন পুলিস নিয়ে ভদ্রলোকের কারখানা ঘিরে ফেলেছে ঠিক সেই সময় আমার ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেলো। দেখলাম বেশ সকাল হয়ে গিয়েছে। বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে আমাকে স্পেনসেস হোটেলে আসতে হবে।"

সায়েব গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলেন, "সিরিয়াস ব্যাপার। আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানায় এই ভেজাল জেব্রা বিক্রি হয়েছে কিনা তা এখনই খোঁজ করে দেখা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ তুমিই একবার বলেছিলে, ইন্ডিয়াতে ভোরবেলার

স্বপ্ন কখনও মিথ্যে হয় না!”

সামান্য দু'একখানা চিঠি টাইপ করবার ছিল, তাও দ্রুত সেরে ফেলার জন্যে সায়েব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কারণ “ফার্স্ট থিং ফার্স্ট!” জেব্রার ব্যাপারটায় ভেজাল ধরতে পারলে আমাদের দু'জনেরই খুব নাম হয়ে যাবে”, সায়েব সানন্দে জানালেন।

আমি বেশ লজ্জা পাচ্ছি! এমন কাণ্ড হবে জানলে আমি ভেজাল জেব্রার গল্প কিছুতেই বলতাম না। স্বপ্ন না দেখলেই ভাল হতো। যথাসময়ে ভেজাল জেব্রার রং ধুয়ে যেতো, আমাদের আর মাথা ঘামাতে হতো না।

সায়েবের উৎসাহ কিন্তু কমছে না। তিনি বললেন, “তুমি জানো না, শংকর। আমার সুইস বন্ধু মিস্টার ক্লেবার এই শহরেই রঙের হোলসেল ব্যবসা করেন। খোদ ফ্রান্স থেকে তিনি এমন সব রঙ আনান যা নাকি সারাজীবনেই ওঠে না!

“তাছাড়া বর্ষাকাল এখনও অনেক দূর, সুতরাং জেব্রার রঙ কাঁচা হলেও কেউ ধরতে পারবে না। ততদিনে গ্যারান্টি পিরিয়ড পেরিয়ে যাবে এবং অসাধু সাপ্লায়ারের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা চিড়িয়াখানার কর্তারা নিতে পারবেন না, অথচ মাল বুঝে নেবার একটা নির্দিষ্ট সময় থাকে, আইন বলছে।” সায়েবের কণ্ঠে কপট গাম্ভীর্য!

“তুমি ভেবো না, তোমার ঐ স্বপ্নের ভেজাল সম্পর্কে গোপন তদন্ত ছাড়াও চিড়িয়াখানায় আমার আরও কিছু জরুরী কাজ আছে। তোমার নিজস্ব বিষয়ে জেব্রা, আর আমার স্পেশাল সাবজেক্ট জিরাফ। এ বিষয়ে সরেজমিনে তদন্ত করতে হবে এবং তোমার সাহায্য প্রয়োজন হতে পারে!”

জিরাফের ব্যাপারটা সায়েব এখনও টপ সিক্রেট রাখছেন! “ওটাও কি ভেজালঘটিত তদন্ত?”

সায়েব গম্ভীরভাবে জানালেন, “জিরাফে ভেজাল দেওয়া খুব শক্ত, তাই খাঁটি জিরাফের দাম এতো বেশি!”

কোন পশুকে লুকিয়ে রঙ করে জিরাফ বানানো যায়? আমি মনে-মনে হিসেব করছি। একটি মাত্র পশু কাছাকাছি আসছে, তার নাম উট। কিন্তু উটের পিঠে বিরাট কুঁজ, ওই কুঁজের পাহাড়কে ফাঁকি দেবে কী করে?

সায়েব প্রয়োজনীয় গাম্ভীর্য অবলম্বন করে বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছো! অনেক টাকা ঘুষ দিয়ে পারচেজ অফিসারের মুখ বন্ধ না করতে পারলে রঙ-করা উটকে জিরাফ বলে চালানো সম্ভব নয়, এমন কি নাইনটিনথ সেঞ্চুরির চীনেও নয়!”

আবার চীনের কথা উঠছে কেন? আমরা তো এখন ইন্ডিয়া নিয়েই হিমসিম খাচ্ছি।

সায়েব উত্তর দিলেন, "উনবিংশ শতাব্দীর চীনে অনাচার এবং ঘুষের প্রকোপটা বড্ড বেশী বেড়ে গিয়েছিল বলে শুনেছি!"

ইতিমধ্যে হোটেলে আউটডোর পিকনিক লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছেন সায়েব। তার অর্থ : একটা ঝুলিতে স্যাণ্ডউইচ, ভেজিটেবল কাটলেট ইত্যাদি প্যাক করে দেওয়া হবে এবং সেই নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো ভেজাল জেব্রা এবং জিরাফ সংক্রান্ত গবেষণায়।

সায়েব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "চীনের এতো কাছাকাছি থেকেও ভারতবর্ষে আমরা ঐ দেশের অতীত সম্পর্কে এতো কম জানি কেন?"

এ-প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। পঞ্চম জর্জের ছোট মামার নাম পর্যন্ত যে-দেশের ছাত্রদের মুখস্থ, সেখানে বিশিষ্ট শিক্ষিতরাও চীনে গত আড়াই হাজার বছর ধরে কী হয়েছে তার কোনো খবর রাখেন না। ইতিহাস তো দূরের কথা, ধর্মপ্রাণ এই দেশে লাওৎসে, চুয়াংসে এবং কনফুসিয়াস-এর ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে কিছু-কিছু খবর সাধারণ মহলে প্রচলিত থাকা উচিত ছিল। চাইনীজ কুকিং, চাইনীজ ডাইংক্লিনিং, চাইনীজ ছুতোর এবং চাইনীজ মুচি ছাড়া আমরা এই বিরাট দেশ সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানি না।

সায়েব বললেন, "আমারও এই অবস্থা হতো যদি-না আমি আর্থার ডেভিড ওয়ালির প্রেমে পড়তাম।"

আর্থার ওয়ালি আমাদের সায়েবের সমবয়সী নন, তাঁর থেকে দশ বছরের ছোট। আদি নাম আর্থার ডেভিড স্ক্রস। সায়েবের মতো তিনিও কেমব্রিজে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন এবং যথাসময়ে কিংস কলেজ থেকে চাইনীজ সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হন। আমি এখন ঠিক স্মরণ করতে পারছি না, কিন্তু ওয়ালির সঙ্গে সায়েবের চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল মনে হয়। এই লেখকের প্রতিটি বই প্রায় কণ্ঠস্থ ছিল। "চীনের প্রতি আমার সমস্ত শ্রদ্ধার পিছনে রয়েছেন আর্থার ওয়ালি।"

স্পেনসেস হোটেল থেকে পিকনিক প্যাকিং-র ঝুলি কাঁধে ঝুলিয়ে ছুটির দিনে আমরা দু'জনে কলকাতার রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি।

আজ ট্রাম একেবারে খালি। আমরা মজা করে আলিপুরের ট্রামেই চড়ে বসলাম। সায়েব চুপিচুপি বললেন, "আমরা অর্ডিনারি লোক নেই! এখন আমরা

জেব্রা ডিটেকটিভ। কিন্তু কেউ জিজ্ঞেস করলে জেব্রার নাম মুখেও আনবো না, বলবো হাতি দেখতে যাচ্ছি! বলা যায় না, যে-দুষ্টুগুলোকে তুমি স্বপ্নে ভেজাল দিতে দেখেছো তারা আমাদের তাড়া করতে পারে। আমার লাইসেন্স-করা রিভলভার আছে, কিন্তু আমি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না।"

সায়েবের কাণ্ডকারখানায় আমি খুব মজা পাচ্ছি। "সত্যি যদি জেব্রার ভেজাল প্রমাণ হয় তা হলে কী হবে?!"

সায়েব বললেন, "দু'একদিনের মধ্যেই স্টেটসম্যানের প্রথম পাতায় আমাদের দু'জনের ছবি একসঙ্গে ছাপা হবে—স্টেটসম্যানের এডিটর আমার বন্ধু। তারপর ইণ্ডিয়ার যেখানে যত জেব্রা আছে তাদের গায়ে স্পেশাল তার্পিন তেল ঘষে রঙ উঠছে কিনা দেখবার জন্যে গভর্নমেন্ট আমাদের নিয়োগ করবে। আমরা প্রতি শনি-রবিবার সরকারের গেস্ট হিসেবে হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়াবো!"

আমি ততক্ষণ ভাবছি, ধরা পড়লে বেচারা ভেজাল ঘোড়াটার ভবিষ্যৎ কী হবে! সায়েব গম্ভীরভাবে চিন্তা করে বললেন, "চিন্তা কোরো না, ভাল ঘোড়া হলে আমি কাউকে ধরে একটা নিরাপদ আশ্রয় ঠিক করে দেবো। ঘোড়াটার তো দোষ নেই, যত দুষ্টুমি তো মানুষের,—যারা ঘোড়ায় ভেজাল দিয়ে জেব্রা করতে চায়।" একটু ভেবে সায়েব বললেন, "কিন্তু মুশকিল হবে গাধা হলে, কেন না আমার সঙ্গে কোনো ধোপার ভাব নেই। তুমি কাউকে চেনো?"

"আমি ধোপা চিনি, কিন্তু তারা আজকাল গাধার বদলে সাইকেল ব্যবহার করে।"

গাধাদের সম্বন্ধে মানুষের এতো অবজ্ঞা কেন? সায়েব দুঃখ করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি হতোদ্যম হলেন না। ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "ফেরবার পথে রেল-স্টেশনে নামতে হবে তোমাকে। খবর নিতে হবে, এখান থেকে থার্ড ক্ল৷সে একজন গাধা এবং দু'জন গার্জেনের কত ভাড়া হায়দরাবাদ পর্যন্ত! আমি শুনেছি, হায়দরাবাদে কোনো গাধা বেকার বসে থাকে না। ওখানে ওরা একটু ট্রেনিং-এর পর জন-মজুরের সহকারী হয়। তুমি ভেবো না শংকর, আমরা ভেজালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছি বলে গাধা-ঘোড়ার কোনো ক্ষতি করবো না। আফটার অল তাদের তো কোনো দোষ নেই! গাধা থেকে জেব্রা হয়ে কোনো গাধা নিশ্চয় সুখী বোধ করবে না। তদন্তের সময় আমরা তাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা চাইবো।" আলোচনাটা এতই সিরিয়াসভাবে হচ্ছে যে হাসাহাসির বিন্দুমাত্র সুযোগ নেই।

সায়েব বললেন, "ধরা পড়বার পর ভেজাল ঘোড়া যদি কেউ না নেয় তা

হলেও তুমি ভেবো না। আমি ওইসব ঘোড়াকে আমার একমাত্র ভাই স্ট্যানলির কাছে পাঠিয়ে দেবো। বেচারার পায়ে একটু গোলমাল আছে, ঘোড়া ছাড়া তার চলে না। একটা গ্রামের মধ্যে কায়ক্লেশে থাকে, বিয়ে-থা করে নি।"

আমি জানতাম, স্ট্যানলি মাঝে-মাঝে সায়েবকে চিঠি লেখেন এবং তিনি প্রায়ই তাকে কিছু টাকা পাঠান। এই ভায়ের ওপর তাঁর টান খুব বেশি, আর্থিক সচ্ছলতা থাকলে ভাইকে আরও সুখে রাখতেন তিনি।

আমরা এতক্ষণে আলিপুরে এসে গিয়েছি। ট্রাম থেকে নেমে আমরা চিড়িয়াখানার দিকে হাঁটছি। বলতে ভুল হয়ে গিয়েছে, পশুদের রঙ পরীক্ষার জন্যে সাবান, তার্পিন তেল, তুলো ইত্যাদি আনার কথা কারো মনেই হয় নি।

সায়েব কিন্তু পিছোতে রাজী নন। বললেন, "চিন্তা কোরো না শংকর। যারা ডিটেকটিভ হয় তাদের অনেক সময় স্পেশাল মাথা খাটিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দূর করতে হয়। আমার মাথার ওপর দিকটা অনুর্বর—প্রায় সাহারা মরুভূমির মতো—একটি তৃণখণ্ডও জন্মায় না। কিন্তু ভিতর দিকটা ভীষণ উর্বর। আর তোমার তো বইরের দিক এবং ভিতরের দিক দুটোই ফার্টাইল। তুমি ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই বিরাট ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পেয়েছো। তুমি কি কোনো আন্দাজ পেয়েছো, কোন রাস্তার কোন গ্যারেজে এই ঘোড়ার ওপর জেব্রা স্প্রেয়িং হচ্ছে?"

আমি মাথা চুলকোলাম। "স্বপ্নে বাড়িটা দেখেছি, কিন্তু রাস্তা এবং ঠিকানা নজরে পড়ে নি। শুধু মনে আছে, কারখানার মালিক ভদ্রলোক একজন আর্টিস্ট। খুব সাবধানে জেব্রার স্টেনসিল কেটে নিয়েছেন।"

সায়েব বললেন, "স্বীকার করতেই হবে, মাথা খাটিয়ে খুব ভাল ব্যবসা ফেঁদেছেন ভদ্রলোক। একটা ঘোড়ার দাম যদি এক হাজার টাকা হয় তাহলে একটা জেব্রা অন্তত দশ হাজার টাকা। তার মানে ভ্যালু-অ্যাডেড হলো ন'হাজার টাকা। অন্য কোনো বিজনেসেই এমন হাই প্রফিট নেই।"

আমি এখন জিরাফের ব্যাপারে আগ্রহ দেখাতে চাই। সায়েব বললেন, "মিস্টার আর্থার ওয়ালিই আমার মাথার চীন-চীনে ভাবটা ঢুকিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে গোপনে বলছি, বাঙালীরা যে প্রচণ্ড বুদ্ধিমান তা পাঁচশো বছর আগে এই জিরাফ সংক্রান্ত ব্যাপারেই বোঝা গিয়েছিলো!"

এই জিরাফের ব্যাপারটা সায়েব যেভাবে বর্ণনা করেছিলেন তাতে রসিকতা বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ডানিয়েল বুরস্টিন নামে এক মহাপণ্ডিত সুদূর আমেরিকা থেকে এদেশে এসেছিলেন। ব্যারিস্টার বুরস্টিন লাইব্রেরি অফ

কংগ্রেসের সর্বেসর্বা গ্রন্থাগারিক। বহু গবেষণা করে তিনি একখানি বিরাট বই সম্প্রতি রচনা করেছেন এবং সেখানে বাঙালীদের জিরাফ ডিপ্লোম্যাসির কথা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। সায়েবের কাছেই কিন্তু আমি এর প্রথম ইঙ্গিত পেয়েছিলাম এবং এতদিন আমি তাঁকে অবিশ্বাস করে এসেছি বলে দুঃখও পাচ্ছি।

আমরা এখন চিড়িয়াখানার মধ্যে ঢুকে পড়ে সবুজ ঘাসের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। সায়েব বললেন, "পাত্র বের করে গরম চা ঢালো ফ্লাস্ক থেকে। মাথাটা পরিষ্কার না থাকলে আমাদের তদন্ত-প্রচেষ্টা ব্যাহত হবে!"

চায়ের পাত্রে চুমুক দিয়ে সায়েব বললেন, "সভ্যতা-ভব্যতায় চীনের মানুষেরা যে পশ্চিমীদের থেকে শত যোজন এগিয়ে ছিলেন এ-বিষয়ে সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। ইউরোপীয়রাও সাগর অভিযানে বেরিয়েছিল। চীনারাও বেরিয়েছিল। কিন্তু স্প্যানিশ পর্তুগিজ বোম্বেটেরা যেখানে গিয়েছে সেখানে কী সর্বনাশ করেছে তা ভাবলে লজ্জার শেষ থাকে না। নির্লজ্জ এই লুণ্ঠনে শেষপর্যন্ত ইংরেজ এবং ফরাসীরাও যোগ দিয়েছে, তবে একটু ভদ্রভাবে।"

আবার চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন সায়েব। "ইউরোপীয়দের রাজ্য জয় এবং চীনাদের রাজ্য জয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত! যে-দেশ চীন সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করলো সে-দেশের রাজা সম্রাটের দূতের কাছ থেকে লক্ষ-লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা এবং বহু মূল্যবান জিনিস উপঢৌকন পেলো, কারণ চীনা সম্রাট পরাভূত রাজাদের কাছ থেকে কিছু নেবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই তো দেবেন, এই তো মানবতার আদি নীতি।"

"আর ইউরোপীয়দের নির্লজ্জ কীর্তিকাহিনী এখন বিশ্বের কে না জানে? নির্মম লুণ্ঠন ও শোষণে তারা এক-একটি দেশকে নিঃস্ব করে ছেড়েছে। পর্তুগিজরা তো শুধু সম্পদ নেয় নি, নিষ্ঠুরভাবে মানুষকে বন্দী করে অন্যত্র ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দিয়েছে।"

সায়েব আবার চায়ের পাত্রে চুমুক দিলেন। "চীনের সম্রাটরা অবশ্য চিরকালই একটু অহংকারী ছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল, অন্য সব দেশ যা আমার সেনাপতিরা জয় করেছেন তাদের কী এমন থাকতে পারে যা আমাদের গ্রহণের যোগ্য?"

সায়েব এবার হাসলেন। "আমি যখন পড়লাম বাঙালীরা এই পরিস্থিতিতেও চীন-সম্রাটের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিল তখন একজন 'বাঙালী' হিসেবে আমারও

খুব আনন্দ হলো।”

বাঙালী! আমার একটু কৌতূহল হচ্ছে। সায়েব বললেন, “অবশ্যই আমি বাঙালী, শুধু একটি বিষয়ে ছাড়া। আমি এখনও প্রতি কাপ চায়ে তিন চামচ চিনি খেতে পারি না। মিষ্টির ব্যাপারে বাঙালীদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া দুনিয়ার কারও পক্ষে সম্ভব নয়।”

এবার আমরা চিড়িয়াখানার জেব্রাদের কাছে চলে এলাম। প্রাণীদের জীবন সম্পর্কে সায়েবের গভীর আগ্রহ ও জ্ঞান। একসময় জওহরলাল নেহরুর মতো তিনিও মন দিয়ে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ন্যাচরাল হিস্ট্রি অধ্যয়ন করেছেন।

সায়েব বললেন, “পশুপাখীদের এইভাবে খাঁচার মধ্যে বন্দী করে রাখার বিরুদ্ধে আমি। শুধু একটি যুক্তিই আছে স্বপক্ষে—যে-জীব বনে প্রাকৃতিক পরিবেশে যতটুকু বাঁচে চিড়িয়াখানার বন্দিদশায় তার আয়ু কিন্তু বেড়ে যায়। এমন কি ইঁদুর-পণ্ডিতরা বলছেন, স্বাধীন অবস্থায় এঁর পরমায়ু এক বছর, কিন্তু বন্দিদশায় ইনি হেসেখেলে তিন-চার বছর বাঁচেন।”

সায়েব হাসলেন। “তোমাকে চুপি-চুপি বলে রাখি, যে জীব যত কম খায় সে তত বেশি বাঁচে। একই ফ্যামিলির এক-ডজন ইঁদুরকে ল্যাবরেটরিতে দু'ভাগ করা হলো। অর্ধেক ইঁদুরকে যত ইচ্ছে তত খেতে দেওয়া হলো। এঁরা চব্বিশ মাসে বার্ধক্যে পৌঁছে গেলেন। অন্য ইঁদুরদের দু'দিনের খাদ্য তিন ভাগ করে দেওয়া হলো। আশ্চর্য কাণ্ড—সাড়ে-তিন বছরেও এঁরা জওয়ান রইলেন, বুড়ো হবার কোনো ইচ্ছেই যেন নেই এঁদের!”

জেব্রা এবং ঘোড়া সম্বন্ধে সায়েব ফিসফিস করে বললেন, “জেনুইন জেব্রা বাঁচে কম, এই ৩৭/৩৮ বছর—হোয়ারঅ্যাজ ঘোড়ার পরমায়ু চল্লিশ বছর। তাহলে দেখা যাচ্ছে জাল জেব্রা কিনে খদ্দের পরমায়ুতে ঠকছে না, ঠকছে শুধু রঙে!” ভেজালের মামলা আদালতে উঠলে আসামীপক্ষের কেউ নিশ্চয়ই এই পয়েন্ট তুলে আত্মপক্ষ সমর্থন করবেন!

আমরা অনেকক্ষণ ধরে চিড়িয়াখানার দুটি জেব্রাকে নিরীক্ষণ করলাম। জেব্রাদের যিনি দেখাশোনা করেন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কখন এঁরা স্নান করবেন? বিচক্ষণ ডিটেকটিভের মতো খুব কায়দা করেই এই প্রশ্নটা আমরা দু'জনে করেছি—যাতে আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ভদ্রলোক না বুঝতে পারেন। কিন্তু শুনলাম, আজই একটু আগে হোস পাইপের জলে জেব্রাদের স্পেশাল স্নান করানো হয়েছে। আমরা দু'জনে হায়-হায় করে উঠলাম, আর একটু আগে যদি আমরা এখানে আসতাম!

সায়েব এবার গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, "যখন স্নান করালেন তখন কোনো রঙটঙ ওঠে নি তো?"

"রঙ উঠতে যাবে কোন দুঃখে?" লোকটি আমাদের প্রশ্নের তাৎপর্যই বুঝতে পারছেন না।

এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, "এই জেব্রা কলকাতার কোন পার্টির কাছে কিনেছেন?"

এবারও লোকটি অবাক হলেন। জানিয়ে দিলেন, "কলকাতা নয়, ফোরেন থেকে এসেছে এই জন্তু।"

আমাদের আলাপ-আলোচনার মধ্যেই জেব্রা-দম্পতি হঠাৎ জেব্রা স্টাইলে ডেকে উঠলো। লোকটি আমাদের সঙ্গে আর কথা বলতে রাজী হলেন না। তিনি ভেবেছেন, আমরা পাগল!

সায়েব বললেন, "আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। এখান থেকে চলো। ঘোড়ার রঙে ভেজাল হলেও গলার আওয়াজ কিছুতেই এইভাবে পাল্টাবে না!"

তদন্ত কার্যে যাতে আমি নিরুৎসাহ হয়ে না-পড়ি সেই জন্যেই বোধহয় সায়েব বললেন, "এরা এখনও ঠকে নি, কিন্তু ঠকতে কতক্ষণ? সুতরাং হোটেলে ফিরেই আমরা চিড়িয়াখানার ডিরেক্টরকে একখানা কনফিডেনসিয়াল চিঠি লিখে সাবধান করে দেবো।"

এবার আমরা চলেছি জিরাফের সন্ধানে। বিপুল উদ্যম ও উৎসাহে হাঁটতে-হাঁটতে সায়েব বললেন, "আমাদের মনে রাখতে হবে জিরাফ একটি পিকিউলিয়র জীব। আফ্রিকার অরণ্যে সারাজীবন সাধ্যসাধনা করলেও জিরাফের কণ্ঠস্বর শুনতে পাবে না। জিরাফ নিশ্চয় চীনা দার্শনিকদের ইনফ্লুয়েন্সে পড়ে গিয়েছিল—শ্রবণ এবং দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রবল রেখেও সে মৌনী হবার ব্রত নিয়েছে কত দিন আগে।"

"অর্থাৎ আওয়াজ শুনে ভেজাল জিরাফ বাজিয়ে নেওয়া চলবে না?"

জিরাফের উচ্চতা নিয়েও কথা উঠলো। সায়েব বললেন, আমার ছোট ভাই স্ট্যানলি একদিন সকালে উঠে আমার মাকে বললো সে গতরাত্রে স্বপ্ন দেখেছে একটি জিরাফ তার বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। মা খুব স্নেহময়ী ছিলেন, তিনি বিশ্বাস করতে যাচ্ছিলেন। আমি বললাম, 'কিছুতেই জিরাফ নয়।' মা বললেন, 'স্বপ্ন দেখলো স্ট্যানলি, আর তুমি না বলবার কে, নোয়েল?' আমি

বললাম, 'জিরাফের উচ্চতা অন্তত আঠারো ফুট, আর আমাদের ঘরটা মাত্র চোদ্দো ফুট, জিরাফ কী করে স্ট্যানলির ঘরে ঢুকবে মা?' স্ট্যানলি তখন কাঁদতে শুরু করেছে। তখন মা বললেন, 'স্ট্যানলি ঠিকই বলছে—হয়তো বেবি জিরাফ দেখেছে সে ঘরের মধ্যে। কিংবা সে মাথা নিচু করেই ঘরে ঢুকেছে।"

সায়েব বললেন, "সেই ছোটবেলা থেকেই বারওয়েল পরিবারে আমরা জিরাফের ওপর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি! ঈশ্বর এমন অদ্ভুত জীব বেশি গড়েন নি। জিরাফের ধড়ের আকার প্রমাণ-সাইজের. ঘোড়া থেকে লম্বা নয়, কিন্তু ওই রণপা এবং লম্বা গলা-ই ব্যাপারটা অন্যরকম করে দিয়েছে। স্ট্যানলি তো মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, জিরাফের মা যদি বাচ্চার জন্যে মাফলার বোনে তাহলে সেটা কত বড় হবে?"

সায়েবের মা বলেছিলেন, "তুমি অযথা চিন্তা ক'রো না। জিরাফের ঠাণ্ডা লাগবার উপায় নেই। জিরাফের দেশ আফ্রিকায়, সেখানে ভীষণ গরম, মাফলার জড়িয়ে দিলেও বাচ্চা জিরাফ তা গলায় রাখবে না।"

সায়েব বললেন, "জিরাফ সম্বন্ধে একটা স্ক্যান্ডাল সেই আদ্যিকাল থেকে চালু রয়েছে—সেটাও তোমাকে চুপিচুপি বলে রাখি। বাঙালি হিসেবে তোমার জানা দরকার, কারণ এখন থেকে পাঁচশো বছর আগে তোমরা জিরাফ দিয়ে কেল্লা ফতে করতে চেয়েছিলে।"

আমি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সায়েব বললেন, "পৃথিবীতে জিরাফ বলে কিছু ছিল না, থাকতোও না। কিন্তু একবার এক ক্যামেলের (তোমরা যাকে বলো উট) সঙ্গে গভীর বনে এক লেপার্ড (অর্থাৎ চিতাবাঘের) দেখা হলো। নির্জন বন, শ্রীমতী ক্যামেলেনীর সঙ্গে মিস্টার চিতাবাঘের প্রণয় হলো এবং সেই দুর্লভ মিলন থেকে জন্ম হলো জিরাফের। বিশ্বাস না হয়, সায়েন্সের বই খুলে দেখো। জিরাফের বৈজ্ঞানিক নাম : ক্যামেলোপার্ডালিন—অর্থাৎ ক্যামেল এবং লেপার্ড এক দেহে হলো লীন!"

আমিও সঙ্গে-সঙ্গে একটা বাংলা নাম ঠিক করে নিলাম—উট + চিতা = উচিতা।

বাংলা শুনে সায়েব বললেন, "কে জানে ৫০০ বছর আগে বাঙালিরা যে জিরাফ নিয়ে স্পেশাল খেলা দেখিয়েছিল তার নাম হয়তো 'উচিতা'ই ছিল। ভারি মিষ্টি এবং কাব্যিক নাম, এর মধ্যে একটু আদর্শও মেশানো রয়েছে!"

জিরাফের গবেষণায় যেসব খবর অনেকদিন ধরে সায়েব সংগ্রহ করেছেন তা এবার তিনি আমাকে শুনিয়ে দিলেন।

"জিরাফ শুয়েও ঘুমোয়, দাঁড়িয়েও ঘুমোয়।"

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, "দাঁড়িয়ে ঘুমোতে গিয়ে পড়ে যায় না?"

"খুব ইম্পর্টান্ট কথা জিজ্ঞেস করেছো। জিরাফ সাধারণত একটা লম্বা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমোয়। ঘুমন্ত জিরাফের ফটো তুলবার জন্যে অনেকের খুব আগ্রহ। ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলে ঘুরছে।"

"জিরাফের পরমায়ু?"

এবার সায়েব একটু বিপদে পড়লেন। "দাঁড়াও, দাঁড়াও। মানুষের তুলনায় জীব-জন্তুদের পরমায়ু কীরকম তার এক স্পেশাল তালিকা এক সময় বহু চেষ্টায় মুখস্থ করেছিলাম! ইঁদুরের লাইফ ৩ বছর, বাদুড়ের ১৫, খরগোশের ১২, ভেড়ার ১৫, ব্যাং-এর ১২, মাকড়সার ২০।" সায়েব হুড়হুড় করে বলতে লাগলেন।

"দাঁড়াও ; দাঁড়াও", সায়েব নামতার মতো মুখস্থ বলতে লাগলেন, "কুকুরের ২৪, বেড়ালের ২৭, গোরুর ৩০, সাপ এবং গিরগিটির ৩০, পায়রার ৩৫ এবং সিংহের ৩৫।"

সায়েব এখনও জিরাফের পরমায়ু স্মরণের চেষ্টা চালাচ্ছেন। "শিম্পাঞ্জির ৩৯, হিপোপটেমাসের ৫৪, রুই মাছের ৫০, চিংড়ির ৫০, কুমীরের ৬০, হাতির ৭৭, কাকাতুয়া ৮৫!"

"শতায়ুর লিস্টে রয়েছে কেবল মানুষ, শকুন ১১৭ এবং কচ্ছপ ১৫০", সায়েবের সংযোজন।

আমি বললাম, "আমাদের শাস্ত্রে রয়েছে ভূষণ্ডির কাক—দীর্ঘজীবীদের মধ্যে সিনিয়রমোস্ট!"

"কিন্তু সায়েন্স তা বলছে না", সায়েব দুঃখের সঙ্গেই প্রতিবাদ করলেন। কিন্তু আমাদের ধর্মপুস্তককে অসম্মান করার জন্যেই বোধহয় জিরাফের পরমায়ু তিনি স্মরণ করতে পারলেন না।

অবশেষে আমরা চিড়িয়াখানার জিরাফ দেখলাম। না, জেনুইন জিনিস, উটকে রঙ করে ভেজাল জিরাফ চালানোর চেষ্টা হয় নি। আমরা তাকে জল খেতেও দেখলাম। সে এক প্রচণ্ড পরিশ্রমের ব্যাপার।

সায়েব বললেন, "পৃথিবীতে যারা সারাক্ষণ মাথা উঁচু রেখে চলতে চায় তাদের কত অসুবিধে তা জিরাফকে দেখলেই বোঝা যায়!"

এবার মাঠের মধ্যে পা ছড়িয়ে বসে আমাদের পিকনিক লাঞ্চ শুরু হলো। চিকেন স্যান্ডুইচ চিবোতে চিবোতে সায়েব বললেন, "ধন্য বাঙালিরা! জিরাফের চালটা তারা যেভাবে দিয়েছিল ৫০০ বছর আগে!"

সায়েব এবার শুরু করলেন, "তুমি চেংহোর নাম শুনেছো?"

"শুনি নি।"

"এই পৃথিবীতে সবাই কলম্বাস, ড্রেক, ভেসপুচি এবং ভাস্কোডাগামার কথা আলোচনা করে। কিন্তু চীনের বিশ্ববিজয়ী খোজা অ্যাডমিরাল চেংহোর নাম তারা শোনে নি।" সায়েব দুঃখ করলেন।

"জেনে রেখো, শৌর্য, বীর্য, সাফল্যে তিনি কোনো ইউরোপিয়ান অ্যাডমিরাল থেকে কম ছিলেন না। বিরাট নৌবাহিনী নিয়ে চীন থেকে বেরিয়ে তিনি সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছিলেন কলম্বাসের অনেক আগে। ইচ্ছে করলে তিনি সমগ্র বিশ্ব বিজয় করতেও পারতেন। কিন্তু, যা তোমায় বলেছি, চীনা সম্রাটদের বিশ্ববিজয় মানে লুঠ এবং শোষণ নয়, বরং পরাজিত এবং পদানতকে যথাসম্ভব দান করা। এই দান করতে-করতে এবং একের-পর-এক দেশে বিজয়ীবাহিনী প্রেরণ করতে-করতে চীনা রাজকোষের এমন অবস্থা হলো যে, এক সময়ে চীনের অর্থমন্ত্রীদের বিশ্ববিজয়ে ঘেন্না ধরে গেলো! রাজকোষের বেহাল অবস্থা সামাল দিতে গিয়ে একজন সম্রাট শেষ পর্যন্ত আইন পাস করলেন, কোনো চীনা সাগরপারে পাড়ি দেবে না। সাগরপারে পাড়ি দেওয়া যেতে পারে এমন নৌকা যে-লোক তৈরি করবে তার তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড হবে!"

চেংহোরা কাহিনী! মানব ইতিহাসের সে এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়। ডানিয়েল বুরস্টিনের বই পড়ে যথাসময়ে আরও কিছু পেরেছি এবং বিস্মিত হয়েছি।

সুদূর অতীতের স্মৃতি থেকে যা স্মরণ করতে পারছি, চেংহোর সুদূর প্রাচ্য এবং এশিয়া বিজয় সম্পর্কে সায়েব তেমন কিছু বলেন নি, কেবল শুনিয়েছিলেন বাংলাদেশেও তাঁর পদধূলি পড়েছিল এবং বাঙালীরা মহাপরাক্রমশালী চীন-সম্রাটের শ্রেষ্ঠত্ব সবিনয়ে স্বীকার করে প্রচুর উপঢৌকন ম্যানেজ করেছিল।

এরপরেই চীনের মহাপরাক্রমশালী মহীপালকে অভিভূত করার পালা। স্বর্ণ, বস্ত্র, মণিমাণিক্য—এসব সম্রাটের রত্নভাণ্ডারে যথেষ্টই আছে। চীনের সম্রাজ্ঞীরা এমন বিনয়ী ছিলেন এবং নিজেদের বৈভব দেখানোর ব্যাপারে তাঁদের এতই লজ্জা ছিল যে মহামূল্যবান ব্রোকেড পরে তার ওপর সবিনয়ে তাঁরা একটি অতি সাধারণ বস্ত্রখণ্ড জড়িয়ে নিতেন। প্রাচীন চীনা গ্রন্থে এই বিনীত মনোবৃত্তির বিস্তারিত উল্লেখ আছে।

সায়েব বলেন, "সম্রাট দয়ালু বটে, কিন্তু তাঁর ঔদ্ধত্য ভীষণ। পদানত পরাভূত সামন্ত রাজারা যে-উপহারই পাঠান তা দেখে তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করেন। এই পৃথিবীর নন্দনকানন চীন, অন্য হতভাগ্য দেশ সেখানে কী পাঠাতে

পারে?”

নাম কেনার জন্যে এবং সম্রাটকে তাজ্জব বানাবার প্রচেষ্টায় বুদ্ধিমান বাঙালীরা শেষে এক অভিনব উপায় বের করলো।

সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীন-সম্রাটের রাজধানীতে প্রবল উত্তেজনা শুরু হয়ে গেলো—সম্রাটকে বাঙালিরা এমন এক উপহার পাঠাচ্ছেন যা বিশ্বের বিস্ময়! চীনের হাজার-হাজার বছরের ইতিহাসে এমন বিচিত্র উপহারের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে নি।

গুজব রটে গেলো, যেমন সম্রাট তাঁকে তেমন অত্যাশ্চর্য উপহার পাঠাতে পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র বাঙালিরাই পারে! যে-সম্রাট কারও কাছ থেকেই গ্রহণ করবার যোগ্য কিছু খুঁজে পান না তিনিও এবার উপহার পেয়ে আনন্দিত হবেন। ধন্য চেংহো, ধন্য বাংলাদেশ!

অবশেষে সেই শুভদিন এলো। ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবার মতো দিন— সালের ২০শে সেপ্টেম্বর।

সেদিন মহাপরাক্রমশালী চীন-সম্রাটের বিত্তময়ী নগরীতে-আনন্দের বন্যা বইতে শুরু করলো। দূর সমুদ্র পথে চেংহোর রণতরীতে বিস্ময়কর এক জীব উপস্থিত হয়েছে। রাজধানীর বিস্মিত নাগরিকরা বিপুল ঔৎসুক্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলে-দলে চলেছেন সেই উদ্যানে যেখানে কিংবদন্তির বিচিত্র জীব চী-লিনকে দেখা যাবে।

একমাত্র সুদূর অতীতে ঋষিরাই তপস্যাবলে এই আশ্চর্য জীবকে অবলোকন করেছেন। চী-লীন অথবা ‘নিরামিষাশী বাঘ’।

সমস্ত মহানগরীতে আজ উৎসবের সাজ—চী-লিন আসছে। বাংলাদেশের বাঙালীরা অবশেষে স্মরণীয় এক কীর্তি রাখলেন, এমন এক উপহার পাঠালেন যা সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর সম্রাটের কৌতূহল জাগাতে সমর্থ হয়েছে।

এরপর সম্রাটের মন্ত্রিসভা বিশেষ এক অধিবেশনে চী-লিন সম্বন্ধে দীর্ঘ গোপন আলোচনা করলেন। সম্রাটের সভাকবিরা আনন্দে পুলকিত হয়ে দীর্ঘ গাথা রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন। স্তাবকরা সঙ্গীত ও বাদ্যসহকারে শুরু করলেন সম্রাটের জয়গাথা। ধন্য এই দেশ, ধন্য এই দেশের নদনদী পর্বতমালা। ধন্য এদেশের প্রজাবৃন্দ। এর আগে অন্য কোনো সম্রাটই নিজের প্রতিভা ও শক্তিবলে এমন মহাকীর্তি স্থাপন করতে পারেন নি যার ফলে স্বর্গীয় সুষমায় ভরা এই দেশে স্বয়ং চী-লিন উপস্থিত হয়েছে। যে-দেশের সম্রাট চী-লিন উপহার পান, যে-দেশে চী-লিনের পাদস্পর্শ ঘটে সে-দেশে জনগণের প্রত্যাশার

আর কী থাকতে পারে?

স্বর্গীয় এই জীবের বর্ণনায় যেসব উত্তেজনাপূর্ণ গাথা রচিত হলো তাও কম বিস্ময়কর নয়। কী বিস্ময়কর এই চী-লিন! স্বর্গীয় এই ব্যাঘ্রের দেহটি হরিণের মতন কিন্তু ল্যাজটি ষাঁড়ের ল্যাজের মতন। মহাপরাক্রমশালী এই জীব, কিন্তু সজ্ঞানে কারও ক্ষতি করে না, কোনো প্রাণী ভক্ষণেও তার বিন্দুমাত্র রুচি নেই।

সামান্য ঘাসপাতা খেয়েই বিশ্বের বিস্ময় এই চী-লিন সন্তুষ্ট।

সম্রাটের অনুরক্ত সাধারণ নাগরিকরাও আজ ধন্য। অবশেষে এই রাজ্যে স্বর্ণযুগের আগমন হলো। বিরাট বৈভব এর আগেই এখানে এসেছে, মহাপরাক্রমে ধরণীকে শাসন করেছেন নরপতিরা কিন্তু কোনো মহাবীরই তো এতোদিন চী-লিনের পাদস্পর্শে এই রাজ্যকে পবিত্র করে তুলতে পারে নি।

সুগম্ভীর সম্রাট নতমস্তকে সমস্ত নিবেদন শ্রবণ করলেন। স্তাবকরা তখন ইঙ্গিত করছেন, শুধু মানবিক শক্তিতে এই মহত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বরের মধ্যে দেবতাকেও যেন দেখতে পাচ্ছি আমরা। না-হলে অবশেষে চী-লিনের আবির্ভাব হবে কেন?

শোভাযাত্রার পুরোভাগে থেকে সম্রাট রাজকীয় উদ্যানে উপস্থিত হলেন এবং ভেজিটারিয়ান টাইগার চী-লিনকে দেখলেন। নাগরিকদলও তখন সেখানে উপস্থিত এবং বিস্ময়ে অভিভূত। অবশেষে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করে সম্রাটের জয়ধ্বনি উঠলো—স্মরণীয় এই মুহূর্তের ইতিহাস যুগযুগান্তর ধরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে, স্বয়ং সম্রাটের জন্যে চী-লিন এসেছেন রহস্যময় বঙ্গভূমি থেকে।

"তারপর?"আমি এবার সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

সায়েব বললেন, "বাঙালীরা একটি জিরাফ পাঠিয়েই বাজি মাত করছেন এটা বোঝা গেলো।

"সম্রাট এরপর আজব জন্তুটিকে দেখে বিস্মিত হলেও রাজকীয় সৌজন্যে নিজের বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। তিনি জানতে চাইলেন, বাংলাদেশের কোথায় এই চী-নিলকে পাওয়া গেলো এবং কোন গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে চী-লিনকে বাঙালিরা নিজেদের কাছে না রেখে চীন-সম্রাটের কাছে পাঠালো?"

সায়েব এবার একটু হাসলেন। "এরপরেই গোলমাল হয়ে গেলো একটু। বাংলাদেশের দূত, যিনি জিরাফের সঙ্গে এসেছিলেন, তিনি মিথ্যাবচনে তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না। সহজেই গোপন কথাটি বেরিয়ে পড়লো যা শ্রবণ করে মহান সম্রাটের মুখ মুহূর্তে গুরুগম্ভীর হয়ে উঠলো। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁর সমস্ত বিস্ময় নষ্ট হতে চলেছে। সম্রাট শ্রবণ করেছেন, জিরাফের জন্ম বাংলায় নয়।

অন্য কোনো দেশ থেকে আমদানি করে এই সেকেন্ড-হ্যান্ড চী-লিনকে সম্রাটের কাছে পাঠানো হয়েছে।

"না। সম্রাটের কীর্তিসূর্য তাহলে তো এখনও মধ্যগগনে উপনীত হয় নি। সম্রাট ভেবেছিলেন, চী-লিনের আদিভূমিকেই তিনি পদানত করেছেন এবং সেই পদানত দেশের জনগণই স্বয়ং চী-লিনকে পাঠিয়েছে তাদের শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ।"

"তারপর?" আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

সায়েব মৃদু হাসলেন। "চীন-সম্রাটের রাজকীয় মেজাজের কথা বিশ্ববিদিত, বুঝতেই পারছো। জিরাফটিকে বাঙালীরা অন্য দেশ থেকে যোগাড় করেছে শুনে তাঁর আনন্দ স্তিমিত হলো। সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ হলো শহরের আনন্দোৎসব। আদেশ হলো বাদ্যগীত বন্ধের। সম্রাট এবার ডেকে পাঠালেন নৌসেনাপতি খোজা চেংহোকে। আদেশে দিলেন, তুমি আমার কীর্তিকে সমস্ত বিশ্বে আশানুরূপভাবে স্থাপিত করো নি। বাংলাদেশে চী-লিনের উৎপত্তি নয়, তার জন্ম সুদূর আফ্রিকা মহাদেশে, মানিস্কি নামক রাজ্যে।

"সম্রাটের নির্দেশ মানিস্কি রাজ্যকে পদানত করে তাঁর জন্য আর একটি চী-লিনকে এক বৎসরের মধ্যে এই রাজধানীতে আনতে হবে, রাজসিংহাসনের সম্মান তবেই রক্ষা পাবে।"

এবার সায়েব হাসতে লাগলেন। আমি চিন্তিত হয়ে জানতে চাইলাম, "বাংলাদেশের প্রতিনিধির মুণ্ডচ্ছেদ হলো না তো?"

সায়েব বললেন, "যতদূর জানি তিনি প্রাণে বাঁচলেন, তবে বাংলার ভাবমূর্তি কিছুটা নষ্ট হলো—চী-লিন সেখানে জন্মায় না বলে।"

তারপর চেংহো কী করেছিলেন জানবার জন্যেও আমি তখন বেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছি।

সায়েব পিকনিকের খাওয়া শেষ করে, কাগজের ন্যাপকিনে মুখ মুছতে-মুছতে বললেন, "তুমি যদি চাও আর্থার ওয়ালিকে এই ব্যাপারে আমি বিলেতে চিঠি লিখবো। তবে এইটুকু জেনে রাখো, খোজা চেংহো সম্রাটের মুখ রক্ষা করেছিলেন। আফ্রিকার মানিস্কি রাজ্যকে সম্রাটের পদানত করে মহাবীর চেংহো পরের বছরেই আর একটি জ্যান্ত জিরাফকে রাজধানীতে এনে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন।"

এবার আমরা দু'জনেই চিড়িয়াখানার জিরাফকে অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলাম। মহাপরাক্রমশালী চীন-সম্রাটকে শত-শত বৎসর আগে

এমনভাবে বিস্মিত করার মতো কী আকর্ষণ আছে এই জন্তুটির তা আমি কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

সায়েব হাসতে-হাসতে বললেন, "মনে নেই তোমার? চৈনিক ঋষিরা কী বলে গিয়েছেন? জ্ঞানই মানুষের শত্রু। যে যত কম জানে সে তত সুখী! এ-যুগের মানুষ বইপত্রের মাধ্যমে সব বিষয়েই বড্ড বেশী জানে, তাই তারা সহজে বিস্মিত হতে চায় না। চলো, আমরা এবার বাড়ি যাই, ভেজিটারিয়ান বাঘ এখানেই পড়ে থাক।" এই বলে আমার হাতটা ধরে সায়েব আলিপুর চিড়িয়াখানার পূর্বদিকের গেটের সন্ধানে মনের আনন্দে হাঁটতে লাগলেন।

গেট পেরিয়ে রাস্তায় পড়বার আগে সায়েব মিষ্টি হেসে জানতে চাইলেন, কবে আমি শেষ এই চিড়িয়াখানায় এসেছিলাম।

বহুদিন আগে, তখন খুব ছোট ছিলাম, বাবা অনেক কষ্ট করে একবার আমাদের চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন। সেদিন আকাশ হঠাৎ মেঘে ছেয়ে যাওয়ায় আমাদের তাড়াতাড়ি ফিরতে হয়েছিল প্রায় কিছু না দেখেই।

আবার চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসবেন এই কথা দিয়েছিলেন বাবা, কিন্তু সংসারের শত দুঃখ সামলাতে গিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্ভব হয় নি। তারপর তিনি নিজেই তো একদিন সেখানে চলে গেলেন যেখান থেকে ইচ্ছে থাকলেও প্রিয়জনদের জন্যে কিছু করা যায় না।

আমার মনে পড়লো, তারপর আর এই আনন্দকাননে আমার আসা হয় নি। অভাব ও অনটনের উত্তাপে আমি কৈশোর থেকে একেবারে সোজা যেন বার্ধক্যে উপনীত হয়েছিলাম। আজ একজন অনাত্মীয় মানুষ গভীর স্নেহে আমাকে ফিরিয়ে দিলেন সেই প্রাপ্য যা অনেক ছোটবেলায় আমার বাবার কাছে আমার পাওনা ছিল।

প্রভু-ভৃত্য

কোথায় জিরাফ আর কোথায় আদালতে জটিল আইনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। কিন্তু জিরাফের জগৎ থেকে এই জীবনে ফিরে আসতে সায়েবকে মোটেই চেষ্টা করতে হয় না।

এদিকে সায়েবের বই লেখার কাজও এগিয়ে চলেছে। বিভূতিদা একদিন

আমাকে চুপিচুপি বলেছিলেন, যখন আইনের কাজ কমে যায় সায়েব তখনই নিজেকে ব্যস্ত রাখবার জন্যে এক-একটা বড় আইন বিষয়ক বই লিখতে বসে যান। কিছু পয়সা আসে, কিন্তু আরও বড় কথা চুপচাপ বসে থাকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।”

এই করেই সায়েব এক সময় উডরফের বিখ্যাত এভিডেন্স আইন বইটির নতুন সংস্করণ রচনা করেছিলেন। তারপর এক সময় বাটারওয়ার্থ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ বই ‘বারওয়েল অন ইনসিওয়েন্স’। তারপর এখন চলেছে প্রভু-ভৃত্য আইন, ল অফ মাস্টার অ্যাণ্ড সার্ভেন্ট, যা ওরিয়েন্ট লংম্যান থেকে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

এই বইয়ের প্রথম খণ্ডের মূল ভূমিকাটি অসামান্য। আইনের রচনা যে এত সুখপাঠ্য হতে পারে তা না-পড়লে বিশ্বাস হয় না। যুগ-যুগান্তর ধরে প্রভু-ভৃত্যের ঐতিহাসিক, সামাজিক এবং আইনগত সম্পর্কটি অসাধারণ নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন একজন আইনজ্ঞ ঐতিহাসিকের দরদী দৃষ্টিভঙ্গীতে।

এসব কতদিন আগেকার কথা। ইতিমধ্যে আমার জীবনে কত বিচিত্র ঘটনাই তো একের পর এক ঘটে গেলো। হতাশার অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ পেরিয়ে আমি আলোকিত ভুবনের কিছু অংশও উপভোগ করেছি। তবু বার বার কারণে-অকারণে সায়েবের কথাই মনে পড়ে যায়, তাঁকে কিছুতেই ভুলতে পারি না।

সেবার এক স্বল্পপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। এই ভদ্রলোক একটি বিচিত্র বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান কর্মে ব্যস্ত রয়েছেন। ইংরেজি ভাষায় তাঁর গবেষণার বিষয় ম্যানেজিং দ্য বস্। কিন্তু যে বন্ধু এই ভদ্রলোককে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তিনি পরিহাসচ্ছলে লিখেছেন—প্রভুপালনের অজানা এবং অন্ধকার জগতে ইনি দুঃসাহসের সঙ্গে বিচরণের ব্রত গ্রহণ করেছেন, যদি পারো একটু সাহায্য ক'রো।’

অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোকটির নিজেরও রসবোধের অভাব নেই। বললেন, “ম্যানেজিং দ্য বস্-এর সহজ বাংলা হলো ‘সায়েব সামলানো’। অনেক লোকের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেছি, তবু আপনার কথা মনে হলো।”

ভদ্রলোককে বললাম, “ভৃত্যজীবনের নানা পর্যায়ে প্রভুগণ কর্তৃক নিগৃহীত বং পুরস্কৃত দুই হয়েছি অন্য অনেক হতভাগ্য বাঙালীর মতন। তবু এ-বিষয়ে মার এমন কি বলবার থাকেতে পারে যা বিলেত-আমেরিকার মহাপরাক্রমশালী গবেষকরা ইতিমধ্যেই নথিবদ্ধ না করেছেন?”

অনুসন্ধিৎসু ভদ্রলোক এত সহজে নিরস্ত হবার মানুষ নন। তিনি বললেন,

"বিলিতি বইতে যা লেখা থাকে তাই যদি এদেশে সত্য হতো তা হলে নতুন করে গবেষণার কোনো প্রয়োজনই হতো না। আমরা নিশ্চিন্তে টম, ডিক এবং মিস্টার হ্যারির অভিজ্ঞতার আলোকে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম।"

আমি বললাম, "আপনি বলতে চান, যা ওদেশে ঘটে তা এদেশে ঘটে না?"

আগন্তুক উত্তর দিলেন, "মানুষের স্বভাব একও বটে আবার বিচিত্রও বটে। পৃথিবীতে প্রভু এবং সহকারীর মধ্যে যা ঘটে তার কিছুটা এক রকম, আবার দেশে-দেশে বিভিন্নও বটে।"

আমি বললাম, "আপনি বৈজ্ঞানিক এবং গবেষক। সত্যকে জেনারলাইজ করাই আপনার কাজ। আমি এখন কথা-সাহিত্যের শিক্ষানবিশ—আমি কোথায় একটা কী ঘটেছে, একজন মানুষের কী অভিজ্ঞতা হলো তার সন্ধানেই সমস্ত সময় ব্যয় করে চলেছি। ডেফিনিশনের শিকলে মানুষের কোনো সম্পর্ককে সংহত করতে আমি শিখি নি। আমার সাহিত্যগুরুর মতে, এই প্রচেষ্টা লেখকের পক্ষে বিপজ্জনকও বটে।"

আগন্তুক জানালেন, "আমি তো সম্পর্কের সংজ্ঞা খুঁজতে আপনার কাছে আসি নি। আপনি এমন একজন প্রভুর কাছে কাজ করেছেন যিনি কোনো অদৃশ যাদুবলে আপনাকে আজও প্রায় ক্রীতদাস করে রেখেছেন। আমি ভাবলাম, সেই সম্বন্ধেই কিছু অনুসন্ধান করবো। আর সেইসঙ্গে খোঁজ করবো, বারওয়েল সায়েবের পরও তো আরও কয়েকজন প্রভুর কাছে কাজ করেছেন, তাঁদের সঙ্গে কাজ করে আপনার কেমন অভিজ্ঞতা হলো, তাঁদের কয়েকজনকে আপনি কীভাবে মনে রেখেছেন?"

এইসব নমস্য ব্যক্তিদের আমি সবার অলক্ষ্যে নমস্কার জানালাম। তাঁরা আমাকে বারওয়েল সায়েবের থেকে অবশ্যই অনেক বেশি অর্থ দিয়েছেন, অনেক বেশি দায়িত্বও পেয়েছি আমি। কোথাও-কোথাও অসম্মানের বলি হয়েছি কথাটা বলাও বোধহয় অসঙ্গত হবে না। তাঁদের অনেকের কাছ থেকে আমি কর্মজীবনের মূল্যবান শিক্ষা লাভ করেছি, আমার অভিজ্ঞতার দিগন্ত অবশ্যই বিস্তারিত হয়েছে। কিন্তু বলো মন, আমি কেন তাঁদের এমনভাবে স্মরণ করতে চাই না। যেমনভাবে আমি পেতে চাই প্রসন্ন সদাহাস্যময় বিদেশী বৃদ্ধটিকে যিনি কিছুকাল আমার হাতে মাত্র আশিটি করে টাকা তুলে দিয়েছেন সমস্ত মাসের পরিশ্রমের পর।

আগন্তুক গবেষককে বললাম, "ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানে যেসব কথা লেখা হয় সেসব পড়লে এক-এক সময় আমার ভয় হয়। মনে হয়, মানুষ সম্বন্ধে

আপনাদের আগ্রহ অত্যন্ত সীমিত। আপনারা ব্যক্তিমানুষের সুখ দুঃখ বেদনায় আগ্রহী নন, আপনারা শুধু ততটুকু জানতে চান যতটুকু জানলে সমাজবদ্ধ মানুষকে কর্মক্ষেত্রে বশীভূত করা যায়। স্বাধীন মানুষকে পরাধীন করার ষড়যন্ত্রের আর এক নাম ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞান।”

ভদ্রলোক অবশ্যই আমার সঙ্গে একমত হলেন না, তবে বললেন, “আপনি যা বলছেন তা হলো বিজ্ঞানের অপব্যবহার—কোথাও-কোথাও যে দাসত্ব-বন্ধনের চেষ্টা হচ্ছে না তা বলবো না, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করতে আমরাও সমান আগ্রহী, যতখানি আগ্রহী কথা-সাহিত্যিকরা। একটা কথা ভুলবেন না, সমাজবদ্ধ মানুষের সাধনা ও প্রচেষ্টাই আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রাণশক্তি—ব্যক্তিমানুষ যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, যদি সে দলবদ্ধ হতে অনিচ্ছুক হয়, তা হলে এদেশের প্রগতি স্তব্ধ হবে।”

ভদ্রলোক বললেন, “আমি সেই জন্যেই প্রভু এবং অধস্তনের সম্পর্ক সম্বন্ধে খবরাখবর সংগ্রহ করছি। ইচ্ছে আছে পরে সহকর্মীদের সম্পর্ক ও মানসিকতার ওপরেও কাজ করবো—কর্মীমানুষকে তখনই আরও সম্পূর্ণভাবে বোঝা যাবে।”

আমার প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক জানালেন, “কর্মক্ষেত্রে আমি দেখছি প্রভুকে পছন্দ করেন এমন লোকের সংখ্যা, প্রভুকে ভক্তি করেন এমন লোকের থেকে অনেক বেশী। আরও দেখচি, টিফিনের সময়, অফিস থেকে ফিরবার সময়, বাসে, ট্রামে, স্টেশনে এবং বাড়িতে গৃহিণীর কাছে নিয়মিত প্রভুনিন্দা করে অনেক লোক নিজেদের শরীর ও মনের জ্বালা মেটায়।”

আরও কী লক্ষ্য করা গিয়েছে তা জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করতে হলো। ভদ্রলোক বললেন, “প্রভুকে সামলানো যে অত্যন্ত কঠিন কাজ এ-কথা প্রায় সবাই বলে থাকেন। প্রভুর নির্দেশ সম্পর্কে দু'রকম মানসিকতা দেখা যাচ্ছে।”

ভদ্রলোক নিজেই ব্যাখ্যা করলেন, “কেউ-কেউ প্রভু যে-নির্দেশই দিন তা মাথা পেতে নিতে পারেন না। উপরওয়ালার সঙ্গে পায়ে পা দিয়ে বিবাদ সৃষ্টিতেই তাঁদের আনন্দ। এঁরা হলেন ‘চিরবিপ্লবী’। আর একদল মনে করেন প্রভু কোনো অন্যায় বা ভুল করতে পারেন না, তাঁর সব আদেশ সব সময় শিরোধার্য। যেখানে সবাই বুঝতে পারছে ভুল নির্দেশ আসছে, প্রভু নিজেও যেখানে অন্যপক্ষের মতামত শুনতে অসম্মত নন, সেখানেও তাঁরা নতমস্তকে নির্দেশ শিরোধার্য করে শেষ পর্যন্ত প্রভুকে বিপদে ফেলেন। এঁরা হলেন ‘চিরশিশু’, প্রভুকে এঁরা অভিভাবকের মতো দেখেন এবং অভিভাবক যে কোনো ভুল

করতে পারেন তা ভাবতে পারেন না।"

আমি চিরবিদ্রোহী নই, চিরশিশুও নই। কিন্তু অবশ্যই আমি বিমোহিত ভক্ত আমি সেই পরম সৌভাগ্যবানদের একজন যে সংসারের কঠিন কর্মক্ষেত্র, যার অপর নাম রণক্ষেত্র, সেখানেও অপ্রত্যাশিত স্নেহ এবং ভালবাসা পেয়েছি। কর্মের যুদ্ধক্ষেত্র কাকে বলে তা আমার জানার সুযোগ হয় নি।

ভদ্রলোক বললেন, "বিদেশী এক ম্যানেজমেন্ট মহাপণ্ডিতের বাণী বহু কর্মক্ষেত্রে প্রতিধ্বনিত হতে শুনলাম। প্রভুরা নাকি দু'রকম ঃ একদল 'জাত-পাঠক' আর একদল 'জাত-শ্রোতা'। যিনি জাত-পাঠক তিনি সহকারীর মুখের কথা শুনতে ততটা আগ্রহী নন, তিনি চান লিখিতং নোট। সেই নোট তাঁর সময় এবং সুবিধামতো তিনি পড়তে চান। আর যিনি জাত-শ্রোতা তিনি আপন সহকারীর ও নিজের মধ্যে কাগুজে-দূরত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী নন, তিনি চান—এসো, মুখেই সব বলো।"

আমার মনে পড়লো, এক অপরিণত-বুদ্ধি বালকের সঙ্গে পরিণত-বয়স্ক আইনবিদ সায়েব এক-একদিন এক-একরকম খেলায় মত্ত হতেন। চাকরিতে ঢুকে প্রথম দিকে আমি চুপ করে বসে থাকতাম, টেলিফোন বাজছে শুনলেই আমার ভয় হতো। ফোন তুলতে সাহসই হতো না, কারণ কাসুন্দের বালককে কষ্ট করে আবার অনেকগুলো ইংরেজি কথা বলতে হবে। সায়েব মজা করে চেম্বার থেকে বেরিয়ে কখনও-কখনও পাশের অফিসে চলে যেতেন। ওখানে বিখ্যাত সলিসিটর প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার অফিস।

সেখান থেকে আমাকে ফোন করতেন। আমার জড়তা কাটাবার জন্যে বলতেন, "বাঃ, কী সুন্দর তোমার কথা শোনা যাচ্ছে। তোমার থেকে ভাল টেলিফোন ম্যানারস কলকাতার আর কারও নেই।"

আমার টেলিফোন-ভীতি যখন কাটলো তখনও নিজের খেয়ালে অন্য অফিসে চলে গিয়ে সায়েব ফোনে আমাকে মজার-মজার কথা বলতে[ন]। "শংকর, টেলিফোন মানুষের চক্ষুলজ্জা কেড়ে নিয়েছে। অনেক কথা [যা] মুখোমুখি বলা যায় না, তাই মানুষ টেলিফোনে কেমন সহজে বলে ফেলে।"

এত কাছে থেকেও এই লুকোচুরি খেলা আমার বিষণ্ণ-মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতো, তিনি বীরবিক্রমে পাশের অফিস থেকে ফিরে আসতেন।

গবেষক ভদ্রলোক বললেন, "বিদেশী বিশেষজ্ঞ মতামত দিয়েছেন, ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত একই দাঁড়ায়। যে প্রভু জাত-পাঠক তাঁকে প্রথমে লিখিতং পাঠিয়ে পরে সুযোগমতো তাঁর সঙ্গে আলোচনা করো। আর যিনি জাত-শ্রোতা তাঁর সঙ্গে

প্রথমে আলোচনা করে পরে লিখিতং পাঠাও!"

আমার রূপকথার রাজ্যের সেই সায়েব কী ছিলেন জানতে চাইছেন এই গবেষক।

তিনি এবং আমি এক-একদিন এক-একরকম খেলায় মত্ত হতাম। একই চেম্বারের দুই অংশে আমরা দু'জন বসে আছি। নিজের চেয়ার থেকে কথা বললেই হাফ পার্টিশনের অপর প্রান্তে তা শোনা যায়। কিন্তু সায়েব হয়তো মজা করে নোট পাঠালেন, 'আজ আমরা পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে ভাব বিনিময় করবো।' তারপর সারাদিন ধরে চলতো আমাদের চিরকূট বিনিময়! সবচেয়ে ব্যস্ত সেদিন বেয়ারা মোহনচাঁদ—তাকে প্রায়ই আমার চিঠি সায়েবের কাছে এবং সায়েবের চিঠি আমার কাছে নিয়ে আসতে হচ্ছে। সায়েব লিখছেন, শব্দহীন বাণীর শক্তি অনেক। মানুষ যেদিন বাক্‌শক্তির ওপর টেক্কা দিয়ে লিখনশক্তি আয়ত্ত করলো সেদিনই আরম্ভ হলো তার জয়যাত্রা।'

সরল মনে তেমন কিছু না জেনেই আমিও একের পর এক উত্তর দিয়েছি। আমি লিখেছি, 'আমি শুনেছি মহাত্মা গান্ধী মৌনব্রত অবলম্বন করতেন, অথচ পণ্ডিত জওহরলাল কখনও তা করেন নি।'

সায়েব সঙ্গে-সঙ্গে লিখে পাঠালেন, 'নেহরুর পক্ষে মৌনী হওয়া কঠিন। কারণ তিনিও আমার মতন কেমব্রিজের ছাত্র। ওখানে গল্পগুজব একটু বেশি পরিমাণেই হয়।'

মনে আছে, মজা করবার জন্যে তিনি কোনো-কোনো চিরকূট 'অত্যন্ত গোপনীয়' মার্কা করতেন। একটি এমন গোপনীয় পত্রে লেখা, 'আজ একটা বাজবার আগেই আমি ক্ষুধার্তবোধ করছি। এই এটর্নি আমার ঘর থেকে বিদায় নেওয়া মাত্র আমরা কি টিফিন কেরিয়ারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি?'

এইসব চিঠি লেখায় সায়েবের কী আনন্দ হতো জানি না, কিন্তু আমি উপকৃত হতাম। আমার ইংরিজি লেখার ভয় ও জড়তা কেটে যেতো। আমি কাউকে তোয়াক্কা না করে কিছুমাত্র লজ্জা না পেয়ে নিজের খুশিমতো ইংরিজি লেখার সাহস অর্জন করতাম।

মাঝে-মাঝে সায়েব লিখতেন আকাশের বর্ণনা। সায়েবের বসবার সীট থেকে এক চিলতে পূর্ব-দক্ষিণের আকাশ দেখা যেতো। সায়েব কী অপরূপ বর্ণনা দিয়ে তাঁর নোট পাঠাতেন।

আরও থাকতো মজার-মজার কথা। খেলার ছলে যা রচিত দিনের শেষে তা সমস্ত নষ্ট করে ফেলছি—তখন মূল্য বুঝি নি। আজ সেই লেখাগুলো আবার

দেখতে ইচ্ছে করে। কোথায় কোন মূল্যবান রত্ন আবার সেগুলোর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেতো কে জানে? তখন বিশেষ কোনো মূল্য দিই নি, ভেবেছি এই তো স্বাভাবিক, এইভাবেই বুঝি সারাজীবন কাটবে। সব জিনিসই যে একদিন শেষ হবে এবং স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না, এ-কথা বোঝবার মতো দূরদৃষ্টি সেই অপরিণত বয়সে আমার হয় নি।

গবেষক ভদ্রলোক কিছুতেই আমাকে স্মৃতির আনন্দসাগরে ডুবে থাকতে দেবেন না।

তিনি বললেন, "আমরা দেখছি প্রভু এবং সহকারীর সম্পর্কের একটা প্রধান বাধা, প্রভু অনেক সময় সহকারীকে নির্ভরযোগ্য মনে করেন না। সহকারীও অনেক সময় ভুলে যান যে প্রভুর সময় সীমিত, সুতরাং অকারণে তাঁর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আবার কোথাও-কোথাও দেখছি, সহকারীর অভিযোগ—একে কাজের চাপে ব্যতিব্যস্ত, কাজ তুলতে-তুলতে নাভিশ্বাস উঠছে, এর মধ্যে সায়েবকে সামলাবার সময় কোথা থেকে খুঁজে বের করবো বলুন তো? সময় তো আর রবার নয় যে টানলেই বেড়ে যাবে!"

আমার মনে পড়লো, সায়েব মজা করে বলতেন, "সময় অবশ্যই রবারের মতন। যত বেশী কাজ করা যায় তত বেশী সময় যেন কোনো অদৃশ্যলোক থেকে বেরিয়ে আসে! এ-সংসারে যাঁরা খুবই ব্যস্ত লোক তাঁরাই সবচেয়ে নিয়মিত চিঠির উত্তর দিয়ে থাকেন। তাই কেউ-কেউ বলে যাঁরা কর্মব্যস্ত লোক একমাত্র তাঁদের ওপরেই বাড়তি কাজের বোঝা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। ক্ষয়ে গিয়ে ভাঙতে যত সময় লাগে মরচে পড়ে ভাঙতে তার থেকে অনেক কম সময় লাগে। সেই জন্যেই তো অখ্যাত একজন এটর্নির বিখ্যাত সন্তান বিবেকানন্দ বলেছিলেন, কাজ না-করে মরচে পড়ে শেষ হয়ে যাওয়ার থেকে কাজ করে-করে ক্ষয়ে যাওয়া ঢের ভাল।—বেটার টু উয়্যার আউট দ্যান টু রাস্ট আউট।"

আর বিশ্বাস? আমার না ছিল অভিজ্ঞতা, না ছিল ইংরিজি জ্ঞান। কাসুন্দের গলি থেকে সোজা হুগলী নদী পেরিয়ে হাইকোর্টে এসে আমি দিশেহারা। যে-মানুষ জীবনে কখনও সায়েব দেখে নি, ইংরিজি উচ্চারণ সম্পর্কে যার আজন্ম ভীতি সে বিনা পরীক্ষায় নির্বাচিত হয়ে মহাপণ্ডিত সায়েবের বাবু নিযুক্ত হয়েছে। কিন্তু যত চিন্তা যেন আমারই, যাঁর কাজ তুলতে হবে এ-বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। তিনি বিশ্বাস করে বসে আছেন প্রত্যেক মানুষই ইচ্ছে করলে অসাধ্য সাধন করতে পারে। তিনি যন্ত্র পেয়েছেন এই যথেষ্ট, এবার যন্ত্রকে নিজের কাজে

লাগাবার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব যেন তাঁরই। আমি তাঁর ইংরিজি উচ্চারণ বুঝবো না, আমি তাঁর ডিকটেশন ধরতে পারবো না, এসব তো তাঁরই চিন্তা, একজন অল্পবয়স্ক কর্মীর তো নিজের প্রচেষ্টাটুকু দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এই মানসিকতা যদি সর্বব্যাপী হতো তা হলে পৃথিবীর সমস্ত কর্মস্থল অনেক সুখের হয়ে উঠতো।

সায়েব ধরেই নিয়েছিলেন, তাঁর অধীনে যারা কাজ করতে এসেছে তাদের সম্ভাবনা অনন্ত, তাদের কোনো দোষত্রুটি থাকতে পারে না, তারা সবাই হীরের টুকরো। সত্যি নয়, অবাস্তব প্রত্যাশা, এমন পরিবেশেই বোধহয় কালো কয়লা হীরকখণ্ডে রূপান্তরিত হয়।

সায়েব একবার কৌতুকচ্ছলে বলেছিলেন, "ফুলের বাগানের মালি শুধু জল দিয়ে যায়, সার দিয়ে যায়—সে কখনও ফুলকে ডেকে কৈফিয়ত চায় না তুমি কেন তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠছো না? তুমি কেন ফুটে উঠছো না? মানুষ বড় সেনসিটিভ, কৈফিয়ৎ চাইলেই সে কুঁকড়ে যায়, কিন্তু প্রত্যাশা করলেই সে বিকশিত হয়ে ওঠে।"

মানুষের অসাধ্য কিছু আছে তা তিনি বিশ্বাসই করতেন না। তাই সায়েব আমাকে বলতেন, "অমুক আইনেব অমুক ধারাটা বের করে দাও, দেখো তো আমি যা ভাবছি ওরা সেই একই কথা বলছে কিনা।"

আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নেই, অভিজ্ঞতা নেই, কিন্তু আমার একবারও মনে হতো না, এসব আমার কাজ নয়, অথবা আমি এসব কী করে পারবো, আমি তো নিযুক্ত হয়েছি চিঠি টাইপ করবার জন্যে এবং বার-লাইব্রেরি থেকে লিষ্টি অনুযায়ী বই টেনে আনবার জন্যে। আমার মনে হলো না, আমি চাকরি করতে এসেছি। আমার মনে হলো, হাওড়ার বাড়ি থেকে আমি নিজেরই আর-এক বাড়িতে এসেছি। আমার পকেটে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপমারা অভিজ্ঞানপত্র না থাকতে পারে, কিন্তু এই বিশ্বভুবনের স্রষ্টা মানুষকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট লাইসেন্স গলায় ঝুলিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠান নি, সকলকে তার নিজের ইচ্ছামতো বিকশিত ও পল্লবিত হবার রাজটীকা পরিয়েই তো তিনি বিশ্বজয়ে পাঠিয়েছেন।

গবেষক ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রয়েছেন। অবশেষে তিনি মুখ খুললেন, "আপনি কি তা হলে বলতে চান আপনার সায়েব বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের ওপর নির্ভর করলেই সে নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে?"

আমি হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্র ছেড়ে অনেক বছর ধরে কর্মের বহুবিচিত্র তীর্থক্ষেত্রে নানাভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মানুষে মানুষে নানা বিষাক্ত

সম্পর্ক সম্বন্ধে আমি নিজেকে আজ অনবহিত বলতে পারি না। আমি উত্তর দিলাম, "আপনি ক্ষমা করবেন। আজকের এই অবিশ্বাসের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কথাটা আর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না, কিন্তু আমারই জীবনকালে এই অশান্ত কলকাতা শহরেই আমি এমন এক পরিবেশ পেয়েছি যেখানে সন্দেহ অথবা অবিশ্বাসের কোনো স্থান ছিল না। এমন একজন মানুষের সান্নিধ্যে আমি এসেছি যিনি জানতেন, বিশ্বাস করলেই মানুষ বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, নির্ভর করলেই মানুষ নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে। কর্মের এই বিশাল যজ্ঞশালায় বিধাতাপুরুষ কাউকেই টাইপ-করা জব ডেসক্রিপশন দিয়ে পাঠান নি—যার মধ্যে রয়েছে সীমাহীন সম্ভাবনা—কর্ম পরিচিতি দিয়ে তাকে ছোট করা যায় না।"

গবেষক ভদ্রলোক বিচলিত হলেন। তিনি বললেন, "আপনি কী বলতে চান মানুষ এই কলকাতা শহরেই দেবতা হয়ে উঠেছিল? মানুষকে অবিশ্বাস করার এবং শাসন করার কোনো প্রয়োজন নেই?"

আমার চোখে জল। আমার কিছুই বলবার নেই। আমি যে আনন্দসাগরে অবগাহন করেছি। যে পারে সে এমনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে। মধুর হাসিতে অবিশ্বাসের সমস্ত বিষ কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে, আমার নাই-বা থাকলো অর্থ, নাই-বা থাকলো প্রতিষ্ঠা—এই বিশ্বভুবনে আমিও আমার সাধ্যমতো বিকশিত হয়ে উঠবো। ভালবাসার অমৃত স্পর্শ থেকে এই জগৎসংসার এখনও পুরোপুরি বঞ্চিত হয় নি। কোনো অপার্থিব পরিবেশ থেকে এই বিশ্বাসের বাণী নিঃসৃত হয় নি, হাইকোর্টের গগনচুম্বী অট্টালিকার পাশে আর একটা পুরনো বাড়িতে আমি স্বর্গীয় মালঞ্চের সেই মালাকারকে দেখেছি। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, আমি তাঁকে চিঠি লিখেছি, আমি তাঁর নির্দেশ মান্য করেছি, অথচ কখনও এক মুহূর্তও মনে হয় নি তিনি প্রভু এবং আমি ভৃত্য।

গবেষক ভদ্রলোক আমার কাছে বিশেষ কিছুই পেলেন না। তাঁর অনুসন্ধানের মধ্যে স্ট্যাটিসটিকসের অনেক ভূমিকা ছিল। বললেন, "তা হলে আপনার অভিজ্ঞতার আলোকে প্রভু ও সহকারীর সম্পর্ক সবচেয়ে ফলপ্রসূ করে তোলার উপায় কী?"

আমি অনেকক্ষণ ভেবেও কোনো আশানুরূপ উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর হঠাৎ মনে পড়লো, কাজের ফাঁকে-ফাঁকে সায়েব একখানা জটিল আইনের বই রচনা করেছিলেন, যার নাম প্রভু-ভৃত্যের আইন—দ্য ল' অফ মাস্টার অ্যান্ড সার্ভেন্ট।

বিরাট বই, খণ্ডে-খণ্ডে প্রকাশিত হবে—এই ধরনের প্রচেষ্টা এদেশে এর আগে কখনও হয় নি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিচারকেরা গত দু'শতাব্দী ধরে এই বিষয়ে যেসব যুগান্তকারী আইনগত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তারই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে চলেছেন সায়েব এবং আমি দিনের-পর-দিন রাতের-পর-রাত টাইপ করে চলেছি।

প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কের মধ্যে কত জটিলতা এবং নীচতা থাকতে পারে তা আবিষ্কার করে আমি বিস্মিত হয়েছি এবং ভেবেছি, অবিশ্বাসের এই সম্পর্কের ইতিকথা পাঁচ হাজার পৃষ্ঠাতেও বোধহয় শেষ হবে না।

একদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমি অফিসে এই বইয়ের ডিকটেশন টাইপ করে চলেছি। হঠাৎ সায়েব এসে হাজির—এ সময় তাঁর টেম্পল চেম্বারে আসবার কথা নয়। তিনি আমার ওপর রাগ করলেন। "দশটা বেজে গিয়েছে, এখনও তুমি টাইপ করছো! বাড়িতে মাকে বলে এসেছো?"

আমার দুঃখিনী মাকে বলে আসা হয় নি, তিনি জানেন সংসারকে রক্ষার তাগিদে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ কর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করবে। আমাদের ফোন নেই যে কখন ফিরছি তাঁকে জানাবো।

সায়েব আমার দিকে তাকালেন, তারপর রাগ দেখিয়ে বললেন, "আমি তোমাকে ঠিক দু' মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে কাজ থামিয়ে তুমি যদি আমার সঙ্গে এই ঘর থেকে বেরিয়ে না আসো তা হলে আমি তোমাকে বরখাস্ত করবো।"

সেই রাতে টেম্পল চেম্বারের লিফট তখন বন্ধ। আমরা দু'জনে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নেমে এসেছিলাম। একটা ট্যাক্সি করে সায়েব আমাকে রাজভবনের পূর্বদিকে বাস স্টপেজে নামিয়ে দিয়ে তাঁর সাময়িক বাসস্থানের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

আমি তখন যে-অধ্যায়টি টাইপ করছিলাম তার নাম শ্রমবিরোধ। বরখাস্তের চ্যাপটারটা তার আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। যেহেতু সায়েব আমাকে বরখাস্তের ভীতিপ্রদর্শন করেছেন আমিও ট্যাক্সিতে চড়ে রসিকতা করে বললাম, "সেক্ষেত্রে শ্রমবিরোধের সম্ভাবনাও রয়েছে।"

সায়েব মনের সুখে হাসলেন। আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "আমার ভয় হচ্ছে প্রভু-ভৃত্যের এই জটিল সম্পর্ক সম্বন্ধে মোদ্দা কথাগুলো শেষ করতেই তোমাকে এখনও শতসহস্র পৃষ্ঠা টাইপ করার যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে। তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি কেন এই বই রচনায় ব্যস্ত রয়েছি।"

অবশ্যই আমি জানতাম। আদালতে কাজ কম, অথচ কিছু অর্থের বিশেষ প্রয়োজন।

জেনেও আমি চুপ করে রইলাম। সায়েব আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, "মাই ডিয়ার বয়, একদিকে এই হাজার-হাজার পৃষ্ঠার বিশ্লেষণ যার সমস্তটা ব্যবহার করলেও সমস্যার জটিলতা কিছু কমবে না, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক আরও জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকবে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। অন্যদিকে আর একটি পথ হলো বারওয়েলের এই বিশাল গবেষণা স্পর্শ না করে ছোট্ট একটি কথা স্মরণ রাখা : প্রভু-ভৃত্যের সেইটাই আদর্শ সম্পর্ক, যেখানে প্রভুর স্মরণ থাকে না যে তিনি প্রভু, আর ভৃত্য কখনও বিস্মৃত হন না যে তিনি ভৃত্য।'

গবেষক আমার কথা শুনলেন এবং কিছু না লিখেই বিদায় নিলেন।

মেমসায়েব

আমরা দু'জনে আবার কাজে বসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সায়েব তাঁর ডিকটেশন দিয়ে যান। তারপর ক্লান্তি বিনোদনের জন্য কিছুক্ষণ বইপত্র বন্ধ রেখে তিনি আমার সঙ্গে গল্প করেন।

আমি কখনও মনে-মনে ভাবি, হায়! রানীক্ষেত ক্লাবের গণ্ডগোলটার মধ্যে সায়েব না-জড়ালেই পারতেন, তা হলে আজ তাঁর মক্কেলের সংখ্যা কমতো না। আবার মনে হয়, ভালই হয়েছে। অর্থের প্রচুর সমাগম থাকলে বিভূতিদা সায়েবকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেন না, আমারও এই বিচিত্র মানবতীর্থ পরিক্রমার সুযোগ ঘটতো না।

তবু এক সময় আমি বোকার মতন সায়েবকে জিজ্ঞেস করেছি, "এই যে আপনি আদর্শের জন্যে লড়াই করলেন, এতে কোনো ইংরেজের সমর্থন পেলেন না কেন? ইংরেজরা তো মস্ত জাত, তাঁদের থেকে নীতিবোধ কারও উন্নত নয় বলেই তো শুনেছি। তাঁরা ক্লাইভ ও হেস্টিংসকেও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে দ্বিধা করেন নি।"

সায়েব হেসে, চোখ বড়-বড় করে বলেছিলেন, "অবশ্যই একজন ইংরেজ আমাকে সারাক্ষণ সমর্থন করেছেন। পারিবারিক ক্ষতি হতে পারে জেনেও তিনি আমাকে এই মামলায় এগিয়ে যাবার উৎসাহ দিয়েছেন। অথচ অন্য অনেক

ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আমার মতান্তর আছে।"

"কে এই ইংরেজ?" আমার জানতে ইচ্ছে হয়।

সায়েব চুপিচুপি বললেন, "তিনি আমার স্ত্রী—ম্যারিয়ন, যাঁকে সেই ছোটবেলা থেকে আমি স্কিপার বলে ডাকি।"

কী আশ্চর্য! এদিকে আমি হাইকোর্ট বার-লাইব্রেরির সামনে বাবুদের বেঞ্চিতে গুজব শুনছি, কর্তা-গিন্নির সম্পর্ক নাকি মোটেই ভাল নয়, দু'জনের মুখ দেখাদেখি নেই, একটা কিছু অঘটন ঘটে গেলে আশ্চর্য হবারও নাকি কিছু থাকবে না! দু'একজন তো আড়ালে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, "হ্যাঁরে, মেমসায়েব এখনও ইন্ডিয়ায় আছেন? না, বিলেতে ফিরে গিয়েছেন? শুনেছি দু'জনে বাক্যালাপ বন্ধ?"

"বাক্যালাপ অবশ্যই বন্ধ—কারণ রানীক্ষেতের বাড়িতে টেলিফোন নেই, তবে পত্রালাপ চলেছে নিরন্তরভাবে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একখানা, কখনও দু'খানা চিঠি আসে এবং যায়।"

"তুই জানলি কী করে?"

"বা রে! সায়েব তো সেই-সব চিঠি আমাকে পড়ে শোনান। প্রায়ই আমার প্রশংসা করে, সায়েব লেখেন এই রকম 'ভেরি গুড বয়' এ যুগে দুর্লভ! টাইপে এখনও দু'একটা ভুল হয়, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টাইপিস্ট বলতে শ্রীমান শংকরকেই যে বোঝাবে সে-বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!"

স্ত্রীর চিঠি কর্মচারীদের পড়তে বাধা নেই শুনে হাইকোর্টের বাবুরা তো তাজ্জব!

কিন্তু অবাক হলে কি হবে? যা সত্যি তা শুনে নাও। আমি তখন অবশ্য এইটাই স্বাভাবিক বলে ভেবে নিয়েছি। পরে বয়স যখন বেড়েছে তখন ভেবেছি কী অসীম বিশ্বাস ও মমতায় সায়েব আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন, কোথাও কোনো দূরত্ব রাখেন নি।

সায়েবকে লেখা মেমসায়েবের চিঠি নিয়মিত আসতো। তিনি সুলেখিকা। যেমন সুন্দর তাঁর হাতের লেখা, তেমনি সুন্দর তাঁর নিজস্ব টাইপিং। দেওয়ান সিং-এর কাছে জানতে পেরেছি একটি পোরটেবল টাইপরাইটিং মেশিন তাঁর নিত্য সহচর। তিনি একখানা উপন্যাস ফেঁদেছিলেন এদেশে আসবার ঠিক আগে। কিন্তু নানা কারণে তা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। রানীক্ষেতে আবার সেই উপন্যাসটি নিয়ে তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন।

স্ত্রীর কোনো চিঠিই সায়েব আমার কাছে লুকিয়ে রাখতেন না। আমাকেই

দিতেন ফাইল করতে। উত্তর সায়েব কখনও লিখতেন নিজের হাতে, আবার কখনও ডিকটেশনে।

হাতে লিখলেও আমার দিকে এগিয়ে দিতেন, "দেখো ঠিক লেখা হলো কিনা।" সে এক ভীষণ অবস্থা! স্ত্রীকে লেখা স্বামীর চিঠি সম্পাদনার দায়িত্ব খুব কম বাবুর ভাগ্যেই যে জুটে থাকে তা তখন না বুঝলেও আজ বুঝি।

একদিন রানীক্ষেত থেকে মেমসায়েবের চিঠি এসেছে। হাতে তেমন কাজ ছিল না। সায়েব নিজেই মেমসায়েবের গল্প শুরু করলেন।

হাইকোর্টের দু'একজন বাবু আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "বউকে সায়েব কী লেখেন?"

আমি উত্তর দিয়েছি, "কলকাতার আকাশ এখন কী রকম নীল, রেড রোডের গাছগুলোতে কী ফুল ধরেছে, এইসব নিয়ে অনেক পাতা লেখেন সায়েব। আমার কথাও লেখেন। মেমসায়েবকে আবার জানিয়েছেন, শংকর ইজ এ ভেরি গুড বয়।"

চিঠি পড়বার সময় অনেক বিষয়ে সায়েব আমার মতামত চাইতেন। আমি হয়তো কোনো মন্তব্য করলাম, তখনই সায়েব খস-খস করে লিখলেন, "পুঃ—শংকর আমার সঙ্গে একমত হচ্ছে না, বলছে রেড রোডের গাছগুলো ইতিমধ্যেই বেশ সবুজ হয়ে উঠেছে।"

আমার কথা লেখবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তিনি লিখতেন এবং মেমসায়েবের ওপর তার কী প্রতিক্রিয়া হবে ভেবে আমার ভয় করতো।

কিন্তু সুদূর রানীক্ষেত থেকে উত্তর এলেই সমস্ত সন্দেহের নিরসন হতো। চিঠিখানা নিজে পড়েই সায়েব আমার দিকে এগিয়ে দিতেন। মেমসায়েব রানীক্ষেতের অরণ্যসৌন্দর্যের বিস্তারিত বিবরণ লিখেছেন এবং মন্তব্য করেছেন, "কলকাতাকে আমি যতটুকু জানি তাতে শংকর-এর সঙ্গেই একমত হতে ইচ্ছে করছে—রেড রোডের গাছগুলো তো এতদিন ভেলভেট-সবুজ হয়ে উঠবারই কথা। মিডলটন স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর মোড়ের গাছটার খবর জানিও।"

"চোখে না দেখে কোনো রিপোর্ট দেওয়া যায় না।" সায়েব রসিকতা করলেন, তারপর আমার হাতে ট্যাক্সির ভাড়া গুঁজে দিয়ে বললেন, "যাও, এখনই মেমসায়েবের প্রিয় গাছটা দেখে এসো, পত্রপাঠ উত্তর দেওয়া প্রয়োজন।"

এমন অবস্থায় কখনও পড়ি নি! একটা গাছের খোঁজখবর নেবার জন্যে আমি সাতসকালে ট্যাক্সি চড়ে চৌরঙ্গী রোড ধরে চলেছি! গাছের সামনে এলাম, সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে দেখে আবার কর্মস্থলে ফিরে গেলাম।

সায়েব তারপর লিখতে শুরু করলেন : "অমন চমৎকার গাছটার মস্ত দুটো ডাল ইতিমধ্যেই কারা ভেঙে নিয়েছে। জ্বালানির দুর্ভিক্ষই এদেশের সমস্ত সবুজ সম্পদ নিশ্চিহ্ন করবে। শংকর নিজে ওই গাছের তলায় গোরক্ষপুরবাসী যে-চাওয়ালার দোকান আছে তার সঙ্গে কথা বলেছে—খুব সম্ভবত উনুনটা সে এবার গুঁড়ি থেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখবে। আগামী সপ্তাহে আমি নিজে খোঁজখবর নিয়ে তোমাকে জানাবো।"

সায়েব বললেন, 'আমি যেমন অগোছালো, আমার গৃহিণী তেমন গোছালো। আমি চোখ থেকে চশমা নামালে খুঁজে পাই না, আর আমার স্ত্রী তোমাকে এক মিনিটে বের করে দেবে ১৮৮০ সালে তাঁর বাবা ভিকটর প্লার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কী কবিতা লিখেছিলেন।'

এর পরেই ভিকটর প্লারের কথা উঠলো। ইনি কোনোদিন ভারতবর্ষে আসেননি, কিন্তু ভিকটর প্লার-এর বাবা সংস্কৃত চর্চা করতেন এবং বোধহয় সেই থেকেই ছেলের মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অন্তহীন শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিল।

যে ইস্কুলে তিনি পড়তেন সেখানে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্যে ভিকটর প্লার 'ভারতবর্ষ' বলে একটি কবিতা লিখেছিলেন, যার শুরু :

Before the face of the eternal East
Our songs, our systems and our histories seem
Frail, hueless, childlike........

এই কবিতায় ইংরেজের ভারত শাসন সম্পর্কে কিছু কটু মন্তব্য ছিল—ফলে স্বদেশভক্ত মাস্টারমশাই ছাত্রকে পুরস্কার দেন নি।

মেমস,য়েবের দিদিমার সঙ্গে ম্যাক্সমুলারের ভাব ছিল। তিনি কবিতাটি তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন।

ম্যাক্সমুলার সঙ্গে-সঙ্গে চিঠির উত্তর দিলেন, "আপনার ছেলের কবিতাটির মধ্যে অনন্যসাধারণ সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। আশা করি ভারতের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে উদ্দীপিত করবার মতো অনেক কিছু সে ভবিষ্যতে খুঁজে পাবে।"

"ম্যাক্সমুলারের এই চিঠিও আমার স্ত্রী তোমাকে দেখিয়ে দেবেন কয়েক মিনিটের নোটিসে।" সায়েব বললেন।

ভিকটর প্লারের কয়েকজন আত্মীয় বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন এবং নানা বিষয়ে সুনাম করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মিলিটারিতে। ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে অতি বৃদ্ধ অবস্থায় তাঁর একটু মতিভ্রম হয়েছিল।

বাড়িতে কোনো ছোট ছেলেমেয়ে এলেই মিলিটারি স্টাইলে বাজখাঁই গলায় তিনি জিজ্ঞেস করতেন, "হ্যাড ইউ বিন টু কো-য়ে-টা?"

কোয়েটা যায় নি শুনলেই আগন্তুক সম্পর্কে তাঁর সমস্ত আগ্রহ নষ্ট হয়ে যেতো। প্লারের আরেকজন আত্মীয় থাকতেন কলকাতার ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটে—ব্যারিস্টারি করে এতো অর্থ নাকি এদেশে থেকে তার আগে কেউ নিয়ে যেতে পারেন নি। বিলেতে ফিরে তিনি এসেক্সে একটি এলিজাবেথান ম্যানর এবং লণ্ডনে একটি ভিক্টোরিয়ান ম্যানসন কিনেছিলেন। ভারতবর্ষীয় রান্নার প্রেমে পড়ে গিয়ে এদেশ থেকে তিনি একজন রাঁধুনি নিয়ে গিয়েছিলেন, যাকে 'কারি কুক' বলে ডাকা হতো।

ভারতবর্ষ থেকে কোনো আত্মীয় ফিরলেই কবি ভিকটর প্লার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। কিন্তু তাঁর দুঃখ হতো 'প্রকৃত' ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এঁদের কাছে কোনো খোঁজখবর পাওয়া যায় না।

ভিকটর প্লার পরে কিংস কলেজে লাইব্রেরিয়ানের কাজ নেন এবং দু'জন বাঙালীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়। মিস্টার প্লার একসময় কলেজে ইংরেজি কবিতা সম্পর্কে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। এই বক্তৃতা শুনতে আসতেন একটি বাঙালী ছাত্রী, নাম সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়।

১৯শে ডিসেম্বর ১৮৯৫ সরোজিনীর লেখা চিঠি ঃ

৭৫, গুনটারস্টোন রোড
ওয়েস্ট কেনসিংটন

মহাশয়,

আমার কয়েকটি কবিতা সম্পর্কে আপনি যে উৎসাহ দেখিয়েছেন তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কিংস কলেজ গেজেটে যদি আমার কোনো লেখা প্রকাশিত হয় তাহলে আমি অবশ্যই গর্ববোধ করবো। যদি অনুমতি করেন তাহলে আমার কাব্যসাধনার দুর্বল প্রয়াসের আরও কয়েকটি নুমনা আপনার মতামতের জন্য পাঠাবো।

গতকাল হঠাৎ খবর পেলাম, 'ইন দি ডোরিয়ান মুড' বলে একটি কাব্যগ্রন্থ আপনি লিখেছেন। এই বইটি আমি যোগাড় করেছি, পড়ে নিশ্চয় খুব আনন্দ পাবো।

ইতি
সরোজিনী চট্টোপাধ্যায়

আর একজন বাঙালী যুবকের নাম বীরেন্দ্রলাল ভাদুড়ী। বীরেন্দ্রলাল ভাদুড়ী

বোধহয় বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। এঁর সঙ্গেও প্লার-এর পারিবারিক ভালবাসা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বীরেন্দ্রলালের সঙ্গে মিস্টার প্লারের কোনো যোগাযোগ থাকে নি।

সরোজিনীর সঙ্গে সায়েব ও তাঁর স্ত্রীর আমৃত্যু সম্পর্ক ছিল এবং সরোজিনী-কন্যা পদ্মজা নাইডুর সঙ্গেও মেমসায়েব সেই যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন।

বীরেন্দ্রলাল ভাদুড়ী কোথায় হারিয়ে গেলেন কে জানে। তাঁর কোনো চিঠিও মেমসায়েবের সংগ্রহে নেই। সায়েবের সন্দেহ বীরেন্দ্রলাল পরবর্তীকালে বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং সহজবোধ্য কারণে তাঁর চিঠিপত্র মিস্টার প্লার নিজের কাছে রাখতে সাহস পান নি।

"সরোজিনী এবং বীরেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল। সাহিত্যিক মিস্টার প্লারের বাড়িতে ওঁদের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো", সায়েব আমাকে বললেন। "কেমব্রিজে আমার আর একজন বন্ধু ছিল অমি চৌধুরী—পরে ব্যারিস্টার হয়ে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা পরিচালনা করেছিলেন রাণীর পক্ষে।" অমিয়নাথের ছেলে জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান হয়েছিলেন।

সায়েব মৃদু হেসে বললেন, "আমার সঙ্গে আমার স্ত্রীর যখন প্রথম দেখা হয় তখন আমার বয়স কুড়ি। আমার স্ত্রীর বয়স কত জানো?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। "আন্দাজ করো, মেক এ গেস।" সায়েব আর একটা সুযোগ দিলেন।

"সতেরো আঠারো?" আমি উত্তর দিয়েছিলাম। 'বিলেতে স্বামী এবং স্ত্রীর বয়সে বিশেষ পার্থক্য থাকে না বলেই শুনেছি।'

"পারলে না।" সায়েব হেসে উঠলেন। "বৎস, তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাইছে যে যখন আমার ভাবী স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় তখন তার বয়স সাত। সালটা এই শতাব্দীর শুরুতে—১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ। মিস্টার ভিকটর প্লার-এর সাত বছরের কন্যাকে আমি তখন কোলে নিয়েছিলাম বেশ মনে আছে এবং তার নতুন নাম দিয়েছিলাম 'স্কিপার'—সেই নামই হাফ-এ সেঞ্চুরি ধরে চলছে।"

"তারপর কত কাণ্ড ঘটে গেলো", সায়েব সহজভাবেই স্মৃতিচারণ করলেন। "আমি কেমব্রিজ থেকে এম-এ পাস করে ব্যারিস্টারি পড়লাম, লন্ডনে ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস আরম্ভ করলাম। মাঝখানে কিছুদিন খবরের কাগজে সাংবাদিকের কাজ করেছি। সাংবাদিক হিসেবে অনেক দেশও ঘুরে নিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি, স্কিপারই আমাকে এই ব্যারিস্টারি লাইনে আসার জন্যে

উৎসাহ দিয়েছে।"

"তারপর?" আমি ততক্ষণে গল্পের বড়শি গিলে বসেছি।

"তারপর আমি তো ব্যারিস্টারি পেশায় ডুবে গিয়ে সুখে লন্ডনে বসবাস করতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়—প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। আমি গাউন ছেড়ে সাধারণ সৈন্যের ইউনিফর্ম পরলাম। যে র‍্যাংকে আমি ঢুকেছিলাম তার নাম 'সাবলটার্ন'।"

"যুদ্ধের সময়কার গল্প তো তোমাকে বলেছি—ফ্রান্সে ট্রেঞ্চ যুদ্ধে অল্পের জন্যে জীবন রক্ষা পেলেও গুরুতরভাবে জখম হলাম। বীরত্বের জন্য মিলিটারি ক্রশ জুটলো।"

বীরত্বে ভিক্টোরিয়া ক্রশের পরেই সবচেয়ে সম্মান মিলিটারি ক্রশের। কিন্তু কেমন করে তিনি মিলিটারি ক্রশ পেলেন জিজ্ঞেস করলে সায়েব বীরত্বের কথাই তুললেন না। হেসে বললেন, "নীতিটা খুবই সহজ—মৃত সিংহের চেয়ে জীবিত গর্দভের মূল্য বেশী। কিন্তু শরীর ভেঙে পড়লো। ইতিমধ্যে মিলিটারিতে অনেকগুলো পদোন্নতি হয়েছে—সেদিনকার সাবলটার্ন কয়েক বছরের মধ্যে লেঃ কর্নেল।"

সায়েবের মুখেই শুনলাম, আহত অবস্থায় যখন লন্ডনে রয়েছেন তখন ম্যারিয়ন প্রায়ই তাঁর খোঁজখবর করেছেন।

"যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরেই হঠাৎ একদিন প্রায় বিনা নোটিসে ভারতবর্ষে যাবার হুকুম হলো। জাহাজে চড়ে খোদ বিলেত থেকে সোজা ভারতবর্ষে চলে এলাম। তারপর নানা জায়গা ঘুরে পাকেচক্রে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম।"

এই ফোর্ট উইলিয়মে কর্মরত অবস্থায় লেফটেনান্ট কর্নেল নোয়েল ফ্রেডেরিক বারওয়েল মিস্টার বারওয়েলে পরিবর্তিত হলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি শুরু করলেন। মিলিটারিতে যিনি এত সম্মানের সঙ্গে ছিলেন তিনি কেন এই পদ বিসর্জন দিলেন সে নিয়ে নানা কথা চালু ছিল সেই প্রসঙ্গে যথা সময়ে আসা যাবে।

এরপর আইনের পসার গড়ে তুলবার কাজে উঠে পড়ে লাগলেন বারওয়েল সায়েব। "ইতিমধ্যে ম্যারিয়নের সঙ্গে পত্রালাপ চলেছে আমার।"

"সময় কীভাবে কেটে যায়!" রসিকতা করলেন সায়েব। "স্কিপারের সঙ্গে প্রথম দেখা হলো ১৯০০ সালে। আর নিবিড় পরিচয়ের বাসনা জাগলো বত্রিশ বছর পরে। আমার বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে—মাথা জুড়ে মস্ত টাক তখনই শোভা পাচ্ছে! ১৯৩২ সালে স্কিপার কী রকম দেখতে হয়েছে তা আমার জানা

নেই—বহু বছর আমি দেশছাড়া। ওকে লিখেইছিলাম কিছুদিনের জন্য কলকাতা ঘুরে যাও—এখানকার পরিবেশ কেমন তা নিজের চোখে প্রথম দেখো, তারপর মনস্থির করা যাবে।”

মেমসায়েব জাহাজে জুড়ে প্রথমে মাদ্রাজ এলেন। সেখানে তাঁর এক দূর সম্পর্কের বোন তখন অ্যানি বেসান্তের শিষ্যা ছিলেন। মাদ্রাজ থেকে জাহাজে কলকাতায়। ভেবেছিলেন কোনো হোটেলে এসে উঠবেন। কিন্তু কলকাতায় পাকা সায়েবদের নিয়মকানুনই আলাদা। হাই সোসাইটির কুমারী মেমসায়েব হোটেলে উঠবেন একা-একা তা কল্পনাই করা যায় না। ফলে ম্যারিয়নের থাকার ব্যবস্থা হলো আলিপুরের থ্যাকারে হাউসে। যেটা এখনও চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি।

লন্ডনে চাকরি করেছেন মেমসায়েব। প্রতিদিন একা-একা যত্রতত্র বাসে-ট্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু উলট-পুরাণের দেশে এসে শুনলেন এখানে কোনো মেমসায়েব পায়ে হেঁটে চলেন না। ট্রামে-বাসে যাতায়াত তো কল্পনাই করা যায় না—সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দেওয়াল তাহলে নাকি ধ্বসে পড়বে।

এদিকে নোয়েলের সঙ্গে অনেকদিন তাঁর মুখোমুখি দেখা নেই। এই ক'বছরে তাঁর স্বভাব কিরকম পাল্টেছে কিছুই জানেন না। সুতরাং ঠিক করেছিলেন, এবার সব কিছু একটু নিজের চোখে দেখতে হবে এবং তারপর তো বিয়ের ভাবনা। কিন্তু.....

তখনকার কলকাতার ইংরেজ সমাজ যত রকম গুজবের বারুদখানা। যেখানেই মেমসায়েব যান সেখানেই শোনেন নোয়েল নাকি বলেছে, আমার ভাবী বধূ কলকাতায় আসছেন। সবাই জিজ্ঞেস করে, বিয়ের তারিখ কবে? ভাবনা-চিন্তার কোনো সময় পেলেন না মেমসায়েব। এখন অন্য কিছু করার কথাই ওঠে না। মেমসায়েব এবার নোয়েলকে বিয়ের তারিখ ঠিক করতে অনুমতি দিলেন।

ম্যারিয়ন প্লার কলকাতায় এসেছেন ১৯৩২ সালের শেষে। ১৯৩৩-এর গোড়ায় সায়েবের সঙ্গে যখন তাঁর বিয়ে হলো তখনও আমার জন্ম হয় নি।

“আমাদের বিয়ে হলো”, সায়েবের কাছে গল্প শুনছি। “বাঙালি কায়দায় বৌভাতের দু'রকম আয়োজন করতে হলো। একদিনের অতিথি কলকাতার খাঁটি ইংরেজরা যাঁরা দিশী লোকদের সঙ্গে মেলামেশা আদৌ পছন্দ করেন না। চব্বিশ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে তো কোনো ইন্ডিয়ানকে ঢালাও নিমন্ত্রণ করাও গোপনে নিষিদ্ধ ছিল—তখনও সন্ত্রাসবাদ চলছে। পকেটে

সারাক্ষণ একটা গুলিভরা রিভলবার নিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চলাফেরা করতেন। এদিকে আমাদের বাঙালি বন্ধু অনেক এবং তাঁরা সমাজের সর্বস্তর থেকে এসেছেন।

"শেষ পর্যন্ত মিডলটন স্ট্রীটের এক বাড়িতে সায়েব-মেমের বাঙালী বৌভাতটা সারা হলো। সেদিন বহু লোক এসেছিলেন এবং ভীষণ হৈ-চৈ হয়েছিল। সবচেয়ে চিন্তা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের তখনকার অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি স্যর মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে। সাত্ত্বিক হিন্দু ছিলেন তিনি, ম্লেচ্ছবাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের।"

"তারপর?" আমি এবার সায়েবকে জিজ্ঞেস করি।

সায়েব বললেন, "আমি ভেবেছিলাম, স্যর মন্মথনাথ আসবেন না। কিন্তু আমাদের অবাক করে সন্ধেবেলায় পরিবারে তিনি বৌভাতে চলে এলেন। সায়েবী বিয়েতে বাঙালি বৌভাত সেই বোধ হয় কলকাতায় প্রথম। বাঙালি বন্ধুদের মধ্যে খুব আনন্দ। মন্মথনাথ শুধু এলেন তাই নয়। ভারতীয়দের আনন্দোৎসব দেখে এতোই সন্তুষ্ট হলেন যে একটি আলাদা টেবিলে খেতেও বসলেন। আগে জানলে আমরা নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দিয়েই রান্না করিয়ে রাখতাম। কিন্তু মন্মথনাথ কোনো রকম দ্বিধা দেখালেন না, মনের আনন্দে তিনি পঙ্‌ক্তিভোজন করলেন। আমার স্ত্রীর কাছে এটা মস্ত এক ঘটনা, দেখা হলে জিজ্ঞেস করে নিও।"

স্কিপার আমাকে বলেন, "কী বলো, এটা মস্ত ঘটনা নয়? একজন নিষ্ঠাবান কুলীন ব্রাহ্মণ নিজের ইচ্ছায় প্রথম ম্লেচ্ছদের সঙ্গে অন্নগ্রহণ করছেন এর থেকে বড় ঘটনা আমার মতো মানুষের জীবনে কী ঘটতে পারে?"

"সায়েবের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল?" এই প্রশ্ন অবশ্যই আমার মনের মধ্যে ছিল।

সায়েব নিজেই একদিন বললেন, "তোমার জেনে রাখা ভাল, মিস্টার ভিকটর প্লার আমাকে খুব ভালবাসতেন। এক সময় তাঁর বিশেষ ইচ্ছেও ছিল আমি তাঁর জামাই হই। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় তিনি মেয়েকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'নোয়েল বারওয়েলকে তুমি কিছুতেই বিয়ে কোরো না'। স্কিপার সে-উপদেশ কেন মানলো না তা আমি তাকে জিজ্ঞেস করি নি।"

সায়েব বললেন, "স্কিপারের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে আমার মত ও রুচির পার্থক্য। স্কিপার একলা থাকতে চায়, আমি অনেক লোকের সান্নিধ্য পছন্দ করি। স্কিপার সামান্য কয়েকজনকে তার ভালবাসা দিতে চায়, আমি যাকে কাছে পাই

তার সঙ্গেই ভাব করি। স্কিপার বিশ্বাস করে মানুষের আত্মা অবিনাশী, আমি বিশ্বাস করি একটিই মানব জন্ম—স্বল্প সময়ের মধ্যে আমি সবরকম আনন্দের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। দূরদর্শী হিন্দুর মতো স্কিপার শত সহস্র বছর অপেক্ষা করতে রাজী। তার মধ্যে কোনো ব্যস্ততা নেই। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মধ্যে রীতিমত মিল।"

সায়েবের মুখেই শুনলাম, ভারতবর্ষের ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম ও লোকাচার নিয়ে মেমসায়েব অনেক পড়াশোনা করেন—এসব বিষয়ে তিনি সায়েবের থেকেও বেশি ওয়াকিবহাল।

সায়েব বললেন, "একবার এক জাঁদরেল ইংরেজ আমাদের বাড়িতে বসে এদেশের নিন্দা শুরু করলেন। কলকাতায় তাঁর অনেক ব্যবসাবাণিজ্য। স্কিপার তখন শিশুরক্ষা সমিতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'খ্রীষ্টান অথবা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান শিশুদের জন্যে কিছু অর্থ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু অন্য জাতের সন্তানদের জন্যে কেন আমি টাকা নষ্ট করবো?' কথাটা আমার মনঃপূত হয় নি, তবুও স্বাভাবিক সৌজন্যবোধে চুপচাপ থেকে যাচ্ছিলাম। ম্যারিয়ন হঠাৎ বলে উঠলো, 'আপনি কি কারণটা সত্যিই জানতে চান?' ম্যানেজিং এজেন্সির দোর্দণ্ডপ্রতাপ সায়েব মুখ তুললেন এবং ম্যারিয়ন জিজ্ঞেস করলো, 'কোন দেশ আপনাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে? যে-দেশে জন্মেছিলেন সে-দেশ থেকে কত টাকা এখানে এনেছিলেন?'

"বিজনেসম্যান সায়েব সেই যে লজ্জায় মাথা নিচু করলেন, তাঁকে আর কোনোদিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করা হয় নি।"

সায়েব বললেন, "ম্যারিয়নের আর একটা গল্প শুনে রাখো। বিয়ের পর এক রাজবন্দীর মামলায় আমি উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলাম। স্কিপারকে সঙ্গে নিয়ে আমরা ডাক বাংলোতে উঠেছিলাম। এই মামলার স্থানীয় উকিল ছিলেন ওয়ান মিস্টার ব্যানার্জী। বয়স্ক আইনজ্ঞ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ। ইংরেজকে যারা দেশ থেকে বিতাড়িত করতে চাইছে তাদের হয়ে মামলা করবার জন্যে তিনি আমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। আমি বললাম, স্বজাতির অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালতে প্রতিবাদ জানাতে পারবো না এমন কোনো প্রতিশ্রুতি তো স্বদেশে কোথাও দিই নি!

"উকিল মিস্টার ব্যানার্জি এবার মেমসায়েবকেও বিনয় ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা দেখালেন এবং বললেন, 'আপনিও যে স্বামীর সঙ্গে এতোদূরে ছুটে এসেছেন তার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' তখন বিকেলবেলা। ডাকবাংলোয়

বেয়ারা আমাদের সামনে চায়ের পট রেখে গেলো। ওঁদের আইন সংক্রান্ত আলোচনা চলছে। মেমসায়েব চা তৈরি শুরু করলেন। প্রথম কাপটা তিনি উকিলবাবুর দিকে এগিয়ে দিতে গেলেন। কিন্তু তিনি তা নিলেন না। মেমসায়েব বুঝতে না পেরে বললেন, 'নিন, আপনার চা।' মিস্টার ব্যানার্জি আবার তাকালেন, কিন্তু চা নিলেন না। মেমসায়েব বোকার মতো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি চা খান না?' ভদ্রলোক সোজাসুজি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, চা খাই বই কি!' আমি ততক্ষণে ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছি—মিস্টার ব্যানার্জি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, তিনি ম্লেচ্ছর হাতে তৈরি চা খাবেন না! পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্যে আমি তখন বললাম, 'স্কিপার, কাপটা আমাকে দাও'।

"এমন অপমান এবং এরকম অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা মেমসায়েবের জীবনে কখনও হয়নি। মিস্টার ব্যানার্জি কিন্তু নির্বিকার। ইংরেজদের তিনি যথেষ্টই ভালবাসেন, কিন্তু তাই বলে তাদের হাত থেকে পানীয় গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই!

"মেমসায়েবের অবস্থা শোচনীয়, কেউ চড় মারলেও এর থেকে অপমানিত হতেন না তিনি। মিস্টার ব্যানার্জি এই সময় আবার তাঁর পরিচিত এক ম্যাজিস্ট্রেট-গৃহিণীর কথা বলতে শুরু করলেন। এই ইংরেজ-নন্দিনীর দিবারাত্র সেবাযত্ন ছাড়া তাঁর স্ত্রী দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে সুস্থ হয়ে উঠতে পারতেন না। গল্পটা শুরু করার কারণ বোধ হয়, মিস্টার ব্যানার্জি বোঝাতে চাইছিলেন, ইংরেজ মেমসায়েবদের সম্বন্ধে তাঁর কৃতজ্ঞতা আছে, কিন্তু তাই বলে তিনি জাত নষ্ট করতে প্রস্তুত নন।"

সায়েব বললেন, "অস্পৃশ্যতার এই প্রথম ধাক্কা থেকে সামলে উঠতে ম্যারিয়নের বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। কয়েকমাস ধরে ঘটনাটা মনে হলেই তার মুখ রাঙা হয়ে উঠতো। আমি যতই তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে-দেশে যে-আচার, কিন্তু স্কিপার কিছুতেই বুঝতে চায় না।

"আমাব ভয় হয়েছিল, ম্যারিয়নের ভারতপ্রেম এবার শেষ হবে। কিন্তু আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম সে এখন ভারত ও ইংলন্ডের সম্পর্ক নিয়ে আরও পড়াশোনা করছে। তার ধারণা, পরস্পরের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে দুই দেশের যতটা জ্ঞান থাকা উচিত ততটা নেই। দু'জনে দু'জনকে ভালভাবে জানে না বলেই যত ভুল বোঝাবুঝি।"

সায়েবের মুখেই শুনলাম, এই সময় এক মজার ব্যাপার হয়েছিল। একজন ইংরেজ বন্ধু একদিন সকালে এদেশের নানা কুসংস্কার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য

করতে লাগলেন।

ব্রাহ্মণ উকিলের চা প্রত্যাখ্যানের খবর তখন বারওয়েল পরিবারের বন্ধুমহলে জানাজানি হয়ে গিয়েছে। বন্ধু বোধহয় সেই ভরসাতেই অভিযোগ করলেন, "এদেশে পদে-পদে কুসংস্কার!"

শ্রীমতী বারওয়েল সঙ্গে-সঙ্গে জানতে চাইলেন, "কোন দেশে কুসংস্কার নেই?"

বন্ধু বললেন, "এদের কুসংস্কারের বিবরণ শুনলে মাথায় হাত দিয়ে বসবেন। কোনদিন বিয়ে হবে তা স্থির করার জন্যও এরা পণ্ডিতের সঙ্গে পরামর্শ করে।"

মেমসায়েব বললেন, "আমি উনচল্লিশ বছর লন্ডনে কাটিয়ে এদেশে এসেছি। আমার জানাশোনা কোনো ইংরেজ মেয়ে ১৩ই এপ্রিল থেকে ১লা জুনের মধ্যে বিয়ে করতে রাজী নয়। মে মাসে বিয়ে করার দুঃসাহস আমার কোনো বান্ধবীর ছিল না! আপনি বলছেন, এদেশের হিন্দুরা বিয়েতে সাদা বা কালো রঙে ভয় পায়। ধরে নিচ্ছি এটা কুসংস্কার—কিন্তু আপনি কোনো ইংরেজ মেয়েকে বলুন তো সবুজ রঙের ড্রেশ পরে বিয়ে করতে!"

ইংরেজ বন্ধু এবার বললেন, "এদেশে মায়ের কোলে কোনো শিশুর স্বাস্থ্যের প্রশংসা করা চলবেনা—কারণ তারপর যদি সেই শিশুর কোনো অসুখ হয় তাহলে আপনিই তার জন্যে দায়ী হবেন।"

মেমসায়েব জবাব দিলেন, "আপনি কী জানেন, ইংলন্ডে এমন জায়গা আছে যেখানে মায়েরা কচি শিশুর নখ নিজের দাঁতে কেটে দেন? তাঁদের বিশ্বাস, কাঁচি বা নেল-কাটার ব্যবহার করলে শিশুর সর্বনাশা ফাঁড়া আসবে।"

ইংরেজ বন্ধু বললেন, "গোরুর প্রতি এতো যত্ন, কিন্তু গোরুর মাংসর কথা তুললে এদেশে রক্তারক্তি হয়ে যাবে!"

মেমসায়েব শান্তভাবে উত্তর দিলেন, "কোনো ইংরেজকে আপনি ঘোড়ার মাংস খেতে বলুন না একবার? অথচ ইউরোপের অনেক দেশে তো ঘোড়ার মাংস জনপ্রিয়।"

ইংরেজ বন্ধু পিছু হটবার পাত্র নন। বললেন, "যুদ্ধের সময় পোলান্ডে আমি ঘোড়ার মাংস খেয়েছি। কিন্তু হিন্দুরা না খেয়ে মরে গেলেও গোরু খাবে না।"

মেমসায়েব এবার অব্যর্থ বাণ ছাড়লেন, "চীনে কুকুরের মাংসে তৈরি একটা বিখ্যাত ডিশের নাম চাও পাপি—পারবেন খেতে?"

ইংরেজ বন্ধুর তো বমি হওয়ার যোগাড়। বললেন, "যাই বলুন, এদেশের 'কাউ ওয়ারশিপ' কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।"

মেমসায়েব বললেন, "দুষ্টজনেরা চুপি-চুপি বলে ইংরেজদের কুকুর প্রশস্তিরও কোনো যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। আদুরে শিশুর চেয়েও কুকুর ইংরেজের কাছে বেশি আদর পায়।"

ইংরেজ বন্ধু বললেন, "ইংরেজের কুসংস্কার তালিকা নিশ্চয় শেষ হয়েছে।"

"মোটেই নয়।" মেমসায়েব উত্তর দিলেন, "এই তো সবে শুরু। যেমন ধরুন, অসংখ্য ইংরেজ মই-এর তলা দিয়ে যাবে না। আয়না ভাঙা যে প্রচণ্ড অলক্ষণ তা কোন ইংরেজ না জানে? একটা ছুরির ওপর আর একটা ছুরি ক্রশ করে রাখাটা খুব খারাপ।"

"এসব অনেক পুরনো দিনের কথা," সায়েব বন্ধু প্রতিবাদ করেছিলেন।

"বেশ, আপনি এই কলকাতার কোনো ইংরেজকে বলুন রাতের সীট-ডাউন ডিনার-পার্টিতে তেরোজনকে নিমন্ত্রণ করতে। শুনুন, অনেক ইংরেজ এখনও বাড়ির মধ্যে ছাতা খোলার কথা ভাবতে পারে না। নতুন জুতো কখনোই টেবিল বা কোনো ফার্নিচারের ওপর রাখা যাবে না—এ-শিক্ষা আমিও আমার মায়ের কাছে পেয়েছিলাম ছাতা এবং জুতো ইংরেজের সংসারেও অমঙ্গল ডেকে আনে।"

আমি এসব সংস্কারের কথা কিছুই জানতাম না। সায়েব মৃদু হেসে আমাকে বললেন, "আমিও খবর রাখতাম না—কিন্তু স্কিপার আমার চোখ খুলে দিয়েছিল। সে বলে, ইংরেজের 'ফোকলোর' চর্চা বেশিদিনের নয়। ফোকলোর সোসাইটি অফ ইংলন্ডের প্রতিষ্ঠা মাত্র সেদিনে—১৮৬৬ সালে।"

সায়েব বললেন, "স্কিপারের ওপর সেদিন আমি খুব খুশি হয়েছিলাম—কারণ মুখের ওপর যোগ্য জবাব পেলে ইংরেজের ঔদ্ধত্য সঙ্গে-সঙ্গে শেষ হয়ে যায়—তোমাদের দেশে একেই বলে জোঁকের মুখে নুন দেওয়া। তোমাকে একটা কথা শিখিয়ে দিই—যে তোমাকে ছোট করার চেষ্টা চালাবে তাকে কখনও প্রশ্রয় দেবে না, তার মুখের ওপর জবাব দেবে। এদেশের মানুষ বড্ড নরম বলেই এখানে অত্যাচারীর সংখ্যা এত বেশি।"

নিজের দেশের মানুষদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ চালিয়ে শ্রীমতী বারওয়েল আমার শ্রদ্ধাভাজনীয়া হয়ে উঠলেন। তাঁকে তখনও আমি চোখে দেখি নি, কিন্তু চোখের দেখাই সব নয়। লক্ষ্য করলাম, সহধর্মিণীর এই তেজস্বিনী ভাবকে সায়েবও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন।

সায়েব বললেন, "আমার কর্মজীবনে স্কিপার সব সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—কখনও প্রশ্ন করে নি কেন কম ফি-তে আমি এদেশের দুরন্ত

ছেলেদের প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করি।”

ক্যালকাটা ক্লাবের একতলায় পূর্বদিকের ঘরটাতে বসে আবার রবীন্দ্র কলিতার কথা উঠলো। পুলিস হত্যার অপরাধে তার মৃত্যুদণ্ডের কথা আমি ‘কত অজানারে’ বইতেই লিখেছি। চট্টগ্রামের এই তরুণ রাজবন্দীকে আমি নিজের চোখে দেখি নি, কেবল তার পুরনো ব্রীফের কয়েকটা পাতা দেখেছি এবং সায়েবের কাছে শুনেছি কেমন করে রাজবন্দী থাকা অবস্থায় সে পুলিস খুন করে এবং আত্মীয়দের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে ফাঁসির মঞ্চে জীবন আহুতি দেয়।

সায়েব শুরু করলেন, “রবীন্দ্র কলিতার সব কথা সেদিন কিন্তু তোমাকে বলা হয় নি। ফাঁসি তো হয়ে গেলো, কিন্তু এখানেই সব শেষ করে দেবার পক্ষপাতী আমি ছিলাম না। আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে ভাবছিলাম কী ভাবে এই পরিবারের কিছু উপকার করা যায়। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেলো। তৎকালীন ছোটলাট স্যার জন অ্যান্ডারসনের সঙ্গে দেখা করলাম। সব চেষ্টা ব্যর্থ হবার পরেও ছোটলাটের কাছে একটা টেকনিক্যাল যুক্তি দেখিয়ে আবেদন করেছিলাম। বলেছিলাম, ছেলেটির মস্তিষ্কবিকৃতি আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা হোক। সেই আবেদন বিচারের সময় তড়িঘড়ি করে রবীন্দ্রর ফাঁসি হয়ে গেলো। খবরটা স্যার জন অ্যান্ডারসনকে মোটেই খুশী করতে পারে নি এবং সেকথা তিনি আমার কাছে স্বীকারও করেছিলেন।”

“এই সুবাদেই তাঁর সঙ্গে আবার দেখা করলাম। বললাম, যা হবার তা তো হয়ে গিয়েছে, আপনি এই পরিবারের একটি ছেলের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিন।”

ছোটলাট ‘না’ বলতে পারলেন না এবং সেই সুযোগে রবীন্দ্রর ছোটভাইয়ের একটা মাথা গোঁজবার ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

চট্টগ্রাম থেকে সরকারী খরচে তাকে কলকাতায় আনা হলো এবং সেখান থেকে ভর্তি করা হলো শ্রীরামপুর টেক্সটাইল প্রতিষ্ঠানে। এখানকার পাস-করা বয়ন-বিশেষজ্ঞদের খ্যাতি তখন সমস্ত ভারতে, টেক্সটাইল টেকনলজি পাস করে কেউ বসে থাকে না। কলেজের সঙ্গে সুন্দর হোস্টেলও আছে—সুতরাং সায়েব ও মেমসায়েবের মনে হলো, আর চিন্তার কিছু থাকবে না।

ছুটির দিনে সায়েব ও মেমসায়েব মাঝে-মাঝে শ্রীরামপুরে যেতেন কারণ আর্থিক ভার লাটসায়েবের হলেও দেখাশোনার দায়িত্ব সম্পূর্ণ সায়েবের। তাঁরাই এই যুবকের স্থানীয় অভিভাবক।

সায়েব আমার মুখের দিকে তাকালেন। “শোনো শংকর, এই দুঃখের গল্পটা। কত আশা করে রবীন্দ্রর ছোটভাইকে শ্রীরামপুরে পাঠিয়েছিলাম। যখন শুনলাম

সে পড়াশোনায় খুব ভাল করছে তখন আমার খুব আনন্দ। পড়াশোনা ছাড়াও খেলাধুলায় সে এক নম্বর। স্পোর্টসম্যানের স্বাস্থ্যও কী সুন্দর। সেবার আমাদের দু'জনকে দেখে তার খুব আনন্দ। কলেজ থেকে হাঁটতে-হাঁটতে আমরা শ্রীরামপুরে গঙ্গার ধারে গেলাম। সে বললো, আপনাদের দু'জনকে নৌকায় বসিয়ে আমি দাঁড় টানবো।"

"স্কিপার আপত্তি তুলেছিল, এটুকু ছেলের অত পরিশ্রমের কোনো অর্থ হয় না। কিন্তু সে শুনলো না। আমাদের নৌকোয় বসিয়ে সে এপার-ওপার করলো, সিংহের মতো বিক্রমে বললো, দেখলেন তো আমার কত ক্ষমতা।"

একটু থামলেন সায়েব। "স্কিপার কতবার যে দুঃখ করেছে, কেন যে ছেলেটাকে অতক্ষণ ধরে দাঁড় টানতে দেওয়া হলো। ঠিক এক সপ্তাহ পরে খবর এলো দ্রুত শ্রীরামপুরে চলে আসতে। সুধীন্দ্রর টি-বি হয়েছে, সে ছোট্ট একটা হাসপাতালে পড়ে রয়েছে। সে যুগে টি-বি'র তেমন কোনো চিকিৎসা ছিল না। কোনো বাড়িতে টি-বি হয়েছে শুনলে সে-বাড়িতে লোক যাতায়াত বন্ধ করে দিতো।

"অনেক চেষ্টায় রোগীকে কলকাতার এক হাসপাতালে নিয়ে এলাম। ডাক্তাররা বললেন, কোনো স্বাস্থ্যকর স্যানাটোরিয়ামে পাঠান। আবার গেলাম স্যার জন অ্যান্ডারসনের কাছে। তাঁর খরচেই নার্স সহ রোগীকে পাঠানো হল দক্ষিণ ভারতের মদনাপল্লীতে।"

"তার পরের ব্যাপারটা এই রকম। সেবার আমি কলকাতার বাইরে গিয়েছি। মামলা করতে। স্কিপারে কাছে টেলিফোন এলো এখনই শিয়ালদহ স্টেশনে চলে আসতে। রোগীর শেষ অবস্থা। তার ইচ্ছা নিজের দেশ চট্টগ্রামে গিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবে। রোগীকে মদনাপল্লী থেকে আনা হয়েছে, কিন্তু রাতের আশ্রয় প্রয়োজন, চট্টগ্রামের ট্রেন পরের দিন ছাড়বে।"

শ্রীমতী বারওয়েল তখনই ছুটে গেলেন শিয়ালদা স্টেশনে—সেখানে মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটির সঙ্গে দেখা হলো—তাকে তখন চেনাই যায় না। এর পর তিনি বের হলেন হাসপাতালে এক রাতের আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য। কলকাতার কোনো হাসপাতাল তিনি বাদ দেন নি—কিন্তু কোথাও সফল হলেন না। এই রোগীকে কেউ নিতে চায় না।

সায়েব বললেন, "পরের দিন যখন আমি কলকাতায় ফিরে এলাম তখন স্কিপার কান্নায় ভেঙে পড়লো। স্কিপার ছেলেটির কোনো কাজে লাগেনি—একজন মৃত্যুপথযাত্রীর এক রাতের আশ্রয় সংগ্রহ হয়নি। রোগীকে

বাড়িতে নিয়ে আসবে ভেবেছিল স্কিপার—কিন্তু বাড়িতে যেসব কর্মী সপরিবারে থাকে তারা ভীষণ ভয় পেলো। অগত্যা গভীর রাতে স্কিপার আবার শিয়ালদহের প্ল্যাটফর্মে ফিরে গিয়েছে, তখন রোগীর সহযাত্রীরা প্ল্যাটফর্মের ওপরেই বিছানা পেতে নিয়েছে।

"স্ত্রীকে বললাম, স্কিপার, তুমি আমার থেকেও বেশি করেছো। হাসপাতালে ব্যর্থ হয়ে আমি আবার শিয়ালদহ স্টেশনে রোগীর কাছে ফিরে যেতাম না!"

কবেকার কথা—তবু সায়েবের কথা শুনে অনেকদিন পরে আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

সায়েব বললেন, "আমার স্ত্রীর একমাত্র সান্ত্বনা হতভাগ্য ছেলেটি জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পেরেছিল। এবং সেখানে তিনদিন পরে মৃত্যু তার সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে দেয়।"

সায়েব আরও বললেন, "বিশ্বাস করো, স্কিপার এইসব ব্যাপারে আমার থেকে অনেক এগিয়ে—শত দুঃখের মধ্যেও মানুষকে ভালবাসতে ওর জুড়ি নেই।"

সায়েব বললেন, "আমাদের দু'জনের মধ্যে অনেক মতবিরোধ এবং মতপার্থক্য আছে, কিন্তু তবু বোধ হয় কয়েকটা ব্যাপারে আমরা আদর্শ দম্পতি। যে-ব্যাপারে আমরা দু'জন হরিহর-আত্মা তা হলো ভারতবর্ষ। স্কিপার এদেশের মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে—তার জন্যে বিদেশী মহলে গঞ্জনা জুটেছে, কিন্তু স্কিপার কারও তোয়াক্কা করে না। মানুষকে ভালবেসে যে-কোনো কাজ করার দুঃসাহস সে রাখে এবং অন্তত ঐ একটি বিষয়ে আমাদের মনে কোনো মতবিরোধ হয়নি।"

সায়েব বললেন, "এদেশে আসবার পরে আমি একবারও ইংলন্ডে যাই নি। কেউ হয়তো বিশ্বাস করবে না, বিয়ের পরে একবারও তাকে বাপের বাড়িতে পাঠাবার জন্যে স্কিপার আমাকে অনুরোধ করেনি। এদেশের জল, হাওয়া, মাটির সঙ্গে ও যেন একাত্ম হয়ে গিয়েছে।"

—

ছোটরা ছোট নয়

স্পেনসেস হোটেলের তিনতলার ঘরে আমরা আবার পূর্ণ উদ্যমে আইন বই লেখার কাজ শুরু করে দিয়েছি। এখন সায়েব ব্যস্ত রয়েছেন শিশু-শ্রমিকদের অধ্যায়টি নিয়ে।

চাইল্ড্ লেবার! পৃথিবীর সব দেশে এ এক লজ্জার ব্যাপার। সায়েব বললেন, "এর দুটো দিকই আছে। যে-দেশ যত দরিদ্র সে-দেশে শিশু-শ্রমিকের তত যন্ত্রণা। কেউ কেউ বলেন, আইন পাস করে শিশুদের কাজ বন্ধ করে দাও। আবার কেউ বলেন, শুধু কাজ বন্ধ হলে আরও ক্ষতি, যদি-না একই সঙ্গে সরকারী উদ্যোগে ছোটদের দেখাশোনার ব্যবস্থা হয়। যতক্ষণ সরকার তা করতে পারছেন না ততক্ষণ যারা দরিদ্র তারা অল্প বয়সেই নিজেদের অন্নসংস্থান করুক, কিন্তু সহনীয় পরিবেশের মধ্যে।"

এই অধ্যায়টি যে পুরোপুরি মেমসায়েবের কাছে পাঠাতে হবে তা সায়েব জানিয়ে রাখলেন। সায়েব বললেন, "এদেশের ছেলেদের দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে যে অনেক কিছু করা প্রয়োজন সে-বিষয়ে স্কিপার এবং আমি একমত।"

শিশু-সংক্রান্ত একটি সমিতির সঙ্গে এঁরা দুজনেই দীর্ঘদিন জড়িয়েছিলেন। মেমসায়েব ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদক, সায়েব ছিলেন আইনসংক্রান্ত উপদেষ্টা।

সায়েব বললেন, "আমরা সব কাজ করতে পারি নি, কিন্তু স্বয়ং টেগোরের গুড উইশেস পেয়েছি। ইংরিজি এবং বাংলাতে তিনি শুভেচ্ছাবাণী লিখে দিয়েছেন। বাংলা কবিতাটা বোধ হয় এইরকম :

দেবমন্দিরে আঙিনা তলে
শিশুরা করেছে মেলা
দেবতা ভোলেন পূজারী দলে
দেখেন শিশুর খেলা।"

আমরা যেদিন এইসব আলোচনা করছি সেদিনের সংবাদপত্রেই একটি বালক পকেটমার ধরা পড়ার খবর বেরিয়েছে। জনতা কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার

পরে এখন সে হাসপাতালে; পরে বিচার হবে আদালতে।

খবরটা দেখে সায়েব বললেন, "স্কিপার কলকাতায় থাকলে আজ এতক্ষণে সে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। প্রথমে হাসপাতালে এবং পরে আদালতে ছুটতো।"

"ছোটদের জন্যে তো আলাদা আদালত আছে", আমি বলি। "সেখানে নিশ্চয় ছোটদের সমস্যাগুলো বিশেষভাবে মনে রাখা হয়।"

"আইন তো সব আছে" দুঃখ করলেন সায়েব। "ভারতবর্ষের মতো এতো আইনকানুন পৃথিবীর কোনো দেশে নেই। কিন্তু আইনের ঠিকমতো প্রয়োগ কোথায়? চীনা ঋষিরা ঠিকই বলেছেন : আইন বেশি হলে আইনভঙ্গও বেশি হবে!"

সায়েবের কাছে শুনলাম, "স্কিপার সময় পেলেই ছোটদের আদালত এবং আশ্রয়স্থলে ঘুরে বেড়াতো, নিজের চোখে শিশুদের অবস্থা দেখতো। একবার স্কিপার একটি শিশুর খোঁজ নিয়ে এসেছিল, এক টুকরো মাছ চুরির জন্য সে সাত বছর বন্দিদশায় রয়েছে! একটুও বাড়িয়ে বলছি না, ভারতবর্ষ এখনও চার্লস ডিকেন্সের ইংলন্ড হয়ে রয়েছে।"

"মাছভাজা কেসটার শেষ পর্যন্ত কী হলো?" আমি জানতে চাই।

"উদ্ধার হলো, ছেলেটি আমাদের সোসাইটির রক্ষণাবেক্ষণে এলো। কিন্তু এরকম ঘটনা আরও কত ঘটছে কে তার হিসেব রাখবে? ইংরেজরা এই শহরের সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। স্কিপার দুঃখ করে, ধনী ইন্ডিয়ানরাও এখন সেই একই পথ বেছে নিয়েছেন। জনজীবনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক নেই।"

এ-বিষয়ে আমিও যে তাঁদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত একথা শুনে সায়েব খুব খুশী হলেন। বললেন, "অপরকে দোষ দেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হলো কী করে সমস্ত মানুষকে জাগানো যায়।"

এরপর সায়েব দুঃখ করলেন, "ছোটদের অনেক মামলায় আমরা শেষ পর্যন্ত হার মেনেছি। কারণ ছোটদের কানা খোঁড়া করে যারা নিষ্ঠুর ব্যবসা ফাঁদে তাদের পয়সাও আছে এবং পয়সা ফেললে ঝানু উকিলও পাওয়া যায়। অনেক শিশুকে এই সব দুষ্টরা তাদের কাকা বা বাবা কিংবা মামা সেজে আদালতের আশ্রয় থেকে আবার কেড়ে নিয়ে গিয়েছে। তবে একবার মেমসায়েব জিতেছিলেন।"

জেতার গল্পটা এই রকম: শিশু আদালতে একটি কেস উঠেছে। ব্যাপারটা শুনেই বিচারক সেবার মেমসায়েবকে ডেকে পাঠালেন। ছেলেটির বিরুদ্ধে 'গুরুতর' অভিযোগ, সে চার আনা পয়সা চুরি করেছে! আগেই সে বেশ মারধর

খেয়েছে। কিন্তু আদালতে সে কিছুই বলতে পারছে না। এক পিস মাছের জন্যে সে যদি সাত বছরের যন্ত্রণা তোলা থাকে তা হলে চার আনা চুরি করার অপরাধে কী শাস্তি হতে পারে আন্দাজ করে মেমসায়েব বেশ চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

দয়ালু বিচারক ছেলেটিকে শাস্তি না দিয়ে সোসাইটির হাতে তুলে দিলেন। মেমসায়েব খুশি হলেন।

কিন্তু শত চেষ্টা করেও ছেলেটির সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না। তখন মেমসায়েব ছেলেটিকে এক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, কথা বলবে কী করে— ছেলেটি কালা। এবং কালারা বোবাও হয়ে থাকে।

মেমসায়েব কিন্তু আশা ছাড়লেন না। তাঁর কেমন ধারণা হলো এই ছেলের পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবেই। নিশ্চয় কোনো কারণে বাড়ি থেকে চলে এসেছে, তারপর ফিরতে পারে নি।

কয়েক সপ্তাহের চেষ্টার পরে একটি মাত্র বিকৃত শব্দ মেমসায়েবের কানে এলো যেটা অনেকটা 'বোম্বাই' -এর মতো। মেমসায়েবের মাথায় ঢুকলো, ছেলেটি নিশ্চয় বোম্বাই থেকে পালিয়ে এসেছে। কলকাতার ছেলেদের বম্বেতে এবং বম্বের ছেলেদের কলকাতায় পালিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ অনেক দিনের।

বোম্বাই প্রসঙ্গে সমিতির পরিচালকদের অনেকেই কোনো উৎসাহ দেখালেন না, কিন্তু মেমসায়েব তখনও নাছোড়বান্দা। সুতরাং শিশু সোসাইটির একজন ইন্সপেক্টরের সঙ্গে ছেলেটিকে পাঠানো হল বোম্বাইতে। সেখানেও শিশুদের একটি সোসাইটি আছে, পত্রযোগে তাঁদের সাহায্য প্রার্থনা করা হলো।

থানা, পুলিস, সংবাদপত্র এবং বোম্বাই সোসাইটির মাধ্যমে ছেলেটির আপনজনদের অনেক খোঁজাখুঁজি করা হলো, কিন্তু কোনোক্রমে 'বোম্বাই' উচ্চারণ করলেই বিরাট শহরে হারানো আত্মীয়স্বজনকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

যথাসময়ে কলকাতায় মেমসায়েবের কাছে বিফল হবার খবর এলো।

মেমসায়েব কী ভেবে বললেন,"বোম্বাই কথাটা যখন ছেলেটি বলেছে, তখন বোম্বাই মূক বধির ইস্কুলে সে পড়ুক বম্বে সোসাইটির তত্ত্বাবধানে। আমরা এখান থেকে খরচ পাঠাবো।"

"এরপরে আবার সামান্য গোলমাল বাধলো", সায়েব বললেন। "বোম্বাই ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব ইস্কুলে ছেলেটির ভর্তির ব্যবস্থা যখন পাকা হয়ে গিয়েছে ঠিক সেই সময়ে তার হাম হলো। ভীষণ ছোঁয়াচে রোগ, তাই তাকে হাসপাতালে আলাদা করে রাখার ব্যবস্থা হলো। এবং এই হাসপাতালেই ছেলেটির ভাগ্য খুলে গেলো।"

"কী রকম?" আমি সায়েবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

সায়েব বললেন, "যেদিন ছেলেটিকে হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ড থেকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ঠিক তার আগের দিন আর একটি ছোঁয়াচে রোগীকে ওয়ার্ডে আনা হলো। এই ছেলেটিও বম্বের রাস্তায় ভিক্ষে করে, তবে বোবা-কালা নয়। ভাগ্য একেই বলে। এই ছেলেটি আমাদের ছেলেটির গ্রামের বাসিন্দা। বোবা ছেলেটিকে দেখেই সে চিনতে পেরেছে এবং তার বিছানার কাছে ছুটে এসেছে।"

মেমসায়েব অশেষ ধৈর্যের সঙ্গে যা সন্ধান করছিলেন তা ঈশ্বরের আশীর্বাদে পেয়ে গেলেন। ছেলেটির ঠিকানা বোম্বাই নয়, উত্তরপ্রদেশের উত্তর পশ্চিম থেকে সে এসেছে। বাড়ির অবস্থা ভালই, বাবা-মা খবর পেয়েই হারানো ছেলেকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে বোম্বাইতে ছুটে এলেন। জানা গেলো, বাড়ি থেকে স্টেশনে বেড়াতে এসে খেয়ালের বশে ছেলেটি হঠাৎ ট্রেনের কামরায় উঠে পড়েছিল, ট্রেন হঠাৎ চলতে শুরু করে, সে আর নামতে পারে নি। সারা ভারত ঘুরতে-ঘুরতে অসহায় ছেলেটি অবশেষে কলকাতায় হাজির হয়েছিল এবং মামলায় জড়িয়ে পড়েছিল।

এই ধরনের পুনর্মিলন সাধারণত গল্প, উপন্যাস এবং সিনেমায় সম্ভব হয়। কিন্তু সায়েব বললেন, হারানো ছেলেকে বাবা মায়ের হাতে আবার তুলে দিতে পেরে স্কিপারের সে কী আনন্দ! লক্ষ পাউন্ড লটারি জিতলেও সে অত খুশি হতো না তা তোমায় বলতে পারি, মাই ডিয়ার বয়।"

কষ্টের মধ্যে যারা দিন যাপন করে তারা যে কষ্টের গল্প শুনতে ভালবাসে না তা সায়েব বোধ হয় ভালভাবেই বুঝতেন। যার এখনও আঠারো বছর বয়স হয় নি সে নিজেই চাইল্ড লেবার সংক্রান্ত সুদীর্ঘ আলোচনা শর্টহ্যান্ডে লিখে নিচ্ছে তা হয়তো সাবধানী সায়েবের নজর এড়ায় নি।

তাই আইনের দীর্ঘ পরিচ্ছেদটি নিয়ে যতদিন গবেষণা চলেছিল ততদিন তিনি প্রায়ই আমাকে বলতেন, "শিশুশক্তি ও যুবশক্তিকে যে-দেশের মানুষ অবহেলা করে সে-দেশ কখনও বড় হবে না!"

তারপর শুরু হতো সায়েবের গল্প, সেইসব মানুষের কথা যাঁরা অতি অল্পবয়সে পৃথিবীতে বড়-বড় কাজ করে গিয়েছেন।

"বিরাট কাজের জন্যে বিরাট বয়সের প্রয়োজন হয় না, এই কথাটা কখনও ভুলো না, মাই ডিয়ার বয়", সায়েব আমাকে উৎসাহ দেবার জন্য প্রায়ই বলতেন।

ছোটদের বড় কাজের ইতিহাসটা এই বয়সেই আমি কখনও ভুলতে পারি নি। যারা আজও ছোট রয়েছে এবং ভাগ্যদোষে কষ্ট সহ্য করছে তাদের অবগতির জন্য সায়েবের কথাগুলো আর একবার স্মরণের চেষ্টা করছি।

সায়েবের স্মৃতিও যেমন প্রখর ছিল, বলবার ভঙ্গীও ছিল তেমনি মধুর। তাঁর মুখ দিয়ে একবার কিছু শুনলে যে কোনো লোকের তা অনেকদিন মনে থাকতে বাধ্য।

"বেনজামিন ডিজরেলি কী বলে গিয়েছেন তা মনে রেখো, মাই ডিয়ার বয়", সায়েব আমার দিকে সস্নেহে তাকিয়েছিলেন। "এই পৃথিবীর উন্নতির মূলে বুড়োরা নেই। পৃথিবীর যা কিছু মহৎ তা কমবয়সীদের কীর্তি।"

আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি শুধু শুনেছি, স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত কম বয়সে শিকাগোর বিশ্বধর্মসভায় নাম করেছিলেন।

অবিশ্বাসী আমাকে দলে টানার জন্য সায়েব একের পর এক কমবয়সীদের বিচিত্রকীর্তির তালিকা শুনিয়ে যেতে লাগলেন অনর্গল।

পাশ্চাত্য সঙ্গীত সায়েবের অতি প্রিয়। তিনি প্রথমেই সঙ্গীত সম্রাটকে স্মরণ করলেন— উলফগঙ্গ মোৎসার্ট। "জানো ক'বছর বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গীত রচনা শুরু হয়েছিল?"

মোৎসার্ট যে শিশুপ্রতিভা তা আমি শুনেছিলাম, কিন্তু চার বছর বয়সে যে তাঁর রচনায় হাতেখড়ি তা আমার অজানা ছিল।

সায়েব বললেন, "মোৎসার্টের প্রথম সাঙ্গীতিক প্রোগ্রাম শুরু হয় ৬ বছর বয়সে, প্রথম সোনাটা রচনা করেন ৭ বছর বয়সে এবং প্রথম সিমফনি সমাপ্ত করেন ৮ বছর বয়সে।"

সুরের আর এক রাজাধিরাজ লুডউইগ ভ্যান বীঠোফেনেরও প্রায় একই রেকর্ড। "মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি সঙ্গীত রচনা করেন এবং মাত্র ১৫ বছর বয়সে পিয়ানোফোর্ট কোয়ার্টেট।"

শুধু সঙ্গীত নয়, বিজ্ঞানের প্রসঙ্গও তুললেন সায়েব। "আলবার্ট আইনস্টাইন ১৫ বছর বয়সের মধ্যেই ইউক্লিড, নিউটন, স্পিনোজা গুলে খেয়েছিলেন। যে রিলেটিভিটি থিওরি (আপেক্ষিক তত্ত্ব) তাঁকে বিশ্বজোড়া সম্মান এনে দিয়েছিল তারও শুরু মাত্র ২৬ বছর বয়সে।"

"চার্লস ডারউইনও তাঁর এভলিউশন (বিবর্তন) সংক্রান্ত কাজ শুরু করেন মাত্র ২৭ বছর বয়সে", সায়েব আমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যই যেন বললেন।

আমার নিজের বয়স তখন ষোলো-সতেরো। "একজন সাতাশ বছরের লোককে কমবয়সী মনে হচ্ছে না বুঝি?" সায়েব রসিকতা করলেন। "তোমার সমবয়সী বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে সন্ধান করা যাক! স্যামুয়েল কোল্ট যখন প্রথম রিভলবারের কাঠের মডেলটি তৈরি করেন তখন তাঁর বয়স ১৬। তিনি স্টিলের রিভলবার আবিষ্কার করলেন পরের বছর। স্যামুয়েল কোল্ট তাঁর নামাঙ্কিত বিশ্ববিখ্যাত রিভলবার পেটেন্টের মালিক হয়েছিলেন ২১ বছর বয়সে!"

সায়েবের স্মৃতির সঞ্চয় যেন অন্তহীন। "এই যে কমপিউটর যুগ পৃথিবীকে পাল্টে দেবে বলছে এর আদিতে রয়েছে ক্যালকুলেটিং মেশিন। ব্লেজ প্যাসফান যখন এটি আবিষ্কার করেন তখন তাঁর বয়স ১৯। ১৬ বছরে তিনি একখানা জ্যামিতির জটিল বই লিখে বসে আছেন!"

ইন্ডাস্ট্রির প্রসঙ্গে চলে গেলেন সায়েব। " যে ভদ্রলোক ইলেকট্রোলাইসিস পদ্ধতিতে অ্যালুমিনিয়াম তৈরির পথ উদ্ভাবন করেন তাঁর নাম চার্লস মার্টিন হল। আবিষ্কারের সময় তাঁর বয়স মাত্র ২৩!"

সায়েব আজ যেন থামবেন না, আমার মনে কোনো সন্দেহই তিনি রাখতে চান না। "বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কারক জেমস ওয়াট গবেষণার কাজ শুরু করেছিলেন মাত্র ২৫ বছর বয়সে। ইলেকট্রিক মোটরের আবিষ্কারক মাইকেল ফ্যারাডে তো কেল্লা ফতে করেন আরও বছর কম বয়সে, মাত্র ২১ বছরে!"

এবার রাজনৈতিক ইতিহাসে নজর দিলেন সায়েব। "আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যখন বীরবিক্রমে ম্যাসিডোনিয়া শাসন শুরু করলেন তখন তাঁর বয়স কত? মাত্র ২৩। যখন সসাগরা পৃথিবী বিজয় সুসম্পন্ন করলেন তখন কত বয়স তাঁর? মাত্র ২৭।"

শুধু রাজা-রাজড়াদের কথা শুনিয়ে সায়েব কখনও তৃপ্তি পান না। তিনি এবার ফিরে এলেন তাঁর প্রিয় বিষয়— শিল্পে।

একটু হেসে সায়েব বললেন, "তোমার যা বয়স, ঠিক সেই সতেরোতেই জগদ্বিখ্যাত হবার মত কাজ করে ফেলেছেন মাইকেলেঞ্জেলো। তাঁর অমর ভাস্কর্য 'ব্যাটল অফ দি সেনটুরস' ১৭ বছর বয়সেই সম্পন্ন হয়েছে।"

এবার বিষয়টা হাল্কা করে ফেললেন সায়েব। নিজের কেশহীন মস্তকে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, "একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, মাথায় টাক পড়লে সেই টেকো মাথা থেকে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দেবার মত কোনো আইডিয়া বেরনো সম্ভব নয়!"

রসিকতা, কিন্তু অশেষ উপকার হয়েছিল আমার। সেদিন এসব কথা না

শুনলে, উনিশ বছর বয়সে প্রথম বই 'কত অজানারে' লেখা শুরু করার দুঃসাহস আমার হতো না। গভীর মমতায়, আমার হতাশা ও অপূর্ণতার কথা স্মরণ করেই সায়েব আমাকে এমন উৎসাহ দিয়েছিলেন যে আমি সত্যিই বিশ্বাস করেছিলাম, পৃথিবীতে এমন কোনো অসাধ্য কর্ম নেই যা কমবয়সীরা নিজের সাধনায় সাধ্য করে তুলতে না পারে।

নট অ্যাট হোম

আমি ক্রমশই তাঁর অতি প্রিয়জন হয়ে উঠেছি। তিনি এক সময় স্পেনসেস হোটেল ছেড়ে ক্যালকাটা ক্লাবে আশ্রয় নিলেন।

চৌরঙ্গী ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে ক্যালকাটা ক্লাবের প্রতিপত্তি তখন ভারত জোড়া। ক্লাবের কিছু ঘরে আবাসিক সভ্যদের থাকবাব ব্যবস্থা আছে।

সায়েব একতলায় একজোড়া ঘর নিলেন, তার নাম সুইট। আমি না জেনে অন্য সমস্ত বাঙালীর মতো 'স্যুট' বলতাম। আমার ভুল সায়েব সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

হেসে বলেছিলেন, "ইংরেজের উচ্চারণের কোনো মাথামুণ্ডু নেই— কোন কথার কী উচ্চারণ তা কানে শুনে শিখতে হয়, এর মধ্যে নিয়মের শৃঙ্খলা নেই। ইংরিজি বানান এবং ইংরিজি উচ্চারণ তাই অন্য দেশের মানুষদের অত্যধিক কষ্ট দেয়। আমি ক্ষমতা পেলে, ইংরিজী ক্যাপিটাল অক্ষর তুলে দিতাম এবং যেখানে যত ভজঘট উচ্চারণ এবং বানান আছে সব সোজা করে দিতাম।"

টেম্পল চেম্বারে সায়েবের অফিসে আমরা সব রকম কাজই করতাম। তিনি যেমন প্রয়োজনে আমার টেবিল থেকে নিজের হাতে কাপ ডিশ সরিয়ে অন্য জায়গায় রাখতেন, আমরাও তেমন চেম্বারে ওঁর লানচ-খাওয়া প্লেট ঘরের কোণে সরিয়ে রাখতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতাম না।

আজকাল চাকরিতে কে কোন কাজ করবে এবং তার মাধ্যমে হঠাৎ না ছোট হয়ে যায় এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে কাজকর্মে পদে-পদে বাধা। তখনও অনেক জায়গায় অমন ছিল। জাতিভেদ প্রথাও কাজকে টুকরো-টুকরো করে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করতো। ধরুন, যে জল দেবে সে টেবিল মুছবে না। যে

টেবিল মুছবে সে মরে গেলেও মেঝের নোংরা তুলবে না। যে খাতাপত্র লেখে কিছুতেই আড়াই সের ওজনের খাতা নিজের হাতে বয়ে কোথাও নিয়ে যাবে না। একাজ করার শক্তি যে নেই এমন নয়, কিন্তু ভয় আছে ছোট হয়ে যাবার।

অনেক সময় কাজ করার ইচ্ছা আছে, কিন্তু নিন্দার ভয় রয়েছে, লোকে বলবে অমুক ছোট কাজ করে।

এসব দ্বিধা আমার কাজের মধ্যেও আসতে পারতো, কিন্তু যদি শোনেন আপনার সায়েব গত রাত্রে দু'ঘণ্টা ধরে বাঁড়ির চাকরের বমি পরিষ্কার করেছেন, তখন আপনি কি চেম্বারে তাঁর হাতে একটা ন্যাপকিন এগিয়ে দিতে দ্বিধা করবেন? আমার পকেটে একদিন রুমাল ছিল না, তিনি উঠে গিয়ে ঘর থেকে আমাকে একটা রুমাল এনে দিলেন।

একদিন খুব ভোরে ক্যালকাটা ক্লাবে এসে কাজ করছি। সায়েবের বেয়ারা অসুস্থ। অন্য এক সায়েবকে একখানা চিঠি পাঠানো বিশেষ জরুরী। টেলিফোন তখনও কাজ করছে না। সায়েব ভাবছেন, কী করা যায়?

আমি বললাম, "ভাববার কী আছে? আমিই চিঠিটা দিয়ে আসছি। যে-ঠিকানায় চিঠি যাবে সেটি এমন কিছু দূরে নয়।"

আমার প্রস্তাবে সায়েব আশ্বস্ত হলেন। খুশি হয়ে বললেন, "গড ব্লেস ইউ, মাই ডিয়ার বয়।"

তারপর খস-খস করে নিজের হাতে চিঠিটা লিখতে-লিখতে বললেন, "বিলেতে আমরা একে চিঠি বলি, কিন্তু কলকাতা শহরের কিছু নিজস্ব ইংরিজি আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল থেকে সকলের অজান্তে এই স্পেশাল ইংরিজি ভাষা তৈরি হয়েছে। এই ধরনের বার্তাব নাম হচ্ছে 'চিট'— কথাটা তোমাদের চিঠি থেকে এসেছে কিনা বলতে পারবো না। কলকাতার সায়েবদের মধ্যে এইভাবে দূত মারফত 'চিট' বিনিময় হয়। যদি চিট-এর সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর প্রয়োজন থাকে তাহলে খামের ওপর এক কোণে হাতে লিখতে হবে : 'টু অ্যাওয়েট রিপ্লাই'— উত্তরের জন্যে পত্রবাহক অপেক্ষা করবে।"

সায়েব রসিকতা করে বললেন, "কলকাতার খাস মেমসায়েবদের কোনো কাজকর্ম থাকতো না, তবু কত যে 'চিট' চালাচালি হতো তোমায় কী বলবো। এই সব চিঠি সব সময় হাতে লেখা হতো এবং মনোগ্রাম-করা খামে পুরে দূত মারফত দ্রুত পাঠাবার রেওয়াজ ছিল।"

সায়েব বললেন, "আমার গৃহিণী আবার ওই রাজকীয় স্টাইলে পত্র বিনিময়ের বিরোধী। ও বেচারা বিলেতের ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডে কয়েক বছর

চাকরি করেছে। এখানে এসে প্রথম দিকে এই নবাবী চালচলন একেবারেই পছন্দ করতো না। প্রতিদিন কতোগুলো চিট আসছে একবার ম্যারিয়ন তার হিসেব রাখতে শুরু করেছিল। সেদিনের রেকর্ড : চব্বিশখানা চিট।"

সায়েবের কাছে আরও শুনলাম, 'উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবে' লেখা থাকলে পত্রবাহকের কিছু প্রাপ্তিযোগ হয়। খামে-আঁটা উত্তরের সঙ্গে একটি সিকি বা আধুলি অপেক্ষমান বাহকের হাতে গুঁজে না দিলে মেমসায়েব নিচু শ্রেণী থেকে এসেছেন এই দুর্নাম সমস্ত কলকাতা শহরে রটে যাবে।

সায়েবের চিঠি লেখা শেষ হলো। ক্যালকাটা ক্লাবের মনোগ্রামওয়ালা নীল খামে চিঠিটা নিজের ঠোঁটে ভিজিয়ে তিনি জুড়ে দিলেন। অনেক ইংরেজের এই অভ্যাস দেখেছি। "বদ অভ্যাস বলতে পারো", সায়েব বললেন। "শুনেছি অস্বাস্থ্যকরও বটে, কিন্তু সত্তর বছর তো এইভাবে চলছে।"

না। খামে 'উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করবে' লেখা নেই। সায়েব বললেন, "তোমাকে অযথা হাঙ্গামায় ফেলতে চাই না। ছুটির দিনে এই সব লোক কতক্ষণ ঘুমোবে কিছু ঠিক নেই, তুমি এদের পাত্তা পাবে না। তুমি চিঠিটা জমা দিয়েই চলে আসবে। দায়টা ওঁর, আমার সঙ্গে আজ সাক্ষাৎ না হলে ওঁরই ক্ষতি।"

সায়েবের লেখা চিঠিটা হাতে নিয়ে আমি সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। ভোরবেলায় এইভাবে পায়ে হেঁটে সায়েবপাড়ায় কলকাতা দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।

থিয়েটার রোড, লরড সিনহা রোড, ক্যামাক স্ট্রীট, উড স্ট্রীট, হ্যারিংটন স্ট্রীটের তখন অন্য এক চরিত্র যা এক কথায় বর্ণনা করা যায় না। বিশেষ করে থিয়েটার রোডের। ওখানকার স্থাপত্য আমাকে মুগ্ধ করতো, যদিও কলোনিয়াল যুগের আর্কিটেকচার সম্বন্ধে তখন আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না।

পঞ্চাশের দশকের গোড়াতেও এপাড়ার বাড়িগুলোর বহিরঙ্গের রক্ষণাবেক্ষণ খুব ভাল ছিল না, অনেক বাড়িতেএক কোট রঙ লাগালে যেন ভাল হতো। কিন্তু প্রায় প্রত্যেকটি বাড়ির ভিতরটা ছিল ইন্দ্রপুরী। আমার আরও ভাল লাগতো ঢালাই লোহার গেট এবং পাঁচিলের রেলিং। গেট পেরিয়ে গাড়ি-বারান্দা, তারপর বাড়ির ভেতর ঢোকবার বিরাট কাঠের দরজা। যার প্রতিটি পাল্লা পঞ্চাশের কলকাতাতেও ঝকঝক করতো। আরও মনোহরণ করতো দোতলায় উঠবার জন্যে পাক-খাওয়া কাঠের সিঁড়ি। তেমন-তেমন বাড়িতে এই সিঁড়ির রেলিং চকোলেট রঙের গালায় নিয়মিত পালিশ করা হতো।

সেই ভোরবেলায় সায়েবপাড়ায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ালেও সায়েবদের

মুখ তেমন দেখা যেতো না। কিন্তু দেখা মিলতো সায়েবের কুকুরের, চাকরের, ড্রাইভারের, জমাদারের এবং দারোয়ানের। কখনও কখনও সায়েবের কুক-বাবুর্চিও নজরে পড়ে যেতেন। সজ্ঞানে গদাই লস্করি চালে তাঁরা নিউ মার্কেট চলেছেন কাঁচা বাজারের সন্ধানে। রেফরিজারেটর তখনও ছিল, কিন্তু আসল সায়েবরাও কলকাতার খানদানি বাবুদের মতোই তাজা মাছ, তাজা মাংস এবং টাটকা সব্জির ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন।

বন্যেরা কেবল বনে সুন্দর, কিন্তু সায়েবপাড়ার কুক-বাবুর্চিরা সুন্দর দু'জায়গায়— কিচেনে এবং নিউ মার্কেটে। দু'জায়গায় তাঁদের দুই রূপ। বাজার করবার স্বাধীনতা না থাকলে কোনো কুকই সায়েবের কাছে চাকরি করবেন না—জমি যার লাঙল তার মতোই, রান্না যার বাজার-থলে তার এই অলিখিত নিয়ম ইংরেজরা ভারত স্বাধীন হবার অনেক আগেই মেনে নিয়ে কুকদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

অনেক বাড়িতেই তখন কুকের স্পেশাল সম্মান। তাঁরা সারথী-চালিত মোটর গাড়ি চেপে রাজকীয় স্টাইলে নিউ মার্কেটে যান এবং সব রকমের বাজার সেরে গাড়িতেই ফিরে আসেন। সেখানেও এক অলিখিত নিয়ম—কুক কখনও পিছনের সীটে বসেন না, সেখানে একটা বড় টাওয়েলের ওপর সওদার মালপত্তর বিছিয়ে রাখেন এবং নিজে আসন গ্রহণ করেন ড্রাইভারের পাশে। এই সেবা করার পরিবর্তে আউট-হাউসে ড্রাইভারের অনেক সময় বিনামুল্যে গরম চা জোটে। 'কুকরা নিউ মার্কেটে সুন্দর' কথাটা যাঁদের পছন্দ হলো না তাঁরা নিশ্চয় স্যর স্টুয়ার্ট হগের বাজারে এঁদের বিক্রম দেখেননি। আমি অনেকবার ভোরের নিউ মার্কেটে ঘুরে বেড়িয়েছি, সেখানাকার সব্জি মার্কেট, মাছ মার্কেট, পোলট্রি মার্কেটের গল্প অন্য কোথাও শোনানোর লোভ রইলো।

যে-সময়ের কথা বলছি তখন আমি কলকাতা সম্পর্কে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। হাওড়া কাসুন্দের মফস্বল থেকে নদী পেরিয়ে প্রতিদিন কোনোরকমে বারওয়েল সায়েবের কাছে চলে আসি। সায়েবপাড়ায় প্রতিটি মানুষ এবং প্রতিষ্ঠানকে আমি সম্মান করে চলি।

সবচেয়ে সমীহ করতাম মাথায় টুপি চড়ানো ঝকঝকে ইউনিফরম-পরা নেপালী দারোয়ানদের। কোমরে কোষবদ্ধ কুকরি, চকচকে জুতোগুলোতে মুখ দেখা যায়। কোমরের কেন্দ্রে একটুকরো পিতলকেও স্বর্ণপদ্মের মতো মনে হতো।

এই দারোয়ানদের বোবা মনে হতো, কোনোদিন এদের আমি কথা বলতে

শুনি নি। আমার আজও মনে হয়, স্মার্টনেস ও নিয়মানুবর্তিতায় পৃথিবীর কোনো জাত গোরখাদের ধারে-কাছে আসতে পারে না।

মহৎ এই গুণ থাকা সত্ত্বেও গোরখারা কেন দরিদ্র এই প্রশ্ন আজকাল আমার মাথায় জাগে, তখন জাগতো না। তখন আমি নিরাপদ দূরত্ব থেকে এঁদের দেখতাম এবং বোধহয় কিছুটা ভয়ও পেতাম। গোরখা দারোয়ানের শোভা কলকাতা থেকে চিরদিনের মতো আরও সুন্দর জিনিসের মতো বিলুপ্ত হয়েছে। এখন যারা ত্রিভঙ্গমুরারী হয়ে দারোয়ানের ইউনিফরম চড়িয়ে গেটের সামনে বসে থাকে তাদের দেখে মায়া হয়। মাঝে-মাঝে যখন গোরখা দারোয়ান দেখার ইচ্ছা দমন করতে পারি না তখন আমি চলে যাই হো-চি-মিন সরণীতে-- ওখানকার বিদেশী রাজদূত অফিসের প্রবেশপথে গোরখারা এখনও দুর্লভ গৌরবে ঝলমল করছে।

পঞ্চাশের কলকাতা এমন ছিল না— ব্রিটিশ ছাপ তখনও এই শহরের প্রতি অঙ্গে। আমি সায়েবের চিঠি হাতে হেঁটে চলেছি এবং গেটের সামনে মোতায়েন গোরখা দারোয়ানদের দেখছি।

থিয়েটার রোড ধবে তখন কোনো বাস চলতো না। রাজকীয় ঐ রাস্তার জনতাবাহন বাস ঢোকানোর কথা কেউ ভাবতেও পারতো না। কলকাতা শহরের নিজস্ব চরিত্র ছিল, পদে-পদে কমপ্রোমাইজের হীনমন্যতা তখনও এই শহরের নৈতিক অধঃপতন ঘটায় নি। এইসব সায়েবপাড়ায় তখন হয় মোটর গাড়ি, না-হয় বড় জোর রিকশা।

মালপত্তর নিয়ে নেহাত বিপদে না-পড়লে আমি রিকশা চড়তে কখনোই উৎসাহী নই। হাঁটতে বেশ ভাল লাগতো এবং হেঁটে বেড়ানোর আনন্দও এই ভাগ্যহীন শহর থেকে তখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি। তিন দশক পরে আজও কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে মানা নেই। কিন্তু তার অর্থ পদে-পদে বিপদকে ডেকে আনা— হয় পদস্খলন, না হয় সলিল সমাধি, না হয় জীবন্ত কবর কিছু একটা শাস্তি পদচারীর জন্যে অপেক্ষা করছেই। গরীবের শহর হলে কী হয় পদাতিকের পক্ষে কলকাতার থেকে বিপজ্জনক জনপদ বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও নেই। অথচ চিরকাল এমন ছিল না। মাত্র তিন দশকের মধ্যে ভাগ্যের দেবতা আমাদের এই প্রিয় শহরের ললাটে কী লিখে দিলেন তা একমাত্র তিনিই জানেন।

অনেকদিন আগের সেই ভোরবেলায় এইসব চিন্তা অবশ্য আমার ছিল না। তখন ঝকঝকে রোদ উঠেছে সবেমাত্র। আকাশে-বাতাসে বেশ তাজা অথচ স্নিগ্ধ ভাব। প্রিয় নগরীর পরিচ্ছন্ন পথ ধরে আমি এগিয়ে চলেছি আমার কাজে।

কলকাতায় বিদেশীদের দাপট রয়েছে, কিন্তু শহরটা তখনও সাধারণ মানুষদের আয়ত্তের বাইরে চলে যায় নি। সমস্ত ভারতবর্ষ তখনও কলকাতাকে খরচের খাতায় লিখে দেয় নি। কলকাতার ধনী ও দরিদ্র উভয়ের মধ্যেই তখনও শহর সম্পর্কে গর্ববোধ রয়েছে। তিন দশক পরে, যাঁরা সত্যিই ধনী তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও কাজকর্মে বুঝিয়ে দেন কলকাতা সম্পর্কে তাঁদের বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। যাঁরা নির্ধন তাঁরা প্রতি মুহূর্তে শহরকে ডোন্ট কেয়ার করছেন। গরিব বড়লোক এবং মধ্যবিত্তের মিলিত অবজ্ঞা ও অবহেলায় আমাদের সোনার শহর গোল্লায় গেলো, কিন্তু সেজন্য কারো বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই।

পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে থিয়েটার রোড ধরে অনেকখানি এগিয়ে এসেছি। হোল্ডিং নম্বর এমন কিছু বেশী নয়, কিন্তু এ-পাড়ার প্রতিটি বাড়ির চৌহদ্দি বড়-বড়, তাই নেহাত কম পথ হাঁটতে হচ্ছে না। কী সুন্দর-সুন্দর পাঁচিলে-ঘেরা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাড়ি ছিল এ অঞ্চলে। সে সব ধীরে-ধীরে আমাদের চোখের সামনেই বিদায় নিলো। একই রাস্তায় ক'বছরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর বাড়ির ধ্বংসাবশেষের ওপর দুষ্ট ব্রণের মতো যেসব দেশলাই-বাক্স ফ্ল্যাটবাড়ি উঠলো তাদের কথা কী বলবো? কলকাতা, তোমার মুখ একদিন ভালবাসায় পড়েছিলাম, এখন তোমার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। মানুষের অবহেলা এবং ইতিহাসের বর্বরতায় তোমার যে শ্লীলতা হানি হলো ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। কেন এমন হলো? কে এর জন্য দায়ী? কর্তব্যকর্মে কার অবহেলা রয়েছে? এসব প্রশ্ন এখন আর তুলতে ইচ্ছে হয় না। মনে হয়, বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে।

না, কলকাতা আমার প্রেমের শহর হলেও তার দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আমি কলম ধরি নি। শ্রাবণের এই শেষ দিনে বৃষ্টি বাদল উপেক্ষা করে আমি বসেছি সায়েবের স্মৃতিচারণ করতে, প্রেমহীন মানুষের শ্বাসরুদ্ধকারী ভিড়ের মধ্যেও যিনি ভালবাসার সঞ্জীবনী মন্ত্রে আমার মতো পরিচয়হীন নিঃসম্বল অভাজনের স্তিমিত জীবনকে প্রাণময় করে তুলেছিলেন। সংখ্যাহীন দরিদ্র বাঙালী যুবকের যা হয়, অভাবে-অনটনে আমারও সমস্ত স্বাতন্ত্র্য হারানো উচিত ছিল, কিন্তু ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি বেঁচে গেলাম। আমি নব জীবনের স্বাদ লাভ করেছি। বৃহৎ এই বিশ্বের ভিড়ে চিরদিনের মতো হারিয়ে না গিয়ে আমি নিজের ঠিকানা খুঁজে পেলাম একজন বিদেশীর অকৃপণ আশীর্বাদে।

সায়েবের চিঠিতে যে-ঠিকানা লেখা ছিল সে-বাড়িটা অবশেষে খুঁজে বের করলাম। হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। থিয়েটার রোডের গেটের কাছে দু'জন

খোদ ইংরেজের নাম লেখা— একজন ওপরের তলার বাসিন্দা এবং আর একজন নিচের তলার। এ-বাড়ির গেটে কোনো দারোয়ান নেই।

আমি যাঁকে খুঁজছি তিনি নিচের তলার বাসিন্দা। আমি গেট পেরিয়ে ছোট ছোট নুড়ি-বেছানো পথ ধরে বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেলাম। গাড়ি-বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর সদর দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। চিঠিটা নিয়ে এখন কী করবো?

তখনও খুব চটপটে হইনি, মফস্বলের লোক প্রথম কলকাতায় এলে ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকে। ইংরেজনন্দনের দরজার গায়ে একটা ছোট্ট লেটার বক্স দেখলাম এবং সেখানে স্পষ্ট অক্ষরে যা লেখা আছে তার দিকে চোখ পড়তেই আমি মুহূর্তে মনস্থির করে ফেললাম। আর সময় নষ্ট নয়, এখনই অ্যাবাউট টার্ন এবং দ্রুতপদক্ষেপে ক্যালকাটা ক্লাবে ফিরে যাওয়া।

পায়ে হেঁটে এতদূর যাওয়াটা সম্পূর্ণ বৃথা হলো। ক্লাবে ফিরে এসে সায়েবকে বললাম, "যাঁকে চিঠি দেবার কথা তিনি বাড়িতে নেই।"

"বাড়িতে নেই!" সায়েবের চিন্তা যেন বাড়লো। "এসময় তো ভদ্রলোকের অন্য কোথাও যাবার কথা নয়। তা ছাড়া আমার কাছ থেকে খবর পাবার প্রত্যাশা তাঁর থাকবে।"

"কিন্তু যদি তিনি বাড়িতে না থাকেন তাহলে তুমি কী করতে পারো? অযথা চিন্তা করে লাভ নেই, মাই ডিয়ার বয়। তুমি এবং আমি এখন চা খাবো। তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায় আমি টি অর্ডার দিই নি। শুধু-শুধু তুমি কষ্ট করলে। ফোনটা ঠিক থাকলে এই হাঙ্গামায় পড়তে হতো না। পূর্বদিকের ফুল বাগানে বসে এই সকালটুকু আমরা উপভোগ করতে পারতাম।" প্রকৃতি সায়েব ভীষণ ভালবাসতেন। বলতেন, "দু চোখ খুলে রেখে যে-মানুষ বিশ্বজ্ঞানের সৌন্দর্য উপভোগ করে না সে বোকা— ফুল ফল গাছ পাতা দেখার জন্য কোনো খরচ নেই, কিন্তু অপার আনন্দ।"

পত্রদৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় আমার মনটা তখনও খচ খচ করছে। কিন্তু সায়েব মাথা ঘামালেন না। আমাকে নিয়ে বাগানে বসে তিনি ডিকটেশন দেওয়া শুরু করলেন। ভাষার সে কী মহিমা! কোনো পরিশ্রম ছাড়াই যেন ঝরনাধারার মতো শব্দগুলি তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে, আর আমি একমনে লিখে চলেছি। বানান এবং উচ্চারণে ইংরিজি ভাষা যতই জটিল হোক শব্দমহিমায় তার কোনো তুলনা নেই। এতো অল্পে এতো বেশি ভাব ইংরিজিতে প্রকাশ করা যায় যে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

ডিকটেশনের পর্ব শেষ হলো। ফুলবাগান থেকে আমরা ঘরের ভিতরে ফিরে এসেছি। আমি এখন দ্রুত টাইপ শুরু করেছি। সেই সুযোগে সায়েব কয়েকটা আইনের বইতে চোখ বুলিয়ে নেবেন এবং মেমসায়েবকে একটা চিঠি লিখে ফেলবেন। তারপর আবার ডিকটেশন— যা আমাকে আজ টাইপ করতে হবে না, আগামীকাল টেম্বল চেম্বারে বসে সারাদিন আমি কাজ করতে পারবো। সায়েব তখন আদালতে থাকবেন।

আমার টাইপের কাজ চলেছে আরো কিছুক্ষণ। কাজের মধ্যেই ছোট-ছোট মজার গল্প বলে সায়েব প্রতিটি মুহূর্ত আনন্দময় করে তুললেন। আমাদের কথাবার্তা শুনে কে বলবে তিনি সত্তর এবং আমি সতেরো? দুই সমবয়সীতে যেন গল্পগুজব হচ্ছে, প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের কথা প্রভুর মনে নেই। কে বলবে তিনি বিদেশী এবং আমি হাওড়ার এক অখ্যাত কানা গলির বাসিন্দা? কে বলবে তিনি বিদ্যায়, অভিজ্ঞতায় সমাজের সর্বোচ্চ, আর আমি অর্থের অভাবে অকালে পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে নাবালক ভাইবোন এবং বিধবা মায়ের জন্য অন্নসংস্থানে বেরিয়েছি? আমাদের দু'জনের অন্তহীন দূরত্ব। কোথায় ক্যালকাটা ক্লাব এবং কোথায় হাওড়ার ১৮/এল বিহারী চক্রবর্তী লেন—মধ্যিখানে যেন লক্ষ-লক্ষ মাইলের অলঙঘনীয় সমুদ্র। আজ সকালেও আমি হাওড়াতে ছিলাম, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কত সহজে সমস্ত দূরত্ব মুছে ফেলেছেন বারওয়েল সায়েব। এখন আমরা একই সঙ্গে যেন একই কাজ করে যাচ্ছি।

সায়েব বললেন, "যে কাজে আনন্দ নেই সে কাজ করার মানে হয় না। তোমাদের প্রাচীন ঋষিরা সুন্দর একটি কথা বলেছেন, সৃষ্টির মূলেই রয়েছে আনন্দ। যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হয় তা তো ক্রীতদাসত্ব— স্লেভ লেবারে কোনো কাজের কাজ হয় না বলেই তো ক্রীতদাস-প্রথা পৃথিবী থেকে উঠে গেলো।"

আমি টাইপ করছি এবং মাঝে মাঝে মেশিন থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সায়েবের কথাবার্তায় যোগ দেবার সাহস পাচ্ছি। এই তাঁর নিয়ম।

তখনও আমার অভিজ্ঞতা কম। তাই প্রথম-প্রথম ওঁকে দেখে মনে হতো প্রাচুর্যই মানুষকে এমন সুন্দর, সহজ ও আদরণীয় করে তোলে। যাদের আছে তারাই ভালবাসতে পারে, যাদের নেই তাদের প্রাণে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা। সায়েব এসব নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তিনি বললেন, "সব ঘটনারই একটা সুন্দর দিক আছে, যদি তা খুঁজে নিতে পারো। যেমন বোর্ন অ্যান্ড শেফার্ডের আর্থার মাসল্‌হোয়াইট বলেন, প্রত্যেক মানুষের একটা বিউটিফুল অ্যাঙ্গল আছে, ক্যামেরাম্যানের কাছে পরিপূর্ণ কুৎসিত কোনো মানুষ হয় না।"

এইসব কথাবার্তার মধ্যে টেলিফোনে আবার ডাক এলো। টেলিফোনটা আমাদের ঘরে ছিল না। বাইরে রিসেপশনের কাছে ক্লাবের টেলিফোন-বোর্ড। কল্ এলে ক্লাবের বেয়ারা সেখান থেকেই ডেকে দেয়। সাধারণতঃ আমি টেলিফোন ধরে প্রথমে খবর নিয়ে আসি। সায়েবের কানে গোলযোগ শুরু হয়েছে— সর্দি হলে সেটা আবার বাড়তো। কিন্তু সায়েব এবার নিজেই ফোন ধরতে গেলেন, আমাকে টাইপের কাজ চালিয়ে যেতে বললেন। ফিরে এলেন একটু পরেই।

বেশ গম্ভীরভাবেই সায়েব জানতে চাইলেন, "তোমাকে যে ঠিকানাটা লিখে দিয়েছিলাম থিয়েটার রোডের সে-বাড়িটা তুমি ঠিক চিনতে পেরেছিলে?"

"চিনতে না পারার কী আছে?" আমি একটু আঘাত পেলাম। বাড়ি খুঁজে না পেলে আমি অবশ্যই ফিরে এসে সায়েবকে তাই রিপোর্ট দিতাম। কলকাতা শহরের সব ঠিকানা সবাই খুঁজে পায় না, নতুন আগন্তুকদের কথা ভেবে এই শহরের পথঘাট, বাড়িঘরের নম্বর কখনও তৈরি করা হয় নি।

সায়েব বললেন, "ভাগ্যে টেলিফোনটা ঠিক হয়েছে এবং এই কল্টা এলো!"

আমি তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। সায়েব বললেন, "আমার কাছ থেকে কোনো খবর না পেয়ে ভদ্রলোক বুদ্ধি করে আমাকে ফোন করলেন। আমি ওঁকে এখনই আসতে বলে দিলাম। কাজটা সেরে নিতে হবে।"

কিছুক্ষণ পরেই সেই ইংরেজ ভদ্রলোক ক্লাবে এলেন। আমার সামনেই তিনি বললেন, "মিস্টার বারওয়েল, আমি আপনার খবরের জন্যে গতকাল সন্ধ্যা থেকে অপেক্ষা করছি। আজ সকালে আমি বাড়ি থেকে বেরোই নি।"

"আপনি অন্য কারুর কাছ থেকে কোনো চিঠি পেয়েছেন?" সায়েব এবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন।

"অবশ্যই। আমার স্ত্রী আজ সকালে অন্তত দু'খানা চিট পেয়েছেন এবং আমি একটা।" ভদ্রলোক কেমন সহজে বলে গেলেন এবং আমাকে অযথা বিপদে ফেলে দিলেন।

তিনি আরও বললেন, "শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, রিস্ক নেবো না। আমি নিজেই একবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে দেখি। ভাগ্যে আপনার টেলিফোন ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

দুই ইংরেজ কথা বলছেন আর আমার কান দুটো লজ্জায় গরম হয়ে উঠছে। আমি সামান্য কর্মচারী। উচ্চপর্যায়ে আলোচনার সময় আমার নাক গলানো

উচিত নয় বলেই তখনকার মতো চুপ করে রইলাম।

ইতিমধ্যে ওঁদের মধ্যে কিছু প্রফেশনাল আলোচনা হলো। একটা জরুরী পিটিশন সায়েব আমাকে ডিকটেশন দিলেন। ডিকটেশন শেষ করেই সেটা দ্রুতবেগে টাইপ হলো এবং স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য আবেদনপত্রের একটা কপি ওই ভদ্রলোক নিয়ে নিলেন।

বিদায় নেবার আগে ইংরেজ ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি সম্প্রতি বাড়ি পাল্টেছেন?"

ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "যুদ্ধের সময় থেকেই এই একই বাড়িতে আছি, পাল্টাবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আমার স্ত্রী এই বাড়ি খুব পছন্দ করেন।"

আমি আর কোনো কথা বললাম না, অপমানটা নিঃশব্দে হজম করে গেলাম।

অতিথিকে বিদায় দিয়ে সায়েব এবার আমার কাছে এসে বসলেন। বললেন, "অনেকক্ষণ একটানা কাজ করছো, এবার একটু গল্প করা যাক? কেবল কাজ এবং নো মজা মানুষকে বোকা করে তোলে।"

কিছুক্ষণের মধ্যে সেই পুরনো প্রসঙ্গ ফিরে এলো। "ব্যাপারটা রহস্যময়। বাড়িতে না থাকায় তুমি চিট নিয়ে ফিরে এলে, অথচ ভদ্রলোক বলছেন তিনি চিটের জন্য হাঁ করে বসেছিলেন, কোথাও যান নি। যাই হোক, আমি তোমাকেই বিশ্বাস করবো, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।"

নির্দিষ্ট বাড়িতে আমি ঢুকেছি, ঠিক ফ্ল্যাট আমি খুঁজে পেয়েছি, তবু চিঠি না দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কারণটা আমি সায়েবকে এবার বললাম। "বাইরের লোকের জন্যই তো বড় বড় করে লেখা রয়েছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস .... নট অ্যাট হোম। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস..... বাড়িতে নেই। আমি নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না।"

সায়েব এবার কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "লেখাটা কি কোনো বোর্ডে?"

"না। কোনো পাকা আর্টিস্ট কাঠের ওপর পাকা রঙ দিয়ে লিখেছেন— নট অ্যাট হোম।"

"লেখাটা কি একটা বাক্সের ওপর?" সায়েব এবার জানতে চাইলেন।

ঠিক আন্দাজ করেছেন সায়েব। এবার তাঁর চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। "ইউরেকা! রহস্য উদ্‌ঘাটন হয়েছে। কলকাতার ইংরেজ বাড়িতে এই অঘটন আগে বেশ কিছু ঘটেছে। আবার ঘটলো। এই জন্যে অনেকেই এই "নট অ্যাট

হোম বাক্স” বাড়ির দরজা থেকে সরিয়ে ফেলছেন। আমি তো কোনোদিনই রাখি নি। যাঁর কাছে তোমাকে পাঠিয়েছিলাম তিনি একজন পাক্কা সায়েব, তাই তোমার ভোগান্তি হলো।”

এরপর প্রচুর হাসতে-হাসতে সায়েব ব্যাপারটি যা ব্যাখ্যা করলেন তা এই রকম ঃ “জানোই তো ইংরেজ জাত ভীষণ ফর্মাল। কেউ পরিচয় না করিয়ে দিলে দু'জন ইংরেজ নিজেদের মধ্যে কথা বলবে না। ক্লাব, ব্যাংক, পার্টি, সামাজিকতা যেখানেই ইংরেজ সেখানেই ইনট্রোডাকশন— অপরিচিতকে ইংরেজ মোটেই ভাল চোখে দেখে না।'

সায়েব বলে চললেন, “সেই হাসির গল্প শুনেছো তো? জাহাজডুবি হয়ে দুই ইংরেজ এক জনহীন দ্বীপে গিয়ে উঠলো। দু'জনেই নিঃসঙ্গ— দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে। কিন্তু পরস্পবের মধ্যে কিছুতেই কথা হচ্ছে না। কারণ কে তাদের ইনট্রোডিউস করিয়ে দেবে?” সায়েব হাসলেন।

তিনি বলে চললেন, “স্বদেশের বাইবে ইংরেজের সামাজিকতার অন্যতম দুর্গ ছিল এই কলকাতা। এখানে পান থেকে চুন খসবার উপায় ছিল না। যেমন ধরো ডিনার জ্যাকেট। যত গরমই হোক, যত অসুবিধাই থাক, নিমন্ত্রণ-পত্রে যদি ড্রেশ সম্পর্কে কোনো বিশেষ নির্দেশ দেওয়া না থাকে তা হলে কালো বো টাই এবং বিশেষ ধরনের তিনপিস ডিনার সুট পবে প্রতিটি ইংরেজকে সান্ধ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে। লাটসায়েবের বাড়িতে যেতে হলে অবশ্যই পুরুষ ও রমণীদের হ্যাট পরতে হবে এবং করমর্দনের জন্যে প্রয়োজন কনুই পর্যন্ত লম্বা সাদা হাত-গ্লাভস। কোথাও সাজসজ্জার এসব নির্দেশ লিখিত নেই, কিন্তু কলোনির সব সায়েব জানেন হ্যাট ও গ্লাভস ছাড়া লাটভবনে গেলে শোচনীয় অপমান হবে। স্বয়ং লাটসায়েব আসরে উপস্থিত হবার আগে তাঁর শ্যেনচক্ষু এ-ডি-সি'রা অতিথিদের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখবেন কোন অতিথি টুপি এবং দস্তানা আনেননি এবং ধরা পড়লেই কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁকে আর সেখানে দেখা যাবে না।”

সায়েবের স্মৃতিচারণ : “স্কিপার এসব বিশ্বাস করে না। একবার সে এ-বিষয়ে অনেক খোঁজখবর করেছিল এবং জানতে চেয়েছিল কবে কাকে এইভাবে লাটভবন থেকে সত্যিই বের করে দেওয়া হয়েছিল? অনেক চেষ্টাতেও বিতাড়িতদের কোনো হদিস মিললো না, শুধু বয়োজ্যেষ্ঠরা বললেন, বিহার থেকে আসা এক সায়েবের নাকি এই দুর্গতি হয়েছিল। তাঁকে সত্যিই গভর্নমেন্ট হাউস থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। এবং এ বিষয়ে সবাইকে সিনিয়র মহিলাদের স্মৃতিশক্তির ওপর ভরসা করতে হবে।”

সায়েব হাসলেন, "নিশ্চয় জানতে চাইছো যে-সায়েবকে লাটভবন থেকে বের করে দেওয়া হলো তাঁর মেমসায়েবের কী অবস্থা হলো? ইংরেজমহলের চালু গল্প, মেমসায়েবের মাথায় টুপি না দেখে তাঁকে যখন বহিষ্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে তখন স্বয়ং লাটসায়েবের যুবতী কন্যা নারীর মানরক্ষা করার জন্যে, ছুটে গিয়ে নিজের একটা হ্যাট এনে মেমসায়েবকে দিলেন।"

সায়েব বললেন, "শেষের অংশটা সত্য হলেও হতে পারে। ডিনারের সময় ফারপো রেস্তোরাঁয় একসময় জ্যাকেট ছাড়া ঢুকতে দেওয়া হতো না। কিন্তু অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াবার জন্য রেডিমেড ব্যবস্থা ছিল। স্টুয়ার্ডদের জিম্মায় কয়েকটি ফ্রি-সাইজ কোট থাকতো যা সঙ্গে-সঙ্গে অসাবধানী অতিথিকে পরিয়ে দিয়ে তাঁর মান বাঁচানো হতো।"

আরও শুনলাম, "ডিনার জ্যাকেটের আইনকানুন সম্পর্কে ইংরেজ এখনও খুব কঠোর।"

আমি সবিস্ময়ে ইংরেজের আচরণবিধি শ্রবণ করছি এবং ভাবছি এর সঙ্গে আজকের 'নট অ্যাট হোম'-এর সম্পর্ক কী? বাড়িতে সবাই উপস্থিত রয়েছেন অথচ দরজার সামনে চিঠির বাক্সে 'বাড়িতে নেই' লিখে রাখবার কী রহস্য থাকতে পারে? ভারতীয় সামাজিকতায় এ তো অমার্জনীয় মিথ্যাচার।

সায়েব বললেন, "ইংরেজ কলোনিতে সামাজিকতার আইনকানুন খুবই কঠিন। মনে করো, একজন নতুন ইংরেজ শহরে এলেন। তাঁর সঙ্গে কী করে শহরের অন্য ইংরেজদের পরিচয় হবে? ব্যাপারটা নির্ভর করবে অনেক জটিল অথচ অলিখিত আইনকানুনের ওপর। প্রথম প্রশ্ন : নবাগতের সামাজিক মর্যাদা কী রকম? দ্বিতীয় প্রশ্ন: তাঁর বৈবাহিক স্ট্যাটাস কী? কলকাতা শহরে ইংরেজদের তখন তিন শ্রেণী ছিল : ব্যাচেলর, বিবাহিত এবং ঘাস-বিপত্নীক বা গ্রাস-উইডোয়ার। যাঁর স্ত্রী ছুটিতে বিলেতে গিয়েছেন ইংরিজি ভাষায় তিনি ঘাস-বিপত্নীক।

"শহরে এসে আগন্তুকের প্রথম কাজ হলো নিজের এবং স্ত্রীর জন্যে আইভরি বোর্ডে কিছু ভিজিটিং কার্ড ছাপিয়ে ফেলা। মানুষটি নিজে খুব সিনিয়র হলে সেই সঙ্গে একটি কার্ডের বাক্স তৈরি করে নিজের দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া, যাতে লেখা থাকবে, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অমুক চন্দ্র বাড়িতে নেই— নট অ্যাট হোম'।

"এরপর শুরু হবে নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র থেকে ইংরেজদের ঠিকানা সংগ্রহের অভিযান এবং কোনো অভিজ্ঞ স্থানীয় মহিলার পরামর্শ অনুযায়ী কোন

ইংরেজ ক'খানা কার্ড পাবার অধিকারী তা ঠিক করা। খুব জটিল অঙ্ক এই কার্ড কে ক'খানা পাবে তা ঠিক করা। পান থেকে চুন খসলেই চিরদিনের জন্যে সমস্ত সম্পর্কের বারোটা বাজলো। আগন্তুক যদি ডাক্তার, অ্যাটর্নি বা ব্যারিস্টার হন তাহলে তাঁর পসার নষ্ট হবার পক্ষে এই ধরনের একটি ভুলই যথেষ্ট।"

"তারপর?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"তারপর আসল অভিযান শুরু হবার কথা। নতুন আগন্তুক একদিন সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়বেন এবং বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে বাক্সে কার্ড ফেলে আসবেন— কোথাও একখানা কার্ড, কোথাও দু'খানা কার্ড, কোথাও ততোধিক। কার্ড ফেলবেন, কিন্তু গৃহ-স্বামীকে অবশ্যই জ্বালাতন করবেন না। যাতে কোনোরকম চক্ষুলজ্জার কারণ না হয়, সেই জন্যেই তো বাক্সের ওপর লিখে দেওয়া হয়েছে, মিস্টার ও মিসেস অমুক নট অ্যাট হোম। সুতরাং কার্ড ফেলতে গিয়ে কেউ বেল বাজাবার মূর্খামি করবেন না এবং কোনো রকমে মুখোমুখি হয়ে গৃহস্বামীও আগন্তুককে লজ্জায় ফেলবেন না। অলিখিত নিয়মটা হলো, তুমি কার্ড ফেলে প্রমাণ রেখে যাও যে তুমি আমাদের সঙ্গে পরিচিত হতে অভিলাষী। আমরা ভেবেচিন্তে, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্ত নেবো এবং তোমার কার্ডের প্রাপ্তি স্বীকার করে হাতে লেখা চিঠি পাঠাবো। এবং সেদিন যখন এসেছিলেন তখন বাড়িতে না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করবো!"

সায়েব আমার পিঠে হাত রেখে বললেন, "ইংরেজের এই হাস্যকর আইন না-জানা থাকায় আজ তোমার কষ্ট হলো। 'নট অ্যাট হোম' দেখে তুমি ডেলিভারি না-দিয়ে ফিরে এলে—যদিও ওই দম্পতি 'বাড়ি নেই' একমাত্র তুমি যদি ওঁদের সঙ্গে প্রথম পরিচিত হবার জন্য গিয়ে থাকো সেই জন্যে।"

এরপর আমার হাসি আর বন্ধ হতে চায় না। এমন হাস্যকর সামাজিকতা যে এখনও চালু থাকতে পারে তা আমার বিশ্বাসই হতো না যদি না আমি নিজে ভুক্তভোগী হতাম। আমি বললাম, "এরপর যদি কোথাও শুনি বা দেখি লেখা আছে অমুক বাবু বাড়ি নেই, তাহলে আমি বিশ্বাস করবো না।"

সায়েব বললেন, "এই সিস্টেম শেষ হতে চলেছে। কয়েক বছর পরে হয়তো ব্যাপারটা গল্প হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের বিয়ের পরে (১৯৩৩) এই রকম বহু কার্ড চালাচালি করতে হয়েছে এবং এ-বিষয়ে স্কিপারকে অনেক মাথা ঘামাতে হয়েছে।"

সায়েবের কাছে শুনলাম, "লাটসায়েবের বাড়ির নিয়মকানুন একটু আলাদা। ওখানে লেখা আছে, লাটসায়েব 'নট অ্যাট হোম'। ওখানে গেটের কাছে

পর্বতপ্রমাণ একটি খাতা— ভিজিটরস রেজিস্টার। আগন্তুকরা শহরে এসেই দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যমতো ঐ খাতায় নিজের নাম, ঠিকানা এবং কী করেন তা লিখে আসবেন।”

সেই খাতার কথায় আমি আবার হেসেছিলাম। সায়েব তৎক্ষণাৎ বললেন, “শুভস্য শ্রীঘ্রম্! চলো এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।”

বিপুল উৎসাহে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে আমরা লাটসায়েবের বাড়ির উত্তর গেটে চলে এলাম। লাটসায়েবের বাড়ির মাথায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা পতপত করে উড়ছে। নর্থ গেটের কাছে একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গিয়ে সায়েব আমাকে খাতাটা দেখালেন। বললেন, “আমার পক্ষে সই করা ঠিক হবে না, কারণ ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের পরিচয়—উনিও ওকালতি করতেন। বহু বছর আগে একবার এলাহাবাদে আমার গাড়ির তেল ফুরিয়ে যাওয়ায় অনেকক্ষণ চুপচাপ রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি থেকে নামলেন কৈলাস নাথ কাটজু এবং এক টিন তেল দান করে সে যাত্রায় আমাকে রক্ষে করলেন। সে তেল এখনও শোধ করা হয়নি।”

সায়েব এবার জানতে চাইলেন, “লাটসায়েবের সঙ্গে যখন তোমার পরিচয় নেই তখন তুমি খাতায় সই করবে নাকি?”

সই করবার জন্যে সায়েব আমাকে উৎসাহ দিলেন, কিন্তু আমি সই করবার সাহস পেলাম না। নাম-ঠিকানা ছাড়া আমার অন্য কী পরিচয় এখানে লিখবো যাতে লাটসায়েবের ভাবী-দর্শকদের মধ্যে আমি একজন হতে পারি?

সায়েব আমার ওপর জোর করলেন না। কিন্তু বললেন, “বলা যায় না, একদিন লাটসায়েবই হয়তো তোমাকে এই বাড়িতে চা-পানের জন্যে নেমন্তন্ন করবেন।”

এরপর সায়েব ক্লাবে ফিরে গিয়েছিলেন এবং আমি একটা বাস ধরে হাওড়ায় চলে এসেছিলাম।

এই ঘটনার পর কয়েকটা দশক হুড়মুড়িয়ে কেটে গেছে। কলকাতার কোনো বাড়িতে এখন ‘নট অ্যাট হোম’ বাক্স দেখতে পাই না, তবে লাটসায়েবের বাড়ির আইনকানুন এখন পালটায়নি। কিছুদিন আগে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী কলকাতায় এলেন। অনেক বছর আগে বেশ কিছুদিন তিনি এই শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তারপর অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন, আবার কর্মসূত্রে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। আমাকে বললেন, “আমি লাটসায়েবের ভিজিটরস বুক-এ সই

করতে চাই।"

আমি ভেবেছিলাম ওই সব খাতাপত্তর উঠে গিয়েছে। কিন্তু লাটভবনের উত্তর গেটের কাছে গিয়ে প্রহরীদের জিম্মায় সেই খাতাটার সন্ধান পাওয়া গেলো। যেমন দেখেছিলাম তেত্রিশ বছর আগে ঠিক সেইভাবেই ছোট্ট একটা ঘরে খাতাটা আজও খোলা রয়েছে। আমার পরিচিত ইংরেজটি খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের নাম লিখলেন। রাণীর কাছ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত তাঁর খেতাবটিও নামের পাশে জুড়ে দিলেন। ঠিকানা এবং কী করেন তাও লিখলেন গোটা-গোটা অক্ষরে। তারপর কলমটি পকেটে পুরে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমাকে ধন্যবাদ। খুব দরকারী একটা কাজ আজ সারা হলো।"

আমি হঠাৎ তেত্রিশ বছরের পথ পেরিয়ে আবার বয়সে ছোট হয়ে গেলাম। আমার একবার ইচ্ছে হলো বলি, "একদিন এই খাতায় সই করবার সুযোগ একজন সস্নেহে আমাকেও করে দিয়েছিলেন। আমি গ্রহণ করবার সাহস পাই নি। বাড়িতে থেকেও 'নটঅ্যাট হোম' লেখার রীতি আমি এই শহরে দেখেছি— কিন্তু সেকথা এখন কোন কমবয়সী ছেলে-মেয়ে বিশ্বাস করবে? তারা আমাকে হেসে উড়িয়ে দেবে, শুধু প্রমাণ হবে আমিও বৃদ্ধ হয়েছি। যা এখন নেই অথচ একদিন ছিল তাই নিয়ে নিজেদের যারা ব্যস্ত রাখতে ভালবাসে তারাই তো বৃদ্ধ।

গোপন চিঠির রহস্য

রাণীক্ষেত থেকে সায়েবের নামে মেমসায়েবের নিয়মিত চিঠি আসছে। তবু গুঞ্জন শেষ হয় না। হাইকোর্টে বাবুদের বেঞ্চিতে এবং ক্লাবের গেটে এ-বিষয়ে চাপা আলোচনা অব্যাহত রয়েছে।

উৎসুক বন্ধুদের প্রশ্ন, "এতো দিন হয়ে গেলো, সায়েব একলা রয়েছেন অথচ মেম নেই কেন?"

বাবুরা যেসব সন্দেহ করেছেন, দাম্পত্য-সম্পর্কের সেইসব দিক সম্বন্ধেও সেই বয়সে আমার কোনো জ্ঞানই নেই, তাই মনের মধ্যে কোনো প্রশ্ন জাগে না।

হাইকোর্টের দু'একজন বাবু আমাকে পাকড়াও করে জানতে চাইলেন, "কী

ব্যাপার শংকরবাবু! সায়েব-মেমে হলো কী?”

বোকার মতো আমি উত্তর দিয়েছি, “সায়েবকে জিজ্ঞেস করে বলবো।”

সেই-না শুনে বাবুরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। “না, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে না।”

এদিকে মেমসায়েবের পত্রাবলীর ফাইল আমার জিম্মায় ক্রমশই মোটা হয়ে উঠছে। এই ফাইলের সঙ্গে অন্য ফাইলের কোনো তফাত নেই। সায়েব নিজের হাতে মেমসায়েবকে যা লিখছেন তা সমস্ত পড়বার অধিকার আমার রয়েছে, ধরে নিয়েছিলাম। প্রত্যেক চিঠি আমি পড়তাম।

কিন্তু ইদানীং সায়েবকে বেশ চিন্তিত দেখাচ্ছিল। চিঠি লিখতে-লিখতে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে যান। তাঁর মনের মধ্যে কী হচ্ছে তা আমি আন্দাজ করতে পারতাম না। সেবার মেমসায়েবকে লেখা একটা চিঠি আমাকে পড়ে শোনালেন, কিন্তু অন্যবারের মতো চিঠিটা আমাকে খামে-সীল করে ডাকে ফেলতে দিলেন না।

আমি লক্ষ্য করলাম, চিঠিটা আমাকে শোনাবার পরে, চুপিচুপি কিছু বাড়তি কথা লিখে ঝটপট খামটা তিনি বন্ধ করে দিলেন।

আজ স্বীকার করতে দোষ নেই, চিঠি পড়িয়ে আবার গোপনে কিছু সংযোজন করার ব্যাপারটা মনের মধ্যে কিছুটা কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিল।

আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম, কী বাড়তি কথা লেখা হচ্ছে? গোপনে কিছু হচ্ছে ভাবলেই বোধ হয় এইভাবে ঔৎসুক্য বেড়ে যায়।

অপঠিত লাইনগুলো মানসচক্ষে উদ্ধারের চেষ্টা করেছি। একবার মনে হলে স্বামী হিসেবে স্ত্রীকে সায়েব এমন প্রিয়কথা লিখছেন যা আমার মত বালককে পড়ে শোনানো শোভন নয়। তাই কথাগুলো সায়েব হয়তো পরে লিখেছেন। কিন্তু আমার মনে পড়লো, স্ত্রীকে যা কিছু আদরের সম্ভাষণ তা তো চিঠির শুরু ও শেষে বিস্তারিতভাবেই লেখা হয়েছে। এ-বিষয়ে আমি ইতিমধ্যে এতোই প্রত্যক্ষ জ্ঞানসঞ্চয় করেছি যে কোনোদিন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে স্ত্রীকে প্রত্যাশিত ইংরিজি কথাগুলো শত-শত পদ্ধতিতে লিখতেও আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

মন তবুও সন্তুষ্ট নয়— অপঠিত লাইনগুলি মাঝে মাঝে আমাকে গোপন সুড়সুড়ি দিচ্ছে। প্রশ্ন জাগলো, যদি প্রিয় সম্ভাষণই হবে, তাহলে প্রত্যেক চিঠিতেই তো ওই গোপন ব্যাপারটা ঘটবে। কিন্তু এতোদিন সব চিঠি তো সায়েব আমার হাতেই দিয়ে দিতেন খোলা অবস্থায়— খাম সেঁটে রাণীক্ষেতের ঠিকানা

সমেত ডাকবাক্সে ফেলবার জন্য।

এই সময় হাইকোর্টের বাবুদের বেঞ্চিতে এবং অন্যত্র কিছু-কিছু অপ্রিয় কথা কানে আসতো। একজন বাবু জিজ্ঞেস করেই বসলেন, "সায়েব এবং মেম-এ কী হলো? হঠাৎ ঘরসংসার তুলে দিয়ে দু'জনে কেন ছিটকে পড়লেন দু'দিকে?"

ব্যাপারটা মিথ্যে নয়— এখন দু'জনের মধ্যে প্রায় হাজার মাইলের ব্যবধান। অবশ্য মিডলটন স্ট্রীটের সংসার ভেঙে যাবার পরেই আমি সায়েবের চাকরিতে যোগ দিয়েছি— ওঁদের যৌথ সংসার কেমন ছিল তা আমার নিজের চোখে দেখা হয় নি।

কিন্তু যাঁদের সে-সংসার দেখা ছিল, তাঁর ভাঙা হাটে বেশ দুঃখ পেতেন। তাঁদেরই একজন আমাকে বলেছেন, "তোমার কপাল খারাপ। সায়েবের মিডলটন স্ট্রীটের সংসারই দেখলে না! যেমন সাজানো গোছানো বাড়ি, তেমন আনন্দময় পরিবেশ। কলকাতার একমাত্র সায়েববাড়ি, যে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় এবং শ্রেষ্ঠ ইংরেজরা একই সঙ্গে জড়ো হতেন। বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মানার্থে প্রায়ই পার্টি লেগেই থাকতো। কিন্তু বারওয়েল সায়েবের আতিথেয়তার বৈশিষ্ট্য ছিল। কলকাতার সাহেবী পার্টি মানে ককটেল— অর্থাৎ যথেচ্ছ হুইস্কি সেবন। হুইস্কি যে বিলেতের রসিকসমাজে তেমন আদরণীয় নয় তা সায়েব প্রায়ই বন্ধুদের মনে করিয়ে দিতেন। তিনি এই তীব্র পানীয়ের নাম দিয়েছিলেন, 'ফায়ার ওয়াটার' বা 'তরল অগ্নি'! বারওয়েল সাহেব কিছুতেই অতিথিদের এই তরল অগ্নি পরিবেশন করতেন না। নিজেও স্পর্শ করতেন না। তার বদলে তাঁর পার্টিতে থাকতো সঙ্গীতের ব্যবস্থা। আর খাওয়ার শেষে কিছু ইউরোপীয় ওয়াইন— যার সম্বন্ধে তিনি অনেক কিছু জানতেন।"

কেন এই সংসার পঞ্চাশের দশকের আগেই ভেঙে গেলো সেই নিয়ে সর্বত্র জল্পনা-কল্পনা। মেমসায়েব সোজা চলে গেলেন রাণীক্ষেত। আর সায়েব অমন সাজানো বাড়ির মায়া কাটিয়ে প্রথমে উঠলেন স্পেনসেস হোটেলের ছোট্ট একটা ঘরে। এবং তারপর ক্যালকাটা ক্লাবে।

যাঁরা দূর থেকে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছেন তাঁরা নানা বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেছেন। দাম্পত্য সম্পর্কের ভাঙন এই অনুসন্ধানের মূল বিষয়বস্তু।

কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, "কবে ডাইভোর্সের মামলা শুরু হচ্ছে?"

কে এই বিপর্যয়ের জন্য দায়ী সে-নিয়েও হিসেবনিকেশ আরম্ভ হয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, "দোষটা সায়েবেরই।" এরপর তাঁরা যা কারণ দেখিয়েছেন

তা শুনলে কানে আঙুল দিতে হয়। আমার তখন নেহাতই কাঁচা বয়স। নাবালক ভাইবোন ও বিধবা মায়ের জন্য কিছু টাকা রোজগার করে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া ছাড়া বিশ্বসংসারে আর কোনো লক্ষ্য নেই আমার। কিন্তু আমাকেও অসহায়ভাবে নোংরা কথাগুলো হজম করতে হয়েছে। শুনতে শুনতে ভয়ও লাগতো— কারণ সায়েবের কোনো অমঙ্গল হলে আমাদের আর্থিক নিরাপত্তা যে বিপন্ন হবে তা বুঝবার মতো জ্ঞান তখন আমার হয়েছে।

সায়েব সম্বন্ধে আমি যেসব নোংরা কথা শুনতাম তা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতাম না। যাঁকে প্রতিদিন দেখছি, যাঁর প্রতিটি কথা আমাকে মোহিত করছে, যাঁর ভালবাসা আমাকে নতুন এক অভিজ্ঞতার জগতে পৌঁছে দিচ্ছে তিনি কেমন করে দোষী হতে পারেন?

যাঁর কাছে কাজ করি তাঁর দাম্পত্যজীবন সম্বন্ধে প্রকাশ্যে আমার ওকালতি করার কোনো অর্থ হয় না। কে আমাকে বিশ্বাস করবে? কেনই বা করবে?

সৌভাগ্যক্রমে গবেষণাকারীদের মধ্যে সর্ববিষয়ে মতৈক্য ছিল না। কেউ-কেউ সায়েবের পক্ষ নিতে গিয়ে মেমসায়েবের সম্বন্ধে অপ্রিয় মতামত প্রকাশ করতেন।

তাঁদের বক্তব্যের প্রতিবাদ করতে গেলেও আমি বকুনি খেতাম, "থামো থামো, তুমি তো কালকা যোগী! আমরা ব্যাচেলর বারওয়েল সাহেবকে ও দেখেছি। আইবুড়ো মিস্ ম্যারিয়ন প্লার যখন কলকাতায় এলেন তখনও দেখেছি। সুতরাং কোন ধান কোন চাল হয়েছে তা আমাদের জানা আছে।"

কিন্তু মিডলটন স্ট্রীটের সংসার উঠে যাবার পর যাঁরা গবেষণা করছেন তাঁদের একজন বলেছেন— মেমসায়েবের জীবনে অন্য এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। আর একজন বলেছেন— ওসব কিছুই নয়, মেমসায়েব সংসারাশ্রম ত্যাগ করে কোনো যোগীর আশ্রমে যোগ দেবার সংকল্প করেছেন। তাঁর এই মানসিক অবস্থার জন্য অবশ্য সায়েব নিজেই দায়ী।

ইন্ডিয়াকে সায়েব ভালবাসেন, কিন্তু ইন্ডিয়ান যোগীর আশ্রম সম্বন্ধে তাঁর যে বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল না তা আমার জানা আছে। ফলে বাবুদের বেঞ্চিতে এইসব কথা শুনে আমার উদ্বেগ আরও বাড়তে লাগলো।

মনের অবস্থা নিয়েই সায়েবের কাছে গিয়েছি। এবং কী আশ্চর্য, শনিবারের ভোরবেলায় সায়েব তাঁর স্ত্রীর গল্পই বলতে শুরু করলেন।

শনিবার আদালত বন্ধ থাকে—নিতান্ত প্রয়োজন না-হলে সায়েব ওইদিন ওল্ড পোস্টাপিস স্ট্রীটের চেম্বারে আসতেন না। ক্লাবে সুইটে বসে নিজের কাজকর্ম

করতেন। প্রথম কাজ হলো ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া। এই কাজ চলতো সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত। তারপরেই তিনি আরও 'গুরুতর' কাজে বেরিয়ে পড়তেন এবং আমি চিঠিপত্র টাইপে ব্যস্ত হয়ে পড়তাম।

গুরুতর কাজটি হলো, বেকার ছেলেদের জন্যে চাকরি খোঁজা! জার্ডিন হেন্ডারসন, এনড্রু ইউল, স্টেটসম্যান, ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই, বার্মাশেল— চাকরির সন্ধানে প্রতি শনিবার সায়েব কোথায় না যেতেন? যেখানেই উচ্চপর্যায়ে তাঁর কোনো চেনা-জানা লোক আছেন সেখানেই তিনি ছুটতেন বেকার ছেলেদের নিয়ে। এই কাজে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। কোথাও সাফল্য লাভ হলে তো উৎসব লেগে যেতো।

সায়েব বলতেন, "যদি কখনও ব্যারিস্টারি থেকে অবসর নিতে পারি তখন এই চাকরি সন্ধানের কাজটাই সপ্তাহের ছ'দিন করবো।"

কত অসহায় যুবক এবং গার্জেন যে চাকরির জন্য তাঁকে উত্ত্যক্ত করতো তার ইয়ত্তা নেই। মাঝে-মাঝে তিনি বিরক্তও হতেন। কিন্তু রাগ কমলেই বলতেন, "দোষটা এইসব হতভাগ্য ছেলেদের নয়, দোষটা শিল্পপতি এবং সবকারের— আরও অনেক কলকারখানা কেন এদেশে তৈরি হচ্ছে না?"

ছেলেদের চাকরির অ্যাপ্লিকেশন তিনি নিজে লিখে দিতেন। বলতেন, "কখনও 'আই বেগ টু' লিখবে না। কোন দুঃখে তুমি ভিক্ষে করবে? তাছাড়া এ পৃথিবীতে ভিক্ষে করলেও কে তোমার আবেদনে সাড়া দেবে?" ছেলেদের বলতেন, "কেরানিগিরির যুগ শেষ হতে চলেছে। অন্য কোন বৃত্তি বেছে নাও। 'যে কোনো চাকরি করতে রাজী আছি' কথাটার কোনো মানে হয় না আজকাল।"

শনিবারের প্রভাতী চিঠিলেখা পর্ব শেষ হলো। সায়েব তাঁর স্ত্রীকেও একটা চিঠি লিখে ফেললেন। আমাকে তা পড়তেও নির্দেশ দিলেন। এবার আমি চিঠিটা খামের মধ্যে বন্ধ করতে যাচ্ছিলাম, সায়েব বারণ করলেন এবং খাম এবং চিঠি দুই-ই আমার হাত থেকে নিয়ে নিলেন। মনে হলো, আরও কিছু লিখবেন যা আমাকে দেখাতে চান না। অবশ্যই সে-অধিকার তাঁর আছে, স্ত্রীকে লেখা অপরের চিঠি সম্পর্কে কে আগ্রহী হতে চায়? কিন্তু এইভাবে চিঠি পড়ানোর পরে লুকোচুরি খেলার কী অর্থ?

মনে হলো, সায়েবের মুখে চিন্তার রেখা। কোনো বিশেষ ভাবনা তাঁকে অবশ্যই কাতর করেছে। এরই মধ্যে তাঁকে বেরোতে হবে অপরের চাকরির সন্ধানে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সায়েব চিঠিখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। মনে হচ্ছে, এমন কিছু কথা লিখতে হবে যা লিখতে তাঁর মন চাইছে

না। এই অপ্রিয় বাণী কী হতে পারে? আমারও দুশ্চিন্তা বাড়ছে। আদালতে বাবুদের বেঞ্চিতে যেসব গবেষণার বিবরণ কানে এসেছে তা আমাকে বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

ঘড়ির দিকে তাকালেন সায়েব। যে-ছেলেটিকে নিয়ে চাকরির সন্ধানে বেরুবার কথা সে এখনও হাজির হয় নি। সায়েব বললেন, "টাইপরাইটার বন্ধ করো। তোমাকে আমার গল্প বলি।"

আমার আবশ্যই আনন্দিত হবার কথা। কেননা এমন মজা করে ছোট্ট-ছোট্ট ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমি অন্য কারও মধ্যে দেখি নি। শুনতে-শুনতে নেশা হয়ে যায়। মনে হয় এসব গল্প যেন কখনও শেষ না হয়!

সায়েব বললেন, "স্কিপারের চিঠিটা আজই পোস্ট করতে হবে। ওর সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের চুক্তি আছে, চিঠি পাওয়া মাত্রই পরের ডাকে উত্তর দিতে হবে!" হয়তো বিয়ের পরে এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সায়েব আমাকে অবাক করে দিলেন, এই চুক্তির সুবর্ণজয়ন্তী পালনের সময় কেটে গিয়েছে।

ঠিক এই সময় দরজার বেল বাজলো। যার চাকরির খোঁজে সায়েব বেরোবেন সে এসে গিয়েছে। সায়েব হঠাৎ বললেন, "স্কিপারকে লেখা চিঠিটা আমি নিজেই পোস্ট করবো।"

ঘরের এক কোণে গিয়ে আমাদের দৃষ্টির বাইরে দাঁড়িয়ে সায়েব ঐ চিঠিতে আরও যেন কী লিখলেন। তারপর চিঠিটা খামবন্দী করে নিজের পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়লেন।

আমার মনে হলো, সায়েবের মুখে চোখে আমি যন্ত্রণার ছায়া দেখলাম। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেলো—যাঁর স্ত্রী এমন আদর্শ মহিলা তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ কেন? কেন হাইকোর্টের বাবুরা অপ্রিয় কথা বলে? ওঁদের দুজনের সম্পর্ক কী সত্যিই স্থায়ী হবে না?

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এই গোপনপত্রের রহস্য সমাধান হয় নি। এরপর মৃত্যু বারওয়েল সায়েব সম্পর্কে আমাদের সমস্ত দুশ্চিন্তার অবসান ঘটিয়ে দিয়েছে। মৃত ব্যক্তিরা তো বিবাহবিচ্ছিন্ন হয় না!

আমি যথাসময়ে শ্রীমতী বারওয়েলের স্নান্নিধ্যে এসেছি। তিনি বলেছেন, "আমরা ঝগড়া করেছি বটে, কিন্তু আমি কখনও নোয়েলকে ছেড়ে যাবার কথা ভাবি নি। নোয়েলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো জন্ম-জন্মান্তরের।"

তাহলে আমার অলক্ষ্যে কী গোপন কথা চিঠিতে সায়েব লিখতেন?

মেমসাযেব তখন সায়েবের লেখা একটা পুরনো চিঠি আমাকে দেখিয়েছিলেন।

সেখানে সায়েব লিখেছেন : "সেবারের অসুখের পর তুমি আমাকে অবসর নিয়ে রানীক্ষেতে চলে আসতে পরামর্শ দিয়েছিলে। বলেছিলে, তোমার সামান্য যা পৈতৃক অর্থ আছে তাতে দু'জনের চলে যাবে। আমি বিরক্তভাবে বলেছিলাম, ওইভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যা ভাল। কিন্তু এবার আমি সত্যিই বিপদে পড়েছি। রোজগার নেই, পয়লা তারিখে শংকরের এবং কর্মীদের মাইনে দেবার কোনো পথই দেখতে পাচ্ছি না।"

মেমসায়েব তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কর্মচারীদের কাছে স্বামীর মুখরক্ষা করেছিলেন।

মেমসায়েব বললেন, "তুমি কি জানতে, কয়েক বছর আগে নোয়েলের একটা বড় ধরনের হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল?"

অবশ্যই জানতাম না। জানলে, বিভূতিদার গ্যারান্টি সত্ত্বেও পাট কোম্পানির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে টেম্পল চেম্বারে সায়েবের চাকরিতে যোগ দেবার সাহস অর্জন করতে পারতাম না।

মেমসায়েবের মুখে শুনলাম, সেই হার্ট-অ্যাটাক থেকে বাঁচবার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের দুঃসাহসী সৈন্যের মতন প্রথম আঘাতকে অবহেলা করেই তিনিই আবার প্রাণময় হয়ে উঠেছিলেন। বিখ্যাত একজন বিদেশী ডাক্তার সেই সময় মেমসায়েবকে আড়ালে ডেকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "ওকালতি প্র্যাকটিস থেকে ওঁর অবসর নেওয়া উচিত— কলকাতার উত্তেজনা থেকে ওঁকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যান।"

মেমসায়েবের হাতে উত্তরাধিকারসূত্রে তখন কিছু পারিবারিক অর্থ এসেছে। ছোটো কোনো জায়গায় সংসার পাতলে দু'জনের মোটামুটি চলে যেতো। কিন্তু সায়েব সে-প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ নাকচ করেছিলেন।

আমার মনে পড়লো, নিজের ভয়াবহ হার্ট-অ্যাটাকের কথা স্মরণে রেখেই সায়েব মৃত্যু নিয়ে রঙ্গরসিকতা করতেন। আবার কখনও আমাকে বলতেন : "আমি তোমাদের টেগোর পড়েছি। মৃত্যুকে যিনি মাধুর্য দিয়েছেন—এমন অভিজ্ঞতা ইউরোপের কোনো সাহিত্যে পাই নি। জানো, পশ্চিমে সমস্ত মানুষ মৃত্যুকে ঘৃণা করে। আমার স্ত্রীর এক দূরসম্পর্কের কাকা ছিলেন, তিনি ভারতীয় ভাবধারার মধ্যে মৃত্যুর নবরূপ আবিষ্কার করেছিলেন। একবার ম্যারিয়নের

একজন নিকট আত্মীয়ের মৃত্যু হলো। কাকা কিন্তু মৃত্যু শব্দ ব্যবহারই করলেন না। বললেন —হি হ্যাজ পাসড অ্যাওয়ে— সে চলে গিয়েছে। প্রিয়জনেরা সবাই যখন শোকে ভেঙে পড়ছেন, তখন তিনি বলে উঠলেন, "তোমরা কাঁদছো কেন? সে তো কেবল এক ঘর থেকে অন্য ঘরে গিয়েছে।"

আমি বয়সের তুলনায় একটু পাকা ছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি এ-কথা বিশ্বাস করেন?"

সায়েব বলেছিলেন, "বিশ্বাস করতে পারলে কী সুন্দর হতো বলো তো। কিন্তু অবিনাশী আত্মার কথা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি না। জানো শংকর স্কিপার পারে। অনেক চেষ্টায় আমার স্ত্রী এমন এক চিন্তার জগতে প্রবেশ করেছে যেখানে মৃত্যু শত চেষ্টাতেও কিছু হরণ করতে পারে না।"

সায়েবের দেহাবসানের পর মেমসায়েবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেখলাম তাঁর জন্মান্তরে বিশ্বাস একটুও কমে নি।

মেমসায়েবের সঙ্গে যখন কথা হচ্ছিল তখন তাঁর চোখ ছলছল করছিল। তিনি বলেছিলেন, "নোয়েলের সঙ্গে অবশ্যই আবার দেখা হবে। আমি তাকে সেদিনও স্বপ্নে দেখেছি। আমি নোয়েলকে বলেছি, সামনের বার যখন আসবে তখন আরও একটু ভাল স্বাস্থ্য এবং স্ত্রীর ওপর একটু কম রাগ নিয়ে এসো, নোয়েল।"

সত্যবাদী

আইনের আঙিনায় আরও কত বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ঘটলো।

আমি ক্রমশই তাঁর অতি প্রিয়জন হয়ে উঠলাম। সায়েবের কাছে কত মানুষ আসে, তাদের কেউ ধনী, কেউ বা দরিদ্র, কেউ বা সন্ন্যাসী, কেউ বা পতিতা, কেউ বা পরাক্রমশালী সৈন্যাধ্যক্ষ, কেউ বা যৎসামান্য কেরানি। কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার, কেউ বা নিরক্ষর, কেউ শিল্পী, কেউ বা নরঘাতক! কেউ স্বার্থসর্বস্ব ব্যবসায়ী, কেউ বা দেশপ্রেমী। এদের কেউ অন্যায়ের প্রতিকার চায়, কেউ অর্থ চায়, কেউ প্রতিশোধ চায়, কেউ আদালতে বিজয়ী হয়েও সমস্ত অপরাধবোধ থেকে মুক্তি চায়।

এদের অনেকের সমস্যার সমাধান হয়েছে, অনেকের প্রত্যাশা পূর্ণ হয় নি।

আমার মনে আছে ফাঁসির এক আসামীর কথা— হিদায়েতুল্লা। নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের প্রখ্যাত প্রযোজক বিখ্যাত শিল্পরসিক হরেন ঘোষ ছেচল্লিশ সালে হিন্দু-মুসলিম রায়টের সময় ধর্মতলায় ওয়াছেল মোল্লা বিল্ডিংএ খুন হয়েছিলেন নৃশংসভাবে। এই মামলার প্রধান আসামী হিদায়েতুল্লার ফাঁসির অর্ডার হয়েছিল। যেদিন ফাঁসি হবে তার আগের দিন জেলখানা থেকে সায়েবের কাছে চিঠি এসেছিল। আবার যেদিন সকালে হিদায়েতুল্লার প্রাণদণ্ড কার্যকর হলো সেদিনও আলিপুর থেকে টেলিফোন এসেছিল। সেই দুঃসংবাদবাণী টেলিফোনে আমাকেই প্রথম নিতে হয়েছিল। খবরটা শুনে সাহেব অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে ছিলেন। তাঁর কেন যেন স্থির বিশ্বাস ছিল, হিদায়েতুল্লা বিনা অপরাধে ফাঁসিতে প্রাণ হারালো।

এমন ঘটনা নাকি যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে। অপরাধী মানুষ যেমন শাস্তিকে ফাঁকি দিয়ে মনের সুখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তেমন নিরপরাধ মানুষও ভাগ্যদোষে শাস্তি পাচ্ছে। আইনের প্রতি, সমাজের প্রতি তাদের বিশ্বাস অটুট থাকা সম্ভব নয়।

সায়েবের কাছে জানতে চেয়েছি, আইনের রক্তচক্ষু থেকে আপনি যাঁদের রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদের কি কখনও জিজ্ঞেস করেছেন তাঁরা অপরাধ করেছেন কি না?

বয়সের তুলনায় অকালপক্ক ছিলাম বলেই বোধ হয় এমন প্রশ্ন তুলতে সাহস করেছি আমি। কিন্তু সায়েব মোটেই বিরক্ত হন নি। বরং আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

সায়েব বললেন, "সত্য কথা বলতে কি, আমি কখনও কোনো আসামীকে গোপনেও জিজ্ঞেস করি নি তুমি অপরাধ করেছো কিনা? আমার মনে হয় না, কোনো বিচক্ষণ আইনজ্ঞ এমন প্রশ্ন করেন।"

আমার সাহস তখন আরও বেড়ে গিয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি, "সত্যবাদিতার ওপর আপনি বড় বেশি গুরুত্ব দেন। যদি কোনো লোক এসে আপনাকে বলে সে খুনী আপনি কী আদালতে অস্বীকার করবেন সে খুন করেছে?"

এক মুহূর্তও ভাবতে হলো না সাহেবকে। তিনি উত্তর দিলেন, "মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিলে শ্রদ্ধেয় আইনজ্ঞ হওয়া যায় না। আমি হয়তো খুনীর শাস্তি লাঘবের চেষ্টা করবো, হয়তো দেখবো আকস্মিক এবং গুরুতর উত্তেজনার মধ্যে সে এই কাজ করে ফেলেছে, কিন্তু আমি নির্জলা মিথ্যা বলতে পারবো না। তেমন হলে

আমাকে ব্রীফ ফেরত দিতে হবে।”

ব্রীফ ফেরত দেওয়া প্রসঙ্গে মনে পড়লো, তখন সায়েবের অত্যন্ত অর্থাভাব। কিছু টাকা না হলে চলে না। সেই সময় এক ধড়িবাজ ব্যবসায়ী কেবল মতামতের জন্য সায়েবকে একটি ব্রীফ পাঠালো। কাজের তুলনায় এই ব্রীফের পারিশ্রমিক অনেক বেশি মার্কা করা আছে।

সায়েব সেই ব্রীফ পড়লেন। তারপর আমাকে বললেন, “সীল করা খামে পুরে এখনই কাগজপত্তর ফেরত দিয়ে এসো।”

আমি বিস্মিত, কিছুটা বিরক্তও বটে। কারণ নগদ টাকা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সায়েব বললেন, “আগে ফিরিয়ে দিয়ে এসো, তবে কথা।”

ব্রীফ ফেরত দিয়ে এসেছি। হাইকোর্টের একজন বিচারকের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক। এই বিচারক সম্পর্কে একটি কটু মন্তব্য করবার জন্যেই যেন সায়েবের ‘মতামত’ চাওয়া হয়েছে। সায়েব বললেন, “ঐসব কাজ আমি করি না, যতই আমার অর্থের অভাব থাক। ওরা ভাবছে, আমি ওই শ্রদ্ধেয় লোকটির সঙ্গে গোপনে কথা বলারও সুযোগ পাবো। কিন্তু আমি তা কখনও করতে প্রস্তুত নই, আদালতের নিজস্ব একটা ডিগনিটি আছে।”

আপন কথা

আজ বিজয়া। বহু বছর আগে আগস্টের এক ম্লান সন্ধ্যায় যাঁকে শেষ দেখেছিলাম, যাঁর আশ্চর্য জীবনকথার কয়েকটি ছবি বুকের মধ্যে নিয়ে বিশ বছর বয়সে সাহিত্যযাত্রা শুরু করেছিলাম, এই বিষণ্ণ দিনে তাঁর কথাই আবার স্মরণ করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

‘এবারের বিজয়া দশমী আমার কাছে অবশ্যই শূন্য। এই প্রথম বিজয়ার আয়োজন চলছে অথচ আমার বাড়িতে মা নেই। পঞ্চাশ বছর ধরে যাঁকে মা বলে ডাকবার সৌভাগ্য লাভ করেছি এবার তিনি চলে গিয়েছেন—অবিচার অথবা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনতে পারি না বিশ্ববিধাতার কাছে। যিনি একদিন আমাকে ধরাধামে এনেছিলেন তিনি তো আমাকে ত্যাগ করে একদিন চলে যাবেনই। এ তো চিরন্তন সত্য। প্রত্যেক বিচ্ছেদের আলোকময় দিকও

আছে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মাতৃবিয়োগের পরে আমাকে লিখেছিলেন, 'মাতৃশোকে কাতর হলেও এই মৃত্যুকে স্বাগত না জানানোর উপায় দেখছি না—কারণ আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে পুত্রশোকের অগ্নিতে দগ্ধ হবার প্রবল সম্ভাবনা তাঁর ছিল।' এ-কথা আমার পক্ষেও প্রযোজ্য, তবু পরম দুঃখের দিনেও যিনি নিরন্তর আমার পাশে ছিলেন তাঁর তিরোধান বুকের মধ্যে এমন অসীম শূন্যতার সৃষ্টি করে যে তাঁর কথা লিপিবদ্ধ না-করলে শরীর ও মনের অবসাদ শেষ হতে চায় না।

মায়ের কথা আমার লেখা উচিত। বাবার অকালমৃত্যুর পরে জীবনের এই অন্ধকারতম অধ্যায়ে বিহারী চক্রবর্তী লেনের জীর্ণ কুঠুরিতে তিনিই ছিলেন আমার শক্তির উৎস। অমাবস্যার অন্ধকারে, দুর্যোগময় রাতে, নির্জন পথ ধরে আমি তখন অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছি মায়ের আশীর্বাদের প্রদীপটি ধরে। ঘন অন্ধকারে সে-আলোর পরিমাণ অবশ্যই বিশাল নয়। সামান্য বিধবার পক্ষে তাঁর চোদ্দো বছরের জ্যেষ্ঠ সন্তানকে কতটুকু শক্তি দেওয়াই বা তখন সম্ভব ছিল? কিন্তু তিনি তাঁর সর্বস্বই আমাকে দিয়েছিলেন সেই আশীর্বাদটুকু সম্বল করেই ভাগ্যবান আমি নিরাশার অন্তহীন অন্ধকার পথ পেরিয়ে এসেছি।

তারপর জীবনে এসেছে নানা সংবাদ। ঘটনার অবিরাম স্রোতে দুঃখদিনের কথা ভালভাবে স্মরণ করার অবকাশও জোটে নি। কিন্তু আজ এই মাতৃহীন বিজয়ার দিনে তাঁর হিসেবনিকেশ করার জন্যে আমার ভেতরকার সেই চোদ্দো বছরের বালকটি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যা চলে গেছে তা ফিরে আসে না, যা অবশিষ্ট আছে তাই নিয়েই পৃথিবীতে সন্তুষ্ট থাকতে হয়— এই সার সত্যটি পঞ্চাশোর্ধ্ব আমার কাছে অজ্ঞাত নয়। তবু কখনও কখনও যুক্তির বাঁধ ভেঙে পড়ে— যাঁরা নেই তাঁরাই শাশ্বত সত্যরূপে চরম অবিশ্বাসীর চোখের সামনে নিভৃতে উপস্থিত হন। আমি তাঁদের সান্নিধ্যেই ধন্য হতে চাই— আপনারা অনুমতি করুন।

পুনরাবৃত্তিতে পাঠক প্রসন্ন নন, সাহিত্যের অঙ্গনে চিরনবীনেরই জয়ধ্বনি। যিনি আজও পরিচিত নন সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের জয়মাল্যটি তাঁরই জন্য। সেই কথা স্মরণ রেখে আমিও নতুনের সন্ধানেই নিজেকে ব্যস্ত রাখি, কিন্তু আজ বিজয়ার এই ম্লান সন্ধ্যায় আপনারা এই স্মৃতি-ভারাক্রান্ত মানুষটিকে সাহিত্যের সমস্ত ট্রাফিক আইন লঙ্ঘন করার উৎসাহ দিন। তাকে ফিরে যেতে দিন তার মায়ের কাছে, তার সায়েবের কাছে। হাইকোর্টের আদালতী কর্মক্ষেত্রে যাঁর হাত ধরে অপরিণতবুদ্ধি কিশোরের আশ্চর্য মানব-তীর্থযাত্রা শুরু হয়েছিল।

অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের মুহূর্তে মা আমাকে বিজয়ী হবার আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু বিজয় পথের সন্ধান যোগাতে পারেন নি। আমি শুধু অভয়বাণী পেয়েছিলাম— যারা চেষ্টা করে যারা হতাশ্বাস হয় না, তারা সমস্ত পরিস্থিতিতেই জয়ী হয়। বিশ্ব-সংসারে এই নাকি নিয়ম। আমি সরল মনে মায়ের অভয়বাণীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে করুণাহীন এই পৃথিবীর অপরিচিত পথে বেরিয়ে পড়েছিলাম আত্মরক্ষার জন্যে, সংগ্রামে বিজয়ী হবার জন্যে।

সমস্ত পথ যখন রুদ্ধ, আমার আশার প্রদীপটি নিবু-নিবু, মানুষের উপর সমস্ত বিশ্বাস যখন শেষ হতে চলেছে তখন ওল্ড পোস্টাপিসের টেম্পল চেম্বার্সে দেখা হলো সত্তর বছরের সেই বিদেশী বৃদ্ধের সঙ্গে— যাঁর মধ্যে শিশুর সরলতা এবং যুবকের প্রাণপ্রাচুর্য। আমার সহপাঠীরা আড়ালে আমাকে অকালবৃদ্ধ বলতো (বোধ হয় আমি তাই, আমি কখনও যৌবনের উচ্ছ্বাস অনুভব করি নি)। ভাগ্যচক্রে আমি যাঁর কাছে কর্মসূত্রে আবদ্ধ, তিনি বার্ধক্যেও অকাল-শৈশব ও অকাল যৌবনের রঙীন আভায় সমুজ্জ্বল।

সেসব কাহিনীর অনেকগুলি আমার সাধ্যমতো ইতিমধ্যেই আমি লিপিবদ্ধ করেছি —এতো বছর পরেও সে-কাহিনী বেঁচে আছে মানুষের মনে সে আমার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্য। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে অনুভব করছি আমি এখনও সর্বস্ব দিয়ে নিজে কে ভারমুক্ত, দায়মুক্ত করি নি, আমার সঞ্চয়ের সংগ্রহশালায় এখনও স্মৃতির স্বর্ণখণ্ডের কয়েকটি খণ্ড ধুলায় পড়ে রয়েছে। আমার জীবন অবসানের সঙ্গেই সেই সব সুবর্ণ-সঞ্চয় চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে। ইতিহাসের চিহ্নিত পুরুষ নন তিনি অথবা আমি। বিচ্ছিন্ন স্মৃতির অবলুপ্তিতে তাই কারও কোনো অপূরণীয় ক্ষতি হবে না। কিন্তু বিজয়ার এই বিদায় রাগিনীতে আমি নিজে আবার মহাসম্পদে ধনী হয়ে উঠতে চাই, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে।

হে বৃদ্ধ বিদেশী, হে সদাহাস্যময় প্রাণবান পুরুষ, হে প্রসন্ন মানবতীর্থযাত্রী, হে সদাসংশয়-ক্ষতবিক্ষত বন্ধু, তুমি কিছুক্ষণের জন্যে আমার মানসলোকে প্রত্যাবর্তন করো— তোমার একদা-স্নেহধন্য বালকটিকে আলো দাও, আনন্দ দাও, নতুন করে তাকে স্মৃতির সলিলে অবগাহনের সুযোগ দাও।

কী বলি? কোথায় শুরু করি? কী এমন অবশিষ্ট আছে যা এখনও এই বুভুক্ষু কাঙালের সঞ্চয়শালায় অবশিষ্ট থাকতে পারে?

আছে, আছে। এমন কিছু আছে যা এতোদিন বলা যায় নি। আমি তাঁকে ছোট করতে চাইনি। তাঁর স্ত্রীর কথাও আমাকে ভাবতে হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম

এই সাধ্বী ইংরেজ রমণী একদিন বিদূষী ভার্যার কতর্ব্যপালন করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর মূল্যবান আলোকপাত করবেন। একান্ত প্রিয়জনের বিশ্লেষণমাধুর্যে তা হয়ে উঠবে মহামূল্যবান। কিন্তু তা হবার নয়। শেষজীবনে মেমসায়েব জীবিত থেকেও হয়েছেন স্মৃতিভ্রষ্ট—তিনি তখন কাউকে চিনতে পারেন না, কোনো কিছুই স্মরণে নেই তাঁর। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী— স্মৃতিভাবে শ্লথ সোনার তরী তখন প্রিয় দেহটিকে জীবনসাগরের এপারে ফেলে রেখে চিরবিস্মরণের অন্ধকার সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছে।

সুতরাং যা পারিবারিক, যা নিতান্ত ব্যক্তিগত তা আব লুকিয়ে রাখার সময় নেই। স্মৃতি যেমন করে এই স্নেহময়ী পতিব্রতাকে আপন খেয়ালে সর্বস্বহারা করেছে তেমন শাস্তি একদিন অকস্মাৎ আমার ওপরেও নেমে আসতে পারে। বাজেয়াপ্ত হবার আগেই আমার যা কিছু আছে, মূল্যবান না হলেও তা জমা দিতে চাই মুদ্রিত অক্ষরের মহাশক্তিমান প্রহরীর কাছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র প্রিয় স্মৃতিতে আমি বেঁচে থাকতে চাই অপরিচিত পাঠকজনের হৃদয়ে, মুদ্রিত অক্ষরের পাষাণ প্রতিমারূপে আমি নীরবে অপেক্ষা করতে চাই অনাগত যুগের রামচন্দ্ররূপী প্রিয়জনের প্রতীক্ষায়, যাঁর পাদস্পর্শে দৈহিক মৃত্যুর অনেক পরেও আমি কিছুক্ষণের জন্য পুনরুজ্জীবিত হবো।

আমার নবীন আপনজনের কেউ-কেউ জিজ্ঞেস করেন, সায়েব তোমার জন্যে এমন কী করেছিলেন? এ-দেশের শত সহস্র মানুষ যেমন কোথাও-না-কোথাও কাজ করেন তুমিও তাই করেছো। কর্মস্থলে তিনি কি তোমাকে বিত্তবান করেছিলেন?

— অবশ্যই নয়। আমার চেয়ে বেশি রোজগার করতেন হাইকোর্টের অধিকাংশ ব্যারিস্টারের বাবু।

তিনি তোমাকে প্রতিদিন কতক্ষণ কাজে ব্যস্ত রাখতেন?

— সেই সকাল দশটায় টেম্পল চেম্বারের দরজা খোলা হতো। তারপর বিকেল চারটে পর্যন্ত কাজকর্ম। এরপর সায়েবের বাসস্থান। সেখানে সাধারণত সাড়ে-সাতটার আগে ছুটি মিলতো না।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল, পয়সার অভাবে কলেজের যে পড়াশোনায় ইতি হয়েছিল রাত-কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে তা আবার শুরু করা যাক। সায়েব উৎসাহ দেখাতে পারেন নি, কারণ সন্ধ্যাবেলায় আমাকে তাঁর অবশ্যই প্রয়োজন। পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রাইভেটে বি-এ পড়ো। একবার তখনকার ভাইস-চ্যান্সেলর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাকে তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু লাভ হলো না। প্রমথনাথ বললেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং জেলবন্দী ছাড়া আর কাউকে প্রাইভেটে গ্র্যাজুয়েট হবার সুযোগ দেওয়া হয় না।

এই উত্তরে সায়েব সন্তুষ্ট হন নি। জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমরা তো সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েই অন্যের সঙ্গে সমান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত।

প্রমথনাথ এরপর যা বলেছিলেন তার সঙ্গে সায়েব একমত হয়েছিলেন—কলেজের শিক্ষাটা শুধু পরীক্ষার হল-এ প্রশ্নের উত্তর লিখে পাস করা নয়। পাঠ্যক্রম একটা অভিজ্ঞতা—বিদ্যাস্থানের অদৃশ্য আলো ও শিক্ষকদের দৈনন্দিন সান্নিধ্য ছাত্রের জীবনে যে চিরস্থায়ী আলোকপাত করবে তাই শিক্ষা। অর্থাৎ প্রাইভেটে গ্র্যাজুয়েট হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সায়েব অবশ্য আমাকে হতাশ হতে দেন নি। বলেছিলেন, "এই ব্যবস্থার আমি প্রতিবাদ করবো। কারণ, জীবনের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদিন যে শিক্ষা লাভ হচ্ছে, কলেজের ক্লাসে তার বেশি কি পাওয়া যাবে?"

তিনি আরও বলেছিলেন, "আমি সেনেটের সদস্য—আমি লিখে দিচ্ছি, যারা নামের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত অক্ষর (বি.এ) লিখতে পারে তুমি তাদের অনেকের থেকে বিদগ্ধ।"

এরপর শুরু হয়েছিল তাঁর সহাস্য প্রাইভেট কনভোকেশন। তিনি শোনালেন, "আমি বলে রাখছি, একদিন বিশ্ববিদ্যালয় তোমাকে ডেকে সম্মানিত করবে, সেদিন এই বৃদ্ধকে যেন ভুলে যেও না!"

আমার নবীন প্রিয়জনদের পরবর্তী প্রশ্ন : রবিবার এবং অন্য ছুটির দিন কি ছুটি মিলতো?

—না, মিলতো না। ছুটির দিনে চেম্বার বন্ধ, কিন্তু যেতে হতো অস্থায়ী নিবাস ক্যালকাটা ক্লাবের রেসিডেন্সিয়াল সুইটে।

পরবর্তী প্রশ্নঃ সায়েবের গাড়ি ছিল?

গাড়ি দেখি নি— তবে সায়েবের ড্রাইভারকে দেখেছি। প্রায়ই সায়েবের কাছে কিছু সাহায্যের প্রত্যাশায় বসে থাকতেন। নাম প্রভাত বৈরাগী। এই প্রভাতবাবুর মুখেই শুনেই, সায়েবের গাড়ি ছিল, বিরাট আমেরিকান গাড়ি—রাক্ষসের মতো পেট্রলক্ষুধা। এই পেট্রল-রাক্ষসকে স-সারথি অন্য কারও কাছে হস্তান্তরের অনেক চেষ্টা করেছিলেন সায়েব, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত শুধু গাড়িই বেচেছিলেন। প্রভাতচন্দ্র তখনও সারথিপদে সশরীরে বহাল থেকে মাসিক মাহিনা অর্জন করেছেন এবং অবশেষে স্টেটবাসের ড্রাইভার পদটি সায়েবের এক পরিচিত প্রতিবেশী বন্ধুর সাহায্যে খুঁজে নিয়েছেন।

কোথায় স্টেটবাস আর কোথায় সায়েব। কোথায় ব্যারিস্টার আর কোথায় এক আনার টিকিট কাটা বাবু! টানা এক সপ্তাহ বাস চালিয়ে প্রভাতচন্দ্রের মনে দুঃখের পাহাড় জমে উঠতো, এবং নির্দিষ্ট ছুটির দিনে তার কিছু নমুনা আমাকে শুনতে হতো।

"আপনার কপাল খারাপ, বড্ড দেরিতে এলেন।" প্রভাতচন্দ্র আমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করতেন। "সায়েবের অমন সুন্দর গাড়ি দেখলেনও না, চড়লেনও না!"

এরপর একদিন এসপ্ল্যানেডের বাস স্ট্যান্ডে প্রভাতচন্দ্র আমাকে দেখতে পেয়ে জোরে হর্ন দিয়েছিলেন। পাইলটের বিশিষ্ট অতিথি হয়ে টিকিট না-কেটে স্টেটবাসে পরিভ্রমণের সেই অপ্রত্যাশিত সুখের কথা আমার মনে আছে। বাস থেকে হাওড়া স্টেশনে নামার পর প্রভাতচন্দ্র আমাকে ভাঁড়ে চা না খাইয়ে ছাড়েন নি। বলেছিলেন, "এই পাবলিক বাস আর ভাল লাগে না, যেন ঘরের বউ বাজাবে বেরিয়ে পাপকর্ম কবছি। সাযেবের একটা গাড়ির ব্যবস্থা হলেই আমাকে খবর দেবেন।"

আমার নবীন প্রিয়জনদের প্রশ্ন : কত মাইনে পেতে? সে-টাকা কি তখনকার বাজারদরের তুলনায় বেশি।

—ইস্কুলে যখন চাকরি করতাম তখন পেতাম মাসে সাড়ে-বাষট্টি টাকা। এক আনা রেভিনিউ স্ট্যাম্পে কাটা যেত। আমাদের প্রধান শিক্ষক পেতেন একশো পঁয়তাল্লিশ টাকার মতন—পরিমাণটা তখন প্রচুর মনে হতো। ইস্কুল থেকে যেখানে চাকরির ইন্টারভিউ দিয়েছিলাম, সেখানে মাইনে ছিল আশি টাকা। জুট অ্যান্ড গানিতে কিছুদিনের নরকযন্ত্রণা ভোগ করে যখন টেম্পল চেম্বার্সে সায়েবের কাছে এলাম তখন মাইনে এই আশি টাকাতেই স্থির হয়ে রইলো।

শুধু আশা ছিল কিছু বাডতি তহুরির, যার ইংরিজি নাম ক্লার্কেজ। ব্যারিস্টারের বাবুরা এক সময় সায়েবের ফিয়ের ব্যাপারে সর্বেসর্বা ছিলেন। সায়েবের ব্রীফে কত মোহর ফি মার্কা হবে তা ব্যারিস্টারের বাবুই ঠিক করতেন। ব্যারিস্টার নিজে কখনও এ-বিষয়ে নাক গলাতেন না।

পয়সার ব্যাপারে সোজাসুজি আলোচনা করাটা এই মহান পেশার পক্ষে নাকি কখনও শোভন ছিল না। সেজন্যে এক অলিখিত নিয়ম অনুযায়ী বার অফ ইংলন্ডের মেম্বাররা তাঁদের প্রফেশনাল মক্কেলকে ক্লার্কের মাধ্যমে বিল পাঠালেও অনাদায়ী বিলের জন্যে কোনোরকম মামলা-মোকদ্দমা করতেন না। নিয়ম ছিল, যদি প্রফেশনাল মক্কেল ব্যারিস্টারের প্রাপ্য বিল পেমেন্ট না করেন

তবে ব্যারিস্টার এই অভিযোগটি বার-কাউন্সিলকে জানাবেন। এবং এক অলিখিত প্রথা অনুযায়ী খবরটি প্রচারিত হওয়া মাত্র ঐ প্রফেশনাল মক্কেলের কোনো ব্রীফ বার অফ ইংলন্ডের অন্য কোনো সভ্য গ্রহণ করবেন না।

এখানে 'প্রফেশনাল মক্কেল' কথাটির উপর পাঠককে বিশেষ নজর রাখতে অনুরোধ করছি। একবার সায়েবের এই অনাদায়ী বিল নিয়ে আমরা বেশ হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়েছিলাম।

যিনি আমাকে সায়েবের কাছে নিজে গিয়েছিলেন সায়েবের সেই ভূতপূর্ব বাবু বিভূতিদা আমাকে শুরুতেই সাবধান করে দিয়েছিলেন "এ তোমার মফস্বলের আদালত নয় যে অর্ডিনারি মক্কেলের সঙ্গে ব্যারিস্টারের দহরম-মহরম থাকবে। এখানে মক্কেল দু'রকম— সাধারণ অথবা 'লে' ক্লায়েন্ট এবং বিশেষজ্ঞ অথবা 'প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট।

কলকাতার স্পেশালিস্ট ডাক্তাররা একসময় রোগীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতেন না। তাঁদের কাছে যেতে হতো গৃহচিকিৎসক বা ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানের মাধ্যমে। বাড়ির ডাক্তারবাবুই একটি খামের মধ্যে রোগের বিস্তারিত বিবরণ লিখে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে, রোগীকে পাঠাতেন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে, যাঁর অপর নাম কনস্যালট্যান্ট। বিশেষজ্ঞ যদিও রোগীর হাত থেকে ফি নিতেন, তবু তাঁর বক্তব্য একটি পত্রে লিখে, খামে পুরে, গৃহচিকিৎসকের নামে পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন, "যা বলবার তা আপনার ডাক্তারবাবুই আপনাকে বলবেন।"

বার অফ ইংলন্ডের সভ্য, অর্থাৎ ব্যারিস্টাব বা বিদগ্ধ কাউন্সেল (বাংলায় কৌন্সিলি শব্দটার প্রতি লক্ষ্য রাখুন) বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মতো সাধারণ ক্লায়েন্টের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখতে উৎসাহী ছিলেন না। ব্যারিস্টারের কাছে আসতে হতো অ্যাটর্নিব মাধ্যমে। অ্যাটর্নি যদি সাধারণ মক্কেলকে কখনও ব্যারিস্টারের কাছে পাঠাতেন তাহলেও সঙ্গে একটি টাইপ করা কাগজ দিতেন, যাতে মামলার বিবরণ দেওয়া থাকতো এবং ব্যারিস্টারের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে তার ঈঙ্গিতও থাকতো। এই কাগজের পিছনে একটি নীলাভ মলাট থাকতো যার নাম 'ব্যাক শিট'। কাগজটির নাম 'ইন্সট্রাকশন্ ফর কাউন্সেল'। কাগজের একেবারে তলায় থাকতো প্রেরক অ্যাটর্নির নাম।

সায়েবের চেম্বারে কখনও-কখনও ক্লায়েন্ট তাঁর সমস্যা নিয়ে সরাসরি হাজির হতেন। প্রফেশনাল ক্লায়েন্টের মাধ্যমে আসেন নি বলেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় করা সম্ভব হতো না। তখন কোনো একজন পরিচিত অ্যাডভোকেট অথবা

অ্যাটর্নিকে ফোন করা হতো এবং তাঁকে প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট হিসেবে কাজ করবার অনুরোধ জানানো হতো। তাঁরা সানন্দে টেলিফোনেই অনুমতি দিতেন, কারণ প্রায়ই ক্লায়েন্টকে না-দেখেই তাঁরা এক অথবা দু মোহর ফি রোজগার করতেন। জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের নামাঙ্কিত ব্যাকশিট আমিই তৈরি করে নিতাম।

এই জি-এম অথবা গোল্ড মোহর এখনও অনেকের কাছে রহস্যময়, কিন্তু হাইকোর্টে এখনও মোহরের রাজত্ব। অমুক কাউন্সেলের ফি একশো মানে একশো টাকা নয়, একশো মোহর অর্থাৎ সতেরো শো' টাকা। মোহর কোনোদিনই নাকি সতেরো টাকা ছিল না— বাবুদের বেঞ্চির গোপন খবর, মোহরের আদি মূল্য ষোলো টাকা। প্রতি মোহরের সঙ্গে বাবুকে এক টাকা দিতে হতো। কোনো এক সময়ে দূরদর্শী ব্যারিস্টার তাঁর মক্কেলকে বললেন, "আমাকেই সতেরো টাকা দাও, বাবুকে আমিই সামলাবো। তার কিছুদিন পর দেখা গেলো বাবুর পাওনা সম্পর্কে সায়েব কোনো উচ্চবাচ্য করছেন না। ফলে বাবু আবার মক্কেলের কাছ থেকে মোহর পিছু এক টাকা আদায় করতে লাগলেন, অথচ মোহরের দাম সতেরো টাকাই রয়ে গেলো। এই গল্পের পিছনে কতখানি ঐতিহাসিক সত্য আছে তা আমি জানি না, কিন্তু বাবুমহলেই সবাই ব্যাপারটা 'নির্জলা সত্য' হিসেবে বংশ-পরম্পরায় শুনে আসছেন।

একবার এক প্রখ্যাত অ্যাটর্নি আমাদের সায়েবকে একটি অপ্রিয় ব্রীফ পাঠিয়েছিলেন। উপদেশ ও মতামতের (অ্যাডভাইস ও ওপিনিয়ন) জন্য। সায়েবের একজন অতি প্রিয় আইনজ্ঞ এই আক্রমণের মুখ্য লক্ষ্য ছিলেন।

ব্রীফটি পড়েই সেটি বন্ধ করে অ্যাটর্নিকে ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দিলেন সায়েব। কোনো প্রিয়জনের বিরুদ্ধে আইনগত মতামত দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এর পরেই সেই প্রখ্যাত অ্যাটর্নির সঙ্গে সায়েবের সম্পর্কের আরও অবনতি হলো, পুরনো কিছু ফিয়ের টাকা পেমেন্টের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে রইলেন।

অ্যাটর্নি অফিসে অনেকবার ধর্না দিয়েও কোনো কাজ হলো না (টাকা আদায়ের এই অপ্রিয় কাজটি ব্যারিস্টারের বাবুর)।

অবশেষে সায়েব বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বার-কাউন্সিলের কাছে তাঁর অভিযোগ দায়ের করলেন। কিন্তু আইনের কুটিল পাশাখেলায় ধুরন্ধর অ্যাটর্নির কাছে সায়েব পরাজিত হলেন। অ্যাটর্নি পাল্টা অভিযোগ করলেন, কাউন্সেল প্রচলিত নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে লে-ক্লায়েন্টের সঙ্গে দহরম-মহরম করেছেন

এবং প্রফেশনাল ক্লায়েন্টকে বিশেষ অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছেন।

দেখা গেলো, মামলায় প্রথম দিকে লে-ক্লায়েন্টের সই করা একটি চেক অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি সময় সংক্ষেপের ধুয়ো তুলে আমাদের হাতে দিয়েছিলেন এবং আমরা সরল মনে সেটি সায়েবের ব্যাঙ্কে জমা করতে পাঠিয়েছি।

বার-কাউন্সিলের বিচার সায়েবের বিরুদ্ধে গেলো। তাঁরা জানালেন, সাধারণ ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সরাসরি অর্থ গ্রহণ করে ব্যারিস্টার হিসেবে সায়েবই নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন, সুতরাং পরবর্তী পেমেন্টের জন্য অ্যাটর্নির উপরে চাপ সৃষ্টির নৈতিক অধিকার তাঁর নেই।

আইনের সূক্ষ্ম প্যাঁচে ব্যারিস্টারকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে সেই অ্যাটর্নি বিশেষ আনন্দবোধ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর সেই উল্লাস আমার কাছে চেপে রাখেন নি।

আমার নবীর প্রিয়জনদের আদি প্রশ্নটি ছিল, মোট কত টাকা রোজগার করতাম?

তার পুরো উত্তর দেওয়া হয় নি। নিশ্চিতভাবে মাসিক আশি টাকা, বাকিটা অনিশ্চিত। সেই সময় বাড়তি রোজগারের সম্ভাবনা ক্রমশই অনিশ্চিত হয়ে উঠছে, কারণ সায়েবের পসার পড়তির দিকে। এবং যাঁরা আইনের সমস্যা নিয়ে আসতেন তাঁদের অনেকেই ক্লার্কেজ দেবার ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহী ছিলেন না। আমার পক্ষেও তাঁদের কাছ থেকে তহুরির তাগাদা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

দু'একজন ফিয়ের টাকাটা দিয়ে বলতেন, আপনার প্রাপ্যটা দুয়েকদিন পরে এসে দিয়ে যাবো। তারপর দু'তিন মাস কেটে যেতো তাঁদের আর দেখা মিলতো না।

এই প্রতিশ্রুতি যাঁরা দিতেন, তাঁদের মধ্যে এক জন ফাঁসির আসামী ছিলেন। সেই ফাঁসি আটকানো গেলো না। সবচেয়ে আশ্চর্য. বেশ কিছুদিন পরে এই আসামীর আত্মীয় আমাকে তহুরির টাকা শোধ করবার জন্য এসেছিলেন। প্রচুর ক্ষমা চেয়ে বলেছিলেন, দেরি হয়ে গিয়েছে, আমি যেন কিছু মনে না করি। বলা বাহুল্য, ওই তহুরির টাকা গ্রহণ করবার মতো শক্ত নার্ভ ঈশ্বর সেই চরম অভাবের দিনেও আমাকে দেন নি।

ঐ আশি টাকা এবং সেই সঙ্গে সকালবেলার প্রাইভেট টিউশানি থেকে কুড়ি টাকা— মোট একশো টাকা থেকে বাড়িভাড়া এবং ভাইবোনদের বিরাট সংসারের সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হতো। সকালবেলায় এমনভাবে খেয়ে আসতাম যেন দুপুরে টিফিনের প্রয়োজন না হয়। সায়েব তা লক্ষ্য করেই বোধ হয়,

হোটেল থেকে সঙ্গে করে আনা তাঁর কোল্ড লাঞ্চের সবটুকু খেতে চাইতেন না। নানা অজুহাত তুলে প্রায়ই বলতেন, "আজ আমার খিদে নেই, সবটুকু খেতে পারছি না— শংকর, তোমাকে সাহায্য করতে হবে, যাতে কোনো জিনিস নষ্ট না হয়!"

সামান্য রোজগার, কিন্তু আমার মা ছিলেন মূর্তিময়ী লক্ষ্মী! যখন যত সামান্য রোজগার করে থাকি না কেন মাসের শেষে মায়ের হাতে এক টাকা-দু'টাকা উদ্বৃত্ত থাকতোই। কোন ঐশ্বরিক শক্তিতে তিনি লক্ষ্মীর ঝাঁপিকে নিঃশেষ হতে দিতেন না তা আজও আমার কাছে রহস্যময় হয়ে আছে, কখনও মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে সাহস করি নি। বিজয়া দশমীর এই শেষ বেলায় মা কাছে থাকলে সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম, কেমন করে তিনি লক্ষ্মীর কৃপাধন্য হয়েছিলেন? স্বল্পের মধ্যে প্রাচুর্যের উপলব্ধি আনার নীরব সাধনায় যে-সব মায়েরা আমাদের সংসারে সদা ব্যস্ত তাঁরা আমাদের প্রণম্য।

প্রাচুর্যের মধ্যেও অভাব কীরকম দুর্বিষহ হয়ে ওঠে তার প্রমাণও কিছুদিনের মধ্যে সায়েবের সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম। ইতিমধ্যে তিনি আমার মনোহরণ করেছেন। তাঁর স্নেহপ্রশ্রয়ে নতুন এক পৃথিবীর বিস্ময় আমার কাছে ধরা দিয়েছে। হাওড়ার অন্ধকার কানা গলি থেকে প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে পড়ে আমি এক অবিশ্বাস্য স্বপ্নময় জগতে প্রবেশ করি। বিস্ময়ভরা সেই পৃথিবীর কোনো খবরই এতোদিন আমার জানা ছিল না। আমি অকস্মাৎ কোনোরকম প্রচেষ্টা ছাড়াই কলম্বাসের মতো নতুন এক বিশ্বভুবনকে আবিষ্কার করেছি।

আমি দারিদ্র্যের নিপীড়নে পড়াশোনা ত্যাগ করেছি। আমার ছোটবেলার সমস্ত স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে, আমার পরিচিতজনেরা সভয়ে আমার থেকে দূরে সরে গিয়েছেন, আমার পিঠে বিরাট এক সংসারের দুঃসহ বোঝা— তবু আমার কোনো দুঃখ নেই। নতুন এক মহাতীর্থে আমি মানুষকে নবরূপে আবিষ্কারের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছি। হাওড়া কাসুন্দিয়ার অপরিণতবুদ্ধি বালক বিদেশী পরশপাথরের সান্নিধ্যে রাশি রাশি স্বর্ণসম্পদের অধিকারী হয়ে উঠেছে।

পড়াশোনায় কোনোদিন আমি প্রচণ্ড মেধাবী ছিলাম না। কিন্তু পরীক্ষাবন্ধনের বাইরে পড়ে গিয়ে সায়েবের সান্নিধ্যে আমি অধ্যয়নকে ভালবাসতে শিখলাম। এই প্রথম আমার ইংরিজি কবিতা পাঠের আগ্রহ জন্মালো। আমি সবিস্ময়ে আবিষ্কার করলাম, কবিতার স্নিগ্ধ আলোকে আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনও কিছুটা আলোকিত হয়ে উঠেছে। আমি অনুভব করতে শুরু করেছি, আমার নবজন্ম হতে চলেছে। দারিদ্র্যের পীড়নে, ভাগ্যের নিষ্ঠুরতায় নতুন এই

বিশ্বভুবনের সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটলে এই মানবজীবন অসম্পূর্ণ থেকে যেতো।

এই অনির্বচনীয় আনন্দের মধ্যে ছন্দপতন ঘটাতো কেবল অর্থ। আমার অর্থাভাব নয়—আমি যাঁর কাছে কাজ করি তাঁর আর্থিক অনিশ্চয়তা।

সায়েবের শরীর সুস্থ নয় এমন একটি গুজব আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আইনপাড়ার চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁর শ্রবণশক্তির গোলমাল ক্রমশই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার ওপর দুটি বড় আঘাত। রানীক্ষেত ক্লাব নিয়ে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য। এবং সদ্যস্বাধীন দেশের জাতীয় রেলপথের কর্ণধার ইংরেজ ব্যারিস্টারকে ব্রীফ পাঠানো বন্ধ করলেন। কিন্তু এ-নিয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিল না। রেলপথের ব্রীফ যাতে আবার পাওয়া যায় তার জন্যে কোনো চেষ্টাও ছিল না। ইংরেজের সন্তান বার অফ ইংলন্ডের নিয়মকানুন সম্বন্ধে বড়ই সচেতন— কোনো ব্যারিস্টার নিজেকে বিজ্ঞাপিত করবেন না। ব্রীফের জন্যে মানুষের পিছনে ছোটার মধ্যে যে হীনমন্যতা আছে তা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় বয়োবৃদ্ধ সৌম্যদর্শন এই বিদেশী।

একদা প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছেন সায়েব। মামলা-মোকদ্দমায় তখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ছিল না। কিন্তু অর্থ ও প্রতিভার গৃহিণীপনার জন্য যাঁরা খ্যাতনামা তাঁদের দলে নাম লেখাতে সায়েব কখনই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন নি।

অর্থ সম্পর্কে এক বিচিত্র ছেলেমানুষি সায়েবের যৌবনকাল থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল বলে শুনেছি। সায়েবের পিতৃদেব ছিলেন ইংলন্ডের শিক্ষাবিভাগের সাধারণ সরকারী কর্মচারী। ছেলেকে কেমব্রিজে পাঠিয়ে বিদ্বান করে তোলার আর্থিক সামর্থ তাঁর অবশ্যই ছিল না। কিন্তু তাঁর দূরসম্পর্কের এক কাকা ধনবান ছিলেন। শোনা যায়, এই কাকার স্নেহপ্রশ্রয় ছিল ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি এবং তিনিই হাতখরচ হিসেবে প্রভূত অর্থ তরুণ যুবকটির হাতে দিয়ে অর্থ সম্পর্কে তাঁর মনোবৃত্তি পাল্টে দেন। ছাত্রাবস্থাতেই অনেক অর্থ নিজের খুশিমতো ব্যয় করার স্বাধীনতা সায়েবের ছিল এবং অনেকেই আশা করেছিল যে কাকার বিপুল সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর হাতেই আসবে।

সেই ধরনের একটা উইলও লেখা হয়ে গিয়েছিল। শোনা যায় ধনপতি কাকা ছিলেন অত্যন্ত সময়নিষ্ঠ, লেটলতিফদের তিনি অপছন্দ করতেন। তখনকার দিনে সায়েবের স্বভাব ছিল নাকি অন্যরকম— প্রায়ই নির্ধারিত সময়ের অনেক পরে কাকার সাথে দেখা করতে যেতেন। বার বার লেট করায় কাকা একবার এতোই বিরক্ত হলেন যে তিনি উইল পরিবর্তন করে সমস্ত টাকা কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিকে দান করে গেলেন। সেই বিপুল অর্থ থেকেই নাকি

রাদারফোর্ড ইত্যাদি পদার্থবিদদের গবেষণাকার্য কিছুটা সুগম হয় এবং ক্যাভেণ্ডিশ গবেষণাগারে এঁদের সাধনায় একদা পরমাণুযুগের সূচনাকে সুগম করলো। সায়েব শেষ বয়সেও রসিকতা করতেন, আমি যদি কাকার বিরক্তির কারণ না হতাম তা হলে হয়তো এই পৃথিবী পরমাণু যুদ্ধের অত্যাচার থেকে অব্যাহতি পেতো।

মাসের শেষে আমার লক্ষ্মীস্বরূপা জননী যে কয়েকটি টাকা বাঁচিয়ে রাখতেন তা কয়েকবার আমার কাজে লেগে গিয়েছিল। যেখানে কাজ করি মাসের শেষে সেখানে কাঁচা টাকার এমনই অভাব যে সায়েবের ট্যাক্সিভাড়া দেওয়ার সঙ্গতি থাকে না। বাধ্য হয়ে আমি টাকা দিয়েছি, সায়েবের পক্ষে তো আর বাসে-ট্রামে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার দেওয়া টাকা অবশ্য প্রতিবারেই ফিরে আসতো কর্মচারীদের কাছে ঋণী থাকবেন এটা সায়েব সহ্য করতে পারতেন না।

আর একটি অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা ছিল। সেটা হলো বাড়িওয়ালার মাসিক ভাড়া। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ এক পাণ্ডেজী টেম্পল চেম্বার্সের ঘরে-ঘরে বিল জমা দিয়ে ভাড়া আদায় করতেন প্রতি মাসে। চমৎকার মানুষ, মুখে হাসিটি লেগেই আছে, লিফটের কাছে দেখা হলেই নমস্কার বিনিময় হতো। কিন্তু পাণ্ডেজীকে চেম্বারে দেখলেই আমার বুকের মধ্যে অস্বস্তি শুরু হতো।

প্রতি মাসেই এই দারোয়ানজী একখানা ভাড়ার বিল আমার হাতে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যেতেন। চুপিচুপি জিজ্ঞেস করতেন, "হালচাল কেমন?" সায়েব সম্পর্কেও এই মানুষটির যথেষ্ট ভালবাসা ছিল সম্ভব হলে তাঁকে অর্থের তাগাদা দিতে চাইতেন না। এই না-দেওয়া বিলগুলো একটা আলাদা ফাইলে রাখা হতো এবং সেখানে অনেকগুলো কাগজ জমা হয়ে গিয়েছিল।

আমার মনে আছে, এক-আধবার দারোয়ানজী বলতেন, "সায়েবকে জানাও, আমি এসেছি।"

সুইং ডোর ঠেলে পার্টিশনের অপরদিকে গিয়ে দারোয়ানজীর নির্দেশ পালন করতে খুবই কষ্ট হতো, কিন্তু উপায় নেই।

সায়েব কী একটা লিখছিলেন। মুখ তুলে দারোয়ানজীর আগমনবার্তা শুনলেন। তারপর বললেন, "নিয়ে এসো।" সায়েব এবার দারোয়ানজীর মুখের দিকে তাকালেন এবং এমনভাবে বললেন, "পরে এসো", যে আমার মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো।

দারোয়ানজী বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে ফিসফিস করে বললেন, "আমি তো ওঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই নি, আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে এসেছিলাম।"

আমি বললাম, "ওই ওঁর স্বভাব। যিনি পয়সা পাবেন তাঁকে এড়িয়ে চলতে উনি ভালবাসেন না।"

দারোয়ানজী যে ওঁকে কতটা ভালবাসতেন তার প্রমাণ যথাসময়ে পেয়েছিলাম। একদিন তিনি একখানা চিঠি নিয়ে এলেন। চিঠিতে একটু কর্কশ ভাষায় দশ মাসের বকেয়া ভাড়া সত্বর পেমেন্টের নোটিস দেওয়া হয়েছে।

দারোয়ানজী আমাকে চিঠিটা পড়ালেন। বললেন, "চিঠিটা সায়েবকে দেখাবেন না, কোনোরকমে আমাকে এক মাসের ভাড়া দিয়ে দিন, আমি চিঠিটা ফেরত নিয়ে যাচ্ছি।"

আমার কাছে দু' পাঁচ টাকা থাকে, কিন্তু এক মাসের অফিস ভাড়া কোথায় পাবো? দারোয়ানজী বললেন, "আপনি চেষ্টা করে দেখুন, আমি চারদিন পরে আসবো।"

এই চারটে দিন যে কী ভাবে কেটেছিল তা আজও আমার মনে আছে। তৃতীয় দিনের মাথায় ভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে সুপ্রসন্ন হলো, কোথা থেকে দু'হাজার টাকার একটা চেক এসে গেলো। এবং সেই চেক থেকে এক মাসের জায়গায় তিন মাসের বাড়িভাড়া সায়েব নিজেই দিয়ে দিলেন। দারোয়ানজীও খুশি হলেন। বললেন, "খুব ভাল হলো। না-হলে এরা মামলা করে দিতো। মানুষটা কীরকম তা আমার মালিক বুঝবেন কী করে?"

মাসের গোড়ায় সায়েবের মস্ত দায়িত্ব ছিল কর্মচারীদের মাইনে এবং ক্লাবের বিল। এই বিল এক মাসও ফেলে রাখা চলবে না। প্রতি মাসের শেষেই আমার দুশ্চিন্তা শুরু হতো— এবার কী হবে? কিন্তু এমনই ভাগ্যের খেলা শেষ পর্যন্ত কিছু-না-কিছু ঘটে যেতো। আমরা মাইনেও পেতাম এবং ক্লাবের চেকও জমা পড়ে যেতো। এক-আধবার বাড়তি কিছু থেকে যেতো এবং তখনই সায়েবের প্রকৃত রূপ আমরা দেখতে পেতাম। ঠাণ্ডা লেগে আমার চোখ লাল হয়েছিল। প্রায় জোর করেই তিনি আমাকে এক সায়েব-ডাক্তারের চেম্বারে পাঠালেন। অনেক টাকা ফি, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। বললেন, "চোখের চেয়ে মূল্যবান অ্যাসেট কিছু নেই, মাই ডিয়ার বয়!"

সমস্ত কর্মীর দলবল নিয়ে তিনি যেতেন আর এক বিখ্যাত ডাক্তারের চেম্বারে কলেরা-টাইফয়েডের ইঞ্জেকশন-এর জন্য। প্রতিটি রোগীর জন্যে এই বিখ্যাত বিদেশী ডাক্তার আলাদা আলাদা ফি নিতেন। কিন্তু সায়েব মোটেই পিছপা হতেন না। বলতেন, "এই সর্বনাশা রোগকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যে কোনো খরচই বাড়তি নয়।"

মাঝে-মাঝে সায়েব আমাকে নিয়ে বেরোতেন। বেড়া'না মানেই ফারপোতে গিয়ে চা-পান। ফারপোর খাদ্যবিলাস আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। খেতে খুব ভাল, তবু মুখে কেক পুরতে কষ্ট হচ্ছে। চেম্বারে দারোয়ানজীর পাওনা বিলগুলো আমি মানসচক্ষে, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেকথা কী করে সায়েবকে বলবো? তাঁকে পয়সা সম্বন্ধে উপদেশ দেবার শক্তি আমার ছিল না।

মাসিক অর্থচিন্তার এক পর্বে আসতো বৃহত্তর আর্থিক দুশ্চিন্তা। অনাদায়ী ইনকাম ট্যাক্সের জন্যে আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিস থেকে বেলিফ আসতো। একটি আশ্চর্য জীবিকা এই পদাধিকারীর— লোকের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি টেনে-হিঁচড়ে বের করে এনে অনাদায়ী টাকা আদায় করাই ছিল তাঁর অপ্রিয় দায়িত্ব। একবার এঁরা ঠেলাগাড়ি সঙ্গে করে এসেছিলেন, চেম্বার থেকে সায়েবের বইপত্তর চেয়ার টেবিল তুলে নিয়ে যাবেন।

এমন খারাপ পরিস্থিতিতে জীবনে পড়ি নি। কী করবো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। সায়েব ভিতরে বসে রয়েছেন, তাঁর হাতে একটি হলদে রঙের নোটিস ভিডিয়ে দিয়েছে আলিপুরের সার্টিফিকেট অফিসারের বেলিফ।

ঠিক সেই সময় দারোয়ানজী আমার ঘরে উঁকি মারলেন। পরিস্থিতি যে গুরুতর তা বুঝতে তাঁর এক মিনিট লাগলো। তখন তিনি আমাকে বাইরে ডাকলেন, জানতে চাইলেন কী হয়েছে? ব্যাপারটা শুনে, আমাকে দারোয়ানজী পরামর্শ দিলেন, সায়েবকে কষ্ট দিবেন না। বেলিফের হাতে দশ টাকা দিয়ে এখনকার মতো বিদায় করুন।

সরকারী দূতকে কী ভাবে আমি অর্থের প্রস্তাব দেবো? এ-বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। দারিদ্র্য কাকে বলে আমি জানি, কিন্তু সার্টিফিকেট অফিসার নামক আরও ভয়ঙ্কর শক্তির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। দারোয়ানজী বোধহয় আমার অবস্থা বুঝলেন। ফিসফিস করে জানতে চাইলেন আমার কাছে দশ টাকা আছে কিনা। পেটি ক্যাশে দশ টাকা ছিল আমার কাছে। আমি সেই দশ টাকা দারোয়ানজীর হাতে তুলে দিলাম।

দারোয়ানজী এবার বেলিফকে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মিনিট দশেক পরে বেলিফ কোনো মালপত্র ক্রোক না করেই নিঃশব্দে বিদায় নিলেন।

দারোয়ানজী আমাকে চুপিচুপি বললেন, "ভাববেন না। এক মাসের মধ্যে লোকটা এদিকে পা বাড়াবে না।"

যেন কিছুই হয়'নি এমন ভাব করে দারোয়ানজী বললেন, "এবার উঠি। আজ কিছু বাকি ভাড়া আদায় করতেই হবে।"

এরপরই দীর্ঘ পূজাবকাশে কোর্ট কাছারি বন্ধ। সায়েব নিজেও যাচ্ছিলেন কুমায়ুন পাহাড়ে রানীক্ষেতে যেখানে মেমসায়েব তখন একাকিনী বসবাস করেন। সেবার মেমসায়েবের কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সার্টিফিকেট অফিসারের পাওনা মেটানো হয়েছিল। মেমসায়েবের হাতে তখন কিছু পারিবারিক অর্থ ছিল—এই টাকা তিনি পেয়েছিলেন এক পিসির কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে। তবে সে-টাকার প্রায় সবটাই সায়েবের সরকারী দেনা মেটানোর প্রয়োজনে ব্যয় হয়েছিল।

প্রচণ্ড এই আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও কিন্তু আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম যা আমাকে আজও অভিভূত করে। আইন ব্যবসায়ীর কিছু রোজগার চেক ছাড়াও ক্যাশে হয়। কিন্তু নিজের রোজগারের পাই-পয়সার হিসেব তিনি তাঁর বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের রিটার্নে দাখিল করতেন। একবার কে যেন বলেছিল, এতোই যখন টাকার টানাটানি তখন রিটার্নটা বুঝেসুঝে দেওয়া হোক।

সায়েব ভীষণ রেগে উঠেছিলেন। বলেছিলেন, "জীবনে কখনও এমন প্রস্তাব আমার কাছে তুলো না। আমি এদেশের অতিথি। এই দেশ আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে, এখানে আমি নীতিবিগর্হিত কাজ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।"

শরীর ভেঙে আসছে, ঋণের বোঝা বাড়ছে, মামলার সংখ্যাও কমছে। যা কাজকর্ম আসে তারও কিছুটা বিনামূল্যে সারতে হয়। এই অবস্থায় সায়েব ডুবে গ্রন্থরচনায়। 'ল অফ মাস্টার্স অ্যান্ড সার্ভেন্টস' গ্রন্থের পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ লেখা চলেছে চেম্বারে।

আইনের বই থেকে তেমন কিছু অর্থ আসে না। আমরা এই অদ্ভুত মানুষটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতাম। অজানা আশঙ্কায় এক-একদিন রাত্রে আমার ঘুম আসতো না। আমার নিজের অর্থাভাব আছে— কিন্তু আমার লক্ষ্মীস্বরূপা মায়ের আশীর্বাদে সেই বিরাট অভাবটুকুও ছোট্ট হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কী করে তিনি আমাদের সংসার ওইভাবে প্রতিপালন করেছিলেন তা আজও আমি ভেবে পাই না। মায়ের কাছে সায়েবের এইসব গল্প করি নি— কারণ অযথা তাঁর চিন্তা বাড়বে। এই বৃদ্ধ মানুষটির ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের এই পরিবারের ভাগ্যও তো সম্পূর্ণরূপে জড়িয়ে রয়েছে।

তবু নতুন এক অভিজ্ঞতার আলোতে আমি কিছুটা আত্মবিশ্বাস লাভ করেছি। এই চাকরি গেলে আইন পাড়ায় আর একটা আশি টাকার চাকরি সহজে যোগাড় করে নিতে পারবো এমন মনোবল এবং পারদর্শিতা আমি লাভ করেছি। নিজের

সম্বন্ধে অতটা ভাবি না, আমার সমস্ত চিন্তা তখন সায়েবকে নিয়ে।

আমার প্রথম গোপন চিন্তা তাঁর ক্যালকাটা ক্লাবের বিল নিয়ে। জায়গাটি সুন্দর এবং হোটেলের তুলনায় মাসিক খরচও কিছুটা কম।

ক্যালকাটা ক্লাবের একতলার সুইটে পৃথিবী নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন-নতুন ডিগ্রি তখন আমি প্রতিদিন সংগ্রহ করছি সাহেবের সান্নিধ্যে। এমন অনিশ্চিত আর্থিক পরিস্থিতি, তবু নাটকের নায়ক প্রসন্নমনে জগতের আনন্দ-সুধা পান করছেন। আমাকে পরিচিত করে দিচ্ছেন বিশ্বভুবনের নানা দুর্বোধ্য রহস্যের সঙ্গে।

আমি নতুনভাবে জগৎসংসারকে দেখতে শিখে উল্লসিত, কিন্তু এই সদানন্দ মানুষটির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা না করেও থাকতে পারি না।

সায়েব অবশ্য তখনও সুরসিক। তিনি বলতেন, "সত্তর বছর পেরিয়ে আমার এই বয়সে কেউ ভবিষ্যৎ চিন্তা করে না। এখন কেবল অতীত। ভবিষ্যৎকে কখনও বিশ্বাস করবে না, আমাদের কবি লংফেলো কতকাল আগে সাবধান করে দিয়েছেন!"

কিন্তু আমার চিন্তার অবসান হয় না। দুশ্চিন্তা আমার স্নায়ুতে মিশে রয়েছে। সায়েব রসিকতা করে বলতেন, "যারা বেশী ওয়ারি (দুশ্চিন্তা) করে তারাও এক ধরনের ওয়ারিয়র (যোদ্ধা)!"

আমরা ভাবতাম, এই সদাশিব মানুষটির সামাজিক সম্মান কীভাবে রক্ষা পাবে? দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার উচ্চ সমাজে তিনি সসম্মানে বসবাস করছেন, এইভাবেই বাকি দিনগুলো চলবে তো?

আমি স্বপ্ন দেখতাম, সায়েব অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছেন। ঘুম ভাঙলে, আমার শরীর ঘেমে উঠতো, কারণ এই মানুষটির তিনদিনের চিকিৎসার খরচ সংগ্রহের সাধ্য আমাদের নেই। কোথা থেকে অর্থ আসবে? কে চেম্বারের ভাড়া শোধ করবে? কে ক্লাবের বিল দেবে? কে কর্মীদের মাইনে যোগাবে? আর সবচেয়ে ভয়াবহ, আলিপুর সার্টিফিকেট অফিসারের ঐ দূতকে কে সামলাবে?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর খুঁজে পেতাম না। প্রথমদিকে ভয় বাড়তো। তারপর কেন জানি না ভগবানে বিশ্বাস বেড়ে গেলো। মনে হলো, যিনি এমন মানুষ, সমস্ত সংসারকে যিনি এমনভাবে ভালবাসতে পেরেছেন, জগৎসংসারে পিতা তাঁকে নিশ্চয় কোনো বড় অপমানের মধ্যে ফেলবেন না।

মনের মধ্যে এই বিশ্বাস রয়েছে, জগৎসংসারের মালিকের ওপর নির্ভর

করবার মতো মানসিকতাও সৃষ্টি হয়েছে, তবু জানতে ইচ্ছে করতো কেমনভাবে এই জটিল অঙ্কের সমাধান হবে? আমি নিজে শত অভাব সত্ত্বেও নিয়মিত লটারির টিকিট কাটতাম : ভাবতাম, একবার ডার্বি সুইপ পেলে সায়েবের অনেক দুঃখ ঘুচিয়ে দেবো।

কী আশ্চর্য এই মানবসংসারের গতিপ্রবাহ। যাঁকে নিয়ে অলক্ষ্যে আমার এতো চিন্তা, তাঁর জটিল সমস্যার শেষ পর্যন্ত কেমন সহজ সমাধান হলো। এমন সম্মানজনক সমাধান যা আমার কল্পনাতেও আসে নি কখনও।

তখনকার দিনের এক বিখ্যাত স্টীল কোম্পানির রেলওয়ে সংক্রান্ত একটি কেস করতে সায়েব মাদ্রাজে গেলেন। কোম্পানির খরচে সঙ্গে নিয়ে গেলেন প্রিয় ভৃত্য দেওয়ান সিংকে। এমন নিষ্ঠাবান সেবক, এমন সৎ ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ আমি কম দেখেছি। কোনো কিছুতেই যেন আসক্তি নেই। দিনরাত শুধু প্রভুর সেবা। কিসে তাঁর মঙ্গল হয় তার চেষ্টা।

রেলওয়ে রেটস ট্রাইবুনালে কয়েকদিন মামলা চলবে। আমরা সন্তুষ্ট। কারণ আগামী মাসে কোনো আর্থিক চিন্তা তাহলে থাকছে না।

এই বড় মামলা আমাদের অনেক নিশ্চিন্ত করে তুলেছে। দেওয়ান সিং নিজেও খুব খুশি। দেওয়ান বলেছে, "চেকগুলো এলে, কিছু ট্যাক্সের দেনা শোধ করে দেবেন, মিষ্টার শংকর। দেনার চিন্তা সায়েবকে বড় কষ্ট দেয়—আপনারা তো সায়েবকে হাসিখুশি দেখেন। আপনারা কেউ কাছাকাছি না থাকলে সায়েব এক এক-সময় গম্ভীর হয়ে কী সব ভাবেন।"

মামলা কয়েকদিন ভালভাবেই চলেছে মাদ্রাজে। আমাদের সুখের দিন বোধ হয় সমাগত। কারণ আরও একটা বড় মামলা আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

সেই সময় মাদ্রাজের আদালতে আর্গুমেন্ট করতে-করতে সায়েব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেকদিন আগে একবার তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়েছিল, তখন ডাক্তার তাঁকে অবসর নিতে বলেছিলেন। কিন্তু সায়েব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরাজিতের জীবন-যাপন করবার জন্য তাঁর জন্ম হয় নি।

আদালত থেকে স্টীল কোম্পানির প্রতিনিধিরা সায়েবকে লেডি উইলিংডন নার্সিং হোমে স্থানান্তরিত করেছিলেন। সে-খবর যখন কলকাতায় এলো তখন আমার দুশ্চিন্তার অবধি নেই। কতদিন সেখানে থাকতে হতে পারে? সেখানকার প্রতিদিনের খরচ কত? হে ঈশ্বর, কলকাতায় অসুখ হলে তবু ভাবনা-চিন্তার একটা সুযোগ আছে। প্রবাসে কী হবে?

আমাদের অযথা চিন্তার কোন প্রয়োজন হলো না। একদিন ভোরবেলায়

বিভূতিদার বাড়ির ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম চরম দুঃসংবাদ বহন করে আনলো— আগস্টের এক অন্ধকার রাত্রে আমাদের সকলকে ছেড়ে, এই বিশ্বভুবনের মায়া কাটিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কোথা থেকে টাকা আসবে? কী ভাবে বিল মেটানো হবে, নার্সিং হোমের খরচ কত হবে— এইসব ক্ষুদ্র চিন্তা থেকে আমাদের চিরদিনের মতো মুক্তি দিয়ে তিনি প্রসন্নচিত্তে অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন।

একটি নমস্কারে

দিন যায়। সায়েবের সান্নিধ্যে অল্পদিনের মধ্যে আমি এতো দেখেছি এতো জেনেছি যা সাধারণ কর্মক্ষেত্রে যুগ-যুগ ধরে জড়িত থেকেও অনেকে জানবার সুযোগ পায় না।

কোনোরকম অভিজ্ঞতা না নিয়েই আমি বিচিত্র এই আদালতী ক্ষেত্রে এসেছিলাম কিন্তু আজ আমি আর অনভিজ্ঞ নই। মানুষকে আমি নব-রূপে আবিষ্কার করেছি।

এবার মনে হচ্ছে সেই অপ্রিয় ঘটনার কথা। যা এতোদিন অপ্রকাশিত আছে, যা অপ্রকাশিত থাকবে চিরকাল এই স্থির করেছিলাম। কিন্তু তিন দশকের এবং সময়ের শিক্ষা এতোদিন আমার দৃষ্টিকে পরিবর্তিত করেছে। সমস্ত শক্তি এবং দুর্বলতা নিয়েই বারওয়েল সায়েব আজও আমার হৃদয়-সিংহাসনে আলোকিত করে রয়েছেন।

আমার মনে পড়ছে, মৃত্যুর কিছু আগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তীর কাছে লেখা তাঁর চিঠির কথা, যেখানে তিনি তাঁর "ছন্নছাড়া" ভবঘুরে জীবনের কথা সকৌতুকে উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু শুধুই কি কৌতুক? না তার থেকে বেশি কোনো ঈঙ্গিত ছিল সেই চিঠিতে, সময়ের এই দীর্ঘ ব্যবধানে আমার পক্ষে সবটুকু আন্দাজ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি জন্মান্তরে বিশ্বাস করি, একদিন যে সায়েবের সঙ্গে আবার দেখা হবে সে -সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। এই জন্মের স্মৃতির একটি বিন্দুও যদি পরজন্মে নিয়ে যাবার সুযোগ থাকে, তা হলে আমার পরম প্রিয়, আমার দুঃখদিনের মধুসূদনকাকা বেশ বিপদে পড়ে যাবেন। অভিমানভরা কণ্ঠে একবার

আমি সায়েবকে মনে করিয়ে দিতে বাধ্য হবো তিনি সত্যকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত একবার তিনি আমাকে মিথ্যে বলেছিলেন।

সেই প্রসঙ্গেই আসা যাক। সেই ছোটবেলা থেকে বারওয়েল সায়েবের জীবনকথা আমার জানা হয়ে গিয়েছে। সায়েবের বাবা ছিলেন শিক্ষা বিভাগের সামান্য কর্মী, মা ছিলেন পরম স্নেহময়ী। তাঁর হার্টের ব্যাধি ছিল এবং ইস্কুল-থেকে-ফেরা ছেলের হাসির গল্প শুনতে শুনতে নিজেকে সংযত করতে না পেরে তিনি অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। এই দুঃখজনক ঘটনা সায়েবের মানসিকতার উপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

সায়েব একবার রসিকতা করেছিলেন, "ছন্নছাড়া জীবনই বটে! হাসাতে গিয়ে মায়ের মৃত্যু ডেকে আনলাম। কোটিপতির উত্তরাধিকারী হতে গিয়ে কোনোক্রমে রক্ষা পেলাম। তারপর বেঁচে থাকার জন্যে এক স্থপতির সহকারী হলাম, সেই সঙ্গে পড়লাম ব্যারিস্টারি। কিন্তু ভাগ্য টানলো সাংবাদিকতার দিকে— সেই সময় টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় মিস্টার হরনিম্যান সাদরে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন গুরুত্বপূর্ণ পদে। কিন্তু ভাগ্য টানলো যুদ্ধক্ষেত্রে। সৈন্যবাহিনী থেকে হঠাৎ ইন্ডিয়ায়। তারপর ব্যারিস্টারি প্র্যাকটিস।"

ব্যারিস্টারিতে বিপুল আর্থিক সাফল্য কী কারণে অর্জিত হয় নি তা অবশ্যই আমাদের অজানা নয়। প্রতিমুহূর্তে সত্য কথা বলার মাদকতা থাকলে যাঁরা ব্রীফ পাঠান তাঁরা সবসময় নিরাপদ বোধ করেন না। যে-লোককে আত্তে আনা যায় না সংসারে কর্মক্ষেত্রে তাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা চলছে সারাক্ষণ।

আমার মনে আছে, একদিন সন্ধ্যায় স্নানের পর ক্যালকাটা ক্লাবের ঘরে বসে সায়েব দিশি কায়দায় কোনোক্রমে একটি লুঙি জড়িয়ে খালি গায়ে আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। হঠাৎ আমার নজরে পড়লো তাঁর গলার কাছে একটি দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন।

আগেও নিশ্চয় এই ক্ষতচিহ্ন দেখেছি, কিন্তু প্রশ্ন জাগে নি। আমি হঠাৎ বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম, "এটা কীসের দাগ?"

সায়েব প্রথমে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। আমার কথায় গুরুত্ব দিলেন না। তখন আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম ওই ক্ষতচিহ্নের কথা।

সায়েব মুহূর্তের জন্য ভাবলেন, তারপর আমাকে বললেন, "যুদ্ধে ব্যর্থতার!" কথাটা তিনি এমনভাবে বললেন যে আমি আন্দাজ করে নিলাম কোনো শত্রুসৈনিক তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। যুদ্ধে আহত বীর সৈনিকরাই মৃত্যু নিয়ে এইভাবে রসিকতা করতে পারে। সায়েবের বেঁচে

থাকাটাই কোনো অপরিচিত জার্মান সৈনিকের ব্যর্থতার নিদর্শন।

সেদিন আমাব কী দুর্মতি হয়েছিল কে জানে। অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর পেয়ে-পেয়ে ছোট ছোট ছেলেরা যেমন ক্রমশ আরও উত্তরের প্রত্যাশী হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি স্নেহের উষ্ণ প্রশ্রয়ে তাঁকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লোভী হয়ে উঠেছি।

কাজ তখন কম, সায়েবের ভীষণ অর্থাভাব। আমি মনে-মনে ভাবছি মিলিটারিতে তো মাইনে কম নয়। সায়েব লেফটেনান্ট কর্নেল হয়েছিলেন, মিলিটারি ক্রশে সম্মানিত হয়েছিলেন, সৈন্যবাহিনীতে থাকলে তিনি তো অবশ্যই জেনারেল হতে পারতেন। তাঁর এক সামরিক বন্ধু জেনারেল ফুলারের কথা প্রায়ই বলতেন সায়েব। এই জেনারেল ফুলার যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাংকের প্রবর্তন করে ঐতিহাসিক কীর্তি রেখে গিয়েছেন।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম, "আপনি কেন সৈন্যবাহিনীতে থেকে গেলেন না? আপনিও তো মস্ত জেনারেল হতে পারতেন?" মনের মধ্যে আমার প্রশ্ন, তা হলে জীবনসন্ধ্যায় এইভাবে ব্রীফের জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে থেকে তাঁকে কষ্ট পেতে হতো না।

সায়েব যেন শুনতেই পেলেন না। অন্য কী কথা তুলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি সেদিন যেন নাছোড়বান্দা। আমি বার বাব তাঁকে একই প্রশ্ন করে যাচ্ছি।

সায়েব অবশেষে বললেন, "ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর থেকে বাইরের এই কলকাতা আমার বেশি ভাল লেগে গেলো। মাঝে মাঝে ইনিংস ডিক্লেয়ার করার লোভ আমাকে চেপে বসে।"

আমি সরল মনে সেদিন তাঁকে বিশ্বাস করে নিয়েছি। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারির সুযোগ পেয়েই তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছেন, আমি ধরে নিয়েছি। সায়েবও আমাকে সেইরকম বোঝালেন।

মিলিটারি ছেড়ে আইনজীবনে ফিরে আসাটা সায়েবের পক্ষে স্বাভাবিক এই বিশ্বাস আমার অনেকদিন ছিল।

এই ঘটনার অনেকদিন পরে মেমসায়েবের সঙ্গে আমার পরিচয় নিবিড় হয়েছে। রানীক্ষেতের নির্বাসন থেকে নতুন করে কর্মজীবন শুরু করবার জন্য তিনি তখন আবার আমাদের শহরে ফিরে এসেছেন। সায়েব তখন পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

মেমসায়েব ও আমার প্রিয় বিষয় ছিল সায়েব সম্পর্কে আলোচনা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সায়েবের জীবনের কত তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে আমরা পরম বিস্ময়ে

আলোচনা করতাম। আমাদের স্মৃতির সঞ্চয় যেন কখনও শেষ হবার নয়, যেন আমরা যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এই অদ্ভুত মানুষটির কীর্তিকথা স্মরণ করেই কাটিয়ে দিতে পারবো।

এমনই পরিস্থিতিতে আমি একদিন সায়েবের গলায় আঘাতের চিহ্ন এবং মিলিটারি ছেড়ে হঠাৎ আইন জগতে চলে আসবার স্মৃতি-কাহিনী মেমসায়েবের কাছে পরম ভক্তিভরে সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলাম।

হিন্দু দর্শনের প্রতি মেমসায়েবের অশেষ শ্রদ্ধা। জন্মান্তরেও তাঁর গভীর বিশ্বাস। আমি সায়েবকে কতখানি ভালবাসি, তিনি আমার জীবনে কতখানি অংশ জুড়ে আছেন, কিছুই তাঁর অজানা নয়।

এবারও কেন্দ্র স্পেনসেস হোটেল। ওই হোটেলের ছাদের ওপর একটা কম দামী কাঠের ঘরে মেমসায়েব তখন বসবাস করেন। একটু আকাশ দেখবার জন্য আমরা তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে খোলা ছাদে এসে বসেছি। মাথার ওপর তারায়-তারায় ভরা বিশ্বপ্রকৃতি।

মেমসায়েব আমার সব কথা শুনলেন এবং কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন তারপর মনস্থির করে নিলেন। "তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে, শংকর। আমি জানি তোমার কাছে নোয়েল প্রায় দেবতার মতো। কিন্তু দেবতারাও ভ্রষ্ট হন বাধ্য হয়েই সে নিশ্চয় তোমাকে একবার মিথ্যে কথা বলেছে।" একটু থামলেন মেমসায়েব।

তারপর ভিজে গলায় তিনি বললেন, "ওই যে ব্যর্থতার ইঙ্গিত দিয়েছিল নোয়েল, ওটা জার্মান সৈন্যের ব্যর্থতা নয়— নোয়েলের নিজেরই ব্যর্থতা নোয়েল একবার সৈনিক অবস্থায় আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করেছিল। কলকাতার এই ফোর্ট উইলিয়ামেই সে তখন লেফটেনান্ট কর্নেল। ভারত-বার্মা-সিলোনের মেট্রোপলিটান বিশপ একদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গড়ের মাঠে এক অচৈতন্য সেনাপতিকে রক্তাক্ত অবস্থায় আবিষ্কার করেছিলেন। পাশে রিভলবার পড়ে আছে, গলার কাছে গুলি ছোঁড়া হয়েছে, কিন্তু প্রাণবায়ু তখনও রয়েছে। করুণহৃদয় বিশপ পরম স্নেহে মানুষটিকে হাসপাতালে পাঠালেন এবং হাসপাতাল থেকে মুক্তির পর অনেকদিন চৌরঙ্গী রোডের বিশপস্ হাউসে নিজের আশ্রয়ে রেখে দিলেন। আত্মহত্যার চেষ্টা করলে তখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কোর্টমার্শাল হতো। বিশপের বিশেষ প্রচেষ্টায় নোয়েলের বিচার ও শাস্তি হলো না, কিন্তু সৈন্যবাহিনী থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নেবার সুযোগ দেওয়া হলো তাঁকে। বিশপ তাঁকে নতুন জীবনযাত্রার পরামর্শ দিলেন কলকাতা

হাইকোর্টে যোগ দিয়ে।"

"কোনো এক দুরন্ত দুঃখ এই সদানন্দ মানুষকে নিশ্চয় আত্মঘাতী হবার পথে ঠেলে দিয়েছিল। দয়ালু বিশপ তাঁকে রক্ষা করলেন। নোয়েলের ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের আর এক পরিচ্ছদ শুরু হলো এই শহর কলকাতায়।"

মেমসায়েব কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে জানালেন, "এ গোপন কথা আমি বিশপের নিজের মুখেই শুনেছি। বিয়ের আগেই বিশপস হাউসে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বিশপ আমাকে বলেছিলেন, 'নোয়েলকে তুমি বিয়ে করো। এমন মানুষ পৃথিবীতে বিরল।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'আমার একটি অনুরোধ, তুমি কখনও নোয়েলকে জিজ্ঞেস করবে না কেন সে মিলিটারির চাকরি ছেড়ে দিলো এবং কেন সেদিন ভোরবেলায় ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বেরিয়ে গড়ের মাঠের নির্জনতায় আত্মঘাতী হবার চেষ্টা করেছিল।"

মেমসায়েব থামলেন। নিচু গলায় বললেন, "তোমার জানা উচিত, তাই তোমাকেই শুধু বললাম। তুমি কিন্তু মনে রেখো, এই এতো বছর ধরে নোয়েলকে আমি জানতে দিই নি ওর গলায় ক্ষতচিহ্নটি সম্পর্কে আমার কোনো কৌতূহল আছে। আমি কোনোদিন ওকে জিজ্ঞেস করি নি, সেদিন কি ঘটেছিল? নিজেকে শেষ করবার জন্য কেন সে অমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল?"

স্পেনসেস হোটেলের ছাদ থেকে সুদূর আকাশের তারার দিকে তাকালেন মেমসায়েব। তারপর জলভরা চোখে বললেন, "নিজের লজ্জা ঢাকবার জন্যে একদিন একটা মিথ্যা কথা বলবার জন্যে ওকে তুমি ক্ষমা ক'রো। নোয়েল তোমাকে সত্যিই ভালবাসতো। বিশ্বসংসারে কারও বিরুদ্ধে তার কোনো ক্ষোভ ছিল না।"

কাকলির দাদু

দাদু, অর্থাৎ মায়ের বাবা, কলকাতায় আসছেন। আগাম খবরটা পেয়ে কাকলির বুকের ভিতরটা কীরকম সুড়সুড় করছে। বাঁদিকে বুকের কাছে কেউ পাখির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে—এইরকম মনে হলেই বুঝতে হবে আনন্দ হচ্ছে, এ-কথা বাড়ির চাকর অভয়দার কাছে কাকলি শুনেছে।

"আঃ! কী আরাম! কী আনন্দ!" কাকলি খুশিতে চোখ বুজে ফেলে।

ছোট্ট মেয়ে কাকলির অনেক কিছু জানবার আগ্রহ। কাকলির নানা প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত হয়ে বাড়ির ঝি মোক্ষদা বলেছিল, "কী অকালপক্ক মেয়ে গা! তোর মা এখনও অত কচি-কচি রয়েছে, তুই এমন হলি কেন গা?"

কী শক্ত কথা—অকালপক্ক! কাকলি মানে জিজ্ঞেস করলে মোক্ষদা মাসি বলেছিল, "অকালপক্ক মানে অকালপক্ক—আষাঢ় মাসে যে-আম পাকবার কথা, সেই-আম বোশেখ মাসের গোড়ায় পেকে বসে আছে।"

মোক্ষদা মাসি বড় চিৎকার করে—ওকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। কাকলির খুব জানতে ইচ্ছে করে, দুঃখু কাকে বলে। এই এখন যেমন আনন্দ হয়েছে বলে, কে যেন বুকের ভিতর পাখির পালক বুলিয়ে দিচ্ছে—দুঃখ হলে কী হবে?

কাকলি তখন আরও ছোট। কাকলির মনে আছে, দুপুরবেলায় মামার একটা ছবির দিকে মা তাকিয়ে ছিল। মাব অমন ডাগর-ডাগর কালো চোখ দিয়ে ছবির গড়াচ্ছিল, ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের শাড়ির আঁচল দিয়ে মা ঘন-ঘন চোখ মুছছিল। কাকলি প্রথমে ভেবেছিল, মায়ের সর্দি হয়েছে, তাই হাঁসফাঁস করছে, নাক মুছছে। সর্দি লাগবে না! যা-ঠাণ্ডার দেশ থেকে মায়ের নামে চিঠি আসে দাদুর কাছ থেকে। মাকে সাবধান করে দিতে যাচ্ছিল কাকলি, "সোয়েটার পরে এই সব চিঠি খুললে পারো—তা হলে ঠাণ্ডা লাগে না।" মা যখন কোনো উত্তর দিলো না, তখন কাকলি বুঝলো সর্দি-কাশি কিছু নয় মা কাঁদছে।

খিদে পেলে, রাগ হলে, পড়ে গেলে কাকলিও পা-ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। মাকে প্রশ্ন করে কাকলি জানতে পারলো, ওসবের কোনোটাই চোখ দিয়ে জল পড়ার কার নয়। মোক্ষদা মাসি ফিস-ফিস করে বললো, "তোর মায়ের দুঃখু হয়েছে।"

কাকুলির চোখ দুটো ঠিক ওর মায়ের মতন। সে-দুটো বড় বড় করে, মায়ের

খুব কাছে দাঁড়িয়ে কাকলি জিজ্ঞেস করেছিল, "দুঃখ হলে কী করে বুঝতে পারো, মা?" মোক্ষদা মাসি বলছিল, "বুকের মধ্যে ভগবান নাকি নংকা-বাটা গুঁজে দেয়।" মায়ের আঁচলটা সরিয়ে, বুকটায় হাত-বুলিয়ে দিতে যাচ্ছিল কাকলি। আদর করে চুমু খেয়ে কাকলিকে সরিয়ে দিয়ে মা বলেছিল, "কাকে সুখ বলে, কাকে দুঃখ বলে, সময় হলে সব জানতে পারবে, মা।"

সুখটা কাকে বলে, আজ এই মুহূর্তে বাবা ও মায়ের মুখ দেখেই বুঝতে পারছে কাকলি। দাদুর চিঠি এসেছে—দাদু আসছেন। মা বললো, "আমি তো ভেবেছিলাম, বাবা কিছুতেই রাজি হবেন না। তাই তোমার কথা আর কাকলির কথা বারবার লিখে দিয়েছিলাম।"

কাকলি আনন্দে ডগমগ হয়ে বললো, "জানো বাবা, তিনটে-পাঁচটা বানান ভুল হলেও, দাদুকে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম।"

বাবা এবার হেসে মাকে বললেন, "তুমি তে কতবার লিখেছো, কাজ হয়নি। এবার তা হলে কাকলির কথাতেই উনি আসছেন।"

কাকলির মা অদিতি প্রতিবাদ করলো না। কিন্তু হঠাৎ ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "এটা তো জুলাই মাস?"

সবাই তো জানে এটা জুলাই মাস—প্রত্যেক ক্যালেন্ডারে বড়-বড় করে লেখা আছে। কাকলি বুঝতে পারছ না এই সামান্য ব্যাপারে মার মুখটা অমন শুকিয়ে গেলো কেন? বাবাও যেন কেমন! মা ফ্যাল-ফ্যাল করে জুলাই মাসের দিকে তাকিয়ে আছে—তবু কিছু বলছে না মাকে।

কাকলির এখন সময় নেই। প্রায় দৌড়তে-দৌড়তে পাশের বাড়ির চারতলার ফ্ল্যাটে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চললো। বেল টিপতেই বন্ধুর দাদা নন্দন দরজা খুলে দিলো। রীতিমতো গম্ভীরভাবে কাকলি জিজ্ঞেস করলো, "আরতি আছে?"

আরতির দাদাও গম্ভীরভাবে বললো, "ভিতরে গিয়ে দ্যাখো—একটু আগেই তো ঘুম থেকে উঠলো। অনেকক্ষণ ভোঁসভোঁস করে ঘুমিয়েছে।"

আরতির কী মজা—ওর মামার বাড়ি কলকাতায় কালীঘাটে। কথায়-কথায় আরতি দাদুর কাছে চলে যায়। এমন কোনো সপ্তাহ যায় না, যখন না আরতির সঙ্গে দাদুর দেখা হয়। আজ কিন্তু আরতিকে তাক লাগিয়ে দেবে কাকলি।

নানা-রঙয়ের গ্রিল দিয়ে ঘেরা বারান্দার এক কোণে আট বছরের আরতি নিজের ঘরসংসার গোছাচ্ছিল। আরতির গলা শোনা যাচ্ছে; "তোদের নিয়ে আর পারি না। একদিন বাইরে গেছি, আর তোরা বাড়িতে লংকাকাণ্ড বাধিয়েছিস।"

"কাকে বকছিস?" কাকলি ঘাড় চুলকোতে-চুলকোতে বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে।

"ছোট মেয়েটাকে," গিন্নী-বান্নির মতো উত্তর দেয় আরতি। পুতুলটার মুখ রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে আরতি বললো, "তোমাদের জন্যে আমি কি 'চল্লিশ' ঘণ্টা ঘরে বন্দী হয়ে থাকবো? আমার কি সাধ-আহ্লাদ নেই?" এবার বন্ধুর দিকে মুখ ফিরিয়ে আরতি গম্ভীরভাবে বললো, "কালি-ঝুলি মেখে পেত্নীর মতো চেহারা করেছে—তোরা ভাববি এদের মা কিছু দেখে না।"

পাকা গিন্নীর মতো কাকলি বললো, "দিন-রাত বকলে ছেলেমেয়ে খারাপ হয়ে যায়। সেদিন বাপি মাকে আড়ালে বলছিল, আমি শুনে ফেলেছি। তুই রাগিস না—আমাকে একটু জল দে, আমি মেয়েটাকে চান করিয়ে দিচ্ছি।"

"ওরে বাবা, মরে গেলেও না—সাত সকালে ঠাণ্ডা জল ওর সহ্য হবে না।" আরতি শিউরে উঠলো।

মিষ্টি ডলপুতুলটাকে কোলে নিয়ে স্নান করাবার ইচ্ছে ছিল কাকলির। কিন্তু আরতির যেন কেমন। নিজের ছেলেমেয়েদের দিন-রাত বকুনি লাগাবে, মারবে ধরবে, কিন্তু অন্য কাউকে আদর করতে দেবে না।

"ঠাণ্ডা কোথায়?" কাকলি একটু রেগেই জিজ্ঞেস করে।

মেয়েটাকে কোলে নিয়ে শুকনো কাপড় দিয়ে খুব যত্নের সঙ্গে মুছতে-মুছতে আরতি বললো, "ওর যে আমার মতো টনসিল আছে। জন্ম থেকেই ভুগছে।"

এই মেয়ের নাম কাকলিই দিয়েছে—সোমা চ্যাটার্জি। বেশি বয়স না—এই তো কয়েক সপ্তাহ আগে দাদুর বাড়ি থেকে ফিরবার সময় আরতি ওকে নিয়ে এলো। পার্ক স্ট্রিটের প্যারাগন থেকে আরতির দাদু নিজে পছন্দ করে কিনে এনেছেন। খুব ছোট্ট মেয়ে—এখন মাত্র আট-ন' বছর বয়স হয়েছে।

লাল টুকটুকে মেয়ের কোঁকড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে আরতি ওকে কোলে তুলে নিলে। ওর মুখে চুমু খেয়ে আদর করলো, "দুষ্টু মেয়ে, কিন্তু মিষ্টি মেয়ে।"

অধৈর্য হয়ে ওঠে কাকলি! "অমনভাবে তাকাস না। নজর লেগে যাবে।"

নজর লাগলে যে শক্ত অসুখ হয় তা আরতির অজানা নয়। তাই সে প্রতিবাদ করলো, "যাঃ, মায়ের নজর লাগে না—সেদিন মাসিকে বলছিল দিদিমা।"

মেয়ে-পুতুলটার ওপর কাকলির একটা চাপা আকর্ষণ আছে। ওকে বুকের কাছে নিয়ে খুব আদর করতে ইচ্ছে করে। ভয় লাগে ওর নজর না-লেগে যায়—হাজার হোক সে তো পুতুলটার মা নয়। কথাটা ভুলবার জন্য কাকলি বলে "হ্যাঁ করে অমন দেখছিস কী?"

আরতি এবার জিজ্ঞাসা করে, "ওকে ঠিক আমার মতো দেখতে হয়েছে, তাই না?"

"নিশ্চয়ই হয়েছে—মেয়েরা তো হয় মা না-হয় বাবার মতো দেখতে হয়।"

কাকলিকে দাদু-দিদিমার নতুন গল্প শোনায় আরতি প্রত্যেকবার। দাদুর বাড়িতে গেলেই কত রকমের ঘটনা ঘটে, সেসব কাকলিকে না বলা পর্যন্ত আরতির ভাত হজম হয় না। মামার বাড়িতে গিয়ে আরতি দাদু এবং দিদিমার মধ্যিখানে শোয়। দিদিমা অনেকক্ষণ ধরে নাতনীর পিঠে সুড়সুড়ি দেয়, আর দাদু রাজপুত্তুর-রাজকন্যাদের গল্প বলেন। "জানিস কাকলি, একটা রানী না এমন দুষ্টু, মন্তর পড়ে নিজের সৎ ছেলেদের হাঁস করে দিয়েছিল; আর মেয়েকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল।"

"কী দুষ্টু, বলো তো।" কাকলি নিজেও খবরটা শুনে খুব রেগে গিয়েছিল রানীর ওপর। কাকলিকে কেউ গল্প বলবার নেই—মা অত গল্প জানে না, জানলেও বলবার ধৈর্য নেই। "হাঁস হয়ে গেলে খুব কষ্ট, তাই না?" অজানা রাজপুত্রদের জন্যে চিন্তা হচ্ছিল কাকলির।

"কষ্ট বলে কষ্ট!" আরতি উত্তর দেয়। "বলা নেই কওয়া নেই, তোকে-আমাকে যদি কেউ হাঁস করে দেয় কী অবস্থা বল তো? ইস্কুল যাওয়া বন্ধ, মাংসের হাড় চিবানো বন্ধ, দাদুর পাশে শোওয়া বন্ধ— দিনরাত শুধু জলে সাঁতার দাও আর প্যাঁক-প্যাঁক করো। ভাগ্যে আমাদের সৎমা নেই!"

কাকলি আর খবরটা চেপে রাখতে পারলো না। তার দাদুও যে এবার কলকাতায় আসছেন, সে-খবরটা বন্ধুকে জানিয়ে দিলো। দাদু আসেন না বলে বন্ধুর যে খুব দুঃখ ছিল তা আরতির অজানা নয়। তাই খুব খুশি হলো সে। কিন্তু কাকলির মাথার দিকে তাকিয়ে সে বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। খুব বকুনি লাগালো বন্ধুকে। "নেড়া হবার আর সময় পেলি না?"

"নেড়া হলে যে রাজকন্যের মতো চুল হয়, মা বলেছে।" কাকলির এই উত্তর শুনে মোটেই সন্তুষ্ট হলো না আরতি। তার চিন্তা, ওর দাদু যদি আরতির দাদুর মতো নাতনীকে বিয়ে করতে চায়। "নেড়ী অবস্থায় কী করে বিয়ে করবি?" মুখ ভেঙচায় আরতি।

অজানা ভয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কাকলি। অজান্তে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে নেয়। ব্যাপারটা সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরতি ফিসফিস করে বললো, "আমাকে বিয়ে করবার জন্য দাদু উঠেপড়ে লেগেছে। এখন থেকেই ছোটগিন্নী বলে ডাকে। আমি মুখের ওপর বলে

দিয়েছিলাম, ওইরকম জ্বালাতন করলে তোমাদের বাড়িতে আর আসবো না। ওইরকম বুড়োকে কেন বিয়ে করবো বল তো? মাথার চুল শাদা, অর্ধেক দাঁত নেই। দাদু এমন অসভ্য, বলে কিনা, তোমারও তো চার-পাঁচটা দাঁত পড়েছে।"

"তারপর?" জিজ্ঞেস করে কাকলি। এমন গোপন খবর সে আর আগে কখনো শোনেনি।

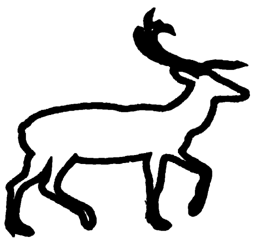
আরতি এখন যে দাদুর ওপর কিছুটা সদয় হয়েছে তা বোঝা যাচ্ছে। সে বললো, "অতো বললাম দাদুকে, তবু কিছু হলো না। প্রত্যেকবার আমাকে খেলনা এনে দেবে—জামা কিনে দেবে। এবার ক্যাডবেরি দিয়েছে দুখানা!"

হাতব্যাগ থেকে চকোলেটের প্যাকেট বের করলো আরতি। "তোর জন্যে আধখানা রেখেছি, খেয়ে দ্যাখ।"

চকোলেট মুখে পুরে ওরা দু'জনে চুষতে লাগলো। কাকলি পরামর্শ দিলো, "রোজ যদি চকোলেট দেয় তা হলে দাদুকে বিয়ে করা ভাল।"

প্রবল আপত্তি জানালো না আরতি। নিজের সমস্যা সমাধান করে সে এবার বললো, "তোর দাদু এতোদিন কোথায় ছিল?"

দাদুর কথা একটুও মনে পড়ে না কাকলির। বন্ধুর কাছে আজ সে বেশ লজ্জায় পড়ে যাচ্ছে। কাকলি শুনেছে, দাদু মস্ত লোক। গভরমেন্টের বিরাট চাকরি করেছেন দাদু। দেশ-বিদেশ কত জায়গায় ঘুরেছেন দাদু—ওয়াশিংটন, টোকিও, নিউ ইয়র্ক, লণ্ডন, প্যারি, হংকং, কায়রো। কত সব অদ্ভুত জায়গার নাম করে মামণি। দাদুর সব কথা মামণির কাছে জেনে নিতে হবে।



"ওমা! দাদুকে তুই দেখিসনি কী করে বললি?" মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদিতি আদর করলো।

দিল্লির হাসপাতালে কাকলি যখন হলো, তখন দাদুই তো প্রথম তার মুখ দেখেছিলেন। দাদুর গাড়ি চড়েই তো হাসপাতাল থেকে বাড়ি গিয়েছিল কাকলি। ছবির অ্যালবামে দাদুর কোলে-চড়ে একটা রঙিন ফটো আছে—সেটা তোলা হয়েছিল প্যারিতে।

"ওমা! আমি বুঝি প্যারিতে গিয়েছি!" অবাক হয়ে যায় কাকলি।

"নিশ্চয় গিয়েছিস; দাদুই তো আমাকে আর তোকে নিয়ে যাবার প্লেনভাড়া পাঠিয়েছিলেন। দাদু তখন ওখানেই চাকরি করতেন।"

কাকলি এবার একটু শান্ত হলো। অদিতির মনে পড়লে, প্যারিতে বাবার সঙ্গে আরও অনেক ছবি তোলার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু কাজ আর কাজে বাবা সব সময় ডুবে থাকতেন। যেদিন ওদের মোটরে প্যারি থেকে বেরিয়ে যাবার কথা সেদিনই দিল্লি থেকে কী এক গোপন খবর এলো।

বাবা বললেন, "দেশের অবস্থা ভাল নয়, যে কোনো মুহূর্তে শত্রুরা আমাদের দেশের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে।" বাবা, তখনই ছুটলেন, ফরাসি সরকারের কোন এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে গোপন আলোচনা করতে।

অদিতির ছুটি ফুরিয়ে আসছিল। বাবাও নানা কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন—বিদেশে ইন্ডিয়ার রাষ্ট্রদূতদের কী এতো কাজ থাকতে পারে ভগবান জানেন। কিন্তু সেসব গোপন ব্যাপার—বাবা কোনোদিন বাড়িতে ফিরে অফিসের গল্প বলেননি।

মা যখন বেঁচেছিলেন, তখন দু-একবার এ-বিষয়ে খোলাখুলি অভিযোগ করেছেন : "আমরা কিছু তোমাদের কথাবার্তা শত্রুদের কানে তুলে দিতে যাচ্ছি না।" বাবা নীরবে হেসেছেন, কোনো উত্তর দেননি।

"ভীষণ গম্ভীর এবং কড়া মানুষ তোমার দাদু।" অদিতি মনে করিয়ে দিলো কাকলিকে।

এ আবার কী কথা বলছে মা? দাদুরা কখনও কড়া হয় না। কাকলির মা বললো, "তুমি যেমন বাপির কোলে বসে যা-খুশি ইয়ারকি করছো, ফোন তুলে আপিসে বাপিকে হাজার রকম হুকুম করছো, এসব আমি এবং তোমার মাসি ছোট্টবেলায় কখনোই সাহস পেতাম না।" দুজন ছাড়াও আর একজনের কথা আচমকা মনে পড়ে গেলো অদিতির।

মায়ের মেঘলা মুখ দেখে কাকলিও বলতে পারে, মা এই মুহূর্তে মামুর কথা ভাবছে। কী একটা অদ্ভুত নাম ছিল মামুর। কেনিয়ামামুর কোলে তোলা কাকলির একটা রঙিন ছবি আছে! মায়ের বন্ধু খুকুমাসি ভেবেছিল ওর নাম কানাই।

মা বলেছিল, "ওর নাম মোটেই কানাই নয়—বাবা তখন কেনিয়াতে পোস্টেড। ওইখানেই ওর জন্ম—তাই সবাই ওকে কেনিয়া বলে ডাকতো।"

ছবির অ্যালবামে হাত দিয়ে কেনিয়া-মামুর রঙিন ফটোর সামনে এসে মা থমকে দাঁড়িয়েছে। মায়ের চোখে জল—কেনিয়া-মামুর সম্বন্ধে কথা উঠলেই মা

কেঁদে ফেলে। আরতিকে ব্যাপারটা বলেছিল কাকলি। আরতি বলেছিল, "দ্যাখ হয়তো তোর মামু পৃথিবী ছেড়ে আকাশে তারা হয়ে গিয়েছে। মরে গেলে মানুষ আকাশের তার হয়ে যায়, জানিস তো? দূর থেকে ওরা সব কিছু দ্যাখে, কিন্তু কিছুতেই কাছে আসতে পারে না।"

কেনিয়া-মামুকে বেশ মনে আছে কাকলির। সেবার এখানে এসে ক'দিন থেকে গেলো। কাকলিকে নিয়ে চিড়িয়াখানা, মড়া সোসাইটি, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল এইসব দেখিয়ে এনেছিল মামু। আর যাবার সময় ব্যাগ থেকে বের করেছিল—কালো কুচকুচে একটা ভালুক। কোথায় যে মামু ভালুকটাকে লুকিয়ে রেখেছিল, কাকলি বুঝতে পারেনি। জানতে পারলে, অনেক আগেই ওটাকে ব্যাগ থেকে সে বের করে নিতো।

আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছে কাকলি। সবগুলোকে একরকম মনে হয়—এর মধ্যে কোনটা যে কেনিয়া-মামু তা কাকলি বুঝতে পারে না। দাদু নিশ্চয় চিনবে। দাদু আসুক, ওকে বলতে হবে, দেখিয়ে দাও।

মা সাবধান করে দিয়েছিলেন, "সবার দাদু সমান নয়। তোমার দাদু আরতির দাদুর মতো নয়। বাবা ভীষণ গম্ভীর—আমারও কথা বলতে সাহস হয় না।"

কাকলি ওসব বিশ্বাস করে না। পাছে কাকলি দাদুকে জ্বালাতন করে আগ থেকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কাকলি কোনো কথা শুনবে না, দাদুকে খুব বকবে। জিজ্ঞেস করবে, আরতির দাদুর মতো প্রত্যেক শনিবারে নিজের মেয়েকে দেখে যেতে পারো না? তারপর কাকলি আরও অনেক কিছু হুকুম করবে—সেসব মা জানতেও পারবে না। কারণ রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে দাদুর বিছানায় শুয়ে গোপন কথাবার্তা হবে।

দাদুর সঙ্গে দিদিমা থাকলে বেশ মজা হতো—দাদু যখন গল্প করতো, তখন দিদিমা পিঠ চুলকে দিতো। দিদিমাও কবে আকাশের তারা হয়ে গিয়েছে—সেই কাকলি জন্মবার আগেই। দাদুটা যেন কেমন—দিদিমা নেই, মামা নেই, একা-একা আসবে।

কাকলি একমনে অ্যালবামে দাদুর ছবিগুলো দেখছে। মায়ের সঙ্গে, কেনিয়া-মামুর সঙ্গে, কানাডা-মাসির সঙ্গে, দিদুর সঙ্গে তোলা ছবি বেশি নেই। বেশির ভাগ ছবি অচেনা সব লোকের সঙ্গে। মা বলেছে, "এরা মোটেই অচেনা নয়, বড় হয়ে বুঝবে এরা সব মস্ত লোক। সবাই এদের এক ডাকে চেনে—জাপানের সম্রাট, হল্যান্ডের রানী, কানাডার প্রাইম মিনিস্টার আরও সব কত কী।"

কাকলি এই সব লোককে দেখে কোনো আগ্রহ পাচ্ছে না—যেসব লোককে

চিনি না তাদের সঙ্গে ছবি তুলিয়ে লাভ? মা বললো, "তোমার দাদু যে মস্ত কাজ করতেন।"

কাকলি অনিচ্ছার সঙ্গে সেই সব ছবি দেখছে—আর সেই ফাঁকে মা ভাবছেন, বাবার কর্মজীবন এবার শেষ হয়েছে। ফরেন সার্ভিসে দেশে-বিদেশে জীবনটা কাটিয়ে বাবা এবার কোথায় জীবনের বাকি ক'টা দিন কাটাবেন? বাবা ফিরে এসে দিল্লিতেই বাড়ি নিয়েছেন। নির্মল চৌধুরীর নাম দিল্লিতে সকলে একডাকে চেনে। এখানেও সবাই শুনেছে তাঁর নাম—নির্মল চৌধুরীর বড়মেয়ে বলেই তো সমাজে অদিতির পরিচয়।

একবার গুজব উঠেছিল, নির্মল চৌধুরী বাংলার লাটসায়েব হচ্ছেন। তখন তো কত লোক অদিতিকে ফোন করেছে। সেকালের সরকারি কর্মচারী নির্মল চৌধুরী—নিজের মেয়েকেও গোপন সরকারি প্রস্তাবের কথা লিখবেন না। কাকলির বাবা সেইসময় দিল্লি গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বললেন, কথাটা ঠিক। প্রাইম মিনিস্টার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু বাবা রাজি হলেন না। "এখন আর কিছু ভাল লাগ না," বাবা বলেছেন জামাইকে।

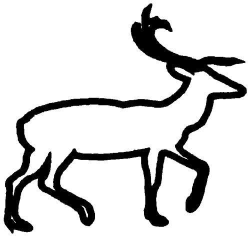
কাজ ভাল লাগে না, এমন যে বাবার কখনও হতে পারে, তা অদিতির স্বপ্নেরও অগোচর। খোকা সব গোলমাল করে দিলো। ট্রাঙ্ক কলে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে অদিতি ছুটে গিয়েছিল চণ্ডীগড়ে। তখন সব শেষ। যে লরি ড্রাইভারটা খোকনকে চাপা দিয়েছিল, সে ধরা পড়েছিল। নির্মল চৌধুরীর ছেলের স্কুটার চাপা দিয়ে তার মুক্তি নেই। কিন্তু সে বলেছিল, তার দোষ নয়, স্কুটারটা যেন ইচ্ছে করেই তার লরির সামনে এসে পড়েছিল। সেকথা কেউ বিশ্বাস করেনি। কড়া সাজা হয়ে গিয়েছিল ড্রাইভারের।

সেই থেকে কী যে হলো, বাবা চণ্ডীগড়ের কাজকর্ম ছেড়ে দিল্লিতে এসে বসলেন।

প্রতি বছর খোকার মৃত্যুদিনে ইংরিজি কাগজে বাবা একটা বিজ্ঞাপন দেন, আর দুই মেয়ের কাছে দু'খানা কেক পাঠান। সে এক যন্ত্রণা, চোখের জলে ভাসতে-ভাসতে কেক ভাগ করতে হয়। কেন যে বাবা এই কেক পাঠান, তা অদিতি জানে না, বাবাকে জিজ্ঞেস করতেও পারে না। বোধহয় খোকা কেক ভালবাসতো বলে। কিংবা, কাকলির মতোই বাবাও ভাবেন, খোকা ঐদিন আকাশের তারা হয়ে গেলো। ওর পুনর্জন্ম হলো।

ওইদিন মায়ের অবস্থা দেখে কাকলি ভয় পেয়ে যায়—জিজ্ঞেস করে, "মা কাঁদছো কেন? তোমার বাপি নিজে কেক নিয়ে আসেনি বলে?"

না, এখন এসব দুঃখের কথা অদিতি ভাববে না। মেয়েকে বললো, "তুমি এখন খেলা করোগে যাও!"



দাদু আসবে বলে সেই সকাল থেকে কাকলি উঠে পড়ে লেগেছে। দুদিন ধরে সার্ফের গুঁড়ো দিয়ে পুতুলদের জামাকাপড় নিজেই কেচেছে। ছেলেদের গয়ে পাউডার মাখিয়েছে, চুল আঁচড়ে দিয়েছে। দাদুকে একবার লিখেছিল কাকলি, "আমার চার ছেলে। খুবই অবাধ্য, পড়াশোনায় মন নেই। বড় দুই ছেড়ে চাকরি করছে।"

ছেলেদের মধ্যে বড়র বিয়ে হয়েছে। বিয়ে-করা অবস্থায় বাপি ওকে বোম্বাই থেকে কিনে এনেছিল। কী সুদূর রাঙা টুকটুকে ছেলে। বউমাটিও সুন্দরী, কিন্তু সালওয়ার পাজামা পরা, গায়ে রঙিন ওড়না, নাকে নথ। বাপির যদি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে! জেনেশুনে পাঞ্জাবি বউ নিয়ে এলো। অন্য কোনো কষ্ট হচ্ছে না—শুধু ওকে সাজাবার সময় কাকলিকে হিন্দিতে কথা বলতে হয়। কাকলি দেখেছে বাংলায় কথা বললে পুতুলটা কিছুই বুঝতে পারে না, ফ্যালফ্যাল করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

"দ্যাখো, দাদুর কাছে যেন আমার মুখ নষ্ট না হয়। তোমরা মোটেই দুষ্টুমি করবে না, আমি যা বলবো, তা শুনবে," ছেলেদের এবং বউমাকে সাবধান করে দিয়েছে কাকলি। "যদি কথা না-শোনো, কয়লার গাদায় ফেলে দিয়ে আসবো, ওখান থেকে ইঁদুরে টেনে নিয়ে যাবে।"

এমন সময় দাদু এলেন। প্রথমে একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল কাকলির। মাথাটা ঠিক এই সময় নেড়া।

দাদু জামাকাপড় পাল্টে ওর দিকে তাকালেন। বড়মেয়ের একমাত্র সন্তান, মেজ মেয়ের কোনো ছেলেপুলে হয়নি। আর খোকার—নির্মল চৌধুরীর মনের মধ্যে হঠাৎ কাঁটাটা খচখচ করে উঠলো। হিসেব করে তিনি দেখলেন, খোকা বেঁচে থাকলে এতোদিনে হাতের গোড়ায় একটা নাতি-নাতনী থাকতো। অদিতির মেয়ের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন রিটায়ার্ড অ্যামাবাসাডার নির্মল

চৌধুরী। বিরাট চেহারা তাঁর। গায়ের রং সোনার মতন। চুলে পাক ধরেছে। চোখে চশমা—মোটা কাচের রংটা ফিকে নীল।

খুব লজ্জা করছিল কাকলির। দাদু এমনভাবে ওর দিকে তাকাচ্ছেন! দাদু ভাবছেন, কী মিষ্টি দেখতে হয়েছে মিঠু ওরফে অদিতির মেয়ে। মেমসায়েবদের হার মানায় ওর গায়ের রং। টানা-টানা চোখ দুটোয় একটু নীলের আভা—এটা ওর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে কাকলি। নরম নরম গোল-গোল হাত দু'খানার দিকেও তাকিয়ে খুব আনন্দ পেলেন নির্মল চৌধুরী। মনে পড়লো, ওয়াশিংটনের এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে বিরাট সাইজের এক ডলপুতুল দেখেছিলেন নির্মল চৌধুরী। সেই পুতুলটা কিনে দেবার জন্যে অদিতি তখন খুব বায়না করেছিল। দোকানের ম্যানেজার জানিয়েছিল, ওই পুতুল বিক্রির জন্যে নয়। তখন অদিতির কী কান্না! মিঠুর কি সে কথা মনে আছে? এখন তো সে একটা জ্যান্ত ডলপুতুল পেয়েছে।

অদিতি দেখলো অমন যে গম্ভীর বাবা তাঁকও পোষ মানিয়ে নিয়েছে কাকলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। অদিতি বলেছিল, "দিনরাত পাকা-পাকা কথা বলে। আর ওর বাবা একটুও বকবে না। তোমার অসুবিধে হলে বকুনি লাগিও।"

কাকলি ভেবেছিল দাদুর ব্যাগের মধ্যে অনেক পুতুল থাকবে। পুতুল নেই। তার বদলে অনেক বই। বাপির জন্যে বই, নিজের মেয়ের জন্যে বই, কাকলির জন্যে বই এনেছে দাদু। বই আবার মোটেই পছন্দ হয় না কাকলির। দাদুটার ওপর খুব রাগ হচ্ছে কাকলির—সঙ্গে দু-একটা পুতুল আনতে পারলো না? মা শুনলে রেগে যাবে। বলবে, পুতুলের ভিড়ে ঘরে আর বেশি জায়গা নেই। দাদু তো যেখানে বদলি হয়েছেন, সেখান থেকেই ডাকে পুতুল পাঠিয়েছেন। কাকলি তখন ছোট্ট, তাই মনে নেই।

সংসারে ছেলেমেয়েদের কাছ থেকেও একটু দূরত্ব রেখে চলেছেন নির্মল চৌধুরী। বাবার সঙ্গে কখনও তারা অন্তরঙ্গ হয়নি। কিন্তু নাতনীর কাছেই বোধহয় তাঁকে হার মানতে হবে।

দাদুর হাত ধরে নিজের সংসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো কাকলি। বললো, "আমার বড় ছেলে রাহুল—পোস্টাপিসের পিওন। ওর বিয়ে হয়েছে। তোমার যত চিঠি তা তো ও-ই বাড়িতে নিয়ে আসে।"

"বাঃ, বউমাটি তো বেশ ভালই হয়েছে।" দাদু গম্ভীরভাবে বললেন।

"আমি বিয়ে দিইনি, নিজেই বিয়ে করে বাড়িতে ঢুকেছে," চাপা গলায়

জানিয়ে দিলো কাকলি।

আরও তিন ছেলের মা হয়েছে কাকলি। এরা কেউ বা পুলিশ, কেউ মোটর সাইকেল চালায়। কী সুন্দর সাজানো সংসার।

ছোট ছেলেটি কুকুর ভালোবাসে—তাই সাদা কুকুরের পাশে শুইয়ে দিয়েছে তাকে। কুকুরটা সবসময় মাথা নাড়ায়, চারদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখে। অদিতি বললো, "মনে আছে বাবা? উলের কুকুরটা তুমি রোম থেকে পাঠিয়েছিলে।"

দাদুর ওপর বিরক্ত হলো কাকলি। কোথায় ছেলেদের কোলে তুলে আদর করবে, মুখ দেখে চার আনা পয়সা দেবে, তা না পুতুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দাদু বলছেন, "বড় হলে জানতে পারবে ডলপুতুলের চোখ কেন এমন নীল হয়। রানী ভিক্টোরিয়ার নীল চোখের সম্মানে। ছোটবেলা থেকে উনি পুতুল ভালবাসতেন—ওঁর ১৩২টা পুতুল ছিল। ডলপুতুলের ব্যবসা যখন জার্মানদের হাতে চলে গেলো, তখনও ওই নীল চোখ রয়ে গেলো।"

কাকলির ছোট ছেলেটাকে বসিয়ে দিতেই সে চোখ মেলে তাকালো। কী সুন্দর চোখ! দাদু বললেন, "এইটটিন টোয়েন্টিসিক্স (১৮২৬) সালের আগে পুতুলরা চোখ খুলতে বা বন্ধ করতে পারত না।"

কাকলি জানালো, "আমার ছোট ছেলেটাই কেবল কথা বলতে পারে। আমাকে দেখলেই ইংরিজীতে 'মামি-মামি' বলে। কত বকি ওকে বাংলায় মা বলতে বলি—কিন্তু ও কিছুতেই শোনে না।"

মা বললো, "ওই পুতুলটাও তো তুমি বন্‌ থেকে পাঠিয়েছিলে।"

দাদু কত খবর রাখে। বললো, "মিলজেল বলে এই জার্মানই তো প্রথম পুতুলকে 'মামি' বলতে শেখায়।"

কাকলির আদরের ভালুকটার কাছে এসেই পরিস্থিতি পাল্টে গেলো। মা সব জেনে-শুনে চুপচাপ ছিলেন। কাকলি বললো, "কেনিয়া-মামু এই টেডিবেয়ার এনেছিল—তখন অবশ্য ও খুব ছোট ছিল, আমি ওকে দুধ খাইয়ে বড় করেছি।"

সবাই হঠাৎ এমন চুপচাপ হয়ে গেলো কেন? কাকলি বুঝতে পারছে না। টেডিবেয়ারকে আদর করে কাকলি বললো, "দাদু, তুমি ওকে কোলে তুলে নিতে পারো—তোমায় কিছু বলবে না। কেমন জুল-জুল করে তোমর দিকে তাকাচ্ছে দ্যাখো।"

দাদু বললো, "এই ভালুক-পুতুলের জন্ম আমেরিকয়। প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্টের ডাকনাম অনুযায়ী এর নাম হয় 'টেডি'।"

দাদু হয়তো কাকলির কথায় টেডিকে আদর করতো—কিন্তু মা ইচ্ছে করেই

দাদুকে নিয়ে চলে গেলো।

ডলপুতুল বলতে দাদু এখন কাকলিকেই দেখছেন। অদিতির মেয়েটা কী মিষ্টি হয়েছে। দাদুকে মাতাবার জন্যেই বোধহয় সকালবেলায় মায়ের লিপস্টিক ঠোঁটে লাগিয়েছে। মুখে রুজ লাগিয়েছে সযত্নে। দাদুর নজর যে তার ওপর রয়েছে তা বুঝতে পারছে কাকলি। বললো, "নেল-পালিশটা যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে মা। ওটা পরলে আমাকে ভাল দেখায়।"

"তোমাকে একটা আলাদা নেল-পালিশ কিনে দেবো।" দাদু যেভাব তাকাচ্ছে, এখনি না ছোটগিন্নী বলে ডেকে বসে।

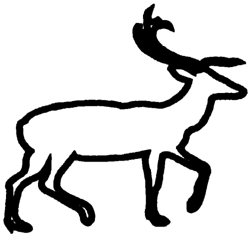
কিন্তু নেল-পালিশের বদলে অন্য জিনিস চায় কাকলি। "কী জিনিস বলো?" দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

"কাউকে বলবে না বলো?" কাকলি এবার দাদুকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নিলো। তারপর কানে-কানে বললো, "আমার একটা মেয়ে হচ্ছে না কেন বলো তো? আমাকে একটা মেয়ে দেবে তুমি?"

এ আর এমন কী অনুরোধ। আগে জানলে বিদেশ থেকেই একটা ফুটফুটে মেয়ে-ডল আনিয়ে দিতে পারতেন। রাত্রে দাদুর পাশে শুয়ে কাকলি আরও কাছে সরে এসে, ষড়যন্ত্রের ভঙ্গিতে ফিস-ফিস করলো, "কেউ যেন না-জানতে পারে।"

ডিপ্লোম্যাটিক চাকরিতে বহু কথাই গোপন রেখেছে নির্মল চৌধুরী, অনেক দায়িত্ব এসেছে, কিন্তু নাতনীর মতো এইভাবে কেউ বলেনি, জানাজানি হলে আড়ি আড়ি আড়ি। আমিও কেনিয়া-মামুর মতো আকাশে তারা হয়ে যাবো।"

স্টিল-ফ্রেমের চাকরিতে নিজেকে ইস্পাতের মতোই তৈরি করেছিলেন নির্মল চৌধুরী। এই প্রথম যেন তিনি হেরে যাচ্ছেন।



পরের দিন রথ। রথের মেলা-টেলা কতদিন দেখেননি নির্মল চৌধুরী। জীবনটাই তো দেশের বাইরে-বাইরে কাটালেন তিনি। মেলাতে কাকলিকে নিয়ে যাবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু অদিতি বারণ করলো। "ভীষণ ভিড়— তোমার

কোনো ধারণা নেই। হাতছাড়া হয়ে যেতে কতক্ষণ?"

যার জিনিস তার পছন্দ অনুযায়ী কেনাই ভাল। কিন্তু কাকলিকে সঙ্গে নেওয়া যাচ্ছে না। অর্দিতি বললো, "ওইটুকু মেয়ের আবার পছন্দ কী? ওর জন্যে তো আর বর আনছো না?"

গম্ভীর নির্মল চৌধুরী কোনো উত্তর দিলেন না। রাস্তায় বেরিয়ে মেয়ের শেষ কথাটা কানে বাজতে লাগলো। তাঁর দুই মেয়ের বর তিনি নিজেই পছন্দ করেছেন। আর ছেলের বেলায় খোকনকে বলেছিলেন, তিনি যতক্ষণ আছেন, ততক্ষণ তাঁর পছন্দের একটা দাম থাকবে।

বিলেত আমেরিকায় কর্মজীবন কাটিয়ে এসে নির্মল চৌধুরী রথের মেলার প্রেমে পড়ে গেলেন। খোলা আকাশের নীচে, হাজার মানুষের ধাক্কাধাক্কির পরোয়া না করে তিনি অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালেন। তারপর হাতে একটা শালপাতার বাক্স নিয়ে বাড়ি ফিবলেন।

কাকলি ছুটতে ছুটতে এলো। ওর মা-বাবা তো ছিলেনই। দাদু বললেন, "তোমাদের মেয়ের জন্যে এক মেয়ে এনেছি।"

কাকলির আব তর সইছে না। "দাদু তাড়াতাড়ি মেয়ে দেখাও। ওর নামও ঠিক করা আছে—চন্দ্রা।"

বাক্স খুলতেই ঘরের এক অস্বাভাবিক স্তব্ধতা নেমে এলো। অদিতি ভেবেছিল, বাবা কোনো মনোহারী দোকান থেকে নাতনীর জন্যে নাইলনের ডল নিয়ে আসবেন। তার বদলে রথের মেলা থেকে মাটির মেয়ে-পুতুল এনেছেন নাদু।

"কী হলো? কাঁদছো কেন?"

চোখের পাতায় আঙুল ঘষতে-ঘষতে কাকলি ততক্ষণ কান্না জুড়ে দিয়েছে, "এই আমার মেয়ে! এ যে কালো কুচকুচে।"

অদিতি ও তার স্বামী লজ্জা পেয়ে গেলো। মেয়েকে দাদুর সামনে বকতে পারছে না। তবু বললো, "ছিঃ, কাকলি, দাদু যা এনেছেন তাই নিতে হয়।"

পুতুল তো পুতুল। তার রূপ নিয়ে নাতনী যে এমন কাণ্ড করবে নির্মল চৌধুরী তা আন্দাজ করেননি। তার ছেলেমেয়েরাও ছোটবেলায় পুতুল খেলেছে নিশ্চয়, কিন্তু তারা তো কখনও তাঁর পছন্দের ওপর কথা বলেনি।

"এ মা। কী বিশ্রী কালো। আমার মেয়ে কেন এমন কালা হবে?" এবার রীতিমতো রাগ দেখালো কাকলি।

অপরাধীর মতো নীরব থেকে নির্মল চৌধুরী দেখলেন তাঁর নাতনীর গায়ের

রং মেমসায়েবদের মতো সাদা। তাঁর মেয়ে জামাই এমন কি তিনি নিজেও রীতিমতো ফর্সা।

অদিতিও আড়চোখে পুতুলটার দিকে তাকালো। মেয়েকে বললো, "কেন তুমি গোলমাল বাড়াচ্ছো? বেশ তো পুতুলটা।"

"বেশ তো?" ফোঁস করে উঠলো কাকলি। "তোমার মেয়ে যদি ওরকম হতো, তাহলে তুমি নিতে?"

একটু ধাক্কা খেলো অদিতি। নিজের মেয়ে ওরকম হলে সত্যি কী যে হতো! ওরকম কুরূপা মেয়ের কথা অদিতি এই মুহূর্তে ভাবতে পারছে না। পুতুলটার ঘাড় নেই, কপালটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে, ট্যারা চোখ, ঠোঁট দুটোও যেন কেমন বেমানান।

অদিতি মেয়েকে বকছে বটে, কিন্তু বাবাই বা দেখে-দেখে এমন পুতুল আনতে গেলেন কেন? বাজারে কি আর পুতুল ছিল না?

বাজারে অবশ্য আরও অনেক পুতুল ছিল। ঘুরে ঘুরে দেখতে গিয়ে সুন্দরীদের ভিড়ে ওই পুতুলটার দিকেই কিন্তু নির্মল চৌধুরীর নজর পড়লো। কুরূপা পুতুলটাকে কেউ চাইছে না। দোকানদারও মাটির ওপর বিছানো সুন্দর-সুন্দর পুতুলের মেলা থেকে ওকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছে। হুড়হুড় করে অনেক পুতুল বিক্রি হচ্ছে—কিন্তু ওর দিকে তাকিয়েই সকলে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। দোকানী গ্রামের লোক—ওই রথের মেলাতে নিজের তৈরি পুতুল বেচতে শহরে এসেছে।

নির্মল চৌধুরীর হঠাৎ মনে পড়লো খোকনকে নিয়ে একবার পুতুল কিনতে গিয়েছিলেন কেনিয়ার বাজারে। সেখানেও কুরূপা হাত-ভাঙা একটা পুতুল ছিল—খোকন ওটাকেই পছন্দ করলো। বললো, "বাবা, ওকে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। ওকে কেউ নিচ্ছে না।" ছোট ছেলেদের খেয়াল—ওদের মন তিনি বোঝেন না। কিন্তু তিনি বাধা দেননি। "তোমার যা পছন্দ তাই নাও।" খোকনকে বলেছিলেন তিনি।

রথের মেলায় অজস্র তালপাতার বাঁশি বাজছে। পাঁপর ভাজার গন্ধে বাতাস মাতোয়ারা। একটু দূরে ছেলেরা নাগরদোলা চড়ছে। শত-শত লোক সওদা করছে, জিলিপি খাচ্ছে। এই ভিড়ের মধ্যে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে ভাববার উপায় নেই—তবু নির্মল চৌধুরীর পুরানো কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। খোকনটা বোধহয় ছোটবেলা থেকেই আলাদা ছিল। নইলে, বড়ো হয়ে কেউ অমন হয়ে যায়? প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত নির্মল চৌধুরীর একমাত্র ছেলে। রাজকন্যের মতো মেয়ের

বাবারা তাঁকে ধরেছে ছেলের বিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু ছেলেটা কোথা থেকে চণ্ডীগড়ের ভাঙ্গী কলোনির কালো কুৎসিত একটা মেয়েকে পছন্দ করে বসলো।

মেয়েটাকে খোকন একদিন বাড়িতেও এনেছিল, বাবাকে দেখাবার জন্যে। মুক্তোর মতো ছেলের গলায় সে যেন বাঁদুরে হার। আগুনের মতো জ্বলে উঠেছিলেন নির্মল চৌধুরী। ছেলেকে সোজা বলেছিলেন, ও মেয়ে বিয়ে করা চলবে না।

খোকনের সাহস কম নয়। তর্ক করেছিল, "দেখতে খাবাপ হলেই বুঝি মানুষ খারাপ হয়?"

"চাকরি না করে বাবার হোটেলে থাকাব সময় ওসব তর্ক মানায় না। এ-বাড়িতে থেকে ওই মেয়ে আনা চলবে না। সমাজে নির্মল চৌধুরীর একটা মান-সম্মান আছে।"

খোকন তখন কোনো উত্তর দেয়নি। বাবার মুখের ওপর কথা বলবার শিক্ষা সে পায়নি। সে কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে ছিল। নির্মল চৌধুরী নিজে বিবক্তভাবে বসবার ঘর থেকে উঠে পড়ার-ঘরে চলে গিয়েছিলেন। কুরূপা সেই মেয়েটাকে বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে খোকন স্কুটার নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল—সে আওয়াজও নির্মল চৌধুরী শুনতে পেয়েছিলেন। তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি। রাত এগারোটা পর্যন্ত ছেলের জন্যে অপেক্ষা করেছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত পুলিশে খবর দিয়েছিলেন। আরও দু'ঘণ্টা পরে হাসপাতালের মর্গে মৃত-পুত্রের মুখ দেখতে হয়েছিল নির্মল চৌধুরীকে। লরির সঙ্গে স্কুটারের ধাক্কা—এই বলেই খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল। মেয়েটাকে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মৃত্যু খোকনকে হাতছানি দিয়েছিল। বাবার কাছে বকুনি খেয়ে খোকন কি অন্যমনস্ক হয়েছিল? না অন্য কিছু? দুর্ঘটনা? না আত্মহত্যা? এর সঠিক উত্তর যে দিতে পারতো সে এখন সকলের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

রথের বাজার ঝিমিয়ে পড়েছে। এখন সন্ধে আটটা। কাকলি নিশ্চয় এখনও দাদুর জন্যে জেগে বসে আছে। রথের দোকানীরা সব ট্রেনের যাত্রী—তাদের অনেকেই বিক্রির পাট চুকিয়ে ফেলেছে। ঘুরতে-ঘুরতে নির্মল চৌধুরী কী এক অজানা আকর্ষণে সেই পুতুলের দোকানে ফিরে এলেন। মিটমিট করে একটা মোমবাতি জ্বলছে। সুন্দর-সুন্দর পুতুল বিক্রি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যার জন্যে ফিরে আসা, সেই কুরূপা পুতুলটা তখনও পড়ে রয়েছে। দোকানদার বুঝতে

পারলো না বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় অফিসার নির্মল চৌধুরীর সঙ্গে সে কথা বলছে। নির্মল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, "ওই পুতুলটাকে ওইরকম কাদার মধ্যে ফেলে রেখেছো কেন?"

"ওর যে রূপ নেই বাবু," লোকটা এক মুঠো মুড়ি খেতে-খেতে উত্তর দিলো। সারাদিন কাজ করে বেচারার খুব খিদে পেয়েছে।

"ওই রকম 'আগলি' হলো কেন?" জিজ্ঞেস্ করলেন নির্মল চৌধুরী।

'আগলি' মানে যে কুৎসিত, তা বোধহয় লোকটা সহজে আন্দাজ করে নিলো। মুড়ি চিবনো বন্ধ রেখে লোকটা বললো, "হাতের পাঁচটা আঙুল কি সমান হয় হুজুর? চেষ্টা তো করি সকলকে সুন্দরী করতে। কিন্তু যে যে-রকম ভাগ্য করে এসেছে।"

গাঁয়ের কুমোর হলে কী হয়, লোকটার কথাবার্তা তো বেশ, নির্মল চৌধুরী ভাবলেন। কিন্তু বললেন, "যাই বলো বাপু. বড্ড বিশ্রী দেখতে।"

লোকটা ভাবলো, বাবু বোধহয় ওইসব বলে পুতুলের দাম কমাতে চাইছে। তাই বললো, "দেখতে খারাপ হলেই কি মানুষ খারাপ হয় হুজুর? এখন ওঠবার সময়—পঁচাত্তর পয়সা পেলেই ছেড়ে দেবো।"

নির্মল চৌধুরী সমস্ত শরীরে হঠাৎ শিহরন বোধ করলেন। খোকনের কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে। ভাঙ্গী কলোনির সেই কুরূপা কালো মেয়েটার মুখ মনে করবার চেষ্টা করলেন নির্মল চৌধুরী। তারপর কাদামাখা বিরস-বদনা পুতুলটিকে তিনি আদর করে হাতে তুলে নিলেন। মোমবাতির অস্পষ্ট আলোকে পরম স্নেহে ওর মুখটিকে দেখলেন, তারপর পকেট থেকে পুরো একখানা দশটাকার নোট বের করে লোকটার হাতে দিলেন। ভাঙানি ফেরত না-নিয়ে, লোকটাকে অবাক করে দিয়ে, নির্মল চৌধুরী এবার হনহন করে মেয়ের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছিলেন।

কাকলির মতো একফোঁটা মেয়ে যে পুতুলের রূপ নিয়ে এমন তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে নির্মল চৌধুরী তা ভাবতে পারেননি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে পুতুলটা দেখছে, আর ক্রমশ হরেক রকমের খুঁত বেরিয়ে পড়ছে। অদিতি আবার মেয়েকে বকুনি লাগালো, "ছিঃ, কাকলি, দাদু যা এনেছেন তাই হাসিমুখে নিতে হয়।"

কাকলির কানে সে-কথা ঢুকলো না। সে বকুনি লাগালো, "দাদু, তোমার কোনো বুদ্ধি নেই—আমার মেয়ে এরকম দেখতে হবে কেন?"

বাবা কিছু বলছেন না। নির্মল চৌধুরীকে নাতনী ছাড়া আর কেউ এখন বকুনি লাগাতে পারতো না। বাবা কী করে দেখেশুনে এমন পুতুল আনলেন?

"তুমি কি চশমা নিতে ভুলে গিয়েছিল?" অদিতি বাবাকে জিজ্ঞেস করলো।

চশমা যে সঙ্গেই ছিল নির্মল চৌধুরী তা স্বীকার করলেন।

একটা পুতুলের সামান্য ব্যাপার যে ক্রমশ এতো পাকিয়ে উঠতে পারে তা আন্দাজ করা যায়নি। কাকলি বলেছিল, "এখনও সময় আছে দাদু, তুমি দোকানে চলে গিয়ে ওকে পাল্টে নিয়ে এসো।"

এতো রাত্রে কোথায় যাবেন দাদু? তার ওপর মেলা কখন ভেঙে গিয়েছে কিন্তু কাকলি নাছোড়বান্দা।

শেষ পর্যন্ত ঠিক হলো আগামীকাল যা-হয় হবে। কাকলি ইতিমধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুক।

দাদুর পাশে বিছানায় শুয়ে কাকলির আজ ঘুম আসছে না। সে ছটফট করছে। আর দাদু ভাবছেন, আজকালকার ছেলেমেয়েরা কতখানি নিজের মত চলে।

"দাদু, তোমার কী মনে হয়, ওই মেয়ের বিয়ে হবে?" কাকলি জিজ্ঞেস করলো।

চিন্তিত নাতনীকে দাদু সাহস দিলেন, "কেন হবে না? ভগবান যাদের সুন্দর করেননি, তাদের কি বিয়ে হচ্ছে না?"

"আমার বন্ধু আরতিকে কাল মেয়ে দেখাবো। ওর ছেলে আছে—যদি পছন্দ করে, ভাল। তাহলে ওকে ফিরিয়ে দিতে হবে না।"

কাকলি পাশ ফিরলো। তারপর গম্ভীরভাবে বললো, "আরতির ছেলেটা খুব সুন্দর—ঠিক আমার বড় ছেলের মতো। তোমার কি মনে হয়, একে পছন্দ করবে?"

দাদুর নিজের মনেই এ-বিষয়ে যথেষ্ট ভয় রয়েছে, তবু নাতনীকে সাহস দিলেন। দাদুর ওপর আজ বেশ অভিমান হয়েছে কাকলির। নিজের ছেলেপুলে নিয়ে বেশ ছিল সে, কোত্থেকে এই কালো কুৎসিত মেয়েটাকে এনে দাদু তার ঘুম কেড়ে নিলো।

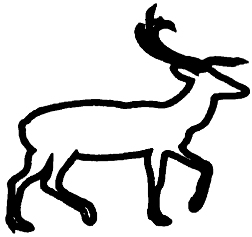
দাদুর নিজেরই এবার ঘুমের ঘোর এসেছিল। এমন সময় দেখলেন, বিছানা থেকে উঠে পড়ে কাকলি পুতুলটাকে বলছে, "খুব হয়েছে—এখন আর গোমড়া মুখে দাঁড়িয়ে থেকো না। তাড়াতাড়ি এই দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড়ো।"

বিছানায় ফিরে এলো কাকলি। ফিস ফিস করে বললো, "জানো দাদু, হঠাৎ খেয়াল হলো কালো মেয়েটাকে শুতে বলিনি—আমার আর সব পুতুল বিছানায়

রয়েছে। উঠে গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি তাই। সবাই ঘুমুচ্ছে, আর ও মুখ শুকনো করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কিছু খায়নি—ভাগ্যে দুধের গেলাশটা ছিল।"

রাগের মাথায় কাকলি আজ দুধ খায়নি—মা গেলাশটা টেবিলে রেখে চলে গিয়েছিলেন।

দাদুকে কাকলি বললো, "কী তেজ মেয়েটার। কিছুতেই দুধ খেতে চায় না। কাল দুপুরেই কিন্তু তুমি ওকে বিদেয় করে আসবে।" কাকলি সোজাসুজি জানিয়ে দিলো দাদুকে।



দাদু ও কাকলি দুজনেই আজ সকাল থেকে ভীষণ ব্যস্ত। একটু পরেই মেয়ে দেখতে আসবে আরতি।

ঘরটা ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করেছে কাকলি। দাদুকে একবার বকুনি লাগালো, "শুধু বসে-বসে সিগারেট খেলেই চলবে? কিছু কাজ করবে না? তুমিই তো যত নষ্টের তোড়া।" বড্ড শক্ত কথা 'গোড়া' বলতে গিয়ে কাকলি ভুলে 'তোড়া' বলে ফেলেছে।

নির্মল চৌধুরী মনে-মনে ভাবলেন, কথাটা মন্দ বলেনি মেয়েটা। সমস্ত জীবনে অনেক ভুল করেছেন তিনি—প্রত্যেকটা ভুল যদি ফুল হয়ে যায়, তাহলে সত্যিই তিনি নষ্টের তোড়া।

সিগারেট বন্ধ রেখে নির্মল চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন, "কিছু করতে হবে?"

"যাও, এখনই জেনে এসো—ওদের কতজন দেখতে আসবে। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে তো? আমি একলা হাতে আর কত পারবো?"

"কেন তোমার বউমা রয়েছে তো?" দাদু মনে করিয়ে দিলেন।

ঠোঁট বেঁকালো কাকলি। "বউমা এখনও ঘুমোচ্ছে—কোনো কথা শোনে না, কোনো কাজ করে না। ছেলেরা অফিসে চলে গিয়েছে!"

বাড়ির সবাইকে অবাক করে দিলেন নির্মল চৌধুরী। বেড়াবার লাঠিহাতে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। চাকরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আরতিদের বাড়িটা কোথায়?"

সকাল বেলায় বিশিষ্ট অতিথিকে বাড়ি আসতে দেখে আরতির বাবা-মা অবাক! নির্মল চৌধুরী কিন্তু কন্যা-পক্ষের প্রতিনিধির মতো বিনয়ে বিগলিত হয়ে আরতির সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। আরতি পাত্রপক্ষ, তাই কাকলির দাদুকে বিশেষ খাতির করেনি। গম্ভীরভাবে জানিয়ে দিয়েছে, মেয়ে দেখতে এ-বাড়ি থেকে অন্তত দুজন যাবে, তিনজনও হতে পারে। দাদাকে বলেছে আরতি— কিন্তু আজ ফুটবল খেলা আছে স্কুলে।

বাড়ি ফিরে এসে দাদুকে সমস্ত দুপুর কাকলির সঙ্গে ব্যস্ত থাকতে হলো। এতো কাজ যে কাকলি নাওয়া-খাওয়ার সময় পাচ্ছিল না। দাদুকে ছুটতে হলো খাবার আনবার জন্যে। তারপর কালো পুতুলটাকে সাজাতে বসলো কাকলি। একে তো ওই রূপ! তার ওপর জামা-কাপড়ের যা ছিরি। দাদুকে খুব শুনিয়ে দিলো কাকলি। "জামা-কাপড়টাও দেখে নিতে পারোনি?" নিরুপায় কাকলি নিজের একটা সিল্কের ফ্রক চুপি-চুপি ছিঁড়ে ফেললো। তাপর অনেকক্ষণ ধরে পুতুলটাকে কাপড় পরালো। কিন্তু ব্লাইজ? দাদু, তুমি চট করে একটা ব্লাউজ কিনে আনতে পারবে?"

এইটুকু পুতুলের রেডিমেড ব্লাউজ কোথায় পাওয়া যাবে? "মেয়ে এনেছো, আর ব্লাউজ আনতে পারোনি?" দাদুকে আবার বকুনি লাগালো কাকলি।

কী করে কাকলি? থাক, এইভাবে। বউমার ঝকঝকে জরির ব্লাউজটা কিছুক্ষণের জন্যে নেবার কথা বলতে গেলেন নির্মল চৌধুরী। কিন্তু রেগে উঠলো কাকলি। 'কোথাকার কোন মেয়ে, জানা নেই শোনা নেই, তাকে বউমা কেন ব্লাউজ দেবে?"

বকুনি খেয়ে অপরাধীর মতো চুপ করে রইলেন দাদু। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন বেশি সময় নেই। কাকলি নিজেই এখনও তৈরি হয়নি। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে মেয়েটার মুখখানা তেল-চকচক করছে।

বাথরুম থেকে মুখ-হাত-পা ধুয়ে এলো কাকলি। দাদুকে হুকুম করলো, "মায়ের কাছ থেকে একটা শাড়ি নিয়ে এসো—আমি বললে মা দেবেন না।"

বাবার কথা মতো অদিতিকে শাড়ি বের করে দিতে হলো। মুখ টিপে একবার হেসেই ফেললো অদিতি। নাতনীর পাল্লায় পড়ে বাবা আজ নাস্তানাবুদ হচ্ছেন—নিজেও বেশ পুতুল-খেলায় মেতে উঠেছেন। অথচ চিরকাল বাবা অন্যরকম ছিলেন—সব সময় দূরত্ব রেখে চলেছেন ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। অদিতির মনে পড়লো, নিজের মেয়ের বিয়ের সময় বাবা কিন্তু এতো কাজ করেননি। পাত্রপক্ষ যখন অদিতিকে দেখতে এলো, বাবা তখন অফিসের কোন

এক জরুরী কাজে সাউথ ব্লক অফিসে চলে গেছেন।

শাড়ি পরে কাকলি এবার গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলো, "দাদু কেমন দেখাচ্ছে?"

"ভারি মিষ্টি দেখাচ্ছে। যে-দেখবে সেই পছন্দ করবে"—দাদুর এই উত্তরে ভীষণ রেগে উঠলো কাকলি। "আমাকে নয়—এই মেয়েটার কথা হচ্ছে।"

খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পুতুলকে দেখলেন নির্মল চৌধুরী। একদিনে মেয়েটাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে অনেকখানি সুন্দর করে ফেলেছে কাকলি।

"ঠোঁটে একটু লিপেস্টিক দেবো?" কাকলি এবার দাদুর পরামর্শ চায়।

"দাও," সুচিন্তিত অভিমত দেন অনভিজ্ঞ নির্মল চৌধুরী। "মায়ের কাছ থেকে লিপস্টিকটা নিয়ে এসো," বললেন তিনি।

"তোমার কোনো বুদ্ধিসুদ্ধি নেই," আবার বকুনি লাগালো কাকলি। "মায়ের লিপেস্টিক টকটকে লাল—ফ্লেমিংগো রেড্। কালো মেয়ের জন্যে চাই ন্যাচারাল কালার।" এইটুকু মেয়ে এরই মধ্যে রংয়ের নামটাম রপ্ত করে ফেলেছে।

দাদু দোকানে ছুটলেন লিপস্টিক কিনতে। দোকান থেকে ফিরেই দেখলেন নাতনীর রাগ আবার বাড়ছে গম্ভীর মুখে কাকলি বললো, "আরতি, যদি পছন্দ না করে, আজকেই তুমি ওকে দোকানে ফিরিয়ে দিয়ে আসবে।"

বাইরে বেল বাজলো। দরজা খুলে নির্মল চৌধুরী দেখলেন পাত্রপক্ষ এসে গিয়েছে, মায়ের শাড়ি পরে গম্ভীর মুখে দরজার কাছে আরতি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"তিনজনের জায়গায় মাত্র একজন?" জিজ্ঞেস করলেন নির্মল চৌধুরী।

গম্ভীর মুখে চেয়ারে বসতে-বসতে আরতি বললো, "একজন কই? দুজন এসেছি আমরা। ভুলু এসেছে।" ছোট একটা কুকুর আরতির পায়ের কাছে ঘুরঘুর করছে। "দাদার খেলা শেষ হয়নি, তাই এলো না।"

আরতি আজ অন্যদিনের তুলনায় গম্ভীর। একটু যেন দূরত্ব রেখে চলেছে সে।

কন্যাপক্ষের সঙ্গে বেশি মাখামাখি ভাল নয়। আরতি বললো, "ভুলু তুমি চুপচাপ বোসো। এখনই মেয়ে দেখবে।"

ভুলু এবার গম্ভীর হয়ে সোফার ওপর উঠে বসে পড়লো। অন্যদিন হলে ভুলুকে ওখানে বসতে দিতো না কাকলি। নখ দিয়ে সোফার কাপড় ছিঁড়ে দেয় ও। আজ কিন্তু ভুলুকে কুটুমের মতো খাতির করতে হলো।

কাকলি ফিস-ফিস করে দাদুকে বললো, "ভুলুটার খুব বুদ্ধি—তাই আরতি

ওকে মেয়ে দেখতে এনেছে। কিন্তু ওকে কী খাওয়াবো? তুমি তো কেবল সিঙাড়া আর রাজভোগ এনেছো।”

ডিশে করে খাবার সাজিয়ে আরতির সামনে রাখলো কাকলি। দাদু বললেন, “একটু মিষ্টিমুখ হোক মেয়ে দেখার আগে।”

খাবার দেখে ভুলু চঞ্চল হয়ে উঠেছে—সে ভব্যতা বজায় রাখতে পারছে না।

খুব লজ্জা পেয়ে কাকলি বললো, ‘ওকে কী দিই? একটু দুধ?”

আরতি গম্ভীরভাবে বললো, “সিঙ্গাড়াটা ওর সহ্য হয় না—তবে রাজভোগ খেতে ভুলু খুব ভালবাসে।”

ভুলু কথাবার্তা সব বুঝতে পারছে। খাবারের আনন্দে তার জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছে।

দুধ ও রাজভোগ শেষ করে ভুলু ছটফট করছে। ঘনঘন ল্যাজ নাড়ছে। আরতি বললো, “মেয়ে দেখার জন্যে ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।” ভুলুর গায়ে হাত দিয়ে আরতি বললো, “ছিঃ, ভুলু, ওরকম করতে নেই, আমি চা খেয়ে নিই—তারপর মেয়ে আসবে।”

বন্ধুকে আরতি বললো, “তুই যদি পারিস, ভুলুকেও একটু চা দিস—বাড়িতে আমরা দুজনেই তো চা পাই না।”

নির্মল চৌধুরী অবাক হয়ে ছোট মেয়েদের এই বড় জগৎ দেখছেন। কাকলি বললো, “ছেলে কতদূর পড়েছে?”

“বি-এ ফেল,” আরতি গম্ভীরভাবে বললো। ওর কাকুও এবার বি-এর পরীক্ষায় ফেল করেছে।

মেয়ের লেখাপড়ার খোঁজখবর করলো আরতি। বেশ লজ্জা পেয়ে গেলো কাকলি—দাদুর মুখের দিক সে তাকালো। দাদু আমতা-আমতা করতে লাগলেন। কাকলি বললো, ‘ গাঁয়ের মেয়ে তো—লেখাপড়া একদম জানে না।”

আরতি বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো। কালো পুতুলকে এবার দুরু দুরু বুকে কাকলি ওদের সামনে এনে বসিয়ে দিলো।

একেবারে নীরবতা—কেউ কোনো কথা বলছে না। প্রায় দু তিন মিনিট ধরে আরতি খুঁটিয়ে-খুটিয়ে দেখছে পুতুলটাকে। তারপর মুখ দেখে মনের অবস্থা কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ভুলুটাও সব খুঁটিয়ে দেখছে—একবার ছুটে এসে পুতুলটাকে শুকলো। জিভ বার করে চেটেও দিতো, যদি না আরতি বকুনি লাগাতো। ভুলুর খুব আনন্দ—ওর বোধহয় মেয়ে পছন্দ হয়েছে।

আরতি এসব কথাবার্তা কোথা থেকে শিখেছে ভগবান জানেন। বললো, “পায়ের পাতা দুটো দেখি—কাপড়ে ঢাকা রয়েছে।”

কাকলি অন্য সময় আরতির কথা শোনে না! আজ কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পায়ের

কাপড় তুলে পুতুলের পা দেখিয়ে দিলো।

"রান্না-বান্না?" আরতি জিজ্ঞেস করলো।

কাকলি আবার দাদুর দিকে আড়চোখে তাকালো। "গাঁয়ের মেয়ে তো—রান্না ভালই জানে।" দাদু নিজেই উত্তর দিলেন।

পনেরো মিনিট পরে ছেলের মা ভুলুর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো। কাকলি যথাসাধ্য ভদ্রতা দেখিয়েছিল। ভুলু একটা কাপ ভেঙে ফেললো, তবু কাকলি কিছু বলেনি। আরতিকে আড়ালে ডেকে কাকলি লোভ দেখিয়েছে, মেয়ে পছন্দ হলে দাদু দু'খানা ক্যাডবেরি কিনে দেবেন।

কিন্তু আরতি নরম হবার মেয়ে নয়। সোজা বলেছে, "শুধু চকোলেট খেলেই হবে না—নিজের পেটের ছেলের কথাও ভাবতে হবে।"

দাদুর কোলে কালো পুতুলকে বসিয়ে দিয়ে কাকলিও ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গিয়েছিল। দাদু বসে ছটফট করছেন। এই নাটকে তিনি নিজে বেশ জড়িয়ে পড়েছেন।

ঠোঁট ফুলিয়ে কাকলি বাড়ি ফিরলো। এসেই দাদুর কোলে মুখ লুকিয়ে বললো, "আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। ওকে এখনই বিদেয় করে দিয়ে এসো।" আরতির মেয়ে পছন্দ হয়নি। এমন কি ভুলুটাও আরতির পক্ষে!

পুতুলটা এনে নির্মল চৌধুরী যে কী বিপদেই পড়লেন! এখন ওকে কে ফেরত নেবে? সত্যি কথা বলতে, বেচারাকে ফেরত দেবার কোনো ইচ্ছেই ছিল না তাঁর। এক কালো মেয়েকে ফেরত দিয়ে তিনি জীবনের শিক্ষা পেয়ে গিয়েছেন। খোকনটা কি যে করলো। এখন তাঁর নিজের কোনো পছন্দ-অপছন্দ নেই।

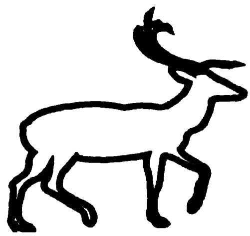
বেশ কয়েকবার কাকলি হুকুম করেছে, "যাও ওকে রেখে এসো। রাত হয়ে যাচ্ছে।"

নির্মল চৌধুরী তবু চুপচাপ বসে আছেন। ভাবছেন, আর একটা দিন সময় ভিক্ষা করে নেবেন নাতনীর কাছ থেকে। কুরূপা পুতুলটাকে নিয়ে এসে এবাড়ির মেয়েটার জীবনেও তিনি অশান্তি ডেকে এনেছেন।

বন্ধুর কাছে অপমানিত হয়ে কাকলি এখন পুতুলটার মুখ দেখতে চাইছে না। রেগে বলেছে, "সত্যিই তো, এই রকম বেঁটে মোটা কালো বোঁচা ট্যারা বিশ্রী মেয়ে কার পছন্দ হয়?"

বাড়ির চাকর অভয় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দাদুর অসহায় অবস্থা দেখছে। এক সময় সে ফিসফিস করে বললো, "আপনি ব্যস্ত হবেন না দাদু। দরকার হলে যা-ব্যবস্থা করার আমিই করবো।"

অভয়ের কথা দাদুর মোটেই মনঃপূত হলো না। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। ব্যবস্থা যা নেবার তা তো তাঁরই নেওয়ার কথা।



সন্ধ্যাবেলায় পড়তে বসেছিল কাকলি। পড়া শেষ করে খেলাঘরে গিয়েই সে চমকে উঠলো। কালো পুতুলটা নেই। কাকলির অন্য পুতুলগুলো সব যে যার জায়গায় রয়েছে, উধাও হয়েছে কেবল কালো পুতুলটা।

ছেলেদের জিজ্ঞেস করলো কাকলি, "তোরা দেখেছিস? মেয়েটা কোথায় গেলো?"

ছেলেরা সবাই ফালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

"বউমা, বউমা তুমি তো সারাক্ষণ বাড়ি রয়েছো। তুমি নিশ্চয় দেখেছো, মেয়েটা কোথায় গেলো?" কাকলি কাতরভাবে জিজ্ঞেস করলো।

জমকালো শাড়ি পরা এবং রুজমাখা বউমা নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। কোনো কথা বললো না।

কাকলির উত্তেজনা বাড়লো। পড়তে যাবার আগেও তো মেয়েটাকে দেখেছে সে। এর মধ্যে কোথাও উধাও হলো?

"ভালুক ভাই, ভালুক ভাই, তুমি জানো?" কাকলি এবার কাঁদো-কাঁদো অবস্থায় জিজ্ঞেস করলো।

টেডিবেয়ারের চোখ দুটো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে। তার চোখ দুটো যেন ছলছল করছে। মনে হচ্ছে সে বলছে, "যাকে তুমি এতো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে, তার আর খোঁজ নিয়ে লাভ কী?"

বিলিতী কুকুরটাও এতোক্ষণ চুপ করে বসেছিল। তাকে একটু ধাক্কা দিতেই সে অভ্যাসমতো মাথা নাড়তে শুরু করলো। কাঁদো কাঁদো হয়ে কাকলি জিজ্ঞেস করলো, "বলতে পারো, কোথায় গেলো কালো পুতুল?"

গম্ভীর মুখে কুকুর কেবল মাথা নাড়তে লাগলো। কোনো উত্তর দিলো না।

অজানা ভয়ে গা ছম-ছম করছে কাকলির। হাঁপাতে হাঁপাতে দাদুর কাছে এসে হাজির হলো কাকলি। "দাদু তুমি কি সত্যিই ওকে ফিরিয়ে দিয়ে এলে?" ছলছল

করছে কাকলির চোখ। "আমাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল একবার, বিকেলে বেচারা কিছু খায়নি। ওকে খাবার দিতে ভুলে গিয়েছি। আমার অন্য ছেলেমেয়েরা খাবার না পেলে চেঁচামেচি করে—ও চুপ করে এক কোণে দাঁড়িয়েছিল। ভীষণ অভিমান ওর।"

দাদু প্রথমে থতমত খেলেন। ভাবছিলেন, ওকে ফিরিয়ে না-দিয়ে আসার জন্যেই নাতনীর কাছে বকুনি খাবেন।

বাড়ির প্রতিটা জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে ফেললো কাকলি। রাগ করে মেয়েটা কোথাও লুকিয়ে আছে কি না কে জানে? খাটের তলা, বাক্সের পিছন দিক, আলমারির কোণ—সব ভাল করে খুঁজলো কাকলি। মা তাকে খেতে ডাকছেন, কিন্তু খাওয়া মাথায় উঠেছে কাকলির।

রাত্রে খেতেই চাইছিল না কাকলি। মার বকুনিতে একখানা রুটি খেয়ে সে উঠে পড়লো। একটু পরে তাও বমি হয়ে গেলো।

"দাদু, দাদু, তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?" মাঝরাতে কাকলির ডাক শুনে নির্মল চৌধুরী বুঝলেন মেয়েটা ঘুমোয়নি।

কাকলির কথায় দাদুকে উঠতে হলো। দুজনে মিলে আবার খোঁজাখুঁজি চললো। পুতুলের সংসারে সবাই শান্ত হয়ে শুয়ে রয়েছে, শুধু ভালুকটা ছাড়া—ও বেচারা চোখ বন্ধ করতে পারে না, তাই ওর ঘুম আসে না।

অনেক কষ্টে নাতনীকে এনে বিছানায় শোয়ালেন নির্মল চৌধুরী। বললেন, "কাল সকালে আবার খোঁজ করা যাবে।"

কাকলি এখনও ছটফট করছে। "দাদু, কেউ হারালে পুলিশে খবর দেয় না? তুমি একবার থানায় ফোন করে দাও।"

দাদুর মনে পড়লো, খোকন সে-রাত্রে বাড়ি না ফেরায় এমনি অস্থিরভাবে তিনি পুলিশের খোঁজ করেছিলেন।

এখন নাতনীকে সামলাবার জন্যে বললেন, "পুলিশরা এখন ঘুমোচ্ছে, লক্ষ্মীসোনা। কাল সকালে যা-হয় হবে।"

নির্মল চৌধুরী পাশ ফিরে শুলেন। আজ রাত্রে তাঁরও ঘুম না আসার কথা। আগামীকাল ১০ই জুলাই। দু'বছর আগে আজ রাত্রেই খোকন শেষবারের মতো তাঁর পাশের খাটে ঘুমিয়েছিল। একা ঘুমোতে ভয় পেতো খোকন। মা-মরা ছেলে, তাই কিছু বলতেন না নির্মল চৌধুরী।

কাকলি এবার ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। আর নির্মল চৌধুরী ১০ই জুলাই-

এর সেই ভয়ানক রাত্রির কথা ভাবলেন—খোকন বাড়ি ফেরেনি।

"দাদু, দাদু," কাকলি আবার ডাকছে। "এইমাত্র একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখলাম। দাদু, এখন একবার ছাদে যাবে?"

এই গভীর রাতে ছাদে যাওয়া! কিন্তু দাদু কেন জানি না রাজি হয়ে গেলেন। আলো জ্বেলে, পা টিপে-টিপে ওরা দুজন ছাদে উঠে এলো! "আকাশে আজ অনেক তারা। তারারা কেউ এখনও ঘুমোতে যায়নি।" দাদু শান্তভাবে বললেন।

কাকলি বললো, "ঘুমোতে যাবে কী করে? এই সময় তো ওরা অপেক্ষা করে, নিজেদের লোকদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে।"

আকাশের দিকে তাকিয়ে অধীর আগ্রহে কাকলী কী যেন খুঁজছে। সে বললো, "দাদু, দ্যাখো তো কালকের থেকে আজ আকাশে একটা তারা বেশি আছে কি না?"

এ আবার কী অদ্ভুত খেয়াল। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি এই তারা গোনা কি তাঁর মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব? কাকলি বললো, "তুমি কিচ্ছু জানো না দাদু, কেউ মরে গেলে সে আকাশের তারা হয়ে যায়। আমি হঠাৎ স্বপ্ন দেখলাম, মেয়েটা গাড়ি চাপা পড়েছে।"

নাতনীকে অভয় দিলেন নির্মল চৌধুরী। তারপর আকাশের তারাদের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে, দুজনে নীচে একতলায় এলেন।

নাতনীর পিঠে হাত বুলোতে-বুলোতে নির্মল চৌধুরী ভাবছেন, কাকলি যেন আর ছোট্ট মেয়েটি নেই।

পরের দিন কাকলি ইস্কুলে যেতে চাইছে না। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠেছে। এই একদিনেই বেচারারা চোখের কোণে কালি পড়েছে।

কাকলির মা ও বাবা মেয়ের ওপর বিরক্ত। সামান্য একটা পুতুল, যাকে পছন্দ হচ্ছিল না, তার জন্যে এই রকম কাণ্ড বাধাবার মানে হয় না। দাদু কিন্তু ওদের বাধা দিলেন।

সকাল থেকেই আজ কাকলির চোখ জল। সমস্ত জায়গা খুঁজে-খুঁজে সে এখন আশা ছেড়ে দিয়েছে। চোখ বুজছে কাকলি মাঝে মাঝে, আর সঙ্গে-সঙ্গে পুতুলটার অসহায় মুখটা সে দেখতে পাচ্ছে।

বেলা সাড়ে দশটা। স্নানের ঘরে গিয়ে, দরজা বন্ধ করে শাওয়ার খুলে দিয়ে নির্মল চৌধুরী একটু কেঁদে নিচ্ছিলেন। ১০ই জুলাই সবার অলক্ষ্যে চোখের জল

ফেলে তিনি নিজেকে একটু হালকা করে নেন। তারপর তিনি বেরোবেন মেয়েদের জন্যে কেক কিনতে। এই কেক জিনিসটা খোকনের খুব প্রিয় ছিল।

নির্মল চৌধুরী তাঁর মনের বাঁধ খুলে দিয়েছেন—বড়-বড় অশ্রুর ফোঁটা আষাঢ়ের বৃষ্টির মতো তাঁর মনের মাটিতে পড়তে শুরু করেছে।

ঠিক সেই সময়, কাকলির উত্তেজিত গলার স্বর শোনা গেলো—"দাদু, দাদু।"

নির্মল চৌধুরী ভিজে কাপড়ে কলঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলেন। কাকলির প্রবল উত্তেজনা। কালো পুতুলকে পাওয়া গিয়েছে। বুড়ী জমাদারনী বাড়ির ডাস্টবিন সাফাই করতে এসে জঞ্জালের মধ্যে রঙিন কাপড়-পরা পুতুলটাকে দেখতে পেয়েছে।

মাছের কাঁটা, এঁটো, ছাইকাদার মধ্যে মুখ থুবড়ে পুতুলটা এখনও পড়ে রয়েছে। কাকলি কারও কথা শুনলো না, পাগলের মতো ছুটে গিয়ে জঞ্জালের ভেতর থেকে দু'হাতে ওকে তুলে আনলো। মা হা-হা করে উঠলো। কিন্তু ততক্ষণে সমস্ত নোংরা সমেত পুতুলটাকে নিজের বুকের কাছে চেপে ধরেছে কাকলি। নিজের পরিষ্কার জামাকাপড়ে ডাস্টবিনের জঞ্জাল লাগছে, সে-খেয়াল নেই।

"দ্যাখো-দ্যাখো, আমার মিষ্টি সোনার কী অবস্থা হয়েছে!" পুতুলকে কাকলি তার বুকের কাছে আরও জোরে চেপে ধরেছে। সমস্ত রাত জলে ভিজে পুতুলটার রং অনেকখানি উঠে গিয়েছে। ইঁদুর বোধহয় একটা হাতের কিছুটা কেটে দিয়েছে। বিবর্ণ পুতুলটাকে আরও বিশ্রী দেখাচ্ছে।

কিন্তু কাকলিকে সে-কথা এখন কে বলবে? "খুকু আমার ঘরে চলো—তোমাকে আমি আর কক্ষনো বকবো না। তুমি আমার মিষ্টি মেয়ে, সোনা মেয়ে, আমার নিজের মেয়ে," এই বলে কাকলি বিবর্ণ নোংরা পুতুলটার মুখে, চোখে, কপালে এপের পর এক চুমু খেতে লাগলো।

রেগে-মেগে অদিতি এবার কাকলিকে মারতে যাচ্ছিল। "ডাস্টবিনের নোংরা মুখে দিয়ে তুই যে অসুখে পড়ে যাবি।"

দাদু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন। এমন অদ্ভুত দৃশ্য তিনি জীবনে কখনও দেখেননি। নিজের মেয়েকে বাধা দিয়ে, মনের অনুভূতি চেপে রেখে নির্মল চৌধুরী কোনোরকমে বললেন, "ও যে মা-জননী—হারানিধি খুঁজে পেয়েছে। ওকে তোমরা কিছু বোলো না।"

দাদু আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে কাকলি ও তার কালো মেয়েকে দেখলেন। তারপর স্নানের ঘরে ফিরে গিয়ে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে কাঁদতে লাগলেন অঝোরে।

